দাসী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

দাসাশ্রমের মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ.

চতুর্থ বর্ষ—চতুর্থ ভাগ।

কলিকাতা

২০৮।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস

দ্বারা প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ টাকা।

সূচী।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা।
অস্ফুট ভাষ	শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,	৮
অনশ্বর	সম্পাদক	১৭০
অগ্নি পরীক্ষা	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু বি এস্, সি, (লণ্ডন)	২৫০
অমরত্ব ওপুনর্জন্ম	শ্রীসীতানাথ দত্ত	৫৭৯, ৫৯৮
অবসর	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন	৬৮৯
আমাদের পারিবারিক অবস্থা	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্,	৪৮
আমার পশ্চিম ভ্রমণ	শ্রীরাজনারায়ণ বসু	২৮৯
আসাম ভ্রমণ	শ্রীজলধর সেন	৩০৯, ৪৪৮
ইতরপ্রাণীর শেষ গতি	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	৭৭
ইংলণ্ডীয় সভ্যতা	শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডি এস, সি, (এডিন)	১৮২
ইংরাজ সমাজ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বি, এ, (ক্যাম্ব্রিজ)	২০[illegible]
ইংলণ্ডে নিরামিষ ভোজন চলে কি না,	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	৪৬০
ইছামতী (কবিতা)	শ্রীফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ	৫২২
উপনিষদের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত	শ্রীসীতানাথ দত্ত	৬৮
উপনিবেশ স্থাপন	শ্রীরাজকুমার দাস এম্, এ,	২৭৭
ঊষা (কবিতা)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্, এ,	৫৬৭
একটা কৈফিয়ৎ	শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ,	৬৩
এলাহাবাদে	শ্রীজলধর সেন	১৫২
এসিয়া ও পৃথিবীর ধর্ম্ম	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ,	১৬৪
কন্যাদায় (গল্প)	শ্রীনৃত্যগোপাল কবিরত্ন	৩৭৮
কীট্সের কবিতা	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৩৮
কীর্ত্তন (কবিতা)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্, এ,	৫০১
কুসংস্কার	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ,	১৪৮
কেরল	শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত	৫১০, ৬২৫
কোম্পানি বাহাদুরের মনুষ্য তৈল বিক্রয়		৪২৩
খণ্ডগিরি	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ,	৪৩১

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
খাদ্য	শ্রীগোবিন্দনাথ গুহ এম্, এ,	১৫৮
খাঁ জাহানআলি	শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	৬৩৫, ৬৩২
গীতোক্ত অবতার তত্ত্ব	শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম	৫৫৫
ছেলেটী যেন কার্ত্তিক	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ,	৪০৩
জগদ্রাম রায়	শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৭, ৩৯৪
জিজ্ঞাসা	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৪৫
জিজ্ঞাসার উত্তর	শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী	২১০
জীবন চরিত	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এ, (কেম্ব্রিজ)	২
জীবনোপায় (গল্প)	ঐ ঐ	১৯১, ... ৫৬, ৩২...
জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দ	শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৭...
জ্ঞানবৃক্ষ ও তাহার একটী সুফল	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ,	৪৯
তুকারাম	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	২৮, ৫৭, ১১... ...৭, ২৪ ২৯৪, ৪১৫, ...০, ৬৬৫
দাসাশ্রম		৫...
দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ		৫৩, ১০৯, ১৭১, ২২৮, ২৮৫, ...২, ... ৪৭৫, ৫৩২, ৫৮৮, ৬...৪৪, ...
দানব ও বামন	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার	[illegible]
দুইটী পক্ষী	সম্পাদক	[illegible]
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী		[illegible]
দেশীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ	[illegible]
নির্ব্বাসিতা	শ্রীবিনয়কুমারী ধর	[illegible]
পঞ্চ মহাযজ্ঞ	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	[illegible]
পারিবারিক আমোদ প্রমোদ	শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত	[illegible]
পিতৃভূমি দর্শন	শ্রীরাজনারায়ণ বসু	[illegible]
পৃথিবীর সেবক দল	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	[illegible]
পৃথিবীর বয়স	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,	[illegible]
প্রতিশোধ	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু	[illegible]
প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী	শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী	[illegible]
বঙ্কিমচন্দ্র	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৮৩, ৩৮২, ৩৮৮, ৫...	[illegible]

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বালুকাময় জলশোধকের উপযোগীতা	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ,	৩৫৯
বাল্যসখী (কবিতা)	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ,	৩৬৮
বর্ষা ও দিবার মৃত্যু (কবিতা)	শ্রীবিনয়কুমারী ধর	৪৩৯
বাঙ্গালী	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ,	১৯৬
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ,	৩০২
বাদ প্রতিবাদ	শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী ও শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩১৭
বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ,	১২০
বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গ	সম্পাদক	২৬৭
ব্রহ্মরমণী	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৫১৬
ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু বি, এস্, সি, (লণ্ডন)	১৭৭
মাতৃস্নেহ (কবিতা)	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ,	৯৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীরাজনারায়ণ বসু	৫৯১
রামপ্রসাদ সেন	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	৪৯৬
রামপ্রসাদ বৈদ্য কি কায়স্থ	শ্রীরসিকচন্দ্র বসু	৬৮১
লাভেরিয়ে	শ্রীমুরলীধর রায়চৌধুরী এম্, এ,	১৬
লেবেরিয়ে	শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৬৮
বিবিধ প্রসঙ্গ	সম্পাদক	২১৫
শমন-দমন-বিধি	শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম্, বি,	১০
শান্তি নিকেতন	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ,	৫৪৬
শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীহট্টাগমন	শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী	৫২৪
শ্রীগৌরাঙ্গ ও তুকারাম	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর	৬০৯
সর্পবিষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ,	৫০২
সম্পাদকের নিবেদন		২৩২
সেবা সংবাদ	শ্রীশ্যামলাল ঘোষ	১১২, ৬৪১
সৌন্দর্য্য-বোধ	শ্রীভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম্, এ,	৪৪
স্বরলিপি	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ,	৭৩
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা		৩৫৫, ১৪২
সুখের নদী (কবিতা)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্, এ,	৩৭৭

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
সুভদ্রা	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্,	৩৮২
সেকালের পাঠশালা	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ,	৪৪০
সেকালের পাঠশালা	শ্রীরাসবিহারী সেন	৫৬০
সূর্য্যের তাপ ও পরমায়ু	শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম্, এ,	৪৮৬
সংসার ও ধর্ম্ম	শ্রীহীরালাল হালদার এম্, এ,	৫৪০
হরিদাস	শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী	১০৪, ৬৭৬

দাসী

নির্ব্বাসিতা।

অরণ্যের অন্তরালে অস্তমিত রবি ;
তমসার কাল জলে ম্লান তটচ্ছবি
হ'তেছে মলিনতর সন্ধ্যার ছায়ায়।
জলিতেছে অতি ক্ষীণ সুবর্ণ আভায়
ঘন নীল বনরেখা দূর পর পারে ;
জলশূন্য নদীতীরে আসন্ন আঁধারে
বসিয়া রমণী এক ; নীরব নিশ্চল,
মধুর মূরতি অতি ; বিষাদ কোমল,
অশ্রুজলে ছল ছল দুখানি নয়ন
নেহারিছে কি দারুণ দুঃখের স্বপন
সমস্ত জগতে যেন, কাতরে চাহিয়া !
সায়াহ্নের মৃদু বিভা প'ড়েছে আসিয়া
সুন্দর ললাটতটে, আনম্র আননে,
শান্ত স্নিগ্ধ সখী-স্নেহে ; অব্যক্ত বেদনে
ম্লান দুটি রক্তাধর ; পাণ্ডুর কপোল
চুম্বিছে চিকুর-গুচ্ছ ; কবরী বিলোল
প'ড়েছে গ্রীবায় হেলি ; চম্পকবরণ
ক্ষীণ দেহলতা খানি করিয়া বেষ্টন
লাবণ্যে মিলায়ে আছে সুনীল বসন,
ঊষার আলোক লগ্ন মেঘের মতন।
চরণ পল্লব দুটি ধরিয়া ধরণী
বিস্ময়ে বিহ্বল যেন ; নিন্দিয়া নবনী

স্থকোমল বাহুযুগ কনক কঙ্কণ
সাগ্রহে র'য়েছে বেড়ি ; সন্ধ্যা সমীরণ
নিশ্বাসি ফিরিছে পাশে ; কি বিষণ্ণ স্থরে
অটবী মর্ম্মরি উঠি কাঁপিতেছে ; দূরে
বিরহিণী চক্রবাকী করুণকূজনে
ডাকিছে সখারে তার ; কুলু কুলু স্বনে
তটতলে সকাতরে উছলে তমসা।
একাকিনী বনপ্রান্তে তরুণী বিবশা
স্তব্ধ, মর্ম্মাহতা ; উর্দ্ধে পশ্চিম গগনে
কাঁপিছে সন্ধ্যার তারা, দিগ্বধূনয়নে
অশ্রুবিন্দু সম। অয়ি নিরাশ্রয়া বালা!
যূথহারা কুরঙ্গিনী সম এ নিরালা
প্রদেশে কে তুমি সাধ্বি ? নির্দোষিতা-মাখা
ও শুভ্র পবিত্র মুখে কেন দুঃখ আঁকা ?
মৌন দৃষ্টি দিয়া যেন উত্তরিছে সতী—
"সংসারের অনাদৃতা, প্রতারিতা অতি,
সর্ব্বসহা বসুধার দুখিনী দুহিতা,
আমি পতিপরিত্যক্তা ভগ্নপ্রাণা সীতা।"

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

জীবনচরিত।

আমি আদৌ বলিয়া রাখিতেছি যে এই প্রবন্ধে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিত বর্ণিত হইবে না ; পরন্তু জীবনচরিত কিরূপে সঙ্কলন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এস্থলে দুই একটী অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। 'মাসিক পত্র ও সমালোচন' শীর্ষধারী যে সকল কাগজ বাহির হইতে দেখা যায়, তাহাতে প্রবন্ধ লিখিবার সময় সাধারণতঃ ইহাই ধারণা হয় যে ঐ সকল প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা বিদ্যালয়ের গুরু মহাশয়ের মত উপদেশ দেওয়া ও পাঠকগণকে তাহা গলাধঃকরণ বা উদ্গার করিয়া

তৃপ্তিলাভ করিতে দেওয়া, কখনই প্রবন্ধলেখকের উদ্দেশ্য থাকে না। সাধারণের শিক্ষার জন্য যত না প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্তি হয়, ঐ শিক্ষণীয় বিষয়ে সাধারণের মধ্যে আলোচনা দেখিতে তদপেক্ষা অধিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কোন প্রবন্ধকে ভাল কিম্বা মন্দ বলা, অথবা কোন্ প্রবন্ধ ঐতিহাসিক এবং কোন্টী বা বৈজ্ঞানিক, তাহার উল্লেখ করাকে আলোচনা বলা যায় না ; সমালোচনা ত কখনই বলিতে পারি না। ইহাকে লৌকিক ভাষায় "সূচিপত্র" বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলা ভাষাতে কিন্তু এই প্রথা অতি প্রবল ; এবং তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে বাঙ্গালীজাতি জীবনের গুরুত্ব স্থিরভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না। এক ব্যক্তির মানস হইতে যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাতে মনপ্রাণ মিশাইয়া সেই স্রোতের বেগ বৃদ্ধি করা বাঙ্গালীর ধৈর্য্যে কুলায় না ; সাধারণ বাঙ্গালী মন স্রোতের জলে জড় প্রস্তরের ন্যায় পড়িয়াই ডুবিয়া যায়,—ডুবিতে ডুবিতে যে পর্য্যন্ত স্রোতোজল গায়ে লাগিল, তাহাই লাভ মনে করে।

ইহার একটী দৃষ্টান্ত পাঠকদিগের গোচর করিতেছি। একদা আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, "জীবনচরিত যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল।" জীবনচরিত বলিতে গেলে একটী মনুষ্যজীবনের কার্য্য ও ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা বুঝায়। ইহা হইতে উদ্ধৃত অংশটীর এই অর্থ করা যায় যে, একটী জীবনের সার কথাগুলি যত অল্পেতে আমরা জানিয়া লইতে পারি, ততই ভাল। বাস্তবিক তাহা ভাল কি মন্দ, তাহারই বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা সকলেই ঘড়ীর 'মুখ' (dial-face) দৃষ্টে সময় জ্ঞাত হইয়া থাকি। কিন্তু যাঁহার ঘড়ীর অভাব আছে, তিনি যদি কোন ঘড়ীর 'মুখ' মাত্র দেখিয়া নিজের ব্যবহারার্থ একটী ঘড়ী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে সেই ঘড়ী ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র হইবে, কিন্তু তাহাতে জগতের কার্য্য চলিবে না। ঘড়ীর 'মুখ' সময়জ্ঞাপনের উপলক্ষণ মাত্র, তাহা সময়জ্ঞাপনের হেতু নহে। আভ্যন্তরিক নানাবিধ কলসংযোগে সময়জ্ঞাপন নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। 'মুখ', দর্পণের ন্যায়, সেই সকল আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবিম্ব স্বরূপ সময়জ্ঞান মানবের নেত্রসমক্ষে উদ্ভাসিত করে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিতকে আমি ঘড়ীর মুখের সহিত তুলনা করি ; মানবজীবনের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকলাপ ও ভাব-প্রবাহ সময়ের স্রোতের ন্যায় তাহাতে প্রতিবিম্বিত

হইবে, জনসাধারণ তদ্দৃষ্টে স্বীয় স্বীয় জীবনের কার্য্যকুশলতার পরিমাপ করিবে। আমরা সাধারণতঃ জীবনের কার্য্যবিভাগ জন্যই ঘড়ীর ব্যবহার করিয়া থাকি। সময় কার্য্যের সহিত মানবজীবনের সম্বন্ধ বিধান করিয়া রাখে, তাই মানুষের নিকট কার্য্যদ্বারাই সময়ের পরিমাপ। কার্য্য দুই প্রকার;—সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতি হইতে সুকৃতি বাছিয়া লইবার এবং তাহা স্বীয় জীবনে গ্রথিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই জীবনচরিত পঠিত হইয়া থাকে। সকল সুকৃতি সকল মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয় না; তাই জীবনের বিভিন্ন প্রকার সুকৃতি-বিভাগ জন্য ভিন্ন ভিন্ন জীবনচরিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল জীবনচরিতেরই উদ্দেশ্য এক;—পাঠকের মানস-মন্দিরে সুকৃতির আদর্শ খাড়া করিয়া দেওয়া।

ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে কোন পূর্ব্বগত বৃক্ষের ফল হইতে বীজ আহরণ করিয়া তাহা নূতন মাটিতে রোপণ করিলে, তাহা হইতে নূতন বৃক্ষ জন্মাইয়া নূতন ফলফুলে জগৎকে পরিশোভিত করে। আমি প্রত্যেক প্রতিভাশালী (বা ফলশালী) জীবনকে উক্ত নূতন মাটির সহিত তুলনা করি; কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে জগতের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান বীজরূপে, প্রতিভা-দ্বারা উর্ব্বরিত কোন মানসভূমিতে নিহিত হইলে, তাহাতে দুর্ল্লভ ফল উৎপাদিত হয়; ইহাকেই প্রতিভার কার্য্য বলা যায়। ভাববৃক্ষ বীজব্যতিরেকে কোন মানসক্ষেত্র হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া দেখা কিম্বা শুনা যায় নাই, এবং তাহার সম্ভাব্যতা বিশ্বাসযোগ্য নহে। একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন অপর কুত্রাপি এইরূপ অবীজসম্ভূত ভাববৃক্ষের উৎপত্তির লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু অপূর্ণবুদ্ধি মানব ফলাস্বাদনে ও ফুলের বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হইয়া বীজ ভুলিয়া কেবল ফলফুলেরই বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হয়; এবং সাধারণ লোকের নিকট ঐ সকল বর্ণনা প্রহেলিকাবৎ প্রতিপন্ন করে। দুঃখের বিষয় এই যে জগতে অধিকাংশ জীবনচরিত এই প্রণালীতে লিখিত হইয়া থাকে; এ কারণ মানুষ ঐ সকল জীবনচরিত হইতে স্বস্ব আদর্শ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জীবন পরিচালিত করিতে সক্ষম হয় না। কোন বিখ্যাত জীবনচরিত-লেখকের গ্রন্থে পড়িয়াছি যে, প্রত্যেক জীবনচরিতে এক কিম্বা ততোধিক ভাবকে ঐ জীবনের কার্য্যরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; ইহাই জীবনচরিতের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক জীবনচরিত উক্ত ভাববিষয়ে তৎসমকালীয় ইতিহাসরূপে গণ্য হইবে। পূর্ব্বার্জ্জিত ভাবরাশি কিরূপে জীবনে

নিহিত হইল এবং কি প্রণালীতে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ফলোৎপাদন করিল, তাহার সহিত তৎসমকালীয় অপরাপর জীবনের ভাবের সহিত কিরূপ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, এই সকলের যথাযথ বর্ণনাই জীবনচরিত। কিন্তু তাহার সহিত ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঐ জীবন একটী সৃষ্টিছাড়া ভাববিষয়ীভূত প্রক্রিয়া নহে, তাহা জড়দেহধারী মানবজীবন, এবং জড়জগতের সুখ দুঃখ তাহাকে বিজড়িত করিয়া ঐ ভাবফলোৎপাদনে সহায়তা করিয়াছে। ভাবের ক্রমবিকাশ ভুলিয়া কেবল ফলালোচনাতে যেমন জীবন প্রহেলিকাবৎ প্রতিপন্ন হয়, তেমনই জীবনের সুখদুঃখের খুটিনাটি বাদ দিয়া কেবল ভাব-প্রবাহরূপে জীবনকে জনসমাজে দাঁড় করাইলে তাহাও ততোধিক প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য হইবে।

এক্ষণে দুই একটী স্থূল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাউক। মহাভারতে যুধিষ্ঠির চরিত্র সকলেই জ্ঞাত আছেন; যুধিষ্ঠির মানুষই হউন অথবা কবির কল্পনা-প্রসূত আদর্শ চরিত্রই হউন, তাহাতে মানবিকত্বের অভাব নাই বলিয়াই তাহা ধর্ম্মজীবনের আদর্শরূপে প্রত্যেক নরনারীর নিকট খাড়া করা যাইতে পারে। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত মানবজন্মসুলভ সুখ দুঃখ শোক মোহ সমস্তই জীবনকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে; তাই যুধিষ্ঠির চরিত পাঠ করিতে করিতে মানুষ সহজে নিজের প্রাণের ভিতরে যুধিষ্ঠিরের জীবনের ছায়া অঙ্কিত করিতে পারে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, ক্রীড়া, কৌতুক, এমন কি, কথঞ্চিৎ স্বার্থলাভার্থ দুর্ব্বলতা পর্য্যন্ত, ঐ চরিত্রের অঙ্গকে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে; তাই যুধিষ্ঠির আমাদের নিকট একান্তই মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; আমরা অনায়াসে যুধিষ্ঠিরকে আদর্শ রাখিয়া চিরজীবন চলিতে পারি। কিন্তু যে সকল চরিত্রে কেবল মাত্র সুকৃতি ফুটাইয়া তোলা হয়, যাহাতে ভাবের সমাবেশ ভিন্ন মানবিকত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না, তাহা সাধারণের নিকট দেবচরিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয় বটে,—ঐ চরিত্রের আধারকে দেবতা বা অবতার বলিয়া ধারণা করা যায় বটে, কিন্তু তাহা মানুষের প্রাণে আদর্শ জীবনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঐ সকল 'দেবচরিত্র' ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের সমালোচনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা জীবনচরিতের বিষয়ীভূত নহে। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত 'খৃষ্টচরিত'। খৃষ্টানগণ খৃষ্টের জীবনকে আদর্শ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব জীবন গঠিত করিতে পারিতেছেন না; কারণ খৃষ্টচরিত্রকে মানব চরিত্ররূপে খাড়া না করিয়া একান্তই দেবচরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

বিজ্ঞানজগতেও এইরূপ জীবনচরিতের অপ্রতুল নাই। অনেক জীবনচরিত-লেখক মনে করেন যে সংক্ষেপে সাধারণের বোধগম্য করিয়া জীবনের সার কথা গুলি লিখিয়া দিতে পারিলেই সুন্দর জীবনচরিত হইল। যথা,—নিউটন একদা এক আতা গাছের নীচে বসিয়াছিলেন; হঠাৎ গাছ হইতে একটী আতা পড়িল; তিনি তাহা ভাবিতে ভাবিতে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিলেন। সকলেই জানিতেছেন যে আতা-পতন মাধ্যাকর্ষণের ফল, কিন্তু তাহার প্রথম জ্ঞান লাভার্থ নিউটনকে দেবতা মনে না করিলেও দেবানুগৃহীত বলিয়া ধারণা হয়। ঐ রূপ দেবানুগ্রহ দৈবযোগে ঘটে; অতএব নিউটনের জীবনের উপরোক্ত অংশ আমাদের নিকট প্রহেলিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু আতা-পতন দর্শন কালে নিউটনের মনে কি ভাব প্রবল ছিল, কোন্ পূর্ব্বার্জ্জিত ভাব তাঁহাকে এই নূতন ভাব উদ্ভাবনে সহায়তা করিল, কোন্ নৈসর্গিক প্রক্রিয়া তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত থাকাতে তিনি তাহার সহিত আতা-পতনের সাদৃশ্য দেখিয়া শেষোক্ত ঘটনাতে কারণের আরোপ করিতে সক্ষম হইলেন, তাহা জীবনচরিতে সুস্পষ্ট না দেখাইয়া দেওয়াতে নিউটনের জীবন সাধারণের নিকট আদর্শজীবনরূপে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কত বালহৃদয় নিউটনের জীবনের এই অংশকে প্রহেলিকা বা বিশেষ বিধান মনে করিয়া তাহার আদর্শ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেছে; তাহার ফলে জগতে বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতিপথে একটী বিষম কণ্টক রোপিত হইয়া রহিয়াছে। পাঠকগণের মধ্যে সকলে জ্ঞাত আছেন কিনা জানি না যে নিউটনের জীবনের একাদশ বৎসরের অবারিত চিন্তার ফল মাধ্যাকর্ষণাবিষ্কার! এই একাদশ বৎসরের চিন্তাপ্রণালী ও ভাবপ্রবাহ জনসাধারণের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারিলে, কত বালহৃদয় বিজ্ঞানানুশীলনে বীতস্পৃহ না হইয়া বরং বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিত। কিন্তু সংক্ষেপকারী জীবনচরিত-লেখকদিগের নির্ম্মম লেখনীর আঘাতে নিউটনের জীবনের যে স্থল আদর্শস্থানীয় হওয়া বিধেয়, তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে Sir David Brewster এবং ফ্রান্সে Arago নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদ্বয় প্রথমে ইংরাজী ও ফরাশিভাষাতে যথাক্রমে নিউটনের ভাবপ্রধান জীবনচরিত প্রণয়ন করেন। এক্ষণে এই দুইটী জীবনচরিতই সর্ব্বত্র তাঁহার আদর্শ জীবনচরিতরূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে।

কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে কোন প্রিয়ব্যক্তির মৃত্যু হইলেই

তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করণার্থ জীবনচরিত প্রণয়ন একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার অপর নানাবিধ উপায় রহিয়াছে। জীবনচরিত বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত হয়; সেই সকল উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে জীবনচরিত প্রণয়ন করিলে তাহার দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্মান হইতে অধিক অবমাননা করা হয়। আবার অনেকে উপরোক্ত বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী জীবনচরিত প্রণয়নে সমর্থ হইলেও মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া তাঁহার জীবনকে ব্যবসায়ের সামগ্রী করিয়া তুলিতে বিরত থাকেন। তাঁহারা নিজের ব্যক্তি গত ভাবকে সমাজের উপকারার্থে উৎসর্গ করিয়া দিলে জগতের অনেক উপকার হইতে পারে।

এক্ষণে ইহা লক্ষিত হইবে যে, যে সকল জীবনের কার্য্যকলাপ আদর্শ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে এবং যাহাদের অনুকরণে জীবন পরিচালিত করিলে জগতের উন্নতি-সাধন হইতে পারে, সে সকল জীবনের ঘটনাবলী ও কার্য্যকলাপ বর্ণনাই জীবনচরিত নামের বাচ্য হইবে। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি মহৎ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী বর্ণনা দ্বারা মহৎ হইবার পথ দশাইয়া দেওয়াই জীবনচরিতের উদ্দেশ্য। তাহা হইলে সহজেই এই ধারণা হয় যে জীবনচরিত যত দীর্ঘ হয়, ততই ভাল। কারণ জীবনচরিতের দৈর্ঘ্যানুসারে তাহাতে কার্য্যপ্রণালী ও ভাবপ্রবাহ সকল অধিকতর বিশদ ও সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করা যায়; এবং মানুষ তাহার প্রত্যেক স্তরে স্তরে ভাব গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রাণে ঐরূপ জীবনের ছায়া পাতিত ও তদনুসারে জীবন গঠিত করিতে সক্ষম হয়। কোন জীবনে একটি বিশেষ ভাব কিরূপে প্রবিষ্ট হইল এবং তাহা কিরূপে ঐ জীবনকে স্বীয় রঙ্গভূমি করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ও উন্নত হইতে লাগিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ জীবনের আনুষঙ্গিক বাহ্যিক বা লৌকিক ঘটনাবলী, মানবজীবনসুলভ দুঃখ সুখ ইত্যাদি কিরূপে ভাবকে বিজড়িত করিয়া কোন্ পথে চালিত করিল, এই সমস্ত বিষয় জীবনচরিতে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবে। আসল কথা এইযে জীবনচরিত মানুষের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি রূপে বিরাজ করিবে; তাহা যত দীর্ঘ হইবে, ততই প্রকৃত মানুষের সহিত তাহার প্রতিমূর্ত্তির অধিকতর সামঞ্জস্য থাকিবে এবং তাহা তত স্থায়িরূপে পাঠকের মনে অঙ্কিত হইবে। যেমন দূর হইতে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিলে তাঁহার স্বরূপ সুস্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায় না; যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় এবং

যত অধিক মনোযোগের সহিত তাঁহাকে দেখা যায়, ততই তাঁহার স্বরূপ অধিকতর স্থায়িরূপে মানসপটে অঙ্কিত হইতে থাকে, জীবনচরিত পাঠেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। জীবনচরিত যত সংক্ষিপ্ত হয়, তাহার ছায়া ততই অস্পষ্টরূপে প্রাণে আসিয়া পড়ে এবং ততই অল্পকাল স্থায়ী হয়। কোন জীবনের ঘটনাবলী যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করা যায়, ঐ জীবনের সহিত স্বীয় জীবনের তত অধিকতর ঘনিষ্টতা সম্পাদিত হয়।

অনেক বড়লোকের ঘরেই বহুসংখ্যক ঘড়ি থাকে। যদি তাহার সকল গুলিই অযত্নরক্ষিত ও বিশুদ্ধ সময় জ্ঞাপনে অসমর্থ হয়, তবে সে গুলি কোন কাজেই আসে না। কিন্তু একটি ঘড়িও বিশুদ্ধ ও যত্ন সহকারে রক্ষিত হইলে তাহা বহুকাল ব্যবহারে আসিবে এবং তাহা গৃহস্থ যাবতীয় লোকের কার্য্য নিয়মিত করিতে সক্ষম হইবে। সেইরূপ বহুসংখ্যক সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত মানুষের চিত্তপটে কার্য্যের শৃঙ্খলা সাধনে যত না সমর্থ হয়, একটিমাত্র সুচিন্তিত ও ভাবপ্রবাহিত জীবনচরিত তদপেক্ষা অনেক অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

অস্ফুট ভাষা।

চারিদিকে কত গান
মোহিত করিছে প্রাণ,
আকুল করিছে বিশ্ব নীরবে।
কি যে গান এ, ওগো, কে শুনিবে,
কে বুঝিবে?

উঠিছে নবীন ভানু,
প্রেমে পুলকিত তনু
বিহগ বিহগী গান গাইছে।
কি যে গান এ, কে বুঝিবে, কে
এমন আছে?

ধীরে ধীরে বহে বায়
শ্যাম লতিকার গায়,
শিহরি উঠিছে লতা পরশে;
প্রেমের পুলকরাশি ফুটে উঠে
হরষে।

রঞ্জিত মেঘের মালা
সায়াহ্নে করিছে খেলা,
মধুর সঙ্গীত কত ঝরিছে।
কি রাগ রাগিণী ছুটে কে বা পারে
বুঝিতে?

কি মহা অশান্তি প্রাণে
পোষিছে সিন্ধু গোপনে,
দীর্ঘ শ্বাস কেবা তার বুঝিবে?
দিগম্বর বারিধির হা হুতাশ ঘুচাবে?

কত কি লুকানো কথা,
কত কি লুকানো ব্যথা,
ফুটে উঠে ললনার নয়নে,
বহু বরষের পর সখা-সম্মিলনে!

মহাযোগী শিশু হাসে
জননীর কোলে ব'সে,
কত অর্থহীন কথা বলিছে;
অস্ফুট সে ভাষা তবু প্রাণমন মোহিছে!

বরষার কালো ছায়া
ঢেকেছে বিশ্বের কায়া,
গভীর গরজে ঘন গগনে;
নিশিদিন ঝরে বারি প্রকৃতির নয়নে।

বসি বাতায়ন পাশে
বিরহিণী নিশিশেষে,
নিবিড় কুন্তলজাল এলায়ে,
চেয়ে আছে শূন্যপানে শূন্যময় হৃদয়ে।

সরবে নীরবে কত
ছুটিছে ভাষা নিয়ত,
হরষে বিষাদে হয়ে জড়িত;
ধীরে গম্ভীরে ভাষা দিকে দিকে তরঙ্গিত।

কে বুঝিবে, কে বুঝাবে,
কে শুনিবে, কে শুনাবে,
বিশ্বময় এ কিসের কামনা?
মানবের ভাষা দিয়ে কে করিবে রচনা?

বুঝি এই নব ভাষা
দিতে পারে নব আশা,
আশাহীন মানবের হৃদয়ে;
শোকতাপ মোহপাপ দিতে পারে
ঘুচায়ে

অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা শত
ভাষায় ফুটিবে যত,
নব নব আকিঞ্চন জাগিবে;
ভাবেতে হইয়ে মত্ত বিশ্ববাসী নাচিবে

কোথা তুমি, মহাকবি,
দেখ জগতের ছবি,
মোরা কিছু বুঝিতে ত পারি না;
চারি দিকে কত গান, কত শত কামনা

দেখ কত আশা করে,
ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে,
শত শত নরনারী দাঁড়ায়ে;
এ রহস্য ভেদ করি দাও সবে বুঝায়ে

শূন্য যাহা পূর্ণ কর,
ভাষায় ভাব সঞ্চার,
বিকশিত কর অস্ফুট ধ্বনি;
সে মহাসঙ্গীতে হবে পরিপূর্ণ ধরণী।

শ্রীপ্রঃ—

শমনদমন-বিধি।

প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ জীবন কেন দেহাশ্রয় গ্রহণ ও দেহ পরিবর্জ্জন করিতেছে, আমরা তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কিন্তু জীবিত দেহের ক্রিয়া প্রণালী কি এবং মৃত্যুকালে ঐ সমুদয় ক্রিয়ার কিরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহের প্রত্যঙ্গসমূহ স্ব স্ব কার্য্য সাধন করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ জীবিত থাকে। সমুদয় প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে; একটী অঙ্গুলী ছিন্ন হইলে কিম্বা প্লীহা বা জরায়ু উৎপাটিত হইলেও জীবনধারণ সম্ভবপর হয়। কিন্তু হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ এবং মস্তিষ্ক, এই তিনের কোনও একটীর ক্রিয়া স্থগিত হইবামাত্র দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

হৃদয় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার আধার। কেহ কেহ বদ্ধ মল বহির্গত করিবার জন্য রবারের পিচকারী ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহারা জানেন, সেই পিচকারীর মধ্যস্থিত গোলক টিপিয়া সঙ্কুচিত করিলে, একদিকে জল আসিয়া গোলকে প্রবেশ করে এবং পুনশ্চ টিপিলে গোলক হইতে জল অন্য দিকে বহির্গত হইয়া উদরমধ্যে প্রবেশ করে। ঐ পিচকারীর ন্যায় হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন বশতঃ একদিক দিয়া হৃৎপ্রকোষ্টে রক্ত প্রবেশ করিতেছে এবং অন্যদিক দিয়া হৃৎপ্রকোষ্ঠ হইতে সমুদয় দেহে রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। কোন কারণবশতঃ যদি পিচকারী ফাটিয়া যায় কিম্বা শিথিল হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহার কার্য্য স্থগিত হয়; তদ্রূপ কোন কারণবশতঃ হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী দুর্ব্বল হইলে বা ফাটিয়া গেলে, ইহার ক্রিয়া স্থগিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হর্ষশোকভয়াধিক্যবশতঃ স্নায়ুমণ্ডলে আঘাত লাগে, এবং ঐ আঘাত স্নায়ুযোগে হৃদয়ে পঁহুছিবামাত্র ইহার গতিরোধ হয়। হর্ষবিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু, মানসিক কারণে আকস্মিক মৃত্যুর একটী উদাহরণ।

ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরে বায়ুযোগে রক্ত শোধিত হয়। কোন কারণবশতঃ বায়ুর গতিরোধ হইলে, রক্তসংশোধন ও রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া স্থগিত হয় এবং শ্বাসরোধনিবন্ধন মৃত্যু হয়। মস্তিষ্কের স্থানবিশেষের সঙ্গে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কোন কারণবশতঃ ঐ অংশ

বিকৃত হইলে শ্বাসরোধ ও মৃত্যু হয়। সর্দ্দিগরমি কিম্বা মস্তিষ্কে রক্তস্রাববশতঃ মস্তিষ্কের শ্বাসপরিচালক অংশ বিকারপ্রাপ্ত হয়। সাত বৎসর পূর্ব্বে একজন লক্ষপতির গৃহে আহূত হইয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একজন অধমর্ণের নিকট অর্থ আদায় করিতে গিয়াছিলেন। গিয়া শুনিলেন, তাঁহার ৫০,০০০৲ টাকার এক কপর্দ্দকও আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থই তাঁহার জীবন ছিল। এই সম্ভাবিত অর্থহানিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। নিদ্রা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; মস্তিষ্কের একটী অংশ ক্রমশঃ তরলীভূত হইল; বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল; মস্তিষ্কে রক্তস্রাববশতঃ সংজ্ঞা লুপ্ত হইল; অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে সমুদয় অর্থভাবনা হইতে বিমুক্ত করিল।

হৃদয়, ফুস্‌ফুস ও মস্তিষ্ক, এই তিনের কোন একটী যন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হইলেই মৃত্যু হয়। এই যন্ত্রত্রয় কিরূপে বা কি হেতু বিকারপ্রাপ্ত হয়, অনেক সময়ে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। রোগ যখন অল্পে অল্পে অলক্ষিতে দেহ অধিকার করে, মৃত্যু ধীরপদসঞ্চারে কোন দিক দিয়া আগমন করে, তাহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় মৃত্যুর গতিরোধ করিবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিত।

মৃত্যু নিবারণের চেষ্টা কি কখনও সফল হইতে পারে? জন্ম মরণ ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মৃত্যুই জীবের শেষ পরিণাম; ইহা নিবারণের চেষ্টা করা, আর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলা কি একই কথা নহে? বহুশতাব্দী পূর্ব্বে অগ্নিবেশ মহর্ষি আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবন্! প্রত্যেক জীবের আয়ুর কি কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে?" আত্রেয় বলিলেনঃ—

"দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদৈহিকম্॥
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদি হাপরম্।
বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ॥

"দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েই আয়ুর বলাবল অবস্থিত। দৈব কোন এক স্বতন্ত্র অদ্ভুত পদার্থ নহে। দৈব ও পুরুষকার উভয়েই আত্মকৃত কর্ম্ম। পূর্ব্বদেহকৃত আত্মকর্ম্মের নাম দৈব, আর বর্ত্তমান দেহকৃত আত্মকর্ম্মের নাম পুরুষকার। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই শক্তিমত্তা ও হীনশক্তিতা

দৃষ্ট হয়।” যাঁহারা পুরুষকার বা আত্মকর্ম্মজনিত আয়ুর ক্ষতি বৃদ্ধি স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে আত্রেয় বলিতেছেন ঃ—

“যদি হি নিয়তকালপ্রমাণ মায়ুঃ সর্ব্বং স্যাদায়ুষ্কামানাং ন মন্ত্রৌষধি মণি মঙ্গল বল্যুপহার হোম নিয়ম প্রায়শ্চিত্তোপবাস স্বস্ত্যয়ন প্রণিপাত গমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রয়োজ্যেরণ ইত্যাদি।” “যদি আয়ুর এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিত যে, তাহার পূর্ব্বে কখনই মৃত্যু ঘটনা হইতে পারে না, তাহা হইলে লোকে আয়ুঃপ্রার্থী হইয়া মন্ত্র, ঔষধি,মণিধারণ, মঙ্গল কর্ম্ম, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণাম ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত না।” পুনশ্চ “তাহা হইলে উদ্‌ভ্রান্ত, প্রচণ্ড ও চপল গো, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব ও মহিষ প্রভৃতিকে এবং ভয়ঙ্কর বাত্যাকে পরিহার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। প্রপাত, প্রবাহ সমস্তকে পরিহার করিতে হইত না। প্রমত্ত, উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত, প্রচণ্ড, চপল, মোহাক্রান্ত ও লোভাকুল ব্যক্তিদিগকে, শত্রুগণকে, প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে ও বিষধর সর্প সরীসৃপাদিকে ভয় করিতে হইত না।” “যাহারা অকালমৃত্যু-ভয় নিবারণ করিতে অনভ্যস্ত, তাহাদের মনে কখনও অকাল মৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইত না, মহর্ষিগণের রসায়নাধিকার বৃথা হইত, ইন্দ্রকে শত্রু-নিপাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া বজ্রপ্রয়োগ করিতে হইত না; তাহা হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ব্যাধিত দেবতা ও ঋষিগণকে ঔষধ প্রদান করিতেন না, ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা যথেষ্ট পরমায়ু লাভ করিতে পারিতেন না এবং তাঁহা-দের সম্যক্ দর্শন, উপদেশ প্রদান ও উপদেশ আচরণ করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। জীবন হিতোপচারমূলক; তাহার বিপর্য্যয় হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।” অতঃপর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভগবন্! যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যু কিরূপ, তাহার উপদেশ প্রদান করুন।” মহর্ষি কহিলেন ঃ—

“শ্রুয়তা মগ্নিবেশ, যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈর্বাক্ষ গুণৈরুপেতঃ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছেৎ, তথায়ুঃ শরীরোপগতং প্রকৃত্যা যথাবদুপর্য্যমানাং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছতি। স মৃত্যুঃ কালে” ইত্যাদি—

“হে অগ্নিবেশ! শ্রবণ কর। যেমন সমাযুক্ত অক্ষ ও অপর সমুদয় আবশ্যকীয় গুণসম্পন্ন ও নিয়মিতরূপে বাহ্যমান হইয়া ক্রমশঃ যথাপ্রমাণ

ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহোপগত আয়ু যথাপ্রমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; এইরূপ মৃত্যুকে কালমৃত্যু বলা যায়।” “আবার ঐ অক্ষই অধিক ভার সহন, বিষম পথ গমন, অপথ গমন, অক্ষচক্রভঙ্গ, বাহ্যবাহক দোষ, বিপর্য্যাস ইত্যাদি কারণে অসময়ে ভগ্ন হয়; সেইরূপ আয়ুও অযথা বলসহকারে ক্রিয়াকরণ, বিপরীত ভোজন, অসৎসঙ্গ, মলমূত্রের বেগধারণ, কাম ক্রোধাদির সম্বরণ, অনাহার ইত্যাদি কারণে কালমৃত্যুর সীমার পূর্ব্বেই অবসান-প্রাপ্ত হয়; এই মৃত্যুর নাম অকালমৃত্যু।”

অকাল-মৃত্যু-নিবারণ চেষ্টা সম্বন্ধে এরূপ সদ্‌যুক্তিপূর্ণ সুস্পষ্ট ঋষিবাক্য লিপিবদ্ধ থাকিতেও আমাদের দেশে রোগ ও মৃত্যু সম্বন্ধে এত ঔদাসীন্য কেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আত্রেয় বলিয়াছেন, আত্মকৃত কর্ম্মের উপর আয়ুর বলাবল অবস্থিত। এই প্রবন্ধে একটীমাত্র কর্ম্মের ফলাফল আলোচনা করা যাউক। ব্যবসা বা বিষয়কর্ম্মের প্রভেদানুসারে আয়ুর কিরূপ তারতম্য হইয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

ডাক্তার ওগ্‌ল্ বলেন, “যে সমুদয় কারণে আয়ুক্ষয় হয়, তন্মধ্যে ব্যবসা সর্ব্বপ্রধান।” “জলবায়ু, পানীয় জল, পরিচ্ছন্নতা, জনতা ইত্যাদির তার-তম্যানুসারে মৃত্যুসংখ্যার তারতম্য হইয়া থাকে বটে; কিন্তু ব্যবসা ভেদে আয়ুর বিভিন্নতা জাজ্বল্যমানরূপে দৃষ্ট হয়। কোন কোন ব্যবসাবশতঃ এত আয়ুক্ষয় হয় যে, ঐ ব্যবসায়িদিগের জীবন, জীবন-বীমা কোম্পানীগণ কিছু-তেই বীমা করিতে সম্মত হন না। আবার কোন কোন ব্যবসায়িদের আয়ু এত দীর্ঘ হয় যে, অধিক সংখ্যক ঐরূপ ব্যবসায়ীর জীবন-বীমা করিয়া তাঁহারা সাধারণের নিকট নিজেদের স্থায়িত্ব ঘোষণা করেন।” লণ্ডন স্বাস্থ্য-সমিতিতে ডাক্তার ওগ্‌ল্ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িদের আয়ুর একটী তালিকা পাঠ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, ধর্ম্মযাজক সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু এবং হোটেল-পরি-চারক সর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়ু।

ওগ্‌লের তালিকা ঃ—

ধর্ম্মযাজকদের	মৃত্যু	১	গুণ	ব্যবহারজীবিদের	মৃত্যু	১·৫	গুণ
মালীদের	”	১·০৮	”	দোকানিদের	”	১·৫	”
কৃষকদের	”	১·২	”	সূত্রধরদের	”	১·৪	”
মুদিদের	”	১·৩	”	মুচিদের	”	১·৬	”
মৎস্যজীবিদের	”	১·৪	”	কেরাণিদের	”	১·৭	”

কর্ম্মকারদের	মৃত্যু	১·৭ গুণ	শুঁড়িদের	মৃত্যু	২·৪ গুণ
দরজিদের	,,	১·৮ ,,	গাড়োয়ানদের	,,	২·৬ ,,
প্রিণ্টারদের	,,	১·৯ ,,	কুম্ভকারদের	,,	৩·১ ,,
চিকিৎসকদের	,,	২ ,,	হোটেল পরিচারকদের	,,	৩·৯ ,,
প্লাম্বারদের	,,	২·১ ,,			

কোন্ কোন্ ব্যবসায়ে অধিক মৃত্যু হইয়া থাকে ? (১) যাহাদিগকে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহাদের হৃদয় ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ মৃত্যু হয়। রেশম তন্তুবায়দিগকে কাষ্ঠের উপর বক্ষ ভর দিয়া কার্য্য করিতে হয় ; মুচিদিগকে সর্ব্বদা মস্তক নত করিয়া কার্য্য করিতে হয় ; এই জন্য ইহাদের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। (২) বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শ আয়ুক্ষয়ের দ্বিতীয় কারণ। যাহারা দেসলাই প্রস্তুত করে, তাহাদের নিম্ন ওষ্ঠাস্থি পচিয়া যায় ; দর্পণ নির্ম্মাতাদের পারা সংস্পর্শবশতঃ ক্ষত ও কম্প হয় ; পশমব্যবসায়িদের আন্ত্রাক্ষ রোগ বা সাংঘাতিক প্লীহাজ্বর হয় ; তামা, কাঁসা ও দস্তা-ব্যবসায়িদের "কাংস-জ্বর" হয় ; এবং সীসা ব্যবসায়িদের শূল ও বাতব্যাধি হয়। সীসা স্পর্শ বশতঃ প্লম্বার ও প্রিণ্টারদের আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। (৩) অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম আয়ুক্ষয়ের তৃতীয় কারণ। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বশতঃ স্নায়ুরোগ, মস্তিষ্করোগ, উন্মাদরোগ, এবং আত্মহত্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ডাক্তার ওগ্‌ল্ বলেন, অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিতদের মধ্যে আত্মহত্যা অধিক। এই কলিকাতা নগরে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক যুবতীর মৃত্যুসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা ইতিপূর্ব্বে পিতা মাতা বা শ্বশুর শ্বাশুড়ীর উপর সমুদয় চিন্তার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, এখন তাহারা স্বয়ং চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিতেছে। কলিকাতা স্বাস্থ্য বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত করিলাম ঃ—

কলিকাতার আত্মহত্যার বাৎসরিক বিবরণ ঃ—

১৮৯১ সালে মোট ৪৪ ; পুরুষ ২৯, স্ত্রীলোক ১৫

১৮৯২ ,, ,, ৬৯ ; ,, ৪৩, ,, ২৬

১৮৯৩ ,, ,, ৭৩ ; ,, ৩৭, ,, ৩৬

৩ বৎসরের মোট ১৮৬ ; পুরুষ ১০৯ ; স্ত্রীলোক ৭৭। ইহাদের শতকরা ৮০ জনের বয়স ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর। জাতিভেদে আত্মহত্যার সংখ্যা ও প্রণালীর ভেদ হইয়া থাকে। ১৮৬টি আত্মহত্যার মধ্যে ইউরোপীয়দের ৩টী,

দেশীয় ফিরিঙ্গীদের ৪টী, মুসলমানদের ৫টী, অন্যজাতীয় ২টী এবং হিন্দুদের ১৭২টী। সাহেবেরা বন্দুকের গুড়ুম শব্দের সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত করেন ; হিন্দু পুরুষেরা বিষপানে নীরবে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন ; হিন্দু রমণী ও মুসলমান পুরুষেরা দড়ীর প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, হিন্দু যুবকগণ দিন দিন জীবনভার অসহনীয় বোধ করিতেছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া অহিফেন সেবনে জীবন-লীলার অবসান করিতেছে। ডাক্তার ব্রাউন বলেন, "ছাত্রদের পরীক্ষার সঙ্গে এত ভয় ভাবনা মিশ্রিত থাকে বলিয়া তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলী ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আত্মহত্যা সাধিত হয় ও নানা প্রকার মানসিক রোগ জন্মায়।" * (৪) বদ্ধস্থানের দূষিত বায়ু সেবন মৃত্যুর চতুর্থ কারণ। এইজন্য কৃষক, মালী ও ধীবরদের অপেক্ষা দোকানী, দরজী, দপ্তরী প্রভৃতি বদ্ধস্থানবাসিদের মৃত্যু অধিক হয়। (৫) মদ্যপান মৃত্যুর পঞ্চম কারণ। হোটেল পরিচারকগণ মদ্যপান করে ; এই জন্য ইহাদের মৃত্যু ধর্ম্মযাজকদের অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক। অপর ব্যক্তিদের অপেক্ষা মদ্যপায়িদের মৃত্যু যকৃতরোগে ৬ গুণ অধিক ও অন্যপ্রকার রোগে দ্বিগুণ অধিক। (৬) দৈব ঘটনা বশতঃ অনেকের প্রাণহানি হয়। গাড়োওয়ানদের, খনির কুলিদের ও সমুদ্রের ধীবরদের বিপদ অনেক ; এইজন্য ইহাদের মৃত্যুসংখ্যা অধিক। (৭) নানা-প্রকার চূর্ণ নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ মৃত্যুর সপ্তম কারণ। যাহারা মৃৎপাত্র প্রস্তুত করে, বা কয়লা প্রভৃতির খনিতে কর্ম্ম করে, তাহাদের নানাপ্রকার ফুস্‌ফুস্ রোগে মৃত্যু হয়।

ধর্ম্মযাজকদের মৃত্যু সংখ্যা এত অল্প কেন ? ইহার কারণ তাঁহাদের নিয়মিত প্রশান্ত জীবন এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর। মহর্ষি আত্রেয় যথার্থই বলিয়াছিলেন—

"যদি হি নিয়তকাল প্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বংস্যাৎ,
নর্ষয়ো যথেষ্টমায়ু স্তপসা প্রাপ্নুয়ুঃ।"

"যদি আয়ু সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ করিতেন না"। যম, নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা দেহমন সুস্থ রাখিলে

* "It is this emotional element in all preparation for competitive examinations that causes such wear and tear in the nervous system, and conduces principally to many of the disasters for which they are responsible,—to suicide or mental derangement &c., &c.,"
J. C. Browne, M. D., L. L. D, F. R. S

যে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তপশ্চরণ দ্বারা শমনদমন পৌরাণিক কাব্য নহে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য মাত্র। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হইবার উপায় বলিতেছেন ঃ—

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্বস্থো রক্ষার্থ মায়ুষঃ।
তত্র সর্ব্বাঘ শান্ত্যর্থং স্মরেদ্ধি মধুসূদনম্॥"
"কামশোকভয়ক্রোধমনোবেগান্ বিধারয়েৎ।"
"ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যান্ন বেগানীরয়েদ্ বলাৎ।"

"সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ঈশ্বর-চিন্তা পূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। "কাম ক্রোধ ভয় শোক প্রভৃতি মনোবেগ ধারণ করিবে।" "কিন্তু অন্য কার্য্যানুরোধে মলাদির বেগ সম্বরণ করিবে না, অথবা বলপূর্ব্বক বেগ দ্বারা মলাদি নিঃসারণের চেষ্টা করিবে না।" সন্ধ্যাকালের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে ঃ—

"চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং চরাচরপতিং বিভুম্।
ভক্তিমান্ প্রযতো নিত্যং ধ্যানযোগপরায়ণঃ॥"

সন্ধ্যাকালে "শুচি ও ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া ভক্তি-নম্র চিত্তে চরাচরপতি পরমাত্মার চিন্তা করিবে।" নিয়মিত আহার বিহার ও বিশ্বাধারের শান্ত মূর্ত্তির আরাধনাই শমন-দমনের একমাত্র বিধি।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

লাভেরিয়ে।

মনীষার দ্বারা সংসারের কত অদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কি মহতী শক্তি! মনীষী তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বকপোলকল্পিত 'নিক্তিতে' আকাশের প্রতি গ্রহ উপগ্রহ ওজন করিতেছেন, এবং স্বীয় ধীশক্তিবলে অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যোমচর গ্রহের বস্তুমান, কক্ষপথ, স্থান প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া দিতেছেন। তিনি গৃহমধ্যে বসিয়া বলিলেন, "আকাশের অমুক স্থানে ঠিক এইরূপ একটী গ্রহ দেখিতে পাইবে, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই;" তুমি দূরবীক্ষণ লইয়া ঠিক সেই দিকে

নির্দ্দেশ করিলে, দেখিতে পাইলে—একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব গ্রহ! ধন্য মনীষীর ক্ষমতা!

লাভেরিয়ে এমনই একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাশিস্ মনীষী। তাঁহার প্রতিভায় তিনি সমস্ত জগৎকে চমকিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ জ্যোতিষবিজ্ঞানের একটী অতুল সম্পত্তি। নিউটনের মহাকর্ষণ নিয়ম জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল ভিত্তি, এবং লাভেরিয়ের মনীষা যাহা সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা তাহারই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। আমরা তাঁহার সাংসারিক জীবনের ইতিহাস দিতে বসি নাই; জ্যোতিষের জন্য তিনি যাহা করিয়া-ছেন, তাহারই কয়েকটী কথা পাঠককে শুনাইতে ইচ্ছা করি। তাঁহার গ্রন্থনিচয় সম্পূর্ণরূপে গণিতের উচ্চাঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আমরা গণিতের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তাঁহার ক্রিয়াকলাপ মোটামুটি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সৌরমণ্ডলের আলোচনার প্রবেশদ্বারেই আমরা দেখিতে পাই, একটী প্রকাণ্ড দীপ্তিমান্ জ্যোতিষ্ক কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া অপর কতকগুলির স্থিতিগতি নির্দ্ধারণ করিতেছে। সূর্য্যের বস্তুমান (mass) সমুদয় গ্রহ-গুলির বস্তুমানের সমষ্টি অপেক্ষা এত অধিক যে সূর্য্য নিজে অবিচলিত রহিয়া গ্রহগণের গতিবিধি শাসন করিতেছে (সূর্য্য যদিও বস্তুতঃ স্থির নহে)। সূর্য্য একটী গ্রহকে যে বলে আকর্ষণ করিতেছে, গ্রহটীও ঠিক সেই বলেই সূর্য্যকে নিজের দিকে টানিতেছে, কিন্তু গ্রহের তুলনায় সূর্য্য এমনই বৃহৎ যে, যে শক্তির প্রভাবে গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে, ঠিক সেই শক্তিপ্রভাবেও সূর্য্য প্রায় অবিচলিত রহিয়া যায়।* সার্ জন্ হার্শেল এক-স্থলে কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন, "সূর্য্য যদি গ্রহগণকে আকর্ষণ করেন, তাহারাও তাঁহাকে ধরিয়া টানে এবং পরস্পরের মধ্যে টানাটানি করে, কিন্তু এরূপ পারিবারিক কলহে তাঁহাকে বড় বিচলিত করিতে পারে না। ইহাতে গ্রহেরা বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যদেব

* নিজের সমুদয় শক্তি দিয়াও প্রকাণ্ড একখানা পাথর নাড়া কত শক্ত, কিন্তু অতি অল্প শক্তি দিলেই ছোট একটা ঢিল বহুদূর পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করা যায়। শক্তির একটি কার্য্য গতি উৎপন্ন করা, এবং এই গতির পরিমাণ যে প্রযুক্ত শক্তি এবং যাহার উপর শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহার বস্তুমান, উভয়ের উপর নির্ভর করে, ইহা বোধ হয় আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

বড় একটা বিচলিত হন না।” প্রাচীনকালে গ্রীকদিগের মধ্যে একটা গল্প ছিল—দেবতারা একবার সকলে মিলিয়া জোভের সিংহাসনে স্বর্ণরজ্জু বাঁধিয়া টানিয়াছিলেন, কিন্তু জোভের সিংহাসন তিলমাত্রও বিচলিত হয় নাই ; তেমনই যদি সমুদয় গ্রহগুলি সরল রেখায় অবস্থান করিয়া যুক্তবলে সূর্য্যকে আকর্ষণ করে, সূর্য্যদেব একটুমাত্র হেলিয়া দাঁড়াইলে গ্রহগণের সাধ্য নাই যে তাঁহাকে তাঁহার ব্যাসার্দ্ধপরিমিত স্থানও বিচলিত করিতে পারে।

একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, সূর্য্যের বস্তুমান কত অধিক। আমরা যদি পৃথিবীর বস্তুমানকে সহস্র বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে প্রধান আটটি গ্রহের বস্তুমান-সমষ্টি অঙ্কে রাখিলে হইবে প্রায় ৪২২০০০, এবং সূর্য্যের বস্তুমান হইবে ৩১৫০০০০০০। সুতরাং সূর্য্যের বস্তুমান গ্রহগণের বস্তুমান সমষ্টির প্রায় ৭৫০ গুণ।

উপরিলিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আটটি গ্রহের গতিবিধি প্রধানতঃ সূর্য্যের আকর্ষণ বলের দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে। গ্রহগণের মধ্যে বৃহত্তম বৃহস্পতি, শনৈশ্চরও একটি বৃহৎ গ্রহ। কিন্তু সূর্য্য সচন্দ্র শনৈশ্চরকে যে কক্ষপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে বিপথে লইয়া যাইতে প্রবল বৃহস্পতি গ্রহেরও ক্ষমতা কতটুকু ? বৃহস্পতি অপেক্ষা সূর্য্যের বস্তুমান প্রায় সহস্র গুণ অধিক ; এবং বৃহস্পতি যখন শনির অতি নিকটে তখন শনি হইতে তাহার দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্বের প্রায় অর্দ্ধেক ; সুতরাং ইহাতে বৃহস্পতির আকর্ষণ সূর্য্যের সহিত সমান দূরে থাকিলে যাহা হইত তাহার চতুর্গুণ হয় ; কিন্তু তথাচ শনৈশ্চরের উপর সূর্য্যের আকর্ষণ বৃহস্পতির আকর্ষণের প্রায় ২৫০ গুণ বেশী রহিয়া যায়। আরও মনে রাখিতে হইবে, বৃহস্পতির পক্ষে এরূপ সুবিধা সকল সময়েই ঘটিয়া উঠে না ; অর্দ্ধেক সময় বৃহস্পতি শনি হইতে সূর্য্যাপেক্ষা অধিক দূরে গিয়া পড়ে, এবং তখন তাহার আকর্ষণবল সূর্য্যের বলের সহস্রাংশেরও কম হয়। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে তন্নিকটস্থ গ্রহকে বিপথগামী করিতে বৃহস্পতির ক্ষমতা যখন এতদূর ক্ষীণ, তখন অপরাপর গ্রহগণের ক্ষমতা সমধিকতর ক্ষীণ হইবে। শুক্র এবং মঙ্গল গ্রহের উপর পৃথিবীর ক্ষমতা অতি ক্ষীণ ; শুক্রের তাহার প্রতিবেশীদিগের (বুধ এবং পৃথিবীর) উপর ক্ষমতা ক্ষীণতর মঙ্গলের ক্ষমতা আরও ক্ষীণ ; এবং বুধের

ক্ষীণতম।* পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন, যখন দূরস্থ গ্রহগণের তুলনায় রবির নিকটস্থ গ্রহগণের পরস্পর হইতে দূরত্ব অনেক কম, তখন রবির নিকটে আসিলে গ্রহগণের পরস্পরের উপর ক্ষমতা অবশ্য বৃদ্ধি পাইবে ; এজন্য তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইলেও ক্ষমতার ফল (ভ্রষ্টতা †) ততটা বৃদ্ধি পাইবে না ; কারণ নিকটস্থ গ্রহগণের পরিভ্রমণ-বেগ দূরস্থ গ্রহের তুলনায় অনেক অধিক। যাহা হউক আমরা দেখিলাম, বৃহস্পতি এবং তাহার প্রতিবেশী গ্রহ শনৈশ্চর উভয়ের আকর্ষণে যে বিচলন উৎপন্ন হয়, সৌর মণ্ডলের অপর কোনও স্থলে গ্রহের ততোঽধিক বিচলন লক্ষিত হয় না ; এবং আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, পরস্পরের এই আকর্ষণ উভয়ের কোনটির উপর সূর্য্যের আকর্ষণের সহিত তুলনায় কত সামান্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রহগণের গতির প্রধান নিয়ন্তা সূর্য্য। যদি “প্রধান” না হইয়া সূর্য্যই একমাত্র নিয়ন্তা হইত, অর্থাৎ যদি গ্রহগণের পরস্পরের মধ্যে কোনও আকর্ষণ না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের গতির সহিত তাহাদের বস্তুমানের কোনও সম্বন্ধ রহিত না। কোনও একটি গ্রহকে দ্বিখণ্ডিত অথবা দ্বিগুণিত করিলেও তাহাদের গতির কোনও হ্রাস বৃদ্ধি হইত না, তাহাদের পরিভ্রমণ ব্যাপার সমভাবেই চলিত। অধিক কি, বৃহৎ আটটি গ্রহের পরিবর্তে যদি আটটি ক্ষুদ্র লোষ্ট্র রাখা যাইত, তাহা হইলেও তাহাদের গতি ঠিক সমানই রহিত। একবার গতিগণনা করিলে আর তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইত না, গতির কোনও ভ্রষ্টতাই লক্ষিত হইত না, সুতরাং গ্রহগণ চিরকালের জন্য অপরিবর্ত্তিত ভাবে স্ব স্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিত। ‡

কিন্তু একবার যদি স্বীকার করা যায় যে গ্রহগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা হইলে এদৃশ্য অন্তর্হিত হইবে। যে গ্রহের বস্তুমান যত

* পাঠকের সুবিধার জন্য গ্রহগণের ইংরাজি নামও দেওয়া যাইতেছে। বুধ—Mercury, শুক্র—Venus ; পৃথিবী—Earth ; মঙ্গল—Mars ; ক্ষুদ্র গ্রহবলয়—Zone of Asteroids ; বৃহস্পতি—Jupiter ; শনি, শনৈশ্চর—Saturn ; ইন্দ্র—Uranus ; বরুণ—Neptune।

† ভ্রষ্টতা, বিচলন—Planetary Pertubation, disturbance. গতবর্ষের ভারতীর “মৃন্ময়ী” শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ পাঠক অবশ্য নিউটনের আকর্ষণ নিয়মের মূলতত্ত্ব অবগত আছেন।

করিয়াছেন। তাঁহার এই গবেষণার ফলে যাহা দাঁড়াইল, তাহা এখন হয় ত সকলের নিকট অপরিজ্ঞাত না হইতে পারে। আমরা তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীর গতিতে এক শ্রেণীর ভ্রষ্টতা আছে, যাহা চন্দ্রের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। আমরা সকলেই জানি, পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে, কিন্তু এই কক্ষপথে বাস্তবিক পৃথিবী ভ্রমণ করে না, পৃথিবী এবং চন্দ্র উভয়ের বস্তুমানদ্বয়ের ভারকেন্দ্রই এই পথে বৎসরে একবার করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে; পৃথিবী এবং চন্দ্র উভয়েই এক চান্দ্র মাসে এই ভারকেন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে। পৃথিবীর এই শেষোক্ত মাসদীর্ঘ ভ্রমণপথের ব্যাস প্রায় ৬ সহস্র মাইল, এবং ইহার এবম্বিধ গতি হেতু চন্দ্রের চতুর্থকলার সময় ধরা পূর্ব্বোল্লিখিত ভারকেন্দ্রের প্রায় ৩০০০ মাইল পুরোবর্ত্তী হয়, এবং চন্দ্রের দ্বাদশকলার সময় উহার প্রায় ৩০০০ মাইল পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়; ধরা এবং চন্দ্র এইরূপে পরস্পরকে ঘিরিয়া নর্ত্তন করিতে করিতে উভয়ে মিলিয়া সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে এবং এইরূপে তাঁহার পূজা সাঙ্গ হয়। পৃথিবীর প্রকৃত গতির এই বিশিষ্টত্বটুকু অবশ্য সূর্য্যের দৃশ্যমান গতিতে প্রতিফলিত হয়, এবং চন্দ্রের চতুর্থকলার সময় তিনি তাঁহার মধ্য স্থানের কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী এবং দ্বাদশকলার সময় সেই স্থলের কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হন; অর্থাৎ সূর্য্যের গতি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে ৬ সহস্র মাইল ব্যাসযুক্ত একটা মাসিক কক্ষপথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার দীর্ঘ (১৮০০ লক্ষ মাইল ব্যাসযুক্ত) বার্ষিক ভ্রমণপথে বিচরণ করেন। এক্ষণে, আমরা যদি বলিতে পারি সূর্য্যের এই মাসিক কক্ষপথ পৃথিবী হইতে কত বড় দেখায়, তাহা হইলে সূর্য্যের দূরত্ব গণনা করা যাইতে পারে; কারণ এই মাসিক কক্ষপথের প্রকৃত আয়তন পৃথিবী এবং চন্দ্রের উপরেই নির্ভর করে, সুতরাং সূর্য্যের দূরত্ব না লইয়াও তাহা অনুমিত হইতে পারে। আমরা জানি এই কক্ষপথ বস্তুতঃ কত বড়, এবং সূর্য্যের স্থানপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি, এত বড় কক্ষপথটা (অর্থাৎ ৬ সহস্র মাইল ব্যাসযুক্ত স্থানটি) সূর্য্যের সহিত সমান দূরে থাকিলে কত বড় দেখায়; সুতরাং সহজেই ইহা হইতে সূর্য্যের দূরত্ব স্থির করা যায়। এইরূপে লাভেরিয়ে অতি সযত্নে সূর্য্যের মাসিক স্থান পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার দূরত্ব নির্দ্ধারণ করেন, এবং বহুপূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্গণকে বিজ্ঞাপিত করেন যে

তাঁহাদের "ধৃত" সূর্য্যের দূরত্ব প্রকৃত দূরত্ব অপেক্ষা প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ মাইল বেশী হইয়াছে।

লাভেরিয়ের আলোচনার সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ফল—নেপ্চ্যুনের আবিষ্কার। তিনি দেখাইয়াছেন যে সাতটি বৃহৎ গ্রহ ধরিলে সৌর মণ্ডল অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, এবং ইন্দ্রগ্রহের কক্ষ পথের বহির্দ্দেশে একটি অদৃষ্ট এবং অজ্ঞাত গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে, যাহার আকর্ষণ বলে ইন্দ্রগ্রহের গতির ভ্রষ্টতা উৎপন্ন হয়। সার উইলিয়াম্ হার্শেল কৃত ইন্দ্রগ্রহাবিষ্কারের ন্যায় লাভেরিয়ের নেপ্চ্যুন-আবিষ্কার কালে অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতা এবং গভীর গণিতজ্ঞতা উভয়েই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল। ইন্দ্রগ্রহ সম্বন্ধে যতগুলি পর্য্যবেক্ষণ তিনি পাইলেন, সযত্নে সকলগুলির আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিয়া তিনি স্থির নিশ্চয় করিলেন যে ঐ গ্রহটি বস্তুতই কোনও অজ্ঞাত গ্রহের দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে এবং গণিতবলে উহার "সাধনায়" প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাঁহার ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা কোথায়?

পাঠক আর একবার আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সমুদ্র তরঙ্গের উপমাটি স্মরণ করুন। মনে করুন, কোনও দর্শক খালের মধ্য দিয়া যে তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে, তাহার পর্য্যালোচনায় রত হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি তরঙ্গ (যাহারা পূর্ব্বে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একই আকার ধারণ করিয়াছিল) এখন ঈষৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। মনে করুন আমাদের কল্পিত দর্শকটি ইহা লক্ষ্য করিয়া সনির্ব্বন্ধে তরঙ্গগুলির আকৃতির পরিমাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিলেন, বাস্তবিকই তাহাদের আকৃতির বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশে তিনি হয় ত একান্ত অক্ষম হইলেন, অথবা যদি একটা কারণ মনে মনে স্থির করিলেন (যথা, সেই খালের মধ্যেই তাঁহার চক্ষুর অগোচর কোনও অংশে ইহারা কোনওরূপে প্রতিহত হইয়াছে), কিন্তু খালের সেই অংশটি কতদূরে তাহার কোনও অনুমান করিতে তিনি আপনাকে নিতান্ত অশক্ত মনে করিলেন। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে তাঁহার তরঙ্গ পরিমাণের সময় দেখিতে পাইলেন, উহারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া একটা উচ্চসীমায় পৌছিয়াছে এবং পরে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে ও অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় পূর্ব্বাকৃতি লাভ করিবে, তাহা হইলে এই পর্য্যবেক্ষণ হইতেই তিনি হয় ত ঘটনাস্থল নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতে পারেন। দৃষ্টান্ত-

করিয়াছেন। তাঁহার এই গবেষণার ফলে যাহা দাঁড়াইল, তাহা এখন হয় ত সকলের নিকট অপরিজ্ঞাত না হইতে পারে। আমরা তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীর গতিতে এক শ্রেণীর ভ্রষ্টতা আছে, যাহা চন্দ্রের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। আমরা সকলেই জানি, পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে, কিন্তু এই কক্ষপথে বাস্তবিক পৃথিবী ভ্রমণ করে না, পৃথিবী এবং চন্দ্র উভয়ের বস্তুমানদ্বয়ের ভারকেন্দ্রই এই পথে বৎসরে একবার করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে; পৃথিবী এবং চন্দ্র উভয়েই এক চান্দ্র মাসে এই ভারকেন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে। পৃথিবীর এই শেষোক্ত মাসদীর্ঘ ভ্রমণপথের ব্যাস প্রায় ৬ সহস্র মাইল, এবং ইহার এবম্বিধ গতি হেতু চন্দ্রের চতুর্থকলার সময় ধরা পূর্ব্বোল্লিখিত ভারকেন্দ্রের প্রায় ৩০০০ মাইল পুরোবর্ত্তী হয়, এবং চন্দ্রের দ্বাদশকলার সময় উহার প্রায় ৩০০০ মাইল পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়; ধরা এবং চন্দ্র এইরূপে পরস্পরকে ঘিরিয়া নর্ত্তন করিতে করিতে উভয়ে মিলিয়া সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে এবং এইরূপে তাঁহার পূজা সাঙ্গ হয়। পৃথিবীর প্রকৃত গতির এই বিশিষ্টত্বটুকু অবশ্য সূর্য্যের দৃশ্যমান গতিতে প্রতিফলিত হয়, এবং চন্দ্রের চতুর্থকলার সময় তিনি তাঁহার মধ্য স্থানের কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী এবং দ্বাদশকলার সময় সেই স্থলের কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হন; অর্থাৎ সূর্য্যের গতি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে ৬ সহস্র মাইল ব্যাসযুক্ত একটা মাসিক কক্ষপথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার দীর্ঘ (১৮০০ লক্ষ মাইল ব্যাসযুক্ত) বার্ষিক ভ্রমণপথে বিচরণ করেন। এক্ষণে, আমরা যদি বলিতে পারি সূর্য্যের এই মাসিক কক্ষপথ পৃথিবী হইতে কত বড় দেখায়, তাহা হইলে সূর্য্যের দূরত্ব গণনা করা যাইতে পারে; কারণ এই মাসিক কক্ষপথের প্রকৃত আয়তন পৃথিবী এবং চন্দ্রের উপরেই নির্ভর করে, সুতরাং সূর্য্যের দূরত্ব না লইয়াও তাহা অনুমিত হইতে পারে। আমরা জানি এই কক্ষপথ বস্তুতঃ কত বড়, এবং সূর্য্যের স্থানপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি, এত বড় কক্ষপথটা (অর্থাৎ ৬ সহস্র মাইল ব্যাসযুক্ত স্থানটি) সূর্য্যের সহিত সমান দূরে থাকিলে কত বড় দেখায়; সুতরাং সহজেই ইহা হইতে সূর্য্যের দূরত্ব স্থির করা যায়। এইরূপে লাভেরিয়ে অতি সযত্নে সূর্য্যের মাসিক স্থান পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার দূরত্ব নির্দ্ধারণ করেন, এবং বহুপূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্গণকে বিজ্ঞাপিত করেন যে

তাঁহাদের "ধৃত" সূর্য্যের দূরত্ব প্রকৃত দূরত্ব অপেক্ষা প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ মাইল বেশী হইয়াছে।

লাভেরিয়ের আলোচনার সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ফল—নেপ্চ্যুনের আবিষ্কার। তিনি দেখাইয়াছেন যে সাতটি বৃহৎ গ্রহ ধরিলে সৌর মণ্ডল অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, এবং ইন্দ্রগ্রহের কক্ষ পথের বহির্দ্দেশে একটি অদৃষ্ট এবং অজ্ঞাত গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে, যাহার আকর্ষণ বলে ইন্দ্রগ্রহের গতির ভ্রষ্টতা উৎপন্ন হয়। সার উইলিয়াম্ হার্শেল কৃত ইন্দ্রগ্রহাবিষ্কারের ন্যায় লাভেরিয়ের নেপ্চ্যুন-আবিষ্কার কালে অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতা এবং গভীর গণিতজ্ঞতা উভয়েই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল। ইন্দ্রগ্রহ সম্বন্ধে যতগুলি পর্য্যবেক্ষণ তিনি পাইলেন, সযত্নে সকলগুলির আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিয়া তিনি স্থির নিশ্চয় করিলেন যে ঐ গ্রহটি বস্তুতই কোনও অজ্ঞাত গ্রহের দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে এবং গণিতবলে উহার "সাধনায়" প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাঁহার ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা কোথায়?

পাঠক আর একবার আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সমুদ্র তরঙ্গের উপমাটি স্মরণ করুন। মনে করুন, কোনও দর্শক খালের মধ্য দিয়া যে তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে, তাহার পর্য্যালোচনায় রত হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি তরঙ্গ (যাহারা পূর্ব্বে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একই আকার ধারণ করিয়াছিল) এখন ঈষৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। মনে করুন আমাদের কল্পিত দর্শকটি ইহা লক্ষ্য করিয়া সনির্ব্বন্ধে তরঙ্গগুলির আকৃতির পরিমাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিলেন, বাস্তবিকই তাহাদের আকৃতির বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশে তিনি হয় ত একান্ত অক্ষম হইলেন, অথবা যদি একটা কারণ মনে মনে স্থির করিলেন (যথা, সেই খালের মধ্যেই তাঁহার চক্ষুর অগোচর কোনও অংশে ইহারা কোনওরূপে প্রতিহত হইয়াছে), কিন্তু খালের সেই অংশটি কতদূরে তাহার কোনও অনুমান করিতে তিনি আপনাকে নিতান্ত অশক্ত মনে করিলেন। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে তাঁহার তরঙ্গ পরিমাণের সময় দেখিতে পাইলেন, উহারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া একটা উচ্চসীমায় পৌছিয়াছে এবং পরে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে ও অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় পূর্ব্বাকৃতি লাভ করিবে, তাহা হইলে এই পর্য্যবেক্ষণ হইতেই তিনি হয় ত ঘটনাস্থল নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতে পারেন। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে তরঙ্গপ্রবাহের বেগ এবং তরঙ্গদিগের মধ্যে এই বিশিষ্টত্ব লক্ষ্য করিবার পরে কতটা সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি বিষয়গুলি জানিয়া ঘটনাস্থল নিরূপণ করিলেও করা যাইতে পারে। নেপ্‌চ্যুনের পক্ষে ঠিক এমনই একটা কিছু ঘটিয়াছিল, এবং এই জন্যই তাহার স্থান গণনা সম্ভবপর হইয়াছিল। যখন লাভেরিয়ে য়ূরেনাসের গতির আলোচনা সমাপ্ত করিলেন, তখন তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উক্ত গ্রহের স্থানবিপর্যায় ঊর্দ্ধসীমায় পৌঁছিয়াছিল এবং ক্রমশঃ উহা কমিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে জ্যোতির্ব্বিদেরা বুঝিলেন যে বিচলনকারী গ্রহ য়ূরেনাসের নিকটতম হইয়াছিল এবং পরে ধীরে ধীরে দূরে অপসরণ করিতেছে। এই বিষয়টুকু জানিতে অনেক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল ; কারণ য়ূরেনাস্ এবং নেপ্‌চ্যুন উভয়েই অতি মন্দ ভাবে কক্ষপরিভ্রমণ করে, * সুতরাং তাহারা অতি ধীরে পরস্পরের নিকট ঘেঁসিয়া আসিতেছিল এবং অতি ধীরেই সে অবস্থা হইতে দূরে অপসরণ করিয়াছিল। যখন আডাম্‌স্ এবং লাভেরিয়ে অদৃষ্ট গ্রহের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই মাত্র ইহা নিশ্চিতরূপে প্রকাশ পাইল যে কিছু বর্ষ পূর্ব্বেই উক্ত গ্রহদ্বয় সূর্য্যের সহিত প্রায় সমসূত্রস্থ হইয়াছিল। এই অনুকূল ঘটনাটি না ঘটিলে—যদি তাঁহারা না আভাস পাইতেন যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই উহারা পরস্পরের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহা হইলে—তাঁহাদের গণিত বলে নেপ্‌চ্যুন আবিষ্কার চেষ্টা বৃথা হইত। এই খানেই তাঁহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যে তাঁহারা যখন নেপ্‌চ্যুন আবিষ্কারের সংকল্প করিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই নেপ্‌চ্যুন ও য়ূরেনাস্ সমসূত্রস্থ হইয়াছিল ! †

* য়ূরেনাস্ ৮৪ বৎসরে একবার সূর্য্যকে বেষ্টন করে, এবং নেপ্‌চ্যুনের সূর্য্যপ্রদক্ষিণ কাল ১৬৪ বৎসরেরও অধিক।

† ইহা একরূপ নিশ্চিত হইয়াছিল যে ১৮২০ ও ১৮২৫ খৃঃঅব্দের মধ্যে কোনও সময়ে য়ূরেনাস্ এবং নেপ্‌চ্যুন সমসূত্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ১৮৪১ ও ১৮৪৬ খৃঃঅব্দের মধ্যে অর্থাৎ ২১ বৎসরে য়ূরেনাস্ (সূর্য্য হইতে দেখিতে) ক্রান্তিবৃত্তের প্রায় চতুর্থাংশ পরিক্রমণ করিয়াছে, এবং অপরিজ্ঞাত গ্রহটি প্রায় তাহার অর্দ্ধেক ; সুতরাং নেপ্‌চ্যুনকে ক্রান্তিবৃত্তের নিকটে য়ূরেনাসের পশ্চাতে ক্রান্তিবৃত্তের প্রায় অষ্টমাংশ স্থান দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে। অবশ্য এস্থলে আমরা সূর্য্য হইতে অবলোকন করিতেছি, কিন্তু ঐ গ্রহদ্বয় এতদূরে অবস্থিত যে পৃথিবী হইতে দেখিলেও ক্রান্তিবৃত্তের প্রায় উক্তরূপ স্থানেই উহাদিগকে পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ আডাম্‌স্ এবং লাভেরিয়ে কর্ত্তৃক নেপ্‌চ্যুনের স্থান গণনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইহা একরূপ নিশ্চিত হইয়াছিল যে অজ্ঞাত গ্রহটি আকাশের একটি জ্ঞাত অংশে (প্রায় ১০।১২ ডিগ্রি দীর্ঘে এবং ৩ ডিগ্রি প্রস্থে) অবস্থান করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। লাভেরিয়ে ও আডাম্‌স্ উভয়েই স্বতন্ত্র ভাবে নেপ্‌চ্যুনের স্থান এবং গতি গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মানসজাত নেপ্‌চ্যুনদ্বয় পরস্পর হইতে অতি বিভিন্নরূপে পরিভ্রমণ করিতেছিল এবং প্রকৃত নেপ্‌চ্যুন হইতে তাহাদের উভয়েরই বিভিন্নতা আরও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সময়ে কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহাদের গণনালব্ধ স্থান প্রকৃত স্থানের অতি নিকটেই ছিল, এবং তিনটি নেপ্‌চ্যুনই প্রায় একই স্থানে অবস্থান করিতেছিল। পূর্ব্বোক্ত তরঙ্গের উপমা গ্রহণ করিলে ইহা একটু বিশদরূপে বুঝা যাইবে। আমাদের কল্পিত দর্শক যদি উপমাবর্ণিত ঘটনার প্রকৃত উৎপত্তি স্থল নির্দ্ধারণ কালে তরঙ্গ-প্রবাহের বেগের পরিমাণে কিছু ভুল করিয়া বসেন, তাহা হইলেও, যদি ঘটনাকাল অতি অল্প পরিমিত হয়, তবে তাঁহার গণনায় প্রকৃত স্থানের অতি কাছাকাছি আসিয়া পড়িবেন। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। প্রবাহ-বেগ ঘণ্টায় অর্দ্ধ মাইল করিয়া যদি বেশী ধরা হইয়া থাকে এবং ঘটনাটিতে যতটুকু সময় লাগিয়াছে, তাহা যদি ২০ মিনিট মাত্র হয়, তাহা হইলে তাঁহার গণিত দূরত্বে ভুলের পরিমাণ মাইলের ষষ্ঠাংশ মাত্র হইবে। কিন্তু যদি এই সময়টুকু ১০ বা ১২ ঘণ্টা হয়, তবে তাঁহার ভুলের পরিমাণ ৫ বা ৬ মাইল হইবে। এইরূপ লাভেরিয়ে এবং আডাম্‌স্ উভয়েই তাঁহাদের নেপ্‌চ্যুনকে প্রকৃত নেপ্‌চ্যুন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মন্দগতি ধরিয়াছিলেন, কিন্তু য়ূরেনাস্ এবং নেপ্‌চ্যুনের সমসূত্রাবস্থার পর অতি অল্প সময় মাত্র অতীত হওয়ায়, তাঁহাদের গণনালব্ধ স্থানে ভুলের পরিমাণ অতি সামান্যই হইয়াছিল। এইজন্য আকাশ-সরোবরে গ্রহান্বেষণে দূরবীক্ষণরূপ "ছিপ" প্রথম ফেলিবামাত্র স্বয়ং বরুণদেবই ধৃত হইলেন।

এক্ষণে লাভেরিয়ের গ্রহালোচনার অপর একটি ফলের বর্ণনা করা যাইতেছে। সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ বুধ, এবং এই বুধগ্রহের গতি পর্য্যালোচনা করিয়া লাভেরিয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে বুধকক্ষাভ্যন্তরে একটি বা ততোধিক গ্রহ অথবা যে কোন আকারেরই হউক পদার্থ নিচয় রহিয়াছে, এবং তাহার আকর্ষণ প্রভাবেই বুধের গতিতে বিচলন উপস্থিত হইতেছে ও সেইজন্য দৃগ্‌গণিতৈক্য হইতেছে না। এই উপলক্ষে ফরাশিস্ ডাক্তার লেকার্ব্বো প্রচার করেন যে, তিনি একটি গ্রহ বুধকক্ষাভ্যন্তরে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং লাভেরিয়েও ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। এই গ্রহের নাম-

করণ হয় বৈশ্বানর (Vulcan), কিন্তু ইহার বিরুদ্ধেও অনেক কথা উঠিয়াছে এবং অনেক বিখ্যাত জ্যোতিষী ইহার অস্তিত্বে আজকাল আস্থা-স্থাপন করেন না। * বঙ্গসাহিত্যের সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত বৎসরের "সাহিত্যে" দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—একটি "লাভেরিয়ে ও বৈশ্বানর," অপরটি "বৈশ্বানরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা"; যাঁহারা এই বিষয় বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উল্লিখিত প্রবন্ধ দুইটি অন্বেষণ করিয়া একবার পাঠ করিবেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহারই ভাষায় উক্ত প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক্ষান্ত রহিব।

"১৮৭৪ খৃঃঅব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি [লাভেরিয়ে] Comptes Rendus নামক কাগজে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইহা প্রচার করিলেন যে যত সিদ্ধান্ত ও গণনার প্রয়োগ করা যাউক না কেন, বুধকক্ষের মন্দোচ্চে প্রতি শত বর্ষে ৩১ বিকলা অধিক গতি আরোপ না করিলে, কিছুতেই বুধের গতিফল প্রত্যক্ষ ফলের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না। এবং পদার্থবিজ্ঞানবলে ইহার কারণ এইমাত্র অনুমিত হইতেছে যে সূর্য্য এবং বুধকক্ষের অন্তর্ভাগে উক্ত কক্ষের সহিত সমতল ভাবে পদার্থ নিচয় অবস্থিতি করিতেছে।... যাহা হউক ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, যে বুধের সান্নিধ্যে, সৌরবিম্ব বেষ্টন করিয়া, পদার্থ খণ্ড অথবা পদার্থ মালা বিচরণ করিতেছে; ইহা এক কিম্বা একাধিক গ্রহ, অথবা পিণ্ডীকৃত কিম্বা রেণুকাকারে অবস্থিত পদার্থমালা হইতে পারে, সমস্যা দ্বারা ইহা নির্ণীত হইতে পারিতেছে না! কিন্তু জড়জগতের কার্য্য দৃষ্টে জড়পদার্থের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ অবশ্যম্ভাবী ও স্থির সিদ্ধান্ত!"

ইহার পরে শুক্রগ্রহের কথা। শুক্রের গতি পর্য্যালোচনা করিয়া লাভেরিয়ে সূর্য্যের দূরত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যত্র বর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। সূর্য্যের দৃশ্যমান গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এখন তাহারই সমর্থন হইল—অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ মাইল বেশী ধরা হইয়াছে। ইহার অল্পকাল পরেই ১৮৭৪ খৃঃঅব্দের ডিসেম্বর মাসে শুক্রকর্ত্তৃক যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহার গণনায়

* একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী লোকার্ব্বোর গ্রহদৃষ্টি সম্বন্ধে কবির কথায় বলিয়াছেন—

It was "the blot upon his brain
That would shew itself without."

লাভেরিয়ের এই সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছিল। জ্যোতিষী হাইণ্ড্ প্রাচীন তালিকা অনুসারে গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে এই গ্রহণকালে মিসরদেশে মোকাট্টাম নামক স্থানে মোক্ষের দৃষ্ট সময় এবং গণিত সময়ে প্রায় ১৩½ মিনিটের প্রভেদ হইয়াছিল; লাভেরিয়ের নূতন তালিকা লইয়া গণনা করিলেন, তাহাতে এই প্রভেদ ৫ সেকেণ্ড মাত্র হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যাইবে লাভেরিয়ের এই দীর্ঘ আলোচনার ফল কত সন্তোষজনক।

পরিশেষে আমরা মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। প্রাচীনকালে জ্যোতির্ব্বিদেরা মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষাভ্যন্তরে গ্রহের অবস্থিতি অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই কল্পনা করেন নাই, সৌরমণ্ডলে সচন্দ্র অথবা চন্দ্রহীন বৃহৎ গ্রহ ব্যতিরেকেও ক্ষুদ্র গ্রহমালা থাকিতে পারে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিবসে (বিজ্ঞান-প্রধান বর্ত্তমান শতাব্দীর অতি শুভ সূচনা সন্দেহ নাই) বহুদিনের বিফল চেষ্টার পর উক্ত স্থানে একটী ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয় এবং তাহার কিয়ৎকাল পরেই আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্রগ্রহ সেই অংশেই লক্ষিত হয়; এখন উহাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। যদি পূর্ব্ব হইতেই খগোলকের এই অংশে গ্রহান্বেষণে দূরবীক্ষণ নির্দ্দেশ না হইত, তাহা হইলেও লাভেরিয়ে-কৃত মঙ্গল গ্রহের গতি পর্য্যালোচনায়, মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষাভ্যন্তরে একটী বৃহৎ গ্রহ অথবা অনেকগুলি ক্ষুদ্রগ্রহ বিচরণ করিতেছে, এই প্রশ্নের স্থির মীমাংসা হইত। লাভেরিয়ের আলোচনায় দেখা যায় যে ঐ স্থানে কোনও বৃহৎ গ্রহই থাকিতে পারে না, কারণ মঙ্গলের গতিতে, বৃহৎ গ্রহে যেরূপ প্রবল বিচলন উৎপন্ন করে, তাহার কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। মঙ্গলের বিচলন উৎপন্ন হইতেছে ইহা স্থির; কিন্তু একটা বৃহৎ গ্রহ থাকিলে তাহার আকর্ষণে ইহা একবার একদিকে প্রবল ভাবে বিচলিত হইত, আবার অপর দিকে সেইরূপ প্রবলভাবে বিচলিত হইত; কিন্তু মঙ্গলের দৃষ্টগতিতে এরূপ কিছুই দেখা যায় না, বরং মঙ্গলের বিচলন এইরূপ সময়ে সময়ে বিষম না হইয়া সকল সময়েই অনেকটা সমভাবাপন্ন থাকে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র গ্রহমালার কার্য্যই পরিলক্ষিত হইতেছে মাত্র, এবং মঙ্গলের এই বিচলনের পরিমাণেই ঐ গ্রহমালার বস্তুমান নির্দ্ধারণের একটা উপায় পাওয়া যাইতেছে। *

* অনেকের বিশ্বাস ছিল, এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলি একটী বৃহৎ গ্রহের ভগ্নাবশেষ মাত্র, কিন্তু এ

এইরূপে লাভেরিয়ে গ্রহগণের গতিপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সূর্য্যের তৎকালধৃত দূরত্ব পরিমাণের ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নেপ্‌চ্যুনের আবিষ্কার করিয়াছেন, বুধকক্ষাভ্যন্তরে পদার্থনিচয়ের অস্তিত্ব এবং তাহার বর্ত্তমান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষাভ্যন্তরস্থিত ক্ষুদ্র গ্রহ-বলয়ের অস্তিত্ব এবং বর্ত্তমান পরিজ্ঞানে সমর্থ হইয়াছেন। কালক্রমে তাঁহার বৈশ্বানর অস্তিত্বশূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু গণিতের সাহায্যে যাহা পাওয়া সম্ভব, তাহা তিনি পাইয়াছেন। আশ্চর্য্য গণিতের ক্ষমতা, এবং সার্থক লাভেরিয়ের গণিতশিক্ষা! †

তুকারাম।

তৃতীয় প্রস্তাব।

[যাঁহারা "দাসী"র বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের বোধসৌকর্য্যার্থে আমরা তুকারাম সম্বন্ধীয় প্রথম দুইটি প্রস্তাবের সার সংকলিত করিয়া দিতেছি। বঙ্গের রামপ্রসাদ সেনের ন্যায় তুকারাম মহারাষ্ট্র দেশের একজন সর্ব্বজনপূজিত ভক্ত-কবি। তাঁহার পদাবলী "অভঙ্গ" নামে পরিচিত। তিনি পুনার অনতিদূরবর্ত্তী দেহু নামক গ্রামে ১৬০৭।৮ খৃষ্টাব্দে "মোরে" উপাধিধারী একটি শূদ্রজাতীয় প্রাচীন মারাঠা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার পুরুষানুক্রমে ভক্তিমান্ ও বৈরাগ্যশীল ছিলেন। তুকারামের পিতার নাম বোল্লোবা, মাতার নাম কনকাঈ। ইহাঁরা উভয়েই ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা "বিঠোবা" নামক শ্রীকৃষ্ণের রূপবিশেষের অর্চ্চনা করিতেন। তুকারাম পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র; তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম সান্তজী। তুকারামের জন্মগ্রহণের সময় তাঁহার পিতামাতা সম্পত্তিশালী ছিলেন। তুকারামের দুই পত্নী; প্রথমার নাম রুক্মাবাই, দ্বিতীয়ার নাম অবলাই। দ্বিতীয়া সাধারণতঃ জিজিবাই বা জিজাই নামে পরিচিতা। ইনিই তুকারামের সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। প্রথমা পত্নীর কাশরোগ ছিল বলিয়া, তুকারামকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতা, জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈরাগ্যবশতঃ অসম্মত হওয়ায়, তাঁহারই হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া, ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। অল্পবয়স্ক হইলেও তুকারাম কৌলিক বাণিজ্য ব্যবসায়ে এবং সংসার পালনে অসমর্থ হন নাই। তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময় প্রথমে তাঁহার পিতা, তৎপরে তাঁহার মাতা পরলোকগমন করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ারও মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সান্তজী তীর্থপর্য্যটন ও ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য গৃহত্যাগী হন। এইরূপে পিতামাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহত্যাগ প্রভৃতি কারণে বিষয়াসক্তচিত্ত তুকারামের হৃদয় ভক্তিমার্গে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সুতরাং

বিশ্বাস যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পাঠক ভারতীতে অপূর্ব্ব বাবুর "প্রলয়"-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিবেন।

† বর্ত্তমান প্রবন্ধটি রিচার্ড প্রক্টরের লাভেরিয়ে সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের অবলম্বনে লিখিত হইল।

ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ হ্রাস পাইতে লাগিল। তুকারাম ক্রমে ক্রমে নানা ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং পরিশেষে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। সুতরাং গৃহে বাহিরে তিনি তিরস্কৃত এবং লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন।]

আমরা বলিয়াছি যে, আত্মা ভগবানে ও মন সংসারে সমর্পণ করিয়া, তুকারাম বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন। শেষ উদ্যম করিবার জন্য তিনি আপনার যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কতকগুলি লঙ্কা ক্রয় করিয়া, কঙ্কনদেশে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যাইলেন। তুকারাম যদিও নূতন দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া, নূতন দেশে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়ের রীতি সেই পূর্ব্বরূপই ছিল। তিনি কঙ্কনদেশে যাইয়া তথাকার সমুদ্রকূলবর্ত্তী এক দেব-মন্দিরের সম্মুখস্থ অশ্বত্থবৃক্ষমূলে দোকান খুলিলেন। নূতন ব্যবসায়ী দেখিয়া, দলে দলে ক্রেতা আসিতে লাগিল; তুকারামও আপনার অভ্যাসানুরূপ রীতিতে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ক্রেতাগণ মূল্য দিয়া নিজের নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য গ্রহণ করিতেন, তুকারাম দ্বিরুক্তি মাত্র করিতেন না। অনেকে ঋণ লইয়াও গেলেন; শেষ একজন আসিয়া বলিলেন, "আমার গৃহে একটী ভোজ আছে, কিন্তু আমার অর্থ নাই। তুমি আমায় তোমার বিক্রয়াবশিষ্ট লঙ্কাগুলি দাও, আমি সুবিধানুসারে তোমায় মূল্য দিব। আমার প্রয়োজন আছে কি না, যদি তোমার জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমার প্রতিবাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।" সরলস্বভাব তুকারাম বলিলেন, "সেকি? প্রয়োজন না হইলে কি আর তুমি আমার নিকট আসিয়াছ? আমার যত লঙ্কা আছে, তুমি লইয়া যাও।" তখন ক্রেতা বলিলেন, "আমার গৃহে রাখিবার কোন পাত্র নাই। তোমার লঙ্কা রাখিবার গুনগুলিও আমায় দাও। আমি মূল্য দিবার সময় তাহা ফিরাইয়া দিব।" তুকারাম তৎক্ষণাৎ আধার সমেত লঙ্কাগুলি ক্রেতাকে দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। লাভ হওয়া দূরে থাকুক, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে মূলধনেরই অপচয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক করে না। লঙ্কা বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া তুকারাম গৃহে প্রতিগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এমনই দৈবের বিড়ম্বনা যে পথে আসিবার সময় তিনি এক প্রতারকের হস্তে পতিত হইলেন। এই ব্যক্তি তাঁহাকে কতকগুলি কৃত্রিম সুবর্ণের অলঙ্কার দেখাইয়া তাহা

গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাহা দ্বারা যে তুকারামের যথেষ্ট লাভ হইবে, এইরূপ বুঝাইল। সরল প্রকৃতি তুকারাম তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমার নিকট এখন তোমার অলঙ্কারের মূল্যের উপযুক্ত অর্থ নাই; আমি কেমন করিয়া তোমার অলঙ্কার লইব?" প্রতারক বলিল, "আমি জানি তুমি অতি সত্যবাদী; তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপাতত তোমার নিকট যে অর্থ আছে, আমাকে দাও; বাকী মূল্য তোমার সুবিধামত পরে দিলেও চলিবে।" তুকারাম তাহার কথামত নিজের নিকট যে অর্থ ছিল, তাহা দিয়া, বিনিময়ে সেই কৃত্রিম সুবর্ণের অলঙ্কারগুলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আত্মীয়গণের নিকট এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আর বলিবার অপেক্ষা করে না।

আমরা বলিয়াছি যে তুকারামের দ্বিতীয়া পত্নী অবলাই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার স্বামী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি লোকের বিশ্বাসও বিলুপ্ত হইয়াছে। বিষয় কার্য্যে অক্ষম ভাবিয়া কেহ আর তুকারামকে ঋণ দিতে বা তাঁহার সঙ্গে একত্রে ব্যবসায় করিতে স্বীকৃত হন না। কিন্তু বণিকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যবসায় ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহেরও অন্য কোন উপায় ছিল না। এসেইজন্য পুনঃ পুনঃ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, অবলাই স্বামীকে পুনর্ব্বার ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য প্রণোদিত করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের দুহিতা ছিলেন বলিয়া অনেকের তাঁহার উপর বিশ্বাস ছিল। তিনি মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, কোন মহাজনের নিকট হইতে দুইশত টাকা ঋণ লইলেন, এবং স্বামির হস্তে তাহা দিয়া, তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া, ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইলেন। তুকারামের গ্রামস্থ বণিকগণ ব্যবসায়ার্থ বালেঘাট নামক স্থানে গমন করিতেছিল। তুকারাম তাহাদিগের অনুযাত্রী হইলেন এবং ক্রয় বিক্রয় শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইবার ব্যবসায়ে মূলধনের উপর তুকারামের এক চতুর্থাংশ লাভ হইল। কিন্তু হইলে কি হইবে? কর্ম্মফল তাঁহার সঙ্গেই ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া সম্পদ ভোগ করিবার তাঁহার সাধ্য কোথায়? তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, এক ব্রাহ্মণকে রাজানুচর ঋণের জন্য বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের মুখ মলিন,

তাঁহার মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু ক্ষৌরকার্য্যের অভাবে সুদীর্ঘ এবং দণ্ডস্বরূপ তাঁহার গলদেশে একখণ্ড কাষ্ঠ লম্বমান। ব্রাহ্মণের পত্নীও স্বামির অনুগমন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বর্ষ অবধি এইরূপ অবস্থায় ঋণ পরিশোধের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এবং এ পর্য্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ঋণের সমতুল্য না হওয়ায়, ঋণমুক্ত হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ তুকারাম ও তাঁহার সহযাত্রিদিগকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাদিগের নিকট আপনার দুরবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। অন্যান্য বণিকগণ তাঁহার কথা শুনিয়া দুই একটী করিয়া পয়সা দিলেন, কিন্তু তুকারামের হৃদয় ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশায় একেবারে বিগলিত হইল। তিনি আপনার ব্যবসায়লব্ধ সমস্ত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঋণমুক্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণের ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। দানের দক্ষিণান্ত স্বরূপ তুকারাম এই সঙ্গে আরও দশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া নিবৃত্তি লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ যেমন তুকারামের দ্বারা দ্বাদশবর্ষব্যাপী ক্লেশভোগের পর ঋণমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিলেন, তুকারামও তেমনই আপনার শেষ সম্বল বিসর্জ্জন দিয়া অর্থচিন্তারূপ বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সহযাত্রী বণিকগণ এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ দূরে থাকুক, সকলেই তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া স্থির করিলেন। অবলাই একেই দরিদ্রতার নিপীড়নে রুক্ষস্বভাবা হইয়াছিলেন, এক্ষণে তুকারামের এইরূপ ব্যবহারে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তুকারামের গৃহে বাস করা দুরূহ হইয়া দাঁড়াইল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে দেহু ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অজন্মা হওয়াতে শস্যাদির মূল্য অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল; এক্ষণে তাহা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে পরিণত হইল। ক্রমে টাকায় দুইসের করিয়া শস্য বিক্রয় হইতে লাগিল। তুকারামের পরিবারবর্গ এই দুঃসময়ে অন্নাভাবে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। তুকারাম প্রতিবাসিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে অবজ্ঞার সহিত তাড়াইয়া দিত। কেহ কেহ বা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "এখন তোমার বিট্ঠলঠাকুর কোথায়? তোমার বিট্ঠলভক্তির পরিণাম ত

দেখিলে?" ক্রমে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত হইল এবং লোকে বৃক্ষের পত্র ও কদর্য্য বন্যমূল ইত্যাদি আহার করিতে আরম্ভ করিল। তুকারামের প্রথমাপত্নী অনেক দিন হইতে কাশরোগে জীর্ণা ছিলেন, অনাহারে এবং ক্লেশে তিনি এই সময় প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন লোকে তুকারামকে শতমুখে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল। দুর্ভিক্ষে আরও কতজন প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু তুকারাম যে স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি লোকের নিকট সেরূপ নিন্দনীয় হইলেন। মহীপতি বলেন যে, "অস্থির উপর সঞ্জাত ক্ষতে বেদনা দিলে যেমন অধিকতর ক্লেশ বোধ হয়, এই বিপদের সময় আত্মীয়গণের গঞ্জনাও তুকারামের পক্ষে সেইরূপ মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হইত।" বিশেষতঃ লোকে যে তাঁহার প্রিয়তম বিঠোবারই উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করিত, তজ্জন্যই তিনি অধিকতর ব্যথিত হইতেন। যখন লোকের তিরস্কার অসহ্য হইত, তখন তিনি বলিতেন, "ভাই সব, যাহারা বিঠোবার নাম কখনও মুখে আনে না, তাহারা, কি তাহাদিগের আত্মীয়গণ, কি মরিতেছে না? তবে তোমরা আমার বিঠোবা-ভজনে দোষারোপ কর কেন এবং সেই দয়াময় বিঠোবাকেই বা আমার দুঃখের নিমিত্তকারণ বলিয়া স্থির কর কেন?" তুকারামের অদৃষ্টগুণে ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোজীও প্রাণত্যাগ করিল। তুকারাম সন্তোজীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেইজন্য তাহার অকালমৃত্যুতে তিনি নিদারুণ বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। ভগবানের লীলা বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য? ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই অদৃষ্টে এইরূপ পরীক্ষা ও এইরূপ যন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে। বারম্বার অগ্নিতে দগ্ধ না করিলে যেমন সুবর্ণের নির্ম্মলত্ব সম্পাদিত হয় না, সেইরূপ কঠোর বিপদ ও দুঃখভোগ ভিন্ন নৈষ্ঠিকী ভক্তি পরীক্ষিত হয় না। ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মিলেও, সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে এতদিন তুকারামের জ্ঞান পূর্ণ বিকশিত হয় নাই, এবং এখনও তিনি সাংসারিক সুখের প্রত্যাশায় পূর্ণ জলাঞ্জলি প্রদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু এইরূপ উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সংসার কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র, সুখের স্থান নয়। সাংসারিক সুখ সমস্তই অলীক ও ভ্রান্তি মাত্র। অবিদ্যারূপ রজনীর অবসানের পর প্রজ্ঞারূপ সূর্য্য এতদিনে তাঁহার হৃদয়াকাশে উদ্ভাসিত হইল। মহীপতি এইস্থলে সাধকের অবস্থা বর্ণন

করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'কৃষক যেমন প্রথমে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত ও বর্ষার ধারায় অভিষিক্ত হইয়া, পরে ফললাভরূপ আনন্দে আপনার পরিশ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচনা করে, ভক্তও তেমনই প্রথমাবস্থায় বহুক্লেশ ও বহুপরীক্ষা অতিক্রম করিয়া, পরিণামে ভগবদ্দর্শনরূপ অনুপম আনন্দে সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হন।' পত্নী ও পুত্রের মৃত্যুতে তুকারামের সংসার-মোহ এতদিনে অন্তর্হিত হইল, এবং তিনি যে এতদিন এই সকল অসার পদার্থের মোহে অন্ধপ্রায় ছিলেন, এই ভাবিয়া তিনি অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার এই সময়কার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মহীপতি লিখিয়াছেন, "তুকারাম ভাবিলেন, 'হায়, সংসারে সুখলাভের জন্য কতই ত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কি ফললাভ ঘটিল? উত্তরোত্তর কেবল দুঃখই ত পাইলাম। সে কথা আর কত স্মরণ করিব? অঙ্গার ঘর্ষণ করিলে তাহার অভ্যন্তরে কেবল গাঢ়তর কালিমাই লক্ষিত হয়, সংসারে যতই অধিক প্রবেশ করিবে, ততই অধিকতর দুঃখ মাত্র ঘটিবে। সংসারে দুঃখ পর্ব্বত-প্রমাণ, কিন্তু সুখ স্বপ্নজনিত ভ্রান্তিমাত্র। আমার আয়ুষ্কালই বা কত? তাহারও ত অধিকাংশ সংসারের সেবায় অতিবাহিত হইল। তবে এইবার অবশিষ্টাংশ সেই রুক্মিণীনাথের ভজনেই অতিবাহিত করিব।'" সতী যেমন প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভ প্রত্যাশায়, সংসার, ধন, জন, পিতা, পুত্র, সকলের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া, জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন, তুকারামও তেমনই তাঁহার প্রিয়তমের সন্দর্শন লাভের আশায়, সংসারের সমস্ত বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক দেহুর নিকটবর্ত্তী ভাম্বনাথ নামক একটী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
বৈদ্যনাথ।

দানব ও বামন।

বহুদিন হইতে দানব ও বামনের নানা প্রকার অদ্ভুত কাহিনী পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত আছে। দানব ও বামনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই তাহাদের শারীরিক অবস্থারও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে। -রাপু

কালের দৈত্যগণ বিস্তৃত নদীর উভয়পার্শ্বস্থ দুইটী বটবৃক্ষের উচ্চচূড়ে দুইখানি প্রকাণ্ড পদ স্থাপন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া এবং তালবৃক্ষের মত বৃহৎ দুইখানি হস্ত উত্তোলন করিয়া লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করিত। পুরাকালের বামনেরাও দলে দলে পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় সামান্য তৃণের মধ্য দিয়া বিচরণ করিয়া অথবা অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, সাধারণের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিত; সামান্য একটী বেগুন পাড়িতে হইলেও আকর্ষীর সাহায্য ভিন্ন তাহাদের আর অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু সে প্রকার দৈত্য অথবা বামনের কথা এখন আর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে দৈত্যের আকার অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, বামনের আকারও সঙ্গে সঙ্গে অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা স্বতন্ত্র জীব বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে সংস্কার প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিদূরিত হইতেছে। দৈত্য ও বামন এক্ষণে মানবসমাজেরই অন্তর্গত। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে দৈত্য বা দানব নামক এক স্বতন্ত্র জাতি বা জীব, এবং বামন নামক আর এক স্বতন্ত্র জাতি বা জীব ছিল। কিন্তু এখন অতিকায় বা অতি খর্ব্বাকৃতি মনুষ্য দুই এক জনমাত্র দেখা যায়; স্বতন্ত্র অতিকায় বা বামন জাতির অস্তিত্বে কেহ আর বিশ্বাস করে না। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়া দেশের লোকেরাই দীর্ঘতম; কিন্তু তাহাদেরও দৈর্ঘ্য গড়ে ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি মাত্র। পরিব্রাজক ষ্টান্‌লী সাহেব মধ্য আফ্রিকায় এক বামন জাতির আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু তাহারাও গড়ে প্রায় ৪ ফুট দীর্ঘ। কথিত আছে গ্রীক বীর হর্কিইলিস্ এক বামন জাতির দেশে গিয়াছিলেন; তাহারা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া তাঁহার পানপাত্র হইতে জলাদি পান করিত। ষ্টান্‌লীর বামনেরা এরূপ বামন নয়। বঙ্গভাষায় অতি ক্ষুদ্রকায় মনুষ্যের "বামন" উপাধির ন্যায় অতিশয় দীর্ঘাকার মনুষ্যের বিশেষ কোন উপাধি নাই বলিয়া, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাদিগকে দৈত্য বা দানব নামে অভিহিত করিলাম।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ ও পরবর্ত্তী রাজা চার্ল্‌সের ওয়াল্‌টার পার্সন্‌স্ (Walter Parsons) নামক দ্বাররক্ষক একজন বিখ্যাত দৈত্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পার্সন্‌স্ লোহকারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। অতি শৈশবেই তাহার শরীর ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। বাল্যকালে পিতার লৌহকারখানায় ভূমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া

অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত নিজের সমতা রক্ষা করিয়া তবে সে কার্য্য করিতে সক্ষম হইত। পার্সন্‌সের শরীরের অনুযায়ী তাহার দেহের বলও যথেষ্ট ছিল এবং আমোদ প্রমোদ করিতে সে বড়ই ভাল বাসিত। কখন কখন কৌতুকচ্ছলে সে দুই দীর্ঘাবয়ব ও বলশালী প্রহরীকে দুই কক্ষে পুরিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইত। শত চেষ্টাতেও তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত না। লণ্ডনের রাজপথে একবার তাহাকে পরিহাস করাতে পার্সন্‌স্ সেই পরিহাসপ্রিয় ব্যক্তিকে ধরিয়া নিকটবর্ত্তী এক মাংসবিক্রেতার দোকানের অতি উচ্চস্থানে লম্বিত একগাছি রশিতে ঝুলাইয়া রাখিয়া সগর্ব্বে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। জন ক্লীভল্যাণ্ড (John Cleveland) নামক সেই সময়ে একজন কবি অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তির সাহায্যে এই বিখ্যাত দৈত্যের বিষয়ে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন। ওয়াল্‌টার পার্সন্‌সের সময়ে জেফ্রী হাডসন্ (Jeffrey Hudson) নামে এক অত্যাশ্চর্য্য বামন ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজমহিষী ও অন্যান্য মহিলাগণের বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত একবার জেফ্রী ঢাল তরবারি দ্বারা সজ্জিত হইয়া একখানি পিষ্টকের আবরণের মধ্য হইতে হঠাৎ টেবিলের উপর বাহির হইয়াছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র অবাক্ হইয়া সকলে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন! ৮ বৎসর বয়সের সময় জেফ্রী কেবলমাত্র ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সে আর এক ইঞ্চিও বাড়ে নাই। ইহার পর হইতে সে আবার বাড়িতে আরম্ভ করে; কিন্তু ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি হইবার পর তাহার বৃদ্ধি একেবারেই স্থগিত থাকে। রাজা তাহাকে কৌতুকচ্ছলে নাইট উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন; এবং নানা বিষয়ে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করিতেন। জেফ্রীর স্বভাব তেমন মিষ্ট ছিল না। লোকের সহিত কলহ বিবাদ করিতেই তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় চলিয়া যাইত। বিশেষতঃ দীর্ঘাবয়ব ব্যক্তিকে দেখিলেই তাহার ক্রোধের সীমা থাকিত না। একবার বিবাদ করিতে করিতে সে একটা লোককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ড নিবাসী জন ওয়ারেনবর্গ (John Warrenburgh) নামক অপর একজন বিখ্যাত বামনকে ইংলণ্ডের নানা স্থানে প্রদর্শন করা হয়। সে কেবলমাত্র ২ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা ছিল। কিন্তু তাহার শরীর বেশ পরিপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ ছিল। তাহাকে সর্ব্বদাই একটী সিন্দুকের মধ্যে

রাখা হইত। ১৬৯৫ সালে জাহাজের কাঠ ভাঙ্গিয়া সে সিন্দুক সমেত সমুদ্রে পড়িয়া মরিয়া যায়। ১৭২৮ খৃঃ অব্দে ক্রষ্টোফার মিলার (Christopher Miller) নামক অপর একটী দৈত্য লণ্ডন নগরে আগমন করে। তাহার দৈর্ঘ্য ৮ ফুট। ফরাসীরাজ তাহাকে রত্নখচিত একখানি তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। সেই তরবারি হস্তে বক্ষ স্ফীত করিয়া সে সগর্ব্বে উপস্থিত দর্শকগণের ভিতর দিয়া মন্থর গমনে যাতায়াত করিতে বড়ই ভাল বাসিত। তাহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল। আউয়েন ফারেল্ (Owen Farrel) নামে তিন ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ একজন আয়র্লণ্ডবাসী বামনের অসাধারণ বলের বিষয় অবগত হইলেও বিস্মিত হইতে হয়। সে দুই হাত ঋজুভাবে প্রসারিত করিয়া প্রত্যেক হাতে ২ জন বলশালী ব্যক্তিকে বসাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিত। ইহাতে সে আদৌ কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিত না।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে জোসেফ (Joseph) নামক একজন বিখ্যাত বামন রুষিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পিতামাতা উভয়েই স্বাভাবিক আকার সম্পন্ন ছিলেন। জোসেফের ছয় ভাইবোনের মধ্যে ৩ জন বামন ও অপর তিন জন স্বাভাবিক দীর্ঘতা বিশিষ্ট ছিল। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে জোসেফের দেহ কেবলমাত্র ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। কিন্তু দেহের তুলনায় তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল অথবা অসম্পূর্ণ ছিল না। ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জোসেফ ১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়; ২২ বৎসর বয়সে সে ২৪ ইঞ্চি এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে ৩৯ ইঞ্চি অবধি বাড়িয়াছিল। সে একটী ফরাসী-মহিলার পাণিগ্রহণ করে। স্বামী-স্ত্রী একত্রে ভ্রমণে বহির্গত হইলে এক অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত। মনে হইত যেন জননী সর্ব্বাঙ্গ নত করিয়া তাঁহার ৩।৪ বৎসরের গুম্ফ এবং শ্মশ্রু বিশিষ্ট শিশুকে "হাঁটি হাঁটি পা পা" করিয়া লইয়া যাইতেছেন। জোসেফ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে রাজ-পরিবারের মধ্যে তাহার খুব প্রতিপত্তি হইয়াছিল। অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন ছিল বলিয়া কেহই তাহাকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সাধারণ বামনদিগের ন্যায় কোন প্রকার বালসুলভ চপলতা তাহাতে দৃষ্ট হইত না। তত্তৎকালের ইংলণ্ডের অনেক বিখ্যাত "বল" ও "কন্‌সার্টে" জোসেফ্-রচিত সঙ্গীতসকল আদরের সহিত গীত হইত। রাজপুত্র চতুর্থ জর্জ্জ তাহার

ভদ্রতা এবং বিনয়ে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তাহাকে অকৃত্রিম বন্ধু মনে না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। রাজপুত্রের সাহায্যে সে নিজের জীবনের একখানি সুন্দর ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার উপস্থিতবুদ্ধি সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। জোসেফ রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ছিল বলিয়া একবার একটী দীর্ঘকায়া স্থূলাঙ্গী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মহিলা তাহাকে পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "তুমি কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না।" মহিলার কথা শুনিয়া জোসেফ্ স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বলিল, "আমি শুনিয়াছি স্বর্গের পথ অতিশয় সংকীর্ণ, সুতরাং আমার যাইবার পক্ষেই সুবিধাজনক; বরং আপনার এই প্রকাণ্ড দেহ সেই পথ দিয়া প্রবিষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।" তাহার উত্তরে রমণী নিরুত্তর হইলেন। জোসেফের কনিষ্ঠা ভগিনীও একজন বিখ্যাত বামন ছিল। ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন বসন্ত-রোগে তাহার মৃত্যু হয়, তখন পর্য্যন্ত সে মোটে ২ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছিল।

বিগত শতাব্দীর প্যাট্রিক কটার (Patrick Cotter) নামক সুবিখ্যাত আইরিষ দৈত্যের কথা ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। বাল্যকালে কটারকে তাহার পিতা বার্ষিক ৫০ পাউণ্ড হিসাবে ৩ বৎসরের জন্য কোন এক প্রদর্শনীর অধিকারীকে ভাড়া দেন। সেই ব্যক্তি আবার ব্রিষ্টলের (Bristol) অপর একব্যক্তির নিকট কটারকে ভাড়া দেয়। সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কটার স্বদেশের নানাস্থানে আপনাকে প্রদর্শন করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকে। কটার দীর্ঘে ৯ ফুট ছিল। দুইখানি তক্তপোষ পাশাপাশি রাখিয়া সে শয়ন করিত। রাস্তার গ্যাসালোক নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই সে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইত। সেই সময় কটার হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক গ্যাসলণ্ঠনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া চুরুট ধরাইয়া লইত। এই ব্যাপারদেখিয়া অন্যান্য পথিকের মনে কি ভাবের সঞ্চার হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কটারের কঙ্কাল Royal College of Sugeons দের যাদুঘরে এখনও অবস্থিতি করিতেছে। ইহার কিছুদিন পরে মাডেম টেরেষিয়া (Madame Teresia) নামে একজন কর্সিকানিবাসিনী ক্ষুদ্র মহিলা ইংলণ্ডে আগমন করেন। দীর্ঘে তিনি ৩৪ ইঞ্চি ছিলেন। তাঁহার শরীরের ওজন মোটে ১৩ সের। কিন্তু

তাঁহার কোন অঙ্গ অসম্পূর্ণ ছিল না। তিনি বেশ বুদ্ধিমতী ছিলেন। ৩টী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন ।

খৃঃ ১৭৭৭ অব্দে কেম্ব্রিজের বিখ্যাত টমাস বেল (Thomas Bell) দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। সেই সঙ্গে তাহার একটী যমজ ভ্রাতাও ভুমিষ্ঠ হয়। কিন্তু সেই ভ্রাতা স্বাভাবিক আকারবিশিষ্ট হইয়াছিল। খৃঃ ১৮১৩ অব্দে বেল ৭ ফুঃ ২ ইঃ দীর্ঘ, তাহার করতল ১১ ইঃ ও মধ্যম অঙ্গুলি ৬ ইঃ দীর্ঘ ছিল। বেলের পরে হলাণ্ড নিবাসী (Wybrand Lolkes) ওয়াইব্রাণ্ড লল্কিস্ নামক বামন ইংলণ্ডের জনসাধারণের কৌতুক উৎপাদন করে। সে মোটে ২৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। লল্কিস্ যখন তাহার পূর্ণাবয়ব স্ত্রীর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইত, তখন যে কি এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য হইত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এই বামন মহাশয় ভূমি হইতে অক্লেশে একলম্ফে চেয়ারের উপর উঠিতে পারিতেন। খৃঃ ১৭৯৫ অব্দে (Basilio Huaylas) বাসিলিও হুয়াইলাস্ নামক একজন আমেরিকার আদিম নিবাসী মহাদৈত্য দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে আপনাকে প্রদর্শন করাইতে আসে। সে দীর্ঘে ৭ ফুট ২ ইঞ্চিরও উপর এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যারপর নাই কদাকার এবং সৌষ্ঠববিহীন ছিল। তাহার প্রকাণ্ড মস্তক সমুদয় শরীরের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করিয়াছিল। হস্তদ্বয় অতিশয় দীর্ঘ ছিল; সোজাভাবে দাঁড়াইলে হস্তাঙ্গুলি হাঁটু স্পর্শ করিত। শরীরটী যেমন স্থূল, তেমনি দীর্ঘ। পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। দক্ষিণ পদ অপেক্ষা বামপদ এক ইঞ্চি দীর্ঘ। এই মহাদৈত্যকে দেখিলে সকলে বিস্ময় অপেক্ষা ভয়েই অধিকতর জড়সড় হইত। কারণ মনুষ্যের অপেক্ষা পুরাণ-কথিত দানবের সহিতই তাহার অধিকতর সৌসাদৃশ্য ছিল।

কীট্‌সের কবিতা।

বায়রণ প্রাণময়, শেলী আত্মাময়; কীট্‌স্ কতদূর প্রাণময়, কতদূর আত্মাময়, তাহা স্থির করা বড় সহজ নহে।

কীট্‌সের মৃত্যুর পর শেলী তাঁহার বন্ধু ও কবি-ভ্রাতার জন্য রোদন করিতে যাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন :—

"Till the future dare
Forget the past, his fate and fame shall be
An echo and a light unto eternity"

আজ কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে শেলী ও কীট্‌সের নাম একরূপই প্রিয়। আজ সাহিত্যক্ষেত্রে কীট্‌সের যশোবৈজয়ন্তী অনুকূল বায়ুভরে সগর্ব্বে উড্ডীয়মান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের সাহিত্যসমাজ কখন চিন্তাও করে নাই, যে সেই সময়কার কবিদিগের মধ্যে এমন একজন ছিলেন, যাঁহার যশের নিকট লে হাণ্টের যশ দাঁড়াইতেই পারিবে না; এবং যাঁহার প্রতিভা সময় সময় শেলী ও বায়রণের প্রতিভাকেও ম্লান করিতে সমর্থ হইবে। কীট্‌সের প্রথম প্রকাশিত কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার প্রতিভা পূর্ণবিকাশের সময় অনেক কবির প্রতিভাকে ম্লান করিতে পারিবে।

কবি সুইন্‌বার্ন এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় (Encyclopœdia Britannica) কীট্‌স্ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতাগুলির বড়ই কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সে গুলি মোটের উপর কীট্‌সের উপযোগী না হইলেও সে গুলির দুই একটীতে এমন দুই একটী পদ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা মানব হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিতে সমর্থ।

ম্যাথু আর্ণল্ড যাহাকে Celtic vein বলেন, কীট্‌সের সকল কবিতার মত এই কবিতা সকলেও তাহা দৃষ্ট হয়। এই শক্তির প্রভাবেই তিনি কুসুমের সৌন্দর্য্য এমন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন! তিনি যেন তাহাদিগের সুখেই সুখী; তাহাদিগের জীবনেই যেন তাঁহার জীবন—এক সূত্রেই যেন তাহাদিগের ও তাঁহার হৃদয় গ্রথিত।

কীট্‌স্ স্বভাবের বড় ভক্ত। তাঁহাকে স্বভাবপূজক বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি আপনাকে স্বভাবের শোভায় নিমগ্ন করিতে পারিতেন—সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বায়রণও একস্থানে বলিয়াছেন :—

"There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar.
I love not man the less but Nature more.

কিন্তু বায়রণ স্বভাবের একভাগ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, কীট্‌স্ আর একভাগ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। কীট্‌স স্বভাবের চরম সৌন্দর্য্য, মানবের চিন্তা ও কার্য্য সকল, নিরীক্ষণ করেন নাই বা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই।

কীট্‌স্‌ অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কাজেই ইহাতে বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু তিনি যে মানবের কার্য্য, চিন্তা ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী উপেক্ষার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, তাহা তাঁহার Otho the Great পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই নাট্যকাব্যের প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে ইহাতে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা কবিকুলগুরু সেক্‌স্‌পিয়র রচনা করিলেও তাঁহার পক্ষে গৌরব ভিন্ন অপমানের কথা হইত না।

স্বভাবকে কীট্‌স্‌ উন্মত্ততার সহিত, অসীম আবেগের সহিত, ভাল বাসিতেন। তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত মানবের সম্বন্ধ ধরিয়া স্বভাবকে ভাল বাসিতেন না; স্বভাবের সম্বন্ধ ধরিয়া স্বভাবকে ভাল বাসিতেন।

অসাধারণ ভাব প্রকাশের সহিত কীট্‌সের শেষ কবিতাগুলিতে শব্দবিন্যাসেরও আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। কীট্‌সের শব্দবিন্যাসকে অনেকস্থানে টেনিসনের শব্দবিন্যাসও পরাস্ত করিতে সমর্থ নহে।

"নাইটিংগেল্‌" এর উপর তিনি যে কবিতাটী লিখিয়াছেন, তাহা একটী আশ্চর্য্য রচনা, তাহাতে উভয় ক্ষমতাই প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সেই কবিতার প্রারম্ভ এইরূপ ঃ—

"My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethewards had sunk:
'Tis not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thy happiness,—
That thou, light-winged Dryad of the trees,
In some melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease."

কি আশ্চর্য্য রচনা! কবিত্বের কি আশ্চর্য্য বিকাশ। উত্তর-চরিতের একস্থানে এই কবিতার প্রথম চারি চরণের মত ভাব দেখা যায়। টেনিসনের শেষ গীতিকবিতা ভিন্ন এমন সুন্দর শব্দবিন্যাস আর অল্প স্থানেই দৃষ্ট হয়।

য়ুরোপের গীতিকবিতার মধ্যে স্যাফোর The Hymn to Aphrodite, কেটুলাসের The Acme and Septimius, টেনিসনের Princess এর কতকগুলি সঙ্গীত, হাইনার প্রণয়-গীত সকল এবং কীট্‌সের Ode গুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহারাই য়ুরোপীয় গীতি-কবিতার চরম উৎকর্ষ এবং আশ্চর্য্য বিকাশ।

কীট্‌সের দ্বিতীয় রচনা Endymion। কবি ওয়াইট দ্বীপে স্বভাবের সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্থলে গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে এই পুস্তকখানি রচনা করেন। আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইহাতে এক অবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। বুঝি সেই স্বভাবের প্রিয় ভূমির সৌন্দর্য্য শ্বাস কবির হৃদয় হইতে তাঁহার রচনাতেও প্রতিফলিত হইয়াছিল! কোন সমালোচক এই পুস্তকের কথায় বলিয়াছেন :—

"We wander on and on through a fragrant wilderness of flowers, lost in mazes of luxuriant and oderous undergrowth. Here the willow 'trails its delicate amber', there 'fresh-blown musk-roses fling their sweets upon the summer'."

প্রভাতের কুসুমগন্ধে পবন সুগন্ধময়, অনন্ত নভোমণ্ডল নীলিমায় কি সৌন্দর্য্যময়, তুষারের মত দুই একখানি মেঘ কখন কখন ভাসিয়া যাইতেছে! সে যেন এক মায়াপুরী, জগতের কোলাহল বা উচ্চনাদ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না—শব্দের মধ্যে সেখানে কেবল ঘুঘুর প্রণয়কাতর স্বর এবং অসংখ্য মধুপের গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি। পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে কেমন এক স্নিগ্ধভাব আসিয়া পড়ে; আমরা আমাদিগের শোকতাপক্লিষ্ট জীবনের কথা ভুলিয়া যাই—হৃদয় সৌন্দর্য্যসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

এই সুন্দর কবিতার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া সমালোচনা করিবার স্থান আমাদিগের নাই। এই কবিতার গল্পাংশও এত বিস্তৃত এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত যে তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করা সম্ভব নহে। তবে ইহা নিশ্চয় যে এই মধুর কবিতায় কবি যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অসামান্য।

যদি কখন কোন কবি কাননশোভায় বিমুগ্ধ হইয়া, নিমগ্ন হইয়া, তদ্গত হৃদয়ে স্বভাবের শোভার বিষয় গান করিয়া থাকেন, তবে কীট্‌স্‌ তাহা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ—

"O thou, whose mighty palace roof doth hang
From jagged trunks, and overshadoweth
Eternal whispers, glooms, the birth, life, death
Of unseen flowers in heavy peacefulness;
Who lovest to see the hamadryads dress
Their ruffled locks, where meeting hazels darken;
And through whole solemn hours doth sit, and hearken
The dreary melody of bedded reeds—

In desolate places, where dank moisture breeds
The pipy hemlock to strange overgrowth,
Bethinking thee, how melancholy loth,
Thou wast to lose fair Syrinx—do thou now,
By thy love's milky brow !
By all the trembling mazes that she ran,
Hear us, great Pan !

এই সৌন্দর্য্যের চাকৃচিক্যে ভূষিত কবিতায় যে নিন্দনীয় অনেকস্থান আছে, তাহা বলা বাহুল্য। কবি আপনিও এ কথা জানিতেন। তাই তিনি এই কবিতার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"Knowing within myself the manner in which this Peom has been produced, it is not without a feeling of regret that I make it public.

"What manner I mean, will be quite clear to the reader who must soon perceive great inexperience, immaturity and every error denoting a feverish attempt, rather than a deed accomplished."

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের Quarterly Review পত্রিকায় উহার তৎকালীন সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত এই কবিতার একটী নাতি বৃহৎ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময় কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে এই সমালোচনাই কীট্‌সকে মারিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। তবে শেলী ও বায়রণ উভয়েই এই বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং সেই বিশ্বাস ফলে Don Juan এ বায়রণের লিখিত কবিতা এব শেলীর Adonais চিরদিন জগতের কর্ণে এই বিশ্বাস ঘোষণা করিবে। যাঁহার প্রতিভা এত উচ্চ, সামান্য সমালোচনা তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া বোধ হয় না! সত্য বটে সমালোচনা বড় কঠোর হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কি কবিকে মারিতে সক্ষম ?

কীট্‌সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এমন কি অসম্পূর্ণ দুই একটী কবিতাতেও এত সৌন্দর্য্য ছড়ান, এত মাধুর্য্য অক্ষরে অক্ষরে ছত্রে ছত্রে ছড়ান !

কীট্‌সের Ode on a Grecian Urn নামক কবিতাটী কতই মধুর! এই কবিতার প্রথম চারিটী ছত্র মাত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"Thou still unravish'd bride of quietness !
Thou foster-child of Silence and slow Time,
Sylvan historian, who canst thus express
A flowery tale more sweetly than our rhyme."

এখন আমরা কীট্‌সের পরে প্রকাশিত কবিতাগুলির বিষয় বিবেচনা করিব। তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে প্রকাশিত কবিতা সকলের মধ্যে দুই একটী তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচায়ক। সে গুলিকে ইংরাজী কবিতার মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। লেমায়া (Lamia)

কি সুন্দর ভাব পূর্ণ! The Eve of St. Agnes, Isabella or The Pot of Basil, Hyperion এবং Ode গুলি কি উচ্চদরের প্রতিভার পরিচায়ক !

"লেমায়ায়" কবির ক্ষমতা অনেকটা অগ্রসর। ইহা তাঁহার অন্যান্য কবিতা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রায় কোন ছেদ নাই। "লেমায়ার" এক স্থানে আছে ঃ—

"Not one hour old, yet of sciential brain
To unperplex bliss from its neighbour pain,
As though in Cupid's college she had spent
Sweet days, a lovely graduate, still unshent,
And kept his rosy terms in idle languishment."

(টেনিসন্ যখন লিখিয়াছিলেন "Sweet girl graduates in their golden hair" তখন বোধ হয় কীট্‌সের এই কয়টী পদ তাঁহার মনে ছিল।)

আর এক স্থানে আছে ঃ—

"Philosophy will clip an angel's wings."

অগভীর ও শূন্যভাব কীট্‌সের নাই। সেরূপ ভাব প্রকাশে তিনি সকল সময় সক্ষমও নহেন। The Cap and Bells পাঠ করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে। তাঁহার প্রতিভা গাম্ভীর্য্যমূলক। শেলী যেরূপ ভাব প্রকাশের জন্য প্রসিদ্ধ, কীট্‌সের সেরূপ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা সর্ব্ব স্থানে দৃষ্ট হয় না।—এখানে ইহাও বলা ভাল যে কীট্‌স্ যেরূপ ভাব প্রকাশের জন্য প্রসিদ্ধ, শেলীরও সেরূপ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা সর্ব্বস্থানে দৃষ্ট হয় না; কীট্‌সের Endymion প্রকাশিত হইলে শেলী ঐ ভাবে Laon and Cythna রচনা করেন কিন্তু তাহা কীট্‌সের কবিতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আমরা বলিয়াছি শেলীর ন্যায় ভাব প্রকাশে কীট্‌স সকল সময় সক্ষম নহেন; তিনি যে সময় সময় সক্ষম, তাহার প্রমাণ La Belle sans merci। এই কবিতা পাঠ করিতে করিতে আমরা মরজগতের কথা ভুলিয়া যাই; মন এক মায়ারাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। বোধ হয় কোল্‌রিজের Christabel এবং রসেটির Rose-Mary ভিন্ন এ ধরণের এত সুন্দর কবিতা ইংরাজী ভাষায় আর নাই।

Hyperion কীট্‌সের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা। ইহা অসম্পূর্ণ; কিন্তু গ্রীসীয় কারুকার্য্য-খচিত ভগ্ন এক এক খণ্ড প্রস্তর যেমন সৌন্দর্য্যময়, এই কবিতাও সেইরূপ সৌন্দর্য্যময়। কীট্‌স্ লাটিন ও ইংরাজী ভাষার সাহায্যে গ্রীক

প্রতিভা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি কেমন করিয়া এত সুন্দর কবিতা লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কীট্‌সের কবিতায় কেবল কোমল সৌন্দর্য্য; তীব্রতা তাহাতে নাই। সেই কোমল সৌন্দর্য্যময় কবিতা চিরদিন জগতে আদৃত হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

সৌন্দর্য্য-বোধ।

আমরা অনেক সময় এরূপ সুখ অনুভব করি, যে তাহাতে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি;—তাহাতে আপনার কথা ভাবিবার সময় থাকে না, আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়, আত্মহারা হইতে হয়, নিজত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়। সৌন্দর্য্য-বোধে ঈদৃশ আত্ম-বিস্মৃতি হইয়া থাকে। যখন গিরিশিখরে দাঁড়াইয়া অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকি, যখন তটিনীতীরে বসিয়া নদীর গান শুনিতে থাকি, যখন অন্ধকারে চক্ষু বুজিয়া অনন্তকালের অবিরাম গতির কথা ভাবিতে থাকি, তখন, কে জানে, কেন আপনা হইতে মনে এক বচনাতীত আনন্দের সঞ্চার হয়। তখন আমার কথা ভাবি না, তোমার কথা ভাবি না, কি ভাবি তা জানি না, শুধু হৃদয় কি এক আনন্দভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া ঢুলিয়া পড়ে। ইহার মধ্যে স্বার্থ নাই; স্বার্থের চিন্তাও নাই। আমি এখানে রক্তিম সূর্য্যকে দিয়া কোন কার্য্য করিয়া লইতে চাই না, তটিনীর উপর আমার বাণিজ্য-পোত ভাসাইতে চাই না, অতীত কালকে আমার সুখের দিন ফিরাইয়া দিতে বলি না; শুধু তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকি এবং আনন্দে বিভোর হই।

এই আনন্দ কেন হয়? এ সুখের কারণ কি? ইহার উত্তর খুঁজিতে গেলে দেখিতে হইবে, সেই অস্তমান রবির রক্তিম কিরণে, সেই কল্লোলিনীর কলকলধ্বনিতে এমন একটী সাধারণ জিনিষ আছে, যাহা আমাদিগের চিত্তে এই হর্ষের সঞ্চার করিয়া দেয়। এই জিনিষটী কি তাহা বলা কঠিন, তবে তাহার একটা নাম দিতে পারি, এবং সেই নাম হইতেছে "সৌন্দর্য্য।" মাধ্যাকর্ষণ কি? বলিলে যে সদুত্তর পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ একটা উত্তর। তবু কি কি উপকরণে এই সৌন্দর্য্য গঠিত, তাহা আমরা বলিতে চেষ্টা করিতে পারি।

প্রথমতঃ, চক্ষু এবং কর্ণ এই দুই ইন্দ্রিয়ের রমণ বা পরিতৃপ্তি সেই সৌন্দর্য্যের দ্বারা হইয়া থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্বকালে, সন্ধ্যার সময়, এবং কিয়ৎকাল পরে, অস্তমান সূর্য্যের রক্তবর্ণ, ঈষৎ লোহিতাভ নীল মেঘখণ্ড, অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণ এবং উদিত চন্দ্রতারকার শ্বেতবর্ণ, এই প্রকার নানাবিধ বর্ণ ক্রমান্বয়ে চক্ষের উপর পতিত হইয়া তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করে; এইজন্য তাহারা সুন্দর। গুহার ভিতর বসিয়া মধ্যাহ্নে নির্ঝরের ঘুমপাড়ানীয়া গান, নিশীথে বাতবহনে দূর বংশীধ্বনি, এবং সুগায়কের মধুরসঙ্গীত, শ্রবণে সুধা ঢালিয়া দেয়, আরাম আনিয়া দেয়, সুতরাং তাহারা সুন্দর।

দ্বিতীয়তঃ, যে জিনিষ সুন্দর হইবে, তাহার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটা সমতা চাই। ইডেন গার্ডেনে পথগুলির সমতা আছে বলিয়া, তাহারা সুন্দর, গাছগুলির শাখা সমভাবে কর্ত্তিত বলিয়া তাহারা সুন্দর, আর সেই সুকণ্ঠের স্বর সমভাবে উঠে নাবে বলিয়া সুন্দর। এখানে হয় ত কেহ (নূতন কবি) বলিবেন, প্রকৃতির দৃশ্য অসম বলিয়াই সুন্দর, মনুষ্যের কার্য্য সমান, চাঁছাছোলা, বলিয়াই অসুন্দর। কথাটা কি ঠিক? হে কবি ভাই! তোমার কাব্যচক্ষু আর একটু ফুটিতে দাও, দেখিবে প্রকৃতির দৃশ্যে যাহা বিষম দেখিতে ছিলে তাহা সম, এবং যাহা বিষম বলিয়া ভাল বলিতে ছিলে তাহা সম বলিয়াই ভাল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত যদি প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে এই অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতে। সত্যই মানব প্রকৃতিও বাহ্যতঃ এইরূপ অসমান; কিন্তু যাহা বাহ্যতঃ অসমান বলিয়া মনে হয়, অন্তর্দৃষ্টিতে তাহাতে সামঞ্জস্য বাহির হয়। শেক্‌স্‌পিয়ারের চরিত্রগুলি বাহ্যতঃ এইরূপ অসমান এবং অন্তরে সম বলিয়াই তাঁহার কাব্য কাব্য নামের উপযুক্ত এবং তিনি অমর হইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, যে জিনিষ সুন্দর তাহা আমাদিগের স্মৃতি এবং চিন্তার বিষয়ীভূত এবং তাহাদের আরামস্থল। যখন আমরা অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকি, প্রথমতঃ আমরা আত্মহারা হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য পান করি; তাহার পর যখন আমাদের চিন্তা ফিরিয়া আসে, তখন মনে হয় আমাদের জীবনও বুঝি ঐরূপ, কালের সাগরে ওরূপ করিয়াই ডুবিয়া যাইবে।

"The clouds that gather round the setting sun
Do take a sober colouring from an eye
That hath kept watch o'er man's mortality !
Another race hath been and other palms are won."

এইখানে আমি একটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে সৌন্দর্য্যের এই তিনটী ভাবই সুন্দররূপে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে ঃ—

তুমি কি আজিও মোরে মনে কর তত,
আমি যত করে থাকি কিবা দিনে রেতে ?
প্রভাতে স্বপন-রাণী ভাস নয়নেতে ;
মধ্যাহ্নে নয়নপথ কর আলোকিত ;
দুপুর গড়ালে যবে তরুতলে আসি
ব'সে থাকি নদী-পাশে চেয়ে চেয়ে চেয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই শিয়রেতে বসি—
কহিছ কতই কথা মুখপানে চেয়ে।
সায়াহ্নে পশ্চিমাকাশে ঢলিলে তপন,
গ্রামশেষে নদীপাশে শুয়ে থাকি মাঠে,
দূর ছায়া কাছে আসে—দেখি হৃদি পটে
ছায়ার আঁধারে তুমি ফুটেছ কখন।
ভুলে বা স্বপনে যারে ভাল বেসেছিলে
একদিন, আজি তারে গিয়াছ কি ভুলে ?

একটু বেশ বুঝিয়া পড়িলে এই কবিতাটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমে দেখ, ইহার কবি প্রভাতে স্বপ্নের মত ভাসা ভাসা দৃশ্য গুলি আধ-ঘুম-ভাঙ্গা চোখে দেখিয়াছেন ; মধ্যাহ্নে সূর্য্যের পূর্ণ কিরণে সমস্ত গাছপালা পৃথিবীকে আলোকিত হইতে দেখিয়াছেন ; অপরাহ্নে নদীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া নদীর উদারভাব দেখিয়াছেন,মধুর গান শুনিয়াছেন ; সায়াহ্নে পশ্চিমাকাশে তপনকে ঢলিতে দেখিয়াছেন, আর চারিদিক হইতে ছায়াময়ী তিমির-সখীদিগকে আসিতে দেখিয়াছেন ; এবং সেই ছায়ার মধ্যে অকস্মাৎ ফুট্‌ফুটে চাঁদকে ফুটিতে দেখিয়াছেন, তাঁহার নয়ন এবং শ্রবণ আনন্দ সংগ্রহ করিয়াছে। তার পর এই প্রকৃতির দৃশ্যগুলি তাঁহার প্রিয় স্মৃতি গুলিতে জড়াইয়াছেন ; জড়াইয়া জড়াইয়া আরও মধুর এবং আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, এবং অবশেষে বাহ্য প্রকৃতিতে যেমন একটা পরম্পরা লক্ষ করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন, অন্তঃপ্রকৃতিতেও সেইরূপ আশার একটা রজ্জু দিয়া সকল বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব এই কবিতাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যিনি এই কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ প্রশংসার যোগ্য।

এই সৌন্দর্য্য-বোধের সহিত উপকার বা অপকার (utility) মিশাইও না। ইহা একটী মনের আত্মভোলা নীরব আনন্দ এবং ইহা আমাদের মানব প্রকৃতির একটী অঙ্গ। যদি নীরবে আনন্দ দানই ইহার কার্য্য হইল, তবে ইহাকে লইয়া এত নাড়া চাড়া কেন ? ইহার আবার অনুশীলন কি ? উত্তর—কথাটার আর একটা দিক্ আছে। আমরা যখন সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দিত হই, তখন সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার মানসিক ভাবের উদয় হয়। সেই আনন্দ নিজে যেমন ভোগ করিতেছি, তেমনি অপরকেও তাহার অংশ দিতে প্রবল বাসনা হয়। অপরের উপকার বিধানের জন্য আমাদিগের জ্ঞান এরূপ করিতে বলিয়া দেয় না ; আমরা শুধু আমাদের মনের স্বাভাবিক গতিতে অপরকে এই আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা করি। নিজে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া সুখী হই, অপরকে আবার তাহা অনুভব করাইয়া সুখী হই। অপরকে এই সুখদানেচ্ছা হইতেই কলা বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই কথা সকল সময় আমাদিগের মনে রাখা কর্ত্তব্য। যে সুখভোগ করিতেছি, তাহাই বাঁটিয়া দিব ; নিজের স্বার্থ কিম্বা পরের অর্থ ভাবিয়া চিন্তিয়া চলিব না। এই সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তিতে আমাদিগের কিম্বা সমাজের উপকার বা অপকার হইতেছে, তাহা ইহার বিষয় নহে, শুধু সুখ অনুভব এবং সুখ দানই ইহার কার্য্য।

এই কলা অনেক রূপ—গীতবাদ্য, কাব্য, কারুকার্য্য প্রভৃতি। তন্মধ্যে কবিতাই আমাদিগের বিবেচ্য বিষয়।

কবিতা কেন লেখে ? নিসর্গ বা মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য প্রথমতঃ আমাদিগকে আকর্ষণ করে, তৎপরে আমরা তাহাদের আভ্যন্তরীন কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করি ; এবং যখন আমাদের হৃদয়ের সহিত তাহাদের হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যখন তাহাদের গানে আমাদের কণ্ঠ মিলাইয়া দিই, তখনই তাহা কবিতা হইয়া পড়ে। সে কবিতায় কবি মুগ্ধ, পাঠক মুগ্ধ। কবির সঙ্গীতে পাঠক আপনার হৃদয়ের গান শুনিতে পান, তাই কবিতাপাঠে তাঁহার আনন্দ। অবশ্য কবিতা পড়িয়া আমাদের সমাজের সমুন্নতি এবং বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং হইবে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু কার্য্যকারিতা বা উপকারিতা কবিতার কখনও মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সেই জন্যই পোপের Essay on Man ভ্রমপূর্ণ দর্শন শাস্ত্র বিশেষ

হইলেও কাব্য নহে, ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের Excursion খণ্ড কবিতায় পূর্ণ থাকিলেও পূর্ণ কাব্য নহে। কিন্তু ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের ক্ষুদ্র গীতিকাব্য সমূহ, শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকাবলী, এবং কালিদাসের সকল কাব্যই কবিতা। আমাদের এই ধর্ম্মবাদের দেশে, এই মত লইয়া লাঠালাঠির দেশে, কাব্যের স্ফূর্ত্তি বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডে পিউরিটানদের আমলে, তাহাদের পেচক-গাম্ভীর্য্যের অত্যাচারে, কবিতা পলাইতে বসিয়াছিল। আমরা শিশুদিগকে কবিতা নামে কি পড়াইয়া থাকি? কতকগুলি পদ্যের ছত্রে ছত্রে "করিও না এবং করিও"র ছড়াছড়ি। হইতে পারে, ইহাতে এই পদ্যের ছলনায় বালককে নীতিপরায়ণ করিতেছি, কিন্তু কবিতা পড়াইতেছি, একথা বলা উচিত নয়। তাহা হইলে পদ্যে ভূগোল, পদ্যে জ্যামিতি, পদ্যে ব্যাকরণ লিখিতে লাগিয়া যাও। তাহা হইলে ইংরাজী ন্যায় শাস্ত্রের

"Barbara Celarent Darii Ferioque,"

ইত্যাদি, স্মৃতিশক্তির সাহায্যার্থ লিখিত পংক্তিগুলিও কবিতা এবং

"Pumpkin লাউকুমড়ো Cucumber শসা।
Brinjal বার্ত্তাকু Ploughman চাষা॥"

ইহাতেও অতি উপাদেয় কাব্যরস আছে!

আমাদের পারিবারিক অবস্থা।

আজকাল আমাদের অনেকেরই পারিবারিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বাঙ্গালীর জীবনে যে বিশেষ কোন স্থায়ী উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না, পারিবারিক দুরবস্থাই তাহার প্রধান কারণ। আমরা আমাদের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে ক্রমশঃ চেষ্টা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, পারিবারিক দুরবস্থা অর্থে আমি পারিবারিক অর্থকৃচ্ছ্র বলিতেছি না। আমাদের অর্থকৃচ্ছ্র অনেক সময়ে যে আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায় হয়, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রই মানবের অবনতির একমাত্র, এবং অনেক স্থলে, কিছুমাত্রও কারণ নহে। অনেক দরিদ্র পরিবারে যে মার্জ্জিত নীতি ও পবিত্রতা দৃষ্ট হয়, অসংখ্য লক্ষপতির গৃহে তাহার শতাংশের একাংশও নয়নগোচর হয় না!

প্রকৃত কথা এই যে, শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা ভোগবিলাস সাধনের প্রচুর উপায়ের বিদ্যমানতা আমাদের পারিবারিক অবস্থার উৎকর্ষাপকর্ষের পরিচায়ক নহে। যে পরিবারে পরিবারস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়, মন ও আত্মার কর্ষণ, তৃপ্তি ও সুখের বন্দোবস্ত থাকে, যেখানে সুনীতির নির্ম্মল বায়ু নিয়তই সঞ্চরণ করে এবং পবিত্রতার স্নিগ্ধ কোমল জ্যোতিঃ ভিত্তিবিলম্বিত সামান্য চিত্রপটটিকেও উদ্ভাসিত করিতে থাকে, দারিদ্র্য-নিপীড়িত হইলেও সেই পরিবারের অবস্থাই প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এইরূপ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; যেহেতু এইরূপ পরিবারেই আত্মা মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

একবার পল্লীগ্রামে কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ কোনও বিখ্যাত আচার্য্যবংশীয় এবং স্বয়ং আচার্য্য। তাঁহার গম্ভীর অথচ প্রসন্ন ও পবিত্র মূর্ত্তিদর্শন করিয়া সহজেই মনে ভক্তির উদয় হইল। তিনি অতিশয় সমাদরপূর্ব্বক আমাদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আগ্রহসহকারে আমাদের কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এই পরিবারে কতিপয় দিবস বাস করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ দরিদ্র; স্বয়ং আচার্য্য হইলেও শিষ্যগণের নিকট কিছুমাত্র অর্থ গ্রহণ করেন না। ইহাঁর কিঞ্চিৎ পৈত্রিক ভূসম্পত্তি ছিল; তদ্দ্বারাই কোনও ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁদের অবস্থা বেশ "স্বচ্ছল" ছিল না; কিন্তু তথাপি এই পরিবারে অসন্তোষের চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হইত না। বালক বালিকাগুলি শান্ত, শিষ্ট, প্রফুল্ল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত। তাহাদের আকার প্রকারে দারিদ্র্য বা তাচ্ছিল্যের চিহ্ন কিছুমাত্র দৃষ্ট হইত না। বালকেরা গৃহেই পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। আচার্য্যের একটী অনূঢ়া কন্যা পবিত্র প্রভাত সময়ে দেবগৃহ পরিমার্জ্জনে ও গৃহসংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে পূজার জন্য স্বহস্তে পুষ্পচয়নে নিযুক্ত থাকিত। আচার্য্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান করিতেন; পরে বিষ্ণু-মন্দিরে বিষ্ণুপূজা করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিতেন। সেইখানে কোনও দিন ভগবদ্গীতা এবং কোনও দিন চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন। প্রতিবেশী অনেক ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিতে আসিত। ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ শেষ হইলে তিনি বাহির হইয়া প্রতিবেশীদের গৃহে গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন; পীড়িত ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা

করিতেন, বাটীর লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেন এবং আবশ্যক হইলে, স্বহস্তেও তাহার শুশ্রূষা করিতেন। প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ লইতে আসিত এবং সকলেই তাঁহার পরামর্শে উপকৃত হইত। মধ্যাহ্নের সময় আচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদি করিতেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের আহার সম্পূর্ণরূপে নিরামিষ ছিল এবং বালক-বালিকারা জীবহত্যার কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিত। আহারের পর আচার্য্য নিজ গার্হস্থ্য ব্যাপারে কিয়ৎক্ষণ মনোনিবেশ করিতেন। সন্ধ্যার পর আচার্য্যের বহির্ব্বাটীতে বিস্তর নর-নারীর সমাগম হইত। আচার্য্য প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সন্ধ্যার পর কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিতেন। আমরা যে সময়ে ছিলাম তখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল।

আচার্য্য-পত্নীও আচার্য্যের অনুরূপা ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এরূপ পবিত্রমনা উদার প্রকৃতির রমণী বঙ্গগৃহে আজ কাল অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি এক প্রকার নিরাভরণা এবং সম্পূর্ণরূপে আড়ম্বরশূন্যা ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুর পরিচ্ছন্নতার আদর্শ ছিল। তিনি স্বহস্তে সমস্ত গৃহকার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। রন্ধন, শিশুপালন হইতে আরম্ভ করিয়া মঙ্গলা গাভীর আহারের ব্যবস্থাটি পর্য্যন্ত সমস্তই স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার অনূঢ়া কন্যাটিও এই সমস্ত কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ সহায়তা করিত। আচার্য্য-পত্নী অতিথি অভ্যাগতের সৎকার করিয়া মাতৃস্নেহে যত্ন করিতেন এবং সকলকে আহার করাইয়া তবে স্বয়ং আহার করিতেন।

এই আচার্য্য-পরিবারের সুন্দর, পবিত্র ও মঙ্গলকর অবস্থা আজকাল অনেক বঙ্গীয় পরিবারে আদৌ দৃষ্ট হয় না। ইদানীং অনেক ধনবান্ "শিক্ষিত ও মার্জ্জিত" পরিবার দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেখানে ধর্ম্ম ও নীতির জীবন্ত ভাব কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। পুরুষেরা বিদ্যা, বল বা সামাজিক অবস্থার অহঙ্কারে দর্পিত, স্ত্রীলোকেরা কেবল বেশভূষা, আলস্য, কদর্য্য আলাপ, ও ভাল মন্দ নাটক নভেল পাঠে নিমগ্ন, এবং অল্প বয়স্কেরা প্রায়ই অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। বাড়ীর কর্ত্তারা শিশুগণের সমক্ষেই কুৎসিত আলাপ বা মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না; অন্তঃপুরবাসিনীরাও অল্পবয়স্কা কন্যা বা ভগিনীর কাছে নিষিদ্ধ কথাবার্ত্তা কহিতে দ্বিধা বোধ করেন না। সর্ব্বাপেক্ষা, আলস্যই বঙ্গীয় নরনারীর জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত

করিয়া দিতেছে। সামান্য গৃহস্থের মহিলারাও শারীরিক পরিশ্রম করিতে একান্ত কাতর। পরিশ্রমের অভাবে তাঁহাদের দেহ ভগ্ন ও মন স্ফূর্ত্তিশূন্য হইতেছে। এরূপ অবস্থায় জীবন অনেকের পক্ষে ভার স্বরূপও হইয়া পড়িতেছে। অনেকে সামান্য কারণেই আত্মহত্যা করিতেছেন, অনেকে জঘন্য কুরুচিপুর্ণ কবিতা লিখিয়া তাঁহাদের হৃদয়স্থ সঞ্চিত বিষের উদ্গার করিতেছেন এবং অধিকাংশই স্নায়বিক উত্তেজনা জনিত ক্ষণিক সুখভোগের জন্য লোমহর্ষণ ঘটনাপূর্ণ কিম্বা নায়ক নায়িকার বিচিত্র হা হুতাশপূর্ণ নাটক নভেল পড়িবার বিকট প্রবৃত্তি দেখাইতেছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আধুনিক বঙ্গীয় পুরুষগণের অনেকেই চরিত্রহীন, স্বার্থপর, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ও নীতিবর্জ্জিত এবং নব্যা বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে অধিকাংশই আর্য্যানামের অযোগ্যা। বড়ই দুঃখের সহিত আজ আমাদিগকে এই অপ্রিয় সত্য কহিতে হইতেছে, কিন্তু রোগের প্রতীকার করিতে হইলে, সত্যগুপ্তি করা কোন মতেই চলে না। ভরসা করি, কেহ আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন না।

প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত কখনও নীতিজ্ঞান সম্ভবে না। বিদ্যাশিক্ষার যে কুফল ফলিতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—ধর্ম্মজ্ঞান লাভের প্রতি একান্ত অমনোযোগ। নূতন রীতিনীতি পুরাতন রীতিনীতির স্থান অধিকার করিতেছে। এই নূতন রীতি-নীতির মধ্যে অনেকগুলিই মার্জ্জিত এবং সভ্যসমাজের অনুমোদিত বটে; কিন্তু তৎসমুদায়ে যেন পবিত্রতার সৌন্দর্য্য নাই! সূর্য্যালোক ব্যতিরেকে যেরূপ মুক্তাফলক বা শিশিরকণার অপূর্ব্ব লাবণ্য কোনমতেই পরিস্ফুট হয় না, সেইরূপ একমাত্র ধর্ম্মের শুভ্র আলোক ব্যতিরেকে, মার্জ্জিত শিক্ষাই বল আর মার্জ্জিত রীতিনীতিই বল, কিছুরই শোভা হয় না। পূর্ব্বোক্ত আচার্য্য পরিবারে যে স্নিগ্ধ, শান্ত ও পবিত্রভাব অবলোকন করিয়া আসি-লাম, তাহা আজকাল অনেক নব্য বাঙ্গালীর পরিবারে দেখিতে পাই না কেন? অনেক পরিবার কেবল অশান্তিরই আলয়। স্বামী স্ত্রীর গুণে প্রীত নহেন। স্ত্রীও স্বামীর প্রতি বিরক্তা। স্বার্থই অনেক স্থলে ভালবাসার স্থান অধিকার করিয়াছে। বহির্দ্দৃষ্টিতে সংসার একরূপ চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়, কাহারও প্রাণের সহিত কাহারও প্রাণের যেন দৃঢ় বন্ধন নাই—পরস্পরের প্রতি স্নেহ অনুরাগ বা ভালবাসার

যেন "জমাট" নাই। বড়ই ভয়ঙ্কর কথা! স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ ও মমতা এই সমস্তই সংসারের বন্ধন ও জীবন। এই বন্ধনই যখন শিথিল হইয়া যাইতেছে, তখন সকলেই যে উচ্ছৃঙ্খল হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

দৃষ্টি দৈহিক সুখভোগের প্রতি আবদ্ধ থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে। পরিবারস্থ দায়িত্ববোধসম্পন্ন নর-নারী মাত্রেরই দৃষ্টি এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া যদি কোন মহান্ উচ্চলক্ষ্যের প্রতি আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে পারিবারিক অশান্তি, কলহ বা অপ্রীতিকর সংঘর্ষণের কথা আদৌ শুনিতে পাইবেন না।

যে গৃহের পুরুষ ও মহিলারা মহান্ পরমেশ্বরের কৃপালাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া আত্মাতে তাঁহার ধ্যানারাধনা জনিত আনন্দ সম্ভোগ করেন, সেই গৃহই প্রকৃতপক্ষে গৃহ, সেই গৃহই শান্তি ও পবিত্রতার আলয়, সেই গৃহেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করেন এবং তাহাই স্বর্গের নির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ। সে গৃহের নরনারী, বালক-বালিকা, দাস-দাসী সকলেরই মুখমণ্ডলে এক দিব্য আনন্দ জ্যোতিঃ ক্রীড়া করে এবং চক্ষু হইতে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি নিঃসৃত হয়। পরোপকারই সেই পরিবারের ব্রত; আত্মত্যাগই সেই পরিবারের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। সেই পরিবারের গর্ভস্থ শিশুটী পর্য্যন্ত এই মঙ্গলময়ভাবে ওতঃপ্রোতঃরূপে পরিপূর্ণ!

আমরা আর অধিক কথা বলিব না। আমাদের পারিবারিক দুরবস্থা কেন সংঘটিত হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। পরমেশ্বর আমাদিগকে সুমতি প্রদান করুন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় দাসাশ্রমের আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। এবার আর কোন নূতন আতুর সেবালয়ে আসে নাই। সুতরাং বিস্তৃত রিপোর্ট দেওয়া গেল না। এখন গিরিডিতে ১০ জন আতুর আছে। তন্মধ্যে দামো ও টোকানী জ্বর ও পাঁচড়ায় কিছু কষ্ট পাইয়াছিল। অবশিষ্ট সকলেই ভাল আছে।

দাসাশ্রমের সেবালয়ে এখনও অনেকগুলি আতুরের স্থান হইতে পারে। সুতরাং যদি কোন আশ্রয় পাইবার উপযুক্ত অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক দাসাশ্রমের বন্ধুগণের চক্ষে পড়ে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে আমাদিগকে সংবাদ দেন।

আমরা সকলকে করযোড়ে অনুরোধ করি যেন সকলেই নিজ সাধ্যমত আমাদের সাহায্য করেন।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত দানগুলি আমরা বিগত মাসে প্রাপ্ত হইয়াছি। দীনদয়াল পরমেশ্বর পরদুঃখকাতর দাতাগণের মঙ্গল করুন।

কার্য্যের সুবিধার জন্য আমরা ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব দিলাম। এখন হইতে এক মাসের ২২শে হইতে পরবর্ত্তী মাসের ২১শে পর্য্যন্ত হিসাব দেওয়া হইবে।

অর্থ। দানাধারে প্রাপ্ত /১০, B. Das ৲১০, শ্রীমতী ক্ষেত্রমোহিনী দাসী অক্টোবরের চাঁদা ১৲, ডাঃ দয়ালচন্দ্র সোম।০, গোয়াবাগানের একটী বন্ধু ১৲, বাবু মতিলাল মৈত্র ১, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু পরেশনাথ সেন ॥০, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ॥০, বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ॥০, বাবু তারিণীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, পরলোকগত যাদবচন্দ্র বসুর স্ত্রী মাঃ বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ১৲, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ১৲, ৪১নং পঞ্চাননতলা লেনস্থ ছাত্রগণ।০, A sympathiser।০, বাবু দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৲, বাবু ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় ৲৫, X ৲১০, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ॥০, বাবু মুকুন্দনাথ কুণ্ডু ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা মাসিক চাঁদা ॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲, দুইটী ছাত্র।০, শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র।০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের চাঁদা ৩৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পুত্রের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৲, বাবু সীতানাথ দত্ত।০, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১০৲, ৭নং ছুতারপাড়া ছাত্র-নিবাস মাঃ বাবু গুরুচরণ সমাদ্দার ১৶০, ৪১।১ কলুটোলা মেস্ ॥০, বাবু রাখালদাস মিত্র ॥০, বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যো ৶০, Hindu Hostel Friends' Association কলিকাতা ॥০, দুইটী ছাত্র ৶০, স্বর্গীয় গুণাভিরাম বড়ুয়া রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী সরকার পুরুলিয়া ২৲, ডাঃ পি, সি, রায় ১৲, বাবু রমাপ্রসাদ বসু ১৲, রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় ১৲, বাবু

তেজচন্দ্র বসু ॥০, ২২।২ ছকু খানসামার লেনস্থ ছাত্রগণ ॥০, বাবু গিরিশচন্দ্র দে /০, A friend ৵০, বাবু অমরনাথ দত্ত ৶০, বাবু বরদাপ্রসাদ চালিহা ।০, বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ১৲, জনৈক ভদ্রমহিলা ডিসেম্বরের চাঁদা ১৲, বাবু বিজয়কৃষ্ণ চটো ৵০, ৫।১ মেডিকেল কলেজ ষ্ট্রীট মেস ১৲, ৪৫।৫ বেনেটোলা মেস্ ॥০, ৪৫।৪ বেনেটোলা মেস্ ॥০, ৮৫ হেরিসন রোড মেস্ ।৶০, একটী ছাত্র /০, বাবু কালাচাঁদ মিত্র ।০, A. M. ১৲।

বস্ত্রাদি। বাবু রাধাকান্ত দত্ত ছোট গরম জামা ১০, Head dress ১, ছোট পেণ্টলুন ১, সাদা জামা ৮, কতকগুলি নেকড়া, কোট ১, কয়েকটি ছোট জামা, মোজা, ফ্রক্ প্রভৃতি, টুপী ১, শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র নূতন পর্দ্দা ৩, বেদানা /১॥ দেড় সের, কিস্‌মিস্ /॥ আধ সের, সাগু /১ এক সের; স্বর্গীয়া দুর্গারাণী দাসী নূতন কম্বল ৫, স্বর্গীয় গুণাভিরাম বড়ুয়ার পুত্রের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে Essence of chicken ৫টা, Swiss Milk ১টা, থার্ম্মোমেটার ১টা, শিশি ১৬টা, পিচকারী ১টা, টিনের কৌটা ১টা, Night cap ১টা, Felt cap ১টা, লজেঞ্জুস্ ½ শিশি, Tea cup ১টা, Saucer ১টা, Feeding cup ১টা, বিলাতী শস্য ১ টিন, বিলাতী কম্বল ১জোড়া, নূতন গরম কোট ১টা, ওয়েষ্ট কোট ১টা, গরম পেণ্টলুন ১টা, মশারী ১টা, আসন ১টা, সার্ট ৪টা, কম্ফর্টার ১টা, পা জামা ২টা, গরম মোজা ২ জোড়া, কলার ২টী, এঁড়ির পেণ্টলুন ১টা, এঁড়ির ওয়েষ্ট কোট ১টা, বেল্ট ১টা, সাদা মোজা ১ জোড়া, ষ্টিথস্কোপ ১টা; রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় জ্যাকেট ২টা, ফ্রক ১টা; ব্রাহ্ম-বালিকা বোর্ডিং জামা ৪টী।

অন্যান্য প্রকারের আয়।

ডিস্পেন্সারী হইতে ধার ১০৲, 'দাসী'র কমিশন ৸০, জামা বিক্রয় ৵০, চাউল বিক্রয় ৩৲, বেদানা বিক্রয় ১।/০, পুরাতন কাগজ বিক্রয় ।৵০, Essence of chicken বিক্রয় ৭॥০, Swiss milk বিক্রয় ॥০, শিশি বিক্রয় ।৵০, থার্ম্মোমেটার বিক্রয় ২।০, মনাক্কা বিক্রয় ।০, মশারী বিক্রয় ১৲, পাজামা বিক্রয় ॥০, সুরোজমোহিনী ফণ্ডের সুদ (জুলাই ১৮৯৫ পর্য্যন্ত) ৬০৸৵১০, পুস্তক বিক্রয় /০, ডিস্পেন্সারী হইতে সাহায্য ১৲।

কলিকাতার আয়।

দানপ্রাপ্তি ৬৪॥১৫, অন্যান্য প্রকারে আয় ৮৯৸১০, মোট আয় ১৫৪।/৫।

কলিকাতার ব্যয়।

ডাক খরচ ৸/১৫, কমিশন ৩॥/০, কর্ম্মচারীর বেতন ২৫॥৶১০, গচ্ছিত জমা শোধ ॥০, ভৃত্য ১৲, গিরিডিতে সেবালয়ের জন্য প্রেরণ ২০।৵০, প্যাকিং বাক্স ২৲, ডিস্পেন্সারির ঋণ শোধ ১০৲, মুটে ৻৫, জালা ।০, খাতা ৻১০, ট্রামভাড়া ।১০, গোয়ালার পূর্ব্বের শোধ ৪৲, খুচরা খরচ ॥/১৫।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয়—১৫৪।/৫। মোট ব্যয়—১২৯৶৫। হস্তেস্থিত—২৫৵০।

গিরিডির আয় ব্যয়।

আয়।

কলিকাতা হইতে প্রাপ্ত বিগত মাসের ৮৲, ঐ বর্ত্তমান মাসে ৫০৲, শ্রীমতী প্রভাবতী দাস পচম্বা দান ১৲, তুলসীমণির খোরাকী বাবত প্রাপ্ত ২।০।

ব্যয়।

মালের ভাড়া ১৯৶০, গরুর গাড়ী ও মুটে ভাড়া ১৸১০, কর্ম্মচারীর বেতন ৬৲, সংসার খরচ ৩৪৸১২॥।

মোট আয়—৬১।০; মোট ব্যয়—৬০৸২॥; হস্তেস্থিত—।৶১৭॥।

ভ্রম-সংশোধন।

নবেম্বর মাসের দাসীতে দানপ্রাপ্তির মধ্যে J. G. Banerjiর স্থলে J. K. Banerji এবং সাধুচরণ সাহার স্থলে সাধুচরণ নাথ হইবে।

ডিসেম্বর মাসের দাসীতে "বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যো Sagaing ২, ও বাবু শরৎকুমার সিংহ Sagaing ১৲" ভুলক্রমে প্রাপ্তি স্বীকার করা হয় নাই।

দাসাশ্রম

উদ্দেশ্য।—নানাপ্রকারে বিপদ্‌গ্রস্ত মানবগণের সাধ্যানুসারে হিত-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগের ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে।

সাধারণ বিভাগ।—সেবালয়—ইহা গিরিডিতে অবস্থিত।

"দাসী" বিভাগ।—জনহিতৈষণা প্রবর্ত্তনা ও দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ হইতে "দাসী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

ডিস্পেন্সারি বিভাগ।—দাসাশ্রমকে ঔষধ সাহায্য করিবার জন্য ও ইহার স্থায়ী এবং পাকা আয়ের সংস্থান করিবার জন্য ইহার এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকানা, ৮৬ হারিসন রোড, কলিকাতা।

কার্য্যপ্রণালী।—ইহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া

সম্প্রতি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপার উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা ও কার্য্যে সেইরূপ চেষ্টা করা হয়।

আমরা সমালোচনার্থ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাইয়াছি।

১। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত ও মৈনা, শ্রীহট্ট, হইতে শ্রীঅনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

২। জ্ঞান-প্রসূন—শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এস্, সি, বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

৩। চাট্‌নী—A. Bose কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

৪। কাকাবাবুর গল্প ১ম খণ্ড—১০৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে A. Bose কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

৫। ভারতমঙ্গল, পূর্ব্বখণ্ড—শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

দাসী

তুকারাম।

চতুর্থ প্রস্তাব।

নির্জ্জন প্রকৃতির সহিত সাধক-হৃদয়ের কি একটী মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। সংসারের কোলাহলে হৃদয় শান্তিহীন হইলে, সাধক প্রকৃতির নিস্তব্ধ ক্রোড়ে যাইয়া বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করেন, এবং বহির্মুখীন দৃষ্টি রোধ করিয়া, মনশ্চক্ষুতে আপনার অন্তরাত্মাস্থিত প্রাণারাম প্রভুকে দর্শনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হন। তুকারাম ভাম্বনাথ পর্ব্বতে গমন করিয়া, স্বীয় আরাধ্য দেব বিঠোবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রাম আরাধনা ও চিন্তনের পর, তাঁহার হৃদয় শান্তিলাভ করিল। * এত দিন তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে যাঁহার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এইবার যেন তাঁহার সত্তা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া, তিনি কৃতার্থ হইলেন। বৈষ্ণব সাধকগণ মানবাত্মাকে প্রেমিকা এবং ভগবানকে প্রেমাস্পদরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সংসার-সুখ-মগ্ন মানবের পক্ষে ইহার অপেক্ষা ভগবানের ও ভক্তের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য বোধ হয় আর কোন উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে না। বাস্তবিকও যখন ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম প্রথম উদ্ভূত হয়, তখন তাহা নবানুরাগে হৃদয়কে একবারেই বিগলিত করিয়া দেয়। প্রগাঢ়তায় তখন তাহা পৃথিবীর নরনারীর প্রেমকে শতগুণে অতিক্রম করে। তুকারাম এক্ষণে সেই নবানুরাগে মুগ্ধ হইয়া, সম্পূর্ণরূপেই আত্মবিস্মৃত হইলেন। প্রেমমুগ্ধ মানবের ন্যায়, তিনিও পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা সকলের কথা বিস্মৃত হইয়া, দিবা রাত্রি তাঁহার প্রিয়তমেরই সহবাস-সুখে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

---

* তুকারামের চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে, বিঠোবা প্রথমে কৃষ্ণসর্পের রূপ ধারণ করিয়া তুকারামের চতুর্দ্দিকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তুকারাম তাহাতে বিচলিত না হওয়াতে আকাশবাণী হইল যে, এই কৃষ্ণসর্পই তাঁহার আরাধ্য দেব বিঠোবা। তুকারাম বলিলেন যে, বিঠোবার স্বরূপ মূর্ত্তি ভিন্ন তিনি পরিতৃপ্ত হইবেন না। তখন বিঠোবা স্বীয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই তুকারামের সমীপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

তিনি যখন ভাম্বনাথে এইরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কানাইয়া, তাঁহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে ভাম্বনাথে উপস্থিত হইলেন। অনেক অনুরোধ উপ-রোধের পর, তুকারাম অবশেষে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, ইন্দ্রায়ণীতীরে আগমন করিলেন। সাত দিবসের অনাহারের পর তুকারামের স্নানাহার সম্পন্ন হইলে, কানাইয়া তাঁহাকে আপনাদিগের সাংসারিক অবস্থা জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যবসায়ে তুকারামের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইলেও তাঁহার পিতা লোককে যে সমস্ত ঋণ দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ তখনও তাঁহাদিগের প্রাপ্য ছিল। তুকারাম বিষয়কার্য্যে ঔদাসীন্য বশতঃ এই সমস্ত ঋণ আদায় করিবার চেষ্টা করেন নাই। কানাইয়া এক্ষণে সেই সকল ঋণের কথা উত্থাপন করিলে, তুকারাম তৎসম্বন্ধীয় কাগজ পত্রগুলি আনিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিলেন। কানাইয়া সেইগুলি লইয়া আসিলে তুকারাম বলিলেন, "ভাই, যখন এই সমস্ত ঋণ আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আর এগুলি রাখিয়া অনর্থক দুশ্চিন্তা বাড়াইবার ও বৃথা আশা লইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? এগুলি নদী-জলে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়ঃ।" কানাইয়া বলিলেন, "আপনি সংসারত্যাগী, আপনার পক্ষে ইহা সহজ, কিন্তু আমাকে যখন পরিবারবর্গের ভার বহন করিতে হইবে, তখন আমার পক্ষে এরূপ করিলে চলিবে কেন?" তুকারাম কনিষ্ঠের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, হিসাব মত কাগজ পত্রগুলির অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং নিজের অংশের কাগজগুলি লইয়া, ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তোমরা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও, এই কন্থা আমার শীতাতপের সম্বল হইবে, ভিক্ষাতেই আমি জীবন ধারণ করিব।" এই বলিয়া তিনি কানাইয়াকে বিদায় দিলেন। কানাইয়া সেই হইতে পৃথকরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ভাম্বনাথে নির্জ্জনবাসের পর হইতে তুকারাম চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বীয় সংস্কার অনুসারে প্রাতঃস্নান, দেবমন্দির মার্জ্জন, পুণ্যাহে উপবাস এবং সেই সঙ্গে পূজা, ধ্যান ও নির্জ্জন-আরাধনা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করিলেন। ইন্দ্রিয় দমনের জন্য অল্পাহার আরম্ভ করিলেন এবং নিদ্রার সময় পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমিত করিয়া আনিলেন। দেহুর সমীপে ভাণ্ডার নামক

একটী রমণীয় পর্ব্বত ছিল; সমস্ত দিন সেখানে যাপন করিয়া, সায়াহ্নকালে তুকারাম আনন্দে নৃত্য ও নামগান করিতে করিতে, গ্রামে প্রত্যাগমন করিতেন এবং বিঠোবার মন্দিরে গমন করিয়া, অন্যান্য ভক্তদিগের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত রজনী যাপন করিতেন। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, নানা জনে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিত, "ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে তুকারামের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে"; কেহ বলিত, "না, তিনি যখন ইন্দ্রায়ণীতে আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তখন তিনি স্বার্থত্যাগী ভক্তই বটেন।" আবার অনেকে বলিত, "অন্য উপায়ে উদর পোষণের উপায় নাই দেখিয়া, তুকারাম এই ভাক্ত সাধুর ভাব ধারণ করিয়াছেন।" তুকারাম নিন্দা, প্রশংসা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার গন্তব্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, লোকের গঞ্জনায় তিনি ভীত হইবেন কেন? মহীপতি বলেন যে, "দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইলে, যেমন তাহাতে আর রোগের আশঙ্কা থাকে না, তেমনই তুকারামের অহংভাব যখন অন্তর্হিত হইয়াছিল, তখন আর লোকের সমালোচনায় তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা কি?" তুকারাম আপনার ইচ্ছানুরূপ কখনও ভাণ্ডার পর্ব্বতে, কখনও বা ইন্দ্রায়ণীতীরবর্ত্তী নির্জ্জন তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন। তুকারাম ইন্দ্রায়ণী-তীরে যেখানে বসিয়া ধ্যান করিতেন, তাহার নিকটে এক জন কৃষকের একটী শস্যক্ষেত্র ছিল। কৃষক একদিন তুকারামকে শস্য রক্ষায় নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া বলিল;—"তুকারাম, তুমি ত সর্ব্বদাই এখানে থাক, যদি তুমি আমার শস্যক্ষেত্র রক্ষার ভার লও, তাহা হইলে আমারও কিছু উপকার হয়, আর তোমারও পরিবারবর্গের জন্য, আমি কিছু শস্য সাহায্য করিতে পারি।" তুকারাম কৃষকের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কৃষক তখন তাঁহাকে একটী উচ্চ মঞ্চের উপর বসাইয়া ও শস্যাহারী পক্ষী-দিগকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য তাঁহার হস্তে একটী যষ্টি প্রদান করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিল। তুকারাম রাত্রি দিন সেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, পক্ষিগণ যে কখন শস্যাহার করিতে আসে, তাহা তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। দেখিলেও তিনি ভাবিতেন, "ভগবানের এই সকল ক্ষুধাতুর জীবদিগকে নিষ্ঠুরের মত কেমন করিয়া তাড়াইয়া দিব? বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষের সময় ইহারা পর্য্যাপ্ত আহার পায় নাই। এখন ঈশ্বর-কৃপায় যখন পৃথিবী

শস্যশালিনী হইয়াছে, তখন ইহারাও স্বেচ্ছানুসারে আহার করুক।” দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইলে, তিনি পক্ষীদিগকে বলিতেন, “যদি আহারে তোমাদের তৃপ্তি হইয়া থাকে, তবে যাও, তোমরা জল পান করিয়া আইস।” সন্ধ্যা হইলে তিনি বলিতেন, “অন্ধকারে তোমরা পথহারা হইবে, এখন স্ব স্ব নীড়ে প্রতিগমন কর, প্রভাত হইলে আবার আসিও।” এই বলিয়া তিনি পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দিতেন এবং তাহাদিগের অবস্থা চিন্তা করিয়া ভাবিতেন, এই সকল পক্ষী নিজের ক্ষুধানুরূপ ও দিনের প্রয়োজন মত আহার করে, পরদিনের জন্য কিছুই সংস্থান করে না; হায়! আমার এমন অবস্থা কবে হইবে, যে আমিও ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া, পরদিনের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব!” তুকারাম যেরূপ ভাবে শস্যক্ষেত্র রক্ষারূপ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছিলেন, তাহার অনুমোদন না করিলেও তাঁহার ব্যবহারে যে সরলতা, নির্ভরশীলতা ও জীবের প্রতি অনুকম্পার ভাব বর্ত্তমান আছে, তজ্জন্য তাঁহার প্রশংসা না করিয়া, কেহই নিরস্ত থাকিতে পারিবেন না। তুকারামকে নিশ্চেষ্ট ও পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট দেখিয়া, পক্ষিগণ দলে দলে আসিয়া, শস্য ভোজন করিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষেত্রটী প্রায় শস্যহীন করিয়া তুলিল। মহীপতি বলেন যে “নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ, স্বগৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, যেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন, তুকারাম পক্ষীদিগকে শস্য ভোজন করিতে দেখিয়া সেইরূপ তৃপ্তি অনুভব করিতেন।” এদিকে ক্ষেত্রাধিকারী আপনার কার্য্যহইতে প্রত্যাগমন করিয়া, শস্য ক্ষেত্রের অবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও কুপিত হইলেন। তিনি প্রতিবাসিগণের নিকট তুকারামের ব্যবহার জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতা করিতে বলিলেন। প্রতিবাসিগণ তুকারামকে এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “যে সকল জীব ক্ষুধানুরূপ ভোজন করিয়াই তৃপ্ত হয়, পরদিনের কথা চিন্তা মাত্র করে না, তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া আমি প্রত্যবায়ভাগী হইব কেন? তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য।” ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রপতি তুকারামের কথায় দ্বিগুণ কুপিত হইলেন এবং তুকারামকে অতি কঠোর ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিবাসিগণের বিচারে তুকারাম অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষেত্রাধিকারীর

কথানুরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ শস্যের জন্য দায়ী করিলেন। মহীপতি বলেন, “ভগবানের এমনই করুণা যে, ক্ষেত্রের শস্য একত্রিত হইলে ক্ষেত্রপতির প্রাপ্য শস্য অপেক্ষা তাহা অনেক গুণ অধিক বলিয়া লক্ষিত হইল। প্রতিবাসিগণ ইহা তুকারামেরই ভাগ্য গুণে ঘটিয়াছে এইরূপ ভাবিয়া, তাঁহাকে অতিরিক্ত শস্য প্রদান করিলেন; কিন্তু নিস্বার্থহৃদয় তুকারাম তাহা স্পর্শও করিলেন না।”

তুকারামের পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বম্ভর দেহুতে বিঠোবার জন্য যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সংস্কার অভাবে অনেক দিন হইতে তাহা জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সেইটীর সংস্কার করিতে পারিলে, ভক্তগণ আসিয়া সেখানে হরিপূজা ও হরি-গুণানুকীর্ত্তন করিবেন, এবং তাঁহাদিগের সহবাস হইতে নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া তুকারাম সেই মন্দিরটীর জীর্ণ-সংস্কারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ কোথায়? একরূপ ভিক্ষুকের ন্যায় তিনি দিনপাত করিতেছিলেন, মন্দির সংস্কারের ব্যয় তাঁহার কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য হইতে নিরস্ত হওয়া ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সম্ভব নয়; তুকারাম স্বহস্তে মন্দিরটী সংস্কার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, এবং স্বয়ং মৃত্তিকা খনন করিয়া মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। সদিচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্য কখনও অসম্পূর্ণ থাকে না। তুকারামের প্রতিবাসিগণ তাঁহার দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া, আপনাদিগের সাধ্যানুরূপ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃ মন্দির নির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ সংগৃহীত হইল এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় মন্দিরটী পুনরায় সুন্দররূপ সংস্কৃত হইল। তুকারাম প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে পরিশ্রম করিলেন, এবং নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, সাধারণের সাহায্যে মন্দিরটী রীতিমত প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতে তুকারাম প্রতিদিন নব নব অনুরাগের সহিত বিঠোবার পূজা ও নাম সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য ভক্তগণ যখন অভিনব পদাবলী রচনা করিয়া বিঠ্ঠলের গুণ কীর্ত্তন করিতেন, তুকারামেরও তখন তাঁহাদিগের ন্যায় স্বরচিত পদ বিঠোবাকে উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু তিনি দেখিলেন, যে প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থ সমূহে অভিজ্ঞতা না থাকাতে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য তিনি এই সময় হইতে তাঁহার পূর্ব্বতন

সাধুভক্তদিগের গ্রন্থাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। * মহারাষ্ট্র দেশীয় প্রাচীন ভক্তকবি নামদেবের অভঙ্গ সমূহ পাঠ করিয়া, তিনি ভক্তিতত্ত্বের প্রথম আস্বাদন প্রাপ্ত হইলেন; এবং তাহার পর কবীরের পদাবলী, জ্ঞানেশ্বর † কৃত গীতার ব্যাখ্যা এবং তৎকৃত "অমৃতানুভব" নামক অধ্যাত্মগ্রন্থ, একনাথ ‡ কৃত "ভাবার্থ রামায়ণ" ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যা এবং যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করাতে তাঁহার হৃদয় আরও ভক্তি-বিগলিত হইল। এই সকল গ্রন্থের ভাব ও উপদেশ হৃদয়ে সম্যক্‌রূপ ধারণা করিবার আশায়, তিনি অনেক সময় ভাণ্ডার পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি স্বভাবতঃ অতি তীক্ষ্ণ ছিল, তাহার উপর অন্য কার্য্য বিরহিত হইয়া, দিবারাত্রি তচ্চিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ হওয়াতে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধীত গ্রন্থ সমূহে সম্যক্ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। যে সকল মহাপুরুষের গ্রন্থাবলী তিনি পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের জীবনের ইতিহাসেও তাঁহার হৃদয়ে অতি গভীর ভাব মুদ্রিত করিল; পুনঃ পুনঃ ধ্যান, ধারণা ও নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা তিনি তাঁহাদিগের পদাঙ্কের অনুসরণ করিবার জন্য আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

---

* নামদেব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পুর্ব্ববর্ত্তী মহারাষ্ট্র সাধুগণ কেবল নীরস বৈদান্তিক তত্ত্ব-সমূহেরই আলোচনা করিতেন। নামদেবই প্রথমে মহারাষ্ট্র দেশে ভক্তি তত্ত্বের প্রচার করেন। এইজন্য মহীপতি প্রভৃতি ভক্তচরিতাখ্যায়কগণের গ্রন্থে তিনি উদ্ধবের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। নামদেবের রচিত কোন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার প্রণীত বহুসংখ্যক "অভঙ্গ" মহারাষ্ট্র দেশে এখনও প্রচলিত আছে। অনেকে তুকারামকে নামদেবের অবতার বলেন।

† জ্ঞানেশ্বর নামদেবের সমসাময়িক ছিলেন। নামদেব যেমন ভক্তিতত্ত্বের প্রচারক, ইনি তেমনি জ্ঞানমার্গের উপদেষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর রচিত গীতাব্যাখ্যা এক অতি বিস্তীর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। মহারাষ্ট্র দেশে তাহা জ্ঞানেশ্বরী নামে পরিচিত ও বেদাদি গ্রন্থের নাম সমাদৃত। ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, ইনি প্রথমে কেবলই জ্ঞান মার্গের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু নামদেবের সহিত সহবাস হইতে পরে ভক্তিতত্ত্বের মাধুর্য্য অনুভব করিতে শিক্ষা করেন।

‡ একনাথ মহারাষ্ট্র দেশীয় একজন অতি প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। এবং জ্ঞানেশ্বর কৃত টীকার পরিভাষা রচনা করেন। তুকারামের ন্যায় ইহাঁরও জীবন ভগবদ্ভক্তি ও জীবানুকম্পার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। আমরা নিম্নে একনাথের মহানুভবতার দুই একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি ;—

একটা কৈফিয়ৎ।

এম্-এ পাস করিয়া স্কুলমাষ্টার কেন হইলাম? এ প্রশ্ন অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে। হাকিমি পরীক্ষা দিলাম না কেন? ওকালতী করিলাম না কেন? জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলাম না কেন? এই প্রকারের কতশত প্রশ্ন, কেহ গম্ভীরভাবে, কেহ বিদ্রূপচ্ছলে, কেহ দুঃখভরে, বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এম্-এ পাস করিয়া স্কুলমাষ্টার হইয়াছি, এই সংবাদ শ্রবণে, আত্মীয়কুটুম্বদের মধ্যে একটী হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল, গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

একবার একটী চণ্ডাল রমণী, আপনার শিশু পুত্রকে নদী সৈকতে রাখিয়া, গোময় সংগ্রহে গমন করিয়াছিল। কার্য্যব্যপদেশে তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটিল। এদিকে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে নদীতীরস্থ বালুকা উত্তপ্ত হওয়াতে বালক যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু চণ্ডাল বালককে স্পর্শ করিয়া কেহই আপনাকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দুই একজন মুখে একটু অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু বালককে স্পর্শ করিয়া স্থানান্তরিত করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। একনাথ সেই সময়ে স্নানান্তে গৃহে প্রতিগমন করিতেছিলেন। তিনি সেই রোরুদ্যমান ও ধূলিধূসরিত বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগের গৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার স্নান করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর একবার একনাথের গৃহে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদিগের ভুক্তাবশেষ প্রাপ্ত হইবার আশায়, অনেকগুলি নীচজাতীয় দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে একটী বালক সমাগত অতিথিগণের নিমিত্ত প্রস্তুত খাদ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য, ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। বালকের পিতা মাতা যখন বালককে প্রবোধ দিতেছিল, তখন তাহাদিগের কথোপকথন একনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বালকের ব্যাকুলতা দেখিয়া, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের আহারের পূর্ব্বেই বালকের অভিলষিত খাদ্য তাহাকে প্রদান করিলেন। নিমন্ত্রিতগণ একনাথের এরূপ ব্যবহারে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এই অপরাধের জন্য একনাথকে পরে বিশেষরূপে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

অন্য এক সময়ে একনাথ যখন স্নানান্তে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিষ্ণুতা পরীক্ষার জন্য একটী দুষ্টপ্রকৃতি লোক তাঁহার দেহে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিল। একনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া পুনর্ব্বার নদীতে স্নানার্থ গমন করিলেন, প্রত্যাগমনের সময় সে ব্যক্তি পুনর্ব্বার সেইরূপ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। একনাথ সেবারও কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। এইরূপ দুই তিন বার স্নানের পরও যখন একনাথ অবিচলিত রহিলেন, তখন সে ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত হইল। সে অনুতপ্ত হৃদয়ে একনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং সেই দিন হইতে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

একনাথের সহৃদয়তা সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক উপদেশপূর্ণ ঘটনা শ্রুত হওয়া যায় ;—বাহুল্যভয়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিতে নিরস্ত হইলাম। পূর্ব্বগামী এই সকল মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত হইতে তুকারাম যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা অতিরিক্ত।

যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, আমি উকীল হইয়া তাঁহাদের কাগজ পত্র বিনি পয়সায় দেখিয়া দিব, তাঁহারা হতাশ হইলেন; যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, আমি হাকিম হইয়া তাঁহাদের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ সন্তানগণের চাকরী করিয়া দিব, তাঁহারা নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইলেন। গ্রামে গিয়া আর মুখ দেখাইতে পারি না—যে আমাকে সম্মুখে দেখে সেই বলে, 'ছি! এ কি করিলে? শেষে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া খাইতে হইল।' যাহারা আমাকে একটু ভয় করিয়া চলিত, তাহারা আমার সঙ্গে এয়ারকি দিতে আরম্ভ করিল—যাহারা আমার সাক্ষাতে তামাক খাইতে সঙ্কুচিত হইত, তাহারা অবাধে আমার মুখের উপর ধূম উদ্গীরণ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। পিতার মুখ ভার, মাতার মুখ ভার, ভগিনীদের মুখ ভার; আমি যেন কোন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর জমী কাড়িয়া লইয়াছি, কি রত্নাকরের মত একটী পাপের বোঝা ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছি, বাড়ীর সকলকে তাহার অংশ দিতে চাহিতেছি। শ্বশুর বাড়ীতেও সেই প্রকার ভাব। সম্পর্কে একজন শালী আমাকে পোষাক পরিতে দেখিয়া বলিল, 'একি গো চাটুয্যে মশায়, মেষ্টের কি আবার পোষাক পরে নাকি? আমার শ্বশুর বাড়ীর ছেলেদিগকে একজন মেষ্টের পড়ায়; সে ত কই পোষাক পরে না।' আমি একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলাম, 'না মাষ্টারদের পোষাক পর্‌তে নেই বটে; তবে আমি স্কুল পর্য্যন্ত পোষাক পরে যাই, কিন্তু যখন ছেলে ঠেঙ্গাই, তখন পোষাক খুলে ফেলে মালকোচ্ছা মেরে কাপড় পরি।' তখনকার মনের অবস্থা একটু একটু মনে পড়ে; তখন চামড়াটা বড় পাতলা ছিল—একটু বিদ্রূপের কথা শুনিলেই, একটু অবজ্ঞার হাসি দেখিলেই প্রাণে বড় আঘাত লাগিত—মাথাটা গরম হইয়া যাইত, বিষ্ণুতেল মাখিবার সংকল্প করিতাম; এক একবার নির্জ্জনে গিয়া বলিতাম, 'বসুমতী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি;' কখন কখন ইচ্ছা হইত, এম্পিডোক্লিসের মত একটা আগ্নেয়গিরির মধ্যে প্রবেশ করি;—কখন হ্যাম্‌লেটের মত বলিতাম,—

"To be, or not to be; that is the question.
Whether it is nobler in the mind to suffer
The stings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them?—To die, to sleep—
No more: and by a sleep, to say we end
The heartache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to—it is a consummation
Devoutly to be wished."

সে দুঃখের কথা আর কি বলিব—আহারে সুখ ছিল না, নিদ্রায় সুখ ছিল না, কথাবার্ত্তায় সুখ ছিল না; কেবল ভাবিতাম—'কি হইল, কি হইল!' কিন্তু সময় বড় সুচিকিৎসক—সময়ে সকল প্রকারের মানসিক ব্যাধিরই হ্রাস হয়। আর ভগবান হয়ত দেখিলেন, লোকটা ত রসাতলে যায়, একটা বিধান করা দরকার। ক্রমে ক্রমে ক্ষত চর্ম্মের ভিতর হইতে স্থূলচর্ম্ম গজাইতে লাগিল; অবশেষে আমি pachydermatous (স্থূলচর্ম্মী) হইয়া পড়িলাম। বিদ্রূপ উপহাসের তীক্ষ্ণ শরে চর্ম্ম আর বিদ্ধ হয় না—মনে আর বিজাতীয় কষ্টের উদয় হয় না। আর ক্ষত সারিবার একটী ঔষধও পাইয়াছিলাম। শক্তিশেল-বিদ্ধ লক্ষ্মণ ঠাকুর বিশল্যকরণীর গুণে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন; আমি শঙ্কর ঠাকুরের

'মা কুরু ধনজনযৌবন গর্ব্বং।"
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং॥ ইত্যাদি

পাঠ করিয়া মনকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলাম। আহা, যে পরীক্ষায় ফেল হয়,—যাহার মাহিনা বাড়িবার আশা থাকে না, যে সাহেবের কর্কশ কথায় দিবানিশি জর্জ্জরিত, গৃহে গৃহিণীর 'উগ্রচণ্ডা' মূর্ত্তি দেখিয়া যাহার প্লীহা সর্ব্বদা চমকিত, তাহার পক্ষে শঙ্কর বাবাজীর কথাগুলি কেমন মিষ্ট,—কেমন শ্রুতিমধুর! অন্য সময়ে অর্থাৎ সুখ ও সম্পদের সময় অবশ্য শঙ্করের মোহ-মুদ্গর 'Irrelevant' বলিয়া মনে হয়। যে প্রকারেই হউক, এখন আমি স্থূলচর্ম্মী হইয়া এ প্রশ্নের দুই চারিটা উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছি। যিনি যে প্রকারের লোক, বুঝিয়া সুজিয়া তাঁহাকে একটা না একটা কৈফিয়ৎ দিতে শিখিয়াছি। যদি কোন ভদ্রলোক আমাকে এ প্রশ্ন করেন, তখন বিনীত ভাবে উত্তর দি, "মশায়, এ সব কপালের লিখন; বিধাতা ঠাকুর আঁতুড়-ঘরে আমার কপালে 'বেগুন পোড়া ভাত'এর টিকিট মারিয়া দিয়াছিলেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের Chancellor মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এম্-এ উপাধি দিয়াছেন, তাঁহার ত আর বিধাতাপুরুষের উপর কলম চালাইবার সামর্থ্য নাই, আর 'বেগুন পোড়া' কাটিয়া 'পোলাও, কালিয়া'ও লিখিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং এই অবস্থাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।" যদি কেহ দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁহাকে বলি, "আপনি আমাকে যতটা অসুখী বিবেচনা করেন, আমি ততটা অসুখী নই, সুতরাং আপনার দুঃখ প্রকাশ করিবার বিশেষ কিছু আবশ্যকতা নাই; সহানুভূতি দেখাইবার অন্য অনেক

স্থল আছে, সেইখানে যান; আর যদি তেমন স্থান আপাততঃ না মিলে, তবে এখন সে প্রবৃত্তিটাকে bottle up করিয়া রাখুন, স্থল বিশেষে ছাড়িবেন,—বিশেষ কাজে লাগিবে।" এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এ উত্তরে সন্তুষ্ট নহেন এবং আমাকে জোর করিয়া অসুখী করিতে চাহেন। তাঁহাদিগের মাথাটা খালি কি নিরেট, পরীক্ষা করিবার জন্য একবার বাজাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ প্রকার কার্য্য ফৌজদারী আইনের কোনও ধারার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এই ভয়ে নিরস্ত হই।

সে যাহা হউক, এখন স্কুলমাষ্টারির দিকে কি প্রকারে আকৃষ্ট হইলাম, তাহারও বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি। ছেলেবেলা হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি। কবিতা রোগটা হামের মত একবার না একবার সকলকেই ধরে; আমাকেও ধরিয়াছিল। সুতরাং টাকা-আনা-গণ্ডাবিমিশ্রিত সংসারের বড় একটা ধার ধারিতাম না,—কল্পনা-পক্ষ অবলম্বন করিয়া আকাশে উঠিয়া সান্ধ্যগগনের উজ্জল আভা উপভোগ করিতাম; কখনও বা মেঘ-শয্যায় শয়ন করিয়া মধুর জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্নরাজ্যে ভাসিয়া বেড়াইতাম; অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে, কি মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে, কি ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, কি পরিবারের গহনা প্রস্তুত করিতে হইবে, এ সমস্ত চিন্তা মনের মধ্যে বড় একটা আসিতে দিতাম না। যদি কখনও ঘরকন্না করার চিন্তা আসিত, তখন সামুয়েল রজার্সের কবিতা আওড়াইতাম;

"Mine be a cot beside the rill,
A bee-hive's hum shall soothe my ear,
A willowy brook that turns a mill
With many a fall shall linger near."

শেষে যখন সংসারে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলাম, তখনও কবিতা আমাকে ছাড়ে নাই। ভাবিলাম, কি করিয়া জীবন কাটাই? আইন ত কিছুই মাথায় ঢোকে না। কি করিয়াই বা ঢুকিবে? সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের চিতানলের প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা দেখিব, না মহম্মদীয় আইনের 'চুল চেরা' হিসাব কণ্ঠস্থ করিব? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Tintern Abbey পড়িব, না Evidence Actএর Relevancy আর Irrelevancyএর মারপেঁচ ঠিক করিব? শেলীর স্বপ্নময় রাজ্যে ভাসিব, না শুষ্ক দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইব? আইন কিছুতেই মাথায় ঢুকাইতে পারিলাম না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই আমার মাথাটা খাইয়াছিল।

'Plain living and high thinking are no more.'

এই ছত্রটা যদি না পড়িতাম, আর যদি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিজ জীবনে এই Plain living আর High thinkingএর পরিচয় না পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এই চাকরীটার দিকে এত আকৃষ্ট হইতাম না। বিধাতা পুরুষের লিখনটা সত্য হওয়া চাই কিনা, তাহারই জন্য কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জীবনী এত ভাল লাগিয়াছিল। শেষে ঠিক করিলাম, স্কুল-মাষ্টারের জীবনে এই দুই পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে; স্কুল-মাষ্টার 'বেগুন পোড়া ভাত' খাইয়া মহতীচিন্তায় আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারেন। করেন আর না করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার পর 'বুনো রামনাথের' গল্প পড়িলাম, ডাইয়োজিনিস্ ও সক্রেটিসের বিষয় কিছু কিছু পড়িলাম। সকলেই ঐ কথা বলিল। পাঠক মহাশয়, এই সকল পণ্ডিতগণের নাম পড়িয়া যেন ভাবিবেন না, যে আমিও পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়াছি। আমি কেবল নিজের সাফাইয়ের জন্য তাঁহাদের দোহাই দিলাম; ইহা ছাড়া আমার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। যাহা হউক, এই প্রকারেই স্কুল-মাষ্টার হইলাম।

এখন দেখিতেছি যে এ চাকরীটি নিতান্ত মন্দ নহে। অর্থেরই যাহা কিছু কষ্ট, তাহা ছাড়া অপর সব দিকেই ভাল। অর্থকষ্ট যাহাতে বোধ করিতে না পারি, তাহার জন্য অনেক সংস্কৃত বচন সংগ্রহ করিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না। এ চাকরীতে এজলাস আছে, summary power (সরকারি বিচার ক্ষমতা) আছে, হকিয়তের বিচার আছে, simple hurt, grievous hurt আছে, জরিমানা আছে, সেলাম আছে, solitary confinement আছে—আর উপরি পাওনাও, কিছু কিছু, আছে। উপরি পাওনার মধ্যে—মাঝে মাঝে সুমিষ্ট বিশেষণ সংযুক্ত নাম স্কুল-ঘরের দেওয়ালে দেখিতে পাওয়া যায় (কারণ আজকালকার ছেলেরা এতই 'উদার চরিত'* যে মাষ্টারকে সহজেই বৃহৎ কুটুম্ব মনে করে); আর মাঝে মাঝে প্রশ্নের Original রকমের উত্তর পাওয়া যায়। যথা—

Question—When was Cromwell born?
Answer—In the year 1649 when he was fourteen years old.
Question—Describe his continental policy.
Answer—He was honest and truthful and he had nine children.
Question—What is the adjective of Ass?
Answer—Assansole.
Question—Who was Chandra Gupta.
Answer—Chandra Gupta was the grand-daughter of Asoka.

* "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" বিষ্ণু শর্ম্মা।

এই প্রকার উত্তরজনিত সুবিমল আনন্দ ভোগ আর কাহারও কপালে ঘটে না। তাহারই জন্য বলিতেছি, চাকরীটি নিতান্ত মন্দ নহে। তবে অনেকে বলেন, স্কুল মাষ্টারী করিলে কিছুকাল পরে চতুষ্পদ জীবের মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়। পাঠক মহাশয়, ইহার বিচার করিবেন। আমার এ কথার উত্তর দিতে সময় নাই—আর ইচ্ছাও নাই; ভয়, পাছে কর্কশ কথা বাহির হইয়া পড়ে; অনেক কষ্টে মনকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি।

উপনিষদের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত।

ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদাংশকে উপনিষদ্ বলে। বেদের দুইটি প্রধান বিভাগ,—সংহিতা বা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। সংহিতার সাধারণ বিষয় নানা দেব-দেবীর স্তুতি; ব্রাহ্মণের সাধারণ বিষয় যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যাদির বিধান। কিন্তু সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়েরই মধ্যে উপনিষদ্ সন্নিবিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণসমূহের অভ্যন্তরে 'আরণ্যক' নামক কতিপয় গ্রন্থ আছে; অধিকাংশ উপনিষদ্ এই সমুদায় আরণ্যকের অন্তর্গত।

উপনিষদ্ নামধারী ন্যূনাধিক ২৫০ খানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই বেদের অন্তর্গত। ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, এই দশ খানি উপনিষদ্ অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৌষীতকী, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণী এই তিন খানিও বিশেষ মান্য। সচরাচর ১০৮ খানা উপনিষদের নাম করা হয়। কিন্তু এই ১০৮ খানার মধ্যেও অনেক গুলিকে বেদাংশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। উপনিষদ্ শ্রুতির অন্তর্গত; বিশেষতঃ ইহা পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক। এই জন্য শাস্ত্রবাদী হিন্দুর নিকট ইহা অসীম সম্মানের বস্তু। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক লেখকগণ আপনাপন সঙ্কীর্ণ মত প্রচারের জন্য উপনিষদ্ নাম দিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সকল সাম্প্রদায়িক উপনিষদে পুরাণোক্ত নানা পরিমিত দেবতা পরব্রহ্মের স্থান অধিকার করিয়াছেন। আধুনিক পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই সমুদায় সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্‌কে বেদাংশ বলিয়া গ্রহণ করেন না। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য উপরোক্ত ১০ খানি এবং শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য করিয়াছেন। অন্য কোন উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছিলেন কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। "বেদান্তসূত্র"কার

উপরোক্ত ১০ খানি এবং 'কৌষীতকী' অবলম্বনে সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন। শ্বেতাশ্বতর বেদাংশ কি না, এই বিষয়ে মতভেদ আছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ উপরোক্ত ১০ খানি প্রাচীন উপনিষদের উপর নির্ভর করিব এবং 'শ্বেতাশ্বতর' সম্বন্ধে স্বতন্ত্ররূপে আলোচনা করিব।

'উপনিষদ্' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। ইহার ধাত্বর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 'উপনিষদে'র সাধারণ অর্থ ব্রহ্ম-বিষয়ক গভীর ও গূঢ় জ্ঞান। উপনিষদের অপর নাম 'বেদান্ত'। এই নাম পরে দেওয়া হয় নাই, উপনিষদেই আছে। বেদান্তের অর্থ বেদের অন্তভাগ বা বেদের মীমাংসা। কিন্তু উপনিষদ্ বেদান্ত-শ্রুতি, বেদান্ত-দর্শন নহে। উপনিষদ্ সমূহ প্রণালী-বদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ নহে। ইহাদের ভিতরে একটি দার্শনিক তন্ত্র অর্থাৎ systemএর উপকরণ নিহিত আছে। এই উপকরণগুলি যথাযথরূপে সন্নিবেশ ও ব্যাখ্যা করিয়া যে কোন গ্রন্থ লেখা যায়, তাহারই নাম বেদান্ত-দর্শন। এইরূপ অনেক গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। তন্মধ্যে উপরোক্ত "বেদান্ত-সূত্র"ই প্রধান। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা—'ব্রহ্মসূত্র', 'শারীরকসূত্র', 'ব্যাসসূত্র', 'বাদরায়ণসূত্র', 'শারীরক মীমাংসা', 'উত্তর মীমাংসা'। এই 'বেদান্তসূত্র' আবার ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, ইহাদের মত পরস্পর হইতে ভিন্ন হইলেও ইহারা সকলেই বৈদান্তিক। এদেশে শঙ্করের ব্যাখ্যাই চলিত, এবং বেদান্তমত বলিতে লোকে শঙ্করের মতকেই বুঝে। কিন্তু এরূপ বুঝা ভুল। একজন বেদান্ত-মতাবলম্বী হইতে পারে, অথচ বেদান্তমতের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শঙ্কর ও তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত তাহার যথেষ্ট পার্থক্য থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে এরূপ ব্যক্তির রামানুজ প্রভৃতি শঙ্করবিরোধী ব্যাখ্যাকারিদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াও আবশ্যক নহে। উল্লিখিত ব্যাখ্যাকারগণ উপনিষদ্ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, উপনিষদের প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠক তাহা করিতে পারেন, অর্থাৎ স্বয়ং উপনিষদ্ পাঠ করিয়া নিজের চিন্তার সাহায্যে উপনিষদের মতামত স্থির করিতে পারেন।

সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন, বেদান্তমতের তিনটী প্রধান স্তর আছে। প্রথম স্তর-প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদ্ সমূহ। দ্বিতীয় স্তর—"ব্রহ্মসূত্র।"

তৃতীয় স্তর—শঙ্কর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকদিগের বেদান্তমত-প্রতিপাদক গ্রন্থাবলী। আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া একবারে প্রথম স্তরে যাইব, এবং উপনিষদের তাৎপর্য্য গ্রহণ সম্বন্ধে উপরোক্ত বৈদান্তিকগণের সাহায্য গ্রহণ করিব বটে, কিন্তু নিজের স্বাধীন চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া অন্ধভাবে তাঁহাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিব না; যথাসাধ্য নিজ চিন্তা দ্বারা উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

কালের বিচিত্র গতিতে আমরা এরূপ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে আমরা এখন দেশীয় বস্তু অপেক্ষা বিদেশীয় বস্তুই অধিক জানি। হ্যামিল্টন্, ম্যান্সেল; মিল্, স্পেন্সার; ক্যাণ্ট্, হেগেল প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের সহিত অনেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। কিন্তু বেদ বেদান্তাদি দেশীয় শাস্ত্র ও দর্শনলেখকগণের নাম পর্য্যন্ত অনেকের শ্রবণগোচর হয় নাই। আজকাল শাস্ত্রালোচনার পুনরুত্থান হওয়াতে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত সন্তোষকর অবস্থা উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, অধিকাংশ ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তির যে দশা, এই প্রবন্ধলেখকেরও সেই দশা। দেশীয় দর্শনালোচনার পূর্ব্বে ইওরোপীয় দর্শন আলোচনা করিয়াছিলাম, এবং বলিতে গেলে ইওরোপীয় দর্শনের সাহায্যেই দেশীয় দর্শন বুঝিতে পারিতেছি; এবং বোধ হয় উপনিষদের দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যথাসম্ভব ইওরোপীয় দার্শনিক মতের সহিত এই মতের সাদৃশ্য দেখাইলে অনেক পাঠকের পক্ষে বুঝিবার সাহায্য হইবে। সুতরাং আমরা তাহাই করিব। ইওরোপে যাহাকে Absolute Idealism বলা হয়, ইংলণ্ডে ষ্টার্লিং, গ্রীণ, কেয়ার্ড, ব্র্যাড্লি প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণ যে মতের ব্যাখ্যাকার, সেই মতের সহিত বেদান্তমতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। যথাস্থানে এই সৌসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইবে।

উপনিষদ্-লেখকগণ ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করেন, আমরা প্রথমতঃ এই বিষয়ের আলোচনা করিব। আমাদের উল্লিখিত তৃতীয় স্তরের বৈদান্তিকগণ বেদশাস্ত্রকে অভ্রান্ত প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই বেদ অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল। বেদ ও বেদান্তশ্রুতি কোন বিষয়ে এরূপ কি ওরূপ বলিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই তাঁহারা মনে করিতেন, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। সেই বিষয়ে আর ব্যক্তিগত যুক্তি তর্ক বা অনুভব কোন

কার্য্যকর নহে। উপনিষদের লেখকগণের মধ্যে এরূপ আত্যন্তিক শাস্ত্রাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা নিজ মত সমর্থনের জন্য স্থানে স্থানে বেদের সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কেহ কেহ নিষ্ঠার সহিত বেদাধ্যয়নের বিধি দিয়াছেন বটে, কিন্তু কুত্রাপি বেদমন্ত্রকে শেষ প্রমাণ বা নির্ভর স্থল বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা স্বাধীন-চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে পরোক্ষভাবে পূর্ব্বরচিত শাস্ত্র এবং তৎকালে বর্ত্তমান আচার্য্যগণের উপদেশের উপর এবং সাক্ষাৎভাবে নিজ নিজ তপস্যা ও অনুভবের উপর নির্ভর করিতেন এবং শিষ্যদিগকেও তদ্রূপ করিতে উপদেশ দিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সেই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এই প্রণালী নির্দ্দিষ্ট ছিল। শিক্ষার্থী প্রথমতঃ নিয়মিত বেদাধ্যয়ন, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবেন। যখন বুঝিবেন, ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নিত্য বস্তুকে জানা যায় না, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের নিকট গমন করিবেন। আচার্য্য শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত বোধ করিলে তাঁহাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবেন। তিনি, "বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর," বলিয়া তাঁহার মনে কৃত্রিম বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া যাহাতে তাঁহার প্রজ্ঞা-চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, যাহাতে তিনি নিজ প্রজ্ঞা-চক্ষুদ্বারা জগতে ও নিজ আত্মাতে ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারেন, তদনুরূপ উপদেশ দিবেন। আচার্য্যগণ কিরূপ যুক্তি-বাণ অবলম্বনপূর্ব্বক শিষ্য-হৃদয়ের ভ্রান্ত সংস্কার ও সন্দেহরূপ আবরণ ছেদন করিতেন, কিরূপে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিতেন, এই সকল বিষয় উপনিষদ্ পাঠে প্রায় কিছুই জানা যায় না। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ সমূহের ন্যায় উপনিষদ্ সমূহ প্রণালীবদ্ধ সূক্ষ্ম বিচারে পরিপূর্ণ নহে। এই সকল গ্রন্থে প্রায় সর্ব্বত্রই কেবল ঋষিদিগের গভীর বিচার ও সূক্ষ্ম দর্শনের শেষফল মাত্র সন্নিবিষ্ট আছে। এই সকল ফল যে দীর্ঘকালব্যাপী বিচার, আলোচনা ও গভীর ধ্যান দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর ঋষিগণ যে কোন কোন সঙ্কীর্ণ, স্থূলদর্শী সাম্প্রদায়িকগণের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানকে অলৌকিক অনুপ্রাণনের (Supernatural Inspiration) ফল মনে করিতেন না, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের 'একচেটিয়া' মনে করিতেন না, বিশুদ্ধ-চিত্ত এবং চিন্তা ও ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই লভ্য মনে করিতেন,

তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমরা মুণ্ডক ও প্রশ্ন উপনিষদ্ হইতে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ডে,—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ন্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১২॥
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় সমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥১৩॥

"কর্ম্মলব্ধ লোক সকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন; কর্ম্মদ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না। তাহা জানিবার জন্য তিনি সমিধ্ (অর্থাৎ হোমাগ্নি জ্বালনার্থ কাষ্ঠ) হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবেন। সেই বিদ্বান্ সম্যক্‌রূপে প্রশান্তচিত্ত, শমগুণান্বিত, তদীয় সমীপগত ব্যক্তিকে যদ্দ্বারা সেই অক্ষয় সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন।"

প্রশ্নোপনিষদের প্রারম্ভেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশা প্রভৃতি ছয়জন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, ঋষি পিপ্পলাদের নিকটে সমিধ্ হস্তে উপস্থিত হইলে সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

ভুয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥

অর্থাৎ—"পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বন পূর্ব্বক সংবৎসর যাপন কর, তৎপর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও, যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদায় বলিব।" তৎপর সংবৎসরান্তে সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ পুনরায় উপস্থিত হইলে ঋষি তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

ব্রহ্ম যে বিশুদ্ধ জ্ঞানগম্য বস্তু এই বিষয়ে উপনিষদের অসংখ্য শ্লোকের মধ্য হইতে ২।৪টী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রাথমিক প্রবন্ধ শেষ করিব।

কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে,—

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥১২॥

"এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাঁকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন।"

উক্ত উপনিষদের ষষ্ঠ বল্লীতে—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৯॥

"ইঁহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না, কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। হৃৎস্থিত সংশয়-রহিত মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।"

দ্বিতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ডে,—

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৭॥
হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥৯॥

"যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহাকে জ্ঞানিগণ গভীর জ্ঞান দ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করেন।" "হিরণ্ময় (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানালোকিত) শ্রেষ্ঠ [আত্মরূপ] কোষ মধ্যে নির্ম্মল, অখণ্ড ব্রহ্ম [প্রকাশিত আছেন]। তিনি শুদ্ধ, জ্যোতিষ্মদ্ বস্তুসমূহের জ্যোতিঃ, তিনি[ই সেই বস্তু] যাঁহাকে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন।"

তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডে—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব—
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮॥

"[পরমাত্মা] চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাকেরও গ্রাহ্য নহেন; অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন; তপস্যা ও কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা (অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা) বিশুদ্ধান্তঃকরণ [হইয়া সাধক] অতঃপর ধ্যানযোগে নিরবয়ব [পরমাত্মা]কে দর্শন করেন।"

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

স্বরলিপি।

লিখিত বিদ্যা আর কণ্ঠস্থ বিদ্যায় তুলনা করিলে প্রভেদ এই দেখা যায়, যে কণ্ঠস্থ বিদ্যা যেমন ক্রমে ঝাপ্‌সা হইয়া আইসে, লিখিত বিদ্যা তেমন নহে।

আমাদের দেশীয় সংগীতে এত মতভেদ এবং অনিশ্চয়তা লক্ষিত হইবার কারণ কণ্ঠস্থ বিদ্যা। ইউরোপীয় সংগীতের সম্বন্ধে এক এক মুনির এক এক মত হয় না, কারণ তাহাদের বিদ্যা লিখিত বিদ্যা। গীতের সুর লিখিবার প্রণালী যদি আগে আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটা দাঁড়াইবার জায়গা থাকিত। আজকাল আমাদের সংগীতের এ অভাব দূর হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটি ঔষধ-জাত ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে। এ পথে যাঁহার একটু গতিবিধি আছে, তিনিই আপনাকে একটা স্বরলিপির প্রণালী উদ্ভাবন করিতে বাধ্য মনে করিতেছেন। ইহার ফলে পেটেণ্ট-ঔষধ-সেবী ম্যালেরিয়া রোগীর ন্যায় শিক্ষার্থী বেচারারা যার পর নাই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থায় পড়িয়াছে।

এক একটা স্বরলিপিকে ধরিয়া সমালোচনা করিয়া দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা স্বরলিপির প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগকে কিছু বলাও যথেষ্ট সাহসের কর্ম্ম। কারণ লেখক নেতৃত্বের ধাপ হইতে আজও অনেক নীচে রহিয়াছে। সুতরাং কেহ যদি মুখ ভার করিয়া বলেন যে "তোমারই বুঝিবার গোল," তবে আর বেচারার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। যাঁহারা এ বিষয়ের চর্চ্চা করেন, অথচ কোন বিশেষ পদ্ধতির প্রবর্ত্তক নহেন, তাঁহাদেরই নিকট আমার বিনীত নিবেদন। কয়েক বৎসর যাবৎ শিক্ষা ও শিক্ষকতা উভয় কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিয়া এ বিষয়ে যাহা অনুভব করা গিয়াছে, তাহা সাধারণের বিচারার্থ উপস্থিত করিলে উপকার পাইতে পারি, আশা আছে।

প্রথম কথা এই যে স্বরলিপির বিভিন্নতা চিহ্নের চেহারার উপরে তত নির্ভর করে না; প্রণালীর ভিতরে ইহা অপেক্ষা গভীরতর পার্থক্য থাকা চাই। তাহা না হইলে তুমি যেরূপ একটা চিহ্ন মাথায় লিখিয়া যাহা প্রকাশ কর, আমি অবিকল সেই অর্থব্যঞ্জক সহস্র প্রকারের চিহ্ন উপরে নীচে পাশে বসাইয়া ততোধিক প্রকারের স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে পারি। তুমি মাথায় অর্দ্ধচন্দ্র লিখিয়া আধ মাত্রা বুঝাও, আমি পাশে ½ লিখিয়া বা ঃ লিখিয়া ঠিক্ ঐ ভাবটি প্রকাশ করিয়া মনে করিতে পারি যে একটা নূতন স্বরলিপি আবিষ্কার করা হইল। আসল কথা, মাত্রার জন্য স্বতন্ত্র একটা চিহ্ন সুরের সঙ্গে যোগ করিয়া দিলেই একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বরলিপি হইল। তা সেই মাত্রাবোধক চিহ্ন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি যেরূপ আকারেরই হউক না,

আর তাহাকে স্বরাক্ষরের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঊর্দ্ধ অধঃ ইত্যাদি যেরূপ স্থানেই লেখা হউক না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে "মাত্রার জন্য স্বতন্ত্র চিহ্ন থাকিবে না, তবে স্বরলিপি হইবে কি করিয়া?" উত্তরে দুই জন শিক্ষকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এক জন শিক্ষার্থীকে বলেন, "এ সুরটাতে আধ মাত্রা দেও, এটাতে পৌণে দুই মাত্রা দেও, ইত্যাদি।" এই হুকুম তামিল করিতে শিক্ষার্থীর কি পরিমাণ ঘর্ম্ম গলিত হইবে, একবার দেখুন। মাত্রার সূক্ষ্ম ভাগগুলি তাহার আজও এতটা আয়ত্ত হয় নাই যে সে তখনই বাজাইয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং তাহাকে হাতে মাত্রা দিয়া শিক্ষকের আদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।—"টক্—টক্—টক্—ফেল্বার সময় এই সুর বাজাইব, তার পর হাত তুলিতে গিয়া ও সুর বাজিবে, আবার হাত পড়িবে, আবার হাত উঠিবে; তার পর কি, বুঝিতে পারিতেছি না!" ইত্যাদি। অর্থাৎ শিক্ষক যে ভাষায় বলিলেন, শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় তাহা আদায় করিতে হইতেছে। সুতরাং আগে বহ্বায়াসসাধ্য ঐ তরজমার ঝঞ্ঝাট সারিয়া লইয়া তবে তাহাকে কাজে লাগিতে হইতেছে। যে স্বরলিপিতে মাত্রার অংশমাত্রের উল্লেখ করে, তাহা দ্বারা শিক্ষার্থীর অবিকল এইরূপ উপকার হয়।

মনে করুন আর একজন শিক্ষক ছাত্রকে বলিতেছেন, "হাত ফেলিবার সময় এই সুর বাজাও, তার পর হাত তুলিবার সময় এই সুর ধরিবে, আবার ফেলিবার সময় ঐ সুরই চলিবে, আবার হাত উঠিবে, আবার পড়িবে" ইত্যাদি। এরূপ হইলে অনুবাদের আবশ্যক নাই, একই ভাষায় উভয়ের কাজ চলিতেছে; শিক্ষার্থী যেমন শুনিতেছে, বিনা হিসাবে অবিকল সেইরূপ করিতে পারিতেছে। সুতরাং মাত্রার জন্য কোন চিহ্ন না লিখিয়া, হাতে মাত্রা দিবার স্থান গুলির উল্লেখ মাত্র করিয়াও স্বরলিপি হইতে পারে। সেখানে একমাত্রা, আধমাত্রা, সিকিমাত্রা, ইত্যাদির কোন চিহ্ন নাই, কেবল হাত তোলা, হাত ফেলা, ইত্যাদি বা তদনুরূপ মাত্রানির্দ্দেশক কোন ধ্বনির স্থান চিহ্নিত থাকে। শিক্ষার্থী ঐ সকল ধ্বনির সাহায্যেই কার্য্য করে, সুতরাং ইহাতে তাহার অধিক সুবিধা হয়।

যাহারা নিতান্ত শিশু, মাত্রা বুঝে না, তাহারাও ছোট ছোট ছড়া বেশ তালে তালে আওড়াইতে পারে। এই জন্যই তাল শিক্ষা দিবার জন্য বোলের সৃষ্টি। সময় বোধের ইহার চাইতে সহজ উপায় আর নাই। ইউরোপে

এইরূপ বোলের সাহায্যে শিশুদিগকে মাত্রা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদ্বারা তাহারা অতি সহজে মাত্রা শিক্ষা করে। এই সকল বোলের সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর লিখিলে, যে বোল জানে, তাহার আর ভাবিতে হয় না—অনায়াসে মাত্রা ঠিক্ রাখিয়া গান আদায় করিতে পারে। এই প্রণালীর নামই টনিক সল্‌ফা প্রণালী।

এই টনিক সল্‌ফা প্রণালীর তুল্য উৎকৃষ্ট প্রণালী এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু এই প্রণালী প্রচলিত হইবার পক্ষে গুরুতর অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ, অনেক শ্রদ্ধেয় লোক ইহার সম্বন্ধে বিশেষ না জানিয়া শুনিয়াই ইহার উপরে নানারূপ কল্পিত দোষ আরোপ করিতেছেন। যাঁহাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করি, তাঁহাদেরই নিন্দা করিতে হয়, নতুবা আমার এই কথাগুলি ঠিক্ দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করা যাইত। মোটের উপরে এই, এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক, যে অনেকেই আধ মাত্রা সিকিমাত্রা, ইত্যাদির কায়দায় টনিক সল্‌ফাকে বুঝিতে গিয়াছেন ও লোককে বুঝাইতে গিয়াছেন। এইরূপ রামকে রাবণের বেশে উপস্থিত করাতে দেশের লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে।

আর এক অন্তরায় এই যে টনিক সল্‌ফায় দেশীয় উচ্চদরের সংগীত যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই ওস্তাদী হিন্দীগান; কিন্তু দেশের লোকে চাহে বাংলা গান। ভাল বাংলা গান টনিক সল্‌ফায় বাহির হয় না; সে সকল গান যাঁহারা বাহির করেন, তাঁহাদের নিজস্ব স্বরলিপি সকল আছে।

আর একটি অন্তরায় ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়দের প্রচলিত স্বরলিপি। উক্ত স্বরলিপি দেশময় এত প্রচারিত হইয়াছে, যে অন্যরূপ স্বরলিপি যে তাহার চাইতে ভাল হইতে পারে, সাধারণ লোকে তাহা বিশ্বাসই করিতে চাহে না। নূতন পুস্তকের সহস্র গুণ থাকুক, কিন্তু তাহাকে খুলিয়া যদি প্রথমেই একটা অপরিচিত স্বরলিপির চেহারা দেখিতে পায়, ক্রেতা অমনি তাহাকে রাখিয়া দেয়। সুতরাং গ্রন্থকারেরাও বাধ্য হইয়া শত দোষ সত্ত্বেও সেই পুরাতন স্বরলিপিকে অবলম্বন করিতেছেন।

অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। যে প্রণালীটি হইলে সুবিধা হইত, তাহা নানা কারণে কল্কে পাইতেছে না। যে প্রণালী চলিত আছে, শিক্ষার্থীর তাহাতে অসুবিধা। বিশেষতঃ এই স্বরলিপিতে থিয়েটার ইত্যাদির গানই

অধিক পরিমাণে বাহির হওয়াতে বিবেচক অভিভাবকগণ তাহাকে ঘরে আনিতেও কুণ্ঠিত হইতে পারেন। ভাল গান যদি চাও, ত ইহা ছাড়াও অপর একাধিক স্বরলিপির সহিত বিশেষ পরিচয় রাখিতে হইবে। এখন শিক্ষার্থী বেচারা যায় কোথায়! প্রচলিত স্বরলিপি শিক্ষক তাহাকে জোর করিয়া শিখাইতেছেন। ভাল স্বরলিপিটি না শিখিতে পাইয়া তাহার যথেষ্ট অকল্যাণ হইতেছে। ভাল ভাল গান শিখিবার পথ তাহার পক্ষে নিতান্তই দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। কারণ সে সকল গান, সে যে স্বরলিপির চর্চ্চা করিতেছে, তাহাতে নয়। এরূপ অবস্থায় দেশের কতদূর কল্যাণ, সকলেই বুঝিতে পারেন। যাঁহারা স্বরলিপির সংখ্যা বাড়াইতেছেন, তাঁহারা উপকার কতটুকু করিতেছেন, ভগবান জানেন, কিন্তু শিক্ষার্থীর সঙ্কট যে বাড়াইতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। তাঁহাদের এই সকল পরিশ্রমের ফল কতদূর স্থায়ী হইবে, তাহাও সমস্যার বিষয়। কারণ, যে পুস্তক দেখিয়া শিক্ষার্থী প্রথমে সংগীত শিখে, সেই পুস্তকে অবলম্বিত স্বরলিপিই তাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়, অন্য স্বরলিপির দিকে সে তত মনোযোগ দেয় না। যাঁহারা মাসিক পত্রিকায় স্বরলিপি প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেছেন, তাঁহাদের সকল শ্রমই পণ্ড হইতেছে। একথা নির্ঘাত বলা যাইতে পারে, যে কালে একটি স্বরলিপিই দাঁড়াইবে। সুতরাং সেই একটি স্বরলিপি যত শীঘ্র স্থির হয়, ততই ভাল। আশা করি সেটি টনিক সল্‌ফাই হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ইতর প্রাণীর শেষ গতি।

হিন্দু ও অন্যান্য কতিপয় প্রাচ্যজাতির বিশ্বাস, মানবের ন্যায় পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গেরও আত্মা আছে, মানবের ন্যায় তাহাদেরও বুদ্ধিবৃত্তি আছে। পাশ্চাত্য জাতিদিগের, বিশেষতঃ খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশ্বাস, কেবল মানবেরই আত্মা আছে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের আত্মা নাই, বুদ্ধিবৃত্তি নাই। এই বিশ্বাস এখন আমাদের দেশেও অনেকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই মতাবলম্বী লোকেরা বলেন, পশুপক্ষীরা বুদ্ধি খাটাইয়া কোন কাজ করে না; তাহারা যে সকল কাজ করে, তাহাতে যুক্তিতর্কের কোন লেশ নাই, ভাব ও চিন্তার কোন সংস্রব নাই। পশুরা জানিতে পারে না যে

তাহারা বুদ্ধিপ্রয়োগে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিল। তাহারা কলের পুতুলের ন্যায় আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া যায়। আবহমান কাল বংশপরম্পরায় তাহারা একই রূপ কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহাদের বুদ্ধির কোন উন্নতি অবনতি দৃষ্ট হয় না। তাহাদের যে সকল কার্য্যকলাপ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত বলিয়া বোধ হয়, সেই সকল কার্য্য তাহারা কোন এক অন্ধ বৃত্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হইয়া সম্পন্ন করে। এই বৃত্তিকে 'সহজবুদ্ধি' বা 'স্বাভাবিক সংস্কার' (instinct) বলা যায়।

বিহঙ্গ অতিশয় নিপুণতার সহিত যে চমৎকার কৌশলপূর্ণ নীড় নির্ম্মাণ করে; মধুমক্ষিকা মানদণ্ডের সাহায্যব্যতিরেকেও যে মধুচক্রের প্রত্যেক কোটর সমান ও সুদৃশ্য করিয়া নির্ম্মাণ করে; ঊর্ণনাভ মক্ষিকাকে পাশবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে গৃহকোণে শতবাহু কুটিল জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে; আহার অন্বেষণে পক্ষী আপন কুলায় ত্যাগ করিয়া কত ক্রোশ দূরে চলিয়া গিয়া আবার সেই নীড়ে ফিরিয়া আইসে, পথ ভুলে না;—এই সমুদয়ে এই দলের লোকেরা বুদ্ধির কোনই পরিচয় পান না, কেবল অন্ধ সহজ সংস্কারেরই নিদর্শন পান। এই শ্রেণীর লোকেরা পশুপক্ষীর যে বুদ্ধি আছে, তাহা স্বীকার করিতে বড়ই নারাজ। পশুপক্ষীর বুদ্ধি আছে বলিলে ইহাঁরা যেন বড়ই অবমানিত বোধ করেন, আত্মমর্য্যাদায় যেন তীব্র আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, এবং মানুষের চিরপ্রাপ্য প্রভুত্ব ও প্রাধান্য একেবারে লোপ পাইল, এইরূপ মনে করেন। ইহাঁরা বলেন আত্মা বলিলে বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব বুঝায়। বুদ্ধি বলিলে যুক্তিতর্ক বুঝায়; ধর্ম্মভাব বলিলে স্নেহমমতা, দয়াভক্তি, ন্যায় অন্যায় বোধ বুঝায়। মানবাত্মার এই সকল উপাদান কি নিকৃষ্ট পশুপক্ষীতে পরিলক্ষিত হয়? শারীরিক প্রবৃত্তির দ্বারাই যাহারা পরিচালিত হয়, "সহজ সংস্কারে"র দ্বারাই যাহাদের জীবনগতি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাদের আবার বুদ্ধিই বা কি, আত্মাই বা কি?

এই তাঁহাদের যুক্তি, এই তাঁহাদের বিশ্বাস। এরূপ বিশ্বাসের যে কোন দৃঢ় ভিত্তি আছে, তাহা বোধ হয় না; বরং ইহা ভূয়োদর্শনের অভাবের ফল বলিয়াই বোধ হয়। মানববুদ্ধি ও পশুবুদ্ধির মধ্যে তাঁহারা এমন কি দুর্ভেদ্য ব্যবধান দেখিতে পান, যাহাতে উভয়কে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? পরিণতমস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের বুদ্ধিতে ও অপরিণতমস্তিষ্ক শিশুর বুদ্ধিতে যে প্রভেদ, সভ্য আর্য্যজাতির প্রপুষ্ট বুদ্ধিতে ও

অসভ্য ফিজিজাতির অপরিণত বুদ্ধিতে যে প্রভেদ; ফিজিজাতির বুদ্ধিতে ও পশুবুদ্ধিতে তদপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। অথচ শিশুবুদ্ধিতে ও পরিণত মানববুদ্ধিতে, সভ্য বুদ্ধিতে ও অসভ্য বুদ্ধিতে যে কোনরূপ প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না।

তবে কি মানববুদ্ধি এবং পশুবুদ্ধি সমান হইল? যে মানববুদ্ধি উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষোভকে উপেক্ষা করিয়া শতযোজনবিস্তৃত মহোদধিকে সুভঙ্গুর লৌহতরণী দ্বারা সামান্য তড়াগের ন্যায় বিলঙ্ঘন করিয়া যায়; যে মানববুদ্ধি নরলোকের ভগ্নকুটীরে বসিয়া কল্পনার অতীত বহুক্রোশ দূরে স্থিত দ্যুলোকের জ্যোতির্ব্বিন্দুর গুরুত্ব ও বিস্তৃতির পরিমাণ নির্ণয় করে; যে মানববুদ্ধি মহাদ্রির ভীমবজ্রদেহ ক্ষীরপুত্তলির ন্যায় ভেদ করিয়া তাহাতে লৌহবর্ত্ম স্থাপন করিয়া রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে; যে মানববুদ্ধি অভ্রশায়িনী চঞ্চলা চপলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধা করিয়া দ্যুতিমতী বর্ত্তিকায় পরিণত করিয়াছে এবং তাহাকে পরিচারিকার কার্য্য করাইয়া লইতেছে; যে মানববুদ্ধি এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে বিশ্ববিধাতার সত্তা অনুভব করিতে পারিয়াছে;—সেই মানববুদ্ধি ও পশুবুদ্ধিতে প্রভেদ যে অপরিসীম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে,—যে নরবুদ্ধি আজিও ফিজিজাতিকে নগ্নদেহে বিচরণ করাইতেছে, বস্ত্রবয়ন করিয়া শরীর আবৃত করিতে শিখায় নাই; যে নরবুদ্ধি আজিও স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপবাসীকে নির্ম্মম করিয়া নরমাংস ভক্ষণ করাইতেছে, ভূমিকর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে শিখায় নাই; যে নরবুদ্ধি অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিকে আজিও বৃদ্ধ পিতামাতাকে হত্যা করিয়া আহার করাইতেছে, তাহাদিগের হৃদয়ে স্নেহমমতা অঙ্কুরিত করিয়া দেয় নাই; যে নরবুদ্ধি আফ্রিকার বর্ব্বর জাতিকে যথেচ্ছ ব্যভিচার করাইতেছে, মাতা ভগিনীর পবিত্র সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয় নাই; যে নরবুদ্ধি অসভ্য জাতিদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি লজ্জা পবিত্রতা ও অন্যান্য উচ্চ ভাব সকল হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে; সেই নরবুদ্ধিতে ও পশুবুদ্ধিতে প্রভেদ অতি সামান্য।

ফিজিদ্বীপের উলঙ্গ বর্ব্বরের বুদ্ধির সহিত বানরের বুদ্ধির তুলনায় যে টুকু প্রভেদ দৃষ্ট হয়, নিউটনের বা ব্যাসের বুদ্ধির সহিত ফিজিজাতির বুদ্ধির তুলনায় তদপেক্ষা শতগুণ অধিক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। নিকৃষ্ট মানবের ও উৎকৃষ্ট পশুর বুদ্ধিতে অতি অল্পই প্রভেদ। নরবুদ্ধি ও পশুবুদ্ধির মধ্যে বিকাশের তারতম্য আছে, প্রকারভেদ নাই।

সুখদুঃখবোধ, সাহস, ভয়, বিরক্তি, অনুরাগ, সন্তানবাৎসল্য, অনুসন্ধিৎসা, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, বিচারক্ষমতা, নিজস্ববোধ, দয়া, পরোপকার, সহানুভূতি, ন্যায়ান্যায় বোধ,—এবং পক্ষান্তরে, জিঘাংসা, কাপুরুষতা, নিষ্ঠুরতা; সমস্তই মানবের ন্যায় ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও সচরাচর দৃষ্ট হয়।

অনেকের বিশ্বাস, জন্তুদিগের কল্পনা-শক্তি নাই। স্মৃতিশক্তি হইতে কল্পনা-শক্তির উৎপত্তি। গৃহপালিত কুক্কুরকে নিদ্রিতাবস্থায় দেহ বিকম্পিত করিতে ও সহসা চীৎকার করিতে দেখা যায়। সে যে অতীত ঘটনার স্বপ্ন দেখে, তাহাতে কি কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না? পালিত কুকুর শত ক্রোশ দূরে নীত হইলেও কত নদ নদী অতিক্রম করিয়া পুরাতন প্রভুর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়, তাহাতে কি তাহার কল্পনাপথে পালয়িতার স্নেহপূর্ণ আশ্রম-গৃহের মোহন-ছবির উদয় হয় না? জন্তুদিগের যে অমূর্ত্ত বা, সাধারণ সংস্কার (abstract or general notions) নাই, তাহাও বলা যায় না। অনেকে বলেন, রাম-শ্যাম-যদু-হরি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মানুষ হইতে আমরা যেমন মানুষের একটা সাধারণ অমূর্ত্ত সংস্কার (abstract notion) লাভ করি, জন্তুগণ সেরূপ করিতে পারে না। এই বিশ্বাসের কোন উপযুক্ত কারণ নাই। শৃগাল যখন আহারের অন্বেষণে গৃহস্থের বাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে সে বিশেষ কোন খাদ্য দ্রব্যের বিশেষ ভাব মনে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা বোধ হয় না। শৃগালের মনে কি তখন বিশেষ বর্ণের, বিশেষ আকারের কোন মুরগী বা হাঁসের কল্পনার উদয় হয়? ক্ষুধার সময়ে আমরা খাবার চাহিলে যেমন আমাদের মনে কোন একটা বিশেষ খাদ্য বস্তুর কল্পনার উদয় হয় না, কেবল খাদ্যের একটা সাধারণ ভাবেরই উদয় হয়, তদ্রূপ শৃগালের মনেও খাদ্যের একটা সাধারণ ভাবের উদয় হওয়াই সম্ভব। তবে মানব-মনে যে সকল জটিল ও উচ্চ ভাবের উদয় হয়, পশু-মনে তাহা হওয়া অসম্ভব। সেরূপ উচ্চ সাধারণভাব (abstract idea)—স্বদেশহিতৈষণা, ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদি—শিশু ও অসভ্যের মনেও উদিত হয় না। কিন্তু সামান্য সাধারণ ভাব (general notion) পশুরা লাভ করিতে পারে। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাধারণ ভাব সকল আমরা দুই প্রকারে লাভ করি। এক প্রকার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি শারীরিক প্রবৃত্তি হইতে লাভ করি। অপর প্রকার ভাষার ব্যবহার দ্বারা লাভ করি। ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে যে সকল সাধারণ ভাব

লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই সকল ভাব পশুর মনে কেন, শিশুর মনে উদিত হওয়াও অসম্ভব। ভাষা বস্তু বা ভাবের চিহ্ন বা পরিচায়ক সঙ্কেত মাত্র। যে জাতির ভাষা যে পরিমাণে ব্যাপক ও সাধারণ ভাব সকলের জ্ঞাপক হয়, সেই জাতির সাধারণ ভাব লাভের ক্ষমতাও সেই পরিমাণে অধিক হয়। পশু-মনে উচ্চ সাধারণ ভাবের উদ্রেক করা অসম্ভব, কারণ মানব ও পশুর মধ্যে একটা সাধারণ ভাষার অভাব থাকায় পশু-মনে ঐ সকল ভাব প্রবেশ করাইবার কোন উপায় নাই। শিশু ও বর্ব্বরের ভাষা ভাবপ্রকাশক শব্দ মাত্র। পশুভাষাও তদ্রূপ, কেবল মনোভাব ও ইন্দ্রিয়-বিকার-জ্ঞাপক। মানবীয় সুব্যক্ত ভাষা পশুর ভাবপ্রকাশক ভাষায় অনুবাদ করিবার উপায় আজিও নির্ণীত হয় নাই। সেইজন্য যখনই আমরা আমাদের ভাব সকল শুধু ভাষার সাহায্যে পশুদের নিকট ব্যক্ত করি, তখনই তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু মুখভঙ্গী, হস্তপদাদি সঞ্চালন, প্রভৃতি, মানসিক ভাব সকলের পরিচায়ক শারীরিক সঙ্কেত দ্বারা আমাদের মনোগত ভাব বহুল পরিমাণে পশুদিগের গোচর করিতে পারি। কোন্ কোন্ পশুর কোন্ ধ্বনির কোন্ অর্থ, আমরা গৃহপালিত পশুর বিভিন্ন স্বরের প্রতি লক্ষ্য করিলে কিছু কিছু বুঝিতে পারি। অধ্যাপক গার্ণার সম্প্রতি ফনোগ্রাফ্ যন্ত্রের সাহায্যে বানরদিগের ভাষার অনেক শব্দের অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন।

অভ্যাসের দ্বারা কুকুর, পাখী প্রভৃতিকে মানবভাষার কতকগুলি কথার অর্থ শিখান যাইতে পারে। ময়না পাখীকে শিকি, দুয়ানি, পয়সা, ও ছোট ছোট কাগজ খণ্ডে ক, খ, ইত্যাদি লিখিয়া, তাহা চিনিতে শিখাইতে পারা যায়। শিখাইলে ময়না তাস বাছিয়া আনিয়া দিতে পারে। লবক সাহেব তাঁহার কুকুরকে অক্ষরপরিচয় করাইয়াছিলেন; সে নির্দ্দিষ্ট অক্ষরযুক্ত তাস বাছিয়া আনিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে খাবার লইত। শিক্ষিত ময়না দুই, তিন, চার ইত্যাদি সামান্য সংখ্যা বুঝিতে পারে; উহাকে তিনটা বা চারিটা শিকি আনিতে বলিলে নানাপ্রকার মুদ্রার মধ্য হইতে তিনটা বা চারিটা শিকি বাছিয়া আনিয়া দেয়, ভুল করে না। যে সকল ঘোড়া পাঁচবার করিয়া ট্রামগাড়ী টানে, চারিবার পর্য্যন্ত তাহারা নীরবে ধীরভাবে আপন কার্য্য করিয়া যায়, পঞ্চমবার বড় চঞ্চল হয়; দ্রুত চলে, শীঘ্র কাজ শেষ করিলেই যেন সুস্থ হয়। সম্প্রতি বিলাতে মেষপালকদিগের কুকুরের (she-

pherd's dog) মেষরক্ষণ ক্ষমতার প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এক এক দলে ৫০।৬০ করিয়া মেষ থাকে; ভিন্ন ভিন্ন দলের রক্ষক স্বরূপ একটী কুকুর থাকে। কুকুরদের অজ্ঞাতসারে দুই দলের মেষগুলিকে একত্রিত করিয়া মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কুকুরেরা আপন আপন দলের মেষগুলিকে বাছিয়া পৃথক্ করিয়া লইল। অজ্ঞাতসারে দলের দুই চারিটা মেষকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। কুকুর পরে দলের নিকট আসিয়া অতগুলি মেষের মধ্য হইতে যে দুই চারিটা কমিয়াছে, তাহা টের পাইল। অবশেষে পর পর পাঁচ ছয় মেষদল অতিক্রম করিয়া অন্য একদলের মধ্য হইতে আপনার মেষগুলিকে বাছিয়া আনিল। তাহারা আপন দলে অন্যত্র হইতে একটা মেষ আসিয়া জুটিলে তাহাও টের পায় ও তাহাকে বাহির করিয়া দেয়। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে পশুদিগেরও সংখ্যা গণনাশক্তি কিয়ৎপরিমাণে আছে।

রোমেন্জ্ সাহেবের একটা কুকুর ছিল, সে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া ভয়ে কাঁপিত। কেহ মেঘগর্জ্জনের অনুকরণে কোন কৃত্রিম শব্দ করিলেও ভয় পাইত। পরে শব্দস্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে শব্দের কারণ দেখাইয়া দিলে সে আর ভয় করিত না। রোমেন্জ্ সাহেব বলেন, তিনি একখণ্ড হাড়ে সূতা বাঁধিয়া সেই হাড়খানা নাচাইতেন বলিয়া অচেতনে চৈতন্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার কুকুর বড়ই ভয় পাইত।

বিচারশক্তিও মানবের একচেটিয়া নহে। ইতর প্রাণিগণেরও বিচার-ক্ষমতা আছে; তাহারা যে কেবল স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করে না, যুক্তিতর্কেরও আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বানর বাদাম প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া খাইবার জন্য পাথর ব্যবহার করিয়া থাকে। ভারী দ্রব্য তুলিবার জন্য বন্য বানরকে লাঠীর দ্বারা চাড় দিতে দেখা গিয়াছে, বা উত্তোলন দণ্ডের (lever) সাহায্য লইতে দেখা গিয়াছে। তৈল বা মধু ভাণ্ড বা বোতলের নিম্নদেশে থাকিলে ইঁদুরেরা তাহাতে লাঙ্গুল ডুবাইয়া দেয়, পরে সেই তৈল বা মধুলিপ্ত লাঙ্গুল চাটিয়া খায়। ঈসপ্‌স্ ফেবলস্ বা কথামালায় যে কাক ও জলের কুঁজার গল্প পড়িয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত কাল্পনিক বা অমূলক নহে; বায়স ও ইঁদুরকে ঐরূপে ছোট ছোট ইট বা পাথরের টুকরা ভাণ্ড মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তরল খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধে উঠিলে পরে খাইতে দেখা গিয়াছে। চঞ্চুদ্বারা খাদ্য দ্রব্য ভাঙ্গিতে না পারিলে, কোন কোন পক্ষী আকাশ হইতে পাথরের উপর

ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ করিয়া লয়। সঙ্কীর্ণ গিরিপথে দুইদিক হইতে দুইটী ছাগল আসিয়া উপস্থিত হইলে উভয়ে ঠেলাঠেলি করিয়া পড়িয়া মরিবার উপক্রম না করিয়া একটী শুইয়া পড়ে, অপরটী তাহার পিঠের উপর দিয়া চলিয়া যায়। ইন্দুর অতি আশ্চর্য্য উপায়ে ডিম্ব চুরি করে। ডিম কামড়াইয়া ধরিবার উপায় নাই; সুতরাং একটা ইন্দুর ডিমটিকে পা দিয়া বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে, অপর একটা ইন্দুর তাহার লেজ ধরিয়া সবশুদ্ধ টানিয়া লইয়া যায়। হরিণ যখন দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, তখন সিংহ তাহাদের নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করে না; এতদ্ব্যতীত দ্রুতগামী হরিণের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করা সিংহের সাধ্যাতীত। এই অবস্থায় কৌশল অবলম্বন ও অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। একটা সিংহ দূরে আড়ালে লুকাইয়া থাকে, এবং আর একটা সেই হরিণদল হইতে কিছুদূরে বিপরীত দিকে থাকিয়া খুব গর্জ্জন করিতে থাকে। সেই গর্জ্জন শুনিয়া হরিণেরা ত্রস্ত হইয়া উঠে, এবং এখনও শত্রু দূরে আছে এইবেলা পলায়ন করা শ্রেয় মনে করিয়া যে দিক হইতে সিংহের গর্জ্জন শুনা যায়, তাহার বিপরীত দিকে প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে, এবং ক্রমে অজ্ঞাতসারে সেই লুক্কায়িত সিংহের নিকট আসিয়া পড়ে। প্রাণভয়ে দৌড়িবার সময়ে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও ছোট অনেক হরিণ দলভ্রষ্ট হইয়া পশ্চাতে পড়ে। তখন সিংহ অবলীলা-ক্রমে একে একে তাহাদের অনেকের প্রাণসংহার করিয়া উভয়ে মিলিয়া যথেচ্ছা উদর পূর্ত্তি করে এবং অবশিষ্ট হত মৃগ পরদিবস আহারের জন্য লুকাইয়া রাখে।

বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ওয়েবর বলেন যে, তাঁহার বাগানে এক সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে দুইটা গাছ ছিল। সেই গাছ দুইটার মাঝখানে এক মাকড়সা জাল বিস্তার করিয়া তাহার দুইধার দুই গাছে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। জালখানি ভূমি হইতে অনেক উপরেই ছিল; সেই পথে কেহ গতায়াত করিলে তাহার মাথায় জাল ঠেকিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই জালখানি টান করিবার জন্য মাকড়সা জালের অধোভাগে এক সূতা বাধাইয়া দিয়া প্রায় পথের উপর এক পার্শ্বে এক শাখার সহিত আঁটিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিল। ওয়েবর সাহেব একদিন প্রাতে সেই পথে চলাতে সূতাটী ছিঁড়িয়া যায়। সাহেব ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, মাকড়সা পুনরা

সেইরূপে নূতন সূতা বাঁধিয়াছে। সাহেব কৌতুক দেখিবার জন্য এবার ইচ্ছা করিয়া সেই সূতা ছিঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। দুই প্রহরের সময়ে আসিয়া দেখেন, আবার সেইভাবে সূতা বাঁধা রহিয়াছে; এবারও ছিঁড়িয়া দিলেন। তারপর আসিয়া দেখেন, মাকড়সা আর সেরূপ সূতা বাঁধে নাই বটে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে। একটা খুব ছোট ইষ্টকখণ্ডে সূতা জড়াইয়া সেটা জালের তলায় বাঁধিয়া দিয়াছে। ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড শূন্যে ঝুলিতেছে এবং তাহার ভারে জাল টান হইয়া রহিয়াছে, অথচ তাহার তলা দিয়া অবাধে লোক গমনাগমন করিতে পারে।

এক সাহেবের বাড়ীতে শৃগালের বড় দৌরাত্ম্য হয়। সাহেব জাঁতিকলে শৃগাল ধরিবার চেষ্টা করেন। প্রথম দিন একটা শৃগাল ধরা পড়িল। তাহার পর আর শৃগাল ধরা পড়িত না। প্রত্যহ প্রাতে দেখা যাইত, কলটা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং শৃগালকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য যে মাংসখণ্ড গাঁথিয়া দেওয়া হইত, তাহাও ভক্ষিত হইয়াছে, অথচ কোন জন্তুই কলে ধরা পড়ে নাই। ইহার কোন মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এক দিন তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া রাত্রে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সেই কল দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে দুইটা শৃগাল জাঁতি কলের নিকটে আসিল। একটা ধীরে ধীরে কলের নিকট গিয়া কলের নীচের দিক দিয়া একটা পা প্রবেশ করাইয়া মাংসখণ্ড টানিল; অমনি জাঁতিকলের হাত দুখানি সবেগে উপরে উঠিয়া বন্ধ হইয়া গেল। শৃগালের কিছুই হইল না। তাহারা আপন বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। শৃগাল যদি কলের উপর দিয়া মুখ অথবা পা বাড়াইয়া দিয়া মাংস টানিত, তাহা হইলে আর নিষ্কৃতি লাভের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। কলের নীচ দিয়া পা বাড়াইয়া মাংস টানিলে যে বিপদের কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহা শৃগাল বিলক্ষণ যুক্তিতর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।

ইন্দুরও অনেক সময়ে নিজ বুদ্ধিবলে ফাঁদ হইতে নিস্তার পায়। ইন্দুর ধরিবার জন্য সচরাচর যে বাক্সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই একটা একবার পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। যে ঘরে কল পাতা হইয়াছিল, তাহারই এক কোণে কতকগুলি সোলা দাঁড় করান ছিল। চতুর ইন্দুরেরা কলের উপর একবার উঠিয়া চতুর্দ্দিক দেখিয়া সেই সোলার একখণ্ড টানিয়া আনিয়া তাহার কিয়দংশ সেই কলের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিল। তাহার পর

কলের ভিতর প্রবেশ করিয়া যে খাবারটুকু ছিল, তাহা খাইতে লাগিল। কলের দরজা উপর হইতে নীচে পড়িল বটে, কিন্তু সোলার উপর পড়ায় কলের মুখ একেবারে বন্ধ হইল না, নীচে ফাঁক রহিয়া গেল। ধূর্ত্ত মূষিকেরা আহার সমাপ্ত করিয়া, স্বীয় বুদ্ধি-চাতুর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত মানবের অতিবুদ্ধিকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া সেই ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

যাহাতে দূরত্ব কম হয়, কুকুর ও অন্যান্য জন্তুগণ তাহা বুঝিতে পারে। বিড়ালেরা পা দিয়া হুড়কা ঠেলিয়া, টানিয়া দরজা খুলে। বিলাতের কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য বিড়ালকে ঘণ্টা বাজাইতে দেখা গিয়াছে। ইহা তাহারা নিজে দেখিয়া শিখিয়াছে, কেহই শিখায় নাই।

নিকৃষ্ট জীব জন্তুরা কেবল 'সহজ সংস্কারের' বশবর্ত্তী হইয়াই তাহাদের জীবনের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রাণিগণের কার্য্যাবলীর বিশেষ পর্য্যালোচনার অভাবের ফল মাত্র। জীব জন্তুর ব্যবহারে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাহা কেবল সহজ সংস্কারের ফল নয়। সে গুলিতে স্পষ্টই অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় অথবা যুক্তিতর্কের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

জাঁতিকলে শৃগালের পা আবদ্ধ হইলে, অনেক সময়ে দেখা যায় শৃগাল সেই পা খানি কামড়াইয়া দুই খণ্ড করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। ইহাতে 'সহজ সংস্কার' কোথায়? পক্ষান্তরে জীব জন্তুরা যদি যুক্তিতর্কের আশ্রয় না লইত, ঠেকিয়া শিখিয়া অভিজ্ঞতা লাভদ্বারা যদি তাহাদের অধিকতর বুদ্ধিমান হইবার আবশ্যকতা না থাকিত, তাহা হইলে জীব জন্তুদের ব্যবহারে কোন ভুল ভ্রান্তি বা অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইত না। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বলেন, পক্ষিশাবকেরা প্রথমাবস্থায় নীড়নির্ম্মাণে বড়ই অপটু থাকে। তাহাদের নির্ম্মিত নীড় বয়স্ক পক্ষী নির্ম্মিত নীড়ের ন্যায় সুন্দর ও পরিপাটী হয় না। সকলেই দেখিয়াছেন, বিড়ালী ও কুক্কুরী শাবকদিগকে শিকার করিবার উপযুক্ত করিবার জন্য কত যত্নে তাহাদিগকে লইয়া কত 'খেলা' করে, কত অঙ্গভঙ্গী শিখায়। অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশের বিখ্যাত প্রাণিবিদেরা জীবজন্তুদের বিষয় বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হাঙ্গেরির অধ্যাপক জুলিয়াস টাপি বহুকাল ডানিয়ুব নদীর তীরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আমি প্রায়ই নদী তীরে বেড়াইতে গিয়া দেখিতাম, হংসশাবকেরা প্রথমাবস্থায় জলে নামিতে

বড় ভয় করিত। হংসী বহুকষ্টে তাহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া জলে নামাইতে সমর্থ হইত। হঠাৎ জলে নামিয়া তাহারা বড় অসুবিধা বোধ করিত ও চীৎকার করিতে করিতে তীরে উঠিতে চেষ্টা করিত। হংস-মাতাও শীঘ্র শীঘ্র শাবকদিগকে তীরে উঠাইয়া দিত। পরে পুনরায় শাবকেরা জলে নামিতে না চাহিলে হংসপিতা অগ্রে অগ্রে ধীরে ধীরে ডাকিতে ডাকিতে জলে নামিত। পশ্চাৎ হইতে হংসীও ডাকিতে ডাকিতে শাবক-দিগকে লইয়া অগ্রসর হইত। কোন শাবক জলে নামিতে ইতস্ততঃ করিলে তাহাকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিত। এইরূপে শাবকদিগকে সাঁতার শিখাইত। পরে অভ্যস্ত হইলে হংসশাবকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক জলে নামিত এবং তাহাতে যথেষ্ট আনন্দও অনুভব করিত। অধ্যাপক লয়ড মর্গান কতকগুলি হংস ও কুক্কুটডিম্ব লইয়া দুইটী বাক্সে পৃথক পৃথক রাখিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিয়া ডিম ফুটাইয়া সেই শাবকগুলির কার্য্যকলাপ বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করেন। প্রথম দিবস ইহারা উত্তমরূপে চলিতে ফিরিতে পারিত না, মাঝে মাঝে পড়িয়া যাইত। চঞ্চুদ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য যে ঠোকর মারিত, তাহাতে অনভিজ্ঞতা দৃষ্ট হইত। এক ঠোকরে কখনই খাদ্য ধরিতে পারিত না। ঠোকর প্রায়ই সেই দ্রব্যের নিকট পৌঁছিত না। একটা পিপীলিকা ধরিতে তিন চারি বার চেষ্টা করিয়া তবে কৃতকার্য্য হইত। ঠোকর মারিয়া খাদ্য ধরিতে শিখিলে পরও খাদ্যা-খাদ্য বিচার করিবার শক্তি হঠাৎ জন্মে না। মানব শিশুর ন্যায় কুক্কুট ও হংস শাবকও যাহা পায় তাহাই খাইতে যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড, লৌহ খণ্ড, কাগজের টুকরা, যাহা দেখিত তাহাই ঠোকরাইয়া খাইতে যাইত। মরগান সাহেব দুই প্রকার শুয়া পোকা আনিয়াছিলেন। এক প্রকার কুক্কুটের খাদ্যোপযোগী, অপর প্রকার তাহাদের অখাদ্য। অখাদ্য শুয়া পোকা কুক্কুট শাবকের নিকট রাখিয়া দিবা মাত্র ঠোকরাইয়া মুখে করিয়া লইয়া গিলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিল। পরে অন্য শুয়াপোকা দিলে খাইয়া ফেলিল কিন্তু এই অখাদ্য শুয়াপোকা চিনিতে কুক্কুট শাবকদিগের দুই দিন লাগিয়াছিল ও অনেকবার ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছিল। একটা অগভীর টিনের পাত্রে জল রাখিয়া হংস-শাবকদিগের নিকট রাখিয়া দিলে, শাবকেরা জলের জন্য বিশেষ কোন ভাবই প্রকাশ করিল না। তাহাদিগকে তুলিয়া সেই জলে ছাড়িয়া দিলে ভীত ও বিরক্ত হইত।

প্রথমাবস্থায় জল পান করিতে গিয়া ভাল করিয়া পান করিতে পারিত না। অল্পে অল্পে অভ্যস্ত হইলে জলে নামিত ও জল পান করিত। ছয় সাত দিবস পরে আর সেই পাত্রে জল না দিয়া, অধ্যাপক মরগান শূন্য পাত্রখানি তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। শাবকেরা শূন্যপাত্রকে জলপূর্ণ মনে করিয়া তাহা হইতে জল পান করিবার চেষ্টা করিল। তাহারা সেই পাত্রের উপর উঠিয়া স্নান করিবারও চেষ্টা করিল ; তাহার পর যখন বুঝিল জল নাই, পাত্র শূন্য, তখন অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অধ্যাপক মোবিয়াস জলপূর্ণ বৃহৎ কাচপাত্রে বোয়ালজাতীয় একপ্রকার মৎস্য পুষিয়াছিলেন। ইহারা ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্য ধরিয়া খায়। সাহেব একবার এক বৃহৎ কাচফলক বসাইয়া এই পাত্রকে দুই অংশে বিভক্ত করেন। এক অংশে বোয়াল মাছ রহিল, অপর অংশে ক্ষুদ্রজাতীয় একপ্রকার মাছ রাখিলেন। কাচের ভিতর দিয়া সেই ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে বোয়াল গ্রাস করিবার জন্য সবেগে অগ্রসর হইত। অমনি সজোরে আসিয়া সেই কাচফলকের উপর পড়িয়া আঘাত পাইত। তথাপি তাহাদিগকে ধরিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিত। সাতদিন ক্রমা-গত কতবার বিফল হইয়া অবশেষে শিখিতে পারিয়াছিল যে তাহাদের ধরা যায় না। তাহার পর আর কখনও ধরিতে চেষ্টা করে নাই। সাহেব পরীক্ষা করিবার জন্য সেই কাচের ব্যবধান খুলিয়া লইলেন। বোয়াল সে মাছগুলি ধরিতে চেষ্টা করিল না। দুই দিবস কোনই ব্যবধান ছিল না। তৃতীয় দিবস সাহেব অন্য আর একজাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য সেই কাচপাত্রে ছাড়িয়া দিলেন, বোয়াল অমনি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু, পূর্ব্বেকার সেই ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি নিকটে থাকিলেও তাহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিল না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বোয়ালের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অনেক সময় লাগে এবং একবার যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা ভুলিতে অনেক দিন যায়।

বিখ্যাত পিপীলিকাতত্ত্ববিদ্ ফোরেল ও হুবর বলেন যে মানবশিল্পীর ন্যায় পিপীলিকারাও সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হয়। দেখা যায় যে পিপীলিকারা একস্থানে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া পরে অনাবশ্যক বা অসুবিধাজনক মনে করিয়া সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তাহাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণে যে সমস্ত ভুল থাকিয়া যায়, তাহা পরে সংশোধন করিয়া দেয়। মধুমক্ষিকাও একবার

মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া সেটা সুবিধাজনক বিবেচনা না করিলে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গঠন করে। অনেকের বিশ্বাস মধুমক্ষিকাগণ সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই ষট্‌কোণ কুঠরি নির্ম্মাণ করে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অবস্থাবিশেষে এবং আবশ্যকবোধে মধুমক্ষিকাকে মধুচক্রে অন্য প্রকারের কুঠরি নির্ম্মাণ করিতেও দেখা গিয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে নিকৃষ্ট প্রাণীরা কেবল 'সহজ সংস্কারের' দ্বারাই পরিচালিত হয় না; যুক্তিতর্ক ও অভিজ্ঞতার দ্বারা আপন আপন কার্য্যাবলী নির্দ্দিষ্ট করে।

যে সকল উচ্চগুণে মানব পশুহইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, সে সকল উচ্চগুণও পশু পক্ষী কীট পতঙ্গে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। মানব সমাজমধ্যে বাস করে, সমাজবন্ধন হেতু অনেকগুলি সামাজিকগুণ লাভ করিয়াছে, এবং সেই সকল গুণ থাকাতে মানব এত উন্নতি লাভ করিতেও সমর্থ হইয়াছে। মানবজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যে জাতি যত সামাজিক, যাহার সমাজ যে পরিমাণে ব্যাপ্ত ও জটিল, সেই পরিমাণে সেই জাতি তত উন্নত। নিকৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যেও দেখা যায় যে সকল প্রাণী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, যাহাদের মধ্যে সমাজের আঁটা আঁটি, আদব কায়দা যত বেশী, তাহারা তত উন্নত। বানর, হস্তী, শৃগাল, শুকপক্ষী, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

স্বজাতির উপচিকীর্ষা ও অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ মানবের ন্যায় নিকৃষ্ট প্রাণিদিগের মধ্যেও লক্ষিত হয়। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকারা বিপদের সময়ে আপন আপন দলস্থ লোকের সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা যে প্রকারে দলস্থ পীড়িত ও আর্ত্তের সেবা শুশ্রূষা করে তাহা দেখিয়া মানুষকে লজ্জিত হইতে হয়। পিপীলিকার শুঁয়া ছিড়িয়া দিয়া দেখা গিয়াছে, তাহার স্বজাতীয়েরা আপন আপন লালা দিয়া তাহার ক্ষত নিবারণ করে। আহতকে পিপীলিকাগণ বহিয়া লইয়া যায় এবং শুশ্রূষা করে। হুবার বলেন মধুসঞ্চয় করিয়া কোন পিপীলিকা ফিরিয়া আসিলে তাহার নিকট দলস্থ ক্ষুধার্ত্ত কোন পিপীলিকা আহার চাহিলে অমনি মুখ হইতে খানিকটা মধু বাহির করিয়া তাহাকে খাইতে দেয়। যাহারা নিজের লোকের প্রতি দয়া বা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকে বিশেষ নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। বানরদিগের মধ্যে মাতৃহীন অনাথ শিশুকে অন্যান্য বানর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে দেখা গিয়াছে।

টীয়াপাখীর দলের কোন একটাকে আহত করিলে দলস্থ অন্য সকলে সেই আহত কুটুম্বকে ঘিরিয়া চীৎকার করিতে থাকে ও তাহার সাহায্য করিতে ও তাহার কষ্টের লাঘব করিতে চেষ্টা করে। কাঁদে, চীৎকার করে, সাহায্য করিতে চেষ্টা করে. সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না; পরে নিতান্ত নিরুপায় হইলে চলিয়া যায়। দলস্থ একটী আহত হইলে বায়সেরা কি ভয়ঙ্কর কোলাহল করে। সেই সময়ে ভয় দেখাইয়াও তাহাদের দল ভঙ্গ করা যায় না। সঙ্গীরা কখনও কখনও আহতকে লইয়া পলায়ন করে। একা বহন করিতে না পারিলে দুইজনে দুইটা ডানা ধরিয়া লইয়া যায়। উটা নামক স্থানে কতকগুলি পেলিকান পক্ষী বৃদ্ধ, অন্ধ, ভক্ষ্যাহরণে অপারগ অন্য একটী পেলিকানকে প্রত্যহ আহার যোগাইত। হুইম্পার একবার একটী ইন্দুর আর একটী অন্ধ ইন্দুরকে সঙ্গে করিয়া আহার অন্বেষণে লইয়া যাইতেছে দেখিয়াছিলেন। অন্ধ ইন্দুরটী মুখে একটী কাঠী ধরিয়াছিল; সেই কাঠীর অপর প্রান্ত অন্য ইন্দুরটী মুখে ধরিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। একজন এক জোড়া শুক পুষিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী রোগগ্রস্ত হইলে স্বামী বহুদিবস তাহাকে চঞ্চুপুটে আহার দিয়াছিল। অবস্থা যতই খারাপ হইতে লাগিল, তাহার যত্নেরও তত বৃদ্ধি পাইল। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয়েক দিন পরে সেও প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

প্রিন্স্ ক্রপট্‌কিন্ একবার ব্রাইটন নগরে জলজন্তু প্রদর্শনাগারে দেখিয়াছিলেন একটা কাঁকড়া কোনও প্রকারে হঠাৎ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া গিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সোজা হইতে পারিতেছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটা আসিয়া তাহাকে অনেক নাড়াচাড়া করিয়া সোজা করিবার চেষ্টা করিল। না পারিয়া পরে আরও তিনটাকে ডাকিয়া আনিল; তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে ঘাড়ে করিয়া তুলিয়া লইয়া সোজা করিয়া ফেলিল। সন্তানস্নেহ পশুদিগের কত অধিক তাহা সকলেই অবগত আছেন। শত্রুমুখে আপনি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তথাপি পশুমাতা সস্নেহে অতি যত্নে শাবককে বক্ষঃস্থলে রক্ষা করে, কখনও সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পলায় না। ডেল্‌ট নগরে অগ্নি লাগিলে এক সারস অসহায় শাবকগুলিকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদের সহিত পুড়িয়া মরিয়াছিল।

স্বজাতীয়ের সাহায্য করা ব্যতীত জন্তুদিগকে অপর জাতীয়ের সাহায্য

করিতে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি ও প্রেম প্রকাশ করিতেও দেখা যায়। একবার কোন লোক মজা দেখিবার জন্য বাঘের খাঁচায় একটা কুকুর ফেলিয়া দিয়াছিল। কুকুর ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া এক কোণে জড়বৎ পড়িয়া রহিল। হিংস্র ব্যাঘ্রও কুকুরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাহার নিকটে শুইয়া সস্নেহে তাহার গা চাটিতে লাগিল। এই বাঘ ও কুকুরের মধ্যে এমনই বন্ধুতা জন্মিয়াছিল যে বাঘ এক মুহূর্ত্তও কুকুরকে না দেখিলে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। প্যারিস পশুবাটিকায় একটী সিংহীর সহিত একটী কুকুরের অত্যন্ত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। সিংহীর মৃত্যু হইলে কুকুরটী শোকে অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল। একবার এক ধৃত ঈগল পক্ষীর নিকট এক অতি রুগ্ন কুক্কুট শাবককে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঈগল অতি যত্নে তাহাকে আপন পক্ষতলে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিল। কেহ সেই কুক্কুটকে লইয়া যাইতে আসিলে তাহাকে তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিত। রোমের ক্রীতদাস আণ্ড্রক্লিস ও সিংহের গল্প কে না পাঠ করিয়াছেন ?

সংসারের ঘোর জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য যে রূপ পরস্পরের প্রতি জিঘাংসা ভাবের বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া বিবর্ত্তনবাদীরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের সাহায্য করিবার ভাবও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল।

অনেকের বিশ্বাস পশুদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই। এই বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রান্ত, তাহার আর বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক করে না। প্রভুর দ্রব্য রক্ষা করিতে গিয়া কুকুর যে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কাতর হয় না, সেকি শুধু অন্ধ সহজ সংস্কারের জন্য, না আপন সুখ লাভের জন্য ? প্রত্যহই দেখিতে পাই কত লোক আপন আপন দ্রব্যাদি পালিত কুকুরের রক্ষাধীনে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অন্যত্র চলিয়া যায়। কুকুরও আপন কর্ত্তব্য বুঝে ; অতি যত্নে সেগুলি রক্ষা করে। বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলাম এক কুকুর পথপার্শ্বে প্রভুর দ্রব্য আগুলিয়া বসিয়াছিল। এক শকট-চালক তাহাকে কত প্রহার করিল, অবশেষে শকট তাহার উপর দিয়া চালাইয়া দিল। কুকুর প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি আপন কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইল না। আল্পস্ পর্ব্বতের তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথে পথিকেরা পথহারা হইয়া পাছে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় তথাকার খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদিগের কুকুরেরা ঘোর তুষারপাতের

মধ্যে কত কষ্ট সহ্য করিয়া দূরদূরান্তরে নিরাশ্রয় পথিকের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। আপন সুবিধার জন্য কখনই কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হয় না।

বানরেরা দলবদ্ধ হইয়া শস্যক্ষেত্র লুণ্ঠন করিতে যায়। সেই সময়ে তাহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে প্রহরী নিযুক্ত করে। তাহারা দূরে থাকিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে থাকে ; বিপদের আশঙ্কা দেখিলে সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া তাহাদের কাজ। লুণ্ঠন কার্য্য সমাপ্ত হইলে সকলে মিলিয়া সেই প্রহরীদিগকে লব্ধ বস্তুর ভাগ দেয়। প্রহরীদের বঞ্চিত করা উচিত নহে, তাহাদেরও যে ভাগ পাইবার অধিকার আছে, তাহা বানরেরা বুঝে।

ইতর প্রাণিগণ আদর অনাদর বুঝে। মুখভঙ্গী দ্বারা বিরক্তি বা কোপ প্রকাশ করিলে গৃহপালিত সমস্ত জন্তুই বুঝিতে পারে। প্রভু চোখ্ রাঙ্গাইলে, কুকুর চোরের মত জড়সড় হইয়া পদতলে পড়িয়া থাকে। খুব প্রহার করিয়া যে কাজ করাইতে না পারা যায়, দুই চারিদিন আদর করিয়া কথা না কহিলেও কুকুরে আপনা হইতে সেই কাজ করে।

ইতর প্রাণীদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি সম্বন্ধে রোমেন্জ্ সাহেব বলেন যে তাঁহার একটা আদুরে কুকুর ছিল, সে জন্মে কখনও তিরস্কৃত বা প্রহৃত হয় নাই। একদিন সেই কুকুর তাঁহার নিকট হইতে এক খণ্ড মাংস চুরি করিয়া লইয়া চেয়ারের উপর গিয়া বসিল। সাহেব যেন তাহা লক্ষ্য করেন নাই এরূপ ভাণ করিলেন। খানিক পরে কুকুরটী আপনা হইতেই সেই মাংস খণ্ড আনিয়া পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিল ও সাহেবের পদতলে মাথা রাখিয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল ও ভারি অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপ করিবার আর কি কারণ থাকিতে পারে ? তাহারা তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইবার আশঙ্কা ছিল না, কারণ সে কখনও তিরস্কৃত বা প্রহৃত হয় নাই। সে যে একটা অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে, এটা বুঝিতে পারিয়াছিল। কোন দ্রব্য প্রভুকে উপহার দিয়া কুকুরকে প্রভুর কোপ শান্ত করিতে দেখা গিয়াছে।

কুকুর ছবি দেখিয়া বাড়ীর কাহার ছবি বুঝিতে পারে। প্রভুর অনুপস্থিতি কালে প্রভুর ছবির পার্শ্বে বসিয়া কত কুকুর প্রভুর সঙ্গসুখ লাভ করে। এইরূপে কত কুকুর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর সমাধিস্থানে দিবারাত্রি বসিয়া থাকে।

পশুপক্ষীদের মধ্যেসৌন্দর্য্যজ্ঞান খুব অধিক, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া

থাকিবেন। এই সৌন্দর্য্যজ্ঞানই ইহাদের যৌননির্ব্বাচনের সহায়তা করে। অনেক জাতীয় পুরুষ পক্ষী আপন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া প্রেয়সীর মন ভুলায়। আর অনেক প্রাণীর মধ্যে স্ত্রীজাতি যৌবনরূপলাবণ্যে পুরুষের মন হরণ করে। যাহার সৌন্দর্য্যযত অধিক, বিবাহ বিষয়ে তাহার তত অধিক সফল হওয়ার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল ও যে সামান্য কয়টী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, তাহাতে সহজেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে যে কারণে মানুষের আত্মা আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সেই সেই কারণে ইতর প্রাণীদিগেরও আত্মা আছে বলিতে হইবে। মানুষের যদি আত্মা থাকে, মানুষের জন্য যদি পরলোক ও পরকাল নির্দ্দিষ্ট থাকে, শরীরান্তে যদি মানবাত্মার কোন গতি হয়; তবে পশুরও আত্মা আছে, পশুর জন্যও পরলোক ও পরকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, দেহান্তে পশুর আত্মারও গতি হইবে। ইহলোকের সংকীর্ণ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া, ভুলভ্রান্তি, অন্ধকার ও মোহের নিগড় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, পশুর আত্মা মানব আত্মার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত লোকে নীত হইয়া কেনই না ক্রমশঃ উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া আত্মার আত্মা পরমাত্মা যিনি তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়া মানবাত্মার সহিত একাসন লাভ করিবে? পশুর আত্মা পরলোকে মানব আত্মার সহিত সমান হইবে, এ কথা অস্বীকার করা নেহাত গায়ের জোর। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন আত্মার পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে কর্ম্মানুসারে অনেক যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। ইতর প্রাণিগণ ক্রমে উচ্চতর জীব হইয়া অবশেষে মানবরূপ ধারণপূর্ব্বক মুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহারা আত্মাকে পরলোকে বহুকাল ধরিয়া অবস্থান করিতে দেন ও সেই স্থানেই আত্মা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, বলেন। পুনর্জ্জন্মবাদীরা সকলেই পশুর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁহাদিগকে আমার বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। তবে যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন না, তাঁহারা প্রায় সকলেই পশুর আত্মায় বিশ্বাসও করেন না। তাঁহাদিগের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন যে আপনাদিগের প্রতি বিশেষ মমতা বশতঃ যখন তাঁহারা স্ব স্ব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত সংশয়হীন হইয়া বসিয়া আছেন, তখন নিজের অহমিকা ও গর্ব্ব কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া ঈষৎ কৃপাপুরঃসর সেই স্বাভাবিক মমতা টুকু চতুষ্পার্শ্বস্থিত ইতর প্রাণীদিগের

প্রতি প্রসারিত করিয়া যেন তাঁহারা তাহাদের আত্মার অস্তিত্ব বিষয়েও নিভৃতে স্থিরচিত্তে আলোচনা করেন।

মাতৃস্নেহ।

বৈশাখের খর রবি উঠেছে আকাশে;
ঝরিছে অনল ধারা, তাপদগ্ধ বসুন্ধরা,
বিশুষ্ক কাননভূমি দাবানল শ্বাসে॥
নিস্তব্ধ, বিজন পল্লী যেন প্রাণিহীন;
মানব গৃহের তলে, পশুকুল তরুমূলে,
বিহগ পত্রের আড়ে, হয়েছে নিলীন॥
কেবল নিকুঞ্জে কোথা বসিয়া আঁধারে
তৃষিত চাতক দল, যাচিছে "ফটিক জল,"
কভুবা দয়েল এক ডাকে তরু'পরে॥
কেবল নিদাঘ-মাধ্য উত্তপ্ত পবন,
আন্দোলিয়া তরুশির হুহুরবে সুগভীর
প্রচণ্ড নিশ্বাস যেন করিছে ক্ষেপণ॥
নাহি কণ্ঠস্বর কোথা নীরব সকল।
কিন্তু একি পরমাদ সহসা ক্রন্দন নাদ
উঠিল, বিদারি যেন আকাশ মণ্ডল॥
"আগুন আগুন" বলি উথলিল রোল,
শিশু যুবা সবেমিলে ধায় ছুটি দলে দলে,
"কি হলো, কি হলো," মুখে সবাকার বোল॥
দেখিতে দেখিতে বহ্নি ব্যাপিল আকাশ,
লোহিত বরণে মাখা লক্ লক্ অগ্নি শিখা
বিস্তারি বদন গৃহ করিয়াছে গ্রাস॥
হুহু হুহু অনলের গভীর গর্জ্জন।
চৌদিকে স্ফুলিঙ্গ ছুটে ফট্ ফট্ কাষ্ঠ ফাটে
ধূমে আবরিত দিক্, না চলে নয়ন॥

ব্যতিব্যস্ত পল্লীবাসী চারিদিকে ধায়।
কেহ ছুটে বারিতরে কেহবা চীৎকার করে
বসন, ভূষণ, শয্যা কেহ টানে হায়॥
দাঁড়াইয়া একদিকে মলিন বদনে,
বিষাদে সজল আঁখি ললাটে অঞ্চল ঢাকি
পুরাঙ্গনাগণ সবে চেয়ে অগ্নি পানে॥
চারিদিকে শিশুগুলি ঘিরে দাঁড়াইয়া,
কভু জননীর মুখে কভু অনলের দিকে
উদাস সজল নেত্রে দেখিছে চাহিয়া॥
"দপ্ দপ্" জ্বলে বহ্নি যেন দাবানল।
গৃহ হ'তে গৃহ চূড়ে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া পড়ে,
কার সাধ্য সে অনলে ঢালে বিন্দু জল!
সহসা জননী এক কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে,
"ওগো মোর কি হইল সুরমা কোথায় গেল?"
বলিয়া, ধাইলা সেই অগ্নির ভিতরে॥
তিন বৎসরের মেয়ে সুরমা তাহার,
আপন শয্যায় শুয়ে ছিল বাছা ঘুমাইয়ে,
সহসা প্রবল বহ্নি ঘিরিল আগার॥
চমকি উঠিয়া শিশু অগ্নির গর্জ্জনে,
বাহির হইতে যায়, পথ খুঁজি নাহি পায়,
"মা মা" বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে প্রাণপণে॥
উন্মাদিনী সম মাতা ছুটি অগ্নি পানে,
"ভয় কি মা সুরমণি, এই যে এসেছি আমি"
বলিয়া শিশুরে বুকে লইলা যতনে॥
বাহিরে প্রচণ্ড বহ্নি উঠিল গর্জ্জিয়া,
অগ্নিময় ভস্মরাশি আবরিত করি দিশি,
স্তূপাকারে গৃহ মাঝে পড়িল খসিয়া॥
ব্যাকুলা জননী, কিছু না পান উপায়।
শিশুরে হৃদয়ে রাখি, যতনে অঞ্চল ঢাকি,
উন্মাদিনী সম দ্বারে ছুটিলেন হায়॥

পলাইল গ্রাস ভাবি বুঝিবা অনল,
ক্ষুধিত রাক্ষস প্রায় ছুটিয়া পশ্চাতে হায়
আক্রমিল জননীর বিলোল অঞ্চল॥
অনল প্রতিমা যেন শোভিলা জননী,
"দাউ দাউ" কেশ দলে দীপ্ত বহ্নিশিখা জ্বলে
অনলে মণ্ডিত বাস লোটায় ধরণী॥
দগ্ধ জননীর দেহ প্রচণ্ড অনলে,
তবুও শিশুরে লয়ে যতনে হৃদয়ে থুয়ে
বাহির হইয়া, মাতা পড়িলা ভূতলে॥
ঘিরিলা চৌদিক হ'তে যত বন্ধু জন।
কেহবা বীজন করে কেহ ছুটে বারিতরে
সযতনে চুমে কেহ শিশুর বদন॥
হাসিল অবোধ শিশু হেরি নিজ জনে।
জানেনা জননী তার কেন পড়ি শবাকার;
"উঠমা উঠমা" বলি ডাকে সযতনে॥
শিশুর করুণ স্বরে ফিরায়ে বদন,
একটী বারের তরে জননী চাহিয়া ফিরে,
জনমের মত হায়! মুদিলা নয়ন॥

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

প্রতিশোধ।

ভারতাক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরী পঞ্জাবের অন্যতম অধিবাসী গোক্ষুর জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত এবং প্রায় সমূলে বিনষ্ট করেন। যুদ্ধাবসানে তিনি একদিন সন্ধ্যার সময় নিজ মনোরথ সিদ্ধির জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে পয়গম্বরকে ধন্যবাদ প্রদান এবং বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার্থ শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার একজন প্রধান সেনাধ্যক্ষ সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক করযোড়ে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোরী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ? কেনই বা এত অস্থিরের মত হইয়াছ? আমার নিকট কি কিছু বলিবার আছে?"

সৈনিক বলিল, "ধর্ম্মাবতার, যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে যাহা বলিবার আছে ; প্রকাশ করি।"

"তোমার অলঙ্কারের ঘটাচ্ছটা সংক্ষিপ্ত করিয়া যাহা বলিবার আছে, শীঘ্র বল।" ঘোরী যেন মহা বিরক্ত হইয়া এই কথা কয়টী বলিলেন। সৈনিক বলিতে লাগিল—"জাঁহাপনা, যুদ্ধে আপনার মত বীর কদাচ দেখা যায় না। আপনার মত ধর্ম্মে আস্থা কাহারও নাই। আপনি কি যুদ্ধে, কি রাজকার্য্যে, সকল বিষয়ে সুনিপুণ। আপনি দেশবিদেশ জয় করিতে ভালবাসেন। তরবারির বিদ্যুৎ-ঝলকে আপনার মনে পুলক হয় ; কিন্তু প্রভু, সুন্দরীর হাসি দেখিতে কি আপনার আনন্দবোধ হয় না ?" রমণীর কথা শুনিয়া ঘোরীর হৃদয় নাচিয়া উঠিল—তিনি যুদ্ধের কষ্ট ভুলিয়া অনুচরকে রহস্যচ্ছলে বলিলেন, "বাঃ, তুমি কেমন লোক হে ? তুমি এ প্রশ্ন সুধাইতেছ কেন ? তুমি জান যে আমি মানুষ। মানুষ বিলাসদ্রব্য ভালবাসে ! আমিও মানুষ হইয়া কি তাহার অনাদর করিতে পারি ?"

অনুচর সৈনিক হাসিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, আপনি যদি আদেশ করেন তাহা হইলে এই দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে আপনার পরিতৃপ্তির জন্য আনিয়া দিতে পারি।"

মহম্মদ প্রীত হইয়া বলিলেন, "তাহা যদি পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।"

অনুচর অবিলম্বে তথা হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইল। ঘোরীও প্রলুব্ধ হইয়া অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে কত কি কল্পনা জাগিতে লাগিল। কিছুকাল অপেক্ষার পর উক্ত কর্ম্মচারী একটী অতুলনীয়া সুন্দরী যুবতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। ললনার অপরূপ রূপলাবণ্য, দেহকান্তি ও মুখের সরলভাব দেখিয়া ঘোরীর চিত্ত বিকলিত হইল। দুরাচার অবলার রূপে অন্ধ হইয়া গেল। রাজানুচর তাহাকে রাজার নিকটে যাইতে আদেশ করিল। অসহায়া যুবতী ধীরে ধীরে ঘোরীর নিকটবর্ত্তী হইল। রাজাকে দেখিয়া তাহার ভয়, লজ্জা, দুঃখ ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। অত্যাচারী ঘোর পাষণ্ড ঘোরীর মূর্ত্তি দেখিয়া হতভাগিনীর গণ্ডস্থল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, এবং আশু বিপদ দেখিয়া চক্ষে জল আসিল—ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। অধীরা, ভয়বিহ্বলা, বন্দিনী যুবতী মহম্মদের পদতলে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য কাঁদিতে

লাগিল। তাহার এবম্বিধ অধীরতা ও ক্রন্দন দেখিয়া ঘোরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি, তোমাকে কেহ কি কোনরূপ কষ্ট দিয়াছে ? তুমি শান্ত হও, আমাকে ভয় করিও না। তোমার উপর আর কেহই অত্যাচার করিতে পারিবে না।" তৎপরে কর্ম্মচারীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর সামগ্রী তোমরা কোথা হইতে আনিলে ?" চাটুকার যোড়হস্তে বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা, আপনার জন্য আমরা কি না করিতে পারি ? আকাশ হইতে চাঁদ তুলিয়া আনিতে যদি হুকুম দেন, তাহাও আমরা অক্লেশে পারি। এই সুন্দরীকে আমরা নিকটবর্ত্তী সহর হইতে আনিয়াছি। কিছুদিন আগে আমরা সহর দেখিতে যাই। সেখানে যাইয়া একটী কুটীরে ইহাদের তিন জনকে পাই। ইহারা তিন জনে একটি ক্ষুদ্রমঞ্চে বসিয়া কি প্রার্থনা করিতেছিল—আর কাঁদিতেছিল। তাহা দেখিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইল। ভাবিলাম, জাঁহাপনার কাছে ইহাদিগকে আনিয়া দিলে ইহারা সুখী হইবে। তাই ইহাদিগকে আনিয়াছি। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী তাই হুজুরের নিকট ইহাকে আনিয়াছি।"

ঘোরী অনুচরকে স্বস্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। সে দুই হস্তে সেলাম করিতে করিতে চলিয়া গেল। সৈনিক চলিয়া গেলে পর ঘোরী যুবতীকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ঘোরী তাহার আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিনাশ করিয়াছে। সকলেই গিয়াছে, এখন সে নিজেই অত্যাচারীর বন্দিনী। হতভাগিনী রাগে ও দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। ঘোরীর আশ্বাসে তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে বলিল,—"নির্দ্দয়, পাপী, তোর জন্য আমি পিতামাতা, ভাই বন্ধু সকলকে হারাইয়াছি। তুই সকলের রক্ত পান করিয়াও সন্তুষ্ট ন'স্ ? তোর কি মৃত্যু নাই ?"

তাহার সে তেজ, সে মনের বল দেখিয়া মহম্মদের হৃদয় বিচলিত হইল ; তাহার চক্ষের জল দেখিয়া নির্দ্দয়ের মন একটু নরম হইল। তিনি তাহাকে তাহাদের দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। সে অতি সংক্ষেপে তাহাদের সমুদয় কথা বলিল। তাহার পিতা গোক্ষুর সর্দ্দার ছিল ; তাহারা সবে ভাই বোনে দুই জন ; ভাই পিতার কীর্ত্তি অনুসরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সে তাহাদের দলের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা হইয়াছে। তাহাদের বাটীর কাছে আর একজন সর্দ্দারের বা'টী ছিল। সেই

সর্দ্দারের ইহসংসারে একমাত্র পুত্র ছাড়া আর কেহই নাই। সর্দ্দার-পুত্র তাহার প্রণয়ী। কিছুদিন হইল উভয়ের পিতা খুব জাঁক জমক করিয়া উভয়কে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা সুখে দিন কাটাইতেছিল। বিবাহের দুই মাস পরে মুসলমানগণ পঞ্জাব দেশ আক্রমণ করে। নবদম্পতির সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার স্বামী রণক্ষেত্রে আহূত হইলেন। পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, আত্মীয় সকলেই যুদ্ধে গেলেন; সেই যে তাঁহারা সকলে রণে গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত সে তাঁহাদের কাহারও সংবাদ পায় নাই। যখন উপরোক্ত সৈনিক তাহাদের কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের তিন জনকে বন্দী করিয়া আনে, তখন তাহারা আত্মীয়দিগের কল্যাণার্থ দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল। অপরা দুই রমণী তাহার মাতা ও ভ্রাতৃজায়া। পাপিষ্ঠেরা তাহাদের চোখের জলেও বিচলিত না হইয়া বলপ্রকাশে, নানা অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়াছে।

আত্মীয়দিগের দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে অভাগিনীর চক্ষের জলে বক্ষ সিক্ত হইয়া গেল। ঘোরী পিশাচ, ঘোরী লম্পট! পশু তাহাকে বঞ্চনা করিল। অসহায়া সরলা যুবতী তাহার কুহক বুঝিতে পারিল না। সে তাহার আশ্বাসে গলিয়া গেল। ঘোরী তাহাকে বশে আনিবার জন্য খুব দয়া দেখাইতে লাগিল। বন্দিনী সবে বালিকাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার বালিকাসুলভ সরল ভাব আজও যায় নাই। মহম্মদ ঘোরীর তাদৃশ যত্ন ও দয়া দেখিয়া সে সব কষ্ট ভুলিয়া গেল। তাহার রাগ দূর হইল। ঘোরী তাহার পিতা মাতা ও স্বামীর সহিত মিলন করাইয়া দিবেন, এই আশ্বাসে সে আনন্দিত হইল, ঘোরীর অন্তরের কথা বুঝিতে পারিল না। এদিকে ঘোরী তাহাকে বশ করিবার জন্য ফাঁদ পাতিল। অপরিমিত স্নেহ দয়ায় সে ফাঁদে পড়িল। ঘোরীর উপর তাহার যে ক্রোধ ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। সে ভাবিল, ঘোরী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। আশ্রয়দাতা যে, সে কখনই অমঙ্গল করিবে না। বালিকা ক্রমে ক্রমে ঘোরীর উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত হইল। দিনের পর দিন এই রূপেই যাইতে লাগিল। সরলা বালিকা তাঁহাকে এখন সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছে, তাঁহার বশ হইয়াছে। কিন্তু বালিকার অভয়দাতা তাহার সম্মান রক্ষা করিল না।

মহম্মদ ভারতীয় রাজকার্য্যাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া গজনীতে ফিরিয়া

যাইবার মনন করিলেন। লাহোর হইতে শিবির উঠান হইল। ঘোরী গৃহাভিমুখে চলিলেন, সঙ্গে সেই বন্দিনী যুবতীকে লইলেন। তাহার দুঃখের আর পার নাই। সে এখন শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছে। মহম্মদ তাহার সতীত্ব হরণ করিয়াছে। সে এখন দিন রাতই ভাবে যে কি করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। জীবনের সব মমতা পরিত্যাগ করিয়াছে, মরিতে সে ভয় করে না। ঘোরীর উষ্ণ রক্তে স্নাত হইয়া সে যদি মরিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। অভাগিনী সর্ব্বদাই সেই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। এক দিন সে কুহকে ভুলিয়াছিল, কুহকে ভুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। আজ সে কুহকজাল বিস্তার করিয়া ঘোরীকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইল। সে আর কাঁদে না। আর দুঃখ করে না, ঘোরীর প্রতি ঘৃণা বা রাগ প্রদর্শন করে না। ঘোরীর কাছে বসিয়া সে এখন হাসে, সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতে চেষ্টা করে। মহম্মদ তাহার হৃদয়ের গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না।

লাহোর ছাড়িয়া কিছুদূর আসিয়াছেন, একটি মাঠের মধ্যে ছাউনি পড়িয়াছে। মহম্মদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ। ভোগবিলাসের মধ্যে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। শিবিরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত। মহম্মদ তাহাতে ভাসমান। এইরূপ আনন্দ উৎসবে দিন কাটাইতেছেন, এমন সময় একদিন দুইটী গোক্ষুর যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কর্ম্মচারী রাজসমীপে তাহাদের আগমনবার্ত্তা প্রচার করিল; ঘোরী তাহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন। এ সময়ে তাহারা তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করে? যাহা হউক, ঘোরী তাহাদিগকে আনিতে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজসন্নিধানে আনীত হইলে মহম্মদ তাহাদের শরীরের হৃষ্টপুষ্টতা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে ইহারা সৈনিক। কিন্তু সাধ করিয়া তাহারা মরিতে আসিয়াছে কেন? তিনি তাহাদিগকে তাঁহার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন; যুবকদ্বয় কাছে আসিল। তাহারা উভয়েই বেশ সুশ্রী ও বলবান; উভয়েই তেজস্বী, উভয়েই সাহসী,—ঘোরী সে মূর্ত্তিদ্বয় দেখিয়া একটু ভীত হইলেন। অতঃপর ভ্রূকুটি করিয়া যুবকদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কি জন্য এখানে আসিয়াছ? স্বাধীনতা বুঝি আর তোমাদের ভাল লাগে না, তাই আমার হাতে আত্মদান করিতে আসিয়াছ?"

তাহারা ঘোরীর এতাদৃশ বিদ্রূপাত্মক কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। মুখ লাল হইল, চক্ষু দিয়া যেন স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। দারুণ ঘৃণার সহিত তাঁহার দিকে ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। উভয়ে কিছুকাল স্বদেশীয় ভাষায় কি বলাবলি করিল। মহম্মদ তাহাতে খুব বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার জন্য আজ্ঞা দিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহারা শান্তভাব ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে বসিয়া পড়িল।

ঘোরী প্রথম হইতেই তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বাস্তবিকই তাঁহার ভয় হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহাদের বিনম্রতা দেখিয়া একটু নরম হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও? যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহাই তোমাদিগকে দিব। আর যদি তাহা না দিতে পারি, তাহা হইলে তোমরা নির্ব্বিঘ্নে দেশে চলিয়া যাইতে পাইবে। আমি তোমাদের স্বাধীনতা হরণ করিব না। বল, তোমরা কি চাও?"

বন্দিনী যুবতী ঘোরীর কাছে দাঁড়াইয়াছিল। যুবকদ্বয়কে দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। সে তাহাদিগকে চিনিতে পারিল। যুবকদ্বয় যুবতীকে দেখিয়া কাতরস্বরে বলিল, "রাজেন্দ্র, আমাদের প্রতি যখন দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমাদের আগমনের কারণ বলি। আমরা ঐ যুবতীকে চাই। যুবতী আমাদের আত্মীয়া।"

পাঠক! যুবকদ্বয়কে চিনিতে পারিয়াছেন কি? একজন যুবতীর স্বামী; অপর তাহার ভ্রাতা।

ঘোরী তাহাদের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি কিছু গর্ব্বিত মেজাজে অথচ উপহাসচ্ছলে বলিলেন:—"ও আল্লা! তোমরা আমার "দিলজান"কে চাও? যাহার কটাক্ষে স্বর্গ আলোকিত হয়, যাহার কণ্ঠধ্বনিতে পৃথিবী আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহাকে তোমরা চাও? তাহা হইবে না। আমি আমার হৃদয়স্বর্গ অন্ধকার করিয়া তোমাদের মত অসভ্যদিগের হস্তে এই "নূরকে" দিতে পারি না। এ "হুরী" কি তোমাদের কাছে থাকা শোভা পায়? এ আশা পরিত্যাগ কর।"

যুবকদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আমাদের ধন, আমাদিগকে দিবেনা? আমাদের স্ত্রী, ভগ্নীকে তুমি দিবে না?" ঘোরী ভ্রূকুটীসহকারে বলিলেন, "এত

স্পর্দ্ধা তোমাদের? এ 'হুরী' আমার, তোমাদের নয়। আমার বিলাসের সামগ্রী তোমাদিগকে দিব? বলিতে মনে ভয় হয় না? প্রাণের মমতা কি তোদের নাই? রাজা যখন এ সুন্দরীর প্রতি আসক্ত, তখন তোমরা কখনই ইহাকে পাইতেছ না। এ আমার সঙ্গে যাইবে। গজনীর বেগম মহল ইহার রূপে আলোকিত হইবে।"

যুবকদ্বয় আর কিছু বলিল না। রাগে অভিমানে তাহাদের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে কোন ফল ফলিবে না দেখিয়া তাহারা বিদায় চাহিল। প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার বাসনা মনে জাগিল। বিদায় পাইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

গৌরামী বান্দিবা পতি ও ভ্রাতার জন্য আকুলিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাঁহারা চলিয়া গেলে সে বিষাদ ভরে—প্রাণের জ্বালায় কাতরা হইয়া পড়িল। নির্দ্দয় যবনরাজের মন তাহাতে আর্দ্র হইল না। পাষণ্ডের মন তাহার চোখের জলে ভিজিল না। ঘোরী শিবির উঠাইতে আদেশ করিলেন। দুই দিনের পর তাঁহার সৈন্যদল নীলাব নদীতীরে রিমিক নামক স্থানে বিশ্রামার্থ পুনরায় ছাউনি ফেলিল।

রিমিক স্থানটী বড় রমণীয়! চারিদিকে অনন্তশায়িত প্রান্তর, সম্মুখে নীলাব নদী ধীরে ধীরে প্রবাহিত; উত্তরে পর্ব্বতমালায় পরিশোভিত। ঘোরী নদীর নির্ম্মল ও মুক্ত বায়ু সেবন করিবেন বলিয়া তাঁহার শিবির নদীতটে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। শিবির সংস্থাপিত হইল, তিনি সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহম্মদ সমীর সেবনার্থ বাহিরে আসিয়া বসিলেন। পশ্চিমগগন পানে তাকাইয়া দেখিলেন, অস্তগামী সৌরকররাশি মেঘমালায় প্রতিবিম্বিত হইয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। সেই সপ্তবর্ণবিশিষ্ট কাদম্বিনী-ছায়া নীলাবের তরঙ্গমালার উপর পতিত হইয়া তক্ তক্ করিয়া স্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইতেছে। সান্ধ্য প্রকৃতি আলো ও আঁধারে মিশিয়া মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করিয়াছে। গৌরামী নদীতটে আসিয়া মহম্মদের কাছে বসিয়া এই মনোরম নৈসর্গিক শোভা দেখিতেছিল। প্রথমে নিজ পতি, ভ্রাতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে পড়িল। গৃহের কথা স্মরণারূঢ় হওয়ায় তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ আকুলিত হইল, বিষাদ আসিয়া তাহার হৃদয়কে চাপিয়া ধরিল। বালিকা গৌরামী ব্যথাভরা হৃদয় লইয়া সাঁঝের পশ্চিম আকাশ পানে তাকাইল। নিসর্গের

শোভার মধ্যে তাহার হৃদয়ব্যথা ডুবিয়া গেল, সে সব ভুলিয়া গেল। নিসর্গ-ছবি-মুগ্ধা বান্দিবা মহম্মদকে মনের আবেশভরে বলিল, "আহা, কি সুন্দর আকাশ, স্থানটীও বড় সুন্দর।"

মহম্মদ বান্দিবার কথা শুনিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন; গৌরামীর ভুল ভাঙ্গিল। নিসর্গরূপ মদিরা-জনিত নেশা টুটিয়া গেল। রাক্ষসের আলিঙ্গন পাশ হইতে একটু সরিয়া বসিল। ঘোরী হাসিয়া বলিলেন, "বাস্তবিকই সুন্দরি, এইরূপ রমণীয় স্থানে মরিতে আমার সাধ যায়। এইরূপ মধুরপ্রাকৃত মাধুরীর মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়; হায়, এইখানেই যদি মরিতে পারিতাম!"

সন্ধ্যা হইয়াছে। দিনমণি বিশ্বাসঘাতক যবনকে আর প্রকৃতির শোভা দেখিতে দিলেন না। তিনি চলিয়া গেলেন এবং ধরাকে গ্রাস করিবার জন্য অমাবস্যার অন্ধকার রজনীকে প্রেরণ করিলেন। ঘোরী যে সময় বান্দিবাকে উক্ত কথাগুলি বলিলেন, তখন তাহার দৃষ্টি উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতমালার দিকে ছিল। মহম্মদের কথা শেষ হইলে বালিকা একটু কাঁপিয়া উঠিল। ঘোরী তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু সহসা এ কম্পনের অর্থ কি? তবে কি বান্দিবা তাঁহাকে ভালবাসে? তাই তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল? তা নয়; পূর্ব্বেই বলিয়াছি গৌরামী পর্ব্বতমালার দিকে তাকাইয়া একদৃষ্টে কি দেখিতেছিল। সে দেখিতেছিল, অনেক দূর হইতে একদল সুসজ্জিত লোক তাহাদের দিকে আসিতেছিল। ঘোরী কিছুই দেখিতে পান নাই, বান্দিবাও তাঁহাকে কিছু বলিল না। উভয়ে নির্দ্দিষ্ট শিবিরে চলিয়া গেলেন। যথাবিধি আমোদ আহ্লাদের পর বিশ্রামার্থ সকলে শয়ন করিল।

অমাবস্যার রাত্রি। ঘোর অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না, সব আঁধারে মিশিয়া গিয়াছে। আজ যেন ভারতে অমাবস্যার অন্ধকার গাঢ়তম হইয়াছিল। বিধাতা যেন প্রপীড়িতদিগের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্যই ঘোর অন্ধকার ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল; ছাউনীতে শব্দ নাই; সকলেই ঘুমাইয়াছে। বিগত যুদ্ধে বহুপরিশ্রম করায় ক্লান্ত সৈন্যগণ এখন অকাতরে নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাজশিবিরের প্রহরীগণও নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল।

বিংশজন গোক্ষুর সর্দ্দার নীলাব নদীর অপর পারস্থ অরণ্য মধ্যে লুক্কায়িত

থাকিয়া শীকারের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। তাহারা অগ্রে চর প্রেরণ করিয়াছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মৃদু সিঙ্গাধ্বনি হইল। অপরাপর সঙ্গীরা ইঙ্গিত বুঝিয়া নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া অতি সন্তর্পণে অপর পারে আসিয়া সঙ্গীর সহিত মিলিত হইল। তাহারা শব-অন্বেষ্টা শিবার ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলেরা সুযোগ পাইল। সর্ব্বপ্রথমে বান্দিবার সাক্ষাৎ মিলিল। বান্দিবা অতি সতর্ক হইয়া তাহাদিগকে লইয়া রাজশিবিরে প্রবেশ করিল।

ঘোরী অকাতরে ঘুমাইতেছেন। শিবিরের এক পার্শ্বে একটি আলো মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। ঘোরীর পার্শ্বে নিষ্কোষিত যুদ্ধ তরবারী প্রভুর সহিত এক শয্যায় শুইয়া আছে। বান্দিবা ধীরে ধীরে সেই অসি তুলিল। মহম্মদের মুখের দিকে তাকাইল; ঘোরী স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কাহার যেন ছবি দেখিয়া মধুর হাসিতেছিলেন; হাসি অধরে মিলাইতে না মিলাইতে ধীরেনীরবে বান্দিবার অসি তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বিংশখানি শাণিত ছুরিকা আমূল সর্ব্বশরীরে প্রবিষ্ট হইল। গজনীরাজের ঘুম ভাঙ্গিল, একবার—শেষবার চোখ মেলিলেন, আবার চক্ষু নিমীলিত হইল; মুখে একটী কথাও সরিল না। তাঁহার জীবনের সব শেষ হইল—সন্ধ্যাকালের সাধ দ্বিপ্রহর রজনীতে মিটিল। শোণিত শয্যা সিক্ত করিয়া মেদিনী স্পর্শ করিল। সকলে আলোক নিবাইয়া দিয়া নদী পার হইল। গৌরামীর স্বামী তাহাকে গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সে অপবিত্র শরীর লইয়া গৃহে যাইতে স্বীকৃত হইল না। ঘোরীর উন্মুক্ত অসি নিজবক্ষে বসাইয়া দিল; রক্তধারা ছুটিল—গৌরামী স্বামীর পদতলে পড়িয়া গেল। দুই চারি বার ছটফট করিয়া স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া সে স্থির হইল। বান্দিবার স্বামী একবিন্দু অশ্রু পরিত্যাগ করিয়া শব উত্তোলনপূর্ব্বক বক্ষে উঠাইয়া নদীপানে চলিলেন। নদীতীরে আসিয়া মৃতা স্ত্রীর অধরে বারেক নিজ অধর মিলাইয়া নদীগর্ভে শব নিক্ষেপ করিলেন। সোনার প্রতিমা গৌরামীকে—হৃদয়প্রতিমা আদরিণীকে নদীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমতীন্দ্রমোহন বসু।

হরিদাসের জন্ম ও হরিনাম কীর্ত্তন।

"প্রভো—হে করুণাময়! তুমি ইহাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর! হায়! ইহারা কি করিতেছে, আপনারা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না; তুমি নিজ-গুণে ইহাদিগকে ক্ষমা কর।" কয়েকটী মুসলমান একটী দরিদ্র ফকিরকে নিদারুণ প্রহার করিতেছিল, আর ফকির উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের কাছে তাহাদের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন। "ইহাদের গতি কি হইবে?" এই ভাবনায় ফকির কাতর ও অভিভূত হইয়া মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। নিদারুণ প্রহারে সাধু ফকিরের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, অঙ্গ ফুটিয়া স্থানে স্থানে শোণিত ক্ষরিত হইতেছিল, সেদিকে সাধুর ভ্রূক্ষেপ নাই। যাহারা নিরপরাধে তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল, দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাদেরই জন্য তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাদেরই জন্য কাঁদিতেছিলেন। ধন্য সাধু,—ধন্য তাঁহার সহৃদয়তা!

এই অসাধারণ সাধুপুরুষটী কে? বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, ইনি সুপ্রসিদ্ধ হরিদাস।

হরিদাস যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন এদেশে মুসলমানের প্রভাব অতি প্রচণ্ড; অত্যাচারী যবনরাজের পীড়নে দেশ তখন নিতান্ত প্রপীড়িত; হিন্দুদিগকে ভয়ে ভয়ে মান সম্ভ্রম রক্ষা ও স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্ম সংসাধন করিতে হইত। পক্ষান্তরে, ধর্ম্মজগতে তখন স্বেচ্ছাচার পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত; কেহ কাহাকেও মানে না, কেহ কাহারও কথা শুনে না। বৌদ্ধধর্ম্মের মত তখন কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, পৌরাণিক ভক্তিবাদ তখন লুক্কায়িত বলিলেও হয়। সময় বুঝিয়া ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন তান্ত্রিকদল তখন মাথা তুলিয়াছে,—বামাচারী—কাপালিক—অসংখ্য শ্রেণী!! বস্তুতঃ রক্তচন্দন-চর্চ্চিত-কপাল মদ্যমাংসাশী তান্ত্রিকদের অনাচারে সমস্ত দেশ তখন প্রাণশূন্য। যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও সুধু জ্ঞানচর্চ্চায় শুষ্কহৃদয়—ভক্তিশূন্য।

দেশের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ভক্তির ভাণ্ডার হৃদয়ে ধারণ করিয়া করুণহৃদয় হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন।

হরিদাস যবন-কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। যদি হরিদাস যবন, তবে

তাঁহার হিন্দু নাম হইল কেন? না, হরিদাস যবন নহেন,—যবন-পালিত, যবনকর্ত্তৃক রক্ষিত; সুতরাং জাতিভ্রষ্ট। জাতিভ্রষ্ট বলিয়াই "যবন হরিদাস" নামে তিনি প্রসিদ্ধ।

যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগ্রাম সবডিভিজনের নিকটে প্রাচীন বুড়ন গ্রাম। এই বুড়ন গ্রামে এক দরিদ্র দ্বিজ-দম্পাতি বাস করিতেন। ইহারা অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, নির্জ্জনে আপন মনে হরিভজন করিতেন; অমায়িকতায় ও মধুর চরিত্রে সমস্ত গ্রামবাসী ইঁহাদিগকে ভালবাসিত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই সুমতি শর্ম্মা ও গৌরী দেবীকে ভক্তি করিত। হরিদাস এই ভক্ত-দম্পতির উপযুক্ত পুত্র।

হরিদাস ১৩৭১ শকাব্দে মার্গশীর্ষ মাসে বুড়নে জন্মগ্রহণ করেন। সুমতি ঠাকুর হরিভক্ত ছিলেন—পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার বিশ্বাস, ভগবন্নামে আর ভগবানে কোনও পার্থক্য নাই—"অভেদ নামনামিনঃ।" অতএব তিনি পুত্রের নাম ব্রহ্মহরিদাস রাখিলেন। অভিপ্রায় যে, পুত্রকে আহ্বান করিতেও স্বীয় ইষ্ট নাম উচ্চারিত হইবে। এই উৎকৃষ্ট ধারণাটী ভারতবাসীর মজ্জাগত ছিল; "ছিল" বলিতেছি, কেন না এখন সে হিসাব অল্প লোকেই করিয়া থাকেন।

হরিদাসের বয়স যখন ছয়মাস, তখন সুমতি ঠাকুর পরলোক যাত্রা করেন। ছয়মাসের শিশু পুত্র লইয়া গৌরীদেবী অকুল সংসারসাগরে ভাসিলেন! কিন্তু গৌরীদেবীর ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর সঙ্কল্প ছিল যে, তাঁহার একটী সন্তান হইলেই তিনি সংসার ত্যাগ করিবেন। কালে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল, স্ত্রী পুত্র প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীধরস্বামী এখন কি করিবেন? পুত্র রক্ষার ভার কাহাকে দিবেন? দৈবাৎ একটী টিক্‌টিকী ডিম্ব তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল, পতনাঘাতে ডিম্ব ভাঙ্গিয়া গেল ও তাহা হইতে পূর্ণাবয়ব একটী টিক্‌টিকীছানা বাহির হইল। দেখিতে দেখিতে ছানাটী সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র কীটাণু ধরিয়া আহার করিল! শ্রীধরস্বামী আপন প্রশ্নের উত্তর পাইলেন। নিরাশ্রয় টিক্‌টিকীছানার আহারদাতা যিনি, তাঁহার চরণে সদ্যোজাত শিশুকে সমর্পণ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন!!

গৌরীদেবী ভাবিলেন—যিনি গর্ব্ভের মধ্যে সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সন্তান প্রসবের পূর্ব্ব হইতেই যাঁহার চিন্তা, তখন হইতেই যিনি মাতৃস্তনে

দুগ্ধ-সঞ্চার করেন, হরিদাসকে তিনি রক্ষা করিবেন। সন্তানের মায়ায় তিনি ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না, ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। গৌরীদেবী হরিদাসকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলেন; করিয়া স্বামীর জলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক তৎসহগামিনী হইলেন !!

ছয়মাসের শিশু—কাছে কেহ নাই, ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ দৃশ্য দর্শনে সুমতির একটী মুসলমান প্রতিবাসীর হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি পিতৃমাতৃহীন হরিদাসকে অতি যত্নে আপন আবাসে লইয়া গেলেন ও পুত্র-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবনগৃহেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণসন্তানের যবনত্বপ্রাপ্তি হইল।

হরিদাস যবন-গৃহে প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হরিদাসের প্রতিপালক তাঁহার অন্য কোন নাম রাখিয়াছিলেন কিনা, তাহা আর জানিবার উপায় নাই; রাখিয়া থাকিলে সে যাবনিক নামে তিনি অধিক দিন পরিচিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে,—হরিদাস যবন-সন্তান বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হরিদাস যবন-গৃহে অনেকদিন ছিলেন; কিন্তু যিনি হরির দাস, হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ যিনি প্রাদুর্ভূত, তিনি যবন-গৃহে কত দিন থাকিবেন? যবনের আচার ব্যবহার তাঁহার ভাল লাগিল না, যবন-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার স্বতএব অশ্রদ্ধা জন্মিল।

হরিদাস কাহারো কাছে হিন্দু ধর্ম্মের কোন উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, যাবনিক রীতি নীতি—ধর্ম্মপদ্ধতি বাল্যাবধি দেখিয়া আসিতেছেন, তথাপি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল। ইহা আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু কোকিল-শাবক কাক কর্ত্তৃক পরিপালিত হইলেও কদাপি বায়স-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। যে ব্রহ্মতেজে হরিদাসের জন্ম, যে শোণিত হরিদাসের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, বিচিত্র কি—কালে তাহা আপন প্রভাব প্রকাশ করিবে। বসন্ত সমাগমে নব-পল্লবিত তরু'পরি যখন কলকণ্ঠে কুহুধ্বনি হইতে থাকে, তখন কোকিল-শাবককে চিনিয়া লওয়া কঠিন নহে। তাই,—কয়লাখনিস্থিত হীরকের ন্যায়, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের ন্যায়, হরিদাস স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন।

হরিনাম শুনিলে, কি জানি কেন, হরিদাসের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, প্রতি

অঙ্গ পুলকিত হইত। তাঁহার হৃদয় কেন নাচিয়া উঠিত, হরিদাস তাহা বুঝিতে পারিতেন না। চণ্ডীদাসের একটী পদ আছে, যথাঃ—

"সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

হরিদাসের প্রাণ হরিনাম শুনিলে বাস্তবিকই আকুল হইয়া উঠিত। হরিনাম তাঁহার মরমে পশিয়া গিয়াছিল, তাই তাঁহার "বদন আর ঐ নাম ছাড়িতে পারিত না।"

হরিদাসের যবন-প্রতিপালক তাঁহাকে কত প্রবোধ দিলেন, মাতা (?) কত কাঁদিলেন, হরিদাসের মন ফিরিল না। হরিদাসের পালয়িতা যথাসাধ্য যবনধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন, হিন্দুধর্ম্মের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন, হরিদাসের মন কিছুতেই ফিরিল না। হরিদাসকে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করা গেল,—সব বৃথা, হরিদাসের অটল বিশ্বাস টলিল না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া হরিদাসের পালকপিতা তাঁহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

গৃহত্যাগে হরিদাসের অণুমাত্র দুঃখ হইল না, সানন্দচিত্তে তাহা ভগবদাশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ভগবন্নিন্দারূপ সুবিষাক্ত শরে আর জর্জ্জরিত করিবে না, প্রাণ ভরিয়া আপাততঃ হরিনাম গান করিতে পারিবেন,—হরিদাসের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি প্রফুল্লচিত্তে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, ও নিকটবর্ত্তী বেণাপোলের জঙ্গলে (বনগ্রামের নিকট,—এখন রেলওয়ে ষ্টেশন) এক কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এতদিন হরিদাসের হিন্দুয়ানি অন্তরেই ছিল, এখন স্বাধীন হইয়া হরিদাস প্রকাশ্যভাবে হিন্দুরীত্যনুসারে ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কুটীরের দ্বারে তুলসীর বেদী করিলেন, গলায় তুলসীর মালা পরিলেন, আর তুলসীর মালায় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের বিশ্বাস,—যে কেহ হউক না কোন প্রকারে একবার হরিনাম লইলেই তরিয়া যাইবে। জপ করা দূরের কথা, তাঁহার বিশ্বাস,—হরিনাম শুনিলেও জীবের অবিদ্যাবন্ধন দূরীভূত হয়; সুতরাং হরিদাস চুপে চুপে নাম জপ না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে করিতেন। এইরূপে হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন।

এখন, যদি অতি দ্রুত হরিনাম করা যায়, লক্ষ নাম জপ করিতে তথাপি ছয় ঘণ্টা সময় লাগে; তিন লক্ষ নাম জপ করিতে এইরূপে ১৮ ঘণ্টার

কমে হয় না; সুতরাং হরিদাস প্রায় দিবানিশি নামাবেশে বিভোর থাকিতেন।

এ জগত আনন্দের অন্বেষণে ব্যস্ত। কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, কেহবা প্রণয়াদির জন্য লালায়িত; কিন্তু সবাই এক আনন্দ অন্বেষণ করিতেছে। হরিদাস নামানন্দে বিভোর থাকিতেন, তিনি আহারোপার্জ্জনের চেষ্টা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। নামে এমন এক আনন্দ নিহিত আছে, এমন এক রস আছে, যাহার সমতুল্য হরিদাস এ জগতে আর কিছু পাইতেন না। নাম তাঁহার কাছে মিষ্ট হইতে মিষ্টতর লাগিত, সে অপূর্ব্ব রস আস্বাদনে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণাও অনেক সময় বোধ হইত না।

অশেষ ক্লেশ সহিয়া অমুক স্থানে গমন করিলে নিশ্চিত লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে অনেক দরিদ্রেই অক্লেশে গমন-যাতনা সহ্য করে—সন্দেহ নাই। হরিদাসের অটল বিশ্বাস,—হরিনাম করিলে হরিকে পাওয়া যায়; একান্তমনে নাম ধরিয়া ডাকিলে নামী আসিয়া উপস্থিত হন; হরিদাস কেন না সর্ব্বত্যাগ করিয়া নামমাত্র সম্বল করিবেন? যাহাতে ক্লেশ নাই—বিপদ নাই, যাহাতে কেবল আনন্দের লহরী উত্থিত হইতে থাকে, কোন্ বুদ্ধিমান তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগী না হন?

তুমি আমি সংসারের মলিন জীব, কাতরে কেহ ক্রমাগত ডাকিতে থাকিলে কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি? না হয় থাকিলাম; তথাপি যদি সে অধ্যবসায়ী ডাকিতে থাকে, মাসাবধি—বৎসরাবধি ডাকিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই একবার তাহার প্রতি কাণ না দিয়া পারি না। তবে যিনি পুরুষোত্তম, সদাশয়ের সদাশয়—দয়াময়, কেহ নির্ম্মলমনে একান্ত ভক্তিসহকারে ক্রমাগত ডাকিতে থাকিলেও তিনি শুনিবেন না, এ পাপচিন্তা হরিদাসের মনে ঘূণাক্ষরেও উপস্থিত হয় নাই; অতএব তিনি সর্ব্বত্যাগী নামসর্ব্বস্ব হইবেন বিচিত্র কি? ফলকথা—ভক্তির অধিকারী হইলে মানুষ পরিতৃপ্ত হইয়া যায়, তাহার আর অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শাস্ত্রও বলেন:—

"ওঁ যঁল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তোভবতি।", ১।৪—নারদকৃত ভক্তিসূত্রম্।

যদি ভগবান থাকেন, আর যদি তিনি সদাশয় হন, তাহা হইলে এরূপ সরল—এরূপ বিশ্বাসী ভক্তের প্রতি বোধ হয় তিনি উপেক্ষা করেন না। হরিদাস আহারোপার্জ্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁহার আহার যোগাইতে লাগিলেন। গ্রামের যত হিন্দু—হরিদাসের অদ্ভুত ব্যবহারে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারাই,—যার যেরূপ সাধ্য, প্রতি দিন হরিদাসের জন্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিত, এবং তাঁহার কুটীরদ্বারে রাখিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিত। এইরূপে হরিদাসের কুটীরে প্রসাদান্ন ও ফলমূলাদি বহুবিধ দ্রব্য জমা হইত। হরিদাস একবার মাত্র আহার করিতেন; যাহা অবশিষ্ট থাকিত,—বিলাইতেন।

হরিদাসকে কেহ দেখিতে আসিলে তিনি নামগ্রহণ করিতে যথাসাধ্য উপদেশ দিতেন—অনুরোধ করিতেন। যাহারা আসিত, ভক্তের বিশ্বাস, একান্ত ভক্তি ও সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া যাইত; তাহারা হরিদাসের অনুরোধ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিত না।

পাঠক! আপনারা (will force বা) ইচ্ছা-শক্তির কথা অবগত আছেন। এ শক্তি প্রভাবে অপরকে কতক বাধ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু সঞ্চারকের অন্তর যদি নির্ম্মল থাকে, তবে এ শক্তি বহু ফলপ্রদ ও শুভদ হয়। ফলকথা —উপদেষ্টার উপদেশে প্রাণ থাকা চাই, প্রাণহীন কথা কেহ গ্রহণ করে না।

হরিদাসের হৃদয় নির্ম্মল—ভক্তিপূর্ণ—আবেগপূর্ণ, সর্ব্বজীবের হিতসাধন তাঁহার ব্রত, তাঁহার অভিলাষ কেন না পূর্ণ হইবে? তাঁহার উপদেশ লোকে কেন না লইবে? হরিদাস হরিনামে দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। কিন্তু চঞ্চল বালকদল হরিদাসের কথা শুনিত না, হরিনাম করিত না। তাহাদিগকে হরিনাম লওয়াইতে হরিদাস এক উপায় সৃষ্টি করিলেন। গ্রামবাসিগণ হরিদাসকে যে ফলমূল প্রদান করিত, তাহারই অধিকাংশ তিনি বালকদলে প্রদান করিতেন, আর তাহারই লোভে বালকদল উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিত। এইরূপে হরিদাস "হরির লুটের" সৃষ্টি করেন। এই যে আমরা নানাস্থানে "হরির লুট" হইতে দেখি, হরিদাসই তাহার প্রবর্ত্তক।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় নিরাপদে আরও একটী মাস কাটিয়া গেল। যতই দিন যাইতেছে, ততই বুঝিতেছি, দাসাশ্রমের উপর তাঁহার বিশেষ করুণা অবতীর্ণ হইয়াছে। নতুবা আমাদের মত ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত না। তাঁহারই নাম জয়যুক্ত হউক। সহৃদয় দাতাগণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বর্ত্তমান মাসের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। রামজি, ২। দামো, ৩। বাবুরাম, ৪। দেবীয়া, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। শিবু, ইহারা এক প্রকার ভালই আছে।

৭। রাজেন্দ্র—এবার জ্বর ও পাঁচড়ায় বড় কষ্ট পাইয়াছে। এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

৮। তিতুরাম—ভাল আছে।

৯। টোকাণী—ইহার কুষ্ঠের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অনেক কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। আবার জ্বর হইয়াছে।

১০। তুলসীমণি—আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন।

১১। বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ—জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়াছিল। শোথ, ও আমাশয় প্রভৃতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সঙ্গীরা তাহাকে পথিমধ্যে ফেলিয়া যায়। একটী ছাত্র আমাদের কার্য্যালয়ে রাখিয়া যান; আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকায় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২। শিবনন্দন—হিন্দুস্থানী। হতভাগ্য ষ্ট্রেট্স্ সেটলমেণ্টের অন্তর্গত সিঙ্গাপুরে চাকুরী করিতে গিয়াছিল। পরে নানাপ্রকরে দূষিত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া গোলদিঘীর এক কোণে পড়িয়াছিল। হাতে যে কয়টি মুদ্রা ছিল, তাহা জনৈক প্রতারক কাড়িয়া লইয়া যায়। যতীন্দ্র-বাবু [তাঁহার পূর্ণ নাম আমাদের মনে নাই] আমাদের জনৈক কর্ম্মচারীকে খবর দিয়া সেই স্থানে লইয়া যান। অপহৃত অর্থের জন্য সে যে প্রকার ক্রন্দন করিয়াছিল, তাহা শুনিলে বোধ হয় পাষাণও বিগলিত হইয়া যাইত! দুর্বৃত্ত প্রতারক কেবল তাহার অর্থ লইয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এক মাত্র অবলম্বন জলপাত্র টী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল! আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকায় এবং মেডিকেল স্কুলের কোন ছাত্রের আগ্রহে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত যতীন্দ্র বাবু, এই রোগীর জন্য যে প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত দান গুলি আমরা বিগত ২২শে ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসের ২১শে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। দীনদয়াল ভগবান পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বারি সিঞ্চন করুন।

অর্থ। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ২৲, বাবু নন্দলাল দত্ত ডিসেম্বর মাসের চাঁদা ১৲, ছাত্রনিবাস হইতে সংগৃহীত ।৹, ১২৬ নং ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড ॥৹, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের ছাত্রনিবাস ॥৹, বাবু বংশধর বিষ্ণু ৶৹, বাবু বিপিন বিহারী রায় ১০৲, দানাধারে প্রাপ্ত ।৶৫, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ডিসেম্বর মাসের দরুণ ৫৲, বাবু রামকুমার দাস ॥৹, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা কম্বলের জন্য ১॥৹, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহাপৌষ মাসের চাঁদা ॥৹, একটি দীন বালিকা ১৲, দানাধারে প্রাপ্ত /৫, বাবু হীরালাল বসু ১৲, বাবু গিরিশ চন্দ্র শর্ম্মা বিবাহ উপলক্ষে ১৫৲, একটি বালক ১৲, দানাধারে প্রাপ্ত ৶১৹, শ্রীমতী কুন্দকুমারী গুপ্তা ১৲, শ্রীমতী সরস্বতী বিবি ১৲, আমলা ১৲, বাবু জগন্নাথ

প্রসাদ গুপ্ত ২৲, শ্রীমতী কৈলাস কামিনী ঘোষ শীত বস্ত্রের জন্য ২৲, পণ্ডিত মহেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় ৵৹, জনৈক ভদ্রমহিলা বৌবাজার জানুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেব চাঁদা ২৲, বাবু গোবিন্দ নারায়ণ সিংহ ১৲, বাবু হারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র সরকার ১৲, বাবু বনমালী রায় ৫৲, বাবু হীরালাল পাল চৌধুরী ১০৲, শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দে ১৲, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ॥৹, A. M. P. ১৲, বাবু কেদার নাথ ঘোষাল ১৲, শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেবী ২৲, মুন্সী জাহারউল্লা বিশ্বাস ১৲, বাবু রামচরণ মিত্র জানুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী পৌষ মাসের চাঁদা ১৲, বাবু জগবন্ধু খাঁ ১৲, বাবু ভুবন মোহন সেন ১৲, বাবু শ্রীরঙ্গবিহারী লাল ১৲, বাবু শশীভূষণ সাধুখাঁ ১৲, বাবু রাখাল দাস মিত্র ।৹, বাবু বিপিন বিহারী রায় ২৲, A poor sinner ১৲, বাবু ব্রজনাথ দাস স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲ বাবু নবকৃষ্ণ গুঁই ১৲, বাবু গিরীন্দ্র নাথ ঘোষ ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের চাঁদা ॥৹, শ্রীমতী ক্ষেত্র মোহিনী দাসী নবেম্বর ও ডিসেম্বরের চাঁদা ২৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা মাঘ মাসের চাঁদা ॥৹, A friend of 45/5 Beniatola Lane ॥৹

অন্যান্য প্রকারে আয়।

ডিস্পেন্সারী হইতে হাওলাৎ ৩০৲, ফিডিং কাপ বিক্রয় ৸৹, বোতল বিক্রয় ।/৹, চামচা বিক্রয় ৵৹, পুস্তক বিক্রয় ৸৹, বস্ত্র বিক্রয় ১৩৸৹, চাউল বিক্রয় ৩৲১০, গচ্ছিত জমা ৭৲, 'দাসী' হইতে হাওলাৎ ৮৲, অন্যস্থান হইতে হাওলাৎ ১৫৲, 'দাসী' হইতে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য সাহায্য ৫০৲।

কলিকাতার মোট আয়।

দানপ্রাপ্তি ৯০৲, অন্যান্য প্রকারে আয় ১২৮॥৶১০, বিগত মাসের জের ২৫৵৹।

কলিকাতার ব্যয়।

গিরিডি সেবালয়ে প্রেরিত হয় ৮৫।৵৹, পূর্ব্বের বাড়ী ভাড়া শোধ ৭৪৲, পুস্তক মুদ্রণ ব্যয় ১৭৲, কর্ম্মচারীর বেতন ২১৸৵১০, ভৃত্যের বেতন ৭৸৵৹, গচ্ছিত জমা শোধ ৭৲, ঋণশোধ ১৯৸৹, আদায় কারীর ব্যয় ১৸/১৫, গুদাম ভাড়া ৩॥/৹, গোয়ালার পূর্ব্বের প্রাপ্য শোধ ২॥৹, মুটে ॥৵৹, রোগীর গাড়ী ॥৹, কাগজ ও খাতা ।৵১৫, ডাক খরচ ।/৹, তালা-চাবি ।৹, সাবান ৶৹, রোগীর জলখাবার ৲১৫, রোগীর দুধ /৫, খুচরা ৲১৫।

কলিকাতার মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ২৪৩৸৵১০, মোট ব্যয় ২৪৩।১৫, হস্তেস্থিত ॥/১৫।

গিরিডি সেবালয়।

আয়।

পূর্ব্ব মাসের জের ৸/১২॥, মনিঅর্ডার যোগে কলিকাতা হইতে ৩০৲, মাঃ ক্ষীরোদ বাবু ৩০৲, তুলসীমনির খোরাকীর দরুণ প্রাপ্ত ৬।৹, মাঃ ইন্দু বাবু ১৫৲, বাবু হরিদাস দে'র বিবাহ উপলক্ষে ১৲, একজন ভদ্রমহিলা ১৲: কর্জ্জ জমা ৪।৵৫

ব্যয়।

সংসার খরচ ৪২।৶১৭॥, কর্ম্মচারীর বেতন ২৪।/০, গোয়ালা ২৸৶০, ধোপা ১॥০, বাড়ী ভাড়া ১৭৲, বাজে খরচ ।/০।

মোট আয় ব্যয়।

আয় ৮৮।৶১৭॥, ব্যয় ৮৮।৶১৭॥।

সেবা সংবাদ।

মধুপুর একটী স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া খ্যাত। প্রতি বৎসর শীতকালে নানা স্থান হইতে রুগ্ন ও স্বাস্থ্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে আত্মীয় বন্ধুহীন অসহায় উপার্জ্জনাক্ষম অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠী, বৃদ্ধ, আতুর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবার আশায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই সকল দরিদ্র পীড়িত নিরাশ্রয় লোক আশ্রয় অভাবে অনাবৃত স্থানে দিন যাপন করিতে বাধ্য হয়। আহা! ইহাদের কষ্ট দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। একে রোগে ও অনাহারে শরীর কঙ্কালবৎ, তাহার উপর দুরন্ত শীত। রাত্রির প্রচণ্ড শীত নিবারণের একমাত্র উপায় অগ্নি। কিন্তু কাষ্ঠ-সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। ইহারা এখানে আসিয়া এক মুষ্টি খাইতে পায় বটে কিন্তু অন্য নানা প্রকারে যে ভীষণ কষ্ট পায় উহা অপেক্ষা অনশন জনিত ক্লেশও সহস্র গুণে সুখের বলিয়া বোধ হয়। দুরন্ত শীত প্রতিবৎসরই এই সকল লোকের মধ্যে কতকগুলিকে সকল জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে পাঠাইয়া দেয়। এই সকল হতভাগার দুঃখে আর্দ্র হইয়া দুইটী পূজনীয়া মহিলা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া গত ৩০শে ডিসেম্বর ইহাদিগকে ১৮ খানি কম্বল ও চাউল প্রদান করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য ইহাদিগের নিমিত্ত একটী আশ্রয়-গৃহ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়। ঈশ্বরের কৃপায় এই পূজনীয়া মহিলাদ্বয়ের সাধুকামনা পূর্ণ হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্যামলাল ঘোষ।

দাসী

তুকারাম।

পঞ্চম প্রস্তাব।

যে অবস্থায় এবং যেরূপ ভাবে তুকারামের ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতেছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। জীবের প্রতি প্রেম এবং ভগবানের প্রতি আসক্তি, এই দুইটীই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। * যাঁহাতে এই দুইটীর পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, তাঁহার ধর্ম্মজীবন অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধও এরূপ ঘনিষ্ঠ, যে একটীর সঙ্গে অপরটীর সত্তাও অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক মাত্রেরই জীবন আলোচনা করিলে এই দুইটী গুণের নিত্য সম্বন্ধ লক্ষিত হইবে। ধর্ম্মভাবের বিকাশের সঙ্গেই এই দুইটী গুণ ভক্তের প্রকৃতিতে আবির্ভূত হয়। তুকারাম দেহুতে প্রত্যাগমনের পরই সাধু ও সজ্জনগণের সেবায় নিয়োজিত হইলেন। যেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তনের জন্য দশজনে একত্র হইতেন, পাছে ভক্তগণের চরণ কঠিন কঙ্করে ক্লিষ্ট হয়, সেই ভয়ে তুকারাম স্বহস্তে সে স্থান মার্জ্জন করিতেন; কখনও বা অন্ধকারে ভক্তগণের পথ প্রদর্শনের জন্য আলোক লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন; লোকে ব্যঙ্গ করিলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে যখন হরিকথা শ্রবণের জন্য গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন, তুকারাম তখন বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের পাদুকা রক্ষা করিতেন এবং কেহ বাহিরে আসিলে তাঁহার পাদুকা অগ্রসর করিয়া দিতেন। গ্রীষ্মকালে সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লোকসমাগম হইলে, শ্রোতাদিগের ক্লেশ নিবারণের জন্য তিনি স্বয়ং ব্যজন করিতেন। রাজপথে

* শ্রীচৈতন্যেরও ধর্ম্মজীবনবিকাশ কালে এইরূপ সাধুসেবার প্রতি অনুরাগ বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন;—

"নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেনও আপনে॥
কুশ, গঙ্গামৃত্তিকা কাহার দেন করে।
ঝারি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥" ইত্যাদি

কোন ভারবাহীকে পরিশ্রান্ত ও ক্লিষ্ট দেখিলে তুকারাম তাহার ভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে বিশ্রামের অবসর দিতেন ; এবং পথিকদিগকে মেঘদুর্দ্দিনে নিজের গৃহে বা গ্রামস্থ কোন বিশ্রাম স্থানে আশ্রয়ার্থ আহ্বান করিতেন। বহুদূর পর্য্যটনে ক্লান্ত ও স্ফীতপদ তীর্থযাত্রীদিগকে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া সযত্নে উষ্ণোদকে তাহাদিগের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেন এবং তাঁহাদিগের পদের বেদনা লাঘবার্থ স্বহস্তে তাহা মর্দ্দন করিতেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে কোন দেবমন্দিরে লইয়া গিয়া তাহার ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। গ্রীষ্মকালে পথিকদিগের জন্য বারিকুম্ভ স্কন্ধে লইয়া যে সকল স্থানের নিকটে কূপ বা জলাশয় না থাকিত, সেখানে দণ্ডায়মান থাকিতেন। তাঁহার নিজের এরূপ অবস্থা ছিল না যে, ইচ্ছানুরূপ অতিথি-সেবা করিতে পারেন, কিন্তু কাহাকেও ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে তুকারাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। যে কোনরূপে হউক, তাহার জন্য অন্ন সংগ্রহ করিয়া দিতেন। যে সকল পশুকে তাহাদিগের পালকগণ অকর্ম্মণ্য বোধে ত্যাগ করিত, তিনি সযত্নে তাহাদিগের সেবা করিতেন। তাহাদিগের শরীরে হস্তাবর্ত্তন করিয়া ও খাদ্য ও পানীয় প্রদান করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগের ক্লেশ লঘু করিবার চেষ্টা করিতেন। ঘৃত, গোধূম বা শর্করা সংগ্রহ পূর্ব্বক "ভগবানের প্রীত্যর্থ" পিপীলিকাদিগের গর্ত্তে প্রদান করিতেন। কোনরূপে যাহাতে ভগবানের সৃষ্ট কোন প্রাণীর ক্লেশ না হয়, তুকারাম সর্ব্বতোভাবে তৎসম্বন্ধে মনোযোগী থাকিতেন। শাকুনিকগণ কোন পক্ষীকে ধৃত করিয়াছে দেখিলে তিনি অনুনয় বিনয় দ্বারা তাহাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। মহীপতি বলেন যে অনবধানতা বশতঃ কোন প্রাণীকে পদদলিত বা নিহত করিলে, তুকারাম বারিহীন মীনের ন্যায় হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেন। পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক, কোনরূপে লোকের পরিচর্য্যা করিতে পারিলে তুকারাম পরম সুখী হইতেন। কোন ব্যবসায়ীর হয় ত একজন লোকের প্রয়োজন, তুকারাম অমনই ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রস্তুত। উপযাচক হইয়া অনেক সময় তুকারাম লোকের কার্য্য করিতে যাইতেন। একবার তুকারাম দেখিলেন যে, একটী প্রাচীনা রমণী তৈল আনয়নের জন্য যষ্টির উপর ভর দিয়া অতিকষ্টে গমন করিতেছেন। তিনি দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন, "মা, তোমায় বড় ক্লান্ত দেখিতেছি, তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ

কর, আমি তোমায় বাজারে লইয়া যাইতেছি।" বৃদ্ধা তুকারামের কথা শুনিয়া সস্নেহবাক্যে বলিলেন, "বাপু তোমায় আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া যাইতে হইবে না ; তুমি যদি দয়া করিয়া আমার তৈলটুকু আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাই।" তুকারাম তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার তৈলপাত্র লইয়া ধাবিত হইলেন, এবং তাঁহার অভিলষিত তৈল আনিয়া দিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে বৃদ্ধা তুকারামের সহৃদয়তার প্রশংসা করিয়া, প্রতিবাসিগণের নিকট বলিলেন যে, তুকারাম যে তৈল আনিয়াছিলেন, তাহা অন্যের আনীত তৈল অপেক্ষা অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এই কথা প্রচার হইবামাত্র সকলেই তুকারামকে তৈল আনিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অমায়িকপ্রকৃতি তুকারাম কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। সুতরাং প্রতিবাসিগণের তৈল আনিয়া দেওয়া তাঁহার একটী নিত্যকার্য্যের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল। তুকারাম যে প্রদত্ত মূল্যের একটী কপর্দ্দকও আত্মসাৎ করেন না, এ কথা সকলেই জানিতেন ; সুতরাং বিনামূল্যে এরূপ ধর্ম্মভীরু ভৃত্য পাইয়া সকলেই তাঁহার উপর দুই একটী আদেশ প্রদান করিতেন। তুকারামও যতদূর সম্ভব, তাহা পালন করিতে ত্রুটী করিতেন না। দিবসে লোকের পরিচর্য্যায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত, রাত্রিতে বিঠোবার মন্দিরে গমন করিয়া শিশু যেমন মাতাকে দর্শন করিলে সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হয়, সেইরূপ সেই "শ্যামসুন্দর" মূর্ত্তি দর্শনে দিবসের সমস্ত পরিশ্রম অপনোদন করিতেন। তুকারাম নিরীহপ্রকৃতি ও আত্মাভিমানশূন্য ছিলেন বলিয়া প্রতিবাসিগণের আদেশ পালন করিতে অপমান বা ক্লেশ বোধ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার পত্নী অবলাইয়ের তাহা সহ্য হইত না। অবলাইয়েরও অপরাধ ছিল না। তিনি দেখিতেন, যে যাহারা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবলকায়, তাহারাও তাঁহার স্বামিকে নির্ব্বোধ ভাবিয়া ভারবাহী বৃষভের ন্যায় পরিশ্রম করাইয়া লইতেছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করা অবলাইয়ের পক্ষে অসঙ্গত নয়। অবলাই এজন্য প্রতিবাসিগণের সঙ্গে সর্ব্বদা কলহ করিতেন। যাহা হউক, এইরূপে পরোপকার ও আত্মসংযম প্রভৃতির দ্বারা তুকারামের ধর্ম্মজীবন লাভের শিক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। যে কার্য্য দ্বারা তিনি মহারাষ্ট্রদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপে তিনি তাহা সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তুকারামের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে যে সকল সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নামদেবের নাম আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। নামদেবের রচিত অভঙ্গ হইতে তুকারাম তাঁহার ধর্ম্মজীবন বিকাশের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে পণ্ঢরপুরে বিঠোবার দর্শনে গমন করিবার সময় তিনি পথে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতেন। এই সময় একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, বিঠোবা নামদেবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "তুকারাম, আমার পূর্ণভক্ত নামদেব পূর্ব্বে যত অভঙ্গ রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হয় নাই। অপূর্ণ সংখ্যা তুমি পূরণ কর। আমি তোমায় "সপ্রেম জ্ঞান" প্রদান করিতেছি, তুমি আমার "প্রসাদ-বাণী" প্রচার করিয়া জীবের উদ্ধার সাধন কর।" বিঠোবা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তুকারামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পৃথিবীর নানাদেশের ভক্তগণের সম্বন্ধেই ভগবানের এইরূপ আদেশের বিষয় শ্রুত হওয়া গিয়া থাকে। ভক্তের শক্তি যে ঐশী শক্তিরই প্রতিরূপ, এই বিশ্বাসই বোধ হয় এইরূপ সর্ব্বদেশব্যাপী প্রবাদের কারণ। পূর্ব্বগামী মহাপুরুষদিগের রচনাবলী সর্ব্বদা পাঠ করিয়া, তুকারাম হৃদয়ে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে যে তাঁহাদিগের অনুকরণে স্বয়ং কিছু রচনা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃ আবির্ভূত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। মহীপতি বলেন যে, তুকারাম প্রথমে ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নয় শত শ্লোকে বর্ণনা করিয়া, একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তনের সময় অন্যের রচিত পদাবলী গান করিতে করিতে ভাবাবেশে নিজে অনেক পদ রচনা করিতেন। মহীপতি বলেন, যে তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় তুকারামের মুখ হইতে সেই সময় সরস ভাবময়ী কবিতা অবিচ্ছেদে নিঃসৃত হইত এবং সেই সকল প্রসাদগুণময়ী নূতন কবিতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতারা বিস্মিত চিত্তে তাহা ঐশীশক্তিসম্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তুকারামের কবিতার গুণে সঙ্কীর্ত্তনের আকর্ষণী শক্তি বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল, এবং তুকারামের নিজের জীবন তাঁহার কবিতার ন্যায় সরস, পবিত্র ও কৃত্রিমতা-শূন্য ছিল বলিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয়ে তাহা গভীর ভাব মুদ্রিত করিত। কুটিলে প্রকৃতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষ্টা ব্যক্তিগণও তুকারামের উপদেশপূর্ণ পদাবলী শ্রবণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইত। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের এমনই এক মোহিনী

শক্তি ছিল, যে যে একবার তাহা শ্রবণ করিত, সে আর তাহা বিস্মৃত হইতে পারিত না। যে দিন তিনি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, সে দিন শ্রোতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক হইত। দেহুর অধিবাসিগণ ও দূরবর্ত্তী গ্রামস্থ অনেকেও ক্রমশঃ তুকারামের সঙ্কীর্ত্তনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া বিঠোবার মন্দিরে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে তুকারামকে উন্মাদ ভাবিয়া লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা তুকারামের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্রমশই তুকারামের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং তিনি যে একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত পুরুষ, অনেকেরই সেইরূপ ধারণা জন্মিল। লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে তুকারামের প্রকৃতিও দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। সাংসারিক পদার্থে বিরক্তি এবং ভগবানের প্রতি আসক্তি অনেক দিন পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রকৃতি সুগঠিত করিয়া তুলিল। পূর্ব্বে তিনি সংসার হইতে পলায়ন করিয়া, জনমানবহীন স্থানই তপশ্চর্য্যার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সংসারে থাকিলে তিনি নানা বিষয়ে জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন এবং অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিতে পারিবেন ভাবিয়া, সংসারের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের বিরাগ হ্রাস হইল। তিনি এখন হইতে গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের পক্ষপাতী হইলেন বলিয়া তিনি যে আবার পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইবেন, সে সম্ভাবনা ছিল না। সংসারী হইতে হইলে যে সকল সামগ্রীর ও যে সকল গুণের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। তবে অনাসক্ত চিত্তে যেরূপ ভাবে সংসার করা সম্ভব, তিনি সেইরূপ ভাবেই পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ করিলেন। বিষয় কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি তাঁহার অনেক দিন পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। সুতরাং সংসারের ভার পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাঁহার পত্নী অবলাইয়ের উপর অর্পিত রহিল। মহীপতি যেখানেই অবলাইয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাকে কলহকারিণী, কর্কশা বা কঠিনা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। সুতরাং সক্রেটিসের সঙ্গে জান্টিপীর ন্যায় তুকারামের সঙ্গে অবলাইয়ের সম্মিলনও বিধাতার বিড়ম্বনা বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অবলাই যে নিন্দনীয়া ছিলেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

সাধুপুরুষদিগের পত্নীগণের এই একটী দুর্ভাগ্য যে লোকে তাঁহাদিগের দোষ গুণ বিচার করিবার সময় তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের স্বামির সহিত তুলনাতেই বিচার করেন, সাধারণ মহিলাগণের সহিত তুলনায় বিচার করেন না। সাধারণ রমণী হইয়া, মহাপুরুষ স্বামিরূপ মানদণ্ডে পরিমাপিত হওয়াতে তাঁহারা যে অতি ক্ষুদ্র, অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগের অপরাধ তাদৃশ গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অবলাইয়ের সম্বন্ধে মহীপতি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার বিচার করিবার জন্যই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। সম্পন্ন গৃহের দুহিতা হইয়া দরিদ্রের হস্তে পড়িলে, তাঁহার প্রকৃতি যে একটু অসহিষ্ণু হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়। তাহার উপর স্বামী যদি সাংসারিক সমস্ত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, দিবারাত্রি কেবলই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া থাকেন, আর পত্নীকে অন্নচিন্তা লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে কয়জন স্ত্রীলোকের স্বভাব কোমল থাকে, বলিতে পারি না। সুতরাং অবলাইয়ের রুক্ষ স্বভাবের জন্য আমরা তাঁহার নিন্দা করি না। তুকারাম "হরি কথা" লইয়া থাকিতেন, আর অবলাইকে পাঁচটী সন্তান প্রতিপালন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা প্রভৃতি সাংসারিক সমস্ত ভার বহন করিতে হইত। সুতরাং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে কলহ ও বাক্‌বিতণ্ডা হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়। কেবল সাংসারিক অভাবের জন্য নয়, তুকারাম যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে অতি অল্প স্ত্রীলোকেরই ধৈর্য্য রক্ষা হইতে পারে। অবলাই হয় ত আপনার লজ্জানিবারক একমাত্র বস্ত্র বা কাঁচুলীটি রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, তুকারাম সেই সময় তাহা কোন দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তিকে দিয়া বসিয়া আছেন; এ অবস্থায় ঋষিজনোচিত সহিষ্ণুতা না থাকিলে আর পারিবারিক শান্তি থাকা সম্ভব নয়। মধ্যাহ্ণ কালে হয় ত অবলাই কায়ক্লেশে আপনাদিগের ক্ষুদ্র পরিবারের কথঞ্চিৎ প্রাণধারণের যোগ্য আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তুকারাম সেই সময় ৪।৫টী অতিথি সঙ্গে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। কাজেই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অবলাইকে যেরূপে হউক, তাহাদিগের খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইত; ইহার উপর লোকে তুকারামকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিত, তাহা যে কোন পতিব্রতার পক্ষেই ক্লেশকর। সকল থাকিয়াও তুকারাম যে একটু সাংসারিক বুদ্ধির অভাবে লোকের নিকট নির্ব্বোধ, বাতুল বা কাণ্ডাকাণ্ড

জ্ঞানরহিত বলিয়া অভিহিত হইতেন, অবলাই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। সংসারসর্ব্বস্ব বিজ্ঞগণ আবার অবলাইকে বুঝাইতেন যে, বিঠোবার সেবা করিয়া, বলি, প্রহ্লাদ প্রভৃতি কাহারও কোন কালে সুখ হয় নাই, তুকারাম সেই বিঠোবাকেই যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার কল্যাণের আশা কোথায়? অবলাই পিতৃগৃহে ভবানীর পূজায় অভ্যস্তা হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্বশুরালয়ে বিঠোবার সেবা তাঁহার পক্ষে নূতন বলিয়া তাহাতে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না, এবং এই বিঠোবা-ভক্তি হইতেই তাঁহার স্বামী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অবলাই স্বামীর ধর্ম্মবিশ্বাসে সহানুভূতি করিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে অনেক সময় দম্পতীর মধ্যে কলহ ও মনোবাদ ঘটিত। অবলাই যখন আরম্ভ করিতেন, তখন একবারে প্রহরস্থায়ী অগ্নিবৃষ্টি না করিয়া ছাড়িতেন না। বেচারা তুকারাম এরূপ যুদ্ধে পলায়নই একমাত্র রক্ষার উপায় ভাবিয়া গৃহ হইতে অদৃশ্য হইতেন; এবং অবলাইয়ের কোপ শান্ত হইলে পরে গৃহে ফিরিতেন। অবলাই মুখরা হইলেও তাঁহার কিন্তু একটী মহৎ গুণ ছিল, তিনি প্রকৃত পতিপরায়ণা ছিলেন। স্বামীর আহার না হইলে অবলাই কখনও নিজে আহার করিতেন না; এই জন্য তুকারাম গৃহ হইতে অদৃশ্য হইলে অবলাইকে উপবাস করিতে হইত এবং নদীতীর, প্রান্তর, পর্ব্বতগুহা, যেখান হইতেই হউক, তুকারামকে অন্বেষণ করিয়া আহার না করাইয়া অবলাই কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। তুকারাম ভাম্বনাথ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবলাই আহার্য্য দ্রব্য লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতেন। একদিন এইরূপ অবস্থায় রৌদ্রে তপ্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইবার পর চরণে কণ্টক বিদ্ধ হওয়াতে অবলাই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তুকারাম তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া সেই হইতে দেহুতেই থাকিতেন। মহীপতি অবলাইকে কটুভাষিণী ও কলহকারিণী বলিয়া নিন্দা করিলেও তিনি যে সাধ্যানুসারে সাংসারিক কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ত্রুটী করিতেন না, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং অবলাই প্রত্যক্ষভাবে স্বামীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা করিতে না পারিলেও, নিজের স্কন্ধে সংসারের ভার গ্রহণ করিয়া স্বামিকে অর্থচিন্তারূপ উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান পূর্ব্বক পরোক্ষভাবে যে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেরূপ আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তির সহিত তিনি স্বামির সেবা ও পরিচর্য্যা করিতেন, যে কোন রমণীর

পক্ষেই তাহা প্রশংসনীয়। নিরপেক্ষভাবে তাঁহার ব্যবহার চিন্তা করিলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হই।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা ও সংগ্রহোপায়।

পানীয় জল শুদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু কোন্ জল শুদ্ধ ও পেয়, আর কোন্ জলই বা অশুদ্ধ ও অপেয়? কি উপায়েই বা পেয় জল সহজে সংগ্রহ করিতে পারা যায়? অনেকের এই সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও অপরিস্ফুট বোধ আছে; তাঁহাদের জন্য নিম্নে এতদ্বিষয় লিখিত হইল। কি সহজ উপায়ে স্ব স্ব গৃহ প্রাঙ্গণে পেয় জলের উপায় করা যাইতে পারে? ছোট ছোট যে সকল নগরে বৃহদাকারে কলের জলের ব্যবস্থা করা অসম্ভব, সে সকল স্থানের নাগরিকগণের পেয় জল সংগ্রহের উপায় কি? শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষক সমিতি (Sanitary Board) সম্প্রতি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এবং তাহার উদ্দেশ্য সকলের অবগতির জন্য প্রকটিত করা যাইতেছে।

দুঃখের বিষয় অল্প লোকই স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক প্রাচীন উপদেশ কিম্বা আধুনিক উপদেশের প্রতি অধিকাংশ লোকই মনোযোগ দেন না। বঙ্গবিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা পঠিত হয়, সত্য, কিন্তু তাহাতেই পাঠ সমাপ্তি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাজ্ঞাকে আমরা সকল বিষয়েই অবহেলা করিতে শিখিতেছি। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নবাজ্ঞাও সম্যক্ শিক্ষা করি না। শিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি লোকের হস্তেই প্রাচীন শাস্ত্রাজ্ঞার ভাল মন্দ বিচার ভার অর্পিত। কিন্তু তাঁহাদের অনেকে এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন। যথা, এই শাস্ত্রের এই এই বিষয় বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিসিদ্ধ নহে, অতএব তত্তৎশাস্ত্রে অপরাপর যে সকল বিধান আছে, তৎসমুদায়ও যুক্তিহীন ও অসার। অধিকন্তু, তৎসমুদায় উপহাসযোগ্য ও পরিত্যাজ্য, একথা বলিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হন না। এরূপ তর্কে যাঁহারা নিবিষ্ট, তাঁহাদের অপেক্ষা নিরক্ষর অল্পমতি ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি অপকৃষ্ট বা হেয় নহে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের নামেই তাঁহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এতদিন যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কখন কি মন্দ বা গর্হিত হইতে পারে? "আমরা চিরকাল এই পুষ্করিণীর জল পান করিতেছি,—ইহার জল মন্দ হইবে কি রূপে?" ইঁহাদের মনে মনে যুক্তির অপরার্দ্ধ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তাহা এই,—"ইহার জল যদি মন্দ হইত, তাহা হইলে আমরা জানিতাম না?" এবম্প্রকার বিজ্ঞব্যক্তির নিকট যুক্তি পরাঙ্মুখ।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা ও আর যা কিছু, পল্লীগ্রামের নিরক্ষর সংবাদপত্র-পাঠ-বিমুখ লোকদিগের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা মনে করেন যে নগরবাসী ইংরাজী-শিক্ষিত সভ্য ভব্য ব্যক্তির নিকট সকল তথ্যই নখদর্পণের ন্যায় প্রতীয়মান। ইনি একজন প্রধান উকীল, ইনি একজন বিষয়কর্ম্ম দ্বারা এত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, অবশ্য বিদ্যা বুদ্ধির জোরেই ত, ইনি আর একথাটা জানেন না?

একটা প্রকৃত ঘটনা শুনিলে কেহ আমাকে অতিশয়োক্তিপ্রিয় বলিবেন না। কোন নগরের বহুসংখ্যক লোক তথাকার এক নদীর জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে এই নদী নিতান্ত ক্ষীণকলেবর হইয়া পড়ে। স্থানে স্থানে আধ্ হাতের অধিক গভীর জল থাকে না। নিতান্ত মৃদু স্রোতে বালুকারাশি ভেদ করিয়া নদীর জল বাহিত হয়। সেই স্থানে অনেক নরনারী প্রতিদিন কাকস্নান দ্বারা গ্রীষ্মের প্রখর জ্বালা নিবারণ করে। কিন্তু সেই গাত্রমলপরিপূরিত, সিতাসিতসমলবিমলবস্ত্রধৌত, প্রক্ষালিত-মুখদন্ত, অগভীর, প্রায় স্রোতোহীন জল পান করিতে কেহই কুঞ্চিত-নাসা হইতেন না। সেই জল ব্যতীত অন্য পানীয় জল না থাকায় সেই নগরের মিউনিসিপালকর্ত্তা সেই নদীর উপর দিকে কিয়দংশ পানীয় জলের জন্য আইন সাহায্যে রক্ষা করিলেন। এই কার্য্যের জন্য নগরকর্ত্তাকে কোথায় ধন্যবাদ দিবে, না একদিন প্রায় ২০।২৫ জন উচ্চশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তি ঐ হিতকর কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লজ্জা বোধ করিলেন না। তাঁহাদের যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে স্বাস্থ্য-বিদ্যায় আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকগণ কি প্রকার পারদর্শী। এক যুক্তি এই,—"এমন দারুণ গ্রীষ্ম, গাত্রে একটু জল সেচন দ্বারা কোথায় আমরা তৃপ্তি লাভ করিব, না সেই সামান্য সুখভোগ হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম!" আর একজন ধরিলেন,—"বলেন কি মহাশয়, কত দূরবর্ত্তী স্থান

হইতে কত নরনারী স্নান করিতে আসিত, এখন আরও দূরে গেলে তাহারা স্নান করিতে পাইবে না ?" আর একজন ধরিলেন,—"যখন স্রোতঃ আছে, তখন তাহার আবার রক্ষণ কি ?" ইত্যাদি। তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, মহাশয়গণ, স্নানের অপেক্ষা পানের জলের ব্যবস্থা অধিক আবশ্যক এবং যাহাতে পানীয় জল দূষিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই নদীর ঐ অংশটুকু রক্ষিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রতি গৃহেই ত কূপ আছে। কূপ জলে স্নান করিতে আপত্তি কি? কোন কোন ব্যক্তি ইহার যে উত্তর দিলেন, তাহা না শুনাই ভাল। নমুনার স্বরূপ একটা বলিতেছি। কোন বিজ্ঞব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি ত ঐ জল প্রতিদিন পান করিয়া আসিতেছি, কৈ এপর্য্যন্ত আমার কোন পীড়া হইল না। খাদ্যাখাদ্য, পেয়াপেয় যে যত বিচার করে, তাহাকে তত সাবধান হইতে হয়।" বলা বাহুল্য নগরকর্ত্তার এই সাধু অভিপ্রায় কার্য্যকালে ব্যর্থ হইল।

যে স্থানের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এইরূপ বিবেচনা, সে স্থানে নগরস্বাস্থ্য বর্দ্ধনের আশা কোথায় ? এজন্য বলিতে হয় যে প্রথমে শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকেই বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা ও ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক, আমাদের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য সূত্রগুলিও অধিকাংশ লোকের নিকট অপরিজ্ঞাত। স্বাস্থ্যবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আসে না, তাহা উপার্জ্জন করিতে হয়, একথা অনেকের নিকট নূতন বোধ হইবে।

এজন্য বলিতেছিলাম যে স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে কি প্রাচীন শাস্ত্র, কি আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দুয়ের কোনটিতে আমরা সমুচিত মনোযোগ দিই না। দেখুন, ভাবপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ বৈদ্যক শাস্ত্রে পানীয় জল সম্বন্ধে কেমন সুন্দর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে যাবতীয় জল বিভক্ত হইয়াছে। যথা, "জল দ্বিবিধ, দিব্য ও ভৌম। দিব্যজল চারিপ্রকার যথা,(১) ধারাভব বা বৃষ্টিজল,(২) করকাভব বা শীলজল,(৩) তৌষার বা তুষার জল, (৪) হৈম বা বরফ (বা শিশির ও কুয়াসা) জল। আর ভৌমজল গুলি এই, যথা নদীর জল, ঊর্দ্ধগামী প্রস্রবণের জল, নির্ঝরের জল, পর্ব্বতাদি দ্বারা রুদ্ধ নদীর জল, তড়াগ জল, বাপীর জল, কূপজল ইত্যাদি। এই সকল জলের মধ্যে যে জলে কোন প্রকার গন্ধ নাই বা রস নাই (odourless and tasteless), শীতল, তৃষ্ণানাশক, স্বচ্ছ, লঘু (soft) ও হৃদয়গ্রাহী, সেই

প্রকার জল প্রশস্ত। আর যে জল পিচ্ছিল (slimy), কৃমিবিশিষ্ট, পত্র শৈবাল কর্দ্দমাদি দ্বারা ক্লিন্ন, বিবর্ণ, ব্যক্তরস (having taste), সান্দ্র বা ঘন (hard), দুর্গন্ধ, কলুষ, পদ্মাদির পত্র ও নালি তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কুস্থানজাত, তাহা হিতকর নহে। যে জল চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, অকালঃ (পৌষ, মাঘ,ফাল্গুন ও চৈত্র) সম্ভূত বৃষ্টিজল, সদ্য-পতিত ভূমিগত বৃষ্টিজল ও ব্যাপন্ন জল পরিত্যাগ করিবে।" কি প্রকার জল পেয়, কি জল অপেয় ও পরিত্যজ্য, তাহা ভাবপ্রকাশেও যাহা বলে, আধুনিক পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানও তাহাই বলিতেছে। সূর্য্যকিরণ সংস্পৃষ্ট হইলে জল দোষশূন্য হয়, কিন্তু অকালসম্ভূত বৃষ্টিজল সদোষ কেন ? ইহার কারণ এই যে বর্ষাকালে বায়ু বৃষ্টি দ্বারা ধৌত ও পরিস্কৃত থাকে, অপর সময়ে তাহা ধূলিময় থাকে। বাস্তবিক, উপরিউক্ত প্রত্যেক বিধানই আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত।

দেখুন দুষ্ট জল নির্দোষ করিবার কি উপায় বলা হইয়াছে। ভাবপ্রকাশ বলিতেছেন যে দুষ্ট জল নির্দোষ করিবার নিমিত্ত তাহাকে অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে অথবা রৌদ্রে তপ্ত করিবে ; কিম্বা সুবর্ণ রৌপ্য লৌহ পাষাণ বালুকা বা মৃত্তিকা সাত বার অত্যন্ত তপ্ত করিয়া সেই জলে নিমগ্ন করিবে। তার পর কর্পূর জাতি পুন্নাগপাটলাদিসুবাসিত, শুচি ও ঘন বস্ত্র দ্বারা ক্ষুদ্র জন্তু সকল বিবর্জিত করিয়া মুক্তাদি দ্বারা স্বচ্ছ করিবে। এই সকল শুদ্ধ জল দোষবর্জ্জিত।" পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন ;—

নাপ্সু মূত্র পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্য লিপ্ত মন্য দ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা॥

অর্থাৎ মূত্রপুরীষশ্লেষ্মাদি জলে ত্যাগ করিবে না। মূত্রাদি অপবিত্র পদার্থলিপ্ত বা ভুক্তোচ্ছিষ্টাদি দ্বারা অপবিত্র বস্ত্র জলে ধৌত করিবে না। জলে রুধির কিম্বা কোন প্রকার বিষ নিক্ষেপ করিবে না।

এতদপেক্ষা সমীচীন উপদেশ আর কি হইতে পারে ? আমাদের কোন শাস্ত্রেই বিধানের কারণ প্রদত্ত হয় নাই। আর আজকাল নব্যগণ কোন বিধানের হেতু না পাইলে তাহা পালন করিতে চান না। প্রাচীন শাস্ত্রাজ্ঞাই হউক আর আধুনিক বিজ্ঞানের আজ্ঞাই হউক, কোন যুক্তিহীন কথাই পালন করিতে কেহ বলে না। কেবল দুঃখের বিষয় এই যে যুক্তি না বুঝিলে কিম্বা না জানিলেও আধুনিক বিজ্ঞানের কথা শিরোধার্য্য, কিন্তু

প্রাচীন শাস্ত্র বুঝিতে কিম্বা জানিতে চেষ্টা না করিয়াই তাহা পরিত্যজ্য। নূতন ও প্রাচীনে প্রভেদ এই!

কি যৎকিঞ্চিৎকর প্রাদেশিক রাজনীতি আর কি বহুলোকস্বার্থবিজড়িত রাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতির সহিত কোনটার বিসম্বাদ ঘটিলে স্বাস্থ্যনীতির জয় বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক নাই সত্য, কিন্তু স্বাস্থ্যনীতি রাজনীতির একটা অঙ্গ। এজন্য বিজ্ঞানে স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল উপদেশ দেয়, তাহা রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সাদরে প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। বড় সুখের বিষয় আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ এবিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের প্রকৃত প্রস্তাব অনুসরণ করা যাক। কয়েক বৎসর হইতে অণুজীববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে আমাদের প্রায় যাবতীয় রোগের মূলকারণ বিভিন্ন জাতীয় অণুজীব। অধিকাংশের মতে এই অণুজীববাদ আর কল্পনা নহে। উহা এখন নিশ্চিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।

অণুজীবগণ নিতান্ত ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র যে অধ্যাপক ক্রুকশাঙ্ক বলেন যে একটা ডাক টিকিটের উপরে চল্লিশ কোটি অণুজীবের দাঁড়াইবার স্থান হইতে পারে। ইহারা বায়ুতে, জলে, মৃত্তিকায়, ধূলিতে, গাত্রচর্ম্মে, সর্ব্বত্র দলে দলে বিদ্যমান। যাঁহারা সর্ব্বদা শুচি হইয়া থাকেন, তাঁহাদেরও মুখে অসংখ্য অণুজীব বর্ত্তমান। যাঁহারা দন্তধাবনে তাদৃশ মনোযোগী নহেন, তাঁহাদের দন্ত অণুজীবগণের উৎকৃষ্ট আবাস ভূমি।

কার্য্যভেদে অণুজীবগণকে চারিভাগে বিভক্ত করা চলে। যথা, (১) রঙ্গোৎপাদক, অর্থাৎ যাহারা দ্রব্যবিশেষে রঙ্গ উৎপাদন করে; (২) পূতিকর অর্থাৎ যাহারা জৈবপদার্থ পচাইয়া ফেলে; (৩) সন্ধানকর, অর্থাৎ যাহারা শর্করা প্রভৃতিকে গেঁজে বা মেতে ফেলিয়া সুরাদি উৎপাদন করে; এবং (৪) ব্যাধিকর, অর্থাৎ যাহারা বিবিধ রোগ উৎপাদন করে। এই ব্যাধিকর অণুজীবগণকেই ভয়। অন্যগুলি দেহে বা খাদ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও কোন আশঙ্কা নাই।

অণুজীবগণের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধিই আশঙ্কার বিষয়। রস না পাইলে কোন জীব বর্দ্ধিত হয় না। আমাদের পানীয় রসের মধ্যে জলই প্রধান। কিন্তু জল পাইলেই যে তাহাতে অসংখ্য অণুজীব বাস করিবে, এমন নহে। অন্যান্য জীবের ন্যায়, জল ব্যতীত তাহাদের আহার সামগ্রী আবশ্যক

অণুজীবগণ জৈব পদার্থ আহার করিয়া বর্দ্ধিত হয়। অতএব যে জলের সহিত জৈব পদার্থের কোন প্রকার মিশ্রণ ঘটিয়াছে, তদ্রূপ জলই শঙ্ক্য।

অতএব পানের জন্য এমন জল আবশ্যক, যাহাতে জৈবপদার্থ মিশ্রিত হয় নাই। কিন্তু জৈবপদার্থ জলে মিশ্রিত থাকিলেই যে তাহাতে ব্যাধিকর অণুজীব থাকিবে, এমন নয়। তবে সেই জলে অন্যান্য অণুজীবের সঙ্গে ব্যাধিকর অণুজীবেরও থাকা সম্ভাব্য। এই আশঙ্কায় জৈবপদার্থ মিশ্রিত জল বর্জ্জনীয়।

কিন্তু কোন্ অণুজীবগুলি ব্যাধিকর, কোন্ গুলি নহে, তদ্বিষয়ের জ্ঞান এখনও আয়ত্ত হয় নাই। যাহা হউক এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উপদেশ তাদৃশ হিতকর বা সুনিশ্চিত না হইলেও কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। বোধ হয়, অচিরে প্রমাণিত হইবে যে অণুজীববাদ সর্ব্বাঙ্গে ঠিক।

কোন জলে ব্যাধিকর অণুজীব আছে কি না তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। তা বলিয়া জলের রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন ফল নাই, এমন নহে। কেননা উক্তবিধ পরীক্ষা দ্বারা কোন জল জৈব পদার্থ মিশ্রিত কি না এবং তাহার পরিমাণইবা কত, তাহা জানা যায়। সুতরাং কোন জল জৈবপদার্থ-মিশ্রিত হইলে তাহাতে ব্যাধিকর অণুজীব বস্তুতঃ থাক্ বা না থাক্, তাহাতে থাকিতে পারে বা আছে, এমন সন্দেহ করিতে হয়। অতএব কেবল রাসায়নিক পরীক্ষা জলের পেয়ত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ ফলদায়ক নহে। বাস্তবিক সকল স্থলে রাসায়নিক পরীক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

উপরে উক্ত হইল যে কোন জলে জৈব-পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকিলেই তাহা অপেয় হয় না। যাবতীয় পুষ্করিণীর জলে অল্প বা অধিক পরিমাণে জৈবপদার্থ-মিশ্রিত থাকে। অথচ সকলেই জানেন সকল স্থলে তাহা অহিত-কর হয় না। সেইরূপ কোন জল স্বচ্ছ ও সুস্বাদু হইলেও তাহা পেয় নহে। কেননা, জলের দোষাদোষ, তাহাতে ব্যাধিকর অণুজীবের অস্তিত্বানস্তিত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য নানাবিধ অহিতকর খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকিলেও যে জল অপেয় হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা সচরাচর নদী, পুষ্করিণী ও কূপজল পান করিয়া থাকি। চট্টগ্রাম দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পাহাড়ে নগরে নির্ঝরজল পানের সুবিধা আছে। নির্ঝর

মুখ সংরক্ষিত হইলে লোকে উক্ত জল সহজে দূষিত করিতে পারে না। কিন্তু পাহাড়ের যে স্থান হইতে জলধারার উৎপত্তি, তাহার পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

সকল স্থানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া দুরূহ। নগরের জলের ত কথাই নাই। তথায় নানাবিধ মল পুষ্করিণীর ও নদীর জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। পানীয় জল আদৌ জৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকিবে না, এমন ব্যবস্থা সহজে করিতে পারিলে কোন চিন্তার কথা থাকিত না। বর্ষাকালে বৃষ্টিজল নগরের ভাল মন্দ যাবতীয় স্থান ধৌত করিয়া পুষ্করিণী ও নদীতে পতিত হয়। ইহাদের ত কথাই নাই। এ সম্বন্ধে কূপও নিরাপদ নহে। আমরা সচরাচর যেভাবে কূপ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি, তাহাতে ভূপৃষ্ঠস্থ মলাদি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কূপে ক্ষরিত হইবার কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।

কোন জলের সহিত নর্দ্দমার যোগ থাকিলেই যে তাহা দূষিত হয়, অন্য প্রকারে হইতে পারে না, এমন নহে। পচা লতা, পাতা, ঘাস, মূত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি যে কোন জৈব পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত থাকিলেই সেই জল শঙ্কা করা উচিত। এইরূপে পুষ্করিণীর ও নদীর জলের ন্যায় কূপজলও দূষিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, ব্যাধিকর অণুজীব নদী, পুষ্করিণী ও কূপ জলে নানা রকমে প্রবেশ করিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কূপই লওয়া যাক্। মনে করুন, কোন কূপের জল বিশুদ্ধ এবং দূরবর্ত্তী পাড়ায় কোন লোকের বাড়ীতে সান্নিপাতিক জ্বর (Typhoid or Enteric fever) হইয়াছিল। সে তাহার ঘরের কলসী ও রজ্জু লইয়া সেই কূপ হইতে জল তুলিতে আসিল। ঐ কলসী ও রজ্জুর সহিত হয় ত উক্ত পীড়ার অণুজীবও কূপজলে প্রবিষ্ট হইল।

কিন্তু এইরূপে পুষ্করিণীর জল যত সহজে দোষযুক্ত হইতে পারে, কূপের জল তত সহজে হয় না। বর্ষাকালে ভূপৃষ্ঠস্থ নানাবিধ গলিত জৈব পদার্থ বৃষ্টিজলের সহিত পুষ্করিণীতে আসিয়া পড়ে। নদীর জলের স্রোত থাকিলে এবং তাহার উপরদিকস্থিত নিকটবর্ত্তী পল্লী বা গ্রাম সমূহের নর্দ্দমা বা দুষ্ট জৈব পদার্থের মিশ্রণ না ঘটিলে তাহার জল দোষ বিবর্জ্জিত হওয়ার সম্ভব। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে নদীর যে ঘাটে লোকে স্নান ও বস্ত্রাদি ধৌত করে, সেই ঘাট হইতেই পানীয় জল সংগৃহীত হয়। এরূপ করিলে নদীর স্রোতের থাকা না থাকা সমান হইয়া দাঁড়ায়।

কূপ জলের প্রধান দোষ এই যে, নদী ও পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা তাহাতে প্রায় অধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। এই জন্য অনেক কূপের জল বিস্বাদ লাগে এবং তাহাতে দাইল সহজে সিদ্ধ হয় না। ক্রমাগত খনিজ পদার্থ উদরে গেলে অহিত হইবার সম্ভাবনা।

উপরে নদী পুষ্করিণী ও কূপ জলের স্থূল দোষগুলির উল্লেখ করা গেল। দেখিতে গেলে বিশুদ্ধ জল পাওয়া প্রায় দুর্ঘট। সুতরাং দুষ্ট জল শোধিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। দুষ্ট জল নির্দ্দোষ করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞান পূর্ব্বে যাহা বলিত, তাহার কোন কোন বিষয় এখন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে, নদী জলের সহিত মলপ্রণালীর (sewer) একবার সংযোগ ঘটিলে তাহা চিরকালের জন্য দুষ্ট রহিয়া যায়। বিগত দশ পনর বৎসর মধ্যে এইমত একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন স্বীকার করা যায় যে, পূতিদুষ্ট নদীজল আমাদের কোন চেষ্টা ব্যতীত নৈসর্গিক ক্রিয়া বশতঃ শুদ্ধ ও পেয় হইতে পারে। আলোক পতন, বায়ুর তাড়ন ও অধঃপাতন (precipitation) দ্বারা নদীর জল নির্দ্দোষ হইতে পারে। বাস্তবিক মনু যেমন বলিয়াছেন,—"নদী বেগেন শুধ্যতি"; সূর্য্যের কিরণ সংস্পৃষ্ট এবং বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া নদীজল বহমান থাকিলে তাহার জল ভূপৃষ্ঠস্থ জৈব পদার্থ মিশ্রিত হইলেও ক্রমশঃ তাহা নির্দ্দোষ হয়।

যাহা হউক, অনেক স্থলেই কৃত্রিম উপায়ে জল শুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। দুইটি কৃত্রিম উপায় আছে। (১) অগ্নিপাক (২) বালুকাময় শোধক (sand filter) ব্যবহার। ইহাদের প্রথমটি সুনিশ্চিত, দ্বিতীয়টিও প্রায় তদ্বৎ। উভয় কার্য্য করিলে জল একবারে নির্দ্দোষ হয়।

অগ্নিদ্বারা জল সিদ্ধ করিলে কেবল যে অণুজীবগুলি বিনষ্ট হয়, এমত নহে। জলে দ্রবীভূত নানাবিধ বায়ু ও খনিজ পদার্থ অগ্নিপাক দ্বারা জল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই জন্য অগ্নিপাকই প্রশস্ত উপায়। অগ্নিপক্ক জল যে নির্দ্দোষ তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা আলস্যপ্রিয় বলিয়া পানীয় জল ফুটাইয়া লইতে কাতর হই। দুই হাঁড়ির বদলে দশ হাঁড়ি অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু দুই হাঁড়ি জল ফুটাইয়া লইতে যত গোলযোগ। অন্নাদি আহারের ন্যায় পেয় জল বৃথা ব্যয় না করিলে এক এক পরিবারে অপেক্ষাকৃত অল্প জলেই কার্য্য সমাধা হইতে পারে। বাস্তবিক, এদিকে দৃষ্টি পতিত না হওয়াতেই লোকে এত উদাসীন।

বালুকা শোধক (sand filter) জল শোধনের অন্যতর উপায়। নগর-

বাসীদিগের সহজে পেয় জলপ্রাপ্তি যেমন কঠিন, তেমনই নানা কারণে জল পক্ক করিয়া লওয়াও সকল সময় ঘটিয়া উঠে না। এজন্য তাঁহাদের পক্ষে বালুকা শোধকই প্রায় একমাত্র উপায়। এতদিন মনে করা যাইত যে সামান্য অঙ্গার বালুকাময় জলশোধক দ্বারা কেবল কর্দ্দমাক্ত জল নির্ম্মল হয়। এতদ্দ্বারা যে অণুজীবের হাত হইতে এড়াইতে পারা যায়, তাহা লোকে জানিত না। সম্প্রতি ইহার কার্য্যকারিতা সবিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিরূপে ইহার উপযোগিতা বিস্তৃত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

বিগত বৎসরে জর্ম্মণীর অন্তঃপাতী হামবর্গ নগরে ওলাউঠার বিষম প্রকোপ অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। হামবর্গের নিকটে আলটোনা নামক একটি ক্ষুদ্র নগর। উভয় নগরবাসী সন্নিকটস্থ এল্‌ব নদীর জল ব্যবহার করে। হামবর্গ নদীর উপর দিকে, আল্‌টোনা নীচের দিকে অবস্থিত। হামবর্গ নগরবাসী নদীর উপর দিকের জল ব্যবহার করিত। আল্‌টোনা-বাসীকে হামবর্গ নগরের মল প্রণালীর জল মিশ্রিত সেই এল্‌ব নদীর জল পান করিতে হইত। কিন্তু হামবর্গ নগরে ওলাউঠার ভীষণ আক্রমণে কত নরনারী প্রাণত্যাগ করিল, কিন্তু আলটোনা নগরে ওলাউঠা প্রায় হয় নাই বলিলেই হয়।

হামবর্গবাসিগণের ব্যবহৃত জল রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নিঃশঙ্ক ঠিক হইলেও তাহারা নিষ্কৃতি পাইল না, আর আলটোনা বাসিগণের কিছুই হইল না। অণুজীববিদ ডাঃ কোক সাহেব ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে আলটোনাবাসিগণ এল্‌ব নদীর দুষ্ট জল শোধিত (filtered) করিয়া পান করিত। এই প্রকারে বিশোধন বশতঃ ওলাউঠার অণুজীব মিশ্রিত হইলেও জল নির্দ্দোষ হইল। ডাঃ কোক সাহেব দেখিলেন যে ওলাউঠা যেন পাড়া বিভাগ করিয়া নাগরিকগণকে আক্রমণ করিয়াছিল। যে পাড়ার লোকেরা শোধিত জল পান করিত, তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাহারা অশোধিত জল পান করিত, তাহারাই ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

লণ্ডন নগরের পানীয় জলের দোষাদোষ নির্দ্ধারণার্থ রাজার আদেশে কয়েকজন বিচক্ষণ ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন *। তাঁহারাও একবাক্যে ডাঃ কোক সাহেবের অনুমানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

* Royal commission to enquire into the purity of the metropolitan water-supply.

কিন্তু আমরা সচরাচর যে ভাবে বালুকা-শোধক (sand filter) ব্যবহার করি, তদ্দ্বারা সবিশেষ ফল হয় না। বাস্তবিক, তদ্দ্বারা জলস্থিত অণুজীব-গণের কিছুই হয় না, কেবল ভাসমান কর্দ্দমাদি বালুকা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়। অণুজীবগণ এত ক্ষুদ্র যে তৎসমুদায় অনায়াসে জলের সঙ্গে বালুকার ভিতর দিয়া ক্ষরিত হয়। উক্ত রাজনিযুক্ত ডাক্তারগণ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বালুকা-শোধকের উপর পতিত পিচ্ছিল পঙ্কই (slime) জলের অণুজীব-গণকে প্রতিরোধ করিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, তত্রস্থ অন্য ক্ষুদ্র জীব দ্বারা অধিকাংশ অণুজীব ভক্ষিত হয়। সুতরাং এতদ্দ্বারা দুষ্ট জল বিশোধিত হয়।

এইখানে বালুকা-শোধক ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাচীন মত একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এতদিন মনে করা যাইত যে শোধক যন্ত্রের বালুকা যত পুনঃ পুনঃ পরিষ্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্দ্বারা তত সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু এখনকার মত এই যে, জলশোধক যন্ত্র দ্বারা যত সমল জল যত অল্পে অল্পে ক্ষরিত হয়, তাহা তত শীঘ্র উপযোগী হইয়া উঠে। একবার কিঞ্চিৎ পঙ্ক পতিত হইলে তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে জল শোধন করিয়া লইলেই দুষ্ট জল নির্দ্দোষ হয়। পুনঃ পুনঃ বালুকা পরিবর্ত্তন করিলে শোধকের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অবশ্য একথা কেহই বলিত না যে জলের অণুজীব বিনাশ বা রোধ করিবার নিমিত্ত বালুকা-শোধক ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক ইহার হিতকারিতা এক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু যেমন শোধকই হউক, জল ফুটাইয়া না লইলে অণুজীবের ধ্বংশ সুনিশ্চিত বলা যায় না। এজন্য সবিশেষ সাবধান হইতে হইলে জলশোধক ব্যবহার ও অগ্নিপাক, উভয়ই আবশ্যক। কিন্তু কথা এই, কোন্‌টি কাহার পূর্ব্বে করা কর্ত্তব্য ? সচরাচর জল প্রথমে ফুটাইয়া সেই সিদ্ধ জল শোধক দ্বারা ক্ষরিত করা হইয়া থাকে। ইহার এই ফল হয় যে অগ্নিপাক বশতঃ জলের যে বিস্বাদ উৎপন্ন হয়, বিন্দু বিন্দু আকারে জল পড়াতে তাহা বায়ুর মিশ্রণ বশতঃ কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হয়। কিন্তু অগ্নিপক্ক জল শোধকের সংস্পর্শে আসিয়া পুনর্ব্বার দূষিত হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পানীয় জল প্রথমে শোধিত করিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে কেহ কেহ বলেন।

উপরে পানীয় জল সম্বন্ধে আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপদেশ গুলি বিস্তারিত বলা হইল। এক্ষণে তৎসমুদায় একত্র করা যাউক।

(১) আমরা যে জলই পান করি, তাহাতে যদি ব্যাধিকর অণুজীব না থাকে, তাহা হইলে সেই জল কিঞ্চিৎ কর্দ্দমাক্ত কিম্বা বিস্বাদ হইলেও, তাহা তত অহিতকর হয় না। বস্তুতঃ জলের অণুজীবকে ভয় করিয়া চলা উচিত। (২) যে জলের সহিত গলিত বা অগলিত কোন জৈবপদার্থের মিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহাতে অণুজীব থাকে, এবং তন্মধ্যে ব্যাধিকর অণুজীবও থাকিতে পারে। (৩) সূর্য্যকিরণ ও বায়ুর ক্রিয়াবশতঃ নদীর জল যেমন দোষহীন হইতে পারে, তেমনই গভীর বালুকাময় স্তর দিয়া দুষ্ট জল ক্ষরিত হইলেও তদ্রূপ দোষমুক্ত হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে নাগরিকদিগের পেয় জলের নিমিত্ত কূপ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন সহজ উপায় নাই। কি প্রণালীতে কূপ খনন ও সংরক্ষণ করা উচিত, তাহা এক্ষণে আলোচ্য।

(১) কূপস্থান নির্ব্বাচন। যে স্থানে কূপ খনিত হইবে, তাহার নিকটস্থ অন্য কূপের জল প্রথমে পরীক্ষা করিবে। এতদ্দ্বারা তথাকার ভূমিনিম্নস্থ জলের প্রকৃতি অবগত হওয়া যাইবে। কূপের নিকটে কোন পচা পুষ্করিণী, মল প্রণালী বা আবর্জ্জনাময় গর্ত্ত থাকিবে না। কোন্ দিক্ হইতে কোন্ দিকে তথাকার বৃষ্টিজল গড়াইয়া যায়, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। এজন্য কূপের স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে নির্ব্বাচিত হইলে ভাল হয়। ইহা ছাড়া, নিকটে কোন নীচজাতির বাস থাকাও ভাল নয়।

(২) কূপ খনন। ইষ্টক বা প্রস্তরদিয়া কূপ নির্ম্মাণ করিতে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। পুনশ্চ, কালক্রমে কোন কারণে ইষ্টকাদি নির্ম্মিত কূপজল দূষিত হইলে, নির্ম্মাণব্যয় বৃথা হয়। এজন্য মাটির পাট দ্বিগুণ করিয়া দিলেই চলে। কিন্তু যাহাতে বৃষ্টিজল কূপমুখের নিকটবর্ত্তী পাটের সন্ধিস্থল দিয়া কূপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, এজন্য অন্ততঃ ২০।২২ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত বিলাতী মাটি (Hydraulic cement) দিয়া পাটের সন্ধিস্থল গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে বর্ষাকালে ভূপৃষ্ঠস্থ জল অন্ততঃ অত ফুট মৃত্তিকা ভেদ করিয়া না গেলে কূপে প্রবেশ করিবে না। তদনন্তর, নির্ম্মিত কূপের চারিদিকে ২।৩ ফুট বিস্তৃত ও অন্ততঃ ১৪।১৫ ফুট গভীর প্রতিকূপ বা খাত কাটিয়া তাহা কঠিন এঁটেল মাটি দ্বারা পিটিয়া বুজাইয়া ফেলিবে। এঁটেল মাটি জলের দুষ্প্রবেশ্য। সুতরাং ভূপৃষ্ঠস্থ জল অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তর দিয়া কূপে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কূপের গভীরতা তত্রস্থ জলময় স্তরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে, যে কূপ যত গভীর তাহার জল তত নির্দ্দোষ। কূপটি যত গভীর হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইবে, তাহাকে তদপেক্ষা দুই তিন ফুট অধিক গভীর করিয়া নিম্নে পরিষ্কৃত উত্তমরূপে ধৌত বালুকা নিক্ষেপ করিবে। সাবধান হইতে হইলে এই বালুকা প্রথমতঃ আগুনে ভাজিয়া বা পোড়াইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে নির্ম্মিত কূপের জল ফলতঃ অঙ্গারবালুকাশোধিত (filtered) জলের সমতুল্য।

(৩) জলোত্তোলন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, যে সে কলসীরজ্জু কূপমধ্যে নিমগ্ন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহা নিবারণ জন্য কাষ্ঠের জলোত্তোলনী কল (windlass) কূপমুখে আবদ্ধ করিলে ভাল হয়। এই কলে রজ্জু বা সরু লৌহশৃঙ্খল দ্বারা লোহার একটা বাল্‌তী (bucket) ঝুলাইয়া রাখিবে।

(৪) কূপ রক্ষণ। কূপের চারিদিকে নিকটে কোন প্রকার বৃক্ষলতাদি থাকিবে না। পরন্তু গবাদি পশু ও দুষ্ট প্রকৃতি লোকের আগমন নিবারণ জন্য কূপের চারিদিকে অন্ততঃ এক বিঘা পরিমিত উন্মুক্ত স্থান কোন প্রকার বেড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, কূপের নিকটে যে সকল ভদ্রলোকের বাস, তাঁহাদের দুই এক জনকে মিউনিসিপালিটি উক্ত কূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিতে পারেন। সেই কূপ পানীয় জলের জন্য রক্ষিত, এবম্প্রকারে দেশীয় ভাষায় মিউনিসিপালিটির আদেশ লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কূপের মুখ উন্মুক্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত এই প্রকারে নির্ম্মিত কূপের অপর কোন দোষ নাই। কূপ উন্মুক্ত না রাখিয়া তাহাতে একটা বিলাতী জলতোলা কল (water pump) বসাইলে সে দোষ নিবারিত হয়। এতদনুসারে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষকসমিতি (Sanitary Board) কিছুদিন হইল ছোট ছোট মিউনিসিপালিটির প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন যে পানীয় জলের নিমিত্ত স্থানে স্থানে জলতোলা কল কূপে বসাইয়া জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবে। যে স্থানে পানীয় জলের প্রয়োজন, তথায় একটা সামান্য কূপ খনন করিয়া তন্মধ্যে দীর্ঘ লৌহচোঙ্গযুক্ত জলতোলা কল বসাইতে হইবে। কূপকে পাট দ্বারা বন্ধ না করিয়া চোঙ্গের চারিদিকে বালুকা মৃত্তিকা দিয়া বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। দীর্ঘ লৌহচোঙ্গ দ্বারা কূপের কার্য্য চলিবে। যিনি উপরি লিখিত কূপখনন বিষয়ক উপদেশ গুলির উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে সেই সকল উদ্দেশ্য এতদ্দ্বারা সুন্দররূপে সাধিত হইবে। এজন্য নূতন কূপেরও প্রয়োজন নাই। যে সকল

পুরাতন কূপের জল বিশুদ্ধ, তাহাতে চোঙ্গসহ জলতোলা কল সংযোজিত করিলেও চলিবে। কূপ হইতে কি পরিমাণ জল প্রত্যহ আবশ্যক, তাহা অবশ্য বিচার করিয়া ছোট কিম্বা বড় কল বসাইতে হইবে।

বাস্তবিক, এই সহজ উপায়ে যে কোন নগরে শোধিত জল সংগৃহীত হইতে পারে। জলতোলা কলের মূল্যও তাদৃশ নহে। পাড়ায় পাড়ায় উপযুক্ত স্থানে এইভাবে এক একটি কলসংযোজিত কূপ দ্বারা অনায়াসে পেয় জলের কষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

এরূপ জলের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি বিঘ্ন এই যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা জলের শুদ্ধতাশুদ্ধতা ততটা বুঝে না। একটু দূরে গিয়া শুদ্ধ জল না আনিয়া অনেকেই বাড়ীর কোণে যে নিজের কূপ থাকে, তাহার জল ব্যবহার করিতেই চায়। ইহার আর এক আপত্তি হইতে পারে যে সাধারণতঃ যে সকল জল তুলিবার কল ব্যবহৃত হয়, তাহাতে চর্ম্মের সংযোগ থাকে। অনেক হিন্দু তদ্দ্বারা জল সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। কিন্তু যখন কলিকাতা, ঢাকা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নগরে কলের জলপানে হিন্দুগণকে বড় একটা পরাঙ্মুখ দেখা যায় না, তখন এই সকল কল ব্যবহারেই বা আপত্তি হইবে কেন? কলের জলের কলে নিশ্চয়ই চর্ম্ম থাকে, তদ্ভিন্ন মুখে নালী যোগ করিবার সময়ও চর্ম্ম আবশ্যক হইয়া থাকে। অভ্যাস হইয়া গেলে এই আপত্তি বেশী দিন টিকিবে না।

আর একটি কথা এই যে জলতোলা বিলাতী কল মধ্যে মধ্যে কার্য্যাক্ষম হইবার সম্ভাবনা। এ জন্য তৎসমুদায় রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন জন্য মধ্যে মধ্যে মিউনিসিপালিটির দৃষ্টি রাখা ও তদ্বিষয়াভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু যে মিউনিসিপালিটি এই সামান্য কার্য্য করিতে অপারক, তাহার মিউনিসিপালিটির অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়াই উচিত। যে মিউনিসিপালিটি লোকের জীবনস্বরূপ জল দানের ব্যবস্থা করিতে এবং যাহাতে নাগরিক সকলের স্বাস্থ্যোন্নতি হয় তদ্বিষয়ক উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ, তাহার অস্তিত্বে প্রয়োজন কি? কেবল কয়েকটা পথ ঘাট পরিষ্কৃত ও রাত্রিকালে দুই দশটা আলোক দিবার জন্য অনায়াসে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বাস্তবিক বঙ্গ দেশের অনেক মিউনিসিপালিটি স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে নিতান্ত বিমুখ। ইহার প্রধান কারণ এই যে কমিশনারগণ পানীয় জলের সংগ্রহোপায় বা সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে অক্ষম; অধিকন্তু যাহা চলিয়া আসিতেছে, গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় সেই পথে চলিতেই সক্ষম। নূতন নূতন হিতকর কার্য্যে তাঁহাদিগকে ব্রতী হইতে তাদৃশ সাহসী কিম্বা বুদ্ধিকুশল দেখা যায় না।

দেশের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিলে বলা উচিত যে গবর্ণমেণ্টের এখন স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে যাবতীয় উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। এ জন্য স্বাস্থ্যরক্ষক-সমিতিও নিযুক্ত আছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ মত কার্য্য করিতে যাহাতে সত্বরে মিউনিসিপালিটিগণ বাধ্য হয়, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কেননা অনেক স্থলে স্থানীয় কমিশনারগণ ভাল হউক মন্দ হউক চিরন্তন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে নিতান্ত উদাসীন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমার কথা যথার্থ বলিয়া বোধ হইবে। পুরীতে শ্বেতগঙ্গা নামক একটা প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। তাহা গভীর বটে, কিন্তু সমুদ্রনৈকট্য হেতু তাহার জল তাদৃশ গভীর নহে। বহুকালের পুরাতন পুষ্করিণী বলিয়া তাহার তলদেশ পঙ্কে প্রায় পরিপূর্ণ। সেই জলে প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী সমল-বিমল বস্ত্রাদি ধৌত ও অঙ্গলেপনাদি পরিষ্কৃত করিতেছে এবং পানীয় জন্যও তাহার জল কলসী ভরিয়া স্ব স্ব গৃহে আনিতেছে। শুধু তাহাই নহে, পুরীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে উহা একটি তীর্থ। জগন্নাথের যাত্রার সময় সহস্র সহস্র সমাগত যাত্রী সেই জল ধর্ম্মপ্রাণে অকাতরে পান করে। পুষ্করিণীর চারিপার্শ্ব ও তলদেশ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। কোন দিকে জল নির্গমনের পথ নাই, অধিকন্তু চারিদিকের ঘন বসতির জল প্রবেশের সুযোগ আছে। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে মিউনিসি-পালিটিকে আদেশ দেন। কিন্তু জল শুকাইতে না পারিলে পঙ্কোত্তোলন হয় কিরূপে? কমিশনারগণ সামান্য কয়েকটি কারণে হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে যদি সেই জলপান বশতঃ একটি লোকেরও প্রাণবিয়োগ ঘটে, সে যাহা, দিনে দুপুরে সদররাস্তায় তাহাকে খুন করাও তাহা। বাস্তবিক, এ সকল বিষয়ে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা না করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলা গবর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যবস্থাই নাই হইতে পারে, তবে তাহার জল ব্যবহার একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সুরগঙ্গার দৃষ্টান্ত অনেক স্থানেই পাওয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে পরদুঃখকাতর জলদানশীল ব্যক্তির অভাব আমাদের দেশে ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। পুরাতন শাস্ত্রের আদেশ স্মরণ করিয়া বিত্তশালী লোকদিগের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ একান্ত কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টকে কি সব কাজই করিতে হইবে? নিজের নিজের পেয় জলের ব্যবস্থা করিতেও কি গবর্ণমেণ্টকে আইনজারী করিতে হইবে? ইহার পর, তোমরা এখানে বেড়াও, ওখানে আহার কর, এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান কর, এ কথাও না কবে বলিবার আবশ্যকতা ঘটে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সংগীত।

অনেক সময় দেখা যায় যে পণ্ডিতেরা যে সকল বিষয় লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়েন, সাধারণ লোকে তাহাদের একটা মোটামুটি মীমাংসা সহজেই করিয়া ফেলে। সংগীত সম্বন্ধেও যে কতকটা সেরূপ হয় নাই, তাহা নহে। আমাদের দেশীয় ওস্তাদদিগকে যদি ইউরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে মত দিতে বলা যায়, তবে তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই নানারূপ জানোয়ারের ডাকের দৃষ্টান্ত দিয়া কাজ সারেন। পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় সংগীত সম্বন্ধে সাহেবদের সাধারণ মতও ঐরূপ। আসল বিষয়টা কতকটা "সোনার ঢাল রূপার ঢাল" গোছের—এক এক দল এক এক দিক হইতে দেখেন, আর সেইরূপ বলেন। এ বিবাদের প্রকৃত মীমাসা করিবার ক্ষমতা লেখকের নাই, আর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সকল মত লেখকের গোচরে আসিয়াছে, সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ তাহার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে একটা সাদা সিধা মীমাংসার সুবিধা হইলে হইতেও পারে।

প্রথমে দেশীয় সংগীত আর ইউরোপীয় সংগীতের বিশেষ প্রভেদ কোথায়, তাহা দেখা উচিত। পরস্পরের সহিত নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধবিশেষ রক্ষা করিয়া যখন মিষ্ট ধ্বনি সকল একটির পর আর একটি বিচিত্র নিয়মে বাদিত হয়, তখন তাহা শুনিতে খুব ভাল লাগে। ইহাকেই আমরা রাগ রাগিণী (melody) বলি; আর এই বিষয়টার আমাদের দেশে খুব চর্চ্চা হইয়াছে।

ইহার সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ধ্বনি যতই মধুর হউক না কেন, একাকী সে কার্য্যকর হইতে পারে না। কোন্ ধ্বনিটির পর কোন্ ধ্বনিটি হইল, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তবে তাহার একটা মূল্য দাঁড়ায়। একটি ধ্বনির পর আর একটি ধ্বনি হইলে কিরূপ শুনায় আমরা তাহা বেশ করিয়া দেখিয়াছি। একাধিক ধ্বনি এক সঙ্গে বাজিলে যাহা হয়, যন্ত্রাদির সুর বাঁধিবার সময় আমরা তাহার সাহায্য লইয়া থাকি। কিন্তু সেই ব্যাপারটার ভিতরে যে সংগীতের কোন মূল্যবান্ অংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমরা ততটা তলাইয়া দেখি নাই। সাহেবেরা এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়া এই ব্যাপারটাকেই তাঁহাদের সংগীতের প্রধান অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। ইহার নাম হারমনি (harmony)।

এই মেলোডি আর হারমনি লইয়াই প্রধানতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংগীতের প্রভেদ। আমাদের মেলোডি আছে, হারমনি নাই। সাহেবদের হারমনিই প্রধান, মেলোডি, তাহার অনুগামী। আমরা খালি মেলোডিকে "সবে ধন নীলমণি" পাইয়া তাহাকেই ঘসিয়া মাজিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া সিংহাসনে বসাইয়াছি। সাহেবেরা নাকি মেলোডিকে তেমন একাধিপত্য দেন নাই, কাজেই তাঁহাদের মেলোডি অনেকটা সাদাসিধে গোছের। খালি মেলোডিতে অলঙ্কার অভাবে তেমন বিচিত্রতা হয় না, সুতরাং তাহাতে অলঙ্কারের দরকার। হারমনি থাকিলে তাহাতেই যথেষ্ট বিচিত্রতা হয়, সুতরাং অলঙ্কার অনাবশ্যক।

আমরা হারমনির রস গ্রহণ করিতে শিখি নাই, সুতরাং সাহেবদের হারমনিকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহাদের নিরলঙ্কার মেলোডিকে লইয়া তাহাদের সংগীতের বিচার করিতে যাই। ইহাতে ফল এই হয় যে, জিনিসটার প্রকৃত সৌন্দর্য্যটুকু দেখিতে পাই না, আর আমরা যাহাকে সুন্দর বলিয়া জানি, তাহা তাহাতে খুঁজিয়া পাই না, সুতরাং সন্তোষ হয় না।

সাহেবেরাও আমাদের সংগীতের অলঙ্কার গুলির রস গ্রহণ করিতে পারেন না, অথচ তাহাতে হারমনির অভাবের দরুণ একটা মস্ত ক্রটি দেখেন। সুতরাং তাঁহাদের ভাল লাগে না।

যাহা বলা হইল, তাহাতে কোন্ সংগীত উৎকৃষ্ট, কোন্ সংগীত নিকৃষ্ট, তাহার কোন মীমাংসা হইবে না। তাহাতে কেবল এইটুকুই বুঝা যাইতেছে যে ভাল লাগেনা বলিয়াই বাস্তবিক জিনিসটাতে কোন দোষ

থাকা প্রমাণ হয় না। বুঝিবার গোলেও ভাল না লাগিতে পারে। অতঃপর, যাহা বলিতে বসিয়াছি।

সাহেবেরা প্রাচ্যসংগীতের নিন্দা করিবার সময় তিনটি বিশেষণ বার বার ব্যবহার করেন—"নাকী", "বেসুরা", "একঘেয়ে।"

আমরাও তাঁহাদিগকে সহজে ছাড়ি নাই। ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার 'সংগীতসারের' একস্থানে বলিয়াছেন যে হারমনি অসভ্য গথ্ জাতির দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার ব্যবহার অসভ্যতার চিহ্ন !! মানুষ অসভ্যাবস্থায় অনেক ভাল বিষয়েরই সূত্রপাত করিয়াছিল, সংগীত তাহার মধ্যে একটি। সুতরাং ইহা কি বলিতে হইবে যে গান করাটা অসভ্যতা? এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের ইহাই বিশ্বাস যে "আমাদের যাহা, তাহার মতন আর ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।" ইহাতে আর কিছু প্রমাণ না হউক, অন্য দেশের সম্বন্ধে আমরা যে কি পরিমাণ কম খবর রাখি, তাহা সুন্দর প্রমাণ হয়। যদি আমার এরূপ উক্তির দ্বারা মৃতের প্রতি অবিচার হইতেছে, এরূপ কেহ মনে করেন, তিনি একবার "সঙ্গীত-সার" পুস্তক খানি খুলিয়া ইংরাজি "Octave" কথাটার সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে, পড়িয়া দেখিবেন। আমরা বলি "সপ্তক", তাঁহারা বলেন "অক্টেভ"; কার কথা ঠিক? এ প্রশ্নের যে মীমাংসা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ঐ ষড়ক্ষর ইংরাজি শব্দটির অর্থই গ্রন্থকর্ত্তার ভালরূপ জানা ছিলনা। অথচ ঐ কথাটা লইয়া ইউরোপীয়দিগের মস্তকে বিস্তর শ্লেষ বর্ষণ হইয়াছে। বেহালা যন্ত্রটা যে আমাদেরই সম্পত্তি, সাহেবেরা বেনামী করিয়া লইয়াছে, এ কথা সাধারণকে বুঝাইবার জন্যই বা কত চেষ্টা! শেষটা স্থির হইল যে আমাদের দেশে 'ধনুর্যন্ত্র' প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল সুতরাং বেহালাও এদেশেই জন্মিয়াছে। চরকা আমাদের দেশে আগে ছিল বলিয়া কাপড়ের কল এ দেশে জন্মিয়াছে বলিলে যেমন হয়, সেইরূপ। আর একজন আবার ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন।—"এই যন্ত্রকে (বেহালাকে) ইংরাজেরা ভায়লিন্ বলিয়া থাকেন, ইটালিয়ানেরা ইহাকে ভিয়ালো বলেন। বোধ হয় সংস্কৃত বাহুলীন শব্দের অপভ্রংশে ভায়লিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে, এবং অধুনাতন ভারতবর্ষবাসীরা ইহার বিশেষ বিবরণ পরিজ্ঞাত না থাকায় বোধ হয় ভিয়ালো শব্দের অপভ্রংশে বেহালা বলিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক, এই যন্ত্র যে প্রথমে ভারতবর্ষে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ভূরি প্রমাণ

পাওয়া যায়। পাঠকগণ! সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত সঙ্গীতসার গ্রন্থের ৫৬পৃষ্ঠায় ইহার বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট করিবেন।" ("বাহুলীনতত্ত্ব")। এত আগ্রহের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের দোহাই পড়াতে বোধ হয় ইউরোপীয় সংগীত-সংসারের খবর এ গ্রন্থকর্ত্তাও গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায়ই রাখেন। ইহার আর এক প্রমাণ দেখুনঃ—"যদ্যপি কেহ প্রশ্ন করেন যে মধ্যমের সহিত কোমল নিষাদের সুরযোগ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? তাহার সদুত্তর এই যে মধ্যমে এবং কোমল নিষাদে সমান শ্রুতি থাকাপ্রযুক্ত উভয়ের ঐক্যতাও অসম্ভব নহে!" ভাবে বুঝা যায় যে সুরযোগ শব্দে chord বুঝান উদ্দেশ্য; সুতরাং কথাটার সদুত্তরটি অতি সন্তোষজনকই হইয়াছে! এ হেন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটিকে "ঐক্যতা (?) অসম্ভব নহে" বলিয়া শেষ করাতে কায়দাটি আরো সুললিত হইয়াছে।

এই দুটি দৃষ্টান্ত লইয়া এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যাঁহারা এদেশীয় সংগীতের একান্ত গোঁড়া এবং বিদেশীয় সংগীতের বিরোধী, তাঁহারা যে বিদেশীয় সংগীতের সম্বন্ধে ভাল খবর রাখেন না, উল্লিখিত পুস্তকগুলির দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রমাণ হইবে। পুস্তকগুলি যে সে পুস্তক নহে। একখানি ত স্বয়ং "সঙ্গীত সার"। অপরখানিও নেহাৎ কেও কেটা নয়,—"রাজশ্রী-শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে ও সম্পূর্ণ সাহায্যে বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিক্ষার নিমিত্ত প্রচারিত। * * * * শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ও * * * বিশেষ সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।" অর্থাৎ এমন পুস্তক, যদ্দ্বারা দেশে সংগীতবিষয়ক মতের সৃষ্টির ইতর বিশেষ হইতে পারে।

পক্ষান্তরে সাহেবেরা যখন একধার হইতে পাইকারী হিসাবে কথা বলেন, তখন তাঁহারাও আমাদের দেশীয় সংগীত সম্বন্ধে ঐরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন। মহাত্মার গায়ের ঝাল কিছুতেই মিটিল না; শেষে বলিলেন, "তা নয় ত কি! পিয়ানোফর্টির মধুর শব্দের সঙ্গে কি টম্ টমে্র কর্কশ ধ্বনির তুলনা হইতে পারে।" টম্ টম্ শব্দে হয়ত সাহেব আপন ঘাসিয়াড়াদিগের ঢোলের কথা বলিতেছেন। রাত্রিতে ঘাসিয়াড়ারা যখন আহারাদি সমাপন করিয়া ঢোল বাজাইয়া গান গায়, তখন সাহেবের নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং উক্ত যন্ত্রের উপরে সাহেবের বিজাতীয় বিরাগ। আর উহা হইতেই হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধে একটা উৎকট

মত জন্মিয়া বেচারার উল্লিখিতরূপ গুরুতর গাত্রদাহের উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

যথার্থ ভারতীয় সঙ্গীত সাহেবেরা এত কম শুনিতে পান যে তাহার সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা পরিষ্কার মত দাঁড়াইবারই অবসর হয় না। একজন নবাগত সাহেব বাঙ্গালা গান শুনিয়া লেখকের নিকট মত ব্যক্ত করিতে যাইয়া "very queer" এই বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এ গানের ভিতরে সংগীত যে কোথায় তাহাই তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমরাও বিলাতী গান শুনিয়া ঠিক্ ঐরূপ মুস্কিলে পড়ি। পারস্যের সম্রাট যখন বিলাত গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনায় এক প্রকাণ্ড কন্‌সার্ট হয়। সম্রাট আদ্যোপান্ত শুনিয়া প্রথম গৎটি পুনরায় বাজাইতে আদেশ করিলেন। প্রথম গৎ পুনরায় বাজিল; কিন্তু সম্রাট তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না; বলিলেন "এর আগে যাহা বাজিয়াছিল, সেইটে।" শেষে দেখা গেল বাদ্যের অপেক্ষা সুর বাঁধাটাই সম্রাটের বেশী ভাল লাগিয়াছিল! আমরা অবশ্য কেহই পারস্যের সম্রাট নহি; কিন্তু আমাদের অবস্থাটা এবিষয়ে অনেক পরিমাণে তাঁহারই মতন। বিলাতী সংগীত শুনিয়াই যে তাহার রসগ্রহণ করিব, সেরূপ শিক্ষা আমাদের হয় নাই। যে সকল স্থলে উভয় সঙ্গীতের রসগ্রহণের ক্ষমতা বর্ত্তমান দেখা যায়, সে সকল স্থলে এই বিদেশীয় সঙ্গীত-বিদ্বেষেরও অভাব হয়। এইরূপ উদারতার প্রসঙ্গে প্রথমেই সার্ উইলিয়ম্ জোন্স ও কাপ্তেন উইলার্ডের কথা মনে হয়। এই দুই মহাত্মা হিন্দু সঙ্গীতের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ইহার সম্বন্ধে বিস্তর অনুসন্ধান সংগ্রহ, গ্রন্থ প্রণয়ণ ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট এ বিষয়ে আমরা যে কতটা ধারি, তাহা এখনও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারি নাই। অল্পদিন হইল কাপ্তেন ডে বিলাতের সঙ্গীত-সমিতিতে ভারতীয় সংগীতের বিস্তর প্রশংসা করেন। তাহাতে ইহার দুইটি গুণের উল্লেখ ছিল—"ছন্দোগত সৌন্দর্য্য" আর "ভাবের গভীরতা।"

এই ভাবের গভীরতার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। আমাদের দেশীয় ওস্তাদগণ ভাবের ভাবনা অল্পই ভাবেন। শুদ্ধ রাগিণী দ্বারা যতদূর ভাব প্রকাশ হয়, তাহা অনেক পরিমাণে আমাদের আছে; কিন্তু কথায় আর সুরে সামঞ্জস্য থাকিলে যে গভীর ভাবের উদ্ভব হয়, তাহা আমাদের

ওস্তাদদিগের মন আকর্ষণ করিতে পারে না। তাঁহারা অনেক সময়ই নিতান্ত সামান্য কথার উপরে এক একটা প্রকাণ্ড সুরের কামান দাগিয়া বসেন। ইঁহাদের ভিতরে পাণ্ডিত্যেরই অধিক আদর, প্রকৃত সংগীতের আদর নাই। এবিষয়ে সাধারণ লোকের বুদ্ধি ও রুচি ওস্তাদ মহাশয়দিগের চাইতে অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত। আমাদের কিন্তু খুব বড় বড় কথা বলার অভ্যাস আছে। আমরা এবিষয়ে কথায় ব্রহ্মাণ্ডকে হারাইয়া দিয়াছি। আমাদের কেমন সব ছিল, জান? অগ্নি মল্লারের তেজে আগুন জ্বলিয়া সভাশুদ্ধ সম্রাট পুড়িয়া মরিবার ফিকির। ওস্তাদের ভগিনীর নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে সংবাদ গেল; তিনি মেঘ মল্লার আওড়াইতে সভার পানে ছুটিলেন, কিন্তু ব্যস্ততার দরুণ রাগভ্রংশ হইয়া ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। এযাত্রায় সম্রাট বেচারার কি গতি হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ থাকিলে আরো জমাট হইত; কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিক ওস্তাদকে লইয়াই এত বিব্রত ছিলেন যে সম্রাটের খবর লইবার ফুরসত হয় নাই। আর এক ওস্তাদের গল্প শুনিয়াছি, তিনি দেশের যত জনার কাছে যত কিছু ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়াছেন, এখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেই হয়। এমন সময়ে এক দিন পথশ্রম নিবারণের জন্য এক কূপের ধারে বিশ্রাম করিতে গিয়া একটি বালিকাকে দেখিলেন। বালিকা কূপ হইতে জল তুলিলেই অমনি নিরাশভাবে কলসীটি আছড়াইয়া ভাঙ্গিল। ওস্তাদ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই শুনিয়া সে তাঁহাকে অবলীলাক্রমে বর্ব্বর সম্বোধন করিয়া বলিল, "জল প্রবেশের সময় ঐ কলসীতে যে অপরূপ রাগিণী বাজিল, তাহা শুনিয়া আমি নিরাশ হইয়াছি।" এই সকল গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রকৃত ঘটনাগুলির তুলনা করিলে কোন্ দেশে ভাবের চর্চ্চা কিরূপ হইতেছে তাহার আভাস পাওয়া যায়। Malebran আর Sontag নাম্নী প্রসিদ্ধ গায়িকা দ্বয়ের মধ্যে অনেক কাল হইতে মনোমালিন্য থাকায় ইঁহাদের বন্ধুগণের যৎপরোনাস্তি পরিতাপের কারণ হইয়াছিল। একবার কোন বড় লোকের সায়ং সম্মিলনে ইঁহারা উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তখন সকলে মিলিয়া ইঁহাদিগের একটী প্রসিদ্ধ করুণরসাত্মক গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ গানটিতে দুইটি কণ্ঠের প্রয়োজন হয়। এরূপ অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সহজ নহে, সুতরাং অগত্যা উভয়ে স্বীকৃত হইলেন। এরূপ গান, এরূপ কণ্ঠদ্বয় আর এরূপ গুণপনার একত্র সমাবেশ আর হয় না। সুতরাং সে

গানে সকলে স্তব্ধ হইয়াছিলেন। গীত শেষে গায়িকাদয় পুরাতন বৈর ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন; তদবধি তাঁহাদের দৃঢ় প্রণয়ের সূত্রপাত হইল। Jenny Lind আমেরিকায় গেলে তাঁহার গান শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চে তাঁহার মুখে আমেরিকার জাতীয় সংগীত শুনিয়া সে সময়ের একজন অতি প্রধান ব্যক্তি এতদূর উত্তেজিত হইয়া গিয়াছিলেন যে দেশকাল ভুলিয়া গিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে সেই গানে যোগ দিলেন। "আরে, থামো, থামো!"—বুড়ো কি তাহা শুনে! তাঁহার সহধর্ম্মিণী এতক্ষণ তাঁহার কোট ধরিয়া বসাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, বৃদ্ধের তাহাতে চৈতন্যই হয় নাই। লম্বা গানটির আদ্যোপান্ত শেষ করিয়া তারপর গায়িকার উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।

আমাদের দেশে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ওস্তাদ এক সভায় মিলিত হইলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। তাহার চোটে সনাতন সঙ্গীত পলায়নের পথ খুঁজিয়া বাঁচেন। সাধারণ লোকের মনে ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত একটা ভাব হয়, সমজদার মহলে বাহবা পড়িয়া যায়। কিসে যে তাঁহারা এত প্রসন্ন হইলেন, তাহা খুঁজিতে গেলে কতকগুলি বিট্‌কেল কথা পাওয়া যাইবে; তাহার ভিতরে কস্‌রতের কায়দা হয় ত খুব আছে, কিন্তু ভাবের নামগন্ধও নাই। আমাদের সঙ্গীতের উচ্চতম অঙ্গ যে আলাপ; তাহার বিলম্বিতের ভাবটিই অধিক মিষ্ট লাগে। ইহার কারণ এই যে ঐ অংশে পাণ্ডিত্যের ঝোঁকটা তখনও প্রবল হয় নাই। এর পর যতই দূন চৌদূনের দিকে যায়, ততই ত্রাহি ত্রাহি ব্যাপার। তখনকার সেই বিকৃত বদন, ঘূর্ণিত মস্তক, ভ্রূকুটিকুটিল দন্তবিকাশ দেখিলে "বিদ্যাবাগীশ" শব্দের সেই অদ্ভুত ব্যাখ্যার কথা মনে হয়—"বিদ্যাকে বাঘ মনে করিয়া 'ঈশ্‌!' করিয়া উঠিয়াছেন, ইতি বিদ্যাবাগীশ।"

এসিয়াটিক রিসার্চ্চেসের এক স্থানে এক সাহেব "বীন্" বাদ্যের বর্ণনা দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে "যখন মৃদুভাবে বাজায় তখন ভারি মিষ্ট লাগে। কিন্তু যখন উৎসাহ বাড়িয়া উঠে, তখন উৎকট শব্দ হয়।" উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে ইহার কারণ কতক বুঝা যাইবে।

আর এক সাহেবের কথা শুনিয়াছি, তিনি দেশীয় সংগীত এত ভাল বাসিতেন যে একজন ওস্তাদের নিকট রীতিমত শিখিতেন। তিনি বেশ

ভালই বাজাইতেন কিন্তু তাঁহার রাগ বোধ জন্মে নাই—এক রাগ বাজাইতে আর এক রাগ আনিয়া ফেলিতেন।

প্রসিদ্ধ রেমিনী একটি এতদ্দেশীয় রাগ শিক্ষা করিয়া করিন্থিয়ান থিয়েটারে বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সে আজ ৮।১০ বৎসরের কম হইবে না, কিন্তু আজও সাহেবেরা তাহা ভুলেন নাই। এদেশীয় সংগীত সাহেবদের চিত্তরঞ্জক হয় কিনা, এতৎসম্বন্ধে কলিকাতার কোন সংগীত ব্যবসায়ী সাহেবের সঙ্গে অতি অল্পদিন হইল লেখকের কথা হইয়াছিল। সাহেব বলিলেন, "বেহালায় ভাল করিয়া বাজাইতে পারিলে হয়,—যেমন রেমিনী করিয়াছিলেন।"

দেশীয় সংগীতের চর্চ্চা করিয়া সাহেবেরা যেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, বিলাতী সংগীতের চর্চ্চায় এতদ্দেশীয়েরা সেইরূপ বা ততোঽধিক তুষ্ট হইয়াছেন। এমন কি, শিশুজনোচিত ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে শিশুর সুখ আর কাব্য পাঠে প্রবীণের সুখের যে প্রভেদ, প্রাচ্য সংগীতের আনন্দ আর প্রতীচ্য সংগীতের আনন্দে সেইরূপ প্রভেদ, এরূপও বলা হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণধন বাবুও বলিয়াছেন যে "বহুমিল প্রণালী (হারমনি) সংগীত বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ।"

এস্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, হারমনি জিনিসটা যখন এতই ভাল, তখন সেটাকে আমাদের সংগীতের ভিতরে আনিলেই ত গোল মিটিয়া যায়। এসম্বন্ধে উইলার্ড্ সাহেব বলেন যে হিন্দু সংগীতের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যে তাহার সঙ্গে হারমনি খাটান এক এক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এতদ্দেশীয় সংগীতবেত্তাদিগের এই মত, যে আমাদের সংগীতে হারমনি বসাইতে গেলে সকল সময় রাগ রাগিণী ঠিক রাখা যায় না।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে, কিন্তু আর উপায়ান্তর নাই। ইহার ভিতরে একটি আশাপ্রদ কথা আছে। প্রাণের আরামের জন্য যখন কেহ একাকী গান গায়, তখন হারমনি থাকা সম্ভব হয় না। এই সকল স্থলে মেলোডিই থাকে। সেই মেলোডি আমাদের আছে। যে ভাবে আর্য্যকবি "গানাৎ পরতরং নহি" বলিয়াছিলেন, সে ভাবের চরিতার্থতা মেলোডি দ্বারাই হইবে, হারমনি দ্বারা নহে। ইহাতে বোধ হয়, হারমনির চাইতে মেলোডি যেন প্রাণের অধিকতর নিকটে। যাহা হউক এসম্বন্ধে বেশী

বলা লেখকের পক্ষে শোভা পায় না। বিশেষতঃ এসব কথা এপ্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

আমাদের শ্রুতি আমাদের রাগ রাগিণী ইত্যাদির সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা কোনরূপ শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিজ্ঞানের হিসাবে শ্রুতি গুলি ভুল; সুতরাং তাহাদের অস্তিত্ব একটা সংগীতের পক্ষে খুব বেশী প্রশংসার কথা হয় না। রাগ রাগিণীগুলি এক হিসাবে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করে। কিন্তু আর এক হিসাবে দেখা যায় যে ঐ রাগ রাগিণী গুলিই মৌলিকতার মূল উৎপাটন করিয়া প্রকৃত উন্নতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে। শক্তি যতই থাকুক, হাত পা বাঁধা থাকিলে কাজ অল্পই হয়।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

"যুগান্তর"—সামাজিক উপন্যাস—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী-বিরচিত। এই গ্রন্থে শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়, তাহার যথাযথ এবং জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নানা অবস্থায় পড়িয়া মানবচরিত্র কিরূপে পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হয়, তাহা দেখান উপন্যাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিজয়ার মনে কিরূপে বৈধব্যোচিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনের সংকল্প উদিত হইল, কিরূপে তাঁহার চরিত্রের সকল দিক পরিস্ফুট হইল, তাহা দেখাইতে গিয়া লেখক উপন্যাসের এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। হরচন্দ্রের চরিত্র গঠনের ইতিহাসও এই উদ্দেশ্য-প্রসূত। অধিকন্তু নারীচরিত্রের যে এক পবিত্র শক্তি আছে, তাহা হরচন্দ্রের উপর বিজয়ার চরিত্রের প্রভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপ-ন্যাসের আর একটি উদ্দেশ্য মহৎ চরিত্রের সৃজন এবং তাহার উপাদানগুলি ঘটনা-বলীর মধ্যদিয়া বিশ্লেষণপূর্ব্বক প্রদর্শন। এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বনাথ তর্কভূষণ বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। এমন ভীমকান্ত গুণোপেত পুরুষ বঙ্গীয় উপন্যাসে অল্পই দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকারের নায়ক নবীনচন্দ্রেরও চরিত্রের দীপ্তি এই প্রাচীন ভট্টাচার্য্যের নিকট ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্নী এবং নবীনচন্দ্রের "রাঙ্গা মা"কে আমরা সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভক্তি করি ও ভালবাসি। গ্রন্থকারের নায়িকা কৃষ্ণকামিনীর হৃদয় বিধাতা যেন পরস্পর বিরোধী উপাদানেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি লজ্জাশীলা, শিরীষকুসুমকোমলা, অথচ বজ্রের মত দৃঢ়চিত্তা। শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার বর্ণিত ঘটনাগুলি অসম্ভব বা অনৈসর্গিক নহে; তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর চরিত্রে মহত্ত্ব আছে, কিন্তু অতিমানুষ কিছুই নাই। তাহারা আমাদেরই মত রক্তমাংসে গঠিত, আমাদেরই মত সুখ দুঃখের অধীন। এই জন্যই তাহারা আমাদের এত "আপনার লোক" হইতে পারিয়াছে, এই জন্যই তাহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। এই পুস্তকের গ্রাম্য জীবনের ছবি বড় সুন্দর হইয়াছে। হাস্যরসের অবতারণায়ও লেখক বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। শিশুদের কথাবার্ত্তায় ও আচরণে এবং তাহাদের প্রকৃতিতে যে মাধুর্য্যটুকু আছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত

হয়। গ্রন্থকার st an চিত্রও আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহার উপর এমন একটি শ্লীলতা ও সংযত ভাবের আবরণ দিয়াছেন যে, সংসারানভিজ্ঞ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকার চিত্তে তজ্জনিত কোন কালিমা পড়িবে না; অথচ সংসারাভিজ্ঞ লোকের কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিবে না। মাতঙ্গিনীর মৃত্যু কি শোকাবহ! লেখক ঘটনাটি এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহার পাপের প্রতি ঘৃণা হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রতি অধিকতর করুণারই উদ্রেক হয়। পাপীয়সীর পাপের মধ্যেও সরলতা, বিশ্বাসপ্রবণতা, ঐকান্তিক প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণে পুরুষ-হৃদয় অপেক্ষা নারী-হৃদয়ের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হই-য়াছে! গ্রন্থের ভাষা সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বর্ণনার পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়। অল্প কথায়, সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়, পাঠকের কল্পনাকে জাগাইয়া দিবার যে একটি ক্ষমতা আছে, এই গ্রন্থে তাহার অভাব দৃষ্ট হয়। সংযম যেমন মানব-চরিত্রের শক্তিকে সংরক্ষণ ও বর্দ্ধন করে, সংযতভাবও তদ্রূপ ভাষাকে শক্তিশালিনী করে। গ্রন্থকার ধর্ম্মাচার্য্য। সকল কথা উপাসকবর্গকে বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে যে নিরন্তর চেষ্টা করিতে হয়, তজ্জন্য বোধ হয় তিনি সেই অভ্যাস বশতই গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনাবশ্যক টীকা টিপ্পনীর অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সামান্য ত্রুটি। গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, কৌতূহল বাড়িতে থাকে; যদিও গ্রন্থকার ঘটনাগুলি ঐতিহাসিকের মতই বর্ণনা করিয়াছেন, কোথাও রহস্য-গোপনের চেষ্টা করেন নাই। ইহার ছাপা ও কাগজ ভাল। পাঁচ সিকা মূল্যে বৃহৎ আকারের ২৯৬ পৃষ্ঠা পুস্তক সুলভ বলিতে হইবে; বিশেষতঃ এরূপ পুস্তক।

"ভারতমঙ্গল।"—পূর্ব্বখণ্ড, সটীক। আনন্দচন্দ্র মিত্র বিরচিত। ইহা একখানি রূপক কাব্য; কতকটা সংস্কৃত প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের মত। রূপক কাব্যকে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট করা বড়ই কঠিন। নানাবিধ অশরীরী ভাব, বৃত্তি এবং গুণকে শরীরী জীবের ন্যায় পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নয়। কবি মিল্টন হাস্যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া লিখিয়াছেন;—"Laughter holding both his sides." এই সামান্য এক পংক্তিতে অশরীরীকে শরীরী করিবার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে মিত্র মহাশয় আশানুরূপ কবিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার ভণ্ডাসুর প্রভৃতি দুই একটি ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই যে রূপক সৃষ্ট ইহা পাঠক ভুলিতে পারেন না। তবে এই পুস্তকে যথেষ্ট উপদেশ আছে; কিন্তু রূপকের সাহায্যে সেগুলি অধিকতর গভীরভাবে পাঠকের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে, বলা যায় না। ইহার দুই একটী অধ্যায়—যেমন "তপস্যা"—বেশ সুন্দর হইয়াছে। বর্ণনাও স্থানে স্থানে মনোহর হইয়াছে। কিন্তু ইষ্টকগুলি সুন্দর হইলেই যেমন অট্টালিকা সুন্দর হয় না, তদ্রূপ কাব্যের কোন কোন অংশ সুন্দর হইলেই হয় না: শিল্পকৌশলে অংশগুলির বিন্যাস এরূপ হওয়া চাই, যে তদ্দ্বারা যেন সমগ্র কাব্যটি একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্যের আধারও হয়। কবি অনেকগুলি নূতন উপমার ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু এই প্রতিভা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াও তিনি কতকগুলি চিরন্তন বর্ণনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। স্বর্গ "শোভন সুন্দর দেশ, শীত গ্রীষ্ম-ভেদ, নাহি সেথা ঋতুর পর্য্যায়; নিয়ত বসন্ত ঋতু আছে বিরাজিত" ইত্যাদি। তাহা হইলে স্বর্গ তো বড়ই একঘেয়ে যায়গা! বসন্তের মত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীতাদি ঋতুরও কি সৌন্দর্য্য নাই? বস্তুতঃ, শীত হইতে বসন্তের পরিবর্ত্তনই কি বসন্তের হৃদ্যতার একটা কারণ নয়? কবি বলিয়াছেন, স্বর্গে দুঃখ নাই; কিন্তু তাঁহার বর্ণিত স্বর্গ হইতে হৃদয়ভেদী ক্রন্দনধ্বনি তো শুনা যায়? স্থানে স্থানে ছন্দঃ পতন সত্ত্বেও ইহা বলিতে হইবে যে, কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিবার বেশ ক্ষমতা আছে। তাঁহার ভাষার স্রোত অনেক স্থলে আতটপ্লাবিনী নদীর ন্যায় অবাধে প্রবাহিত। এ বিষয়ে উহা মেঘনাদবধের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। তবে ইহাঁর ভাষায় অন্যবিধ কতক-গুলি ত্রুটি দৃষ্ট হয়। ইনি যে অনেকস্থলে "নভোস্থল" লিখিয়াছেন, ইহা কি মুদ্রাকরের

ভুল? "বারবাগ্নি," "উগাড়ি," "নাহ্যানেহ্য," "কোড়ক," "ভাগিরথ... কথ...ত্য," "ন্যাত্র," "পাণ্ডিত্ব," অজড় অমর," "তল্লাসিলা," (আকাশ অর্থে) "অনম্বর," ...ঙ্গ" প্রভৃতি কথা-গুলিতে যে বর্ণাশুদ্ধি ও গ্রাম্যতাদি দোষ আছে, তজ্জন্য মুদ্রাকরকে ...য়ী করা যায় কি না, তাহা বিচার্য্য। কবি পঞ্চম সর্গে ও অন্যত্র গোদাবরী নদীকে বিন্ধ্যাচলসন্নিহিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যে ২০৩ পৃষ্ঠায় দেবকী ও বসুদেবের নন্দালয়ে গমন কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বরং মার্জ্জনীয়, কিন্তু কবির প্রয়োজন, অনবধানতা বা জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত নদী ও পর্ব্বতের স্থানভ্রংশ ঘটিতে পারে না। তিনি আজিকালিকার রঙ্গালয়গুলির যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু তল্লিখিত পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচক কমিটির বর্ণনা অত্যুক্তিপূর্ণ বলিতে হইবে। কবি পাপ পুণ্য ও তজ্জনিত সুখ দুঃখ বর্ণনায় নিপুণ। কিন্তু পাপও তাহার বিভীষিকার বর্ণনায় অধিকতর সক্ষম বলিয়া বোধ হয়। স্থানাভাবে এই পুস্তকের গল্পাংশ দিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। অস্মদ্দেশে সচরাচর যেরূপ অসার পুস্তক বাহির হয়, ইহা তদপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও উপদেশপ্রদ; এবং তজ্জন্যই আমরা ইহার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ দেখাইলাম।

"শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত।" শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী-প্রণীত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন বৈরাগ্যের ও ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখক বৈষ্ণবভাব হইতে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভাষা বেশ হইয়াছে। তবে বৈষ্ণব সাহিত্যে অধিকার না থাকায় আমরা গ্রন্থখানি প্রামাণ্য হইয়াছে কি না, বলিতে পারিলাম না।

"জ্ঞান-প্রসূন"। শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক। লেখকের ভাষা বিশুদ্ধ হইয়াছে। অনেকগুলি বিষয় বেশ জ্ঞানগর্ভ এবং প্রীতিকর। তবে কেরী ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সুন্দর হইলেও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের পক্ষে সুদীর্ঘ হইয়াছে। "পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ" বিষয়ক গল্পটিতে লেখককে বাধ্য হইয়া দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ঐ গল্পটি না দিলে ভাল হইত।

"চাট্‌নী"—A. Bose কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা একখানি হাস্যোদ্দীপক গল্পের বহি। বেশ রস আছে; কিন্তু রসের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লেখক অরসিকের কাজ করিয়াছেন। দুই একটি গল্প শ্লীলতার কিঞ্চিৎ অভাব বশতঃ সর্ব্বত্র অসঙ্কোচে পড়া যায় না। "মোটা লে আও" গল্পটিতে গল্পের ব্যক্তি দুই জন সম্বন্ধে ভুল হইয়াছে। "* * * পাল" এবং "খাজা সাহেবের" পরিবর্ত্তে "৺ রামগোপাল ঘোষ" ও "Sir Arthur Buller, Justice of the Supreme Court" হইবে।—"কাকাবাবুর গল্প"—A. Bose কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শিশুদের উপযোগী বেশ সুন্দর উপকথা।

"নারী-মঙ্গল।" শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরাণী কর্ত্তৃক বিরচিত। এই পুস্তক অল্পশিক্ষিতা বঙ্গনারীগণ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগিণী নহেন, তাঁহারা "শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক"টি বাদ দিতে পারেন। স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থের তালিকাটি একটি নূতন জিনিষ।

"প্রার্থনা। পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রণীত।" শ্রীঅনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বরচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তক বৈষ্ণবগণের অতি আদরের সামগ্রী। বৈষ্ণবেতর ব্যক্তিগণের নিকটও ইহা ধর্ম্মপিপাসা, ব্যাকুল প্রার্থনা ও ভক্তির জন্য আদর পাইবার যোগ্য।

"সচিত্র শিশুহার।" শ্রীরসিকলাল দে-প্রণীত। ইহার কবিতাগুলি বেশ সোজা ও বালকবালিকাদের পাঠের যোগ্য। ছবিগুলি ভাল নয়।

"নীহার বিন্দু।" (কবিতা পুস্তক)। শ্রীনিতাইসুন্দর সরকার-প্রণীত। এই পুস্তকের অনেকগুলি কবিতা বেশ মিষ্ট ও কবিত্বপূর্ণ।

"Treatment by Electricity or Electro-Therapeutics." By Nondolal Ghose, L. M. S. চিকিৎসা-বিদ্যায় কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় আমরা এই পুস্তিকা সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

"The First and Second Annual Reports of the Sircar Sporting and Debating Club. 1892—1893 and 1893—1894." এই পুস্তিকা দুইখানি একটি সমিতির দুই বৎসরের দুইটি রিপোর্ট। ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান এবং নানাবিধ বিষয়ে বক্তৃতাদি দ্বারা তাহাদের আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য। ইহা হইতে নানাবিধ ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহাতে বক্তৃতাদি করিয়াছেন। অকালপক্কতা ও অকালগাম্ভীর্য্য আমাদের দেশের লোকের একটি রোগ। কুড়ি বৎসর পার হইতে না হইতেই অনেকে একটু দৌড়াদৌড়ি করা পর্য্যন্ত ছেলেমানুষী মনে করেন। যদি এই সকল সমিতিদ্বারা এই অনিষ্টকর সংস্কারও দূর হয়, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা অতঃপর সমালোচনার্থ প্রাপ্ত গ্রন্থমাত্রেরই সমালোচনা করিব না; গ্রন্থের বিষয়-গৌরব বা গুণ-গৌরব থাকিলেই করিব।

জিজ্ঞাসা।

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের "দাসী"তে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের "হরিদাসের জন্ম ও হরিনাম কীর্ত্তন" অভিধেয় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যবনকুলোদ্ভব হরিদাস ঠাকুরকে এতদ্দেশে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ-কুলজাত অথচ অতি শৈশবে যবনকর্ত্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত এই জনপ্রবাদের কোন সমীচীন মীমাংসা হয় নাই। কি মূল অবলম্বন করিয়া কি প্রবাদ প্রচলিত হয়, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। বিশেষতঃ কল্পনাপ্রিয় বঙ্গদেশে ইহা আরও দুরূহ। অচ্যুত বাবু হরিদাসের বাল্য ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"বুড়ন গ্রামে এক দরিদ্র দ্বিজদম্পতি বাস করিতেন। * * সকলেই সুমতি শর্ম্মা ও গৌরী দেবীকে ভক্তি করিত। হরিদাস এই ভক্তদম্পতির উপযুক্ত পুত্র। * * হরিদাসের বয়স যখন ছয় মাস, তখন সুমতি ঠাকুর পরলোক যাত্রা করেন। ছয় মাসের শিশুপুত্র লইয়া গৌরী দেবী অকূল সংসার সাগরে ভাসিলেন! * * গৌরীদেবী হরিদাসকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলেন; করিয়া স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক তৎসহগামিনী হইলেন!! * * সুমতির একটী মুসলমান প্রতিবাসীর হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি পিতৃ-মাতৃহীন হরিদাসকে অতি যত্নে আপন আবাসে লইয়া গেলেন ও পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। * * এইরূপে ব্রাহ্মণসন্তানের যবনত্ব প্রাপ্তি হইল।"

অচ্যুত বাবুর এই উক্তি বৈষ্ণবেতিহাস বিরুদ্ধ। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিত "চৈতন্য ভাগবত" ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রণীত "চৈতন্য চরিতামৃত" বৈষ্ণব সমাজে অতীব প্রামাণ্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রেমদাস মহানুভবের অনুবাদিত "চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক" ও শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের "চৈতন্য মঙ্গল"

গ্রন্থও বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ আদরণীয়। হরিদাস যে যবনকুলে জন্মিয়াছিলেন, এই সকল গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে।* বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সমসাময়িক। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে "চৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থে মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইনি বেদব্যাসের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবিরাজ গোস্বামীও ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা ও প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। এই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হরিদাসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে॥
* * * * *
উত্তমকুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥"

হরিদাস যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল যবনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই যবনত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি "হীনজাতি জন্ম মোর" বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন না, এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও তাঁহাকে "জন্মিলেন নীচ কুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে" বলিয়া পরিচিত করিতেন না। যবন হরিদাসের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন প্রসঙ্গে তদানীন্তন হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যদি প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইয়া যবনগৃহে প্রতিপালিত হইতেন, তাহা হইলে এই আন্দোলনের সময় একথা অপ্রকাশিত থাকিত না, এবং এই বৃত্তান্ত বৃন্দাবন দাস ঠাকুর "চৈতন্য ভাগবতে" অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের অল্প দিন পরেই "চৈতন্য ভাগবত" লিখিত হইয়াছিল, এবং বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর বিদ্যমান কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছয় মাসের

* "হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর॥"
চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।
"গোপীনাথ বলে এই দেখ বিদ্যমান।
ম্লেচ্ছকুলে জন্ম ইহো হরিদাস নাম॥"
চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, ৮ম অঙ্ক।
"দেখি সার্ব্বভৌম হরিদাস প্রতি কয়॥
জাতিকুল বৃথা সব ইহা বুঝাইতে।
ম্লেচ্ছকুলে তুমি জন্ম লইলে ইচ্ছাতে॥"
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ১০ম অঙ্ক।

শিশু হরিদাসের মুসলমানগৃহে প্রতিপালনের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত হরিদাসের সমসাময়িক বৈষ্ণবেতিহাস-প্রণেতা বৃন্দাবন দাস অবগত ছিলেন না, চারি শত বৎসর পরে অচ্যুত বাবু তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছেন, ইহা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব?

অচ্যুত বাবুর আর একটী অকাট্যযুক্তি এই, "যদি হরিদাস যবন, তবে তাঁহার হিন্দু নাম হইল কেন?" আমরা ইহার উত্তরে বলিতে পারি, হরিদাস যবন হইয়াও একান্ত হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সম্মানসহকারে 'হরিদাস' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

জাতিকুলের অভিমান যে মিথ্যা অভিমান মাত্র, এবং ভক্ত যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি সকলের সম্মানের পাত্র, এই উপদেশ দিবার জন্য পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাস দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছেন,—

"জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনা নাপায় কৃষ্ণেরে॥
যেতে কুলে কেনে বৈষ্ণবের জন্ম নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির তুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥"
চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড।

আমরা যে সকল প্রমাণ উল্লেখ করিলাম, তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে যে, হরিদাস যবনকুলেই জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে কেবল হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত না। কাজির প্ররোচনায় মুলুকপতি হরিদাসকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ তুমি বহুভাগ্যে মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এখন জাতিধর্ম্ম ত্যাগকরা তোমার উচিত হয় না। হরিদাস ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"শুন বাপ সভারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ কহে হিন্দু ও যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
* * * * * *
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি কর্ম্ম॥"

হরিদাস যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিতেন, তাহা হইলে মুলুকপতিকে স্পষ্টতঃ বলিতে পারিতেন যে হরিনাম কীর্ত্তন করাই আমার কুল ধর্ম্ম, আমি মুসল-

মান গৃহে কিছু দিন প্রতিপালিত হইয়াছিলাম মাত্র, অতএব আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও না। হরিদাস আপনার জন্মবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না, বলিবার যো নাই, যেহেতু অচ্যুত বাবু নিজেই লিখিয়াছেন, 'হরিদাসের রক্ষ প্রতিপালক তাঁহাকে কত প্রবোধ দিলেন, মাতা (?) কত কাঁদিলেন, হরিদাসের মন ফিরিল না।'।

হরিদাস যবনবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহাকে যারপর নাই শ্রদ্ধাসম্মান ও ভক্তি করিতেন। ভক্ত ও সাধুচরিত্রের লক্ষণই এই। কিন্তু কালক্রমে দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ভক্তিস্রোত মন্দীভূত হইল, অস্থিমজ্জাগত জাতিভেদ যখন আবার অল্পে অল্প বৈষ্ণবনেতাদিগের অন্তরে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, সেই সময় হইতেই অনেকে সাধুভক্তগণের জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদিও শাস্ত্র বলিতেছেন, "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ," কিন্তু ইহা সত্য সত্য মানিয়া লইলে 'দ্বিজের' আর মান থাকে কই? কাজেই 'জোলা'-কুলোদ্ভব "কবীরজী" ব্রাহ্মণ ছিলেন, যবন হরিদাস "যবন পালিত, যবনকর্ত্তৃক রক্ষিত, সুতরাং জাতিভ্রষ্ট", ইত্যাদিরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িল।

লেখক মহাশয়ের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, হরিদাস যে "সুমতি শর্ম্মা ও গৌরীদেবীর পুত্র" এবং ইহারা পরলোক গমন করিলে হরিদাস যে যবনগৃহে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, ইহা তিনি কি প্রমাণে অবগত হইয়াছেন, লিখিয়া আমাদের সংশয় দূরীকৃত করিবেন। বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কেবল লোকপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থকে অগ্রাহ্য করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। আশা করি তিনি আমাদের এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কুসংস্কার।

ইংরাজের সমাজের সহিত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোন মিল নাই; থাকিতেও পারে না। ইংরাজের চক্ষে আমাদের সকল প্রকার আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতিই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়। ইংরাজ ভাবেন, ভারতবর্ষীয়েরা ধুতি পরেন, ছি, কি নির্লজ্জতা! হাতে খান, ছি, কি নোংরামি!

বিধবার বিবাহ দেন্ না, কি কুসংস্কার! ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত কলেজে দেশীয় যুবকেরা ইংরাজ গুরুর নিকট শিক্ষিত হইয়া, অনেকে ইংরাজের চক্ষু পাইলেন; তাঁহারাও দেশীয় আচার ব্যবহার গুলি অর্থশূন্য মনে করিয়া বসিলেন; এবং ভাবিলেন, চারিদিকে কি কুসংস্কার! যে ব্রাহ্মণেরা, কেহ মদ্য স্পর্শ করিয়াছে শুনিলে শিহরিয়া উঠিতেন, কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সন্তানেরা অনেকে মাতাল হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দেশ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সমাজের বাঁধন শিথিল হইতে লাগিল। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেনঃ—

"যত দেশী ছেলে কপ্‌চে উঠে চাল্ চলেছে সাহেবানা,
এরা নোনা জল ঢোকাল ঘরে আপনা হাতে কেটে খানা।
এদের পেটে হেড়া মেজাজ্ টেড়া, ইংরাজী কয় বাঁকাভাবে;
বলে জো বাঙ্গালী ড্যাম্ গোটুহেল্ কাছে এলেই কোঁদকা খাবে।"

এই নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় বা ইয়ংবেঙ্গল দলের হাতে, কুসংস্কার শব্দের সৃষ্টি। শিক্ষিত দল সকলেই মাতাল হইয়া উঠিয়াছিলেন, বা হইতেছেন, এমন নহে; কিন্তু ঘটিরাম ডিপুটির মত অনেকেরই কুসংস্কার ছিল না এবং নাই।

'সংস্কার' সকল সমাজেই আছে; অথবা সমাজ, সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। তবে কোন্‌টি সু, কোন্‌টি কু, তাহা উপকারিতা এবং উপযোগিতা দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইয়ংবেঙ্গল দলে সে প্রকার রীতিতে বড় কোন কথা মীমাংসিত হয় নাই। শিক্ষিতদিগের আদর্শ সাহেবিআনা। সুতরাং যাহা কিছু সাহেবিআনার অন্তরায়, তাহাই কুসংস্কার। দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। লজ্জাশীলতা বাড়িয়াছে বলিয়া যে নব্যবঙ্গে এত কাপড়ের আঁটাসাঁটি তাহা নহে। কটিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত কোটবিভূষিত হইয়া, শরীরে 'সুসংলগ্ন' ট্রাউসারস পরিধান করা ভদ্রতা; আর দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিলে হাঁটুর নিম্নভাগ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় বলিয়া, সেটা অসভ্যতা। ইহাদের অবরোধনির্ম্মুক্তা মহিলাগণ মস্তকের অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়াছেন; এবং অঙ্গসৌষ্ঠব বিধায়ক "লো-নেক্"(Low-neck) জ্যাকেটাদি পরিধান করিয়া অঞ্চলের বেষ্টনের আর প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পান্ না। অথচ অন্যদিকে পাদপদ্ম নগ্নাবস্থায় রাখিতে অতি কুণ্ঠিত। মনে হয়, লজ্জা যেন মস্তক এবং শরীর হইতে দূরীভূত হইয়া নবীনাদিগের পায়ে ধরিয়াছেন। স্ত্রীর ভগিনীকে ইংরাজীতে 'আইন মতে' ভগিনী বলে; সুতরাং শ্যালীর সহিত পরিহাস, অতি অমানু-

ষিক কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দুইটি সহোদরা ভগ্নীর একটিকে পিতা এবং একটিকে পুত্র যদি বিবাহ করেন, ত ক্ষতি হয় না। শ্যালী সম্পর্কটা আছে, তবে কাহাকে বলিতে হইবে, এই লইয়া যাহা পরিবর্ত্তন। আমার সৌভাগ্য এই, এ দলের লোক বাঙ্গালা পড়া অসভ্যতা মনে করেন; নচেৎ কেহ হয় ত একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, 'দোষ কি?' আমরা স্বাধীনচিন্তাশীল, যাহা কিছু ভাল বুঝিব, তাহাই করিব; দেশীয় বিদেশীয় বিচার করিব কেন?" কথাগুলি বেশ্ বড় বড়। 'স্বাধীন চিন্তা', 'শাস্ত্র না মানা' প্রভৃতি কথা দ্বারা খুব একটা দিগ্‌গজতা বুঝায় বটে; কিন্তু কাজে কি হইতেছে, একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। দেশের শাস্ত্র বলেন, বা দেশের সমাজ বলেন, "ভূতলে আসন বিস্তৃত করিয়া আহার করিতে বসিবে; স্ত্রী পুরুষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আহার করিবে; পায়ের জুতা দূরে রাখিবে।" শিক্ষিতেরা বলিলেন, ছি! ছি! এ সকল কথা মানা কুসংস্কার। বিলাতের সমাজ বলেন, "ডিনার সু পায়ে দিয়া, স্ত্রীপুরুষ জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত হইয়া, টেবিলে খাদ্য সংস্থাপন করিয়া আহার করিতে বসিবে।" শিক্ষিতদল বলিতেছেন, তথাস্তু, তথাস্তু; ইহার তিলমাত্রও আমরা অমান্য করিয়া অসভ্যতার পরিচয় দিব না। ইংরাজী এটিকেটের অর্থশূন্য কথা সদা প্রতিপাল্য। সুপের প্লেট সাম্‌নে হেলাইয়া খাইলে বর্ব্বরতা হয়; অর্থাৎ ইংরাজ মনে করিতে পারে লোকটা এটিকেট্ জানে না। দেশের লোকের প্রতি যাহাদের এই প্রকার অনুরাগ, তাহারা যখন পেট্রিয়ট্ সাজিয়া কংগ্রেস আলোকিত করিতে যায়, তখন কে না বুঝিবে, তাহাদের সকলই ভণ্ডামি? স্বাধীন চিন্তা অনেক সময়েই একটা ধুয়া; কথার কথা মাত্র। সমাজের কল্যাণের জন্য প্রকৃতপক্ষে যে গুলি প্রয়োজনীয়, সেগুলি প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে, যদি কেহ বাধা পায়, এবং তথাপিও প্রবর্ত্তিত করে, তাহাতে সমাজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় না; এ কথা মানি। কিন্তু কোন্ কার্য্যটী কোন্ শ্রেণীর তাহা চেহারা দেখিলেই জানা যায়। যখন দেখি, "সংস্কারক" নিজে একটী অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়া বিনীত ভাবে সমাজের গঞ্জনা সহ্য করিয়া সমাজসেবা না করিয়া, কেবল বিদেশীয়দিগের কাছে গিয়া মার্টার ও বাহাদুর নাম লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, তখন কে না বলিবে যে এস্থলেও কেবল ইংরাজী ধুয়া? কেবল আত্ম-সমাজ-পরিহার মাত্র?

ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু গড়া বড় শক্ত। একটি সুসংস্কার প্রতিষ্ঠিত করা বড় কষ্টকর, কিন্তু পবিত্র বিবাহ প্রথা হইতে ধুতি পর্য্যন্ত, সকলই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। 'উড়ান চড়ে' সমাজ সংস্কারকদিগের দ্বারা দেশের কি অনিষ্টই না সাধিত হইতেছে। একালের শিক্ষিতদিগের নিকটে দেশীয় প্রাচীন জ্ঞানীদিগের দোহাই দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং একটি উপযোগী বিলাতী বচন তুলিতে বাধ্য হইলাম। গেটে (Goethe) লিখিয়াছেন:—All which merely frees our spirit, without giving us the command over ourselves, is deleterious. আমরা স্বাধীন চিন্তার একটা ধুয়া পাইয়াছি; কুসংস্কার বলিয়া অনেক কথাই উড়াইয়া দিয়াছি, কিন্তু যাহার বলে আত্মসংযম লাভ করিব, তাহা পাই নাই; সুতরাং চতুর্দ্দিকে কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে। এবিষয়েও দুইটি দৃষ্টান্ত দিব। (১) দেশীয় শিল্পাদি যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা করা উচিত। উড়িষ্যায় স্ত্রীলোকেরা বিলাতী কাপড় পরেন না, পরিলে জাতি যায়। এটা আমাদের চক্ষে কুসংস্কার। কিন্তু এই কুসংস্কার টুকুর দ্বারা যতটা উপকার হইতেছে, কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহা হইতে পারে কি? আমাদের কুসংস্কার নাই, প্রতিজ্ঞার বলও নাই; সুতরাং আমরা অকাতরে আমাদের টাকা বিলাতে যাইতে দিতেছি। (২) সমাজে শিশুবিবাহ প্রচলিত আছে, কাজেই শিশু বিধবাও আছে। ইহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে কুমারী মনে করাই নাকি উচিত, তাই ইহাদিগের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এত অসতর্কতার সহিত এই অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যে, 'বিধবা বিবাহে দোষ নাই,' এই জঘন্য বিলাতী কথা দেশে স্থান লাভ করিয়াছে। যে বিধবা, তাহার বিবাহ হইতে পারে না, এসংস্কার অতি পবিত্র। বিলাতী অনুকরণে ইহার উচ্ছেদ সাধিত হইতেছে। সংস্কারের বাঁধন কাটিয়া যাইতেছে বলিয়া বৃদ্ধা বিধবা পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেছে। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য চিরকালই ছিল; কিন্তু এখন তাহার দমন নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইতেছে। সর্ব্বদাই লোকে বিবাহ করিতে উন্মুখ থাকিলে যেন কোন ক্ষতি নাই! প্রকৃত কথা, ইন্দ্রিয়সংযম দূরীভূত হইতেছে; এবং সমাজসংস্কারের ভাণ করিয়া আত্মম্ভরিতা এবং ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি সাধিত হইতেছে। শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে; এমন কি, অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থেও এসকল কথা লিখিয়া শেষ করা

যায় না। এসকল উচ্ছৃঙ্খলতা কেবল ধর্ম্ম দ্বারাই নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু সে পথেও এক বিষম বাধা। সাধারণতঃ আমাদের দেশে যে প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা প্রচলিত আছে, তাহা পাদরীদিগের খ্রীষ্টানি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও সত্য সত্যই অনেক দোষাশ্রিত। হিন্দু যুবক ইংরাজের নিরীশ্বর শাস্ত্র পাঠ করিয়া, ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদায়ই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা কেবল ইংরাজী পাঠ করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দৃঢ় হওয়া বড় কষ্টকর কথা। কারণ সাধারণতঃ ইংরাজ জাতির সাহিত্যে ধর্ম্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদেয় গ্রন্থ নাই। যাহা আছে, সেগুলি তীক্ষ্ণ যুক্তির কাছে বড় দাঁড়াইতে পারে না। একালে জর্ম্মাণির দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব, কিছু পরিমাণে যাহা আলোচিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার আভাস, ইউরোপে কিছু পৌঁহছিয়াছে। কিন্তু সে সকল গ্রন্থ এদেশে বড় অধিক পঠিত হয় না। কাজেই শিক্ষিতদিগের অন্তঃকরণ ধর্ম্ম-ভাব-পরিশূন্য হইতেছে। কর্ত্তাহীন গৃহের মত, ধর্ম্মহীন জীবন, দিন দিন উচ্ছৃঙ্খলই হইতেছে। অতি নিরক্ষর "কুসংস্কারাপন্ন" দরিদ্র হিন্দুর গৃহে যে পবিত্রতা, শান্তি এবং সৌন্দর্য্য বিরাজিত, সমাজের, গণ্যমান্য ফিরিঙ্গীকৃত বাবুর গৃহে তাহার সহস্রাংশের একাংশই বা কই? সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার পথে বসিয়াছে, কে ইহাকে নিয়মিত করিবে? এরূপ সঙ্কটকালে প্রাচীন ঋষি বলিতেন, 'ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্'; তিনি বলিতেন "এষাস্য পরমাগতিঃ।" ইংরাজী সভ্যতার পাউডার ঝাড়িয়া ফেলিয়া, ঋষির পদধূলি অঙ্গে মাখিতে চাহ কি? যদি চাহ, তবেই এই বিঘ্ন নিরাকৃত হইবে, এবং প্রকৃত কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া সুসংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

এলাহাবাদ।

প্রথম যে বার আমি এলাহাবাদে যাই, সে সময়ে বর্ষাকাল। এলাহাবাদ সহর কেমন, তাতে কি আছে, সে কথা যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি বিপদ্গ্রস্ত; আমি সহর দেখি নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী, হিন্দুর প্রয়াগ-তীর্থ, ভারতবর্ষের মানচিত্রের একটা গণ্য মান্য স্থান আমি দেখি নাই, অথচ কোথায় পর্ব্বতের মধ্যে কি আছে, হিমালয়ের চির-তুষারের পাশে নীরবে নির্জ্জনে একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহা দেখিবার জন্য বহু কষ্ট ও প্রাণপণ করিয়াছি, এ কথাটা কেমন খাপছাড়া বোধ হয়। কি করিব, আমার অদৃষ্টে এলাহাবাদ সহর দর্শন ছিল না, কিন্তু এলাহাবাদ সহরের কথা যে শীঘ্র ভুলিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই। অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন এই শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা দেশের ক্ষুদ্র গ্রামে বন্ধুবান্ধব বেষ্টিত হইয়াও যখন এলাহাবাদের কথা ভাবি, সেই অপরিচিত স্থানে গভীর রজনীতে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে আমি যে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম, সে কথা মনে হইলে, এখনও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কষ্ট বিপদের কথা বড়ই মনে থাকে, সুখের কথা মনে থাকে না; দুঃখ দুর্দ্দিনের "ফটো" যেন সর্ব্বদাই মানসচক্ষে অবিকৃত, দেখিতে পাওয়া যায়, সুখের স্মৃতি তেমন উজ্জ্বল থাকে না। তাই এলাহাবাদে আমি প্রথমবার যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা আমার বেশ মনে আছে। "দাসী"র পাঠকপাঠিকাদিগকে আমার সেই বিপদ-কাহিনী আজ শুনাইব।

দেশ বিদেশ, পাহাড় পর্ব্বত, অরণ্য প্রস্রবণের মধ্যে ক্রমাগত অনেকদিন ভ্রমণ করিয়া আমার একটী অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা এইঃ—লোকালয় অপেক্ষা অরণ্য পর্ব্বত নিরাপদ স্থান; লোকালয়ে কুভাব সকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দিবানিশি বিচরণ করে। নবাগত অতিথি সংসারক্ষেত্রে, লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া যদি একটু অসতর্ক হয়, যদি চারিদিক সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া একখানি পা ফেলে, তাহা হইলেই তাহাকে একটী না হয় আর একটী বিপদে পড়িতেই হইবে; আর গভীর অরণ্য দেবতার প্রিয় নিকেতন, স্বর্গের ছবি, সেখানে ভাইয়ের বুকের শোণিতপিপাসায় ভাইয়ের উদ্যত অসির হৃদয়ভেদী দৃশ্য নাই, সতীর পবিত্র সৌন্দর্য্য বিলাস-লালসার গরলময় কুদৃষ্টিতে মলিন হয় না, অশান্তির কুবাতাসে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। অরণ্যে কোন ভয় নাই। হিংস্র জন্তু বনে আছে, বিষধর সর্প বনে আছে, কিন্তু কিন্তু ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম—

> "But envy, calumny and spite
> Bear stronger venom in their bite."

এ কথার যাথার্থ্য আমার জীবনে বিশেষভাবে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তবুও লোকে পথহারা হইলে, জঙ্গলে পড়িলে, অন্ধকার রাত্রে লোকালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, দূর কুটীর-বহির্গত সামান্য প্রদীপের ক্ষীণ আলোক দেখিয়া

হৃদয়ে কত বল পায়। তখন কি তাহার মনে হয় যে, সেই ক্ষুদ্র কুটীরের আলোক-পার্শ্বে সিংহ ব্যাঘ্র সর্প অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ানক, তাহারই স্বজাতীয় জীব হয় ত সেখানে তাহার ন্যায় বিপন্ন পথিকের যথাসর্ব্বস্ব ও আবশ্যক হইলে জীবন পর্য্যন্তও কাড়িয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? আমি মনুষ্যদ্রোহী নহি, কিন্তু অনেক দেখিয়া শুনিয়া মনুষ্যপ্রকৃতি অপেক্ষা জড় প্রকৃতিই আমার অধিকতর প্রিয়। ভগবানের পবিত্র সিংহাসন অরণ্য গিরি নির্ঝরিণীর প্রত্যেক স্থানে জীবন্তভাবে দেখিয়াছি; আর মানুষের হৃদয়ে সুধু প্রতারণা, সুধু ঈর্ষা, সুধু দ্বেষ, সুধু পরশ্রী-কাতরতা। শান্তি লাভের জন্য যাহার নিকট গিয়াছি, সেই অশান্তিপূর্ণ; সাধুদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। এত দেশ দেখিলাম, হিমালয়ের ন্যায় উদার মহান, স্থির গম্ভীর, কঠিন কোমল একটা মানুষও দেখিলাম না; চৈতন্য, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদের মত কাহাকেও দেখিলাম না। হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ভুলিয়া মানুষ কি হিমালয়ের মত হইবে না? "দাসী"র পাঠকপাঠিকা কেহ কি হিমালয়ের মত জীবন গঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিবেন না?

এলাহাবাদের কথা মনে হইলে উপরের সব কথাই আগে মনে হয়, মানুষের দুর্ব্বলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠে, তাই এক কথা বলিতে আর এক কথা বলিতে হয়। সে সব কথা ছাড়িয়া আমি এলাহাবাদের কথা বলি।

আমি যখন এলাহাবাদ ষ্টেসনে পৌছিলাম, রাত্রি তখন ১২টার একটু বেশী। এলাহাবাদের পাঁচ সাতটী ষ্টেসন এ পাশ হইতেই আমরা বৃষ্টি পাইয়াছি; যখন ষ্টেসনে পৌছিলাম, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। গাড়ী হইতে নামিয়া যেখানে টিকিট দিতে হয়, সেখানে আমার টিকিটখানি দেখাইয়া বাহির হইলাম; আমার টিকিট অনেক দূরের। গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, যদি কোন বাঙ্গালী যাত্রী গাড়ী হইতে নামে। প্রায় ১০ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যাহাদের টিকিট দিবার ছিল, দিয়া চলিয়া গেল, তাহার মধ্যে একজনও বাঙ্গালী দেখিলাম না। সঙ্গে একটী পোর্টম্যাণ্টো, বিছানা পত্র কিছুই সঙ্গে নাই; ছাতাটি পর্য্যন্তও নাই। রেলের নম্বরওয়ালা কুলীরা আমার পোর্টম্যাণ্টোটি বহিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিতে চাহিল, আমি তখনও কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি নাই, কাজেই তাহারা বিদায় হইয়া গেল। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের বিশ্রাম

ভবনে লোকারণ্য, কেহ শুইয়া আছে, কেহবা তামাকু খাইতেছে, কেহবা বসিয়া বসিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত কোন যাত্রীর সঙ্গে গল্প করিতেছে, কেহবা নিজের গাঁটরী কোলে করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, এক একবার তাহার মস্তক গাঁটরীর উপরে আসিয়া পড়িতেছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও সেখানে বসিবার স্থান পাইলাম না। এদিকে নিদ্রার জ্বালায় শরীর কেমন করিতেছে। কি করি, তাহার ঠিকানা করিতে পারিতেছি না, এমন সময়ে একজন পরিণতবয়স্ক দরিদ্র কুলী আমাকে নিতান্ত বেকার দেখিয়া আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, আমি রাত্রিবাসের জন্য একটু স্থানের প্রার্থী, তখন সে এলাহাবাদের "বহুত উম্‌দা" একটা সরাইয়ের অস্তিত্ব আমার গোচর করিল এবং তাহা যে "থোড়ি দূর" সে কথাও বিজ্ঞাপন করিল। গরিব বাঙ্গালী, তিন বেলা অন্নের সহিত সাক্ষাৎ নাই, পৌণে দুই রাত্রি নিদ্রা নাই, আর অনবরত গাড়ীতে থাকা, এ অবস্থায় যদি কেহ অতি নিকটেই সুন্দর শয়নের স্থান পাওয়া যাইতে পারে জানায়, তবে সে প্রলোভন কি সম্বরণ করা যায়? বিশেষ আমার সংবাদদাতা যখন বলিলেন যে, তিনি কুলী নহেন, তিনি রাত্রি দুইটার গাড়ীতে কোথায় যাইবেন, আমাকে নিতান্ত নিরুপায় "মুসাফের" দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া আমাকে সরাই দেখাইয়া দিতে চাহিতেছেন, এবং বেশী ভারি না হইলে আমার পোর্টম্যাণ্টোটী অবধিও আশ্রয় স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারেন, তখন তাঁহার এই বৃষ্টির দিনে এ হেন নিঃস্বার্থপরতায় সন্দেহ করিবার আমার কি অধিকার আছে? সে যে আমাকে নিতান্ত বোকা বাঙ্গালী পাইয়া ঠকাইবে ও বিপদে ফেলিবে, সে কথা সে সময়ে আমার মাথায় প্রবেশ করে নাই। এজন্য আমার উপর "স্থূলবুদ্ধি" "বিয়াকুফ্" প্রভৃতি যে বিশেষণই বিনি প্রয়োগ করিবেন, আমি তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

সেই অপরিচিত স্বার্থহীন পরহিতব্রত লোকটীর স্কন্ধে আমার পোর্টম্যাণ্টোটী দিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখনও একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় অল্প অল্প কাদা হইয়াছে। ষ্টেসনের বাহিরের রাস্তাটী বেশ বড়; সেই রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া আমরা দুই জন চলিলাম, পথে জনমানবের সমাগম নাই, সমস্ত সহর নীরব, সুধু

"প্রহরী কুকুর ডাকে, তার সেই রব
সহরের প্রান্ত হোতে আর প্রান্তে ধায়।"

এমন নীরব নিদ্রিত ভাব আমি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এতক্ষণের মধ্যেও আমার মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই; প্রকাশ্য রাজপথ; একদিকে অট্টালিকা-শ্রেণী, অপরদিকে মাঠের মত, তাহার অপর পার্শ্বে কি আছে, রাত্রের অন্ধকারে বুঝিতে পারিলাম না। লোক জন না থাকিলেও এ প্রকার স্থানে তেমন ভয় হয় না। বোধ হয় আধ মাইলের কিছু বেশী পথ এইভাবে চলিলাম। নিদ্রায় চক্ষু ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। পথপ্রদর্শক মহাশয় এখন সদর রাস্তা ছাড়িয়া বামের একটী গলির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে গলির দুই পাশে দুইটী প্রকাণ্ড কোঠা বাড়ী। গলিটী খুব সংকীর্ণ, তাহার মধ্যে গাড়ী যাইবার যো নাই; জিজ্ঞাসায় জানিলাম সরাইটী বড় রাস্তার উপরে নহে, একটু ভিতরে। বেশী দূর যাইতে হইল না, একটা প্রকাণ্ড দুয়ারের ভিতর দিয়া একটা প্রশস্ত উঠানে উপস্থিত হইলাম, তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া একটা দোতালা বাড়ী, বারান্দা দেখিতে পাইলাম না। পথ-প্রদর্শক বলিলেন, নীচে লোকজন থাকে না, উপরে থাকে; তাহার পাছে পাছে একটা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। একটী দ্বারের সম্মুখে দুই তিনটী ডাক দিল, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না দেখিয়া সেই স্থানে আমার পোর্টম্যাণ্টোটী নামাইয়া আমাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। এতক্ষণে আমার যেন কেমন একটা ভয় করিতে লাগিল; যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার সম্মুখের একটা জানালা খোলা ছিল, সেই জানালা দিয়া নীচের উঠানটা দেখিতে পাওয়া যায়। আমার পোর্ট-ম্যাণ্টো টানিয়া সেই জানালার গোড়ায় লইয়া গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট এই প্রকারে কাটিয়া গেল; আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম'; লোকটীর উপরে ভয়ানক সন্দেহ হইতে লাগিল। তার সেই নিঃস্বার্থপরতা এখন আমার নিকট ভিন্নভাব বোধ হইতে লাগিল। এই অপরিচিত স্থানে এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমাকে মারিয়া ফেলিলেও কেহ সন্ধান পাইবে না; এলাহাবাদে এমন সময়ে এমন স্থানে আমি আসিতে পারি, ইহাই বা কাহার মনে হইবে। প্রাণভয়ে ভীত হইলাম। এমন সময়ে সেই দ্বার খুলিয়া গেল, একটী প্রদীপের

আলো জ্বলিতেছে, ঘরের মধ্যে দুই তিনটি মাদুর পাতা, আর তারই এক পাশে একখানি চারপায়া; আমার পথ-প্রদর্শক ব্যতীত সেখানে আর কাহাকেও দেখিলাম না; আমার শয়নের জন্য সেই চারিপায়াখানি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। কি একটা নাম ধরিয়া ডাকায় একজন প্রকাণ্ড জোয়ান সেই ঘরে আসিয়া, সেই চারপায়ের উপরে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। আমি তাহারই উপর বসিলাম। আমার পথ-প্রদর্শককে দুই আনা পয়সা দিলাম, বোধ হইল সে বিদায় হইয়া গেল।

এমন সময়ে একটী নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল; আমি ত একেবারে অবাক্! কি করিব, কি বলিব, ভাবিয়া পাই না। স্ত্রীলোকটী আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; আমি বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করায় সে কি একটা সঙ্কেত প্রকাশ করিল। দেখিতে দেখিতে দুই তিন জন অসুরের মত লোক ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমাকে বুঝাইয়া দিল যে এই স্ত্রীলোকটী এ ঘরের মালিক, তাহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা আমার ভাল হইবে না। তাহাদের সেই চেহারা, আর কথা শুনিয়া আমি আর প্রাণের আশা করি নাই। আমি বুঝিলাম, আজ এই স্থানে আমার প্রাণ যাইবে। কিন্তু দেখিলাম, স্ত্রীলোকটীকে জড়ান জড়ান ভাষায় কি বলিয়া লোক কয়টী অন্তর্হিত হইল।

স্ত্রীলোকটী শেষে আমাকে খুলিয়া বলিল যে, বাড়ী তাহার, সে এখানে লোক জনের আশ্রয় দিয়া থাকে; যে সমস্ত পথিক তাহাকে যথাযোগ্য সমাদর ও টাকা কড়ি না দেয়, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়, এমন কি তাহারা অনেক লোকের প্রাণ সংহার পর্য্যন্ত করিয়াছে। তাহার সেই সব কথা শুনিয়া আমার আর একপদও চলিবার সামর্থ্য ছিল না। সে যে সমস্ত প্রস্তাব করিতে লাগিল, শুনিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল; আমার পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া দেখিতে চায়। আমি শেষে অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপায় আমার বিনয়-প্রার্থনা, চক্ষের জলে তাহার পাপ-পঙ্কিল পাষাণ হৃদয়ও একটু নরম হইল এবং আমি যদি তাহাকে পাঁচটী টাকা দিই, তাহা হইলেই সে আর আমাকে কিছু বলে না। আমি আর কোন আপত্তি না করিয়া পাঁচটী টাকা দিয়া পোর্টম্যাণ্টো স্কন্ধে লইয়া বাহির হইলাল; স্ত্রীলোকটী আমাকে নামিবার সিঁড়ি দেখাইয়া দিল। আমি বাহির হইয়া বেগে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বড় রাস্তার

আসিয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, এক দৌড়ে ষ্টেসনে যাই; সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম; পথে একজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে দেখা হইল, তাহাকে বলিলাম যে, আমি একটা সরাইয়ে গিয়াছিলাম, সেখানে থাকিবার সুবিধা হইল না, তাই ষ্টেসনে যাইতেছি; প্রাণ কিন্তু তখনও ধড়্ফড়্ করিতেছে। বিপদের কথা আর তাহাকে বলিলাম না। পাহারাওয়ালা লোকটী বড়ই ভাল; সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল এবং বড় রাস্তার ধারে কিছুদূর গিয়া আমাকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া ছোট একটা দোতালা বাড়ীর দ্বারের নিকট "বাবু বাবু" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। একজন বাঙ্গালী বাবু বাহির হইয়া আসিলেন; পাহারাওয়ালা বলিল এই বাঙ্গালী বাবুর হোটেল আছে। বাঙ্গালী বাবুটী আমার পরিচয় লইলেন এবং আমাকে বিশেষ সমাদরে ঘরে লইয়া গেলেন; এত রাত্রে আহারের কোন উপায় নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। আমি যে এত সহজে এমন বদ্মাইসের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়াছি, এই কথা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। পরদিন তাহার কীর্ত্তিকাহিনী আমাকে শুনাইবেন, এই আশ্বাস দিয়া আমাকে একটা বিছানা দেখাইয়া দিলেন; আমি সেখানে শুইয়া শুইয়া বিপদের কথা ভাবিতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপায় এত সহজে পরহন্তাদের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি, সেই জন্য সেই অখিলনির্ভরের নাম প্রাণ ভরিয়া করিলাম; হৃদয় অনেক শান্ত হইল।

শ্রীজলধর সেন।

খাদ্য।

অনেক কারণে ব্যক্তিগত ও জাতীয় অবনতি ঘটে। তন্মধ্যে খাদ্যের অপকৃষ্টতা প্রধান। পূর্ব্বকালে হিন্দুজাতির অনেক উন্নতি হইয়াছিল। শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, প্রেম, সাধুতা, স্বাবলম্বনে, প্রাচীন হিন্দুর তুল্য জাতি পৃথিবীতে বিরল। সে জাতি কিরূপে এত অবনতি প্রাপ্ত হইল? অবনতির অনেক কারণ আছে। একটী প্রধান কারণ খাদ্যের দারিদ্র্য।

অনেক পণ্ডিত লোকেও এ কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন। তাঁহারা বলিবেন, "সেকি? আহারের উপরে একটা জাতির উন্নতি অবনতি

নির্ভর করে? শরীর রক্ষা করা আবশ্যক, দেশস্থ সকল লোকের উন্নতি লইয়াই জাতীয় উন্নতি! এ সকল কথা মানি; কিন্তু এ কথা স্বীকার করা যায় না যে আমরা যাহা আহার করি, তাহাতে শরীর রক্ষা পায় না, অথবা শরীর পুষ্টিলাভ না করিলে মন বা আত্মার উন্নতি হয় না। শরীরের প্রতি এতটা দৃষ্টি ভাল দেখায় না। সাহেবেরা আহার বিহারে অত্যধিক অনুরক্ত, তাঁহাদের দেখাদেখি এদেশীয়েরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, আমাদিগের খাদ্য অপকৃষ্ট। ঋষিরা গলিত পত্র ও হরিতকী খাইয়া বেদ পুরাণ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা সে সকল বুঝিবার ক্ষমতা রাখি না; কেবল বলিতে শিখিয়াছি, প্রাচীন খাদ্যে আর চলে না।" ঋষিরা কি খাইতেন কি না খাইতেন, সে কথা পরে ভাবিব। এই কথাগুলির মূলে একটী মত বিদ্যমান আছে, প্রথমে তাহার আলোচনা করি। মতটি এই,—শরীর রক্ষা করা ও সুস্থ রাখা উচিত বটে, কিন্তু শরীর ও মনের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা এতদূর ঘনিষ্ঠ নয় যে, শেষেরটির উন্নতির জন্য প্রথমটিতে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কথাটা কতদূর ঠিক্, অতি সহজে জানা যাইতে পারে। শরীরে পীড়া হইলে মন কষ্টে আত্মহারা হইয়া যায়; চিন্তাস্রোত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। পীড়া সারিয়া গেলে মন পুনঃ প্রকৃতিস্থ হয়, চিন্তাস্রোত পূর্ব্বের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই তত্ত্বটি বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারা যায়। ভুক্তদ্রব্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শরীর পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে মনও পরিবর্ত্তিত হয়। সাধারণ খাদ্যের দ্বারা যে পরিবর্ত্তন ঘটে, বিশেষ প্রণিধান ব্যতিরেকে তাহা ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু তেজস্কর দ্রব্য দেহের যে বিষম পরিবর্ত্তন ঘটায়, তাহাতে মনও ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তিত হয়। ঐ পরিবর্ত্তন ভোক্তা ভালরূপে বিবৃত না করিলেও নিকটস্থ অভিজ্ঞ লোকেরা সহজে বুঝিতে পারেন। বহু পরীক্ষায় ও ভূয়োদর্শনে জানা গিয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মানসিক অবস্থা উৎপন্ন হয়। মিঠাবিষ সেবনে মৃত্যুভয় ও ব্যাকুলতা, কেউটিয়া সাপের বিষ ভক্ষণে স্মৃতিনাশ, অজ্ঞানতা ও চলিয়া বেড়াইবার অত্যধিক ইচ্ছা, সোণা ভোজনে আত্মহত্যার স্পৃহা জন্মে। এই সকল মানসিক অবস্থা ঐ ঐ দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে সহজেই মনে হয় যে, প্রত্যেক খাদ্যের সহিত বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থার সম্বন্ধ

আছে। অন্বয় শাস্ত্রের যুক্তিপ্রণালী এই মতের অনুকূল। এদেশীয় যোগী-সম্প্রদায় প্রায় দিবানিশি মানসিক অবস্থা লইয়াই থাকেন, এমন আত্মনিবিষ্ট আর কোন সম্প্রদায়ের লোকই নহে। তাঁহারা এই মত সাধনের সহিত প্রচার করিয়া থাকেন।

মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মসাধন ও শিক্ষাতত্ত্বের একটী গূঢ় রহস্য এই যে, কোন বাহ্য কারণে বিশেষ মানসিক অবস্থা পুনঃ পুনঃ জন্মিতে থাকিলে ক্রমে তাহা মনে প্রকৃতি-গত হইয়া দাঁড়ায়। শেষে এমন হয় যে অবস্থাটি আর জন্মদাতা কারণের অপেক্ষা করে না, প্রায় সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে ও চিত্তের বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য হয়। এই অবস্থা যদি পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা ভাল হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্ত্তন চিত্তের উন্নতি; যদি মন্দ হয়, চিত্তের অবনতি। যদি একই প্রকার খাদ্য পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করা হয়, তাহার ফল এই হয় যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থা চিত্তের প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল অবস্থা চিত্তের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় দেয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মানসিক উন্নতি অবনতি মুখ্য ভাবে শরীর ও গৌণ ভাবে খাদ্যের উপরে নির্ভর করে।

যাঁহারা কোন না কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই মীমাংসা। মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—অভ্যাসবলে কি ক্রমে খাদ্যের, বিশেষতঃ স্থূল খাদ্যের হস্ত এড়াইতে পারে না? যে খাদ্যে মানসিক অবনতি ঘটিতে পারে—বহু শ্রমলব্ধ উচ্চ মানসিক অবস্থা নষ্ট হইতে পারে, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নাই? ধর্ম্মশীলের পক্ষে এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজস্থ কর্ম্ম-বিপনির তত্ত্বাবধায়ক বাবু * * এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি একাদিক্রমে ১৬ দিন উপবাস করেন। প্রথম তিন দিন কিছুই আহার করেন নাই, তথাপি বেড়াইতে কথা বলিতে ও কিছু কিছু কাজ কর্ম্ম করিতে পারিতেন। ৪র্থ দিন তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়েন। সেই দিন হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ কেবল এক পয়সার চিনির সরবত পান করিতেন। মানসিক অবস্থা পূর্ব্বাপর ভালই ছিল। কিন্তু ক্রমে কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হয় ও কথা বলিবার ইচ্ছা চলিয়া যায়। শেষে শরীর এমন দুর্ব্বল হইয়া যায় যে বিছানা হইতে উঠিতে পারিতেন না। ১৬ দিন পরে তিনি অনাহারের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। বহুদিনের চেষ্টাতেও এরূপ সঙ্কল্প

পূর্ণ করা যায় না। ওঁকারনাথে একজন বাঙ্গালী যোগী বাস করেন। তিনি আহার অত্যন্ত কমাইয়া ফেলিয়াছেন। এখন কেবল কিঞ্চিৎ বেলপাতার রস ও অল্প দুগ্ধ পান করেন। তাঁহার শরীর এমন দুর্ব্বল যে তিনি রাস্তায় বিশ্রাম না করিয়া বাস্তর অতি নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেও যাইতে পারেন না; শরীর নিতান্ত শীর্ণ।

অল্পাহারী লোকের মধ্যে যুগপৎ মনস্বী ও কর্ম্মঠ কোন ব্যক্তি পাওয়া যায় না। কেন এমন হয়, পরে বলিব। এস্থলে কেবল এই কথা বলিয়া রাখি যে, জগতে যাঁহারা মনস্বিতা ও কর্ম্মঠতা এই উভয়ের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া অধিক বয়সে পরলোকে গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ অল্পাহারী ছিলেন, এরূপ শুনা যায় না। রামমোহন রায় ও জনব্রাইট প্রচুর আহার করিতেন। প্রচুরভোজি মাত্রেই মনস্বী বা কর্ম্মঠ এরূপ বলিতেছি না। অভিপ্রায় এই যে, মনস্বিতা ও কর্ম্মঠতা একত্র লাভ করিবার নিমিত্ত প্রচুর ভোজন আবশ্যক। বংশ, শারীরিক ও মানসিক গঠন, শিক্ষা, সঙ্গ, সাধন ও আহার এই সমস্তগুলির উপরে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মভাব ও কার্য্যক্ষমতা নির্ভর করে।

যে কোন প্রকার দ্রব্যে উদর পূরণ করিলেই চলে না। দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকে পেটের জ্বালায় যথেষ্ট পরিমাণে শাক শব্জি কচুঘেচু খাইয়া ফেলে। তাহাতে কাহারও শরীর পোষণ হয় না, অধিকন্তু ভোক্তারা পেটের পীড়ায় মারা যায়। তবে কি যে ভোজ্য যথেষ্ট পরিমাণে উদরস্থ করিয়া হজম করিয়া ফেলা যায়, তাহাতেই শরীর পুষ্ট ও রক্ষিত হইতে পারে? পরীক্ষা করিয়া স্থির করা আবশ্যক।

কতকগুলি কুকুরকে কেবল চিনি ও পরিস্রুত জল খাইতে দেওয়া হইল। প্রথম ৭।৮ দিন তাহারা বিলক্ষণ ক্রিয়াশীল ও প্রফুল্ল রহিল এবং পূর্ব্ববৎ আহার ও পানীয় গ্রহণ করিল। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্ষুধা প্রবল থাকা সত্ত্বেও তাহারা শুকাইয়া যাইতে লাগিল ও প্রত্যহ প্রায় ৩।৪ ছটাক চিনি খাইতে লাগিল। তৃতীয় সপ্তাহে শীর্ণতা বৃদ্ধি পাইল—তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং ক্ষুধা ও ক্রিয়াশীলতা হারাইল। এই সময়ে প্রত্যেক চক্ষুর বহিরাবরণে ঘা হইল এবং ঘায়ের ফল স্বরূপ নেত্ররস বাহির হইতে লাগিল—এইটী সকল পরীক্ষণেই দেখা গিয়াছে। কুকুরগুলি এ অবস্থাতেও প্রত্যহ প্রায় ১॥০ ছটাক ২ ছটাক চিনি খাইতে থাকে, কিন্তু শেষে এমন

দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, নড়াচড়ার শক্তি রহিল না, এবং ৩১ দিন হইতে ৩৪ দিনে প্রাণত্যাগ করিল। ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গেল, তাহাদিগের দেহে অনাহারে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান। বস্তুতঃ অনাহারে রাখিলেও কুকুরেরা প্রায় এতদিন জীবিত থাকে।* গঁদ বা জলপাইয়ের তৈল খাওয়াইয়াও প্রায় এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ যবক্ষারজান যুক্ত খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ না করিলে শরীর রক্ষা পাইতে পারে না, চক্ষুরোগ প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। যে সকল হিন্দু প্রায় ভাতের উপরে নির্ভর করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে চক্ষুরোগ অতিপ্রবল।†

কিন্তু পাকশক্তি অনুসারে মাংস প্রভৃতি অম্লজানযুক্ত খাদ্যও অত্যধিক খাইলে শরীরের অপকার হয়। এমন কি বাত প্রভৃতি নানাবিধ গুরুতর পীড়া জন্মে। শুধু শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য প্রথম প্রথম অত্যধিক খাইয়া অনায়াসে জীর্ণ করা যায়; কিন্তু কিছুদিন এরূপ করিলেই অম্বলের পীড়া উৎপন্ন হয়। বসা শরীরের এক প্রধান উপকরণ। কিন্তু যথাশক্তি বসা খাইয়া হজম করিয়া ফেলিলেও শেষে দেখা যায়, তাহাতে শরীরের উপকার না হইয়া অপকার হইয়াছে। লবণ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য বা জল সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অতিরিক্ত চিনি খাইয়া দেখা যায়, তাহা শরীরের প্রয়োজনে আসে না, যকৃৎ কেবল ভারগ্রস্ত করে, আর মূত্রদ্বারে নির্গত হইয়া প্রস্রাবে চিনির ভীতি জন্মায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য নির্ব্বাচনের ভার কেবল পাক যন্ত্রের উপরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

তবে খাদ্য নির্ব্বাচনের উপায় কি? নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে লক্ষ্য কি জানা আবশ্যক।

এই যে মানবদেহ, ইহার মত সুন্দর ও কর্ম্মসাধন পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই। এই দেহ প্রথমে নির্গঠন, নিরাকৃতি, আদিমূর্ত্তিরূপে জরায়ু নিকেতনে আবির্ভূত হয়। তখন উহা অতি ক্ষুদ্র, বিজ্ঞান-চক্ষু মহাশক্তি অণুবীক্ষণেও দুরধিগম্য। তখন খাদ্য জননীর পাকযন্ত্রে পাক পাইয়া তদীয় দেহের শোণিতস্রোতে প্রবেশ করে ও তথায় নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া জরায়ুতে প্রবেশ পূর্ব্বক নবাগত অতিথি আদিমূর্ত্তির অভ্যন্তরে পোষণ সামগ্রী ছড়াইয়া দেয় ও তথা হইতে মল সংগ্রহ করিয়া মাতৃদেহে ফিরিয়া আসে।

* Kirke's Hand-Book of Physiology, 13th Edn, 1892, p. 544.
† Do p. 545.

আহার পাইয়া আদিমূর্ত্তি নষ্ট অণুর স্থান পূরণ করিয়া লয় ও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ক্রমে নির্গঠন বিবিধ গঠন লাভ করে, নিরাকৃতি বিবিধ আকৃতি ধারণ করে। যেখানে কোন গঠনই ছিল না, সেখানে বিবিধ অঙ্গ, যন্ত্র ও ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; যাহার কোন আকৃতিই ছিল না, সে ক্রমে মৎস্য, সরীসৃপ, বানরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। যখন বানর বর্ব্বরের মূর্ত্তি লাভ করে ও বাহ্যজগতের সহিত কতকগুলি সম্বন্ধ রক্ষার উপযুক্ত হয়, তখন সে জরায়ু-কারা ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আসে। তখন খাদ্য জননী দেহে বিবিধরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া মাতৃস্তনে উপস্থিত থাকে। কালক্রমে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ়তা লাভ করে, পাকযন্ত্রের ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পায়। তখন সে অপেক্ষাকৃত গুরুপাক দ্রব্য জীর্ণ করিতে পারে, স্তন্যের আর প্রয়োজন থাকে না। যতই বয়স বাড়ে, ততই খাদ্যের গুণে দেহের গঠন, দৃঢ়তা, কার্য্যশীলতা বাড়িতে থাকে। এইরূপে পূর্ণযৌবনে গঠনের বিচিত্রতা, আকৃতির সৌন্দর্য্য এবং যন্ত্র, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ সকলের দৃঢ়তা ও কার্য্যশীলতা চরমসীমায় উপস্থিত হয়। এই সময় হইতে বুদ্ধিবল, নৈতিকবল ও ধর্ম্মবল হ্রাস না পাইয়া বাড়িতে থাকিলেও সর্ব্বপ্রকারেই দেহের অবনতি হইতে থাকে। নিয়মিতরূপে উপযুক্ত খাদ্য ভোজন প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে কখনও কোন রোগ জন্মে না, শীঘ্র মৃত্যুও হয় না। দেহের বৃত্তি সকল কমিতে কমিতে অতি বৃদ্ধকালে, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য শাসনে যখন স্থগিত হইয়া যায়, তখন মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুই স্বাভাবিক মৃত্যু।

জরায়ু-মন্দিরে আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত আদিমূর্ত্তির যে জীবনী আখ্যাত হইল, তাহার সহিত খাদ্যের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ! কে না জানেন যে, এই দীর্ঘকালের যে কোন মুহূর্ত্তে খাদ্যপ্রাপ্তি না ঘটিলেই জীবন-সূত্র ছিঁড়িয়া যায়? বস্তুতঃ দেহবিকাশ, দেহের কার্য্যশীলতা এবং তৎসঙ্গে মনের বিকাশ ও আত্মার উন্নতি খাদ্যের উপরে নির্ভর করে। এখন দেহের বিকাশ ও কার্য্যশীলতা জিনিসটা কি ভাবিয়া দেখিলে খাদ্যের প্রয়োজন বুঝা যাইতে পারে।

কার্য্যশীলতা কি আমরা সকলেই জানি। দেহের বিকাশ আদিমূর্ত্তির জীবনবৃত্তে বিবৃত হইল। এই বিবরণে দেখা যায়, খাদ্যের প্রয়োজন দেহস্থ বিবিধ যন্ত্র, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গের (১) সৃজন, (২) আকৃতি-নির্ম্মাণ, (৩) গঠন-বৈচিত্র্য, (৪) দৃঢ়ীকরণ, (৫) বর্দ্ধন, (৬) ক্ষতিপূরণ এবং (৭) বিচিত্রবৃত্তি ও

কার্য্যশীলতার (ক) সৃজন, (খ) রক্ষণ, ও (গ) বর্দ্ধন। খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে এই প্রয়োজন অল্প বা অধিক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে। সকল গর্ভিণী, প্রসূতি বা সাবালক মনুষ্য সমান খাদ্য আহার করেন না, সুতরাং সকল ভ্রূণ, শিশু বা সাবালক মনুষ্যের দেহ সকল বিষয়ে সমান বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। এই বিকাশের সহিত বংশাদিরও সম্বন্ধ আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সকল নানাকারণে কেহ প্রাংশু, কেহ বামন ; কেহ স্থূল, কেহ কৃশ ; কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত ; কেহ বীর, কেহ ভীরু ; কেহ বুদ্ধিমান্, বিদ্বান, কর্ম্মশীল, কেহবা অবোধ, মূর্খ, অলস ; একজন ধার্ম্মিকের শিরোমণি, আর একজন অধার্ম্মিকের চরণ-রেণু।

শ্রীগোবিন্দনাথ গুহ।

এসিয়া ও পৃথিবীর ধর্ম্ম।

এসিয়ার নামে ইউরোপের অধিবাসীরা ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। তাঁহাদের মতে এই মহাদেশবাসীরা অর্দ্ধসভ্যমাত্র। ইউরোপীয় বীর্য্য ও শৌর্য্য, ইউরোপীয় অধ্যবসায় ইহাদের নাই। ইউরোপীয় স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতে ইহারা অসমর্থ। পরের দাসত্ব করিতে, পরের পদলেহন করিতেই ইহাদের সৃষ্টি, এবং সেই কাজেই ইহারা পটু। অনেকেই এইরূপ ভাবকে ইউরোপীয় দাম্ভিকতা ভিন্ন আর কিছুই মনে করেন না। এই বিষয়ে তর্ক করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এইরূপ বিশ্বাস যৌক্তিক কি অযৌক্তিক তাহার মীমাংসা করিতে আমি প্রস্তুত নই। এসিয়া সম্বন্ধে যিনি যাহা ভাবুন না কেন এক বিষয়ে এসিয়ার গৌরব অসীম—এক বিষয়ে অন্য সকল স্থান এসিয়ার নিকট অবনত-মস্তক। এসিয়া পৃথিবীর ধর্ম্মগুরু। এই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে বর্ত্তমান সময়ে যে কয়টি প্রধান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভাজনীয়। (১) আর্য্যধর্ম্ম, (২) সেমিতীয় ধর্ম্ম, (৩) খৃষ্টধর্ম্ম। তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে এ বিভাগ ভ্রমশূন্য নহে, কিন্তু যে ভাগ করা গেল, তাহা মোটামোটি ঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। (১) আর্য্যধর্ম্ম—আমাদের দেশে অনেকে হিন্দুধর্ম্মকেই আর্য্যধর্ম্ম বলেন। আমি এ কথাটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। আর্য্যজাতীয়েরা যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত

করেন, তাহাকেই আর্য্যধর্ম্ম বলিতেছি। আর্য্যজাতি বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি ছিল কিনা, সে বিষয়ে আজ কাল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সে সংশয়ের সঙ্গে আজ আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সাধারণতঃ আর্য্য শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত, এই প্রবন্ধে সেই অর্থই গ্রহণ করা হইল। এই আর্য্যধর্ম্মের আজ কাল দুইটি প্রধান শাখা বর্ত্তমান ; (ক) হিন্দুধর্ম্ম, (খ) বৌদ্ধধর্ম্ম। পুরাকালে এই ধর্ম্মের অনেক শাখা ছিল ; যথা গ্রীকধর্ম্ম, রোমকধর্ম্ম, টিউটনধর্ম্ম, ইত্যাদি। আর একটি শাখা আজও কিয়ৎ পরিমাণে জীবিত, তাহা পারসীক ধর্ম্ম। কিন্তু আজ কাল আর্য্যধর্ম্মের দুইটি মাত্র প্রধান শাখা। (২) সেমিতীয় ধর্ম্ম—ইহা সেমিতীয় জাতীয়গণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইহার দুইটি শাখা বর্ত্তমান ; (ক) ইহুদীধর্ম্ম, (খ) মুসলমান ধর্ম্ম। ইহুদী ধর্ম্মাবলম্বী লোক আজ কাল খুব বেশী নয় বটে, কিন্তু পারসীক প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্রধর্ম্ম অপেক্ষা জগতের ইতিহাসে এই ধর্ম্মের গুরুত্ব অনেক বেশী। ইহা একরূপ খৃষ্টধর্ম্মের জনয়িতা। (৩) খৃষ্টধর্ম্ম। ইহাকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে কেন সন্নিবিষ্ট করা হইল, সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা উচিত। হঠাৎ মনে হয় ইহা ইহুদীধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ; এবং অনেক অংশে তাহা ঠিকও বটে। যীশু নিজকে ইহুদীধর্ম্ম সংস্কারক বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। যাহা এখন বাইবেলের পুরাতন অংশ বলিয়া বর্ণিত, যতদূর জানিতে পারা যায় তাহা তাঁহার ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস ছিল। কিন্তু একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যায় যে আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে তুরস্ক পারস্য প্রভৃতি দেশে যে গ্রীকসভ্যতা বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়, এবং তাহার সহিত যে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন চর্চ্চা অনেক দূর ব্যাপিয়া পড়ে, তাহার সহিত খৃষ্টধর্ম্মের অনেকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। গ্রীক সভ্যতার এইরূপ বিস্তার না হইলে খৃষ্টধর্ম্ম কিরূপ আকার ধারণ করিত, বলা যায় না। এ সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলা আবশ্যক। সেমিতীয় ধর্ম্মদ্বয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উহাদের সঙ্গে এক কঠোর ভাব মিশ্রিত আছে। এই কঠোরতা অন্তনির্বিষ্ট নয়, ইহা সুস্পষ্ট। ইহুদীধর্ম্মই বল, আর মুসলমান ধর্ম্মই বল, উভয়েতেই আর্য্য কোমলতার অভাব। ইহাদের ঈশ্বর যেরূপ ভাবে চিত্রিত, তাহাতে তাঁহাকে মানব জাতি হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। মানুষের উপকারার্থে তিনি অনেক কাজ করিতেছেন, যাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টাবান্

তথাপি তাঁহার ভাব গম্ভীর ও ভয়োৎপাদক। সেমিতীয় জাতির মজ্জাগত কঠোরতা সেমিতীয় ধর্ম্মে কোমলত্বের অভাবের কারণ। আর্য্য জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে যে কোমলতা আছে, সেমিতীয় জীবনে ও সাহিত্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান সাহিত্যে যে কোমলতা, যে মাধুর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা বাহির হইতে লওয়া; আরবজাতি হইতে প্রাপ্ত নয়। আরবীয় মুসলমানেরা যখন নানা দেশ জয় করিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম যখন অন্যান্য জাতিরা গ্রহণ করিল, মুসলমানেরা যখন বিধর্ম্মী সাহিত্য ও দর্শন চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মুসলমান সাহিত্যে কোমলতার আবির্ভাব হইল। প্রাচীন ইহুদীদের জাতীয় জীবন এরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে তাহারা আপনাদের সব ভাল দেখিত ও অন্যান্য জাতিকে ঘৃণা করিত। ইহার ফল, বাইবেলের পুরাতন অংশে কোমলতার আশ্চর্য্য অভাব। খৃষ্টধর্ম্মে কিন্তু এই সেমিতীয় কঠোরতা দৃষ্ট হয় না। তাহার প্রধান কারণ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে তুরস্কে গ্রীক সভ্যতা বিস্তার ও গ্রীক সাহিত্য প্রচলন বলিয়া বোধ হয়। ইহার ফল কঠোর ইহুদী জীবনেও কতক পরিমাণে আর্য্যভাব আর্য্য কোমলতার প্রবেশ; ইহার ফল খৃষ্টধর্ম্মের মাধুর্য্য। ঐ ধর্ম্মের স্থানে স্থানে যে বৌদ্ধভাব লক্ষিত হয়, ভাল করিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার সময় আজিও আসে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা যুদিয়ায় তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন কিনা, এবং তাহারই ফল খৃষ্টধর্ম্মে প্রতিফলিত কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার সময় আজিও আসে নাই। খৃষ্টধর্ম্মকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করার কারণ এখন পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন।

উপরে যে কয়টি ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহাদের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। অনেক পণ্ডিতের অনুমান আর্য্যধর্ম্মের জন্মস্থান মধ্য এসিয়া। আর্য্যধর্ম্মের যে দুইটি প্রধান শাখা আজ কাল বর্ত্তমান তাহাদের ভারতের সহিত বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুবিশাল হিন্দুধর্ম্ম—যাহার মহিমা আমরা আজ কাল কিছু কিছু বুঝিতে শিখিতেছি,—ভারতবর্ষে ঠিক জন্মগ্রহণ করে নাই বটে, কিন্তু এই দেশে আসিয়াই তার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভারতের আর একটি গৌরবের কারণ আছে। বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষা দেয় জগতে কেবল একটি মাত্র ধর্ম্ম। সেই মহামহিমান্বিত বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মস্থান আমাদের এই হিন্দুস্থান। ইহুদীধর্ম্ম ধর্ম্মের ইতিহাসে অতি উচ্চস্থান

অধিকার করে কেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই ইহুদী ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এসিরিক তুরস্কের দক্ষিণদেশ। আজ কাল পৃথিবীর জীবন্ত ধর্ম্ম সকলের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মকে প্রধান বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু ইহার প্রধান গৌরবের কারণ, বহুবিস্তীর্ণ ধর্ম্ম সকলের মধ্যে ইহাই কেবল একেশ্বরবাদী। আরবের বারিশূন্য মরুদেশ এই ধর্ম্মের আদিভূমি। এখন বাকি কেবল খৃষ্টধর্ম্ম। ইউরোপীয় সমাজে ইহাই সভ্যজগতের ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; মানুন আর না মানুন, আজও ইউরোপীয়গণ ইহার গর্ব্ব করিতে ছাড়েন না। ইহুদীয় ধর্ম্মপ্রাণতা এবং গ্রীকদিগের সাহিত্য ও দর্শনচর্চ্চা যে ধর্ম্মের নিদানভূত, খ্রীষ্ট প্রবর্ত্তিত সেই ধর্ম্ম এই ঘৃণিত এসিয়াখণ্ডেই জন্মগ্রহণ করে; এবং ইহার যাহা কিছু পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে এসিয়াবাসীদের কার্য্য।

পৃথিবীর প্রধান ধর্ম্মসমূহ যে এসিয়াজাত তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। এইরূপ হইবার কি কোন কারণ আছে? কারণ অবশ্যই আছে। জগতে বিনা কারণে কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না। কিন্তু কারণের সত্তা ও তাহার জ্ঞাতব্যতা এক বস্তু নয়। সমাজ ও ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নসমূহ যে বড় জটিল, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। কি কারণ সমবায় হেতু এসিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের মাতৃভূমি হইল, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন এবং তাহা যে নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। তবে এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আমাদের মনোমধ্যে যে দুই এক কথা উদয় হইয়াছে, তাহাই পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হইতে পারে, কিন্তু এই প্রবন্ধ লেখার দরুণ যদি যথার্থ তত্ব নির্ণীত হইবার পক্ষে কিছু সাহায্য হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে সকল য়ুনানীয় জাতি সভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত, ধর্ম্ম-চর্চ্চা সম্বন্ধে তাহারা আজ পর্য্যন্তও আর্য্য ও সেমিতীয় জাতিদ্বয়ের অনেক পশ্চাতে অবস্থিত। এসিয়ার যে সমস্ত জাতি আর্য্য বা সেমিতীয় জাতি সন্নিবিষ্ট নয়, তাহাদিগকে তুরাণীয় বলা গেল। তুরাণীয় জাতিসমূহের মধ্যে চীন ও জাপানীরাই সভ্যসমাজভুক্ত হইবার দাবী করিতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক সভ্যতা তাহাদের মধ্যে

যতদূর বিস্তৃত বলিয়া স্বীকার করা যাউক না কেন, আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহারা যে আজও অনেক নীচে অবস্থিত, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বহুকাল হইতে বিস্তীর্ণরূপে ধর্ম্মচর্চ্চা আর্য্য ও সেমিতীয় জাতিদ্বয়ের মধ্যে প্রচলিত। জাপানীপ্রমুখ তুরাণীয় জাতিসমূহের মধ্যে যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহা আর্য্য কিম্বা সেমিতীয় জাতি হইতে লওয়া, এবং ধর্ম্মভাব ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অঙ্কুরিত অবস্থায় স্থিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে একদিকে আর্য্য ও সেমিতীয় ও অপরদিকে তুরাণীয় জাতির যে পার্থক্য তাহা জাতিগত বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ বড় জটিল এবং তাহার অনুসন্ধান আমাদের ক্ষমতার অতীত। কিন্তু এই পার্থক্যের সত্তা ঐতিহাসিক এবং তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এখন যে দুই জাতির মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চা পুরাকাল হইতে বহুলরূপে প্রচলিত, তাহাদের আদিস্থান এসিয়া। সেইজন্য এসিয়াকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ত্তমান সভ্যজগতের গুরু বলা হইয়াছে। নানাকারণে সেমিতীয় জাতি ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। বরাবর অনেকটা ইহা এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আবদ্ধ রহিয়াছে। আর্য্যজাতি অনেক শাখায় বিভক্ত এবং অধিকাংশ শাখা ইউরোপ মহাখণ্ডে যাইয়া উপনিবেশ করে। কিন্তু যে শাখা যবে যেথানে গিয়া থাকুক না কেন, ধর্ম্মবীজ সকলকেই এসিয়া হইতে লইয়া যাইতে হইয়াছে।

এখন একটা কথা উঠিতে পারে। উপরে বলা হইয়াছে যে দুই জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিশেষরূপে স্ফূরণ হইয়াছিল, আর্য্যজাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতর। ইউরোপের অধিকাংশ বর্ত্তমান জাতিরা আর্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত। কিন্তু কই তাহাদের মধ্যে ত কোন নূতন ধর্ম্ম সমুৎপন্ন হয় নাই, এবং ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য তাঁহাদের মধ্যে ত দৃষ্ট হয় না? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই, যে ধর্ম্মচর্চ্চায় ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বৈষম্যের দুইটি কারণ—(১) জাতিবৈষম্য—(২) স্থানবৈষম্য। জাতিবৈষম্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখন স্থানবৈষম্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইবে।

সেমিতীয় জাতি প্রধানতঃ এসিয়ার সীমায় আবদ্ধ। আফ্রিকার স্থানে স্থানে ইহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সকল উপনিবেশ কখনও বৃহৎ আকার ধারণ করে নাই। অতএব স্থানবৈষম্যে

ইহাদের ধর্ম্মভাবের কিরূপ বৈষম্য হইতে পারিত, তাহা কিছুই বলা যায় না। স্থানবৈষম্যে জাতীয় চরিত্রের কিরূপ বৈষম্য হইতে পারে, তাহা কেবল আর্য্যজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার এক শাখা যেমন আর্য্যাবর্ত্তে তাহাদের অধিকার স্থাপন করে, সেইরূপ অন্যান্য শাখা ইউরোপ মহাখণ্ডের সুদূর পশ্চিমে ও উত্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইউরোপ অঞ্চলে যে সব আর্য্যেরা গিয়া বসবাস করে, তাহাদের মধ্যে কোন জাতিই জগতের ইতিহাসে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। এসিয়িক আর্য্যদিগের মধ্যে কেবল ইরানীয়রা ও হিন্দুরা পৃথিবীর ইতিহাসে আপনাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে।

মুসলমান ধর্ম্মের তেজে ইরানীয় ধর্ম্ম আজ ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তপ্রায়। মুসলমান ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন না হইলে ইহার ইতিহাস কিরূপ হইত তাহা বলা যায় না। এখন বাকি রহিল হিন্দুরা; এবং এখনও প্রবল দুইটি ধর্ম্ম তাহাদের দ্বারা গঠিত। আর্য্য ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, ধর্ম্মভাব ইহাদের মধ্যে তত প্রবল ছিল না। সেমিতীয়দিগের ন্যায় তাহারা তত ধর্ম্মগত প্রাণ ছিল না। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল ভারতবর্ষে। ইহাতে সহজে অনুমিত হইতে পারে যে, ভারতের এমন কিছু বিশেষত্ব আছে, যাহা হইতে ইউরোপীয় আর্য্য ও ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে। আমার বোধ হয় ইউরোপ ও ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থার প্রভেদ এই পার্থক্যের কারণ। মোটের উপর ইউরোপের জল বায়ুর ও ভূমির অবস্থা এবং ইউরোপের প্রাকৃতিক গঠন এইরূপ যে জীবনধারণ করিবার জন্য ইউরোপীয়গণকে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতি মানুষকে পরাভব করিতে পারে নাই, মানুষই প্রকৃতিকে পরাভব করিয়াছে। এই যুদ্ধের ফল—ইউরোপীয় বল, সাহস ও অধ্যবসায়, ইউরোপীয় সভ্যতায় অনাত্ম ভাব, নৈসর্গিক নিয়মানুসন্ধানে ইউরোপীয় মনের ধাবন; এবং যে পরিমাণে ইউরোপীয় দৃষ্টি বহির্জগতের দিকে গিয়াছে, অন্তর্জগতের দিক হইতে সেই পরিমাণে ইহা অপসৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় আর্য্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের অপেক্ষাকৃত অভাবের কারণ কতকটা উপলব্ধি হইল। এদিকে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? জীবনধারণোপযোগী আহার

এখানে অনায়াসলভ্য। জল বায়ুর যে প্রকার অবস্থা তাহাতে সর্ব্বপ্রকার আয়াস অল্পাধিক কষ্টকর। একবার আর্য্য উপনিবেশ বহুল পরিমাণে স্থাপিত হইবার পর প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম বোধ হয় একবারে উঠিয়া গিয়াছিল। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি যত অধিক, এত বোধ হয় আর কোন জাতির মধ্যে লক্ষিত হয় না— ইহার ফল, ভারতবর্ষে আশ্চর্য্যরূপ দর্শন ও ধর্ম্মচর্চ্চা। এবং সেই হেতুই ভারত জগতকে দুইটি প্রধান ধর্ম্ম দান করিতে সমর্থ হইয়াছে—

এই প্রবন্ধে ৬টি বিষয়ের অবতারণা করা গিয়াছে। (১) সভ্যজগতে যে কয়টি প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপিত আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ। (২) তাহাদের উৎপত্তির স্থান নির্ণয়। (৩) তুরানীয় ধর্ম্ম। (৪) ধর্ম্মচর্চ্চা সম্বন্ধে জাতিগত বৈষম্য। (৫) ঐ সম্বন্ধে স্থানগত বৈষম্য। (৬) আর্য্য জাতিগণের মধ্যে কেবল হিন্দুদের মধ্যে বহুল পরিমাণে ধর্ম্মচর্চ্চার কারণ। এই প্রবন্ধে পৃথিবীর অনেক মৃত ও জীবিত ধর্ম্মের উল্লেখ করা হয় নাই; এবং যে কয়টি বিষয়ের অবতারণা করা গিয়াছে, তাহাও খুব সংক্ষেপে। যে সব মত প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহাদের সত্যাসত্যতার বিচার পাঠকেরা করিবেন।

ব।

"অনম্বর"।

"দাসী"র বর্ত্তমান সংখ্যার ১৪৪ পৃষ্ঠায় ২য় ছত্রে আকাশ অর্থে "অনম্বর" শব্দের প্রয়োগ অশুদ্ধ বলা হইয়াছে। উহা মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর আমরা জ্ঞাত হইলাম যে "প্রকৃতিবাদ" অভিধানে "অনম্বর" শব্দের একটি অর্থ আকাশ বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু ইহা ভুল। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত শব্দসার, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতিকৃত শব্দস্তোম মহানিধি, এবং উইলসন্ সাহেবের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে "অনম্বর" কথাটি নাই। পুনা ফার্গুসন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বামন শিবরাম আপ্তে, এম্-এ,-প্রণীত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান, রাজা রাধাকান্ত দেব-সংকলিত শব্দকল্পদ্রুম, অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ কৃত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান এবং পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি-কৃত 'বাচস্পত্য' অভিধানে "অনম্বর" শব্দের "আকাশ" অর্থের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং "ভারত-মঙ্গল"-প্রণেতা যদি প্রকৃতিবাদের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

ভগবানের কৃপায় দাসাশ্রমের আর এক মাস কাটিয়া গেল। আমরা তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া দাসাশ্রমের বন্ধুগণকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক মাসিক কার্য্যবিবরণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

এ মাসে স্থায়ী রোগীর সংখ্যা ১১ ও অস্থায়ী রোগীর সংখ্যা ২ :—

১। দামো, ২। রামজী, ৩। বাবুরাম, ৪। তিতুরাম, ৫। টোকানি ঋষি, ৬। দেবিয়া, ৭। দুর্গাতারিণী, ৮। শিবু, ৯। দুর্গামণি, ১০। ফুলকুমারী, ১১। রাজেন্দ্র, ১২। কৃষ্ণপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, ১৩। চন্দ্রনাথ মজুমদার।

রামজী। বৃদ্ধ বয়সে অর্দ্ধ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া বেচারা বড়ই ভুগিতেছে। জানি না ভগবান কত দিনে তাহার এ যাতনা শেষ করিবেন।

বাবুরাম। ইচ্ছামত কখন কোন কাজ করে। পশ্চিমে আসিয়া তাহার ইচ্ছাটা বেশ কর্ত্তৃত্ব করিয়া দশজনের এক জন হইয়া বেড়ায়; কেবল যদি দুটি চক্ষু থাকিত!

তিতুরাম। এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম ছিল ভাল। এখন গলা বেদনা প্রভৃতি কিছু কিছু অসুখ যাইতেছে।

টোকানি। বেচারা কুষ্ঠ ব্যাধির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া এখন আছে মন্দ নয়। ঘা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। খাওয়া কমিয়া গিয়াছিল, এখন আবার নিয়মমত খাইতেছে। 'ক্যাবল পুটি মাজডা খালিই' তার 'ছর্দ্দি হয়'; এটা যেন তাহাকে না দেওয়া হয়, সে সে বিষয়ে খুব সাবধান আছে।

দেবিয়া। নেপালি বুড়ী এখনও খুব শক্ত আছে। তবে ধীরে ধীরে অথর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত হইয়াছে।

ফুলকুমারী। ইহার বাড়ী হুগলী জেলা আমনাগ্রামে। বয়স ৬৯ বৎসর। পায়ে ফোস্কা হইয়া গলিয়া গিয়া ক্ষত হয়, তাহাতে একেবারে অচল হইয়া পড়ে। গ্রামের লোকে যত্ন করিয়া চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। সেখানে পায়ের ঘা আরাম হইয়া যায় কিন্তু চক্ষে যে ছানি পড়িয়াছে তাহা আর উঠিল না। আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায় বাবু কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয়ের বিশেষ যত্নে সেখানকার সিভিলসার্জ্জন মহাশয় আপন রাহাখরচ দিয়া দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। এখানে নূতন স্থানে আসিয়া প্রথমে একটু অসুবিধা বোধ করিয়াছিল, এখন একরকম আছে ভাল।

দুর্গামণি। বাড়ী দুর্গানন্দপুর। বয়স ৭৮ বৎসর। জ্বর হওয়ায় চুঁচুড়া হাঁসপাতালে যায় ও জ্বর সারিলে তাহাকে বাড়ী যাওয়ার কথা বলায় সে অস্বীকৃত হয় ও বলে তাহার কেহ নাই, সে যায় কোথায়?- ফুলকুমারীর সঙ্গে সে দাসাশ্রমে প্রেরিত হইয়াছে।

রাজেন্দ্র। এত দিন পরে রাজেন্দ্রকে তাহার ভাই আসিয়া তাহার ভগ্নীর ইচ্ছাক্রমে লইয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্র বড়ই শান্ত ও ভক্তিমান আতুর ছিল। শুইয়া শুইয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে যখন সে গান করিত, তখন তাহার চক্ষু দুটী বিস্ফারিত হইয়া উঠিত।

ভগবান তাহার আত্মার কল্যাণ করুন। আশা করি, তাহার ভাই ভগ্নী তাহার প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিবেন। *

বাবু চন্দ্রনাথ মজুমদার। বাড়ী বরিশাল জেলায়, বয়স ৫০ বৎসর, মাষ্টারী চাক্‌রী করেন। ইনি পুরাতন রোগগ্রস্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পচম্বায় আসেন। সেখানে ভয়ানক জ্বর হওরায় ডাক্তার কবিরাজ ও সেবা শুশ্রূষার লোকাভাবে একেবারে অসহায় হইয়া পড়েন। অবশেষে গিরিডিতে দাসাশ্রমে খবর দিতে বাধ্য হন। দাসাশ্রমের নূতন নিয়মানুসারে রোগী লইবার ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রাণ যায় দেখিয়া তাঁহাকে দাসাশ্রমে আনা হয়। এখানে এক দিন আসিলেই পর বসন্ত দেখা দিল। এখানকার ডাক্তারদিগের মত যে এই দুরন্ত ব্যাধির বীজ তিনি কলিকাতা হইতেই লইয়া আসিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে মাত্র। ইনি অত্যন্ত গরিব বলিয়া বরিশালের গরিব ধনভাণ্ডার (Poor Fund) ১০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার এখন শোচনীয় অবস্থা। গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের পরামর্শ ক্রমে ইঁহাকে এখন একটী আউট হাউসে (প্রধান বাস গৃহ হইতে দূরে একটী ক্ষুদ্র গৃহে) স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেবা শুশ্রূষা যথোচিত চলিতেছে। সম্প্রতি ॥৵০ দিনধার্য্য করিয়া তাঁহার সেবার জন্য একজন লোক রাখিতে হইয়াছে। আমাদের সাধ্যে যাহা হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত একরূপ হইয়াছে, এখন ভগবানের ইচ্ছা। †

বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন দাস। ইনিও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া অন্য স্থানাভাবে দাসাশ্রমে খরচ দিয়া আছেন। ‡

গিরিডি সেবালয়ের মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

(২২শে জানুয়ারি—২১শে ফেব্রুয়ারি)

আয়।

মণিঅর্ডার যোগে ৮৬॥০, মাং ইন্দুভূষণ রায় ১০৲, মাং নরেন্দ্রনাথ মান্না ১০৲, বাবু সত্যানন্দ বসু হাইকোর্টের উকীল ৫৲, বাবু শক্তিকান্ত মুখোপাধ্যায় ২৲, খোরাকি ২৲, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু চাঁদা জানুয়ারি ১৲=মোট জমা ১১৬॥০।

---

* ইহার যাইবার সময় Carrying Companyর কর্ত্তৃপক্ষগণ দাসাশ্রমের রোগী বলিয়া তাঁহাদের গাড়ী বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। এজন্য আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

† এই রিপোর্টের তারিখ ২১ জানুয়ারী। টীকা না হওয়ায় এই বিপদ ঘটিয়াছে। আজিও কত স্থানে কত লোক টীকা না লইয়া মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, কে তাহার খবর রাখে? আমাদের দেশের লোকের আজিও এ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ এখানে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার ও রেলওয়ে ডাক্তার বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণ দাসাশ্রমের রোগীদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। এইজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

ব্যয়।

সংসার খরচ ৪৩॥৶১৫, কর্ম্মচারীর বেতন ৪৬৸/১০, বাড়ীভাড়া ১৮৲, ধোপা ১।৵০, গোয়ালা ॥৵০, বাজে খরচ ৶৫, গত মাসের কর্জ্জ শোধ ৪৲=মোট খরচ ১১৪৸/১০।

হস্তেস্থিত ১॥৵১০

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত দানগুলি বিগতমাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান পরদুঃখকাতর দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অর্থ। রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর জানুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ মাসের চাঁদা ।০, বাবু নন্দলাল দত্ত ঐ মাসের চাঁদা ১৲, বাবু ভূপেন্দ্র নাথ বসু ১৲, জনৈক ভদ্রলোক ২৲, একজন পরিচিত বন্ধু ১৲, বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৶০, বাবু উমাপদ রায় ১/০, বাবু অক্ষয়কুমার চট্টো ১৲, বাবু ঈশ্বর চন্দ্র সেন ফরিদপুর ॥০, A friend Steamer এ ১৲, A friend of Kustea ।০, A friend মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫০৲, বাবু বিহারী লাল চট্টো ১৲, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥০, ৪৫।৪ বেনেটোলা লেন ॥০, বাবু বরদা প্রসাদ চালিহা ।০, ৬৩।১ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট ।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু ॥০, ৪১ নং কলুটোলা ॥০, বাবু ভূতনাথ ঘোষ ৪॥০, বাবু বিষ্ণুপদ ঘোষাল পিতার সম্মানার্থ ১৲, ৭ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ॥০, ৪।২ ছকু খানসামার লেন ।০, The Executor of Late Ambika Deb ৫৲, ২৭নং শিবনারায়ণ দাসের লেন ।০, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ১৲, পণ্ডিত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৲, বাবু হারান চন্দ্র চট্টো ১৲, বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ২৲, I. C. Bose Esq. হাওড়া ১৲, বাবু যদুনাথ সিংহ ঐ ১৲, Mrs. A. C. Dutt জব্বলপুর সন্তানের রোগ নিবারণে ৫৲ ৮।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন ॥০, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দাসের মাধুকরী ভিক্ষা /০, শ্রীঝুনালাল বাবু /০, ছকু খানসামার লেনের একটী ছাত্রনিবাস হইতে ৵০, বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু সুরেন্দ্র নাথ সরকার বীডনষ্ট্রীট ৫৲, Dr. Rash Behari Ghosh ১॥০, A. Sen Esq. বীডনষ্ট্রীট ।০, একটী ভদ্রলোক ৫৲, শ্রীমতী ক্ষেত্রমোহিনী দাসী জানুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, রামনারায়ণ সাধু খাঁ ১৲, Mr. N. K. Bose ফেব্রুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, বাবু মহেন্দ্র নাথ বসু ১৲, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু ১৲, J. C. Bose Esq. ১৲, বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো ১৲, বাবু ইন্দুকুমার দেব ।০, বাবু নবীন চাঁদ বড়াল জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের চাঁদা ২৲, ৪।২ ছকু খানসামার লেন ॥০, বাবু তেজচন্দ্র বসু ॥০, বাবু হৃষীকেশ মজুমদার মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫৲, ১৩২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বিবাহ উপলক্ষে ৫৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের ফেব্রুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্তের ঐ মাসের চাঁদা ।০, বাবু হরিমোহন হাজরা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ॥০, একটী ছাত্র ৵০, একটী ভদ্র মহিলা বৌবাজার ফেব্রুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, ৪০/১ কলুটোলা ॥০, বাবু শশীভূষণ শর্ম্মা /০, A friend ।০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন ৵০, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ।০, বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ৵০, বাবু সতীশচন্দ্র সাহা ৵০, Dr. J. N. Mitra এর বাড়ী হইতে প্রাপ্ত /০, বাবু সত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৶১০।

অন্যান্য প্রকারের আয়।

দানাধারে প্রাপ্ত /১০, দাসী হইতে ধার ২৩।১০, চাউল বিক্রয় ৩৸/১০, পুস্তক বিক্রয় ৶,

মোট আয়।

দান প্রাপ্তি ১২৫৸১০, অন্যান্য প্রকারের আয় ২৭।৵১০, বিগত মাসের জের ৸/১৫ উদ্বৃত্ত জমা ৶৫।

বস্ত্র। ভাগলপুরের একটী ভদ্রমহিলা ঃ—নববস্ত্র ১, বাবু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ঃ—গদি ১, লেপ ৩, বালিস ৩, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু ১ম বারে ঃ—ধুতি ১৩ খানা, আলোয়ান ১, জ্যাকেট ৩, পেটিকোট ১, ২য় বারে ঃ—রেপার ১, সাদাজ্যাকেট ৯, গরম জ্যাকেট ৩, কোট ১, জাঙ্গিয়া ১, ফ্রক ১, ধুতি ৩, সার্ট ২, কোট ২।

J. C. Bose Esq :—কোট ২, Trousers ২।

চাউল।

নিম্নলিখিত মহোদয় ও মহোদয়াগণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াছেন:— ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং, বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু কালীনারায়ণ রায়, বাবু রামতনু লাহিড়ী, বাবু যদুনাথ ঘোষ, বাবু ফকীর চাঁদ সাধু খাঁ, ৭নং ছুতার পাড়া লেনের ছাত্র নিবাস, বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, বাবু পরেশনাথ সেন, শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু, বাবু রামকুমার দাস, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু নকুড়চন্দ্র ঘোষ, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টো, বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১।১ শঙ্কর ঘোষের লেনের ছাত্রনিবাস, বাবু গোবিন্দনাথ গুহ, Dr. P. C. Roy, বাবু শ্রীনাথ দত্ত, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু রাধানাথ দেব, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীযুক্তা সৌরভিনী ঘোষ, বাবু বিপিন বিহারী রায়, Dr. J. N. Mitra, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, বাবু উমাপদ রায়, বাবু রামানন্দ চট্টো, ছাত্রনিবাস:— ৪৫/৪ বেনেটোলা, ৪৫/৫ বেনেটোলা, বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বাবু ললিতকুমার বন্দ্যো, বাবু অনুকূলচন্দ্র রাহা, বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, ছাত্রনিবাস ঃ—১০ শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট, ৫৫ পঞ্চানন তলা লেন, ১৬ পঞ্চানন তলা লেন, ১৭ মধুসূদন গুপ্তের লেন, বাবু শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা, ডাঃ নীলরতন সরকার, বাবু হীরালাল মজুমদার, ছাত্র নিবাস ঃ—৪১/১ ছকু খানসামার লেন, ৪/১ ঐ ঐ, ৪নং ঐ ঐ, ৪১/১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, ২০/২ ঐ ঐ ১২৬নং ওল্ড বৈঠক খানা. ৫০ নং ঐ ঐ, ২৫/১/১ পটল ডাঙ্গা, ৭নং পটল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

ব্যয়।

গিরিডি দাসাশ্রম ৯৭॥০, আদায়কারীর খরচ ৭৵১৫, ঋণ শোধ ৩২৸১০, দুধের জন্য পূর্ব্বের ঋণ শোধ ৯॥০, তালাচাবি ১৶০, রোগীর গাড়ী ।/০, টিনের বাক্স ৸/০, ডাক খরচ ৶১৫, পাল্লা বাট্‌খারা ॥১৫, জালা ।০, হাঁড়ী ৶১০, গিরিডির জন্য জিনিস ক্রয় ১৶১০, ঝুড়ী ।১৫, মুটে ৵৫, নিব /০, পেন্সিল ৶১০, বিবিধ ৵৫।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৫৪৲, মোট ব্যয় ১৫১৸৶৫১, হস্তেস্থিত ২৲১৫।

২২শে জানুয়ারী হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই হিসাব দেওয়া গেল।

"দাসী"র মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত।

সাবেক।

রাধিকাপ্রসাদ সান্ন্যাল ১৲, নেপালচন্দ্র রায় ১৲, বেণীমাধব পোদ্দার ১৲, মোহিনীমোহন রায় ১৲, রজনীকান্ত ঘোষ ১॥০, সরলাবালা সেন ১৲, অমৃতলাল সেন ১৲, যতীন্দ্রনাথ বসু ॥০, বিপিনবিহারী দাস ১৲, বিহারীলাল বন্দ্যো ১৲, অন্নদাপ্রসাদ নাথ ॥০, ক্ষীরোদচন্দ্র বসু ২৲, L. V. Mitter ১৲।

৪র্থ বর্ষ।

৩৫০ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ১॥০, ১০২০ মঙ্গল সিংহ ২৲, ১০২১ যদুনাথ সেন ২৲, ১০২২ বিপিন-বিহারী সরকার ২৲, ১০২৩ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৲, ১০২৪ অন্নদাপ্রসাদ মল্লিক ১৲, ১০২৫ সুখদা দাসী ২৲, ৭৯৪ অক্ষয়কুমার দত্ত ২৲, ১০২৭ চণ্ডীচরণ সেন ১৲, ১০২৮ হেমচন্দ্র ঘোষ ২৲, ১০২৯ হরিনারায়ণ রায় ১৲, ১০৩০ মনুজেন্দ্র দত্ত ২৲, ১০৩১ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার ২৲, ৩২৬ Mrs. Jnanendra Mohan Ghosh ২৲, ১০৩৮ মহেন্দ্রলাল সরকার ২৲, ১০৩৯ বঙ্কুবিহারী বসু ১৲, ১০৪০ হীরালাল দাস ২৲, ৭১১ ইমাজুদ্দিন সেক ১॥০ ১০৪২ ডাঃ নন্দলাল ঘোষ ১৲, ১০৪৩ মতিলাল ভড় ২৲, ১০৪৪ বটকৃষ্ণ পাল ২৲, ১০৪৫ নরসিংহ বসু ২৲, ১০৪৬ Miss. R. Sabira ১৲, ২৩২ রায় যদুনাথ মুখার্জি বাহাদুর ২৲, ৪০২ রাখালদাস ঘোষ ২৲, ৩ সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী ১॥০, ৩৫৩ রামতনু লাহিড়ী ২৲, ১০৪৮ বরদাপ্রসাদ ঘোষ ২৲, ১০৪৯ গয়াপ্রসাদ ঘোষ ২৲, ১০৫০ কালীপ্রসন্ন ঘোষ ২৲, ১০৫১ মধুসূদন সেন ১৲, ১০৫২ অমূল্যচরণ বসু ২৲, ১০৫৩ বসন্তকুমার লাহিড়ী ২৲, ১০৫৪ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ২৲, ১০৫৫ প্যারীমোহন ঘোষ ২৲, ১০৫৬ সুরবালা ঘোষ ২৲, ১০৫৭ শৈলবালা মজুমদার ২৲, ১০৫৮ বৈকুণ্ঠনাথ দাস গুপ্ত ১৲, ১০৫৯ বেণুধর রাজ খোওয়া ১৲, ১০৬০ প্রেমতোষ বসু ২৲, ১০৬১ শ্রীগোপাল মল্লিক ২৲, ১০৬২ রজনীকান্ত ঘোষ ২৲, ৯৪৬ প্রসন্নকুমার বানার্জি ১৲, ১০৬৬ সরলাবালা সেন ২৲, ১০৬৩ নলিনীমালা সেন ১৲, ১০৬৪ সুরেন্দ্রনাথ দাস ২৲, ১০৬৫ গঙ্গাধর বন্দ্যো ২৲, ১০৬৮ ভুবন-মোহন দত্ত ২৲, ১০৬৯ গোপালচন্দ্র বসু ২৲, ১০৭০ হরিচরণ মল্লিক ২৲, ১০৭১ কালীনাথ মিত্র ২৲, ১০৭২ পূর্ণচন্দ্র দত্ত ২৲, ১০৭৩ বরদাপ্রসাদ চালিহা ২৲, ১০৭৪ নন্দগোপাল নিয়োগী ২৲, ১০৭৫ নিখিলনাথ রায় ২৲, ২৩৫ গিরিবালা দেবী ২৲, ১০৭৩ Mrs. N. K. Bose ২৲, ৪৫ সৌদামিনী সেন ১॥০, ১০৭৮ ক্ষুদীরাম বসু ১৲, ১০৭৯ Dr. R. G. Kar ২৲, ১০৮০ নৃপেন্দ্র-নাথ বসু ২৲, ১০৮১ হরলাল সাহা ২৲, ১০৮২ অমরচন্দ্র মুখো ২৲, ১০৮৩ নবীনচন্দ্র বসু ২৲, ১০৮৪ Dr. P. N. Gupta ২৲, ৯১৭ গিরিবালা দাসী ১৲, ১০৮৫ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৲ ১০৮৬ সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ১৲, ২৩৬ বিহারীলাল ঘোষ ২৲, ২০১ অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ ২৲, ২২৩ গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী ২৲, ২২৭ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ২৲, ২২৪ চারুচন্দ্র গুপ্ত ২৲, ২২৯ ডাঃ

"দাসী"র মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

অন্নদাপ্রসাদ দে ২৲, ৩১৬ বসন্তকুমার ঘোষ ২৲, ১০৮৭ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৲, ১০৮৮ পূর্ণচন্দ্র চট্টো ২৲, ১০৮৯ কৈলাসচন্দ্র বসু ২৲, ১০৯০ তীর্থনাথ সাহা ২৲, ৩১৮ কালিদাস পালিত ২৲, ১০৯১ Mrs. G. C. Roy ২৲, ১০৯২ শশীভূষণ রায় ২৲, ১০৯৩ মথুরানাথ রায় ২৲, ১০৯৪ প্রিয়নাথ মুখো ২৲, ১০৯৫ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৲, ১০৯৬ অমৃতলাল বসু ২৲. ২৩০ বিশ্বেশ্বর মুখো ২৲, ১০৯৭ বান্ধব লাইব্রেরী ২৲. ৯১৫ প্রমীলা রায় ১৲, ৪৮ ইন্দুবালা ঘোষাল ১॥০, ১০৯৮ কুমার সূর্য্যকুমার দেব ১৲, ৯৫৪ শরৎচন্দ্র চট্টো ১৲, ১০৯৯ সুবলচন্দ্র চন্দ ২৲, ১১০০ চণ্ডীচরণ দত্ত ২৲, ১১০১ নারায়ণচন্দ্র সরকার ১৲, ২০৩ ভবানীচরণ মিত্র ২৲, ২০৪ জয়নারায়ণ সরকার ২৲, ১১০২ শরচ্চন্দ্র মজুমদার ২৲, ১১০৩ হেমচন্দ্র মিত্র ১৲, ১১০৪ ভবনাথ বন্দ্যো ২৲, ১১০৫ বিনয়ভূষণ সেন ১৲, ২১১ বিহারীকৃষ্ণ দেব ২৲, ১১০৮ শরচ্চন্দ্র দত্ত ২৲, ৩৪৪ দুর্গাদাস বসু ১॥০, ১১১০ বামাচরণ গুপ্ত ১৲, ১১১১ R. C. Gupta ২৲, ১১১২ বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যো ২৲, ১১১৩ R. N. Mukerjee ২৲, ১১১৪ N. N. Mitter ২৲, ১২৩ বঙ্গ সাহিত্যোৎসাহিনী সভা ১৲, ১১১৬ লালবিহারী মিত্র ২৲, ১১১৭ গোপাললাল মিত্র ২৲, ১১১৮ পৃথ্বীচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৲, ৩২০ কৈলাসচন্দ্র সেন ২৲, ১১২০ সতীশচন্দ্র মজুমদার ২৲, ১১২১ অশ্বিনীকুমার হোড় ২৲, ১১২২ মুন্সী তমিজুদ্দিন আহাম্মদ ২৲. ১১২৩ রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ২৲, ১১২৪ মৌলবী বজলল ২৲, ১১১৯ পরেশনাথ আচার্য্য ২৲, ১১২৫ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ২৲, ১১২৬ শশীভূষণ সুর ২৲, ১১২৭ মন্মথনাথ বসু ২৲, ১০৬৭ মন্মথনাথ মুখো ২৲, ৮২৩ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ১॥০।

ক্রমশঃ

দাসী

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে।

আমাদের বাড়ীর নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূলপ্লাবন করিয়া জলস্রোতঃ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটী গতিপরিবর্ত্তনশীল চৈতন্যময় জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছাড়িয়া পড়িয়া, কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত, এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখন মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহাতো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্তস্রোতঃ কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ"?—নদী উত্তর করিত, "মহাদেবের জটা হইতে"। তখন ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর, বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি, তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব্ব-কথা শুনিতাম—"মহাদেবের জটা হইতে!"

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্মপরিচিত, বাৎসল্যের বাস মন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে তো আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই

কি জীবনের পরিসমাপ্তি ? যে যায়, সে কোথা যায় ? আমার প্রিয়জন আজ কোথায় ?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে"।

চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদি ?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

এক দিন আমি বলিলাম, "নদি, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি ! বাল্যকাল হইতে এপর্য্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তি-স্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, বহুগ্রাম জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্ম্মাচল নামক পুরাণ-প্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূনদীর উৎপত্তি স্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুগিরিগহন লঙ্ঘন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী ; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজত-সূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই বহুদেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কূল-প্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখ ! জয় নন্দাদেবী ! জয় ত্রিশূল !"*

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পর্ব্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্ত্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটী গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহুজীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্ত্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহারই অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া, মেদিনী বিদারণ পূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে, সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তের আয়ুধ, সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে ; উহা অতীব দুর্গম ; দুই দিন চলিলে পর তুষার-নদী দেখিতে পাইবে।"

সেই দুই দিন বহুবন ও গিরি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এপর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে; যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ !" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিক খনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ; বহুদূরপ্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

শিখর-তুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্‌ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবল গিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময় পর্ব্বত দেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তর স্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তর স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্দ্ধে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের * সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষ সকল স্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক্‌ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষার-পর্ব্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্‌ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষার কণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানস-চক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায়

* তুষার ক্ষেত্র জাত এক প্রকার সুগন্ধ গুল্ম বিশেষ।

উৎসে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমানুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্ব্বত ভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোন পথ ছিল না, পতিত পর্ব্বত খণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল,—উপত্যকা রচিত হইল। পর্ব্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তর খণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্ত্তনপূর্ব্বক বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমি প্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি বর্দ্ধিত হইল। কঠিন পর্ব্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ নির্ম্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে ধরণী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্য চক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্ব্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া

আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গাররূপে প্রকাশ পাইতেছে ; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে ; উন্নত ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নমিত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্ম্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্য্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্ব্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল মধ্যে আশ্রয় লইবে ; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্ব্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পাতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই !

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাঁহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

'নদি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ', ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

"মহাদেবের জটা হইতে।"

ইংলণ্ডীয় সভ্যতা।

ইংলণ্ড সভ্য দেশ, ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কি কি উপকরণে ইংলণ্ডের সভ্যতা গঠিত, তাহা কি আমরা চিন্তা করিয়া থাকি ? এই বিষয়টী আমাদের চিন্তা করা উচিত ; কেননা, আমরা সর্ব্বদাই ইংলণ্ডের সভ্যতার অনুকরণে ব্যস্ত, সভ্যতা ভ্রমে যদি অসভ্যতার অনুকরণ করিয়া ফেলি, তবে বড়ই বিপদের সম্ভাবনা। এই প্রবন্ধে ইংলণ্ডের সভ্যতার কয়েকটী উপকরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম। ইংরেজজাতি অত্যন্ত বিনীত ও শিষ্টাচারী ; এইটী তাহাদের সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ। আমরা যে সকল ইংরাজ এদেশে দেখিতে পাই, তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ইহা ধারণা করা কঠিন ; কিন্তু যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন তাঁহারা ইংরেজ জাতির শিষ্টাচার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। শৈশবকাল হইতেই বাপ মায়ের নিকট হইতে ইংরাজেরা শিষ্টাচারের নিয়ম সকল শিক্ষা করিয়া থাকে। বিলাতে একটী বালকের মধ্যে যে প্রকার

শিষ্টভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশের অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকের মধ্যেও তাহা নাই। কি প্রকারে একজন ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে হয়, কি বলিয়া একজনকে অভ্যর্থনা করিতে হয়, এই সকল ইংরেজ বালক বালিকারা অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করে। কথাবার্ত্তার মধ্যে বিনীতভাব, কাহারও কথার কর্কশভাবে প্রতিবাদ না করা, প্রতিবাদ করিতে হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করা, এই সকল ইংরেজ জাতির চরিত্রগত সদ্‌গুণ। এমন কি ইংলণ্ডে চাকর চাকরাণীকে পর্য্যন্ত কোন প্রকারে অবজ্ঞা করা নিন্দনীয়। তাহাদিগের নিকটেও বিনীতভাবে কথা কহিতে হয়। কোন একটী আদেশ প্রতিপালন করিলে ধন্যবাদ দিতে হয়, এটী বড়ই সুন্দর ভাব। আমরা চাকর চাকরাণীকে কতই মনঃপীড়া দেই, তাহারা গরিব বলিয়া অন্নের দায়ে আমাদের অধীনে কাজ করিতে আসে ; আর তাহারা যে মানুষ, আমাদের মত তাহাদেরও সুখ দুঃখ বোধ আছে, ইহা আমাদের যেন জ্ঞানই থাকে না। ভারতবর্ষীয় ইংরাজদেরত কথাই নাই, তাঁহারা চাকরদিগকে নৃশংস ভাবে কতই না পাদুকা প্রহার ও বেত্রাঘাত করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে আর একটী ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, সেখানে বৃদ্ধ ও যুবকের সম্বন্ধ আমাদের দেশ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। আমরা মনে করি বৃদ্ধের নিকটে মন খুলিয়া গল্প করা কি আমোদ করা বেয়াদবী ; কিন্তু বিলাতে তাহা দেখা যায় না ; বৃদ্ধ ও যুবকের মধ্যে বেশ সখ্যভাব। যুবকই যে কেবল বৃদ্ধের নিকট বিনীত আর বৃদ্ধ যুবকদের নিকটে উদ্ধত হইবেন, ইহা সেখানে দেখা যায় না। বিলাতে শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর ব্যবহার চিন্তা করিলে এই ভাবটী আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। শিক্ষক সর্ব্বদাই রুদ্রমূর্ত্তি আর ছাত্র ভয়ে বিকম্পিত, এটী বিলাতে খুবই কম। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ সখ্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষক যেমন ক্লাসের বাহিরে আসিলেন, অমনই ছাত্র ও শিক্ষক পরস্পরের বন্ধু, উভয়ে সমভাবে কথা কহিবার অধিকারী। ছাত্রদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়দিগের শিষ্ট ও বিনীতভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। একজন শিক্ষকের বাড়ীতে যদি যাওয়া যায়, তবে তিনি অন্য দশজন ভদ্রলোককে যে প্রকার সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন, ছাত্রকেও ঠিক্ সেইরূপ করিয়া থাকেন, এমন কি বসিবার জন্য ভাল আসন খানা ছাড়িয়া দেন্। আমি সর্ব্বপ্রথমে যেদিন প্রফেসার কল্‌ডারউডের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে দেখা করিতে গেলাম, তিনি যে প্রকারে আমাকে অভ্যর্থনা

করিলেন, আমি দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। একখানা ভাল আসনে বসাইয়া অত্যন্ত বিনয় ও সদ্ভাবের সহিত আলাপ ত করিলেনই; তারপর আমি যখন উঠিয়া আসি তিনি সঙ্গে সঙ্গে সদর দুয়ার পর্য্যন্ত আসিলেন এবং আমার বড় কোট্‌টা গায়ে পরাইয়া দিলেন। তিনি যে আমাকে নূতন লোক পাইয়া এইরূপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; আমি তারপর যতদিন তাঁহার বাড়ী গিয়াছি, প্রতিদিনই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। যাঁহারা শিক্ষিত লোক, কেবল তাঁহাদের মধ্যেই এই বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে;—ইতর ও সাধারণ লোকের মধ্যেও ইহা বেশ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ লোকেরা রাজপথে দাঁড়াইয়া অসভ্য ভাষায় পরস্পরের সহিত গালাগালি করিতেছে, ইহা বিলাতে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। মদ খাইয়া যখন মাতাল হয়, তখনই ঐরূপ করে। অনেকে মনে করেন যে ইংরাজের যে শিষ্টাচার, এটা কেবল বাহ্যিক এবং অনেক পরিমাণে কপটাচার। আমি এই মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে প্রস্তুত নই। শিষ্টাচার যাহাদের মজ্জাগত হইয়াছে, তাহাদের নিকটে উহা আর বাহ্যিক কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় অনেকে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে কপটাচার অথবা Artificial বলিয়া নিন্দা করা অন্যায়। আমরা যখন বিলাতে যাই এবং যাইয়া যখন ইংরাজী সভ্যতা নকল করিতে থাকি, তখন তাহা কপটতা ও Artificial; কেন না আমরা ত আর শৈশবকাল হইতে ঐভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসি নাই। আমরা অনেক সময়েই আমাদের নিজের মনের অবস্থা দ্বারা বিচার করি বলিয়াই ঐরূপ নিন্দা করিয়া থাকি। ইংলণ্ডে একজন লোককে ভদ্র হইতে হইলে, M. A., B. A. পাশ ও কতকগুলি অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত আরও কিছু করিতে হয়। তাহাদের শিষ্টাচারী হওয়া দরকার। আমরা ত অনেকেই M. A., B. A. পাশ করিয়া থাকি কিন্তু কয়জন শিষ্টাচার শিক্ষা করি? একজন লোকের সঙ্গে ভাল ভাবে কিরূপে কথা কহিতে হয়, তাহা আমরা অনেকে জানি না। এই শিক্ষা স্কুল কলেজে হওয়া অসম্ভব। ইহা গৃহের শিক্ষা, বাপ্ মায়ের কাছে এ শিক্ষা পাইতে হয়। আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াও যে সভ্য হইতে পারি নাই, তাহা ধরা পড়ে। যখন আমরা একজন ইংরাজের সংসর্গে যাই, তখনই বুঝিতে পারি, আমাদের কত অভাব রহিয়াছে।

দ্বিতীয়। আমরা যদি এই শিষ্টাচারের গূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করি, তবে বলিতে হইবে, ইংরাজের স্বভাবজাত স্বাধীনতাপ্রিয়তাই ইহার মূল কারণ। স্বাধীনতা কাহাকে বলে? নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান। সেই সম্মানই অন্যের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে শিক্ষা দেয়। আমি যে একটা মানুষ এবং আমার জীবনের যে একটা মূল্য আছে, এই বোধ যদি না থাকে, তবে অন্যকে প্রকৃত ভাবে সম্মান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক ইংরাজই অল্পাধিক পরিমাণে আপনার জীবনের মূল্য বুঝেন এবং তদ্দ্বারাই আপনার প্রতিবাসীকেও সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন। ইংরাজ জাতি যে স্বাধীনতাপ্রিয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। স্বাধীনতা ইংরাজসমাজে সভ্যতার আরেকটী উপকরণ। বাঙ্গালীরা বিলাতে যাইয়া যে এত সুখ অনুভব করেন, তাহার প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে তাঁহারা সেখানে স্বাধীনতার বায়ু সেবন করিয়া বিমলানন্দ অনুভব করেন। সেখানে বাঙ্গালী ও ইংরাজে পার্থক্য নাই। আমি ও আমার ইংরাজ বন্ধু দুই সমান; আমাকে কোন ইংরাজের হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয় না। আমার সঙ্গে সকলেই ভদ্র ও শিষ্টভাবে কথা কহেন, আমিও তখন আমার জীবনের মূল্য কতক পরিমাণে অনুভব করি। ভারতবাসীদের বিলাতে যাওয়া যে কর্ত্তব্য, তাহার প্রধান কারণ এই যে সেখানে তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা করিতে পারেন। দেখিয়া অবাক্ হইতে হয় যে ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মানের ভাব ইংলণ্ডে এতই প্রবল যে, তদ্ধেতু জাতিগত বিদ্বেষ ও অসদ্ভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। কোন অসভ্য বিদেশীয় লোক ইংলণ্ডে যাইয়া যেন ইংরাজ জাতির সঙ্গে এক হইয়া পড়ে। দেখিয়াছি যে আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে কাফ্রিগণও ইংলণ্ডে যাইয়া ইংরাজের সঙ্গে এক হইয়া যায়। ইংরাজ রমণীগণ তাহাদিগকে আপনাদের গৃহে স্থানদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন্ না। এই উদার ভাব এতই প্রবল যে অনেক ইংরাজ মহিলা কৃষ্ণকায় কাফ্রীদের পাণিগ্রহণেও কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন না। আমাদের দেশে জাতিভেদরূপ ভয়ানক অনুদারতা যে বিদ্যমান, তাহার কারণ এই যে জাতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের মনুষ্যত্বকে আমরা সম্মান করিতে পারি না।

তৃতীয়। ইংলণ্ডের সভ্যতার তৃতীয় উপকরণ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও তাহাদের শিক্ষা। যে জাতিতে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান নাই এবং তাহাদিগকে

যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না, সে জাতিকে ইংরাজেরা সভ্য বলিতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে ইংরাজেরা ভারতবাসীদিগকে সাধারণতঃ এত ঘৃণার চক্ষে কেন দেখেন? তাহার উত্তর এই যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজের যে এই ভাব, তাহা ইংলণ্ডে না গেলে সম্যক্‌রূপ অনুভব করা যায় না। ইংলণ্ডবাসীরা ভারতবাসীদের সম্বন্ধে যদি কিছু জানে, তাহা স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা। সেখানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মনেই এই সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ। সেখানে যদি কোন অশিক্ষিত কৃষককেও জিজ্ঞাসা করা যায়,—"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি জান?" সে নিশ্চয়ই বলিবে, "ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে স্ত্রীলোকের প্রতি মহা উৎপীড়ন হইয়া থাকে।" দিবাবসানে কোন গৃহস্থ ইংরাজ দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং আপনার স্ত্রী পুত্র লইয়া অগ্নিকুণ্ডের সমক্ষে বসিয়া নানারূপ উপাখ্যান দ্বারা শ্রম নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি কোন এক ভারতবাসী লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন, তবে হয় ত শুনিবেন, কোন ভারতবর্ষীয়া দুঃখিনী বিধবার দুঃখ কাহিনী বর্ণিত হইতেছে—কি প্রকারে সে অনাথা হইয়া আত্মীয়গণের অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া থাকে, অথবা কি প্রকার স্বামীর মৃত দেহের সহিত আপনার জীবন্তদেহ ভস্মসাৎ করে। ইংলণ্ডে অনেকে মনে করেন যে এখনও ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে যে স্ত্রীজাতির প্রতি বহুল সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ের অধিক বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। আমাদের দেশে এমন শুভদিন কবে আসিবে, যে আমরা স্ত্রী জাতির যথার্থ সম্মান রক্ষা করিতে শিক্ষা করিব! কবে তাহাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত করিয়া আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করিব! ঈশ্বর করুন আমাদের দেশে ত্বরায় সেই শুভদিন আগমন করুক; এবং আমরা জগতের সমক্ষে সুসভ্যজাতি বলিয়া পরিচিত হই।

শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

তুকারাম।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

তুকারাম যেরূপে একজন প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত সাধুপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন, পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার অকৃত্রিম সরলতা, ভগবন্নিষ্ঠা, জীবানুকম্পা প্রভৃতি গুণে এবং তাঁহার প্রদত্ত মধুর ধর্ম্মোপদেশের জন্য তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় অনেক ব্যক্তিও তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশ শ্রবণে অনেকেই সংসারের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে গঙ্গাধর পন্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ও সন্তাজী নামক একজন তৈলিক, এই দুই জনই প্রধান। তুকারামের সংকীর্ত্তন ও কথকতার সময় ইহাঁরা করতাল ও বীণা হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া ধ্রুবা (ধূয়া) ধরিতেন। গঙ্গাধর পন্তের উপর তুকারামের কবিতাদি লিখিবার ভার ছিল। কিন্তু সাধারণের নিকট এইরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে তৎকালের ভাক্ত সাধুগণের নিকট তুকারামের প্রশংসা অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধনে তাঁহাদিগের নিজের প্রতিপত্তি হ্রাস হইবার আশঙ্কায়, তাঁহারা তুকারামের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "মম্বাজী বাবা গোঁসাই" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম তুকারামের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তিনি দেহু গ্রামে এক মঠ সংস্থাপন করিয়া, সেখানকার "মোহান্ত" হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে "মম্বাজী বাবা মহাপুরুষ" বলিত। কিন্তু ক্রমশঃ সাধারণ লোক তাঁহার অপেক্ষা তুকারামের প্রতি সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করায়, তুকারাম মম্বাজীর বিষনয়নে পতিত হইলেন। মম্বাজী তাঁহাকে অপমানিত করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। পরিবার প্রতিপালনের ভার স্ত্রীর স্কন্ধে অর্পণ করিয়া তুকারাম বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে, অবলাইয়ের পিতা "আপ্পাজী" কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে আপ্পাজী তুকারামকে একটি মহিষ প্রদান করিয়াছিলেন। বিঠোবার মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে মম্বাজীর একটি উদ্যান ছিল। দৈবক্রমে একদিন

তুকারামের মহিষ সেই উদ্যানের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক কতিপয় পুষ্পবৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিল। তদ্দর্শনে মম্বাজী ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে তুকারামের উদ্দেশে অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ করিলেন। কিন্তু তুকারামকে নিকটে না পাইয়া সেদিন আর অধিক কিছু করিবার সুবিধা পাইলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে আর এক ঘটনায় তুকারাম মম্বাজীর কোপে পতিত হইলেন। একদা সায়ংকালে একাদশী উপলক্ষে দেহুতে বিঠোবার দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। মম্বাজী স্বীয় উদ্যানটিকে কণ্টক দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টনে দেব-দর্শনার্থি-গণের প্রদক্ষিণ স্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, অন্ধকারে নবাগত দর্শনার্থিগণের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তুকারাম স্বহস্তে সেগুলি উৎপাটিত করতঃ স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মম্বাজী পূর্ব্বাবধিই অবসর খুঁজিতেছিলেন। এক্ষণে তুকারামকে তাঁহার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টন উৎপাটন ও ভগ্ন করিতে দেখিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইলেন। তিনি কটু ভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে তুকারামের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারই উৎপাটিত কণ্টক যষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। একটির পর আর একটি করিয়া ১০।১৫টি কণ্টক-যষ্টি তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মম্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। তুকারাম অকাতরে ও নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিলেন। মম্বাজীর প্রহারকালে তিনি মনে মনে কেবল নাম জপ করিতেছিলেন। গোঁসাইজী প্রহার কার্য্য সমাধা করিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলে তুকারাম মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক বিঠোবার নিকট সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিলেন। তুকারামের এইরূপ দুর্গতি দর্শনে সকলেরই নেত্র অশ্রুপূরিত হইল। তুকারামের জীবনের অনেক ঘটনা, তিনি তাঁহার অভঙ্গগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত, তাঁহার পারিবারিক অবস্থা, তাঁহার নির্ভরশীলতা প্রভৃতি অনেক বিষয় তাঁহার অভঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়। এই ঘটনারও উল্লেখ করিয়া তুকারাম ছয়টি অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটির মর্ম্ম মহীপতি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ;—"হে ভগবন্! বুঝিয়াছি, দুর্জ্জনের সান্নিধ্যে কিরূপে সাধুগণের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইয়া অশান্তি উৎপত্তি হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই তুমি আমাকে এই শিক্ষা প্রদান করিলে। এইবার হইতে দুর্জ্জনের সহবাস হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিবার চেষ্টা

করিব।" এই ঘটনায় রচিত অভঙ্গগুলির মধ্যে তিনটির অনুবাদ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "বোম্বাই চিত্র" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার দুইটি আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।*

প্রথম।

ছাড়িব না ছাড়িব না,
ছাড়িব না হে বিঠোবা তোমারি চরণ।
যতই যন্ত্রণা আসে,
আসুক কি করিবে সে,
না হয় হইবে মরণ ॥
শস্ত্রধারী আসি কেহ,
খণ্ড করে যদি দেহ,
তবু নাহি ডরি।
তুকা বলে "সাবধান,
হোয়ে আছি আগুয়ান,
চিত্তে মোর শম গুণ ধরি ॥"

দ্বিতীয়।

বেশ বেশ বড় ভাল, বিঠোবা হে ক'ল্লে ভাল,
শাপে বর দান।
ক্ষমাগুণ শেখাবারে, হানিলে এ দেহোপরে
কণ্টকের বাণ ॥
কটু কাটব্য গালি, মোর পৃষ্ঠে দিলা ঢালি,
তাহে পাই প্রাণ—
তুকা বলে "কৃপা করি, সংহারিয়া ক্রোধ অরি,
দিলে পরিত্রাণ ॥"

তুকারাম যে কিরূপ অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন, এই সকল অভঙ্গে প্রকাশিত তাঁহার হৃদয়ের ভাব হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। কঠোর নিগ্রহ ও সংযম দ্বারা তিনি যে তাঁহার শরীরকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এত দিন পরে শত্রুকৃত নির্য্যাতন অম্লানমুখে সহ্য করাতে যেন তাহার সার্থকতা হইল। যাহা হউক প্রহার প্রাপ্ত হইয়া, তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, অবলাই তাঁহার অঙ্গবেদনা লাঘবের জন্য তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং তুকারাম কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন। অবলাই স্বামীর সংকীর্ত্তনের ও একাদশী-নিমিত্ত হরিজাগরণের আয়োজন

---

* সত্যেন্দ্র বাবুর কৃত তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদগুলি এমনই সুন্দর যে তাহার নূতন অনুবাদ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রবন্ধে সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদই কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিব। যে সকল অভঙ্গের সত্যেন্দ্র বাবু অনুবাদ করেন নাই, তাহারই নূতন অনুবাদ করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

করিয়া দিলেন। তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য সকলেই যথারীতি আগমন করিলেন। মম্বাজী বাবা তুকারামের প্রতি মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্ট থাকিলেও, লোক লজ্জার জন্য যথা নিয়মে তাঁহার সংকীর্ত্তনে আগমন করিতেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বশত সে দিন তিনি তুকারামের সংকীর্ত্তনে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তুকারাম তাঁহার জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। উত্তরে মম্বাজী বলিয়া পাঠাইলেন যে, "অদ্য আমার শরীর অসুস্থ; সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করিতেছে; সংকীর্ত্তনে যাইতে পারিব না।" ইহা শুনিয়া তুকারাম স্বয়ং তাঁহার মঠে গমন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "স্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্টি প্রহার করাতে প্রভুর শ্রান্তি জন্মিয়াছে। আমি যদি আপনার উদ্যানের কন্টকবেষ্টন উৎপাটন না করিতাম, তাহা হইলে আপনার রোষোৎপত্তি হইত না। সুতরাং আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। প্রভু, নিজ গুণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপা পুরঃসর সংকীর্ত্তন স্থলে আগমন করুন।" এই বলিয়া মম্বাজীর বেদনা উপশমের জন্য তুকারাম স্ব-হস্তে তাঁহার অঙ্গমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের এইরূপ ব্যবহারে মম্বাজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া সংকীর্ত্তন স্থলে উপনীত হইলেন। তুকারাম মম্বাজীকে লইয়া সমস্ত নিশা সংকীর্ত্তনে যাপন করিলেন। এইরূপে তুকারাম সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিলেন। সেই দিবস হইতে মম্বাজী বাবা তুকারামের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। (১)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
বৈদ্যনাথ দেওঘর।

---

(১) মহীপতি বলেন যে দিন এই সকল ঘটনা ঘটে, সেই দিন রাত্রে কয়েক জন তস্কর তুকারামের মহিষটি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ভক্তবৎসল বিঠোবা ভয়ঙ্কর কালপুরুষ বেশে প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করায় তাহারা মহিষ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তথাপি কালপুরুষ তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সংকীর্ত্তন স্থলে গমন পূর্ব্বক তুকারামের শরণাপন্ন হইল। তুকারাম তাহাদিগকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যদি মহিষের আবশ্যক থাকে, আমার মহিষটি লইয়া যাইতে পার।" তস্করগণ মহিষপ্রার্থী হইতে সাহসী হইল না। তুকারামের গুণ গান করিতে করিতে প্রাণ লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মম্বাজী তুকারামের অচলা ভক্তি ও অসাধারণ মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি বৈরভাব পরিত্যাগ করিলেন।

জীবনোপায়।

রুশীয়া সাম্রাজ্যের কোন গ্রামে এক দরিদ্র চর্ম্মকার বাস করিত। সে কায়ক্লেশে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিগণের আহারসংস্থান মাত্র হইত; সুতরাং তাহার নিজের একখানা গৃহ নির্ম্মাণেরও সংস্থান ছিল না। গ্রামের এক কৃষক দয়া করিয়া স্বীয় আবাসগৃহের একাংশ ছাড়িয়া দেওয়াতে সাইমন তাহাতে বাস করিয়া পাদুকা নির্ম্মাণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

রুশীয়ায় শীতের প্রকোপ অতি ভীষণ; তথায় শীতবস্ত্রের পরিবর্ত্তে মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত আঙ্গরাখা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দরিদ্র গ্রামবাসীরা আহারার্থ যে সকল মেষ হনন করিয়া থাকে, তাহাদের চর্ম্ম দ্বারাই আঙ্গরাখা প্রস্তুত করে; ইহাকে 'শুবা' কহে। সাইমনের গৃহে একটী মাত্র শুবা ছিল, তাহা তাহার বিবাহকালে উপহার প্রাপ্ত। বহুকাল ব্যবহৃত হওয়াতে তাহা ক্রমে গলিত ও পলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু দিন হইতে তাহার ব্যবহারেরও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে, কারণ কেবলমাত্র বহির্গমন কাল ভিন্ন আর কখনও কেহ তাহা ব্যবহার করিত না। সাইমন দরিদ্র বলিয়া তাহার গৃহে কদাপি মেষ হনন হইত না। কাজেই একটী নূতন শুবা প্রস্তুত করণার্থ তাহাকে চর্ম্ম ক্রয় করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কিছু দিন হইতে অর্থ সঞ্চয় করিতে হইতেছিল।

একদা সাইমন হিসাব করিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার কয়েক জন গ্রাহকের নিকট যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা একত্রে আদায় করিয়া লইতে পারিলে একটী চর্ম্ম ক্রয় করা যাইতে পারে। অতএব পরদিন প্রত্যূষে তাহার স্ত্রীর নিকট এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল যে সে পরবর্ত্তী গ্রামে স্বীয় প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহার্থ যাইতেছে; তাহা সংগৃহীত হইলে সেই দিনই নিকটবর্ত্তী সহরে গিয়া চর্ম্ম ক্রয় করিয়া রাত্রিতে গৃহ প্রত্যাগমন করিবে। সাইমনের কিঞ্চিৎ পানদোষ ছিল, এজন্য তাহার স্ত্রী তাহাকে বিশেষরূপ সাবধান করিয়া দিল যেন কোন কুলোকের সঙ্গ গ্রহণ না করে। স্বামীর রাত্রে বাড়ী ফিরিতে শীত লাগিবে বলিয়া সাধ্বী স্ত্রী নিজের অঙ্গাভরণটী স্বামীকে পরাইয়া তাহার উপর গলিত শুবাটী বান্ধিয়া দিল। নিজের হস্তে

যে দুইটী মাত্র 'রুবল' * সঞ্চিত ছিল, তাহাও স্বামীর হস্তে দিয়া বলিল যে সমস্ত সংগৃহীত অর্থ একত্র করিলে একটী উৎকৃষ্ট চর্ম্ম পাওয়া যাইবে। আবার কখন এমন সুদিন আসিবে তাহার ঠিক নাই, এখন সুবিধা মত একটী ভাল শুবা করিয়া লইতে পারিলে অনেক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে। স্ত্রীর এইরূপ পরিণামদর্শিতাতে প্রীত হইয়া তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া সাইমন নিকটবর্ত্তী গ্রামের দিকে যাত্রা করিল।

ঐ গ্রামে এক গৃহস্থের নিকট পাদুকানির্ম্মাণ জন্য তিন রুবল এবং পাদুকাসংস্কার জন্য বিশ 'কোপেক' † প্রাপ্য ছিল। গৃহস্বামী বাড়ী না থাকাতে রুবল তিনটী পাওয়া গেল না; সাইমন কেবলমাত্র বিশটী কোপেক লইয়া বিদায় হইল। অপর এক গৃহস্থের বাড়ীতেও তিন রুবল প্রাপ্য ছিল, তাহাও পাওয়া গেল না; গৃহস্বামী গৃহে নাই, গৃহিণী বলিলেন স্বামী আসিলেই প্রাপ্য অর্থ পাঠাইয়া দিবেন। ইত্যবসরে জীর্ণসংস্কারার্থ স্বামীর এক যোড়া বুট জুতা দিয়া গৃহিণী সাইমনকে বিদায় করিলেন।

অর্থ সংগৃহীত না হওয়াতে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া সাইমন পথপ্রান্তে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া এই স্থির করিল, সহরে গিয়া দেখা যাউক যদি কোন চর্ম্ম বিক্রেতা দয়া করিয়া একটী শুবার উপযোগী চর্ম্ম বাকী মূল্যে তাহার নিকট বিক্রয় করে, তাহা হইলে যে দুইটী রুবল হাতে আছে তাহা এক্ষণে দিয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট মূল্য ২।১ দিবসের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে সহরের দিকে চলিতে লাগিল এবং অপরাহ্নে এক চর্ম্মবিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত প্রস্তাব করিলে পর চর্ম্মবিক্রেতা অপরিচিত বলিয়া তাহাতে সম্মত হইল না। ক্রমে আরও ২।৩ দোকান দেখিল, কোথাও সফলকাম হইল না। কোন চর্ম্মবিক্রেতা পরিচিত থাকা সত্ত্বেও এই বলিয়া, অসম্মত হইল যে সাইমন যেরূপ দরিদ্র তাহাতে মূল্য আদায়ের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। একে সমস্তদিন পথ চলিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাহার উপর এইরূপ নিরাশ হওয়াতে সাইমন নিজকে একান্ত হতভাগ্য মনে করিতে লাগিল; ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হওয়াতে শীত বোধও হইতে লাগিল। শরীরের ক্লান্তি, মনের গ্লানি এবং শীতের জড়তাতে একান্ত অভিভূত হইয়া সে প্রভাতে স্ত্রীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়া

* 'রুবল' (Ruble) = চৌদ্দ আনা। † 'কোপেক' (Kopek) = অর্দ্ধ পয়সা।

ছিল, তাহা ভুলিয়া এক মদ্যালয়ে প্রবেশ করিল এবং স্বীয় হস্তস্থিত বিশ কোপেক দিয়া উষ্ণকর মদ্য ক্রয় করিয়া পান করিল। পানান্তে মন ও শরীর কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি অনুভব করাতে আর ঘুরিয়া বেড়ান নিরর্থক মনে করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সাইমন পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল যে আমি দরিদ্র বলিয়া আমাকে কেহ মূল্য নগদ না পাইলে জিনীস দেয় না। কিন্তু আবার যাহাদের নিকট আমার মূল্য প্রাপ্য আছে, তাঁহারা এইটী ভাবেন না যে, আমি দরিদ্র আমার কিরূপে চলে? যাঁহার গৃহ আছে, আহার সংস্থান আছে, দশটী গো মহিষাদি পালিতে পারেন, তাঁহার নিকট টাকা চাহিতে গেলে বলেন, 'আমি দরিদ্র, হাতে টাকা থাকে না, অন্য সময় দিব।' তাঁহাদের বেলা যদি এই কথা হইল, তবে আমার যে গৃহ নাই, অন্ন মিলে না, একটা শীতবস্ত্র পর্য্যন্ত করিতে পারি না, আমার অবস্থা কি? এই ত সমস্ত দিন চলিয়া বিশ কোপেক মাত্র সংগ্রহ হইল; ইহাতে কি করা যায়? চলিয়া ক্লান্ত হইলাম, বিশ কোপেকের মদ্যপান হইল, এইমাত্র! দূর হউক, আর ভাবিয়া কি হইবে? শুবা হইল না, কি করিব? মদ্যপানে ত শরীর উষ্ণ হইয়াছে, এখন আমার আর শুবার অভাব বোধ হইতেছে না। কিন্তু মাত্রিওনা (Matriona—সাইমনের স্ত্রীর নাম) বড়ই ক্ষুণ্ণ হইবে। সারা বৎসর কত কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করিলাম, তাহার ফল এই হইল? যাহা হউক, আমি যে মাত্রিওনার দুইটী রুবল ভাঙ্গিয়া মদ্যপান করি নাই, সেজন্য সে সন্তুষ্ট হইবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সাইমন নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বোক্ত জুতাযোড়া হাতে করিয়া দোলাইতে দোলাইতে ক্রমে ঐ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী গির্জ্জার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইল, যেন গির্জ্জার পশ্চাতে কি একটা ধবলাকার পদার্থ পড়িয়া রহিয়াছে। তখনও অল্প অল্প সন্ধ্যালোক ছিল, তাহাতে সুস্পষ্ট কিছুই লক্ষিত হইতেছিল না। সাইমন প্রথমে মনে করিল, হয় ত একটী শ্বেত প্রস্তর; পরে ভাবিল ঐ স্থানে পূর্ব্বে ত কোন প্রস্তর ছিল না, তবে হয় ত একটা গাভী হইবে। কিন্তু অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল, যেন মাথাটী মানুষের মতন। কিন্তু ঐ শ্বেত পদার্থ কি? মানুষ ত এরূপ শীতের সময় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে পারে না!

অবশেষে সাইমন সাহসে ভর করিয়া গীর্জ্জার সীমানায় পদার্পণ করিল। তখন দেখিতে পাইল যে একটী মানুষই বটে—দিব্যকান্তি পুরুষ, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে ; তাহার দেহে বস্ত্রের লেশমাত্র নাই ; গীর্জ্জার সিঁড়ীতে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় পড়িয়া আছে। সাইমন ত দেখিয়া অবাক্! প্রথমতঃ তাহার মনে হইতে লাগিল যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করিয়া সমস্ত বস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া মৃতদেহটী এস্থানে ফেলিয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই তাহার এই ধারণা হইল যে যদি কেহ তাহাকে ঐ স্থানে এ অবস্থায় দেখিতে পায়, তবে নিশ্চয়ই মনে করিবে ইহা তাহারই কার্য্য, কারণ সকলেই জানে সে দরিদ্র, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট ও কাতর। ইহা মনে উদয় হওয়া মাত্র সে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাইমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে পাইল যে ঐ উলঙ্গ ব্যক্তি আর পূর্ব্বমত পড়িয়া নাই, সে গাত্রোত্থান করিয়া সাইমনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার মনে ভয় সঞ্চার হইল ; সে মনে করিল ঐ ব্যক্তি এরূপাবস্থায় যখন মানুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে তখন অবশ্য ইহার কোন দুরভিসন্ধি আছে। এই ভাবিয়া সাইমন দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইতে লাগিল যে হয় ত ঐ ব্যক্তি কোন দুরবস্থায় পড়িয়া সাইমনের সাহায্য গ্রহণার্থ আসিতেছে, এমতাবস্থায় তাহার সাহায্য না করা একান্ত অমানুষিক কার্য্য হইবে। "আমি দরিদ্র, সে দুষ্টাভিসন্ধি করিয়া আসিলেও আমার কি অপহরণ করিবে ? কিন্তু এ অবস্থায় হয় ত আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াও সাহায্য না করিলে তাহার প্রাণনাশ হইতে পারে।" সাইমন ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া চলিল এবং ঐ লোকটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইল যে সে একজন দিব্যকান্তি যুবাপুরুষ ; তাহার দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন নাই, অথচ দেখিলে মনে হয় যেন বড় দুর্ব্বল ও শীতে ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সাইমন নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ ব্যক্তি তাহার মুখের দিকে নেত্রপাত করিল ;—সেই দৃষ্টিতেই তাহার হৃদয় গলিয়া গেল, সেই চক্ষের কাতরতা যেন দরিদ্র সাইমনের হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত দয়াপ্রবণতা জাগরিত করিয়া তুলিল।

সাইমন হস্তস্থিত জুতাযোড়া মাটিতে রাখিয়া ক্ষীপ্র হস্তে আপনার অঙ্গ হইতে শুবা খুলিয়া লইল এবং ঐ অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে দিয়া তাহা পরি-

ধান করিতে বলিল। সে ব্যক্তি কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শীতে জড়সড় হওয়াতে মুখ দিয়া যেন কথা ফুটিতেছিল না। সাইমন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আর কিছু বলিতে হইবে না, এখন শীঘ্র শীঘ্র পরিয়া লও।" এই বলিয়া তাহার হাতে ধরিয়া শুবা পরাইয়া দিতে লাগিল ; সে শুবার ভিতরে হাত দিতে পারিতেছিল না, যেন শীতে তাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছে। সাইমন শুবা পরাইতে গিয়া দেখিতে পাইল যে ঐ ব্যক্তির হস্ত পদাদি রমণীর হস্তপদের ন্যায় কোমল, শিরে সুদীর্ঘ কেশ লম্বিত, সর্ব্বাঙ্গ এত মসৃণ ও কোমল যে শরীর স্পর্শ করিলে তাহাকে রাজপুত্র বলিয়া ধারণা হয়। সাইমনের হস্তে যে জুতা ছিল তাহা ঐ ব্যক্তিকে পরাইয়া দিল ; এবং নিজের মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া পরাইতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মনে হইল যে ঐ ব্যক্তির সুদীর্ঘ কেশ আছে, তাহার নিজের মস্তক কেশ শূন্য! এই ভাবিয়া টুপিটী আবার নিজেরই মস্তকাবরণ জন্য রাখিল।

তৎপর সাইমন তাহাকে চলিতে বলিলে সে ব্যক্তি এক পা দুই পা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে মনে হইল যেন সে এই নূতন চলিতে আরম্ভ করিতেছে ; কিন্তু ২।১ পা চলিয়াই বেশ সুস্থ ও সবল ব্যক্তির ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিল। সাইমন তাহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল।

এ পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি একটীও শব্দ উচ্চারণ করে নাই। সাইমন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কথা বলিতেছ না কেন ? এখন আর ভয় কি ? এসব ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে, মানুষের ঐ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিবার সাধ্য কি আছে ?"—তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

অপরিচিত ব্যক্তি প্রথম কথা বলিল,—"আমার বাড়ী এ অঞ্চলে নহে।"

সাইমন,—"তাহা ত জানিতেছি ; কারণ আমি হেথাকার সকল লোককে চিনি।"

সাইমন আবার বলিল,—"তুমি এখানে কিরূপে আসিয়াছ ?"

অপরিচিত ব্যক্তি,—"তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই।"

সাইমন,—"তোমার উপর কি কেহ অত্যাচার করিয়া তোমাকে এখানে ছাড়িয়া দিয়াছে ?"

অপরিচিত ব্যক্তি—"ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। কোন মানুষের ইহাতে কোন হাত নাই।"

সাইমন,—"ঈশ্বর ত সবই করেন। সে যা হউক, তুমি অবশ্য কোথাও যাইতেছিলে ; এখন কোথায় যাইতে চাও।"

অপরিচত ব্যক্তি,—"আমাকে যেথানে যাইতে বল সেখানেই যাইতে পারি।"

সাইমন ঐ ব্যক্তির এবম্বিধ উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া একান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। পরে ভাবিতে লাগিল যে "মানুষের অদৃষ্টে এরূপ দুর্ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এ ব্যক্তি যে বিপদ্‌গ্রস্ত, তাহার আর ভুল নাই। তবে যে সে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না, তাহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ রহিয়াছে। এরূপ বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে সক্ষম হওয়াও সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ঈশ্বরই দয়া করিয়া আমাকে ইহার পথে আনিয়া দিয়াছেন।" এই ভাবিয়া সাইমন তাহাকে বলিল,—"তবে তুমি আমারই গৃহে চল। অবশ্য তোমাকে আমি সুখ স্বচ্ছন্দতা দিতে পারিব না, কারণ আমি বড়ই দরিদ্র।"

অপরিচিত ব্যক্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া সাইমনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। সাইমন, গৃহে পৌঁছিলে মাত্রিওনা কি বলিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত।

বাঙ্গালী।

বাঙ্গালী জাতি বলিলে কাহাদিগকে বুঝায় এবং তাহাদের উৎপত্তি কিরূপ, এ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অসংশয়িত ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে যাঁহারা ইহা পাঠ করিবেন, প্রথমেই বলিয়া রাখি, তাঁহারা নিরাশ হইবেন। এই মুখবন্ধের পর প্রবন্ধটি পাঠ করা না করা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। এখন বক্তব্য আরম্ভ করা যাউক।

বঙ্গে আর্য্য উপনিবেশের বহুপূর্ব্বে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানই জলা ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। ঐ ঐ প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নহে। বঙ্গের প্রধান প্রধান নদ নদী সকল তখন বঙ্গোপসাগরে আধুনিক নিম্ন বঙ্গদেশ

রচনায় ব্যাপৃত ছিল। এখনও যে তাহাদের কার্য্যের শেষ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

সাঁওতাল, কোল, ওরাঁউ, বাউরী প্রভৃতি জাতিরাই যে বঙ্গদেশের আদিম নিবাসী তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহারা বঙ্গদেশের কোন্ অংশে বসতি করিত, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা নিম্নবঙ্গের উর্ব্বর ক্ষেত্রে বাস করিত ; পরে প্রবল আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহারা পশ্চিমবঙ্গের পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই অবধি ইহারা এই শেষোক্ত প্রদেশেই বাস করিতেছে। সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় অনার্য্যেরা লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার জানিত না। কৃষিকার্য্যও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। আর্য্যেরাই যে ভারতে কৃষিকার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, ইহা ইতিহাসের একপ্রকার মীমাংসিত সত্য। সুতরাং অনার্য্যদিগের নিকট জলাজঙ্গলময়, নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল, অস্বাস্থ্যকর, পরন্তু উর্ব্বর নিম্নবঙ্গের যে সবিশেষ আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা বোধ হয় না। মৃগয়াই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল ; এখনও অনেকটা বটে। যেখানে ভক্ষ্য পশুপক্ষী সুলভ, বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা অল্প, আশঙ্কা থাকিলেও যেখানে তাহারা অত্যল্পকাল মধ্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে পারে, বসবাসের জন্য সেইরূপ স্থান মনোনীত করাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, কেবল আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশেই তাহাদের উক্ত উদ্দেশ্যগুলির সুসিদ্ধ হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি, পূর্ব্বোক্ত অনার্য্যজাতিরা স্মরণাতীত কাল হইতে পশ্চিম বঙ্গের আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিয়া আসিতেছে। নিম্নবঙ্গে তাহারা বাস করিত না ; কোন কোন সম্প্রদায় বাস করিলেও প্রবল আর্য্যজাতির অভিযানের সম্মুখে তাহারা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া পশ্চিম-বঙ্গের অরণ্য ও পর্ব্বতসমূহে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকিবে।

বঙ্গদেশের মধ্যে (Bengal Presidency) মিথিলা বা বর্ত্তমান ত্রিহুত অঞ্চলেই আর্য্যগণের প্রথম শুভাগমন হয়। আর্য্যজাতির যে সম্প্রদায় এই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা বিদেহ নামে ইতিহাসে খ্যাত আছেন। বিদেহগণের নেতা মাধব বিদেহই দলবল লইয়া সর্ব্বপ্রথমে উক্ত দেশে আগমন করেন। সঙ্গে ছিলেন পুরোহিত মহর্ষি গৌতম।

কথিত আছে, স্বয়ং বিভাবসুই ইহাঁদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। গণ্ডক নদের তটে উপনীত হইয়া বিভাবসু নিশ্চল হইলেন। তখন মাধব বিদেহ তাঁহাকে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশের প্রার্থনা জানাইলেন। অগ্নি তাঁহাদিগকে গণ্ডক নদের পূর্ব্বতটবর্ত্তী উর্ব্বর প্রদেশে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে বিদেহগণ উক্ত প্রদেশে বাস করিয়া পরাক্রান্ত মিথিলা-রাজ্য স্থাপন করিলেন *

মিথিলায় আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইলে, কালক্রমে মগধ (বর্ত্তমান বিহার) এবং অঙ্গদেশেও (ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও) আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এই দুই প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই মহারণ্যে সমাবৃত ছিল। কোন কোন স্থানে মহর্ষিগণ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই অনার্য্যগণ (রাক্ষসগণ) কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইতেন। যাহা হউক, মিথিলা রাজ্যের গৌরব প্রনষ্ট হইলে, মগধ রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। মগধের রাজগণ সমগ্র উত্তর-ভারতে আপনাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিলেন। কোশল, পাঞ্চাল, অঙ্গ, মিথিলা সমস্তই মগধ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিল। মগধের রাজগণ কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া উত্তর-ভারতে একচ্ছত্র রাজত্ব করিলেন।

মগধ এবং অঙ্গদেশে আর্য্যগণের সমাগম হইলে, তাঁহারা ধীরে ধীরে আধুনিক বঙ্গদেশে † আসিয়া উপনীত হইতে লাগিলেন। ভগীরথের গঙ্গা

* এই বৈদিক গল্পের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত থাকিবার সম্ভাবনা। অগ্নি বিদেহগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেও পারে যে, বিদেহগণ অগ্নির সাহায্যে দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া মিথিলায় উপনীত হইয়াছিলেন। অগ্নি গণ্ডকের তটে আসিয়া নিশ্চল হইলেন, অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর তটবর্ত্তী প্রশস্ত উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল বনাচ্ছন্ন না থাকায়, অগ্নির সহায়তার আর প্রয়োজন হইল না এবং উক্ত প্রদেশেই বসবাসের উপযুক্ত বিবেচিত হইল। পুরাকালে মগধ প্রভৃতি দেশ যে মহারণ্যে সমাবৃত ছিল, তাহা মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ পাঠেও অবগত হওয়া যায়।

† বঙ্গদেশ অর্থাৎ Bengal Proper। দেশের নাম "বঙ্গদেশ" হইল কেন, এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে, তাহা অবগত নাহি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী কথা আমার মনে হই-তেছে; ভয়ে ভয়ে তাহা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। কোল সাঁওতালেরা তাহাদের প্রধান দেবতাকে "বঙ্গা" বলে; এই "বঙ্গার" একটী "বঙ্গী"ও আছেন। বঙ্গার উপাসনা করে বলিয়াই হউক, কিম্বা অপর কোন কারণেই হউক, এই অনার্য্যেরা বাঁকুড়া মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে "বঙ্গা" নামেই অভিহিত হয়। এই কারণে, উক্ত অঞ্চলে "বঙ্গা" অর্থে নির্ব্বোধও বুঝায়। যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, "বঙ্গাদের দেশ"ই তো "বঙ্গদেশ" হয় নাই? পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকেরা আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি কস্মিন্‌কালেও ইহাকে পুরাতত্ত্বের অভিনব আবিষ্কার মনে করি নাই।

আনয়নরূপ আখ্যানে আর্য্যগণের বঙ্গদেশে প্রথম পদার্পণের কথা সূচিত হইতেছে, এইরূপ মনে করা বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কৃষিপ্রিয় আর্য্যেরা যে ভাগীরথী দামোদর প্রভৃতি নদনদীর উভয়তটবর্ত্তী প্রশস্ত উর্ব্বর ক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ না করাই কর্ত্তব্য। এই উর্ব্বর দেশে বাস করিয়া ইহাঁরা ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, নিম্নবঙ্গে অনার্য্য রাক্ষসেরা বাস করিত না; যাহারা বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পর্ব্বতে ও অরণ্যে পলায়ন করিল; অবশিষ্টেরা তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিল। এই শেষোক্তেরা কালক্রমে রাক্ষসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং আর্য্যগণের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। ইহারাই বঙ্গদেশের নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু।

আর্য্যেরা বঙ্গদেশে আসিয়া অপেক্ষাকৃত সুখে ও নির্ব্বিবাদে বাস করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু এই কারণেই তাঁহাদের প্রকৃতির বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইল। পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে যে সকল আর্য্য বাস করিতেন, তাঁহারা নিকট-বর্ত্তী পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী দুর্দ্দান্ত অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই আক্রান্ত উৎপীড়িত ও উপদ্রুত হইতেন। * এই কারণে প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহাদিগকে সশস্ত্র থাকিতে হইত এবং পুনঃ পুনঃ সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইতে হইত। এইরূপে নিয়ত অস্ত্রশস্ত্রের পরিচালনা করিতে করিতে তাঁহারা বিলক্ষণ যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং যুদ্ধপ্রিয়তা এবং সাহসিকতা তাঁহাদের প্রকৃতির সর্ব্ব-প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। উক্ত প্রদেশের জলবায়ুও তাঁহাদের দৈহিক বিকাশ সাধন এবং বলবীর্য্য সংরক্ষণের বিলক্ষণ সহায় হইল। প্রায় এই সমস্ত কারণেই, কোশল, মগধ, পাঞ্চাল, মিথিলা, অঙ্গ প্রভৃতি দেশের আর্য্যেরাও বিলক্ষণ সাহসী ও তেজস্বী হইলেন। কিন্তু যে আর্য্যসম্প্রদায় নিম্নবঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তাঁহারা সেই প্রদেশে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পাইয়া অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার প্রায় বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু ইহাদেরই মধ্যে যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য ও পর্ব্বতময় প্রদেশের সন্নিধানে বাস করিলেন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই অনার্য্যগণের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইতে হইত। এই

* ইংরেজের শাসনেও অদ্যাপি এই উপদ্রবের শান্তি হয় নাই।

কারণে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বিস্মৃত হওয়া চলিল না। তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশকে "বীর-ভূমি", "মল্ল-ভূমি" প্রভৃতি বীরত্ববাচক অভিধানে অভিহিত করিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যার যৎসামান্য চর্চ্চাও রাখিতে বাধ্য হইলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্নিহিত বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুও নিম্নবঙ্গের জলবায়ু অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যজনক এবং বলবীর্য্য বিকাশের অনুকূল হইল। অদ্যাপি বীর-ভূমি, মল্ল-ভূমি প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা নিম্নবঙ্গবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর বলবান্, রুক্ষমূর্ত্তি ও সাহসী।*

যাহা হউক, নিম্নবঙ্গবাসী আর্য্যেরা যুদ্ধবিদ্যার অনুশীলনাভাবে একদিকে যেরূপ অন্যান্য আর্য্যসম্প্রদায় অপেক্ষা বলবীর্য্যে হীন হইলেন, সেইরূপ অপর দিকে শান্তিসুখের অধিকারী হইয়া তাঁহারা আপনাদের মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে প্রখর প্রতিভাকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। কাব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, সুকুমার শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হওয়াতে ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত ও মার্জ্জিত হইল এবং হৃদয়ের সুকুমার ভাবগুলিও যথোচিত কর্ষিত হইল। ভারতবর্ষের অন্য সকল আর্য্যসম্প্রদায় অপেক্ষা বঙ্গদেশবাসী আর্য্যগণ এই কারণেই বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে অধিকতর বলীয়ান্ এবং বর্ত্তমানকালেও উন্নতির পথে অগ্রণী।

বঙ্গদেশে বাস করিয়া বঙ্গীয় আর্য্যগণের প্রকৃতিতে এইরূপে কতিপয় বিশেষত্ব জন্মগ্রহণ করিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালী দুর্ব্বল ও ভীরু হইল; দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী বিলাসী ও শান্তিপ্রিয় হইল; এবং তৃতীয়তঃ বাঙ্গালী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভাসম্পন্ন হইল। বঙ্গদেশের জলবায়ুর গুণই এই প্রকার। শুধু হিন্দু আর্য্যগণের কথা নহে, বঙ্গদেশে যাহারা অধিককাল বাস করিবে, তাহাদেরই প্রকৃতিতে পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্ব গুলির অঙ্কুর ও বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠকবর্গ আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশবাসী মুসলমান †, ক্ষত্রিয় ‡, জৈন §, য়ুরোপীয় এবং

* আর্দ্রভূমি নিম্নবঙ্গের জলাজঙ্গলোত্থিত দূষিত বিষাক্ত বাষ্প বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গালী আর্য্যগণকে নির্বীর্য্য করিতেছে। অদ্যাপি নিম্নবঙ্গের বায়ুরাশি ম্যালেরিয়া বিষে ওতঃপ্রোতঃরূপে পরিপূর্ণ। বঙ্গদেশে যে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ধান্যই প্রধান। সুতরাং তণ্ডুলই বঙ্গদেশবাসীর প্রধান খাদ্য। এই খাদ্যও যে বাঙ্গালীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ নহে, তাহা কে বলিতে পারে?

† যে সকল উচ্চ বা নিম্ন সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না।

‡ বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলে বিস্তর ক্ষত্রিয় বা "ছেত্রী" দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে কেবল "ছেত্রী"রই বাস। পশ্চিম বঙ্গে বাস করিয়াও ইহাদের দৈহিক অবনতি হইয়াছে।

§ মুর্শিদাবাদ জেলায় আজিমগঞ্জ, বালুচর প্রভৃতি স্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বিস্তর ওসোয়াল বাস করে; ইহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে অনেক কথা লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্যক্তিরা,—অর্থাৎ যাহারা এদেশে অধিক দিন বাস করিতেছে,—তাহারা সকলেই ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর স্বভাব ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ বিশ্বাস হয়, কালক্রমে সকলেই সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীত্ব প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু কখনও বাঙ্গালী হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমরা আমাদের বক্তব্য নিম্নে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যাই সমধিক। কোন কোন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অনার্য্য-জাতিও হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। হিন্দুর জনসংখ্যা হইতে ইহা-দিগকে বর্জ্জন করিলেও অবিমিশ্র আর্য্য হিন্দুর সংখ্যা বঙ্গদেশে নিতান্ত অল্প হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জনসংখ্যার তুলনায় বঙ্গদেশে আর্য্য-হিন্দুর সংখ্যা বোধ হয় অধিক হইবে। কিন্তু ইহাদের সকলেই কি "বাঙ্গালী"-পদবাচ্য? বাঙ্গালী বলিলে কাহাদিগকে বুঝায়, তৎসম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"বাঙ্গালী" নামের উচ্চারণে আজ কাল নানা লোকের মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। কেহ ঘৃণার, কেহ সম্মানের, কেহ শ্রদ্ধার এবং কেহ বা ঈর্ষার চক্ষেও বাঙ্গালীকে দেখিয়া থাকেন। বাঙ্গালী আজ কাল সকলেরই সুপরিচিত বটে। আকার প্রকার দেখিলেও বাঙ্গালীকে চেনা যায়। কিন্তু বঙ্গদেশবাসী নানাজাতীয় ও বিভিন্নদেশাগত লোকের মধ্যে বাঙ্গালীকে চিনিবার আরও কতিপয় লক্ষণ আছে, নিম্নে সেগুলির নির্দ্দেশ করা গেল।

বাঙ্গালী হইতে হইলে প্রথমতঃ বঙ্গদেশে বাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহাই বাঙ্গালীর একমাত্র লক্ষণ নহে। * এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্গদেশবাসী ইংরেজ, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি বিভিন্নদেশাগত ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের আদিমনিবাসী কোল সাঁওতালেরাও আপনাদিগকে "বাঙ্গালী" নামে অভিহিত করে না। অপর সকলে যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলে, তাহারাও তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া থাকে। বাঙ্গালীর দ্বিতীয় লক্ষণ বঙ্গভাষার ব্যবহার †; কিন্তু ইহাও বাঙ্গালীত্বের সম্যক্ পরিচয় নহে।

* British-born শব্দের ন্যায় বঙ্গদেশে কোনও শব্দ প্রচলিত নাই।

† পশ্চিমদেশবাসী কোন কোন বাঙ্গালী পরিবারের হিন্দীই "মাতৃভাষা" হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত সংস্রব একেবারে পরিত্যক্ত না হওয়ায়, ইহাদের এখনও "বাঙ্গালী" নাম ঘুচে নাই।

জৈন, মুসলমান প্রভৃতি জাতি যাহারা বহুকাল এদেশে বাস করিতে করিতে কথোপকথনে প্রধানতঃ বঙ্গভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকে,—তাহারাও আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করে না। বঙ্গদেশের নানা স্থানে অনেক "হিন্দুস্থানী" পরিবার দৃষ্ট হয়; বঙ্গভাষাই ইহাদের "মাতৃভাষা" হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহারা "বাঙ্গালী" নহে। অবশ্য যে সকল প্রকৃত বাঙ্গালী মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আপনাদিগকে "বাঙ্গালী মুসলমান" বা "বাঙ্গালী খৃষ্টান" নামে অভিহিত করে বটে; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও অনেকে আপনাদিগকে বাঙ্গালীর সহিত একীভূত করিতে কুণ্ঠিত হয়।* তবে কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বনই বাঙ্গালীত্বের প্রধান লক্ষণ? তাহাও বোধ হয় না। যেহেতু বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গলাভাষী, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বিহারী, খোট্টা এবং মাড়োবারীরাও কখনই আপনাদিগকে "বাঙ্গালী"র মধ্যে গণ্য করে না। তবে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ কি? আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন। বলা বাহুল্য যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকলও বিদ্যমান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহের এক একটী বা সমষ্টিও "বাঙ্গালাত্ব" গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে কস্মিন্‌কালেও বাঙ্গালী হওয়া যায় না; অর্থাৎ যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মৎস্য মাংস খাইয়াও প্রকৃত আর্য্যব্যক্তিকে কখনও সমাজ মধ্যে দূষিত বা "পতিত" হইতে হয় না। বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গালাভাষী, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী† মৎস্যাশী আর্য্য ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী। বঙ্গদেশ, বাঙ্গলা ভাষা এবং মৎস্যাহার পরিত্যাগ করিলেও হিন্দু বাঙ্গালীর "বাঙ্গালী" নাম সহজে যাইবে না। মৎস্যাশী ব্যক্তিগণের শোণিত তো তাহার শিরায় শিরায় প্রধাবিত হইয়া থাকে। মৎস্যাহার করিলে তো তাহার পাতিত্য দোষ জন্মে না? তাহা হইলেই তাহার বাঙ্গালী নাম ঘুচিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হইল। বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গালাভাষী, কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণেরা যতদিন মৎস্যাহার আরম্ভ করেন নাই, ততদিন তাঁহারা "বাঙ্গালী ছিলেন না।

* বাঙ্গালী খৃষ্টান বা বাঙ্গালী মুসলমানগণের আত্মীয় স্বজনেরা অনেকেই "বাঙ্গালী"! সুতরাং তাহারা আপনাদিগকে বাঙ্গালী না বলিয়া কি করিবে? তবে যাহারা ইংরেজ বা পশ্চিমদেশবাসী মুসলমানের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়, তাহাদের পুত্র সন্তানেরা আপনাদিগকে আর বাঙ্গালী বলে না।

† ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত ধরিয়া লইতেছি।

মৎস্যাহার আরম্ভ করিয়া অবধি তাঁহারা "তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে"* "বাঙ্গালী" হইয়া গিয়াছেন! এখন আর তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না।

মৎস্যাহার হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে আর কোথাও প্রচলিত নাই, বরং তাহা ঘৃণা ও পাতিত্যেরই কারণ মধ্যে পরিগণিত হয়। কেবল বঙ্গদেশবাসী হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যেই তাহা তদ্রূপ বিবেচিত হইল না, ইহার তাৎপর্য্য কি? আর্য্যেরা যখন বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন, তখন বোধ হয় মৎস্যাহার নিন্দনীয় ছিল না। সমুদ্রতটবর্ত্তী জলাময়দেশে বাস করিয়া তাঁহারা প্রচুর মৎস্য দেখিতে পাইলেন। মৎস্যের বিজাতীয় দুর্গন্ধ থাকিলেও, সুপক্ক হইলে তাহা খাইতে মন্দ নহে; বিশেষতঃ মৎস্যভক্ষণে দেহ পুষ্টিলাভও করিয়া থাকে। সুতরাং বঙ্গদেশীয় আর্য্যগণের মধ্যে মৎস্য-ভক্ষণ-প্রথা প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে বঙ্গদেশের ন্যায় মৎস্য সুলভ নহে। সুতরাং তত্রত্য আর্য্যেরা কচিৎ মৎস্য ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু পশুমাংস খাইতে কাহারও আপত্তি ছিল না। যেহেতু যজ্ঞে পশুহনন করিয়া পশুমাংস ভক্ষণ করা শাস্ত্রসম্মত ও দেশপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর বহুকাল প্রাধান্য স্থাপন করে। "অহিংসা এবং সর্ব্বভূতে দয়া প্রদর্শনই" বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল; সুতরাং উত্তর-ভারতবাসী আর্য্যগণ বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষাগুণে মৎস্যমাংসাহার বর্জ্জন এবং মৎস্যমাংসাহারী ব্যক্তিগণকে যে ঘৃণা করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কালের বিচিত্র গতিতে, হিন্দুধর্ম্ম যখন ভারতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল, তখন যজ্ঞার্থে পশুবধ করা শাস্ত্র সম্মত থাকায়, কেহ কেহ পশুমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মৎস্যাহার বহুকাল পরিত্যক্ত থাকায়, এবং তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান বা আদেশ না থাকায়, হিন্দুধর্ম্মের নবভক্তগণের নিকট তাহা নিন্দনীয় ও পাতিত্যের কারণ হইয়া উঠিল। উত্তর-ভারতবাসী আর্য্যগণের মধ্যে মৎস্যের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা† এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

* অনেক বাঙ্গালী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকে এইরূপ বিলাপ করিতে শুনা যায়।

† পশ্চিমাঞ্চলে অনেক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকে পাঁঠার মাংস খাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু প্রাণান্তেও তাহারা মৎস্য স্পর্শ করিবে না। তান্ত্রিক ধর্ম্মোক্ত কার্য্যকলাপে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইলে, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মও "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মত প্রচার করিয়াছিল। অদ্যাপি বঙ্গদেশে অনেক নিরামিষভোজী বৈষ্ণব পরিবার দৃষ্ট হয়। অনেক বৈষ্ণব

বৌদ্ধধর্ম্ম যে বঙ্গদেশে কখনও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। প্রাধান্য লাভ করিলে, মৎস্যমাংসাহার একেবারে পরিত্যক্ত না হউক, অন্ততঃ ঘৃণিতও হইত। এই ধর্ম্মের দুই একটী তরঙ্গ আসিয়া বঙ্গদেশকে অভিঘাত করিয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর; কিন্তু সে অভিঘাতে বঙ্গীয় আর্য্যসমাজ যে কিছুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। বিচলিত হইলে, কিয়দ্দিন পরে তান্ত্রিক ধর্ম্মের এরূপ প্রসর ও প্রতিপত্তি লাভ হইত না। মৎস্যমাংসাহার নিষেধ করা দূরে থাকুক, তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ঐ বিষয়ের সবিশেষ প্রশ্রয়ই দিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই, বঙ্গদেশে মৎস্যাহার নিষিদ্ধ হয় নাই এবং স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গীয় আর্য্যসমাজে এই প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

মৎস্যাহারই বঙ্গীয় আর্য্যগণকে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিতেছে। মৎস্যাশী না হইলে, বাঙ্গালী অন্যান্য প্রদেশের আর্য্যগণের নিকট এরূপ নিন্দাভাজন ও ঘৃণাস্পদ হইত না। * যাহাই হউক, মৎস্য ভক্ষণ যে বাঙ্গালী আর্য্যগণের একটী বিশেষত্ব তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালীর আরও কতিপয় বিশেষত্ব আছে, তাহাদের এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করি না। কিন্তু একটীর যৎসামান্য উল্লেখ না করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না, তাহা বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে। বাঙ্গালীর দেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়াই বাঙ্গালীকে চেনা যায়; এই পরিচ্ছদের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে, উত্তমাঙ্গের অনাচ্ছাদন। বাঙ্গালী-বিদ্বেষী অনেক আর্য্যকে এই বিষয় লইয়া অনার্য্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে দেখা যায়। সে সব কথাবার্ত্তা আর্য্যব্যক্তির অশ্রাব্য ও অপাঠ্য সুতরাং এস্থলেও উল্লেখের অযোগ্য। প্রাকৃতিক কারণের বশবর্ত্তী হইয়াই যে বাঙ্গালী মস্তকাচ্ছাদন করে না, ইহা যাহারা বুঝিতে না পারে, তাহাদের মস্তিষ্ক যে

আবার মৎস্যমাত্র ভক্ষণ করে; কিন্তু পাঁঠার নামে কর্ণে অঙ্গুলি দেয়। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের এবং ইহাদের ব্যবহার পরস্পর বিরোধী। বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়া হিন্দুস্থানী-দের নিকট যারপরনাই ঘৃণ্য। "বাঙ্গালী মছ্‌লী খাতা হেয়" একথা যার তার মুখে শুনা যায়।

* বাঙ্গালীর আহার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বিহারে অনেক সংস্কৃত শ্লোক রচিত হইয়াছিল। একটী প্রাচীন শ্লোক এইরূপ:—

"আহারে কাক বক শূকর সমাঃ * * * * ।
বাঙ্গালাঃ যদি মানবাঃ হরিঃ হরিঃ প্রেতাস্তদা কীদৃশাঃ ॥"

Indian Antiquary (Part cxcviii, vol. xvi.)

"মেড়ুয়া" ভক্ষণজনিত রসদ্বারা পরিপুষ্ট, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমুদ্র যে দেশের নিকটবর্ত্তী, সে দেশে যে শীতের প্রাবল্য বা গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য থাকে না, সুতরাং লোকের শিরস্ত্রাণেরও প্রয়োজন হয় না, ইহা আশা করি বালক ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

যাহা হউক, বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি ও লক্ষণ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ করিলাম। বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সত্য ও সমধিক কল্পনা থাকাই সম্ভবপর। সম্ভবপর কেন, বস্তুতঃই আছে। সুতরাং আমি বাঙ্গালীর এই ইতিহাসটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহাকেও অনুরোধ করিতেছি না। কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া যদি বাঙ্গালীজাতির একটী প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই আমার এই প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ আদর হইবে, আমিও সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারিব এবং সর্ব্বোপরি সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

ইংরাজ সমাজ।

আমাদের দেশে ইংরাজ সমাজের বিরুদ্ধে এক বিষম কুসংস্কার আছে। বিশেষতঃ আজ কয়েক বৎসর হইল সেই কুসংস্কার অনেকের মনকে আরও বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে যাহাকেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিই বলেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস;—ইংরাজ সমাজ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার কিছুই জানা নাই। যাঁহাদেরও বা এরূপ কিছু কিছু সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাঁহাদের মধ্যেও হয়ত অনেকের পূর্ব্বার্জ্জিত কুসংস্কার বশতঃ দৃষ্টির বক্রতা হয়। তদ্ব্যতীত, অল্পজ্ঞান অজ্ঞানতা অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর দূষনীয়। ইংরাজ সমাজের নীতি সকল আমাদের দেশের নীতি হইতে শুধু ভিন্ন নহে—অনেক স্থলে তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হয়; সুতরাং যাঁহারা আমাদের নীতিকেই অনিন্দ-নীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন ও ইংরাজ সমাজ পক্ষপাতশূন্য হইয়া দর্শন ও বিচার না করেন, তাঁহাদের যে ইহার উপর অতীব অনাস্থা জন্মিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ইংরাজ সমাজেও এক প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশের লোকের মত তাঁহারা নৈয়ায়িক নহেন, সুতরাং তাঁহাদের জাতিভেদের কিছু লক্ষণ নাই। আমাদের সমাজে কত দিন, হয়ত, কত সহস্র বৎসর অগ্রে স্থির হইয়া গিয়াছে, জন্মই জাতিভেদের লক্ষণ হইবে; স্থূলতঃ ধরিতে গেলে তাহাই বরাবর ন্যায়ানুযায়িক স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজের মধ্যেও বংশমর্য্যাদা আছে, কিন্তু তাঁহারা তজ্জন্য ভুলিয়া যান নাই যে সুধু বংশমর্য্যাদাই জাতিভেদের লক্ষণ হইলে, বহুল কুফল ফলিতে পারে। এই জন্য ধনমর্য্যাদা, বিদ্যাযশঃ, মেধা, এই সকলেরই উপর বিশেষ ভাবে, বিশেষ বিশেষ স্থলে সামাজিক পদ নির্ভর করে। ইংরাজ সমাজে স্থূলতঃ দুই প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। ভদ্র শ্রেণী ও সাধারণ লোক। শিক্ষা, শিষ্টাচার ও কতক পরিমাণ অর্থ ভদ্রের প্রধান লক্ষণ। বংশমর্য্যাদা তাহাদের সহানুগামী মাত্র। সকল দেশেই পূর্ব্বোক্ত গুণ গুলি শেষোক্তের সহিত জড়িত। কিন্তু তাহা বলিয়া, তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়া শেষোক্তটীকে জাতিবিভাগের এক মাত্র লক্ষণ করিয়া নৈয়ায়িকতার সহিত তাহা রক্ষা করিলে যে বিষময় ফল হয়, আমাদের কৌলীন্য প্রথা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। সেইরূপে বংশের ন্যায় অর্থকেই শ্রেণীবিভাগের একমাত্র লক্ষণ ধরিলে অনেক কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ইংরাজ সমাজ বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হইতে পারে, অর্থই তথাকার জাতিবিভাগের প্রধান লক্ষণ। তাহার কারণ, ইংলণ্ডে অর্থশালী লোকের অর্থ এত অধিক, অর্থবিহীন লোকের এত দুরবস্থা, অর্থের এত প্রয়োজন যে, নিঃস্ব লোকে নানাগুণ সম্পন্ন হইলেও তাহার ভদ্র সমাজে চলা অসাধ্য হইয়া উঠে। বিবাহ নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে ভদ্র সমাজের অধিকাংশ লোকের সহিত এরূপ লোকের সমকক্ষতা চলে না। তবে ইহা স্মরণ রাখা উচিত, অধ্যাপক, পাদরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী লোক, কিম্বা যাঁহারা কোন প্রকারে মেধার পরিচয় দিয়াছেন এরূপ লোক সর্ব্বত্র সমাদৃত—উন্নতসমাজভুক্ত। আরও এক কথা—অর্থ না থাকিলে সেখানে শিক্ষালাভ হওয়া অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে হইলে, এক, অনেক অর্থের প্রয়োজন; না হয়, বৃত্তিলাভ করিতে পারা চাই। সেইরূপ প্রধান প্রধান স্কুলেরও ব্যয় অনেক। এইরূপে অর্থের ক্ষমতা বুঝিতে পারা যাইতেছে। অনেক সময়ে একজন মেধাবী লোক বহুল অর্থ উপার্জ্জন

করেন; তাঁহার শিক্ষা, শিষ্টাচার-জ্ঞান নাই, সুতরাং ভদ্র সমাজে তাঁহার স্থান নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র কন্যা অর্থের বলে যথার্থ শিক্ষালাভ করিয়া অনায়াসেই ভদ্র সমাজে গৃহীত হইবেন। নির্গুণ অর্থশালী লোকে, নির্গুণ বংশমর্য্যাদাবান লোকে, অনেক সময়ে ইংরাজ সমাজে সম্যক্ উন্নতস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সমাজে নূতন লোকের (Parvenu) প্রতি বিদ্বেষভাব মনুষ্যস্বভাবসুলভ। লোকের পক্ষে সাধারণ বাধা বিপত্তি ভেদ করিয়া বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জন করা আজিও সহজ নহে। তাহাদের কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহার সহিত এরূপ অস্বাভাবিক বাধা বিপত্তিও ক্রমশঃ লোপ পাইবে, আশা করা যায়।

স্থূলতঃ, ইংরাজ সমাজ স্বাভাবিক নিয়মের উপর সংরক্ষিত। ইহা আর কাহারও অবিদিত নাই, যে সময়বিশেষে মনুষ্য সমাজের সাময়িক অস্বাভাবিকতাও, এই নিয়মের অধীন, এবং এই অস্বাভাবিকতার পরিহারও সেই নিয়ম অনুসারেই হইয়া থাকে। মনুষ্য সমাজ মাত্রেই শ্রেণী বিভাগ থাকিবে; সভ্যতার উন্নতি অবনতি অনুসারে সেই শ্রেণীবিভাগের ধারা বিভিন্ন হইবে। কিন্তু যদি নিয়ম করিয়া এই ধারার পরিবর্ত্তন হইতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমাজের জীবনীভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইবেই যাইবে। লোক বিশেষে, স্থান বিশেষে, এক ধারা অল্প দিন বা অধিক দিন চলিতে পারে, কিন্তু চিরকাল কখনই চলিতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীলতা জগতের নিয়ম। এ নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে অবশেষে কখনই অশুভ ভিন্ন শুভ হইতে পারে না।

স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিলাতে অল্প দিন হইল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখনও কেম্ব্রিজে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ও উপাধি লাভের অধিকার পান নাই। গার্টন (Girton) ও নিউনহাম (Newnham) এর ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হন, কিন্তু তাঁহাদের পরীক্ষার ফলের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই সম্পর্ক নাই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু অনেক দিন হইল স্ত্রীলোকদিগকে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, উচ্চশিক্ষা, সুধু বিশ্ববিদ্যালয়গত নহে। প্রত্যেক ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা হইবেন, এ প্রথা অনেক দিন হইতে রহিয়াছে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত লোকের বালিকারা ১৬।১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে

থাকেন। সেখানে, সঙ্গীত, চিত্র, ফরাসিভাষা, কিঞ্চিৎ ভূগোল ইতিহাস ও গণিত, হয়ত একটু লাটিন গ্রীক শিক্ষা হয়। স্কুলের বালিকারা ভোজ কি নৃত্যে (Ball) নিমন্ত্রিত হন না। স্কুল ছাড়িয়া তবে প্রথম সমাজে প্রবেশাধিকার পান। অনেকেই জানেন, সেই ঘটনা জানাইবার জন্য, তাঁহাদের পিতা মাতা অনেক সময়ে বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। তাহার পর সাংসারিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। যদি তখন সময় থাকে, শিক্ষায় আস্থা থাকে, তাহা হইলে পুস্তকগত শিক্ষাও চলিতে থাকে। পুস্তকগত শিক্ষা অপেক্ষা, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার উপর বালিকাদিগের লক্ষ্য অধিক এবং সাধারণ মতে ইহাই বাঞ্ছনীয়। সমস্ত গৃহকার্য্যে কর্তৃত্ব করা; জিনিষপত্র ক্রয় করা, গৃহটীকে দেবালয়ের মত সজ্জিত ও পরিষ্কার রাখা, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, তাঁহাদিগকে আহ্বান ও অভ্যর্থনা করা, গৃহকর্ত্রীর বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে; এ সকল বিষয়ে তাঁহার বয়স্কা কন্যাগণ তাঁহার সাহায্য করেন ও তাঁহা হইতে শিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজ ভদ্রলোকের ও অনেক সামান্য লোকের গৃহ দেখিলে, সেখানে লক্ষ্মী বিরাজমান বলিয়া বোধ হয়। সেখানে প্রবেশ করিয়া গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার কন্যাগণের শিষ্টাচার ও সাদর সম্ভাষণে মন উন্নত হয়, তাঁহাদের সঙ্গীতে ও সদালাপে মনের বিকার দূর হয়, ও মনে প্রফুল্লতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই চিত্রের অপর দিকও আছে। মিষ্টতাদির সহিত কখনও কখনও কপটতা ও অস্বাভাবিকতা জড়িত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার জন্য মনুষ্যের স্বাভাবিক অপকৃষ্টতাই অধিক দায়ী। অনেক সময়ে বালিকাদিগের জ্ঞানচর্চ্চার অত্যল্পতা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বেশ ভূষার আলাপেই অনেক সময় ব্যয় করেন, কিন্তু তাহা অনেকের কর্ণে বৈজ্ঞানিক আলাপ অপেক্ষা অনেক সুমধুর বোধ হয়। জীবনের মাধুরী ও সৌন্দর্য্য বিকাশে সাহায্য করাই স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ কার্য্য।

ইংরাজ সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীলোকের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, স্বামীর সমকক্ষা, অধীন নন, ইহাই ইংরাজ সমাজের মূলমন্ত্র। পরস্ত্রী, পরকন্যাকে, ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, ইহাই এই সমাজনীতির লক্ষণ। সকল সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রী ও স্বামী পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষায় মাতারই কর্ত্তব্য অধিক; মাতার স্নেহ, মাতার সুমধুরতা, অনেক কার্য্য করে। কিন্তু মাতার শিক্ষকতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভদ্রবংশীয় ইংরাজ বালকবালিকাগণ জন্মাবধি সদাচার, সততা শিক্ষা করে। কে না জানেন, বাল্যকালের শিক্ষাই চরিত্রগঠনে বিশেষ কার্য্য করে? স্ত্রীস্বাধীনতার ফল যেমন পরিবারের মধ্যে, তেমনি সামাজিক ব্যবহারেও লক্ষিত হয়। পরস্ত্রী, পরকন্যার সহিত বাল্যকাল হইতে সরলভাবে, বন্ধুভাবে আলাপ করিতে না শিখিলে "পরস্ত্রী মাতৃবৎ" বচনটী বাক্যগত হইয়া দাঁড়ায়। বালকবালিকার, পুরুষ স্ত্রীর যে পবিত্র স্বর্গীয় সম্বন্ধ, তাহার পরিবর্ত্তে এক অস্বাভাবিক ভাব ও কৃত্রিম ব্যবহার প্রবর্ত্তন, যে অবনতিসূচক, ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। মনুষ্য চরিত্রে অপকৃষ্টতা অনেক; কিন্তু তাহা বলিয়া সেই চরিত্রে অবিশ্বাস, উহার অপকৃষ্টতা দূরীকরণে সহযোগী হইতে পারে না। তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে বিশ্বাস করিয়া এই উন্নতি সাধনার্থ স্বাভাবিক নীতি অবলম্বন করাই বিজ্ঞানসম্মত। ইংরাজ সমাজে এই নীতি প্রবর্ত্তিত; কেবলমাত্র তাহার কুফলের দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অতি ভ্রান্ত বিশ্বাসে উপনীত হইতে হইবে। এই নীতির গুণে অনেক বালিকাই অকালপক্কতা হইতে রক্ষিত হন।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ স্বীয় সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের নিকট বিনয় শিক্ষা করিয়া, মনুষ্যত্ব লাভ করেন। স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষের পদমর্য্যাদা নাই। ডিউক হইতে সাধারণ ভদ্রলোক পর্য্যন্ত সকলকেই, ভদ্রমহিলামাত্রেরই অনুগামী হইতে হইবে। 'ইংরাজী-ভদ্রতা' এই প্রণালী হইতেই তাহার মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে সঙ্গীতের চর্চ্চা বিষয়ে বিষম কুসংস্কার ছিল। তাহার কারণ আর কাহারও অবিদিত নাই। স্বর্গীয় বস্তু কারণবিশেষে কলুষিত হইয়াছিল; এখন সে কলুষ কতক অপনোদিত হইতেছে; কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যিনি পবিত্র রমণীর মুখে সঙ্গীত শ্রবণ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই স্বর্গীয় ভাব এখনও অস্ফুট রহিয়াছে। ইংরাজ সমাজ সঙ্গীতের এই মোহিনী শক্তিতে, সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা হৃদয়বান্ লোক মাত্রেই যে স্বীকার করিবেন, তাহা স্পর্দ্ধার সহিত বলা যাইতে পারে।

"জিজ্ঞাসা"র উত্তর।

বিগত মার্চ্চ মাসের "দাসী"তে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—হরিদাস ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ কি?—জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—হরিদাস ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন। স্বমত পরিপোষণার্থ তিনি নিম্নোক্ত প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১। "জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে॥ * * * উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে। কুলে তারে কি করিবে নরকেতে মজে॥ এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে। জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥"

২। "জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্ত্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে॥ যে তে কুলে কেনে বৈষ্ণবের জন্ম নহে। তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥ এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস। ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥"—চৈতন্যভাগবত।

তৃতীয়তঃ, কাজি হরিদাসকে বিচারার্থ আহ্বান ও পুনর্ব্বার মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে হরিদাস বলিয়াছিলেনঃ—

"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর। নামমাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে। পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥ * * * হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ। আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥ হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই ধর্ম্ম। আপনে যে মৈল, তারে মারিয়া কি কর্ম্ম॥"—চৈঃ ভাঃ।

অঘোর বাবু বলেন—"হরিদাস যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিতেন, তাহা হইলে মুলুকপতিকে স্পষ্টতঃ বলিতে পারিতেন যে হরিনাম কীর্ত্তন করাই আমার কুলধর্ম্ম, আমি মুসলমান গৃহে কিছুদিন প্রতিপালিত হইয়াছিলাম মাত্র, অতএব আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও না।" তাঁহার আর একটী 'অকাট্ট যুক্তি' এই যে, হরিদাস যবন কুলোদ্ভব না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে, আপনাকে "হীন জাতি জন্ম মোর" ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় দিতেন না। এখন, দেখিতে হইবে, বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের লিখন ভঙ্গী কিরূপ; তাঁহাদের অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিলে গোলে পড়িবার সম্ভাবনা। দেখিয়াছি—তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন লেখক সম্প্রতি প্রচার করিতেছেন, রূপসনাতন যবন ছিলেন; আর সনাতন শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! অথচ 'বৈষ্ণব ইতিহাসে অভিজ্ঞ' বলিয়া যে সকল অভিমানী লেখক দম্ভ করিয়া থাকেন, বৈষ্ণব ইতিহাসের এ ঘোর অবমাননা অবলীলা-

ক্রমে তাঁহারা সন্দর্শন করিলেন, একটী কথা বলিতে অবসর পাইলেন না, আশ্চর্য্য কথা।

১। সে যা'ক, হরিদাস হিন্দু ছিলেন, একথা ভাবিবার কএকটী সূক্ষ্ম হেতু প্রদর্শিত হইয়া থাকে। "সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ, প্রচুর অর্থলোভেও ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তখন ম্লেচ্ছের সংস্পর্শে আসিতেন না।" (ভক্ত-চরিতামৃত)। সেই সময়েই আবার ফুলিয়ার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতেন, প্রত্যহ একবার তৎসহ সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। কেহ বলিতে পারে—হরিদাস মূলে যবন ছিলেন না বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ সেই হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের কালেই হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতে ভয় করিতেন না।

২। অদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে "শ্রাদ্ধপাত্র" ভোজন করাইয়াছিলেন। (চরিতামৃত)। একমাত্র বেদজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণই "শ্রাদ্ধপাত্র" ভোজনের অধিকারী। সত্য বটে—পরম-ভক্তিপরায়ণ বলিয়াই হরিদাসকে "শ্রাদ্ধপাত্র" দেওয়া হয়, কিন্তু সমাজের সাধারণ লোক আর ভক্তির অনুরোধে কিছু সামাজিকতা ত্যাগ করে না,—বিশেষ সে ভক্তিশূন্য কালে। সত্য বটে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, জাতিভেদ প্রায় রহিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল বৈষ্ণব সমাজে। অন্যথা—নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের পূর্ব্বে "গাঁই গোত্র" উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উপবীত ধারণ করিতে হইত না। অদ্বৈত প্রভু যখন হরিদাসকে ব্রাহ্মণযোগ্য ঈদৃশ সম্মান করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ দিগম্বর শিশু মাত্র। তবে সে সময়ে অদ্বৈতের এ সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্যের—এ অসম সাহসের মূলে অন্য কিছু যে ছিল না, তাহার প্রমাণ কি? কেহ বলিতে পারে—জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ সন্তান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ব্রাহ্মণযোগ্য সদাচার ও নিষ্ঠাদি ছিল, তিনি হিন্দুসমাজে একপ্রকার পরিগৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়া "শ্রাদ্ধপাত্র" দেওয়ায় হিন্দুগণ আপত্তি করেন নাই।

৩। কুলীন গ্রামের সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু সন্ন্যাসের পর (দক্ষিণ ভ্রমণ কালে) মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হন, তাহার বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ চৈতন্যের ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে, হরিদাস কুলীন গ্রামের একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদ্বয়কে শিষ্য করেন।

"তার উপশাখা আর কুলীন গ্রামীজন। সত্যরাজ রামানন্দ তার কৃপার ভাজন॥"চরিতামৃত।

কেহ বলিতে পারে—ব্রাহ্মণসন্তান না হইলে কুলীনগ্রামী হরিদাসের এরূপ বাধ্য হইতেন না। কাজিকৃত প্রহারে হরিদাসের 'মৃত্যু (সমাধি) ও তাঁহার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি'কে (কর্ণপূরকৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয়) হিন্দুসমাজ তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত গণ্য করিয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি সমাজে একপ্রকার গৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সেই হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের কালেও কুলীনগ্রামী হরিদাসের অনুগত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পূর্ব্বে শূদ্রের কাছেই শিষ্য হইবার প্রথা ছিল না, তখনও হিন্দুসমাজ-গ্রন্থি শিথিল হয় নাই। সে সময়ে একটী খাঁটি যবনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিতে কুলীনগ্রামী সাহস করিতেন, বোধ হয় না।

৪। হরিদাস যখন গৃহত্যাগ করিয়া বেণাপোলের জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের অন্ন গ্রহণ করিতেন না; পরেও না। কেন?

"রাত্রে দিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন। ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥"—চৈঃ চঃ।

এ সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত এই যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, যখন তিনি প্রতিপালকের গৃহত্যাগে স্বাধীন হইলেন, হিন্দুসমাজের সহিত সংশ্রব রাখিতে সেই কারণে তিনি যত্ন করিতেন, সেই কারণে তখন ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্ন গ্রহণ করিতেন না। যদি হরিদাস সম্বন্ধে পরম্পরাপ্রচলিত প্রাচীন কোন জনশ্রুতি থাকে, আর যাঁহারা সে সংবাদ অধিকতররূপে রাখিবার সম্ভব, তাঁহাদের মত এইরূপ।

৫। কাজি হরিদাসকে যখন মুসলমান ধর্ম্ম পুনঃগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, আর উত্তরে হরিদাস যাহা বলেন,—উদ্ধৃত হইয়াছে। অঘোর বাবু বলেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ হইলে কাজিকে উত্তর দিতেন, হরিনাম করাই তাহার কুলধর্ম্ম ইত্যাদি। কিন্তু,

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ। আপন ইচ্ছায় হয় আসিয়া যবন॥" ইত্যাদি

লিখার ভঙ্গীতে কি তাহাই বুঝাইতেছে না? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ধৃত পয়ারে "ব্রাহ্মণ" শব্দ থাকায় তাহাই নির্দ্দেশিত হইতেছে। বিশেষত্ব বোধক "ব্রাহ্মণ" শব্দ দিবার অভিপ্রায় তাহাই। "আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি কর্ম্ম।" এই পদে হরিদাসের মনের কি অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে? "আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও না" এই ভাব কি প্রকাশ পাইতেছে না? যদি তাই হয়, তবে অঘোর বাবুর কথাই হইল।

৬। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে উচ্চ নীচাদি কুলভেদ আছে, তাহাতেই বৃন্দাবনের "সগৌড়িয়া বিপ্র" মহাপ্রভুর কাছে হীনকুলোৎপন্ন বলিয়া স্বীয় পরিচয় দেন। হরিদাসের পিতা, ব্রাহ্মণের উচ্চ কি নীচ শ্রেণীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কে বলিবে? বিশেষতঃ হরিদাস যবনপালিত হওয়ায় নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিবেন, আশ্চর্য্য নহে। এবং এইরূপ যবনসংশৃষ্ট হরিদাসকে "যবন হরিদাস" "হীনজাতি" প্রভৃতি বলা অসঙ্গত হয় নাই। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবহার বৈষ্ণবগ্রন্থে অপরাপর স্থলেও দৃষ্ট হয়।

যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে :—

"নীচ শূদ্র দ্বারে করে ভক্তির প্রকাশ। ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহায় রায় করি বক্তা। আপনে প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥ হরিদাস দ্বারায় নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ। সনাতন দ্বারায় ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস॥" ইত্যাদি।

এ স্থলে শূদ্র একমাত্র রামরায় এবং নীচ হরিদাস ও সনাতনের প্রতি প্রযুজ্য হইয়াছে। কিন্তু সনাতন মহাবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ সন্তান।

৭। "মর্য্যাদা রক্ষণ এই সাধুর ভূষণ।" হরিদাস ও সনাতন এই মর্য্যাদা রক্ষার্থ নীলাচলের মন্দির সন্নিকটে যাইতেন না।

অঘোর বাবুর 'অকাট্যযুক্তি' এই যে, হরিদাস নিজ মুখে বলিয়াছেন :—

"হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর। হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর॥"—চৈঃ চঃ।

তিনি ব্রাহ্মণ পুত্র হইলে মহাপ্রভুর কাছে এ কথা কখনই বলিতেন না। কিন্তু চরিতামৃতে দেখি যে, ব্রাহ্মণ সন্তান সনাতনও এইরূপ হীনজাতি বলিয়া মহাপ্রভুর কাছে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।

সনাতনের উক্তি যথা চরিতামৃতে :—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥"

নীচ সঙ্গী অর্থাৎ মুসলমানের সঙ্গী; কেননা সনাতন সৈয়দ হুসেন সার মন্ত্রী ছিলেন। আবার জগাই মাধাইয়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর। নীচ সেবা না করে নহে নীচের কুর্প্পর॥"—চৈঃ চঃ।

এখন, "ব্রাহ্মণ জাতি তারা" ইত্যাদি বলিয়া সনাতন জগাই মাধাইয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন। তবে কি সনাতন ব্রাহ্মণ সন্তান নহেন? যাঁহারা আপনাদিগকে 'তৃণাদপিনীচ' মনে করিতেন, যবন সংশ্রবে থাকিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে পতিত মনে করিতেন, নিজ মুখে তাঁহাদের এইরূপ আত্মপরিচয়ই সঙ্গত। তাই বলিয়াই কি তাঁহাদের কথা,—তাঁহাদের দৈন্য-বাক্য, অর্থান্তরে বিবেচিত হইবে? তাই বলিয়াই কি ব্রাহ্মণসন্তানের যবনত্ব প্রতিপাদিত হইবে?

৮। অঘোর বাবু বলেন—হরিদাস ব্রাহ্মণসন্তান হইলে সে "বৃত্তান্ত বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে অবশ্যই উল্লেখ করিতেন।" অবশ্য উল্লেখ করিতেন, তাহা বলা যায় না। কেননা. এতদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ও বৃন্দাবন দাস বর্ণন করেন নাই। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ মালা জপ করিতেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারের অবশ্য বর্ণিতব্য এই বিষয়টীর উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে নাই। হরিদাসের মহিমা প্রকাশক বারবনিতার বিবরণ বৃন্দাবন দাস বলেন নাই; আরও অনেক কথা বলেন নাই। অতএব তিনি ব্রাহ্মণসন্তান হইলেই সে কথা অবশ্য বিবর্ণিত থাকিত, বলা যায় না। হরিদাসের জন্ম বিবরণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র বলিবার চেষ্টা বৃন্দাবন দাস করেন নাই। যে দুই এক স্থানে হরিদাসকে যবন বা নীচ বলা গিয়াছে, তাহা ভজন ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ। তাহার মূল্য অধিক নহে। তাহা একমাত্র হরিদাসের প্রতি প্রযুজ্য, এ কথা কি অঘোর বাবু বলেন?

যথা—জাতি কুলে ইত্যাদি।

যথা—যেতে কুলে ইত্যাদি।

অঘোর বাবু টীকায় প্রেমদাসের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চৈতন্য ভাগবতের প্রতিধ্বনি মাত্র। তাহার আর পৃথক উত্তর দেওয়ার আবশ্যক দেখিতেছি না।

৯। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের বর্ণনার একটী ক্রম দৃষ্ট হয়। প্রধান প্রধান বৈষ্ণব গ্রন্থকার কেহই পূর্ব্ববর্ণিত বিষয় পুনঃ বর্ণন করেন নাই। তবে পূর্ব্ব গ্রন্থকারের বর্ণনাবশিষ্ট পরিপুষ্ট করিতে যথেষ্ট যত্ন করিতেন, পূর্ব্ব গ্রন্থকারের অপূর্ণ বর্ণনা পূর্ণ করিতেন। এই জন্যই চৈতন্য ভাগবতে যে চরিত্রের যে অংশ বর্ণিত হয় নাই, কৃষ্ণদাস তাহা লিখিয়াছেন। চরিতামৃতে যাহা লিখেন নাই, ভক্তিরত্নাকরাদিতে তাহা পাওয়া যায়। এই ক্রমানুসারে চৈতন্য সঙ্গীতা গ্রন্থে বহুতর অভিনব কাহিনী বর্ণিত আছে। সেই অভিনব কাহিনী সকলের মধ্যে হরিদাসের বাল্যবিবরণ একটী। তাহা এই:—

"প্রভুর প্রধান ভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস। শুন সবে যেই রূপে তাহান প্রকাশ॥ সুমতি নামেতে দ্বিজ হরিপরায়ণ। গৌরী নামে নারী তার সতীতে গণন॥ হরিনামে ব্রহ্ম এই করিয়াছে সার। কত দিনে এক পুত্র হইল তাহার॥ নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিল পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস॥ আয়ুশেষে কৈল দ্বিজ স্বর্গে গমন। গৌরীদেবী পতিসহ সহগামী হন॥ * * * * * * ছয় মাসের পুত্র রাখি যবন আলয়। যবন আপন পুত্র সমান পালয়॥" ইত্যাদি।

১০। অঘোর বাবুর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর যথাযথ লিখিত হইল।

বিষয়টী ভিত্তিবিহীন জনশ্রুতি মাত্র বা আমার মনঃকল্পিত নহে; এখন মানা না মানা হৃদ্‌গত বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

হরিদাস যবন-সন্তান হইলে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা আছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান সাধু হইলে আর বিশেষ কি? তাহার তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যবন বৈষ্ণব হইলে হিন্দুর, বৈষ্ণব ধর্ম্মের গৌরব আছে। গৌরব আছে বলিয়া এক দেশ দর্শন করা 'সুবুদ্ধির পরিচায়ক' নহে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব। ঋগ্বেদকেই অনেকে প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, স্থির করা সহজ নয়। হার্ গিঞ্জেল (Herr Ginzel) নামক একজন জর্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ্ পুরাকালের গ্রহণসমূহের কালনির্ণয় করিতেছেন। ঋগ্বেদে চারিবার গ্রহণের উল্লেখ আছে। সুতরাং তিনি উহার রচনাকাল নির্ণয় করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। সকলেই জানেন আর্য্য ঋষিগণ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে পঞ্জাব অঞ্চলেই আগমন ও বাস করেন। সুতরাং বহু পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বৎসরে উক্ত প্রদেশে গ্রহণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। অব্‌-জার্ভেটরী (Observatory) পত্রিকা বলেন, গিঞ্জেল সাহেব স্থির করিয়াছেন, যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৫০ হইতে ১৩৮৬ অব্দের মধ্যে লাহোরে তিনটি বৃহৎ সূর্য্যগ্রহণ লক্ষিত হইয়া থাকিবার কথা; এবং এই গ্রহণত্রয় ঋগ্বেদোল্লিখিত গ্রহণ গুলির সহিত অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই তিনটির প্রথমটি ১৩৮৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ২৮শে নবেম্বরের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, দ্বিতীয়টি ১৩০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ৪ঠা নবেম্বরের প্রায় মধ্যাহ্নে, এবং তৃতীয়টি ১২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ লক্ষিত হইয়াছিল। চতুর্থটির তারিখ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

সর্পের সর্পভক্ষণ। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের কোন কোন কাগজে একটা খবর বাহির হয় যে, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা বৃহৎ বোড়া সাপ আর একটা বড় বোড়া সাপকে গিলিয়া ফেলিয়াছে।

ঘটনাটা কিন্তু ঘটিয়াছিল লণ্ডনের চিড়িয়াখানায়। সুতরাং, আমরা আলিপুরের জীবনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়কে খবরটা ঠিক্ কি না, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "হইতে পারে, কিন্তু আমি জানি না।" এই উত্তর পাইয়া অনেক সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একটা পুরাতন গল্প মনে পড়িল। এক ব্যক্তি নিজের একজন বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "কিহে, আমি যে শুনেছিলাম যে তুমি মারা প'ড়েছ।" বন্ধু বলিলেন, "কই না ; এই তো তোমার সম্মুখেই রয়েছি।" প্রথম বক্তা বলিলেন, "না না, তুমি নিশ্চয়ই মারা প'ড়েছে ; আমি খুব বিশ্বস্ত লোকের কাছে শুনেছি ; তিনি তো মিথ্যা কথা বল্‌বার লোক নন।" সে যাহাই হউক, লণ্ডন জীবনিবাসের এই ঘটনা ১৮৯৪ সালের ২৬এ অক্টোবরের টাইম্‌স্ কাগজে বাহির হইবার পর আর্থার ই. ভিনী নামক একজন সাহেব দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপ কলোনি হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি টাইম্‌স্ কাগজে লিখিয়া পাঠান। "এই অঞ্চলে সম্প্রতি একটা বড় কাল সাপ মারিয়া ফেলা হয়। ইহার দৈর্ঘ্যের তুলনায় শরীরটা বেশী মোটা বোধ হওয়ায় পেট চিরিয়া ফেলা হয়। তাহাতে দেখা গেল, ইহার ভিতর প্রায় ইহার সমান লম্বা একটা হরিদ্রাবর্ণ সাপ রহিয়াছে। হরিদ্রাবর্ণ সর্পের ভিতর আবার একটা বড় কাল সাপ ছিল ; এবং এই শেষোক্ত কৃষ্ণ সর্পের উদরে ৩০ টা ডিম ছিল। প্রত্যেক ডিম্বের ভিতর এক একটা ছানা ছিল। এই উদররূপ সমাধিতে থাকায় তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একটা সাপের ভিতর সর্ব্বশুদ্ধ বত্রিশটা সাপ ছিল।"

নস্যভোজন। সর্ব্বদেশেই নাসারন্ধ্রের ভিতর নস্য প্রয়োগের রীতি আছে বলিয়াই জানিতাম ; কিন্তু মাডাগাস্কার দ্বীপের লোকেরা এ বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। তাহারা অপরের অনুকরণ না করিয়া "মৌলিকত্ব" দেখাইয়াছে। তাহারা মুখবিবরে নস্য গ্রহণ করে!

অপরাধ-প্রবণতা। আমাদের দেশে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ কয়েদীর সংখ্যা অনেক অধিক। অনেকে মনে করিতে পারেন, নারী-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা ইহার কারণ নয়, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অপরাধে লিপ্ত হইবার সুযোগ পায় না বলিয়াই স্ত্রী অপরাধীর সংখ্যা এত কম। কিন্তু হঠাৎ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা

স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র গতিবিধি করে এবং নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও তো পুরুষের তুলনায় অল্প স্ত্রীলোকেই অপরাধিনী বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। অনেকে বলিবেন, আমাদের দেশে অবরোধ প্রথা থাকায় স্ত্রীলোকেরা অপরাধিনী হয় না। অতএব যে সকল দেশে অবরোধ প্রথার লেশমাত্র নাই, তথাকার অবস্থা কিরূপ দেখা যাক্। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরী হইতে প্রকাশিত International Journal of Ethics নামক সুবিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। লেখক বিলাতের কথা বলিতেছেন। "অপরাধপ্রবণতার সহিত লিঙ্গভেদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। আমাদের কারাগারসমূহে ২১ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ১০০ জন অপরাধীর মধ্যে ৮৪ জন পুরুষ, ১৬ জন মাত্র স্ত্রীলোক। চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয়-সমূহে (Reformatory Schools) ১০০ জনের মধ্যে ৮৫ জন বালক ১৫ জন বালিকা। এইরূপ সর্ব্বত্রই বালক অপরাধীর সংখ্যা বালিকাদের অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী। [অতঃপর লেখক অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগেরই সংখ্যার উল্লেখের কারণ বলিতেছেন।] অনেকে বলেন, অপরাধ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার প্রভেদ প্রধানতঃ স্ত্রীলোক এবং পুরুষের সামাজিক কার্য্যবিভাগের বিভিন্নতা হইতে উৎপন্ন। এই কথার মধ্যে যে অনেকটা সত্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যদি সম্পূর্ণরূপে সত্য হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থলে স্ত্রী ও পুরুষ একই অবস্থার মধ্যে কার্য্য করে এবং যে বয়সে তাহাদের মধ্যে জীবন বা অবস্থাগত কোন প্রভেদ জন্মে নাই, সেই সকল স্থলে এবং সেই বয়সে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান অপরাধপ্রবণ হইত। ১৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকবালিকার মধ্যে কার্য্যতঃ অবস্থা, কার্য্য বা সামাজিকজীবনগত কোন প্রভেদই নাই। [মনে রাখিতে হইবে, লেখক বিলাতের কথা বলিতেছেন।] এই বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকাগণ একই ভাবে পালিত ও শিক্ষিত হয়। তাহারা একই প্রকার তত্ত্বাবধায়কতার অধীন থাকে ; তাহাদের সামাজিক জীবন প্রধানতঃ একই প্রকার থাকে। অথচ দেখা যায় যে ১৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের অপরাধী হইবার সম্ভাবনা, তুল্যবয়স্কা বালিকার অপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।" নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষের ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মশার রক্ত শোষণ। অনেকে হয় ত জানেন না যে, মশা যে রক্ত শোষণ করে, তাহা তাহার শরীরের পুষ্টি বা রক্ষার জন্য আবশ্যক নহে। তবে রক্ত যে তাহার কি কাজে লাগে, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। মশা সম্বন্ধে আর একটি কৌতুকজনক তত্ত্ব আছে। পুরুষজাতীয় মশা দংশন বা রক্ত শোষণ করে না। স্ত্রী-মশারাই রক্ত খায়।—আমাদের দেশে কন্যার বিবাহে কম রক্ত শোষিত হয় না! সেটা কিন্তু কন্যার দ্বারা হয় না।

গণিত-শাস্ত্রে বিদুষী নারী। সোফী কোবালেব্‌স্কী রুশীয়াদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুইডেনের অন্তঃপাতী ষ্টক্‌হল্‌ম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ গণিতের অধ্যাপক (অধ্যাপিকা ?) ছিলেন। ইউলার এবং লাগ্রেঞ্জের সহিত তাঁহার নাম গণিতবিষয়ক পুস্তকাদিতে সমান সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকে। অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবন উপন্যাস-সুলভ ঘটনাবৈচিত্রে পূর্ণ। তাঁহার পিতা সেনানী ক্রোকোব্‌স্কী একদিন দ্যূত ক্রীড়ায় এত টাকা হারিয়া আসেন যে, নিজ পত্নীর জড়োয়া অলঙ্কার বন্ধক দিতে বাধ্য হন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই সোফী জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার জীবনের আরম্ভটা ভাল হয় নাই। ইহার উপর তাঁহার মাতা রূপসী ও "ফ্যাশন"-প্রিয়া ছিলেন। কন্যার কোন যত্নই হইত না। সুতরাং তাঁহার জীবনের প্রভাত দেখিলে মধ্যাহ্ন যে ভাল হইবে, এরূপ মনে না হইবারই কথা। ক্রোকোব্‌স্কী পরিবার খুব সম্ভ্রান্ত অভিজাত-বর্গের অন্তর্গত ছিল। তাহারা হঙ্গেরীর রাজা ম্যাথিয়স্‌ কর্ভিনসের বংশোদ্ভূত বলিয়া বংশগৌরবে গর্ব্বিত ছিল। সেনানী ক্রোকোব্‌স্কী পালিবনো নামক একটি সুদূর পল্লীগ্রামে জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিবার জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া তথায় বাস করিতে গিয়াছিলেন। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে দিগন্তব্যাপী সমতলক্ষেত্র ও গভীর অরণ্য ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও জনকোলাহল হইতে ইহা এতই দূরে ছিল যে, এখানে সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র চিঠি লইয়া ডাকহরকরা আসিত। সুতরাং ক্রোকোব্‌স্কী মনে করিলেন, এখানে তাঁহার সন্তানগণ—এক পুত্র ও দুই কন্যা—সামাজিকবিপ্লব-সংসাধক নূতন নূতন মতের প্রভাব হইতে অতিদূরে নিরাপদে থাকিবে। কিন্তু সেনাপতি মহাশয় তাঁহার কন্যাদ্বয়কে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রুশীয়ার রাজধানী সেণ্টপীটার্সবর্গে লইয়া গেলেন। তথায় "সোনিয়া" (সোফীর আর একটি নাম) গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা

দেখাইতে লাগিল। ইহাদের পরিবারের একজন বন্ধু সেনাপতিকে তাঁহার কন্যার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সোফীর পিতা তাহার উন্নতিতে ভীত হইলেন, এবং শিক্ষার জন্য কন্যাকে বিদেশে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহাতে কিন্তু কন্যাদ্বয় নিরস্ত হইল না। তাহাদের "ঈনা" নাম্নী এক সখি ছিল, তাহারও অবস্থা তাহাদেরই মত। তাহারা ঈনার সহিত পরামর্শ করিয়া এক বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহারা স্থির করিল, একটা "জাল" বা "কাল্পনিক" বিবাহ করিবে; তাহা হইলেই তাহারা স্বাধীন হইতে পারিবে। অর্থাৎ তাহাদিগকে পিতার অধীন থাকিতে হইবে না, অথচ প্রকৃত বিবাহে যেরূপ স্বামীর অধীন হইতে হয়, তাহাও হইবে না। তাহারা প্রথমে একজন যুবা অধ্যাপককে এই অদ্ভুত বিবাহাভিনয়ের নায়কত্ব গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইল না। তাহার পর বয়োজ্যেষ্ঠা দুইটী যুবতী ব্লাডিমির কোবালেব্‌স্কী নামক এক ছাত্রের নিকট পূর্ব্বোক্ত "কাল্পনিক" বিবাহের প্রস্তাব করিল। ছাত্র এই সর্ত্তে প্রস্তাবে সম্মত হইল যে সে সোফীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে কিম্বা ঈনাকে "কাল্পনিক" পত্নীরূপে গ্রহণ না করিয়া "সোফী"কেই মনোনয়ন করিতে পাইবে। অতঃপর সোফী প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া পিতার নিকট বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিল। পিতা অবশ্য রোষের সহিত নিজের সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সোফী স্বাধীনতার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অনেকগুলি উপন্যাসও পড়িয়াছিল। সে জোর করিয়া পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার অনুমতি আদায় করিল। যুবা ছাত্র ব্লাডিমির কোবালেব্‌স্কী ও সোফীর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিবাহ হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা অধ্যয়নার্থ জার্ম্মেনী যাত্রা করিলেন। তাহার পর হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের বিচিত্র জীবনের সূত্রপাত হইল। "স্বামী" ভূতত্ত্ব (Geology) এবং "পত্নী" গণিতের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সোফী কোবালেব্‌স্কীর অসাধারণ প্রতিভার কথা অধ্যাপক মহলে আলোচিত হইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীর কার্য্যবিভাগের এস্থলে বৈপরীত্য ঘটিল। সোফী তপশ্চর্য্যার মত একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সহিত গণিত চর্চ্চা করিতেন। ব্লাডিমির বাজার করিতেন, এমন কি দরজির সহিত সোফীর পরিচ্ছদ কিরূপ হইবে, তাহাও আলোচনা করিয়া স্থির করিতেন। শেষোক্ত কাজটা যে কত কঠিন, তাহা একমাত্র

সাটীপরিহিতা বঙ্গনারীগণ বা তাঁহাদের সম্পর্কীয় পুরুষেরা বুঝিবেন না। তাঁহাদের সঙ্গে আর একটি ছাত্রী বাস করিতেন। তিনি ইহাদের একটি বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সোফী ও ব্লাডিমিরের মধ্যে, লোকে প্রেম বলিলে যে একটা জঘন্য মানসিক ব্যাধি বুঝে, তাহা ছিল না; তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অতি গভীর আধ্যাত্মিক প্রীতি ছিল।

সোফীর ভগিনী কিছুকাল পরে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, যে কালক্রমে সোফী তাঁহার স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অকৃত্রিম অনুরাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। দাম্পত্য-প্রেমের অভিনয় করিতে গিয়া সোফী সত্য সত্যই ব্লাডিমিরকে প্রাণ মন সঁপিয়া দিয়াছেন। প্রেম লইয়া খেলা আর আগুন লইয়া খেলা, একই কথা। স্বামীর কিন্তু "বিবাহ" নাটকের এই নূতন অঙ্ক ভাল লাগিল না। বিদ্যাদেবীই এখনও তাঁহার হৃদয়েশ্বরী ছিলেন। তিনি হাইডেলবর্গে সোফীকে ফেলিয়া অধ্যয়নার্থ জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। সোফী প্রোষিতভর্তৃকা অবস্থায় পতির অবহেলার পাত্রী হইয়া হাইডেলবর্গে মনোদুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া তিনি এখন এরূপ অনুরাগের সহিত গণিতের উচ্চাঙ্গ সকলের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার তাৎকালিক অনুশীলনই তাঁহার ভবিষ্যৎ যশোমন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রেমের অভিনয়ের শেষ কয়েকটী অঙ্ক অভিনীত হইতে এখনও বাকী ছিল। এক্ষণে তাঁহার স্বামীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। উভয়ে কিছুকাল পারিস সহরে অন্যান্য দম্পতির মত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়েই সোফীর একমাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দম্পতির পুনর্মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এরূপ একঘেয়ে উত্তেজনাবিহীন জীবন সোফীর ভাল লাগিল না, তিনি জার্ম্মেনীতে ফিরিয়া গেলেন; এবং অবশেষে ব্লাডিমির কোবালেবস্কী উন্মাদগ্রস্ত হইয়া তাঁহারই নামধারিণী নারী হইতে দূরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি ষ্টক্‌হল্‌ম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তথাকার গণিতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৮৮ সালে তিনি ফরাশীশ বিজ্ঞান পরিষদের (French Academy of Sciences) সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এখন তাঁহার সম্মানের আর সীমা রহিল না। তিনি যখন ভ্রমণ করিতেন, তখন রাজ্ঞীর মত সমাদর ও সম্মান পাইতেন। কিন্তু ইহাতেও

সোফী সুখী হইলেন না। তিনি প্রেমের অভাবে জীবন্মৃতা ছিলেন। এই প্রেমপিপাসাই পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চস্থানীয় এই বৈজ্ঞানিক জীবনের অকাল পরিসমাপ্তির কারণ হইয়াছিল।

১৮৮৮ অব্দের প্রারম্ভে বিবি সোফী কোবালেবস্কী "ক—" নামক এক রুশীয় ভদ্র লোকের গভীর প্রেমে নিমগ্ন হন। "ক—" প্রথম প্রথম সোফীর বুদ্ধি বিদ্যারই উপাসক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; তাঁহার নারী-সুলভ রূপ গুণে আকৃষ্ট হন নাই। সোফী প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে এই বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যে তিনি বাস্তবিকই কেবল নারী মাত্র, আর কিছু নহেন। যদি তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, নারী বলিয়াই বাসিতে হইবে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য নয়। পরিশেষে "ক—" র প্রাণে প্রেমের আগুন জ্বলিল। তিনি বলিলেন, "তুমি আর সকল ছাড়িয়া আমার পত্নী হও,—কেবল আমার পত্নী হও।" সোফী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কার্য্য ও বিদ্যানুরাগ এবং প্রেম এই উভয়ের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, পরিশেষে তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। তিনি ষ্টক্‌হল্মে ফিরিয়া গেলেন। হঠাৎ এতই বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহার বন্ধুগণও কষ্টে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। তিনি শোক ও নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইয়া ১৮৯১ অব্দ পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেবল জোনাস্ লাই নামক নরওয়েবাসী ঔপন্যাসিক ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রকৃতি বা দুঃখ বুঝিতে পারেন নাই। লাই বলেন, যেমন একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে যতই সুন্দর জিনিষ দাও না কেন,সে যতক্ষণ তাহার প্রার্থিত কমলালেবুটি না পায়, ততক্ষণ "করুণ নয়নে" হাত বাড়াইয়া থাকে; তেমনি সোফীকে বিধাতা আর সকল সম্পত্তিই দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের পিপাসার বস্তু প্রেম না পাওয়ায় তিনি আজীবন অসুখীই ছিলেন।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন—"প্রেম পুরুষের খেলার জিনিষ, কিন্তু ইহা নারীর জীবন, নারীর সর্ব্বস্ব।"

পরীক্ষা-রহস্য। "কলা ঝলসাইতে লাগিল" ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, "roasted some plantations"; আর একজন লিখিয়াছেন, "roasted some Plantagenets"; অপর একজন লিখিয়াছেন, "roasted some plaintiffs"। কেহ মনে করিবেন না যে ইহা কল্পিত উত্তর। সত্য সত্যই এরূপ উত্তর

পাওয়া গিয়াছে। বধিরতা সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলা হয়। তাহাতে একটি ছাত্র নিম্নলিখিত গল্পটি লিখিয়াছেন।

একটি পরিবার ছিল. তাহার সকলেই কালা। জামাতাও বধির। একদিন জামাতা মাঠে লাঙ্গল দিতেছেন ; এমন সময় একজন কন্‌ষ্টেবল তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, "আমাকে একটা পুকুর দেখাইয়া দিতে পার ? জল খাইব।" জামাতা বাবাজি কালা। কন্‌ষ্টেবলের কথা বুঝিতে না পারিয়া গরু জোড়া ও লাঙ্গল ফেলিয়াই একেবারে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। সেখানে গিয়া "তোর বাবা আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস পাঠাইয়াছিল," শ্বশুরের কন্যা অর্থাৎ পত্নীকে এইবলিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন।

গল্পটি এই পর্য্যন্ত। বোধ হয়, কন্যাটিও কালা বলিয়া স্বামীর কথা শুনিতে ও প্রহারের কারণ বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক গল্পটি বলিয়া ছাত্র মহাশয় এই moral বা নীতি "আকর্ষণ" করিতেছেন,—"Therefore deafness is dangerous" অর্থাৎ বধিরতা বিপজ্জনক ! বিপদ্‌টা কিন্তু বধিরের নয় ; তাহার পত্নীরূপ জীবের !

ইতরপ্রাণীর পরার্থপরতা। অনেকে মনে করেন, মানুষের সমুদয় মানসিক বৃত্তি ও কার্য্য স্বার্থমূলক। প্রেম, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, জনহিতৈষণা,—কিছুই পরার্থমূলক নয়। দুই একজন বড় বড় দার্শনিকও এইরূপ মনে করেন। এই মতের বিরুদ্ধে International Journal of Ethicsএ একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লেখক বিবর্ত্তন বাদের (Evolution) দিক্ দিয়া এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বিবর্ত্তনবাদিগণ বলেন, যেমন মানুষের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অবিকশিত বা অঙ্কুরাবস্থায় ইতরপ্রাণিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মানুষের মানসিক বৃত্তিসমূহও অবিকশিত অবস্থায় ইতরপ্রাণীতে লক্ষিত হয়। ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত ফেব্রুয়ারী মাসের "দাসী"তে দেওয়া হইয়াছে। এই মুখবন্ধ করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, যদি ইতরপ্রাণিগণের মধ্যে পরার্থপরতার সত্তা প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে মানবের প্রেম, বন্ধুত্বাদিও যে পরার্থপরতাপ্রসূত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে না। তৎপরে তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

লবক সাহেব পিপীলিকাগণের জীবন, প্রকৃতি ও ব্যবহার বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। পিপীলিকাগণের হৃদয় সম্বন্ধে তাঁহার মত ভাল নয়। তথাপি তিনি পিপীলিকাগণের পরার্থপরতার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। "হস্ত" বিহীন একটি পিপীলিকা ভিন্ন জাতীয় এক পিপীলিকা কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। এমত অবস্থায় ইহাকে ইহার স্বজাতীয় একটি পিপীলিকা দেখিতে পাইল। সে অতিশয় যত্ন ও মনোযোগের সহিত তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিল : তাহার পর উহাকে নিজেদের বাসায় বহন করিয়া লইয়া গেল। লবক বলেন, "এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার মধ্যে দয়া

বৃত্তির বিদ্যমানতা অস্বীকার করা অসম্ভব।" রোমেঞ্জ্ সাহেব ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বেণ্ট সাহেব বলেন, 'আমি একদিন পিপীলিকাগণের একটি উপনিবেশ দেখিতেছিলাম। তাহাদের একটির উপর আমি একটা ছোট পাথর চাপাইয়া দিলাম। উহার অব্যবহিত পরে যে পিঁপড়াটি ছিল, সে সঙ্গীর এই অবস্থা দেখিয়া পিছাইয়া গেল, এবং অতিশয় উত্তেজিত ভাবে অপর পিপীলিকা সকলকে এই কথা জানাইল। সকলেই বিপন্ন সঙ্গীর উদ্ধারার্থ দৌড়িয়া আসিল। কেহ কেহ কামড়াইয়া পাথরটি সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অপর কয়েক জন এরূপ জোরে কয়েদীটির পা ধরিয়া টানিতে লাগিল যে আমার মনে হইল যে, উহার পা দুখানা বুঝিবা ছিঁড়িয়া আসে। কিন্তু সহচরবর্গের অধ্যবসায়ের প্রভাবে পরিশেষে সে মুক্তিলাভ করিল। ইহার পর আমি কেবল একখানা "হাত" বাহিরে রাখিয়া একটা পিঁপড়ার সর্ব্বাঙ্গ কাদা দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। ইহার সহচরেরা শীঘ্রই তাহা দেখিতে পাইল ; এবং একটু একটু করিয়া দাঁত দিয়া কাদাটুকু সরাইয়া সঙ্গীর উদ্ধার সাধন করিল। আর এক সময় কতকগুলি পিপীলিকাকে পরস্পর হইতে দূরে দূরে সারি বাঁধিয়া যাইতে দেখিয়া, আমি একটাকে সারি হইতে কিছু দূরে লইয়া গিয়া মাথাটি বাহিরে রাখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাদা চাপা দিলাম। তাহার অনেক সহচর কিছু সন্দেহ না করিয়া চলিয়া গেল। পরিশেষে একজন উহার দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়া উহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু না পারিয়া চলিয়া গেল। আমি মনে করিলাম সে নিজ বন্ধুকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম সে জন বারো সহচর লইয়া উপস্থিত হইল, এবং একেবারে কাদাচাপা পিঁপড়াটির নিকট গিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিল। আমার বোধ হয়, ইহার মধ্যে সহজাত সংস্কার (instinct) ব্যতিরেকে আরও কিছু ছিল।'"

পিপীলিকাগণের এরূপ আচরণে কি স্বার্থ ছিল ? কি পুরস্কারের প্রত্যাশা ছিল ? কিন্তু আরও দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। রোমেঞ্জ্ সাহেব বলেন, পারিসের চিড়িয়াখানায় একটি উট পক্ষী পক্ষিণীর মৃত্যু হওয়ায় শোকে প্রাণত্যাগ করে। ইহাতে উট পক্ষীর কি স্বার্থ ছিল ? সেকি পত্নীব্রত স্বামী বা প্রেমিক বলিয়া মৃত্যুর পর যশস্বী হইবে ভাবিয়া এরূপ করিয়াছিল, না, স্বর্গকামনায় এরূপ করিয়াছিল ? দুই একমাস পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরে এবম্বিধ একটি ঘটনা পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে আমার এক বন্ধু থাকেন। তাঁহার বাসায় একটা নারিকেল গাছে চীলের দুইটি বাচ্চা হইয়াছিল। একদিন প্রাতে একটি ছানা মাটিতে পড়িয়া মারা গেল। দুপরে আর একটি গাছ হইতে পড়িয়া মরিয়া গেল। তাহাদের তখনও ডানা হয় নাই। ইহার পর তাহাদের মাতা পাখা গুটাইয়া মাটিতে পড়িল। উচ্চ স্থান হইতে পড়ায় মৃতপ্রায় হইয়া গেল। আমার বন্ধু তাহাকে অনেক যত্ন করিয়া তুলিয়া শুশ্রূষা করায় দুই একদিন পরে চীলটির প্রাণ রক্ষা হয়।

জেম্‌স্ ম্যাক্‌ম্ সাহেব একবার এক জাহাজে ছিলেন। তথায় দুটি বানর ছিল। তাহাদের পরস্পর কোন সম্পর্ক ছিল না। একদিন ছোট বানরটা সমুদ্রে পড়িয়া যায়। ইহা দেখিয়া বড়টা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে এক হাত দিয়া জাহাজের পার্শ্বটা ধরিল

এবং অপর হাত বাড়াইয়া নিজ শরীরে বাঁধা এক গাছি দড়ি ঝুলাইয়া ধরিল। জাহাজস্থ সকলে ইহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। বানরের সাহায্যে তাহার সঙ্গীর জীবন রক্ষা হইত না। কারণ দড়িটা ছোট ছিল। একজন নাবিক জলমগ্ন বানরটাকে রক্ষা করিল। যাহাই হউক, বড় বানরটার চেষ্টা সফল না হইলেও তাহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল।

আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে স্বার্থবাদীদের মতটা পরীক্ষা করিয়া দেখা থাক্। তাঁহারা বলেন, "সকল কার্য্যই স্বার্থপ্রসূত।" যদি দেখান যায় যে কোন কোন কার্য্য স্বার্থপ্রসূত নয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল। বাস্তবিক উল্লিখিত দৃষ্টান্ত গুলিতে ব্যক্তিগত কি স্বার্থ থাকিতে পারে? সন্তান বা স্ত্রীর শোকে মরিয়া ইতরপ্রাণিবিশেষের কি স্বার্থ সিদ্ধ হয়? স্বার্থবাদী বলিবেন. "যাহা আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে আকৃষ্ট করে, মৃত্যু কামনা করায়, তাহা, পার্থিব সুখ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্, অধিক স্থায়ী, অনন্ত সুখের আশা ব্যতীত আর কিছুই নয়।" আচ্ছা! এই মতটা ইতরপ্রাণিগণের সম্বন্ধে খাটে কিনা দেখা যাক্। তাহারা কি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে,—পুরস্কারে, পরকালে বিশ্বাস করে? তাহারা তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করে নাকি? ইহা অতি হাস্যকর যুক্তি।

অভিবাদন প্রথা। আমাদের দেশে প্রণাম বা নমস্কার করিয়া অভিবাদন করিতে হয়। ল্যাপ্ল্যাণ্ড ও নবজীল্যাণ্ডবাসীরা নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া অভিবাদন করে। উত্তর-আমেরিকার আদিমনিবাসীরা কেহবা বক্ষঃস্থলে, কেহবা বাহুতে, কেহবা উদরে থাবড়া মারিয়া অভিবাদন করে। পলিনেসীয়গণ অপরের হস্ত বা পদদ্বারা নিজমুখে আস্তে আস্তে আঘাত করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী লোয়াঙ্গোদেশে হাততালি দিতে দিতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়া ও পিছাইয়া যাওয়াই অভিবাদনের রীতি। আফ্রিকার ডেহমীদেশের লোকেরা আঙ্গুল মটকায়। বাটঙ্গানেরা পিঠের উপর মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উরুদেশে করাঘাত করিতে থাকে। আবিসিনীয়গণ আগন্তুকের করতল ধরিয়া তাহাতে থুথু ফেলার ভাণ করে। পলিনেসিয়া ও মালয়দেশের লোকেরা মান্য ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার সময় উপবেশন করিয়া কথা কয়; চীনেরা টুপি না খুলিয়া টুপি পরিয়া থাকে; মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোনদীর তীরে এবং অন্যত্র সম্মান প্রদর্শন করিতে হইলে মান্য ব্যক্তির দিকে মুখ না ফিরাইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই রীতি। ফিজিদ্বীপে যদি কোন গুরু বা মান্য জন পা পিছ্লাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার

অধস্তন সকলকেও তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হয়। চীন ও শ্যামদেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করাই রীতি। মাডাগাস্কারদ্বীপের অধিবাসী মালাগাসী-দিগের প্রাচীন একটি প্রথা এই যে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট যাইতে হইলে শিশুর মত হামা দিয়া যাইতে হয় এবং তাঁহার পদলেহন করিতে হয়। চীনদেশে প্রণামের আটটি ক্রম, গ্রাম বা মাত্রা আছে। (১) হাত জোড় করিয়া বক্ষের সম্মুখে রাখা; (২) কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক নত করা; (৩) হাঁটু নত করা; (৪) হাঁটুগাড়িয়া বসা; (৫) হাঁটুগাড়িয়া মাটিতে মাথা ঠোকা; (৬) পঞ্চমেরই মত, অধিকন্তু তিনবার গড় করিতে হয়; (৭) ষষ্ঠের দ্বিগুণ; (৮) সপ্তমের দ্বিগুণ। সাহেবেরা সম্মান দেখাইবার জন্য টুপি খুলেন, কিম্বা টুপির প্রান্তদেশ স্পর্শ করেন। অনেক দেশে জুতা খুলাই রীতি। টাহিটীদ্বীপে সম্মান প্রদর্শনার্থ মস্তক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত করিতে হয়। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উগাণ্ডার রাজার দাসীগণকে সম্মান প্রদর্শনার্থ রাজার সম্মুখে সম্পূর্ণ দিগ্বসনা হইতে হয়।

হিন্দু সৎকার সমিতি। অসহায় হিন্দুবংশীয় মৃত ব্যক্তির সৎ-কারার্থ উক্ত নামে একটি সমিতি হারিসন রোডে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য ভাল এবং ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্যানুযায়ী কিছু কিছু কার্য্যও হইয়াছে।

পৃথিবীর সেবক দল।

ধর্ম্ম সংস্কারে বল, সমাজ সংস্কারে বল, আর মানব সমাজের অন্য নানা-বিধ কল্যাণ সাধনেই বল, মানুষ আত্মোৎসর্গ না করিলে কোন কাজে সিদ্ধকাম হইতে পারে না। পাঁচ কাজে ছুটাছুটি করিতেছি, পাঁচ জনকে পাঁচ কাজে জীবনটাকে ভাগ কবিয়া দিয়াছি, সময় নাই, অসময় নাই, কাজের জন্য পাঁচজনেই টানাটানি করিতেছে, কোন্ দিকে যাই, কার সেবা করি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না; এরূপ কার্য্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া যাহাদের জীবনের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে, হা হুতাশ করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে অশ্রুজল মোচন করিতে যাহাদের সমগ্র সময় কাটিয়া যাইতেছে, তাহাদের আত্মনিন্দায় ও পরশ্রীকাতরতায় সেবার সূত্রপাত হয় না। পৃথিবীর এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর দুঃখ দারিদ্র্য সন্দর্শনে যাঁহারা আত্মবিস্মৃত হন, তাঁহারাই সেবকদলের অগ্রণী। নিজের অন্ন

সংস্থান নাই, কিন্তু অপরে খাইতে পাইতেছে না শুনিয়া যাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, তাঁহাদেরই প্রাণধারণ সার্থক, যাঁহারা আপনাদের প্রজ্জলিত জঠরানল বিস্মৃত হইয়া অন্যের ক্ষুধা নিবারণে ব্যস্ত, তাঁহাদের সেই ব্যস্ততার অন্তরালে কি সেই চির অনাহারী উপবাসী বিশ্বপ্রাণ মহাদেব দেবলীলা দেখিতে পাওয়া যায় না? হিন্দুগৃহের অতিথিসেবাপরায়ণ নিষ্ঠাবান লোকদের নিত্য জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। আমরা শৈশবে নিজেরাই স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক নিজের জন্য প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনে অভ্যাগত জনের পরিচর্য্যা করিয়া আহারজনিত তৃপ্তি অপেক্ষা শতগুণে অধিক সুখ অনুভব করিয়াছেন। এরূপও শুনা গিয়াছে যে নিজের ও নিজ পরিবার বর্গের অন্ন সংস্থান নাই, হয়ত সমস্ত দিন উপবাসেই কাটিবে, সেদিকে দৃষ্টি নাই, অতিথি সেবার জন্য বিব্রত ও ব্যস্ত। এখনকার এই ঘোর স্বার্থপরতার দিনে ইহা চিন্তা করিতেও প্রাণে পুণ্যের হাওয়া প্রবাহিত হয়।

আপনার দুঃখে সহজেই চক্ষে জল পড়ে, পরের দুঃখে সহজে কঠোর প্রাণ কোমল হয় না, পরের কাতরতায় শুষ্ক হৃদয়ে সহজে সমবেদনার সরস ভাব প্রকাশ পায় না, হৃদয়ের স্নেহ বিন্দু বিন্দু ক্ষরিয়া নয়ন প্রান্তে দেখা দেয় না। পরের দুঃখে সত্যসত্যই কাতর হওয়া অতি কঠিন কাজ; তবুও যদি কেহ কাঁদে তবে অবশ্যই বলিতে হইবে তাহার হৃদয়ে স্নেহ আছে, তাহার প্রাণে প্রেম আছে, তাহার চক্ষে জল আছে। কিন্তু এসকল ত গেল সাধারণ নিয়ম। পরের জন্য অসাধারণ কান্না কেহ কাঁদিয়াছে কিনা? পৃথিবীতে পরের জন্য প্রাণপাত করিয়া কাঁদিয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক না হইলেও নিতান্ত বিরল নহে। আমেরিকার থিওডোর পার্কার দাসদিগের দাসত্ব ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। একবার এক কাফ্রি রমণীর প্রভুর পীড়নে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার প্রভুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মানসে তিনি বলপূর্ব্বক তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। দাসপ্রভু এই আইনবিরুদ্ধ আচরণে উত্তেজিত হইয়া দলবলসহ পার্কারের গৃহ আক্রমণ করিতে ও কাফ্রি রমণীকে স্বাধিকারে আনিতে অগ্রসর হইলেন। পার্কার গৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন:—"আর একপা অগ্রসর হইয়াছ কি আমি এই বন্দুকের গুলিতে তোমার প্রাণ সংহার করিব।" (One step more and I will put this gun in operation) আততায়ী দল বিদ্যুৎচমকে চমকিত ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া ক্ষণকাল পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে প্রাণ হারাইতে অসম্মত হইয়া ভীরুর ন্যায় পলায়ন করিল। মহাত্মার অসাধারণ অশ্রুজলের বলে কাফ্রি রমণী দাসত্ব বন্ধন মুক্ত হইয়া উত্তর আমেরিকার মুক্তভূমি ক্যানেডাতে প্রেরিত হইল।

আর এক ইংরাজ সন্তান নিজের সুখ সুবিধা বিস্মৃত হইয়া হতভাগ্য চিরঘৃণিত কারাবাসিগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা জনসমাজের গোচর করিতে এবং সম্ভব হইলে কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমগ্র ইউরোপ খণ্ড ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাতে যেমন লোক বাধা জন্মাইয়া থাকে জনহাউয়ার্ডের কারাগার পরিদর্শন কার্য্যেও তদ্রূপ প্রথম প্রথম বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মানব-প্রেমের প্রবল স্রোতে সকল বাধাই ভাসিয়া গেল। তাঁহার এইরূপ ভ্রমণে যে কত আঁধার কারাগহ্বরে দুঃখের হাহাকারে আশার আলোকে সুখের রেখা দেখা গিয়াছিল, কত লোকের নিরবচ্ছিন্ন সুতীব্র নিগ্রহজনিত জীবনব্যাপী বিষাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সুখভোগের শুভ সূচনা হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। জনহাউয়ার্ড পরিত্যক্ত ও ঘৃণিত মানবসন্তানের অশ্রুমোচনে অগ্রসর হইয়া সমবেদনার সমতল ক্ষেত্রে সুকোমল প্রেমের প্রান্তরে দেবলীলার প্রকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাকেই মানব-দেবতা বলে অথবা মানবে দেবত্বের বিকাশ বলে।

এই মানব-দেবতার অভ্যুদয় কি আমাদের দেশে হয় না? ভারতবর্ষে কারাবাসিগণকে যে কি দারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহার প্রকৃত চিত্র আমরা অনুভবই করিতে পারিব না, কারণ আমাদের সে সহৃদয়তা নাই। সামাজিক জীব তুমি আমি সর্ব্বদা কত শত অপরাধ করিয়াও বিধাতার কৃপা লাভে বঞ্চিত নহি, সমাজ সুখে বঞ্চিত নহি; বারমাসে তের পার্ব্বণ সুখে সম্ভোগ করিতেছি, পুত্র কলত্র লইয়া আহ্লাদে কালহরণ করিতেছি, আর একবার ভাব ত আমাদের মত শত শত লোক সমান ভাবে বিষণ্ণ মুখখানি বুজাইয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে উদয়াস্ত সমাপন করিতেছে; মানব প্রাণের শত প্রকার আশা ভরসার স্মৃতি সহস্র সহস্র দীর্ঘ নিশ্বাসে নীরবে দগ্ধ হইতেছে। মানব সেবকদিগের কেহ কি হাউ-

য়ার্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কারাবাসের দাসত্বের মধ্যে একটু মনুষ্যত্ব আনয়নে প্রয়াসী হইবেন না ?

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

পরমেশ্বরের কৃপায় দাসাশ্রমের আর এক মাস চলিয়া গেল। এ মাসে গিরিডির সেবালয়ে ১১ জন আতুর ও দুই জন অস্থায়ী রোগীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নে তাহাদের নাম ও কাহারও কাহারও বৃত্তান্ত দেওয়া গেল। এ মাসে ১ জন নূতন আতুর আশ্রয় পাইয়াছে।

১। দামো, ২। রামজি, ৩। তিতুরাম, ৪। বাবুরাম, ৫। টোকানি-ঋষি, ৬। দেবীয়া, ৭। দুর্গাতারিণী, ৮। শিবু, ৯। দুর্গামণি, ১০। ফুলকুমারী, ১১। স্বর্ণ, ১২। কৃষ্ণপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, ১৩। চন্দ্রনাথ মজুমদার।

রামজি। বৃদ্ধ বয়সে নানাপ্রকার রোগে ক্লেশ পাইতেছে।

বাবুরাম। বসন্তে ভয়ানক ক্লেশ পাইতেছে। একে ত বেচারা অন্ধ, তাহার উপর দারুণ মিশ্র বসন্তের চিন্তাতীত যাতনা কি যে পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক দিন ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। এই পীড়ার কালে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে বাবুরাম ক্রমাগত ভগবানকে ডাকিয়াছে। তাহার সে সময়কার ভক্তির উচ্ছ্বাস জ্ঞানী বৃদ্ধজনেরও অনুকরণীয়। ভগবান তাহার বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি করুন।

দুর্গামণি। ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধার পা মুখ চোখ ফুলিয়া গিয়া একেবারে শেষ দশায় উপনীত হইয়াছে।

বাবু চন্দ্রনাথ মজুমদার। এই মহাত্মা চিরদিনের জন্য এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি নিত্য পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইয়া আপনার জীবন মরণ উপেক্ষা করিয়া দীন দুঃখী অনাথ নিরাশ্রয় রোগীদিগের সেবা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, তিনি আজ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অন্ধকার করিয়া স্নেহশীল বন্ধুগণের প্রাণ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক চন্দ্রনাথ বাবু গুপ্ত মহাপুরুষ ছিলেন। এমন স্বার্থশূন্য নিস্পৃহ, লোকসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রায় দেখা যায় না। তিনি ৫০ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা জননী, বিংশবর্ষবয়স্কা স্ত্রী ও দেড় বৎসরের একটী পুত্র, অধিকন্তু অবশাঙ্গ একটী ভগ্নীপতি ও ভাগিনী এবং একটী নাবালক ভাগিনেয় রাখিয়া সকলকে দুই খানি জীর্ণ কুটীরের অধিকারী করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন ও তাঁহার পরিবারমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিয়া মহাবিপদ সমুদ্র হইতে মুক্ত করুন। তাঁহার কোন বন্ধু কর্ত্তৃক রচিত তাঁহার জীবনীর হস্তলিপি হইতে তাঁহার জীবনের দুই একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইতেছে। তিনি বরিশালের দরিদ্র-ভাণ্ডারের সম্পাদক ও প্রাণ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। "মা যাহা ভালবাসিতেন, যাহা খাহা করিতে বলিতেন, তাহা সম্পাদন না করিলে তাঁহার হৃদয়ে শান্তি আসিত না। তাঁহার মাতা হেলেঞ্চা শাক বড় ভালবাসিতেন। চন্দ্র বাবু বরিশালের কোন বাসায় হেলেঞ্চা দেখিয়া একমুঠা তুলিয়া লইলেন এবং সেই দিনই বরিশাল হইতে দশ ক্রোশাধিক দূরবর্ত্তী পৈত্রিক গ্রাম পোনাবালিয়ায় পদব্রজে গিয়া মাকে দিয়া আসিলেন। চন্দ্র বাবু বাড়ীতে থাকিলে মাতৃদেবীর পাদোদক পান না করিয়া জলবিন্দুও স্পর্শ করিতেন না।" "একদিন বাড়ীর গৃহ-সংস্কার মানসে কতকগুলি খড় ক্রয় করিয়া গৃহ-সংস্কারে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বোপকারী স্বদেশী দুর্গাচরণ ডাক্তার বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। অর্থাভাবে তাঁহার জীর্ণ গৃহের সংস্কার হইতেছে না। অমনি নিজের সংগৃহীত খড় দ্বারা তাঁহার জীর্ণ গৃহের সংস্কার করিয়া দিলেন। নিজের গৃহ জীর্ণাবস্থায়ই পড়িয়া রহিল।" "তিনি প্রাণপণে রোগীর সেবা করিতেন। একদিন তিনি শুনিলেন, বরিশালের কোন অসহায়া পতিতা নারী দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে লোকজনের সাড়া শব্দ নাই। হতভাগিনী 'জল দেও', 'জল দেও' বলিয়া হৃদয় বিদারী চীৎকার করিতেছে। অমনি তাঁহার দয়াপ্রবণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। জনৈক বন্ধু সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। বেশ্যাগৃহ বলিয়া বন্ধুটি যাইতে কিছু সঙ্কুচিত হওয়ায়," তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া লইয়া গিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়া আসিলেন। "একদিন বরিশালের কোন এক দোকান গৃহে একটি কাক রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ছটফট করিতেছিল। তদ্দর্শনে চন্দ্রবাবুর দয়াপ্রবণ হৃদয় গলিয়া গেল। অমনি তিনি এই দোকানীর নিকট কাকটির জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু দোকানী কাককে ছাড়িয়া দেওয়া দূরে থাকুক, আরও চন্দ্রবাবুকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিতে লাগিল। অগত্যা তাহার পা পর্য্যন্ত ধরিতেও প্রস্তুত হইলেন। তাহাতেও যখন দোকানী স্বীকৃত হইল না, তখন নানা চেষ্টায় মিউনিসিপালিটির সাহায্যে কাকটিকে মুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।" "চন্দ্রবাবুর পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এক সময়ে তাঁহার উপরই সংসারের ভার ছিল। যখন তিনি শুনিলেন, উহা সদুপায়ে উপার্জ্জিত নহে, তখন উহা তৃণবৎ পরিহার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না; পরিবারের দিকে না তাকাইয়া উহা অম্লান বদনে ছাড়িয়া দিলেন। একদিন কোন ব্যবসায়ীর নিকট একটি জিনিস ক্রয় করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাসায় আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ক্রীত দ্রব্যের মূল্য যাহা স্থির হইয়াছিল, ভ্রমক্রমে তাহা অপেক্ষা দুই আনা কম দিয়া আসিয়াছেন। তখনই ছুটিয়া যাইয়া ঐ ব্যবসায়ীর বাকী মূল্য দিয়া আসিলেন।" চন্দ্রবাবু ধ্যানপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

স্বর্ণ। হতভাগিনী জন্মান্ধ। পিতৃকুল বা পতিকুলে কেহই নাই। এই ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া দিন চালাইয়াছে। কয়েকটী দয়ালু ছাত্র আমাদের কার্য্যালয়ে রাখিয়া যান। আমরা গিরিডি সেবালয়ে পাঠাইয়া দি।

দানপ্রাপ্তি।

(২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত দানগুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান পরদুঃখকাতর দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অর্থ। ডাঃ সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী /০, বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী ৵০, একজন সহানুভূতিকারক নাটোর ১৲, মহারাজা জগদীন্দ্র নারায়ণ ২৲, শ্রীমতী বৃন্দেশ্বরী দেব্যা ১৲, রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পুঠিয়া ৫৲, জনৈক হিতৈষী ।০, একজন ভদ্রলোক ।০, একজন বন্ধু নাটোর ॥০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ফেব্রুয়ারি মাসের চাঁদা ১৲, বাবু নন্দলাল দত্ত ফেব্রুয়ারি মাসের চাঁদা ১৲ R. M. G. ৵০, বাবু সত্যকুমার সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৫, বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষের বাটী হইতে প্রাপ্ত ১৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ শীল /০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সিংহ ১০, বাবু রাখালদাস মিত্র জানুয়ারি মাসের চাদা।০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িণী দেবী মাঘ মাসের চাদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী মাঘ মাসের চাদা ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা ॥০, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ।০, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ॥০, মারফতে বাবু চারুচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ১৲, একজন ভদ্রলোক ।০, বাবু উমেশচন্দ্র দাস ৵০, শ্রীমতী ক্ষীরদা মিত্র ১৲, বাবু হরিমোহন হাজরা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ।০, Mrs A. M. Bose ৫৲ Dr. P. C. Roy ১৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জানুয়ারি মাসের চাঁদা ১৲, রায় ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ৪৫।৫ বেনেটোলা লেন ॥৹, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা ফাল্গুন মাসের চাঁদা ॥৹, কুমারী হেমপ্রভা বসু ২॥৵৹, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু ২৲, বাবু গৌরীকান্ত রায় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, মৌলবী ইমাজুদ্দিন সেখ ২৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী ফাল্গুন মাসের চাঁদা ১৲, বাবু পরেশনাথ বিশ্বাস পিতৃব্যের বার্ষিক শ্রাদ্ধে ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস ফেব্রুয়ারি মাসের চাঁদা ।৹, বাবু নন্দলাল দে ।৹, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ৩৲, বাবু রমণীমোহন রায় কাকীনিয়া পুত্রের জন্ম দিনে ১৲, কাকীনিয়ার জনৈক ভদ্রলোক ৵৹, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যো ৩৲, বাবু শশিভূষণ মুখার্জ্জি ১৲, বাবু জানকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু রামলাল সিংহ ১৲, বাবু হংসনারায়ণ দত্ত ১৲, জনৈক হিন্দু মহিলা মার্চ্চ মাসের চাদা ১৲, বাবু রেবতীমোহন সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ২৲, বাবু লালমাধব মুখার্জ্জি ২৲, বাবু অবতারচন্দ্র সাহা ১৲, বাবু অন্নদামোহন রায় ১৲, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী ১৲, শ্রীমতী—সেনগুপ্তা ॥৹, রায় উমাকান্ত দাস গুপ্তের ফেব্রুয়ারি মাসের চাঁদা ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত দাস গুপ্ত ঐ মাসের চাঁদা ।৹, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস M. A. B. L. ১৲, বাবু পশুপতিনাথ বসু মার্চ্চ মাসের চাদা ১৲, বাবু সত্যপ্রিয় মিত্র ১৲, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন L. M. S. ২৲, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি ॥৹, বাবু কালীনাথ ঘোষ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস ডিসেম্বর ও জানুয়ারির চাদা ২৲, Justice Gurudas Banerji ৫৲, Sirkar's Debating Club হইতে সংগৃহীতঃ—বাবু হরিলাল মুখার্জ্জি ॥৹, বাবু চন্দ্রপ্রিয় মিত্র ১৲, বাবু রমেশচন্দ্র বিশ্বাস ॥৹, বাবু সুশীলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ॥৹, বাবু বীরেন্দ্রনাথ সরকার ১৲, বাবু ভূজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ১৲, বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ॥৹, বাবু নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ॥৹, বাবু চারুচন্দ্র মুখো ॥৹, ঐ জ্যোতিন্দ্রনাথ সরকার ১৲, ঐ মণিলাল চট্টো ॥৹, ঐ নরেন্দ্রনাথ সেট ॥৹, ঐ সতীন্দ্রনাথ সরকার ১৲, ঐ হরিমন দে ১৲, ঐ শ্যামাচরণ চৌধুরী ১৲, ঐ গুরুপদ হালদার ১৲, ১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৸৹, বাবু পঞ্চানন মুখো ৫৲, ঐ গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ মার্চ্চ মাসের চাঁদা ।৹, ঐ মহেশচন্দ্র সান্ন্যাল ১৲, ঐ প্রসন্নকুমার দত্ত ১৲, Miss. C. Hodgkinsons (Protestant Home) ২৲, বাবু গঙ্গাধর ঘোষ ১৲, ঐ লোকনাথ সাহা ১৲, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ১৲, বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাসগুপ্ত ১৲, ঐ দেবেন্দ্রনাথ শীল ১৲, Mrs. A. Alexander ১৲।

গিরিডিস্থ সেবালয়ের বসন্ত রোগগ্রস্ত অন্ধ বালকের সেবার জন্য নিম্নলিখিত দানগুলিও পাওয়া গিয়াছে ঃ—

কুমারী মনোরমা রায় ১৲, বাবু গৌরলাল রায় কাকিনীয়া ২৲, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ঃ—কুমারী নিরুপমা গাঙ্গুলি ।৹, কুমারী সুনীতিবালা চট্টো ।৹, কুমারী সুনলিনী বসু ॥৹, কুমারী শৈবলিনী বসু ॥৹, কুমারী প্রফুল্লবালা রায় চৌধুরী /৹, কুমারী হেমন্তকুমারী সিংহ /৹, কুমারী সুনীতিবালা নিয়োগী ৵১০, কুমারী স্নেহলতা নিয়োগী ৵১০; কুমারী রতনকুমারী মিত্র ॥৹, কুমারী বাসন্তী মিত্র ॥৹, সিটি স্কুল পঞ্চম শ্রেণী ঃ—দেবেন্দ্রমোহন বসু ৵১০, সুরেশমোহন বসু ৵১০, শ্রুতীশমোহন বসু ৵৫, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ৵৫, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যো ৵১০, জ্যোতিভূষণ নিয়োগী ৵৫ সুকুমার মিত্র ॥৹।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

"দাসী" হইতে মার্চ্চ মাসের সাহায্য২৫৲, "দাসী" হইতে ধার ৪৪৵১৫, 'দাসী' হইতে খুচরা সাহায্য ১৸৵১৫, চাউল বিক্রয় ৬॥/৹, দাসীর ধার শোধ ৵১৭॥।

মোট আয়।

দানপ্রাপ্তি ১০৯॥/১০, অন্যান্য প্রকারে আয় ৭৭৸/৭॥, বিগত মাসের জের ২৵১৫, মোট আয় ১৮৯।৵১২॥।

চাউল।

বিগত মাসে যাঁহারা মুষ্টিভিক্ষা দিয়াছিলেন, এ মাসেও তাঁহারা দিয়াছেন। নূতন কোন নাম না থাকায় এ মাসে আর পৃথকভাবে কোন নামের লিষ্ট প্রকাশিত হইল না।

বস্ত্রাদি। রামপ্রসাদ মিত্র ঃ—ধুতি ১, চাদর ১, তিনকড়ি বসু ঃ—১থান নূতন কাপড়, ঐ যদুনাথ ঘোষের বাড়ী হইতে ঃ—ধুতি ১, কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব শোভাবাজার ৩৩টী এলোপ্যাথিক ঔষধ দিয়াছেন, উমেশচন্দ্র দাস ঃ—র‍্যাপার ১, মিসেস্ অধেদার এলাহাবাদ ঃ—বগুণা ১, থালা ১. বাটী ১, রেকাব ১, ঘটী ৩, মকমলের জ্যাকেট ১, গেঞ্জি-ফ্রক ২৲, সার্ট ২, ধুতি ১, নূতন ধুতি ১, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু ঃ—১ম বারে—ধুতি ৫, বিছানার চাদর ২, ২য় বারে—ধুতি ২, জ্যাকেট ২, ৩য় বারে—ধুতি ৪, জ্যাকেট ১১, বালিসের ওয়াড় ৪, জাঙ্গিয়া ৪, পোটিকোট ১, সেমিজ ২, বিছানার চাদর ১, মোজা ৮ জোড়া, রমেশচন্দ্র সেনের পত্নী নূতন কাপড় ১।

কলিকাতার আয় ব্যয়।

(২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

গিরিডি সেবালয়ে প্রেরণ মঃ অঃ কমিশন সহিত ৯৪৵৹, আদায়কারীর ব্যয় ১৫৵৹, কর্ম্মচারীর বেতন ৮।৵৫, ডাক খরচ ৵১০, হাঁড়ি ৵৹, ব্যাগ ।/৹, গিরিডিতে রোগী প্রেরণের ব্যয় ৮৸৹, বিবিধ ।/১০, ট্রাম ভাড়া /৫, ভিক্ষার বাক্স ১৸৹, প্যাকিং ৵১০ খাতা খরিদ ৵১৭॥, দাসীকে ধার দেওয়া ৵১৭॥, পূর্ব্বের বাড়ী ভাড়া শোধ ৫০৲ দাসীর ঋণ শোধ ৬।/৹, মোট ব্যয় ১৮৫॥/১৫।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৮৯।৵১২॥, মোট ব্যয় ১৮৫॥/১৫, হস্তেস্থিত ৩৸/১৭॥।

গিরিডিস্থ সেবালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ৫৲, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু ১৲, স্বর্ণের দরুণ জমা ৵১৭॥৹, গত মাসের জের ১॥৵১০, কলিকাতা দাসাশ্রম কার্য্যালয় হইতে প্রাপ্ত ৯৩৲। মোট ১০০৸/৭॥।

ব্যয়।

বাটীভাড়া ১৮৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩১।১৫, ধোপা ১/১৫, নাপিত /১০, গোয়ালা ।/৹, ঔষধ ৩।৹, ব্যারামের জন্য অতিরিক্ত খরচ ৩৸৵১৫, বিবিধ ।৹, সংসার খরচ ৩৬৸১০। মোট ৯৫।/৫। হস্তেস্থিত—৫॥২॥৹।

সম্পাদকের নিবেদন।

"দাসী"তে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে কেবল দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ এবং দাসাশ্রম ঘটিত অন্যবিধ সংবাদ, প্রার্থনাদির জন্যই দাসাশ্রম দায়ী। আর যাহা কিছু লিখিত হয়, তন্মধ্যে যিনি যাহা লিখেন, তজ্জন্য তিনিই দায়ী। সম্পাদক কেবল নিজের লেখার জন্যই দায়ী। দাসাশ্রম সম্পাদকীয় কোনও মতামতের জন্যও দায়ী নহেন। কারণ কোন বিষয়ে কোন বিশেষ মত প্রচার দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য নয়। কেবল সেবাধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ফাল্গুন মাসের "সাহিত্যে" "দাসী"র সমালোচনায় একটি ভুল আছে। "সাহিত্যে"র সম্পাদক মহাশয় দাসাশ্রমের একজন পুরাতন অনুগ্রাহক ও বন্ধু। তিনি, শুধু কথায় নয়, কাজেও অনেক সময় নিজ হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভুলটি দেখাইয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, "দাসী" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাহাতে কেবল সেবাবিষয়ক প্রবন্ধাদি থাকিত। কিন্তু ইহা ঠিক্ নয়। ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসের "দাসী"তে আমরা একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলাম যে, ততঃপর "দাসী"তে জন-হিতৈষণা ব্যতীত অন্যবিষয়ক প্রবন্ধাদিও থাকিবে। সুতরাং তদবধিই "দাসী"তে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্যে"ও "দাসী"র এমন কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার সহিত জনহিতৈষণার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং "দাসী"র এই পরিবর্ত্তন নূতন নয়। নূতনের মধ্যে কেবল বর্দ্ধিত কলেবর। কি কারণে লিখিতব্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসের "দাসী"তে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে এখনও আমরা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সেবা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছি, পরেও করিব।

CALCUTTA
Printed and Published by KARTIKCHANDRA DATTA
AT THE B. M. PRESS. 211, *Cornwallis Street.*

দাসী

পিতৃভূমি দর্শন।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত।

আমার কানপুরে অবস্থিতির সময়ে (১৮৬৮) গবর্ণমেণ্ট স্কুল ইনস্পেক্টর ও আমার হিন্দু কলেজের সমাধ্যায়ী বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি (তখন তিনি C. I. E. হন নাই) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী স্কুল সকল পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল স্কুলের যে সকল নিয়ম বঙ্গদেশের বাঙ্গালাস্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার ভার অর্পণ করেন। তিনি সেই ভার প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল স্কুল পরিদর্শনার্থ পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। যখন তিনি কানপুরে যান, তখন তথায় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন কথোপকথনের সময় পিতৃভূমি অর্থাৎ কান্যকুব্জ (কনোজ) দর্শনের প্রস্তাব উঠে। কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আইসেন; এই জন্য আমরা ঐ স্থানকে পিতৃভূমি সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমরা কনোজ যাইতে সংকল্পারূঢ় হইলাম। ভূদেব আমাকে বলিলেন, "যাইবে তো গাড়ু গামছা হাতে কর।" আমি বলিলাম, "এই উনবিংশ শতাব্দীতে?" আর এক কথা আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; সে কথা এই যে "আমরা গাড়ু গামছা বহা জাত, আগে তাহা প্রমাণ কর।" কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ আমার বিশ্বাস। কনোজ ফরাক্কাবাদ জেলায় স্থিত, কানপুর জেলায় স্থিত নহে। কিন্তু কানপুর জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্স্পেক্টার পণ্ডিত চুড়ামণ্ অত্যন্ত শিষ্টতাপূর্ব্বক ততদূর আমাদিগের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনে উৎসাহ দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি, কনোজে গিয়া পিতৃভূমির জন্য মোকদ্দামা না করেন।"

কনোজের অর্দ্ধরাস্তায় শিওরাজপুর গ্রামে সেখানকার তহশীলদার অর্থাৎ ডেপুটি কলেক্টর লালা বিহারীলালের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজি অতি যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিলেন। লালা বিহারীলাল ঘোর সাকারবাদী হিন্দু। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "শুনিতেছি কলি-

কাতায় অনেকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ।” ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, “বুৎপরস্ত্ হোনা মোনাসেব নেহি।” তিনি উত্তর করিলেন, “বুৎপরস্ত্ কোন হ্যায়? হামলোক ক্যায়া মাট্টীকা বুৎকো পূজ্‌তে হে, না উস্‌কা ভিতর দেওতাকো পূজ্‌তে?” লালাজি ভূদেবকে তর্কের মীমাংসার মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। ভূদেব অত্যন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, “সব আচ্ছা হ্যায়, সব আচ্ছা হ্যায়।” অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্মও ভাল প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মও ভাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসায় এমনি সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার মুখে ভূদেবের “তারিফ” আর ফুরায় না। আমি ভূদেবকে বলিলাম যে “আমি যাহা এতক্ষণ বকিয়া মরিলাম তুমি এক কথায় তাহা মীমাংসা করিয়া দিলে; তোমাকে ধন্য।” তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে কনোজের অতি নিকট মিরাকিসরাই নামক স্থানে পৌঁছিলাম। তথায় পৌঁছিয়া প্রয়াগবাসী লালা কিশোরীলাল নামক তথাকার মুনসেফের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সকল হিন্দু জাতির বিবরণ হিন্দীতে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক খণ্ড আমাদিগকে দান করিলেন। পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি যে এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্রের স্ব সম্পর্কীয় কলিকাতাবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক কোন উৎসাহী ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের সঙ্গী ছিলেন। তিনিও একখানি পুস্তক পাইলেন। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কথোপকথনের সময় লালা কিশোরীলাল একটি আশ্চর্য্য কথা বলিলেন। সে কথা এই যে গত কুম্ভমেলার সময়ে হরিদ্বারে মোগল অর্থাৎ পারস্যদেশীয় পরিচ্ছদধারী বোখারা ও সমরখন্দ নিবাসী হিন্দু তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমি এইমাত্র বলিলাম যে ইহা আশ্চর্য্য কথা; কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমরা ইংরাজী পুস্তকে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে ঐ সকল স্থানে হিন্দু বণিক অনেক পুরুষ অবধি বসতি করিতেছে।

লালাজির প্রণীত হিন্দু জাতি বিষয়ক পুস্তকে লেখা আছে যে কনোজের বীরসিংহ নামক রাজার রাজত্ব সময়ে তাঁহার দ্বারা পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরিত হয়। যেদিন আমরা লালা কিশোরীলালের আতিথ্যস্বীকার করিলাম, তৎপর দিবস আমরা কনোজ দর্শনার্থ বহির্গত হই। কনোজের শ্রীহীন দশা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হই। জয়চাঁদ ও সংযুক্তার কনোজ আর সে

কনোজ নাই। যে নগরে ২৪০০০ চব্বিশ হাজার পানের খিলির দোকান ছিল ও নিত্য উৎসব সমাজ সকল দ্বারা যাহা পূর্ণ ছিল, সেখানে এক্ষণে অসংখ্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন গৃহ ও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। আমরা দেখিলাম জয়চাঁদের দুর্গস্থানে তামাকের চাষ হইতেছে। আমরা কনোজের হিন্দীস্কুল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের টোল দেখিতে গেলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদিগকে অর্ঘ প্রদান না করিয়া মুসলমান রীত্যনুসারে আতর ও গুজরুটে এলাচ দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা টোলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যে তাঁহাদিগের কোন কোন ভাই বন্ধু বঙ্গদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। আমরা তাহার পর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণের এবং কান্যকুব্জের লালাদিগের সহিত বাঙ্গালী কায়স্থের বিবাহ সুসাধ্য কি না? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন, “যজ্ঞ কি বিয়ে।” “যহাযজ্ঞ করিয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র ও কাশীর প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর।” এই প্রণালী হ’চ্চে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রকৃত হিন্দু পদ্ধতি। আমার স্মরণ হয়, ডাক্তার গোল্ট্‌ষ্টুকর (Dr. Goldstucker) সাহেবও আমার Brahmic Questions of the Day নামক পুস্তিকা চিঠিতে সমালোচনা করিবার সময় ঠিক এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যেমন অচল ও সংস্কারবিরুদ্ধ মনে করি, তাঁহারা সেরূপ নহেন। কনোজে “মীরে বাঙ্গালি” নামক কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ভগ্ন বাটী আছে। তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অনেক অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বীয় জন্মস্থান কনোজে আসিয়া ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিতৃভূমি কনোজ দর্শন করিয়া, বিশেষতঃ কনোজ হইতে বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন স্মরণ করিয়া, আমাদিগের কি এক মনের ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। উষ্ণীষ ও বৃহৎ চর্ম্মপাদুকাধারী পঞ্চব্রাহ্মণ গোযানে ও তাঁহাদিগের সহিত পঞ্চ কায়স্থ কেহ হস্তী যানে কেহ অশ্ব যানে কেহ অন্য যানে বঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন, আমরা কল্পনাচক্ষে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

বর্ত্তমান শতাব্দীর এই জ্ঞানোজ্জ্বল যুগে যাগ যজ্ঞের নাম শুনিয়া অনেকে হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু তাঁহারা অবহিতচিত্তে এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে, শীর্ষোক্ত "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" কুসংস্কারপ্রসূত কোন সঙ্কীর্ণ ক্রিয়া নহে। প্রাচীন ভারতের গৃহমেধী আর্য্যগণ আচার্য্যকুল হইতে বেদ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপন পূর্ব্বক পিতৃগৃহে সমাবর্ত্তনানন্তর দারগ্রহণ করিয়া যে পাঁচটী নিত্যঅনুষ্ঠেয় গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, আর্য্য শাস্ত্রে তাহাই "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" নামে কথিত হইয়াছে। গৃহস্থের সমষ্টিই সমাজ। যেদেশের গার্হস্থ্য নীতিতে নিজের মঙ্গলের সহিত সমাজের মঙ্গলামঙ্গল অনুস্যূত, তাহাকেই উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্যনীতি বলা যায়। সমাজবন্ধনের পূর্ব্বে মানুষ প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত ছিল, এ অবস্থায় স্বার্থই তাহার সকল কার্য্যের নিয়ন্তা। কিন্তু কেবল স্বার্থের উপর কখনও গার্হস্থ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যেহেতু গৃহস্থ সমাজসূত্রে আরও দশজনের সহিত সম্বদ্ধ। সুতরাং স্বার্থ পরার্থের অনুগত না হইলে সমাজ রক্ষা হইতে পারে না। স্বার্থ এবং পরার্থের সম্মিলনই সমাজস্থিতির প্রকৃষ্ট উপায় এবং পরমার্থই তাহার নিয়ন্তা হওয়া আবশ্যক। পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্বজাতি ও স্বদেশ এবং সাধারণ জনসমাজ, সকলেরই সহিত নানা কর্ত্তব্য সূত্রে মানবজীবন সম্বদ্ধ। মনুষ্যের চিত্ত এই সকল কর্ত্তব্য-সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ স্বার্থ হইতে পরার্থে সম্প্রসারিত হইয়া সমস্ত বিশ্বের হিতসাধনে নিযুক্ত হইলেই পরমার্থ লাভে সমর্থ হয়, কেন না সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলই পরমার্থ। মানুষ গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করিয়া পরার্থপরতা অভ্যাস পূর্ব্বক ক্রমশঃ যাহাতে বিশ্বের সেবা-ব্রতে দেহ মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারে, এই সুমহান্ উদ্দেশ্যেই আর্য্যঋষিগণ গৃহীর জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন।

যাহা ধর্ম্মোদ্দেশে যজন করা যায়, তাহাই যজ্ঞ। এই পাঁচটী অনুষ্ঠান মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের হেতুভূত বলিয়া ইহার নাম "পঞ্চ মহাযজ্ঞ।"

"ঋষি যজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥"

মনু সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২১ শ্লোক।

মনু বলিতেছেন, "ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ, এই সমুদয় যজ্ঞ সর্ব্বদা যথাশক্তি পরিত্যাগ করিবে না" ॥২৩॥*

অর্থাৎ দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, মানবসমাজ ও তির্য্যক জাতির সেবা এই পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্ভূত।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমোদৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥"

৩য় অ, ৭০।

অর্থঃ—"অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদিদ্বারা পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ বলা যায়" ॥৭০॥

এই পঞ্চবিধ নিত্য কর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় ইহা দ্বারা যেমন ব্যক্তিগত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হয়, সেই প্রকার জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণও ইহার লক্ষ্য। গৃহীকে প্রতিদিন এই পাঁচটী অনুষ্ঠান যথানিয়মে সম্পন্ন করিতে হইত। সন্ধ্যোপাসনা ও হোমক্রিয়া দ্বারা দেবসেবা অর্থাৎ চিত্তকে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরব্রহ্মে সমাধান করিয়া ধর্ম্ম সাধন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা নিজের ও অন্যের জ্ঞানোন্নতি সাধন অর্থাৎ লোকশিক্ষার বিস্তার, লোকান্তরিত আত্মার স্মরণার্থ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, রূপ পিতৃসেবা দ্বারা পরলোকে বিশ্বাস এবং পিতৃ পিতামহাদি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্দীপন, অতিথিসেবারূপ নৃযজ্ঞের দ্বারা মানব মাত্রের প্রতি সাম্য ও মৈত্রী শিক্ষা, এবং ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর তৃপ্তিসাধন দ্বারা বিশ্বজনীন প্রেমে আত্মার সম্প্রসারণ, এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই জন্য মনু ইহাকে "মহাযজ্ঞ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি উক্ত মহান্ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন বলিয়াই মনু গৃহস্থকে সকল আশ্রমবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। আধ্যাত্মিক বলবীর্য্য জ্ঞানবিজ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া উপচিকীর্ষা ও বিশ্বজনীন প্রীতি প্রভৃতি মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভের সমস্ত উপাদানই এই পঞ্চ যজ্ঞের অন্তর্গত। ইহার একটী পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব, এইজন্য শাস্ত্রে যথাশক্তি ইহার অনুষ্ঠানের উপদেশ। প্রাচীন

* উদ্ধৃতি-চিহ্নের অন্তর্গত মনুবচনের অনুবাদগুলি সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহাত্মা ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

প্রবন্ধ লেখক।

কালে এই পঞ্চযজ্ঞ কি প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইত, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

প্রথম, দেবযজ্ঞ। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবার নাম দেবযজ্ঞ। দেবার্চ্চনা ও মনুষ্যাদি প্রাণীর উপকার ইহার উদ্দেশ্য। অগ্নিহোত্র দ্বারা কিরূপে পরোপকার সিদ্ধ হইতে পারে, বিজ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান যুগে তাহা বুঝান অতি দুষ্কর। এ সম্বন্ধে আর্য্যঋষিগণের যুক্তি এইরূপ,—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"

মনু ৩য় অ, ৭৬ শ্লোক।

অর্থাৎ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্য্যে অর্থাৎ আকাশে বাষ্পরূপে উত্থিত হয়, পরে, সূর্য্য বা আকাশ হইতে বৃষ্টি হয়, এবং বৃষ্টি ফল শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া প্রজারক্ষা করিয়া থাকে। ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

অর্থাৎ "প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন পর্জ্জন্য হইতে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে। (অগ্নিহোত্রাদি) কর্ম্ম বেদ হইতে, বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।" (মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ।) ফলতঃ ভগবৎ আরাধনা দ্বারা আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় ও ভক্তিবৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরোপাসনার বিধান করিয়াছেন। *

দ্বিতীয়, ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ। বেদাদি সৎশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ঋষিযজ্ঞ। শাস্ত্র সকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিরাই জ্ঞানের প্রচারক, শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা জ্ঞানচর্চ্চাই ঋষিদিগের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রকৃত উপায়। মনুসংহিতার মূল শ্লোকে "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ" এইমাত্র আছে, কিন্তু টীকাকার কুল্লূকভট্ট বলেন, "অধ্যাপন শব্দেনাধ্যয়নমপি গৃহ্যতে" অর্থাৎ অধ্যাপন শব্দে অধ্যয়নও বুঝিতে হইবে। ফলতঃ অধ্যয়ন

* "সূর্য্যো জ্যোতি র্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা," "ওঁ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি অগ্নিহোমমন্ত্র পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, উহা প্রাকৃত সূর্য্য ও ভৌতিক অগ্নির অর্চ্চনা। প্রকৃত পক্ষে এ গুলি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরমেশ্বরের অর্চ্চনামূলক বেদমন্ত্র। শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃত "ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা" গ্রন্থ দেখ।

ব্যতীত অধ্যাপনা অসম্ভব। অধীত বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধন, এবং লোক শিক্ষার বিস্তার দ্বারা জনসমাজের অজ্ঞানতা নিবারণ ঋষিযজ্ঞের উদ্দেশ্য। জ্ঞানেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ব্যতীত উৎকর্ষাপকর্ষ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বোধ হয় না। প্রাচীন আর্য্যেরা নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া জ্ঞানানন্দে আপনারা কৃতার্থ হইতেন, এবং অন্যকে মুক্তহস্তে তাহা বিতরণ করিয়া সমাজের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেন। দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র বিতরণের ন্যায় জ্ঞানহীনকে জ্ঞান বিতরণ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। শিক্ষার্থীকে অন্ন দিয়া পোষণ করিয়া জ্ঞান বিতরণ করিতে হইত, এখনকার ন্যায় বিদ্যাবিক্রয়-প্রথা ছিল না। অদ্যাপি হিন্দুসমাজে এই পরম পবিত্র ঋষিযজ্ঞের শেষচিহ্ন স্বরূপ চতুষ্পাঠী প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকে জ্ঞানযোগে স্বার্থ হইতে পরার্থে আত্মসম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ। শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ ও তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠানের নাম পিতৃযজ্ঞ। ইহার অনুষ্ঠানে পিতৃপিতামহাদি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা ও পরলোকে বিশ্বাস উদ্দীপ্ত হয়। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বিহীন হইলে জনসমাজ মরুভূমি ও শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হয়, এই কারণ পিতৃ-সেবার বিধি।* প্রাচীন কালে এই বিধি সম্যক অনুষ্ঠিত হইত বলিয়াই পিতৃপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এদেশের চিরন্তন প্রথা, এবং এই কারণেই মনু বলিয়াছেন,—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

অর্থাৎ "শাস্ত্রের নানা প্রকার শাসন থাকিলেও যে শাস্ত্রার্থ পিতৃপিতামহাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, সেই সৎপথ, সে পথে গমন করিলে কোন মতে তাহাকে অধর্ম্মে আক্রমণ করিতে পারে না॥"

এই পিতৃযজ্ঞ যে কেবল নিজ বংশের পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে সমাহিত

* আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী তৎপ্রণীত "পঞ্চমহাযজ্ঞবিধিঃ" গ্রন্থে কেবল জীবিত পিতৃলোকদিগের সেবার উপদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের সেবার নাম পিতৃযজ্ঞ। যিনি জ্ঞানী ধার্ম্মিক পরোপকারী সত্যনিষ্ঠ, তিনি দেব; যাঁহারা বেদাদি সৎশাস্ত্রের পঠন পাঠনা দ্বারা জনসমাজের জ্ঞানোন্নতি সাধন করেন, তাঁহারা ঋষি; আর পিতা পিতামহ, মাতা মাতামহ প্রভৃতি তথা আচার্য্য ও জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত ইহঁাদিগের মিত্রস্থানীয় লোকদিগের নাম পিতৃলোক। প্রীতিপূর্ব্বক ইহঁাদিগের যে সেবা করা যায়, তাহার নাম তর্পণ। "প্রীত্যা যৎ সেবনং ক্রিয়তে তৎতর্পণম্।" আর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবার নাম শ্রাদ্ধ। "শ্রদ্ধয়া যৎ সেবনং ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধম্।"

হইত তাহা নহে, এসংসারে যাহাদের আপনার বলিবার কেহ নাই, "যেষাং ন মাতা" যাহাদের মাতা নাই, "যেষাং ন পিতা" যাহাদের পিতা নাই, "ন বন্ধু" যাহাদের বন্ধু নাই, "নৈবান্নসিদ্ধির্ণতথান্নমস্তি" যাহাদের অন্নসিদ্ধি নাই, তাহাদিগেরও তৃপ্তি এবং সদ্গতির জন্য শুভকামনাও পিতৃযজ্ঞের অন্তর্গত। শ্রাদ্ধান্তে শ্রাদ্ধকর্ত্তার যে বর প্রার্থনার রীতি আছে, তাহাও অতি পবিত্র ও মধুর। যাঁহারা হিন্দুসমাজের অনুষ্ঠানগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন অসার কর্ম্মকাণ্ডের কোলাহল বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত প্রার্থনামন্ত্রগুলি একবার পাঠ করেন, এই অনুরোধ।

প্রথমতঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিবেন, "ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃসন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাং", আমার পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট অভয়প্রদ সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করুন, এবং আমাদের পুত্র পৌত্রাদিরূপ বংশ পরম্পরা যেন বর্দ্ধিত হয়। পুরোহিত প্রতিবচনে বলিবেন, "ওঁ বর্দ্ধতাম্", বর্দ্ধিত হউক। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা করযোড়ে বলিবেন,

"ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেবচ।
শ্রদ্ধাচ নোমা ধ্যগমৎ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদথিতীংশ্চ লভেমহি।
যাচতারশ্চ নঃ সন্তু মাচ যাচিস্ম কঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু।" *

অর্থ:—"আমাদিগের বংশে দাতৃশক্তিসম্পন্ন পুরুষসকল পরিবর্দ্ধিত হউক, অধ্যয়ন অধ্যাপন দ্বারা বেদশাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হউক, পুত্র পৌত্রাদি সন্ততি সকল পরিবর্দ্ধিত হউক, বেদার্থের প্রতি শ্রদ্ধা আমার কুলে কাহারও কখন না যাউক, দান করিবার জন্য ধনাদি যথেষ্ট সম্পত্তি হউক। আমরা যেন প্রচুর পরিমাণে অন্ন ও বহু অতিথি লাভ করি। আমরা যেন কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা না করি, কিন্তু বহু ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা পুরণ করিতে যেন সমর্থ হই। অন্ন নিত্যই বর্দ্ধিত হউক এবং দাতা দীর্ঘজীবী হউন।"

এই সকল প্রার্থনার মধ্যে পার্থিব কামনার গন্ধমাত্রও নাই, নিঃস্বার্থতা ও পরার্থপরতার ইহা জ্বলন্ত নিদর্শন।

চতুর্থ নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সেবা। এক রাত্রি মাত্র পরগৃহে যিনি বাস

* সামবেদী শ্রাদ্ধমন্ত্র।

করেন এবং অপর তিথি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন অবস্থান না করেন, তাঁহাকে অতিথি বলা যায়।*

"সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধি পূর্ব্বকং॥"
(মনু, ৩য় অ, ৯৯।)

অর্থ:—"স্বয়ং গৃহাগত অতিথিকে বিধানানুসারে সৎকার করিয়া আসন, পদপ্রক্ষালনের জল ও যথাশক্তি অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিবে।" অতিথি ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র যে কোন জাতীয় হউন, হিন্দুর নিকট "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি।" "অতিথি দেবোভব" † অতিথিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে, ইহা বেদের উপদেশ। গৃহীব্যক্তি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে শ্রান্তক্লান্ত অন্ধ আতুর সকল প্রকার অভ্যাগতকে যথাশক্তি বিশ্রামার্থ আসন ও অন্নজলাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবেন, শাস্ত্রকৃদ্গণ ভূয়োভূয়, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। গৃহস্থ যদি অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা অতিথির পরিচর্য্যায় একান্ত অসমর্থ হন, তবে শয্যাদি দান ও প্রিয়বচন দ্বারা সৎকার করিতে কখনও যেন অমনোযোগ না করেন, "যেহেতু শয়নীয় তৃণ, বিশ্রামভূমি, পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, ও প্রিয় বচন, অতিথি সেবার জন্য এ সকল ভদ্র লোকের গৃহে কখনই অপ্রাপ্ত হইতে পারে না।" ‡ সাধারণ ভিক্ষুকগণকে এক গ্রাসের ন্যূন না হয়, এইরূপ ভিক্ষাদানের বিধি। পরম শত্রুও যদি অতিথি হন, তাঁহাকেও যথাবিধি আদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে, শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ। অতিথি অভ্যাগত এমন কি দাস দাসী প্রভৃতির ভোজনাবসানে গৃহস্থ সস্ত্রীক ভোজন করিবেন, এইজন্য গৃহস্থের নাম "শেষভুক্।" "গৃহস্থঃ শেষভুক্ ভবেৎ।" অর্থাৎ "গৃহস্থ সকলের অন্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া পশ্চাৎ আপনি সস্ত্রীক অবশিষ্ট ভোজন করিবেন।"

"অঘং স কেবলং ভুঙক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আপনার জন্য পাক করিয়া ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে।" ইহাই হিন্দুর শিক্ষা। সকল নরনারী জগৎপিতা পরমেশ্বরের সন্তান, অতএব মানবসাধারণের প্রতি সহানুভূতি, সাম্য ও মৈত্রী অর্থাৎ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দেওয়াই অতিথি সেবার উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালে এই নৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা যাদৃশ উদার সার্ব্বভৌমিক প্রীতির অনুশীলন হইত, এখনকার সহস্র সহস্র সভাসমিতি ও বক্তৃতা দ্বারা তাহার একাংশও সম্পন্ন হয় কি না সন্দেহ। হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান সময়ে নানা দোষে

* মনু সংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ১০২ শ্লোক।
† তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, একাদশ অনুবাক।
‡ মনু, ৩য় অধ্যায়, ১০১ শ্লোক।

ভুষ্ট হইলেও এখনও পল্লিবাসী অনেক হিন্দুগৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হয় না, এবং নাগরিক সমাজে ইংরাজি সভ্যতা যতই বিস্তীর্ণ হউক, সৌভাগ্যবশতঃ পল্লিবাসিনী কোন কোন কুলরমণী আজও দাস দাসী অতিথি প্রভৃতির অগ্রে ভোজন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন।

পঞ্চম, ভূতযজ্ঞ। পশু পক্ষী কৃমি কীটাদি সর্ব্বভূত প্রাণি মাত্রের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রকাশ এবং তাহাদের সেবার নাম ভূতযজ্ঞ। অতিথি সেবায় যেমন মানব প্রীতির পূর্ণ বিকাশ, ভূত সেবায় সেইরূপ বিশ্বপ্রীতির পূর্ণ বিকাশ। বোধ হয় এইজন্য ভগবান মনু ইহাকে "বৈশ্বদেববলি" শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। উদার মানবপ্রীতি ও বিশ্বজনীন দয়া, হৃদয়বৃত্তি অনুশীলনের চরম ফল। হিন্দুর জ্ঞান যেমন সুগভীর, হৃদয় সেইরূপ প্রশস্ত ও বিরাট। হিন্দুশাস্ত্র ব্যতীত আর কোন্ শাস্ত্রে এ প্রকার বিরাট বিশ্বজনীন প্রীতির উপদেশ আছে? গৃহপালিত অশ্বগবাদি হইতে আমরা নানারূপ উপকার লাভ করি, সুতরাং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য; ইহা দয়া নহে, কিয়ৎপরিমাণে কৃতজ্ঞতা ও স্বার্থই ইহার নেতা। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রে নিঃস্বার্থ ভাবে, কেবল বিশ্বহিতৈষণা পরিস্ফুরণের জন্য পতিত, গলিত কুষ্ঠী প্রভৃতি প্রকৃত অভাবগ্রস্ত দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ও ইতর প্রাণিদিগের সেবার বিধান রহিয়াছে। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রের এত মাহাত্ম্য। এ সম্বন্ধে মনুর বিধান এই,—

"শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাং
বায়সানাং কৃমীনাঞ্চ শনকৈর্নির্বপেৎভুবি ॥"

অর্থাৎ "অন্ন পাত্রে উদ্ধার করিয়া, ধূলি না লাগে এমন করিয়া ভূমিতে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী পাপ রোগী, কাক ও কৃমিদিগকে প্রদান করিবে।" এই ভূত যজ্ঞের ফলশ্রুতিও অতি উচ্চ। যিনি প্রতিদিন এই রূপে সকল প্রাণীদিগকে বলি প্রদান করেন, "সগচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিপথার্জুনা" অর্থাৎ "তিনি অতি সরল আলোকময় পথ দ্বারা ব্রহ্মধামে গমন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়েন॥"

এতাবতা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, জগতের সেবাব্রতই হিন্দুর গার্হস্থ্যের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মচর্য্যা ও পরোপকারই গৃহীর ধর্ম্ম।

"দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চয়ঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ সন্ন সজীবতি॥" (মনু, ৩য়, ৭২।)

অর্থ:—"দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা এই পাঁচকে যে

ব্যক্তি অন্ন না দেয়, সে নিশ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে।" পুনশ্চ মনু বলিতেছেন,

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥

অর্থাৎ "যেমন প্রাণবায়ুর আশ্রয়ে যাবতীয় জীব জীবিত থাকে, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকল আশ্রমবাসীরা জীবিকা করেন।" * "গৃহস্থেনেব ধর্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী" "অতএব গৃহস্থই সকল আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ আশ্রমবাসী জানিবে।" কিন্তু এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যগুলি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে শরীর ও মনের বলবীর্য্য, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, দিব্যজ্ঞান, চিত্তের পবিত্রতা ও অনুষ্ঠানে গভীর নিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। এই নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিধান। † নিরবচ্ছিন্ন অর্থোপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ, এবং অবকাশ কাল অসার ক্রীড়া কৌতুক ও বাদ প্রতিবাদে অতিবাহন করা যে সকল দুর্ব্বলেন্দ্রিয় লঘুচিত্ত ব্যক্তির নিত্যকর্ম্ম, হিন্দুর গার্হস্থ্য নীতির পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য এবং মহত্ত্ব ও মহিমা তাহারা কিরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে? এই সমুদায় লোককে লক্ষ্য করিয়া ভগবান মনু বলিয়াছেন,

"স সন্ধার্য্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোহধার্য্যোদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥"

অর্থাৎ যিনি পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ও ইহলোকে নিত্য সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্ন সহকারে এই গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়-গণকে আয়ত্ত করিতে পারেন না, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

* "যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তিসংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিং॥" মনু ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯০ শ্লোক।
অর্থাৎ "যেমন গঙ্গা শোণ প্রভৃতি সমুদয় নদ নদী সাগরে যাইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও সকলে গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করে।"

† মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্যপ্রকরণ দেখ।

তুকারাম।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

হিন্দুজাতির সাধারণ বিশ্বাস যে যিনি যতই মহাপুরুষ হউন, দীক্ষা না হইলে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। এই প্রচলিত বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়াই আমাদিগের কথক ও গায়কগণ আজন্মতপস্বী মহাত্মা ধ্রুবকেও প্রথমে মহর্ষি নারদের দ্বারা দীক্ষিত করাইয়া, পরে তাঁহাকে ভগবানের প্রসাদ লাভের উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। কঠোর আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে তুকারাম এক্ষণে দীক্ষা লাভের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দীক্ষা লাভ সাধারণ মনুষ্যদিগের ন্যায় হয় নাই। তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে, বিঠোবা তুকারামকে দীক্ষা যোগ্য দেখিয়া স্বয়ংই তাঁহাকে দীক্ষা দিবার সংকল্প করিলেন এবং তদনুসারে একদিন স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। মহীপতি এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে একদা মাঘের শুক্ল দশমী বৃহস্পতিবার তুকারাম পাণ্ডুরঙ্গের (বিঠোবা) মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া নিদ্রিত হইবার পর স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি ইন্দ্রায়নী হইতে স্নান করিয়া বিঠোবার মন্দিরে গমন করিতেছেন, সেই সময় একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তুকারাম আপনার অভ্যাসানুযায়ী ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং আপনার পরিচয় বা গুরু পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভক্ত বৈষ্ণব রাঘব চৈতন্যের শিষ্য কেশব চৈতন্য, আমি তাঁহার শিষ্য, আমার নাম বাবাজী চৈতন্য;" এবং তাহার পর বলিলেন, "তুকারাম তুমি কিছুতেই পাণ্ডুরঙ্গের উপাসনা ও ধ্যান পরিত্যাগ করিও না।" তুকারাম পরম প্রীত মনে বলিলেন, আপনি আমার আশ্রমে পদার্পণ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন্। ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়া তুকারামের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু অবলাই এই নূতন অতিথিকে দেখিয়া তুকারামের সঙ্গে কলহ আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণ সেই অবসরে অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই সময় তুকারামের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অদর্শনে তিনি একান্ত ব্যাকুলিত হইলেন এবং সংসারে থাকাতেই

যে তাঁহার স্বপ্নেও শান্তি ঘটিতেছে না এই ভাবিয়া আবার কিছু দিনের জন্য তিনি সংসার পরিত্যাগ করিলেন। অতিথি অভ্যাগতের সেবার জন্যই সংসারধর্ম্ম, কিন্তু স্বপ্নেও যখন তাঁহার সেই সেবাধর্ম্ম প্রতিপালনের শক্তি নাই, তখন এ সংসার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই তুকারাম "বল্লালের বন" নামক একটী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে সেখান হইতে আসিয়া ইন্দ্রায়নীতে স্নানানন্তর বিঠোবার পূজা করিয়া পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রতিগমন করিতেন। তখন তিনি সাধুভক্ত বলিয়া সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য আহার্য্য দ্রব্য লইয়া যাইতেন। যে দিন কিছু সংগ্রহ না হইত, সে দিন উপবাস করিতেন। প্রায় দুই মাস কাল এইরূপ অরণ্য বাসের পর এক দিন তুকারাম ইন্দ্রায়নীতে স্নানার্থ আগমন করিয়াছেন, অবলাইও সেই সময় জল আনয়নের জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুকারামকে দেখিয়া অবলাই তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি আজ দুই মাস আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ; আমাদিগের উপায় কি হইতেছে, তাহা কি তোমার মনে হয় না?" তুকারাম বলিলেন, "বিঠোবা ও রুক্মিণী জগতের পিতামাতা, আমরা সকলেই তাঁহাদিগের সন্তান, তুমি তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হও, তোমার অভাব থাকিবে না।" অবলাই অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া বলিলেন, "আমি আর তোমার ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যাঘাত করিব না, তুমি গৃহে চল, সেখানে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিবে।" তুকারাম স্বীকৃত হওয়াতে পতি পত্নীর এক প্রকার পুনর্ম্মিলন হইল, কিন্তু অবলাই যে অধিক কাল আপনার কথামত কার্য্য করিতে পারেন নাই, তাহা বলা অতিরিক্ত।

যাহা হউক তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার অঙ্গনস্থিত তুলসীমঞ্চের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক হরিভজন আরম্ভ করিলেন এবং অবলাইয়ের শিক্ষার জন্য তাঁহাকেও পার্শ্বে বসাইয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারাম কথকতা ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করা অবধি তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই লোকসমাগম হইত, অবলাই তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তুকারাম পত্নীকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ বিঠোবার সেবা করাতে সমস্ত বিশ্বই এক্ষণে আমাদের আত্মীয় হইয়াছে। নিজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কে কোথায় কাহার গৃহে গমন করে? ইহারা যে সকল কার্য্য ছাড়িয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি কোথায় তাহাতে গৌরবান্বিত হইবে, না বিরক্ত

হও। ইহাত কর্ত্তব্য নয়। পুত্র কন্যাদির জন্য তোমার এত চিন্তা কেন? বিঠোবা জগতের প্রতিপালক, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে শিখিলে তোমার কোন অভাবই থাকিবে না। যত দিন সাংসারিক পদার্থের প্রতি তোমার মমতা থাকিবে, তত দিন তোমার হরিসাধন হইবে না। আগামী কল্য অতি শুভদিন, চিত্তকে দৃঢ় করিয়া ও বিনশ্বর পদার্থের প্রতি মায়া ত্যাগ করিয়া সংসারের যাহা কিছু আছে, দেব দ্বিজাদির সেবায় নিযুক্ত কর, এবং বৈষ্ণবের দাসী হইয়া অনন্যচিত্তে সাধুগণের শরণাপন্ন হও। ক্ষণস্থায়ী সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া যদি বিঠ্ঠলের নাম গানে মগ্ন হইতে পার, তাহা হইলে পরমানন্দের অধিকারিণী হইবে।” তুকারাম একাদশটী অভঙ্গে পত্নীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল অভঙ্গ “পূর্ণবোধ” নামে পরিচিত। তুকারামের উপদেশের গুণেই হউক, বা নিজের কথা রক্ষার জন্যই হউক, অবলাই পরদিন আপনাদিগের যথাসর্ব্বস্ব বিতরণে স্বীকৃতা হইলেন; এবং পরদিন প্রাতঃস্নানান্তে আপনাদিগের গৃহস্থালীর সমস্ত সামগ্রী বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহীপতি বলেন, যে এইরূপে তুকারামের তৈজস পাত্র বস্ত্রাদি সমস্তই বিতরিত হইল। এমন কি চুল্লীর পাংশু পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদিগের কার্য্যে লাগিবে বলিয়া প্রদত্ত হইল। সমস্ত দ্রব্য বিতরিত হইলে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক আসিয়া তুকারামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তুকারামের গৃহে তাঁহাকে দিবার উপযুক্ত আর কোন সামগ্রীই তখন ছিল না। অবলাইএর একখানি মাত্র জীর্ণ বস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, তুকারাম পত্নীর আজ্ঞাতে তাহাই লইয়া বৃদ্ধাকে প্রদান করিলেন। অবলাই এপর্য্যন্ত সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার লজ্জানিবারণ একমাত্র বস্ত্র বিতরিত হইতে দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য্যলোপ হইল। এরূপ অবস্থায় যাহা সম্ভব অবলাই সেইরূপ সুমিষ্ট ভাষায় তুকারামকে পুরস্কৃত করিলেন। সে সকল এস্থলে উল্লেখ করার আবশ্যক নাই। মুখরা-ভার্য্য দরিদ্র পাঠক স্বয়ংই তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। নিজের এই সময়কার পারিবারিক অবস্থা ও পত্নীর ব্যবহার সম্বন্ধে তুকারাম যে কয়টী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার যাহা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

৫৬৬

আমারি বেলায় উনি যোগী,
নিজের ত বাকী নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে. শুধু
আমারি ত ঘুচিল না দুখ।
ঘরে ঘরে অন্ন নেই ব’লে
বল দেখি যাই কার দ্বার?
এই পোড়া সংসারের তরে
আপদ সহিব কত আর?
অন্ন অন্ন কোরে রাত দিন
ছেলে গুলো খেলে যে আমায়!
মরণ তাদের হয় যদি
সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান,
তিল মাত্র ঘরে থাকা ভার।
ঘরে যে গোবর দিতে হবে,
একটিও গরু নাই তার।
তুকা বলে, “দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে, মিছে
কাঁদিলে কি হবে বল আর।”

৫৬৭

বোধ হয় এ পাষণ্ড,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল মোর অরি।
এ জনমে স্বামী হোয়ে
বৈর সাধিতেছে এত করি!
কত দুঃখ সব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে।
বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল কোল্লেন এ সংসারে?
তুকা বলে “স্ত্রী আমার
রাগিয়া কতই কটু ভাষে।
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।”

৫৬৮

ঘরে দুটা অন্ন এলে
ছেলেদের দেব কোথা থেকে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে চা’ন দিতে!
তুকা বলে “অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত!
না জানি যে পূর্ব্ব জন্মে
কতই করিয়াছিলি পাপ।”
তুকা বলে “এ জনমে,
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।”

৫৬৯

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া
আমাদের দেখেন না চেয়ে!
খর্ত্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান্ গেয়ে গেয়ে।
কি করিব বল্ দেখি বাছা,
কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রাতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।
তুকা বলে “ধৈর্য্য ধর মনে
এখনো সকল ফুরায় নাই।”

৫৭০

গেছে সে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
যা হোক্ তা হোক্ কোরে
পেটভরে খেতে পাবে দুটি।
বোকে বোকে দিনু এল্যো,
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে “যদিও সে
দিবানিশি কত কটু ভাষে।
তুকারে তুকার স্ত্রী যে
মনে মনে তবু ভাল বাসে।’

৫৭১

ঘরে আর আসে না সে,
কোন পরিশ্রম নাহি কোরে
নিজে না কি খেতে পায়
রোজ রোজ সুখে পেট ভোরে।
না উঠিতে শয্যা হতে
মিলি দল-বল-গুলা সাথে
করতাল বাজাইতে
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন।
ঘরে আছে ছেলে পিলে,
তাদের তো না করে যতন।

স্ত্রী তাদের পোড়ে আছে—
হতভাগী লাজ-দুঃখ-ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে—
মাথায় পাথর ভেঙ্গে মরে।
"ভাগ্যে যাহা আছে তাহা,"
তুকা বলে "থাক সহ্য কোরে।"

৫৭২

হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে ?
তুকা কহে "ঈশ্বরের তরে,
ব্রহ্মাণ্ড মিলিছে মোর সাথে।
"ভাল মুখে দু চারিটা কথা,
না জানি তাহে কি ক্ষতি আছে !
"কোথাও যায় না যারা কভু
ভালবেসে বসে মোর কাছে।
"এও সে বাসে না ভাল হায়,
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া,
"সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া।"

তুকারামের গার্হস্থ্য সুখ কিরূপ ছিল, এই সকল কবিতাই তাহার প্রমাণ। তুকারামের তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র ছিল।

কন্যা তিনটীর নাম কাশী, ভাগীরথী ও গঙ্গা ; পুত্র দুইটীর নাম মহাদেব ও বিঠোবা। প্রথমা কন্যাটী বিবাহযোগ্যা হইলে অবলাই তাহার বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। তুকারামকে কন্যার বিবাহের কথা বলাতে তুকারাম পাত্র অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই বৈবাহিক শুভ দিন ছিল। তুকারাম রাজপথে বাহির হইয়া ক্রীড়াশীল বালকদিগের মধ্যে আপনার স্বজাতীয় তিনটী বালক মনোনীত করিলেন এবং তাহাদিগকে নিজের গৃহে আনয়ন করিয়া একবারেই তিনটী কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহের প্রীতিভোজন করাইবার অবস্থা তাঁহার ছিল না, বাজ্‌রা নামক শস্যের রুটী ও সামান্য একটু দুগ্ধ, ইহাই জামাতাদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। পরদিন এসংবাদ পাত্রদিগের পিতামাতার গোচর হইল। কিন্তু তুকারামের ন্যায় সাধুপুরুষের সহিত কুটুম্বিতা স্পৃহনীয় ভাবিয়া, তাঁহারা অসন্তোষের পরিবর্ত্তে এই বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গ্রামস্থ লোকেরাও তুকারামকে কিছু কিছু সাহায্য করিলেন এবং সকলের অনুগ্রহে বিবাহোৎসব একরূপ সুসম্পন্ন হইল।*

তুকারামের খ্যাতি ক্রমশঃ এরূপ বিস্তৃত হইতেছিল, যে অতি দূরদেশ হইতেও অনেকে আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। প্রবাদ আছে যে, একবার কোন জ্ঞানপিপাসু ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য পণ্টরপুরে বিঠোবার শরণাপন্ন হইলে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়া-

* এই বিবাহ সম্বন্ধে মহীপতি বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কথা হইতে সন্দেহ হয়, যে তুকারাম একই দিনে এরূপ ভাবে তিনটী কন্যার বিবাহ দেন নাই ; কোন একটীরই দিয়া থাকিবেন।

ছিল যে তিনি জ্ঞানেশ্বরের আরাধনা করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ তদনুসারে জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরে যাইয়া আরাধনা আরম্ভ করিলেন। সেখানে তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ হইল যে "তুমি দেহুতে যাইয়া তুকারামের শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ তুকারামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার শিক্ষার জন্য একাদশটী অভঙ্গ রচনা করিলেন এবং সেই সঙ্গে একটী নারিকেল ফলও ভগবৎপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তুকারামের অভঙ্গগুলি সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে সাধারণ মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত দেখিয়া শাস্ত্রজ্ঞান প্রয়াসী ব্রাহ্মণের তাহা প্রীতিকর হইল না। তিনি একরূপ অবজ্ঞার সহিত তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রতি আর কোন রূপই প্রত্যাদেশ হইল না। এদিকে কোণ্ডোবা নামক একটী নিরহঙ্কার ও অমায়িক প্রকৃতি ব্রাহ্মণ বহুদূর হইতে ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত অভঙ্গগুলি ও নারিকেল ফলটী অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব সম্যক্ পরিস্ফুরিত হইল। তুকারামের রচিত এই অভঙ্গগুলি, "উত্তম জ্ঞান" নামে পরিচিত। তাঁহার শিষ্যগণ এখনও তাহা অতি সমাদরে পাঠ ও গান করিয়া থাকেন। নারিকেল ফলটীর সম্বন্ধেও এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, যে একজন ধনী বণিক আপনার কোন মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে প্রচুর অর্থ উপহার দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তাঁহার সংকল্পিত উপহার যেন তিনি তুকারামকেই প্রদান করেন। পাছে তুকারাম তাঁহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃত হন, সেই আশঙ্কায় বণিক্ কৌশলক্রমে নারিকেলটীর ভিতর বহুমূল্য মণিমুক্তাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা তুকারামকে প্রদান করিয়াছিলেন। নিস্পৃহ তুকারাম সেই দিনই তাহা জ্ঞানপিপাসু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করাতে কোণ্ডোবা তাহা প্রাপ্ত হন এবং তাহা ভগ্ন করিয়া তাহার অভ্যন্তর মণিমুক্তাদিতে পরিপূর্ণ দেখেন। এই ঘটনাটীর কোন কোন অংশ অতিরঞ্জিত হইলেও, তুকারামের প্রতিপত্তি এই সময় কিরূপ দেশব্যাপী হইয়াছিল, ইহা হইতে আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

অগ্নিপরীক্ষা।*

১৮১৪ খৃঃ অব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নেপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারেল মার্লি কাটামুণ্ডু আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনারেল উড গোরক্ষপুরে ছাউনি করিয়া তরাই প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টার্লোনি নেপাল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অমরসিংহের সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন; আর জেনারেল গিলেস্পি দেরাহুন হইতে কলুঙ্গা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে নেপাল রাজ্য চারি বিভিন্ন স্থান হইতে একেবারে আক্রান্ত হইল। নেপাল রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা সমুদয়ে দ্বাদশ সহস্র, তাহার বিরুদ্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঊনত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধের কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—প্রয়োজনও নাই।

অগ্নিদগ্ধ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না। মনুষ্যও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রলয়কালে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা ও বন্ধন ঊর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায়, বীরপুরুষ তখনই মুক্ত হইয়া আপনার প্রকৃতরূপ প্রকাশ করেন।

আমরা এই যুদ্ধানল হইতে একটী স্বর্ণকণা উদ্ধার করিব। এই যুদ্ধ ঘোষণার সময় নেপাল সীমান্তপ্রদেশে কলুঙ্গা নামক স্থানে অল্পসংখ্যক একদল গোরক্ষ সৈন্য ছিল। সৈন্যসংখ্যা তিন শত মাত্র; বলভদ্র থাপা তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। এস্থানে বহুদিনের পুরাতন একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ ছিল। অস্ত্র শস্ত্রেরও বিশেষ অভাব—কাহারও তীর, ধনু ও খুড়কী, কাহারও বা পুরাতন বন্দুক—ইহাই যুদ্ধের উপকরণ। এত কাল যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ছিল না, এই জন্য সৈনিকেরা তাহাদের পুত্র কলত্র লইয়া এই স্থানে বাস করিতেছিল। স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড় শত হইবে।

হঠাৎ এক দিন সংবাদ আসিল যে ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং কলুঙ্গা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বলভদ্র এই সংবাদ

* দুই বৎসর পূর্ব্বে লেখক নেপালের সীমান্তপ্রদেশে ভ্রমণকালে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করেন। "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন এই যুদ্ধ সম্বন্ধে অতি সুন্দর এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

পাইয়া পুরাতন ভগ্ন প্রাচীর কোন প্রকারে সংস্কার করিতে লাগিলেন। গোরক্ষ সেনাপতি স্ত্রীলোক ও শিশুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত; সৈন্য ও অস্ত্রাভাবে একান্ত বিপন্ন। এমন সময়ে ইংরেজ সেনাপতি মাউব্রি পঁয়ত্রিশ শত সৈন্য ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া সত্বর এই স্থান অবরোধ করিলেন।

যে যুদ্ধে জয়ের আশা থাকে, সে যুদ্ধ অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু যাহাতে পরাভব নিশ্চিত, সে যুদ্ধ যুঝিতে অমানুষিক বলের প্রয়োজন।

দেখিতে দেখিতে ইংরেজ সৈন্য দুর্গের চারিদিক সেনাজালে আবদ্ধ করিল। বলভদ্র ভাবিতেছিলেন, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সুদিনে কলুঙ্গার সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখন দুর্দ্দিন উপস্থিত, আজ নিমকের পরীক্ষা হইবে।

২৫শে অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ইংরেজ দূত বলভদ্রের নিকট যুদ্ধ পত্র লইয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বলভদ্র শয়ন করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ইংরাজ সেনাপতির পত্র আসিল। পত্রে লিখিত ছিল, "এই অসময় যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করা বীরপুরুষের গ্লানিজনক নহে; গোরক্ষ সেনাপতির বিনা রক্তপাতে দুর্গাধিকার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" উত্তরে গোরক্ষ সেনাপতি ইংরেজ দূতকে বলিলেন, "তোমাদের সুবাদারকে বলিও, আগামী কল্য যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ইহার উত্তর পাইবেন।"

পরদিন প্রত্যূষে কামানের গর্জ্জন এই ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তর লইয়া আসিল। চতুর্দ্দিকে কামানের অগ্নির ধূম অপসারিত হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজ সেনাপতি সমস্ত সেনা লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রস্তর স্তূপের পশ্চাতে এক অদম্য শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, কামানের গোলা তাহাকে ভেদ করিতে পারে না; সেই মানসিক মহাশক্তি আজ চকিতে দেখা দিল এবং সুবাদার হইতে সামান্য সেনার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কেবল যোদ্ধার হৃদয়ে নহে—দুর্ব্বল নারী ও নিরুপায় শিশুকেও সেই মহা অগ্নিশিখা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

ইংরেজ সৈন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইল। পরিশেষে জয়ের আশা নাই দেখিয়া দেরাহুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

তৎপরদিন জেনারেল গিলেস্পি দুর্গভগ্ন করিবার উপযোগী নূতন কামান এবং নূতন সৈন্য লইয়া মাউব্রির সহিত যোগ দিলেন। স্থির হইল চারি সৈন্য-

দল এক সময়ে চারিদিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবে এবং কামানের গুলিতে দুর্গ-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অবারিত দ্বারে দুর্গে প্রবেশ করিবে।

২৬শে তারিখের নয় ঘটিকার সময় এই বিরাট আক্রমণ আরব্ধ হইল, কিন্তু অল্প সময়েই ইংরেজ সৈন্য পরাহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন জেনারেল গিলেস্পি স্বয়ং তিন দল নূতন সৈন্য লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। একেবারে বহুসংখ্যক কামান অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া দুর্গে অনলপূর্ণ গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সন্ত্রস্ত গোরক্ষ সেনা এখন চতুর্দ্দিক হইতে একেবারে আক্রান্ত হইল।

দুর্গের নামমাত্র যে প্রাচীর ছিল, এই ঝটিকায় তাহা আর রক্ষা পাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তরস্তূপ বালুর বাঁধের ন্যায় খসিয়া পড়িল। আক্রান্ত গোরক্ষ সৈন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই সময়ে সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষিত হইল; ভগ্নস্থানে মুহূর্ত্ত মধ্যে এক প্রাচীর উত্থিত হইল। এই নূতন প্রাচীর সুকোমল নারীদেহে রচিত। গোরক্ষ রমণীগণ স্বীয় দেহ দ্বারা প্রাচীরের ভগ্নস্থান নিমেষে পূর্ণ করিলেন। ইহার অনুরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। কার্থেজের রমণীরা স্বীয় কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধনুর জ্যা রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু রক্তমাংস গঠিত জীবন্ত শরীর দিয়া কুত্রাপি দুর্গ-প্রাচীর নির্ম্মিত হয় নাই। কেবল প্রাচীর নহে—এই দুর্ব্বল কষ্ট অসহিষ্ণু দেহ বজ্রবৎ কঠিন ও রণে ভীষণ সংহারক অস্ত্র হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জেনারেল গিলেস্পি সসৈন্যে দুর্গ-প্রাচীর অতিক্রম করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই বক্ষে গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুগামী সৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যেই তীর ও গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল; ইংরেজ সৈন্যের ভগ্নাবশেষ দেরাদুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ইহার পর দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য দল ও বহুসংখ্যক কামান যুদ্ধ স্থানে প্রেরিত হইল। ২৪শে নবেম্বর তারিখে এই নূতন সৈন্য দল কলুঙ্গা আক্রমণ করিল।

এবার কামানের গুলি বারুদ ও গোলাপূর্ণ সেল অনবরত দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, ভূমি স্পর্শ মাত্র এই গোলা ভীষণ রবে শতধা বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। এত

দিন যোদ্ধায় যোদ্ধায় প্রতিযোগিতা চলিতেছিল—যাহারা মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি নির্ভীকচিত্তে দর্শন করিতে পারিত, এতদিন মৃত্যু তাহাদিগকেই স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু এখন মৃত্যু সর্ব্বগ্রাসীরূপে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। মাতার বক্ষে থাকিয়াও শিশু উদ্ধার পাইল না।

এক মাসের অধিক কাল কলুঙ্গার অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। আহার্য্য সামগ্রী ফুরাইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের উপকরণও নিঃশেষ প্রায়। এত বিপদের মধ্যেও যোদ্ধারা অবিচলিতচিত্ত। মুমূর্ষু শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য সাগরোর্ম্মির ন্যায় ইংরেজ সৈন্য দুর্গোপরি বারংবার পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু গোরক্ষ সৈন্য অমানুষী শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বারুদ ফুরাইলে তীর ধনু দ্বারা, তাহা ফুরাইলে প্রস্তর নিক্ষেপে শত্রু বিনাশ করিতে লাগিল। এই অসম সংগ্রামে গোরক্ষদেরই জয় হইল। দুর্গাধিকারের কোন আশা নাই দেখিয়া ইংরেজ সৈন্য দেরাদুনে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

এমন সময়ে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে কলুঙ্গার দুর্গে পানীয় জল নাই। দুর্গের বাহিরের এক নির্ঝরিণী হইতে গোরক্ষেরা রাত্রির অন্ধকারে জল লইয়া যায়। এই জল বন্ধ করিতে পারিলেই তৃষ্ণাতুর শত্রু নিরুপায় হইয়া পরাভূত হইবে।

নির্ঝরিণীর জল বন্ধ করা হইল। ইহার পর দুর্গমধ্যে যে ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তাহা কল্পনারও অতীত, আহত ও মুমূর্ষ নরনারী এবং শিশুর "জল জল" এই আর্ত্তনাদ কেবল মৃত্যুর আগমনেই নীরব হইল।

এদিকে ইংরেজেরা শত্রুকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া সিংহশিশুদিগকে জীবন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দুর্গের চতুর্দ্দিকে সৈন্যপাশ দৃঢ়ীকৃত হইল। অবরুদ্ধ দুর্গের বহির্গমন পথে বহু সংখ্যক সৈন্য সমাবেশিত হইল। তাহারা দিবারাত্রি পথ অবরোধ করিয়া রহিল।

গোরক্ষ সৈন্য সংখ্যা প্রথমে তিন শত ছিল, মাসাধিক যুদ্ধের পর সত্তর জন মাত্র রহিল। চারি দিন পর্য্যন্ত ইহাদের কেহ এক বিন্দু জল স্পর্শ করে নাই, অনশন ও তৃষ্ণা নীরবে সহ করিয়াছে—তাহারা এ সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছিল, কিন্তু নারী ও শিশুর আর্ত্তনাদ ক্রমে অসহ হইয়া উঠিল। শত্রুর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেই এই দারুণ কষ্ট শেষ হয়। কিন্তু হস্তের তরবারী শত্রুর পদে স্থাপন প্রাণ থাকিতে হইবে না। জীবন থাকিতে কোন উপায় নাই—

জীবন দিয়াই বা কি উপায় আছে ? সম্মুখে চারিদিক বেষ্টন করিয়া লোহিত রেখার জাল ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতেছে—সেই রেখার মধ্যে মধ্যে অসিত বর্ণ কামানের বিকট মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে—এই জালে কি আবদ্ধ হইতে হইবে ? অথবা জীবনবিন্দু এই রক্তিমা ক্ষণিকের জন্য গাঢ়তর করিবে ?—তবে তাহাই হউক !

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। যে দ্বার সঙ্গীন ও কামানের গোলার আঘাতে উদ্ঘাটিত হয় নাই, আজ তাহা স্বতঃই উন্মুক্ত হইল। আত্মবলিদানে উন্মুখ সেই সত্তরটী বীর—মুষ্টিপ্রমাণ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায়—অগণিত শত্রুদলের উপর পতিত হইল এবং অসির আঘাতে পথ কাটিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল।

পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ সৈন্য, যোদ্ধৃপরিত্যক্ত দুর্গে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের উল্লাস বিষাদে পরিণত হইল। এই কি দুর্গ ? না—শ্মশান ? এই শবকবন্ধমণ্ডিত ভূমিতে কি প্রকারে মানুষ এত দিন বাস করিয়াছে ? আহত, জীবিত ও মৃতের কি ভয়ানক সমাবেশ ! এই যে সম্মুখে সুবাদারের মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত চারি বৎসরের একটি শিশু কাঁদিতেছে। তাহার একটু অগ্রে একটী স্ত্রীলোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দুই উরু ভেদ করিয়া কামানের গোলা চলিয়াগিয়াছে। অদূরে বহু ছিন্ন হস্ত পদ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে—এ স্থানে সেল পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল। নিকটে কয়েকটী শিশু রক্তাপ্লুত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে—এখনও তাহাদের প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই। চতুর্দ্দিকে কেবল জল জল এই কাতর ধ্বনি ! †

* * * * *

† "At three o'clock in the morning Major Kelly entered and took possession of the fort ; and there indeed the desperate courage and bloody resistance they had opposed to means so overwhelming, were mournfully and horribly apparent. The whole area of the fort was a slaughter house strewed with the bodies of the dead and wounded and the dissevered limbs of those who had been torn to pieces by the bursting of the shells ; those who yet lived piteously calling out for water, of which they had not tasted for days. The bodies of several women by shots and shells were discovered, and children mangled yet alive, by the same ruthless engines.

The determined resolution of the small party which held this small post, for more than a month, against so large a force, most surely wring

বলভদ্র সত্তরটী সঙ্গী লইয়া যৌতগড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল কিন্তু অধিকার করিতে পারে নাই। তৎপর বলভদ্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া যৈতক দুর্গের আধিপত্য গ্রহণ করেন, এবং নেপাল যুদ্ধ শেষ হইলে স্বদেশে তাঁহার তরবারীর আর আবশ্যক নাই দেখিয়া সঙ্গী সহিত রণজিৎ সিংহের শিখ সৈন্যে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে রণজিৎ সিংহ আফগান যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। একবার তাঁহার একদল সৈন্য বহুসংখ্যক আফগান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল, কেবল সত্তরটী সেনা রণভূমি ত্যাগ করিল না। এই কয়টী সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রুর দিকে মুখ করিয়া অটল পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইহারা অনেক বিপদের সময় পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, আজ এই শেষবার সুবাদার ও সিপাহি এক শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে কামান গর্জ্জন করিতেছিল। এক এক বার সেই জীমূতনাদ পর্ব্বত ও উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করিতেছিল—সেই সঙ্গে শ্রেণী মধ্যে এক একটি স্থান শূন্য হইতে লাগিল, কিন্তু শ্রেণী টলিল না। পরিশেষে পাশাপাশি সত্তরটী শবদেহ অনন্ত শয্যায় শায়িত হইল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ধরায় পতিত হইয়া চির শান্তি লাভ করিল।

ইংরেজ সৈন্য কলুঙ্গা অধিকার করিয়া দুর্গ সমভূমি করিল। এখন পূর্ব্ব দুর্গ স্থানে বন্ধুর প্রস্তরস্তূপ দৃষ্ট হয়। সেই দারুণ বিগ্রহের লীলাভূমিতে এখন গভীর নির্জ্জনতা বিরাজিত। মৃত্যুর এ পারেই ঝটিকা, পরপারে বোধ হয় চিরশান্তি। মরণের পরপার হইতেই বোধ হয় কোন শান্তিময় আত্মা এই রণস্থলে আবির্ভূত হইয়া জেতৃগণের বীরহৃদয়ে করুণরস সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। যে স্থানে জেতা ও বিজিতের দেহধূলি একত্র মিশ্রিত হইতেছিল, সেই স্থানে ইংরেজ দুটী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল—ইহা অদ্যাপি দৃষ্ট

admiration from every voice, especially when the horrors of the latter portion of this time are considered, the dismal spectacle of their slaughtered comrades, the sufferings of their women and children, thus immured with themselves, and the hopelessness of relief, which destroyed any other motive for the obstinate defence they made, than that resulting from a sense of duty supported by unsubdued courage. This and a generous spirit of courtsey towards their enemy certainly marked the character of the garrison of Kalunga, during the period of its seige. * * They fought us in fair conflict like men, and in the intervals of combat showed us a liberal courtsey : so far from insulting the bodies of the dead and wounded, they permitted them to lie untouched till carried away."—

Mr. Fraser's Report.

হয়। একটী প্রস্তর ফলক জেনারেল গিলেস্পি ও কলুঙ্গা যুদ্ধে হত ইংরেজ সৈন্যের স্মরণার্থ স্থাপিত ; ইহার অদূরে দ্বিতীয় প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে:—

"আমাদের বীর শত্রু
কলুঙ্গা দুর্গাধিপতি বলভদ্র ও তাঁহার অধীনস্থ বীর সেনা—
যাঁহারা কলুঙ্গার অবরোধের পর শিখ সৈন্যে প্রবেশ করিয়া
রণে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন
এবং
আফগান কামানের সম্মুখীন হইয়া
একে একে অকাতরে প্রাণদান করিয়াছিলেন—
সেই বীরগণের স্মরণার্থ
এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল।"

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

জীবনোপায়।

(১৯৬ পৃষ্ঠার পর)

ঐ দিবস অপরাহ্ণে সাইমন-পত্নী বেলা থাকিতেই আপনার সমস্ত গৃহকর্ম্ম সারিয়া লইল। শীতকালের রাত্রি, স্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে পারে ; হিমে পথ চলিয়া গৃহে আসিয়া যাহাতে উষ্ণতা অনুভব করিয়া পথের শ্রান্তি ক্লান্তি বিস্মৃত হইতে পারে, একারণ সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পরিচর্য্যার্থ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করণাশয়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিল। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সন্তানদিগকে আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল ; কারণ তাহা না করিলে সন্তানগণের হাত পা উত্তপ্ত করিবার জন্য সন্ধ্যা হইতেই অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হয়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অগ্নি রাখিতে হইবে, এত কাষ্ঠ কোথায় পাইবে ?

সমস্ত দৈনিক কর্ম্ম সারা হইলে মাত্রিওনা ভাবিল,—"সাইমন অবশ্যই সহর হইতে কিছু আহার করিয়া চলিবে। তাহা হইলে রাত্রিতে তাহার আর আহার প্রয়োজন হইবে না। আমি একেবারে আহারাদি সমস্ত শেষ করিয়া তাহার পর অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া সাইমনের জামা শেলাই করিতে করিতে তাহার জন্য অপেক্ষা করিব।" এই ভাবিয়া মাত্রিওনা আহারে

বসিল। আহারান্তে যে রুটীটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহা হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিল,—"সাইম যদি বাড়ী আসিয়া কিছু খাইতে না চায়, তবে এই রুটীটুকুতে আমাদের কাল চলিয়া যাইবে। ঘরে যে ময়দা আছে, তাহাতে আর একটী মাত্র রুটী হইবে। আজ আর আমি ময়দা ভিজাইব না, কাল ভিজাইলেই চলিবে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মাত্রিওনা হস্তস্থিত রুটী তুন্দুরের উপর ঢাকিয়া রাখিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিল, এবং তাহার পাশে বসিয়া সাইমনের একটী ছেঁড়া জামাতে তালি লাগাইতে আরম্ভ করিল। সেলাই করিতে করিতে আবার সেই রুটীর কথা মনে করিয়া ভাবিতে লাগিল,—"একটী রুটীতে আমাদের তিন দিন চলে। ইতিমধ্যে যদি হাতে কোন কাজ এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থ না আসে, তবে এই চারি দিন কাটিয়া গেলে কি উপায় হইবে? আমার হাতে যে দুইটী রুবল ছিল, তাহাও সাইমকে দিয়াছি, এখন সমূহ অর্থাভাবে দেখিতেছি আহার বন্ধ করিতে হইবে। যেমন আহারের কষ্ট তেমনই শীতের কষ্ট ; শুবা না হইলেও ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গত শীতে কি ভয়ানক কষ্টই না পাইতে হইয়াছে। যাহা হউক কপালে দুঃখ থাকিলে কে খণ্ডাইবে? এবার ত একটী ভাল শুবা হইবে। আট রুবল ত কম কথা নয়! তাহাতে একটী ভাল চামড়া পাওয়া যাইবে, তার পর আমরা স্বামী স্ত্রীতে ঘরে শুবা সেলাই করিয়া লইব। এখন তাহাকে যদি দোকানদার না ঠকায়, তবেই রক্ষা। সাইম যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক! সে নিজে কাহাকেও এক পয়সা ঠকাইবে না, কিন্তু তাহাকে একটী বালকও ঠকাইয়া লইতে পারে। যদি ঠকিয়া আসে, কিম্বা চামড়া না পায়, তবে কি বিপদেই পড়িতে হইবে!"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে চলিল। সাইমনের বাড়ী ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মাত্রিওনা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, এবং উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতে লাগিল,—"আমার সাইম ত কোন মাতালের সঙ্গ লইয়া কোন মদ্যালয়ে রাত্রিযাপন করিতে যায় নাই?"—মাত্রিওনা হৃদয়ের আবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল ; এমন সময়ে বহির্দ্বারে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উহা মনুষ্যপদশব্দ নিশ্চয় জানিয়া সাধ্বী স্ত্রী তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিতে গেল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল,—"আমার স্বামীর পদশব্দ ত চিনিতে পারিলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে আবার একটী অপরিচিত পদশব্দও শুনা গেল। এ ব্যক্তি কে?"

৪

মাত্রিওনা দ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। সাইমন এবং অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইল যে সাইমনের হাত খালি, চামড়া আনে নাই! তাহার পুরাতন শুবাটী পর্য্যন্ত গায়ে নাই। অধিকন্তু সাইমনের মুখে মদ্যগন্ধ! অপরিচিত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল যে স্বামীর শুবাটী তাহার গায়ে রহিয়াছে; অধিকন্তু তাহার শির নগ্ন, ও পায়ে যে জুতা আছে, তাহাও যেন অন্যের জুতা, পায়ে ঠিক বসিতেছে না। এই সকল দেখিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বা স্ত্রীর মনে যে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, মাত্রিওনার তাহাই হইল;—সাইমন রাস্তায় এই অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; সে ব্যক্তির প্রলোভনে পড়িয়া উভয়ে মদ্যালয়ে গিয়াছে এবং সাইমনের অর্থে উভয়ে মদ্যপান করিয়াছে; সে সাইমনকে মাতাল করিয়া তাহার শুবাটী পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়াছে; তাহার পর আরও কোন দুরভিসন্ধি মনে মনে আঁটিয়া সাইমনের সঙ্গ লইয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছে! এই ধারণা হইতে আগন্তুকের প্রতি মাত্রিওনার বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইল।

সাইমন গৃহ প্রবেশ করিয়াই মাথার টুপি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল এবং নিজে একটী বেঞ্চের এক পাশে উপবেশন করিয়া আগন্তুককেও বসিতে ডাকিল। আগন্তুক গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া যখন দেখিল যে গৃহস্বামিনী তাহাকে প্রবেশার্থ আহ্বান করিল না, তখন সে দ্বারদেশে দাঁড়াইল এবং একান্ত দীননেত্রে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সেই করুণ দৃষ্টি মাত্রিওনার চক্ষে পড়িল না। মাত্রিওনা ভাবিল,—এ ব্যক্তির অভিসন্ধি ভাল নহে, তাই আমাকে দেখিয়া আর গৃহ প্রবেশ করিতে সাহস পাইতেছে না। মাত্রিওনা দ্বারদেশ হইতে সরিয়া তন্দুরের নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

সাইমন মাত্রিওনার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"অমন মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন? সমস্ত দিনের পর বাড়ী আসিলাম, একটীও কথা কহিতেছ না যে? আজ সমস্ত দিন অনাহারে গিয়াছে; আমাদিগকে কিছু খাইতে দিবে না?"

মাত্রিওনা কিছুই উত্তর দিল না কিম্বা এক পাও নড়িল না। সাইমন মনে মনে বুঝিল, গতিক ভাল নহে! আগন্তুককে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এস, ভাই, বস। মাত্রিওনা আমাদের জন্য

অবশ্যই খাবার রাখিয়াছে। এস, দুজনে ত আগে খাই, তাহার পর কথা বার্ত্তা হইবে। আগন্তুক আসিয়া বেঞ্চের এক কোণে অতি সন্তর্পণে উপবেশন করিল। কিন্তু মাত্রিওনা এক পাও নড়িল না। সাইমন আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ তুমি কিছুই রান্না কর নাই?"

মাত্রিওনা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল,—"রান্না করিব না কেন? কিন্তু মাতালদের জন্য আমার রান্না নহে। আমি প্রাতে এত অনুনয় করিয়া তোমাকে মদ্যপান করিতে বারণ করিয়া দিলাম, তুমি আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই। তুমি নূতন শুবার জন্য চামড়া আনিতে গিয়া পুরাতন শুবাটী পর্য্যন্ত তোমার মাতাল সঙ্গীকে দিয়া আসিয়াছ। কেবল তাহা নহে. সেই উলঙ্গ মাতালকে নিজের পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া আবার গৃহে আনিয়াছ। এমন সব মাতালকে আমি আহার দিতে পারি না।"

সাইমন উত্তর করিল,—"এইরূপ ভাবে কথা বলা তোমার বড়ই অন্যায়। তুমিত একবার জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতে যে এ ব্যক্তি"—

মাত্রিওনা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"আমার টাকা কি করিয়াছ?"

সাইমন শুবার আস্তরণের ভিতর হইতে মাত্রিওনা-দত্ত রুবল দুইটী বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। মাত্রিওনা লম্ফ দিয়া রুবল দুইটী কবলিত করিল, এবং "মাতালদিগকে আমি খাইতে দিতে পারি না" বলিয়া গৃহকোণে গিয়া দাঁড়াইল।

সাইমন বলিল,—"বারে বারে কেবল গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছ। গালি দিবার আগে একবার আমার কথা শুন।"

মাত্রিওনা আবার বাধা দিয়া বলিল,—"মাতালের কথা আবার কে শুনে? এমন মাতালের হাতে বিধাতা আমায় ফেলিয়াছেন যে স্ত্রী পুত্র অনাহারে শীতে প্রাণ দিতেছে, কিন্তু তাহার মদ্যপানে বিরতি নাই। মা আমাকে কাপড় পাঠাইয়া দেন, আমি তাহা নিজে না পরিয়া তোমাকে পরাই, তুমি তাহা দিয়া মদ খাইয়া আইস। তোমাকে টাকা দিয়া চামড়া কিনিতে পাঠাই, তুমি সেই টাকা দিয়া মদ খাও।"

এইরূপে মাত্রিওনার রাগ ক্রমশঃ বিলাপে পরিণত হইল। কিয়ৎক্ষণ বিলাপের পর যখন দেখিল যে সাইমন কিছু উত্তর দিল না, তখন আবার রাগের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাইমনের ইচ্ছা ছিল যে মাত্রিওনাকে আগ-

স্তুক ব্যক্তি সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলে; কিন্তু মাত্রিওনা তাহাকে আর একটীও কথা বলিবার অবসর না দিয়া ক্রমাগত গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে একান্ত রোষপরবশ হইয়া দৌড়াইয়া সাইমনের নিকট গিয়া তাহার নিজের অঙ্গাভরণটী স্বামীর গাত্র হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহাদ্বারা স্বীয় মস্তক আবৃত করিয়া গালি দিতে দিতে গৃহবহিষ্কৃত হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

মাত্রিওনা দ্বারদেশে যাইতে যাইতে ভাবিল যে আগন্তুক ব্যক্তি একটীও কথা কহিতেছে না! তবে কি সে মাতাল নহে? মাতাল ত কখনও এত গালি খাইয়াও কোন উত্তর না দিয়া অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা ভাবিয়া সে দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—"এ ব্যক্তি যদি ভাল লোক হইবে, তবে উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় আসিবে কেন? আর তোমরা যদি কোন অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিবে, তবে তুমি এতক্ষণ আমাকে বলিতেছ না কেন এ ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় কোথায় কুড়াইয়া পাইলে?"

সাইমন বুঝিল, এই তাহার কথা কহিবার সুযোগ; এই সুযোগে মাত্রিওনার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতে না পারিলে মাত্রিওনা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে বলিল,—"আমি ত কতবারই বলিতে যাইতেছিলাম, কোথায় কি অবস্থায় এ ব্যক্তিকে পাইয়াছি; কিন্তু তুমি আমাকে বলিবার অবসর দিলে কই? যাহা হউক এখন বলি শুন।" এই বলিয়া সে যেরূপে আগন্তুককে ক্ষুৎপিপাসায় ও শীতে জড়সড় এবং কাতরাবস্থায় গীর্জ্জার পার্শ্বে পতিত দেখিয়াছিল, তাহা সমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিল। তৎপর বলিল,—"ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে যে আমি সেই সময় তাহার উদ্ধারার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম, নতুবা তাহার কি অবস্থা হইত কে বলিবে? এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না। পরের দুঃখে সাহায্য করিতে সক্ষম হওয়া যখন যাহার ভাগ্যে ঘটে, তখন তাহার পরম সৌভাগ্য; ও তাহারই প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে! মাত্রিওনা, এইরূপ দৈবানুগৃহীত কার্য্যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া মৃত্যুমুখগত ব্যক্তির প্রলাপের ন্যায়। ইহাতে তোমার ক্রোধ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? তোমাতে কি ঈশ্বর নাই?"

এতক্ষণ মাত্রিওনা অত্যাচরিত গৃহিণীর ভাবে কথা বার্ত্তা বলিতেছিল। সাইমনের এই কথা কয়টী তাহার প্রাণে পৌঁছিয়া অকস্মাৎ তাহার মাতৃভাব জাগরিত করিয়া তুলিল। মাত্রিওনা আগন্তুককে ক্লিষ্ট ও বিপন্ন সন্তানের ন্যায় মনে করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তখন আগন্তুকের করুণ দৃষ্টি মাত্রিওনার নেত্রপথে প্রথম পতিত হইল। আহা! কি মর্ম্মভেদী দৃষ্টি! সেই দৃষ্টিতেই মাত্রিওনা বুঝিয়া লইল, এ জগতে আর আগন্তুকের আশ্রয় অবলম্বন কিছুই নাই!

যে রমণী একবার মাতৃত্বের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার প্রেমে আর জোয়ার ভাঁটা থাকে না; তাহা নিয়ত বেগে এক দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন যাহাকে ঘৃণা করিতে হয়, তখন সমস্ত প্রাণ মন দিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবে, আবার যখন ভাল বাসিতে হয়, তখনও আপনা ভুলিয়া ভাল বাসিবে। রমণী যে পর্য্যন্ত আপনাকে মাতৃস্থানীয়া অনুভব না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ভিতরে প্রেমের ভাব পুঁথিগত বিদ্যার ন্যায় থাকে; তাহা প্রাণেতে মিশিয়া যায় না। কারণ মাতৃত্বই রমণীর প্রাণ! মাতৃত্বে না পৌঁছিলে প্রেম রমণীর প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মাত্রিওনা এতক্ষণ নারী ছিলেন না, কেবল মাত্র গৃহিণী ছিলেন। কিন্তু একবার মাতৃত্ব অনুভব করিয়াই একেবারে নারীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আগন্তুকের করুণ নিরবলম্বন দৃষ্টি যেন সহস্র জিহ্বাতে প্রেমের ভাষা ব্যক্ত করিল; মাত্রিওনা আপনাকে মাতৃস্থানীয়া অনুভব করিলেন। তাঁহার রাগ মুহূর্ত্তমধ্যে দূরীভূত হইয়া গেল; তিনি নিজেদের অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিল পরিষ্কার করিলেন এবং গৃহে যাহা কিছু আহার্য্য সামগ্রী ছিল, তাহা বাহির করিয়া তদুপরি রাখিলেন। তদনন্তর আগন্তুকের দিকে চাহিয়া স্নেহার্দ্র কোমল স্বরে বলিলেন,—"খাও!"

আগন্তুক এতক্ষণ অধোদৃষ্টিতে বসিয়া ছিল; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন ক্রমশঃ তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। মাত্রিওনার কোমল আহ্বান শুনিয়া সে চক্ষু তুলিয়া চাহিল। অকস্মাৎ তাহার চক্ষের ভাব বদলাইয়া গেল; করুণ চক্ষের তরলত্ব বিদূরিত হইয়া তাহাতে প্রেমের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। আগন্তুকের মুখে প্রথম হাসি দেখা দিল!

সাইমন রুটী কাটিতে কাটিতে সেই হাসি দেখিতে পাইল। তাহারও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত হইলে মাত্রিওনা টেবিলের

অপর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আগন্তকের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহারই দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিল! এতক্ষণে তাহার পূর্ণ রমণীত্ব লাভ হইল!!

আহার সমাপন হইলে মাত্রিওনা উঠিয়া টেবিল পরিষ্কার করিল। তৎপর সাইমনের পরদিনের পরিধানের জন্য যে জামাটীতে তালি লাগাইতেছিল, তাহা এবং সাইমনের একটী পুরাতন পায়জামা বাহির করিয়া আগন্তককে পরিতে দিল। আগন্তক গৃহকোণে গিয়া কাপড় পরিয়া আসিল। মাত্রিওনা তাহার নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"তোমার বাড়ী কোন্ দেশে?"

আগন্তক,—"এদেশে নহে।"

মাত্রিওনা,—"তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে?"

আগন্তক,—"আমার বলিবার সাধ্য নাই।"

মাত্রিওনা,—"তুমি রাস্তায় উলঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলে কেন?"

আগন্তক,—"ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। আমাকে উলঙ্গ দেখিয়া তোমার স্বামী নিজের পরিধেয় আমাকে পরাইয়া দিয়াছেন; আমাকে ক্ষুধিত দেখিয়া তুমি আপনাদের কল্যকার আহার্য্য না রাখিয়া আমাকে খাওয়াইয়াছ; ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন!"

রাত্রিতে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। সাইমন শুইতে গেলে পর মাত্রিওনা আগন্তককে তুন্দুরের উপর শুইতে দেখাইয়া দিয়া নিজে গিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল না। মাত্রিওনার মনে কেবল আগন্তকের সেই মোহিনী দৃষ্টি জাগিতেছিল! অনেকক্ষণ পর মাত্রিওনা ডাকিল,—"সাইম!"

সাইমন উত্তর দিল।

মাত্রিওনা,—"যে রুটীটুকু ছিল তাহা ত ফুরাইয়া গেল। আমি আর ময়দা ভিজাই নাই। কাল কি খাইব?"

সাইমন,—"ঈশ্বর উপায় করিয়া দিবেন। এখন ভাবিয়া কি হইবে?"

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিল। মাত্রিওনা আবার বলিল,—"আচ্ছা, এ ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না কেন?"

সাইমন,—"বোধ হয় সে কিছুই বলিতে পারিতেছে না। তাহার অবশ্যই কোন কারণ আছে।"

মাত্রিওনা,—"আচ্ছা, সাইম, আমরা খাইতে পাই না, তবুও লোকের সাহায্য করি। আমাদের অভাবের সময় আমাদিগকে কেহ সাহায্য করে না কেন?"

সাইমন পাদুকানির্ম্মাণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন হয় নাই। দেখিয়া শুনিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহারই কথা কহিতে পারে। কিন্তু যুক্তিতর্কের বিষয়ে কি উত্তর দিবে? সে,—"ঢের কথা বলিয়াছ, এখন ঘুমাও!" বলিয়া পাশ ফিরিয়া নেত্র মুদ্রিত করিল।

প্রভাতে সাইমন গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিল। মাত্রিওনা কোন প্রতিবেশীর গৃহে অদ্যকার মতন রুটী ধার পাওয়া যায় কি না, দেখিতে গিয়াছে। আগন্তক ব্যক্তি বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

সাইমন বেঞ্চের অপর পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিল,—"দেখ, মানুষের একটী উদর আছে, তাহা নিয়ত আহার চায়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তাহা নিয়ত আচ্ছাদন চায়। আমরা খাটিয়া নিজেদের অভাব পূরণ করি। তুমি কি করিতে চাও, কি করিতে জান?"

আগন্তক,—"জগতে এমন কোনই কাজ নাই, যাহা আমি করিতে জানি। আমি কখনও জীবিকানির্ব্বাহার্থ কোন কাজ করি নাই।"

সাইমন চমৎকৃত হইয়া গেল। তবে কি এ কোন রাজপুত্র? তাহার পর বলিল,—"মানুষ যদি মন লাগাইতে পারে, তবে জগতে কোন কাজই তাহার অসাধ্য থাকে না।"

আগন্তক,—"মানুষ খাটিয়া খায়, আমিও খাটিয়া খাইব।"

সাইমন,—"তোমার নাম কি?"

আগন্তক,—"মিখাইল।"

সাইমন,—"আচ্ছা, মিখাইল, তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা আমাদিগকে বলা না বলা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে ভাল লোক বলিয়াই ধারণা করিয়া লইতেছি। এখন তোমাকে খাটিয়া খাইতে হইবে। তুমি যদি আমার কাজ শিখিতে পার, তবে আমি তোমাকে আমার কাছে রাখিব।"

মিখাইল,—"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এখন কেবল আমাকে দেখাইয়া দাও, কি করিতে হইবে, তবেই আমি শিখিতে পারিব এবং তোমার কার্য্য করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিব।"

ইত্যবসরে মাত্রিওনা রুটী লইয়া গৃহে ফিরিল। আহারান্তে সাইমন মিথাইলাকে কর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিল। মিথাইলা প্রথমে সূতা পর্য্যন্ত পাকাইতে জানিত না; যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কিছুই ধরিতে পর্য্যন্ত জানিত না। কিন্তু সাইমন যেরূপ দেখাইতে লাগিল, সে একবার করিয়া দেখিয়াই ঠিক তদ্রূপ শিক্ষা করিতে লাগিল, এবং দুই দিন মাত্র কার্য্য করিয়া এমন দক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, দেখিলে মনে হয় যেন সে আজীবন ঐ কার্য্য করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে মিথাইলার কার্য্যদক্ষতার বিষয় চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সাইমনেরও পসার বাড়িতে লাগিল। সাইমন ও তাহার পত্নী উভয়েই তাহার প্রতি অধিকতর সদ্ভাব ও সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিল।

এইরূপে সাইমনের গৃহে কার্য্য করিয়া মিথাইলা দিনাতিপাত করিতে লাগিল। তাহাকে কদাপি বাহির হইতে দেখা যাইত না। সে অবিশ্রান্ত আপন কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিত এবং দিবসের কার্য্য শেষ হইলে গৃহের কোণে বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কদাপি কথা কহিত না। সে যদিও প্রথম দিবসের ন্যায় বিমর্ষ ছিল না, কিন্তু একবার বই তাহার মুখে আর কখনও হাসি দেখা যায় নাই। কার্য্যাবসানে সাইমনের সন্তানসন্ততিরা তাহার নিকটে বসিয়া গল্প করিত, সে চুপ করিয়া তাহাদের গল্প শুনিত এবং কখনও বা করুণনেত্রে তাহাদের মুখ-পানে তাকাইয়া থাকিত। সেই করুণ দৃষ্টি! তাহাতে বালকের মন পর্য্যন্ত গলিয়া যাইত। সকলেই মিথাইলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিল।

এইরূপে ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় শীতকাল আসিল। সমস্ত দেশ বরফে ঢাকা পড়িয়া গেল। ‘ত্রয়কা’* ভিন্ন লোকের চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিল।

একদা সাইমন ও মিথাইলা গৃহে বসিয়া কার্য্য করিতেছে; মাত্রিওনা আপন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত আছে; এমন সময় একটা ত্রয়কা রুণু রুণু শব্দে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মাত্রিওনা জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতে পাইল যে, প্রথমে একজন সুসজ্জিত ভৃত্য

* ত্রয়কা (Troika) রুশীয়াদেশে প্রচলিত এক প্রকার চক্রহীন গাড়ী বিশেষ। ইহা বরফের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলে। একজাতীয় হরিণ দ্বারা চালিত হয়। ঐ সকল হরিণের গলাতে ঘণ্টা বান্ধা থাকে; তাহার শব্দ দ্বারা ত্রয়কার গতিবিধি শ্রুতিগোচর হয়।

ত্রয়কার পশ্চাৎ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার দ্বার খুলিয়া দিল; তৎপর একজন বিপুলকায় যুবক জমীদার ত্রয়কা হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদেরই দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। মাত্রিওনা দেখিবামাত্র একান্ত ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আগন্তুক গৃহে প্রবেশ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাত্রিওনার মনে হইল যেন এ ব্যক্তির বিশাল দেহ তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহটী সমস্তই যুড়িয়া রাখিয়াছে। একে দেহের বিশাল আয়তন, তাহাতে পরিচ্ছদের জাঁকজমক। ইহার সমক্ষে তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহ আরও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল, কারণ ইহারা কেহই কখনত জমীদার দেখে নাই।

জমীদার মহাশয় একটী বেঞ্চ টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। বেঞ্চটী তাঁহার ভারে নমিত হইয়া পড়িল। উপবেশনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই জুতার দোকান কার?”

সাইমন অগ্রসর হইয়া বলিল,—“আপনার কৃপায় এই দোকানটী আমার।”

আগন্তুক আপন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল,—“ওরে গাড়ী হইতে চামড়াটা নিয়ে আয় ত।”

ভৃত্য দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়া চামড়ার পুলিন্দা উঠাইয়া আনিল। আগন্তুকের ইঙ্গিতক্রমে সাইমন তাহা গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে চামড়া বাহির করিয়া টেবিলের উপর বিছাইল। আগন্তুক বলিলেন,—“দেখ, মুচি, এ কিরূপ চামড়া দেখিতে পাইতেছ?”

সাইমন,—“আজ্ঞে হাঁ।”

আগন্তুক,—“কেমন চামড়া বলিয়া তোমার মনে হয়?”

সাইমন,—“আজ্ঞে, বেশ চামড়া।”

আগন্তুক,—“বেশ চামড়া, তোমার মাথা! বেশ আবার একটা কথা! এরূপ চামড়া তোমার জীবনে কখনও দেখ নাই। আমি জার্ম্মনী হইতে বিশ রুবল দিয়া ইহা আনাইয়াছি!”

সাইমন বিশ রুবলের নাম শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে এত দরিদ্র যে বিশ রুবল কখনও একত্রে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ! সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—“আমরা এরূপ চামড়া কোথায় দেখিব?”

আগন্তুক,—“তাই হউক। এখন এই চামড়া দ্বারা আমার এক যোড়া বুট-জুতা তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে। পারিবে কি?”

সাইমন,—"আজ্ঞে, তা পারিব।"

আগন্তুক,—"'পারিব' বেশ কথা বটে, কিন্তু 'পারিব' বলাতে ও পারাতে অনেক তফাৎ। এইটী মনে রাখ যে, কি চামড়া দিয়া কাহার জন্য জুতা তৈয়ার করিতেছ। জুতা এমন করিতে হইবে যে, এক বৎসর ব্যবহার করিলেও কোন স্থানে একটু ময়লা পড়িবে না, কিম্বা কোঁকড়াইয়া অথবা বাঁকিয়া যাইবে না। যদি পার তবে চামড়া রাখ, নতুবা বল যে পারিবে না। আমি এক বৎসর পরিয়া সন্তুষ্ট হইলে তখন তোমার মজুরী দশ রুবল দিব। আর যদি জুতা ইতিমধ্যে কোনরূপ নষ্ট হয়, তবে তোমাকে জেলে পাঠাইব।"

সাইমন ভীত হইয়া মিথাইলার দিকে চাহিল। মিথাইলা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে পর সাইমন জুতা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইল।

আগন্তুক আপন বাম পায়ের জুতা খুলিয়া সাইমনকে তাহার মাপ লইতে বলিল। সাইমন ভাল করিয়া হাত ধুইয়া মুছিয়া মাপ লইতে আসিল, পাছে তাহার হাতের ময়লা লাগিয়া জমীদারের মোজাতে দাগ পড়ে। মাপ লইতে গিয়া দেখিল, জমীদারের পায়ের তলা সতর ইঞ্চি লম্বা!

সাইমন যখন মাপ লইতেছিল, তখন আগন্তুক গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। তিনি মিথাইলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ব্যক্তি কে?" সাইমন উত্তর করিল,—"এইটী আমার কর্ম্মকারক। ইহার হাতেই হুজুরের জুতা তৈয়ার হইবে।" ইহা বলিতে বলিতে মিথাইলার দিকে নেত্রপাত করিয়া সাইমন দেখিতে পাইল যে, মিথাইলা আগন্তুকের দিকে দেখিতেছে না, কিম্বা তাঁহার কথাও শুনিতেছে না। আগন্তুকের পশ্চাতে যেন কি দাঁড়াইয়া আছে, মিথাইলা তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। সাইমন চাহিয়া দেখিল; কিছুই দেখিতে পাইল না। পুনরায় চাহিয়া দেখিতে পাইল যে, মিথাইলার মুখে হাসি দেখা দিতেছে। মিথাইলা বস্তুতঃই হাস্য করিল।—এই মিথাইলার দ্বিতীয়বার হাস্য!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গ।

ষেক্সপিয়র সংসারকে রঙ্গমঞ্চ বলিয়াছেন।* ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ শিশু মানবকে অভিনেতা উপাধি দিয়াছেন।† কিন্তু মানুষ যে শৈশব হইতেই অভিনয় করে, তাহার প্রকৃতিতে যে অভিনয়-বৃত্তি নিহিত আছে, তাহা বুঝাইবার ও প্রমাণ করিবার জন্য ষেক্স্‌পিয়র বা ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থের প্রেতাত্মার আবাহন করিবার প্রয়োজন নাই। বালিকাগণ, জননী হইবার বহুপূর্ব্বেই, অচেতন পুত্তলিকাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া মা হইয়া বসেন; কখনও বা পুতুলের বিবাহ দিয়া সঙ্গিনীর সহিত বৈবাহিকসম্পর্কে আবদ্ধ হন। কোন বালক চোর সাজেন, এবং অতি অপূর্ব্ব হিন্দী-ভাষী শিশু কন্‌ষ্টেবল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, বিচারার্থ, কল্পিত বিচারাসনে আসীন অপর এক জজ-রূপী সহচরের সম্মুখে আনীত হন। সৈনিকের পুত্র যুদ্ধাভিনয় এবং বণিকের পুত্র ক্রয়-বিক্রয়ের অভিনয় করেন। আমি অনেক ধনশালী বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্ববিধ উপাদেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া যে সুখ পাই নাই, অনেক বালিকা-গৃহিণীর ধূলি-নির্ম্মিত ক্রীড়া ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া, তিন্তিড়ীপত্ররূপী চিপিটক ভোজনের অভিনয় ও আহারান্তে তুলসী পত্রের তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। যে বালক রাত্রিকালে যাত্রা শ্রবণানন্তর পর দিবস রাম সাজিয়া "রে দুর্বৃত্ত দশানন" বলিয়া রাবণের উদ্দেশে বক্তৃতা না করিয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া বালক নামে অভিহিত করিব?

আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ার অভিনয় পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। একটি ছোট খাল ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এরূপ খালকে

---

* "*Ant.* I hold the world but as the world *Gratiano*,
A stage where every man must play a part,"
—*The Merchant of Venice.*
"All the world's a stage."
—*As You Like It.*

† "And with new joy and pride
The little Actor cons another part."
—*The Immortality Ode.*

আমাদের জেলায় "জোড়" বলে। একদিন আমার ও আমার তিন জন সঙ্গীর ইচ্ছা হইল, এই জোড়টির উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিতে হইবে। এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংবাদ শুনিতে পাইলে ষ্ট্যান্‌লী সাহেব ভয় পাইতেন কি না জানি না। যাহাই হউক, আমরা চারি জন জোড়ের তীর দিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ গিয়া দেখিলাম, একটি ধানের ক্ষেতের মধ্যে সামান্য পয়ঃপ্রণালীর আকারে জোড়টি ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছে। অনতিদূরে কয়েক স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্গুলিপরিমিত কুণ্ড হইতে জল নিঃসৃত হইতেছে। সেখানে তিনটি ছোট বাব্‌লা গাছ দাঁড়াইয়া আছে। উৎপত্তিস্থল আবিষ্কৃত হইল! এত বড় একটা মহৎ কাজ অঙ্গহীন থাকে কেন? যে সুবৃহৎ স্রোতস্বিনীর উৎপত্তিস্থল নির্দ্ধারিত হইল, তাহার নামকরণ একান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। আমরা স্ব স্ব নামের আদ্য অক্ষর সংযোজিত করিয়া জোড়টির নাম রাখিলাম "কারাপরা।" হায়, কারাপরা, অপরের কর্ণে তোমার নাম কর্কশ লাগিতে পারে, অপরের নিকট তুমি উপহাসের কারণ হইতে পার, কিন্তু আমার নিকট তোমার নাম বড়ই মধুর। তুমি আমার সোণার শৈশবের কথা মনে পড়াইয়া দিলে। তোমার সেতুর পার্শ্বে তৃণশয্যায় শুইয়া কত সুখস্বপ্নই না দেখিয়াছি। একদিন অপরাহ্নে তোমার সেতুর পার্শ্বে শুইয়া তোমার ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের কুল কুল ধ্বনি শুনিতেছিলাম। দুই দিকে দিগন্তপ্রসারিত ধান্যক্ষেত্র। বায়ুভরে ধানের গাছগুলি এক একবার শুইয়া পড়িতেছিল, আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সমীরণ ধান্যরাজি হইতে সুস্নিগ্ধ অতি মৃদু সুমিষ্ট সৌরভ আনিয়া দিতেছিল।—নাগরিকগণ নগরে থাকিয়া যতই অর্থব্যয় করুন না কেন, এই স্বর্গীয় সৌরভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। ইহা একমাত্র জানপদবর্গেরই উপভোগ্য।—ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলশায়ী হইলেন। পশ্চিমাকাশ যেন গতাসু সূর্য্যের চিতানল-শিখা দ্বারাই লোহিতাভ নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই শোভা ক্ষণকাল পরেই অন্তর্হিত হইল। ধূসরবাসা সন্ধ্যাসতীর আগমনে সমস্ত প্রকৃতি অতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। পশ্চিম গগনে শুক্রতারা তাঁহারই ললাটে সিন্দূর বিন্দুর মত শোভা পাইতে লাগিল। নদীটি এতক্ষণ সভয়ে ব্রীড়ান্বিতা কিশোরীর ন্যায় মৃদুগীতি গাইতেছিল। এখন সন্ধ্যা সমাগমে যেন সে হঠাৎ মুখরা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখরতা কেমন মর্ম্মস্পর্শিণী! দেখিলাম অদূরে আম্রোদ্যানের

ভিতর দিয়া একটি বালিকা প্রদীপ হস্তে গ্রাম্য পথ দিয়া যাইতেছে। কে ঐ বালিকা? সংসার-সমুদ্রের অসংখ্য ঊর্ম্মিমালার মধ্যে ঐ তরঙ্গটি এখন কোথায় গিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, জানি না। কিন্তু এই সায়ংকালীন দৃশ্যের শোভা, নদীর মৃদুগীতি, বায়ুচুম্বিত বৃক্ষপত্রের "সর" "সর" ধ্বনি, ঐ বালিকার স্মৃতির সহিত এমনই জড়াইয়া রহিয়াছে যে, আমার আশা হয় যে, তাহার সহিত যেন আবার কোথায় পরিচয় হইবে।

অদ্যবিধ আর একটি শৈশবের ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। বাল্য-সহচরী এই ক্ষুদ্র নদীটির অদূরে শালপলাশবনের অঙ্কশায়ী ব—গ্রামে একটি জাম গাছ ছিল। আমাদের বালকসমাজে এই জাম গাছটির বড় সুখ্যাতি ছিল। তাহার জাম যেমন বড়, তেমনই সুমিষ্ট ও "চিকণ-কালা"। আমরা অনেকবার ইহার জাম খাইয়া, কে কত বেশী খাইয়াছে পরীক্ষা করিবার জন্য জীভ্ বাহির করিয়া দেখিতাম, কাহার জীভ্ কত নীল হইয়াছে। নীলতম-জিহ্বাবিশিষ্ট বালক সকলের ঈর্ষার পাত্র হইত। একবার আমরা দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নে এই গাছের জাম খাইতে গিয়াছিলাম। আমি তখন গাছে উঠিতে পারিতাম না। বয়োজ্যেষ্ঠেরা গাছে উঠিল। আমি তাহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া গাছের তলায় রহিলাম।—বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, জামগাছটা আমাদের কাহারও নয়, আমরা চুরি করিয়া জাম খাইতেছিলাম। কিন্তু সেকালে পরের বাগানের আম জাম খাওয়াটাকে একটা ন্যায়সঙ্গত অধিকার মনে করিতাম, চুরি মনে করিতাম না। এখন বয়স হইয়াছে, সন্তানসন্ততির নীতিশিক্ষার দায়িত্ব অনুভব করিতেছি; তথাপি, ভয়ে ভয়ে বলি, আম জাম চুরিটাকে চুরি বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমি যদি কখনও নীতিবিজ্ঞানের বহি লিখি, তাহা হইলে পরস্বাপহরণকে নিশ্চয়ই অপরাধ মধ্যে গণ্য করিব, কিন্তু বালকবৃন্দ কর্ত্তৃক আম্র ও জম্বু অপহরণের চৌর্য্য আখ্যা দিব না। কেন না, গাছপালার সহিত তাহাদের বড়ই আত্মীয়তা।—আমার সঙ্গিগণ সুখে উদর পূরণ করিতেছিলেন; আমিও দুই চারিটা জাম পাইতেছিলাম। এমন সময়ে উক্ত ব—গ্রামের কয়েক জন যুবক আসিয়া আমাদিগকে জাম খাইতে নিষেধ করিল ও গাছ হইতে নামিতে বলিল। আমার সহচরেরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। শত্রুদল আমাদিগকে জব্দ করিবার জন্য গাছের গুঁড়ি বাব্‌লার ডাল দিয়া ঘেরিয়া দিল। কিন্তু বৃক্ষারূঢ় বালকগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ

না করিয়া যতক্ষণ না পেট ভরিল, খাইতে লাগিল। পরে গাছের গুঁড়ি দিয়া না নামিয়া ডাল হইতে ঝুলিয়া মাটিতে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। আততায়ী বালকগণ স্বীয় মনোরথ ব্যর্থ হইল দেখিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরা সাহসিকতার ভাণ না করিয়া পলায়নপর হইলাম। শীঘ্রই মাঠের মধ্যে একটা পাথরের গাদায় পৌছিলাম। তখন আমাদের বিক্রম দেখে কে? আততায়িগণ প্রস্তরনিক্ষেপে ভীত হইয়া আর আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল না।

ব—গ্রামের অদূরবর্ত্তী শালবনগুলি আমার বড় প্রিয়। প্রায় দুই বৎসর হইল, আমার এক কবি-বন্ধুর সহিত প্রাতে উহার মধ্যে একটি বনে বেড়াইতে যাই। যখন নিকটে গেলাম, শালপত্রের উজ্জ্বল শ্যামল শ্রী চক্ষুর পরিতৃপ্তি সাধন করিল। এই স্থানের ভূমি ঈষৎ রক্তাভ ও এরূপ কঠিন যে বৃষ্টির পরও কর্দ্দমাক্ত হয় না। আমরা বনস্থলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বৃক্ষপরিবৃত একটি প্রশস্ত সুশীতল স্থানে উপবেশন করিলাম। স্থানটি এমনই পরিচ্ছন্ন, বোধ হইল যেন বনদেবতাগণ অতিথিসৎকারের জন্য উহা সম্মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থানমাহাত্ম্য বশতঃ আমরা উভয়েই নির্ব্বাক ও আত্মহারা হইয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব গভীর শান্তিরসের আস্বাদন করিতেছিলাম; এমন সময় বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলাম. সমীরণের একটি তরঙ্গ বৃক্ষশিরগুলি নত ও শাখাপত্ররাজি আন্দোলিত করিয়া চলিয়া গেল। শালতরুগুলি আবার চিত্রার্পিতপ্রায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বনস্থলী আবার নীরব হইল। আমার বন্ধুগণও কখনও আমাকে কবিত্বাপবাদ দেন নাই। কিন্তু তৎকালে আমার মনে হইল, যেন বনদেবী মস্তক নত করিয়া সহস্র অঙ্গুলির সঙ্কেত সহকারে বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ব্যপদেশে তাঁহার মানব অতিথি দুই জনকে "স্বাগত" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। আমাদের দুই জনের একবার ঐ স্থানের নিকটে বাসগৃহ বাঁধিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ আনন্দ সকল দিনে সম্ভোগ্য নয়; সর্ব্বদা সুলভও নয়। পর্ব্ব দিবসের আমোদ কি সকল দিন পাওয়া যায়? কবি ওআর্ডস্‌ওআর্থ্ ইংলণ্ডের সুরম্য হ্রদমালাপরিশোভিত প্রদেশে (Lake District) বাস করিতেন। তিনি বলেন:—"People come to the Lakes, and are charmed with a particular spot, and build a house, and find themselves

discontented, forgetting that these things are only the sauce and garnish of life."*

বাল্যসহচরী ক্ষুদ্র নদীটির মোহন মন্ত্রে পথ ভুলিয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! সাধে কি আত্মাহারা হই? অপরের নিকট আমি সম্ভ্রান্ত মান্যগণ্য "বাবু" পদবাচ্য হইলেও হইতে পারি; অপরে আমার সহিত ভদ্রতা করে; তাহারা আদর করিলে মনে হয়, বুঝিবা ইহার ভিতর কত অনাদর লুকাইয়া আছে। কিন্তু যে জন্মভূমিতে আমি নগ্নদেহে অসভ্য অবস্থায় বিচরণ করিয়াছি, যাঁহার স্নেহে শরীর মন পুষ্ট হইয়াছে, যাঁহার নিকট আমার দেহমনের কোন সংবাদ অজানা নাই, যাঁহার গাছগুলি আমার দেহের সহিত বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তিনি আমাকে যেরূপ অকপট স্নেহের সহিত কোলে লন, এমন আর কে পারে? তাঁহার নিকট আমি যাহা ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি। তাঁহার অঙ্গাভরণ এই ক্ষুদ্র নদীটির যে এত মোহিনী শক্তি থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, আবার আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করি।

এতক্ষণ নির্দ্দোষ অভিনয়ের কথাই বলিয়াছি। মানবসমাজে আর এক প্রকার অভিনয় প্রচলিত আছে। তাহা কপটাচারেরই নামান্তরমাত্র। আমি তাহার কথা বলিব না।

অভিনয় করা যেমন স্বাভাবিক, অভিনয় দেখিবার ও শুনিবার ইচ্ছাও তেমনি স্বাভাবিক। কোন না কোন আকারে সকল দেশেই অভিনয় বিদ্যমান আছে। আমাদের দেশে যেমন যাত্রা, নাটকাদি আছে, পাশ্চাত্যদেশসমূহেও তেমনি থিয়েটারে নাটকাভিনয় আছে। সুনীতির অনুরোধে, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য কেহ রঙ্গালয়ে না যাইতে পারেন; কিন্তু অভিনয় দর্শন ও শ্রবণের ইচ্ছা মানবহৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ গর্হিত নহে। তবে অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের চরিত্রদোষে রঙ্গালয়গুলি ভদ্রসমাজের পদার্পণের অযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে আমার কিছু বলিবার অধিকার আছে কি না সন্দেহ। আমি বহুবৎসর কলিকাতায় যাপন করিয়াছি;

* "লোকে হ্রদগুলির নিকটে আসে, কোন একটি স্থান দেখিয়া মোহিত হয়, তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করে, এবং অবশেষে অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে এই সুশোভন স্থলগুলি জীবনের চাট্‌নি ও ভূষণ স্বরূপ।

কিন্তু একবারও কোন থিয়েটারে যাই নাই। আমার বরাবর একটা নৈতিক সংস্কার আছে,—কুসংস্কার কি সুসংস্কার বলিতে পারি না,—যে থিয়েটারগুলাতে যে শ্রেণীর লোকে অভিনয় করে, তাহাতে তথায় যাওয়া উচিত নয়। কেহ কেহ এইটুকু পড়িয়াই হয়ত আমাকে সেই দলের লোক মনে করিবেন, যাঁহারা ব্যাকরণ হইতে স্ত্রীত্য প্রকরণ উঠাইয়া দিতে চান। এরূপ একটা দল আছে কি না জানি না, কিন্তু আমি সে দলের লোক নই। "একবারও কোন থিয়েটারে যাই নাই," বলাটা ঠিক নয়। একবার কোরিন্থিয়ান্ থিয়েটারে গিয়াছিলাম। কেহ যদি বলেন, দেশী থিয়েটারে যাও না,—কোরিন্থিয়ানে কেন গেলে? ইহার সদুত্তর থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে দিলাম না। কেবল বলি, মানুষ ত কল নয় যে ঠিক এক ভাবেই কার্য্য করিবে; অবস্থাভেদে কার্য্যের বিভিন্নতাই সচেতন জীবের লক্ষণ।

এই একবার ব্যতীত কখনও থিয়েটারে যাই নাই, কিন্তু বাল্যকালে একবার নাটকাভিনয় করিয়াছিলাম। ইহাতে অভিনয় সম্বন্ধে হয়ত কিছু বলিবার অধিকার জন্মিতেও পারে। বাল্যের সেই অভিনয় এখনও মনে আছে। একখানা ছোট সতরঞ্চ যবনিকার কাজ করিয়াছিল। আমি কালনেমি সাজিয়াছিলাম। আমার যে সহচর হনূমান্ সাজিয়াছিল, কালনেমিকে পদাঘাতের অভিনয় করাই তাহার উচিত ছিল। কিন্তু সে অভিনয় না করিয়া কালনেমিরূপী আমাকে অতিশয় "ভক্তিপূর্ব্বক" * এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়াছিল।

একটু বয়স হইলেই বাজে কথা বলিবার প্রবৃত্তিটা বেশী হইয়া পড়ে;—বিশেষতঃ নিজের কথা। কিন্তু উহা আত্মম্ভরিতা-প্রসূত নহে। যাহা হউক, এখন আসল কথাটা বলি।

ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য সকল কলেজেই ছোট বড় এক একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার আছে। কারণ শুধু বই পড়িয়া বিজ্ঞান শেখা যায় না। কলেজের ছাত্রদিগকে যেমন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক পড়িতে

* আমার এক বন্ধু শিক্ষকতা করেন। তিনি কোন ছাত্রকে অপর ছাত্রের কাণ মলিতে বলিবার সময় বলেন, "খুব ভক্তি করিয়া কাণ মল।" ইহার মানেটা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। বোধ হয়, যাহার কাণ মলা হয় তিনি তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া কাণ মলিতে বলেন; অথবা খুব জোরে কাণ মলিতে বলেন। কারণ লোকে যাহা ভক্তিপূর্ব্বক করে, তাহা একাগ্রতা ও দেহমনের সমগ্র শক্তির সহিত নির্ব্বাহিত হয়।

হয়, তেমনি ইংরাজী ও সংস্কৃত অনেকগুলি নাটক পড়িতে হয়। আমার বোধ হয় অভিনয় করিয়া না দেখাইলে নাটকের প্রকৃত মর্ম্ম ছাত্রদিগের বোধগম্য হয় না। ছাত্রেরাও অভিনয় করিতে না পারিলে, নাটকের মর্ম্ম ও নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তবে সকলেই যে ভাল অভিনেতা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

মানুষ যখন শান্তভাবে কথা বলে, ক্রোধাদি কোন প্রবল বৃত্তি বা ভাব যখন হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে না, তখন শুধু কথার দ্বারাই মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। যখনই আমরা ক্রোধ, ঘৃণা, শোক বা অন্যবিধ কোন ভাবের অধীন হই, তখন আর শুধু ভাষায় কুলায় না। আমরা তখন মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্য গ্রহণ করি। ক্রোধে ভ্রূ কুঞ্চিত কণ্ঠস্বর কর্কশ, হস্তের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হয়। শোকপরবশ হইয়া মানুষ কেশ ছিন্ন করে, বক্ষে করাঘাত করে। এইরূপ সমুদয় প্রবল মনোভাবেরই বাহ্য লক্ষণ আছে। মনের মধ্যে যখন কৌতুকের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তখন তাহাও মৃদু বা অট্টহাস্য দ্বারা সূচিত হয়। সুতরাং যখন কোন নাটক হইতে ক্রোধ, শোক বা ঘৃণাব্যঞ্জক অথবা হাস্যোদ্দীপক কথা পড়া হয়, তখন তদুপযোগী মুখ ও অঙ্গভঙ্গী না করিলে নাটককারের অভিপ্রেত সমস্ত অর্থ,—সমস্ত ভাবটুকু, আদায় হয় না। দেখা গিয়াছে যে এতদূর না করিয়া যদি অধ্যাপক ছাত্রবর্গকে কেবল বলিয়া দেন, কোন্ প্রসিদ্ধ অভিনেতা কোন্ কথাগুলি কিরূপ স্বরে, কিরূপ মুখভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গী সহকারে উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলেও ছাত্রগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত অধ্যাপকের ব্যাখ্যা শুনে এবং নাটকখানিও সুবোধ্য হইয়া উঠে।

এখন কেহ বলিতে পারেন, অঙ্গ বা মুখভঙ্গী না করিয়া কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপযোগী স্বরে নাটক পড়া যায় না? ইহার উত্তর এই যে, ইহা কিয়ৎপরিমাণে সম্ভব, সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ, মুখের ভাব (expression) পরিবর্ত্তন এবং অঙ্গসঞ্চালন ব্যতিরেকে কোন প্রবল মানসিক ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। মানসিক উত্তেজনা ও তাহার বাহ্য লক্ষণ এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট, যে সাধারণতঃ একটি ব্যতিরেকে অপরটির অস্তিত্ব সম্ভবেনা। সুতরাং কোন মনোবিকার প্রকাশ করিতে হইলে মুখাঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন। আর একটি কারণেও অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন বুঝা যায়। মনের

মধ্যে যে ভাব নাই, বাহিরে ঠিক্ তাহার সত্যবৎ অভিনয় করা কঠিন। ক্রোধের, ঘৃণার, শোকের, বা বিস্ময়ের অভিনয় করিতে হইলে, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও ক্রুদ্ধ, ঘৃণাপরবশ, শোকার্ত্ত বা বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইচ্ছা শক্তি দ্বারা মনে এই সকল ভাব আনা যায়; কিন্তু মুখ ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারাও মনোমধ্যে এই সকল ভাব আনয়নের সাহায্য হয়। যথা, ক্রুদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে ভ্রূ কুঞ্চিত, চক্ষু ঘূর্ণিত ও অধর দংশন করিলে হৃদয়ের উপর ক্রোধের ছায়া পড়ে। ইহা নিতান্ত কথার কথা নয়; দার্শনিকের আলোচনার বিষয়।*

দেখা গেল, মুখ ও অঙ্গভঙ্গী ব্যতীত মানসিক উত্তেজনা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না; মনোবিকারের প্রকৃত অভিনয় করিতে হইলে মনোমধ্যে বিকারের হেতুভূত ক্রোধাদি ভাব বিদ্যমান থাকা চাই; এবং মনের মধ্যে এই সকল ভাবের উদ্রেক করিতে হইলে উহাদের বাহ্যলক্ষণস্বরূপ নানাবিধ মুখ ও অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে হয়।

কলেজের ক্লাসে বসিয়া চোগা চাপ্‌কান আঁটিয়া অভিনয় করিলে অধ্যাপক নিজ গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না। সে অবস্থায় অভিনয় করাও সম্ভব নয়। একাই এক শ হইয়া কখনও সরু গলা, কখনও মোটা গলা করিয়া কথা কহা বড়ই বিড়ম্বনা। তদ্ভিন্ন একজন অভিনেতা অপর কোন অভিনেতার সাহচর্য্যেই ভাল অভিনয় করিতে পারে। তুমি যদি আমাকে প্রহার করিতে আসিবার অভিনয় কর, তাহা হইলে আমার পক্ষে ক্রোধ বা ভয়ের অভিনয় করা সহজ হয়। তদ্ভিন্ন দৃশ্যের ও পরিচ্ছদের উপরও অভিনয়ের উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।—সে কথা পরে বলিতেছি।—আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন। চোগা-চাপ্‌কান-পরিহিত অধ্যাপক মহাশয় লীয়র নৃপতি, বা কণ্ব মুনির "অংশ" অভিনয় করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি, শকুন্তলা, গৌতমী, কর্ডীলিয়া বা পোর্শিয়া হইয়া বসেন, তাহা হইলে ছাত্রবর্গের নীলকণ্ঠ বা গোবিন্দ অধিকারীর বৃন্দাদূতী সাজা মনে পড়িতে পারে।

* "The simplest form of this volitional excitation of feeling is seen in all histrionic imitation. * * * The mimic takes on the outward motor manifestations of the feelings he represents, such as the facial movements, gestures, bodily pose, and modifications of vocal action. Such assumption of motor concomitants, by introducing a part of the bodily resonance of the feeling, tends in a measure to develop this last."
—Sully's *Outlines of Psychology* (1894), P. 431.

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দৃশ্য ও পরিচ্ছদের উপর অভিনয়ের উৎকর্ষ নির্ভর করে। দৃশ্যের কথা বেশী করিয়া বলিব না। পরিচ্ছদের কথাই বলি। আমার এক বন্ধু বলিতেন, কোট প্যাণ্টালুন পরিলেই মেজাজটা কিছু সাহেবী, কিঞ্চিৎ রুক্ষ হইয়া উঠে। কথাটা পরিহাসচ্ছলে উক্ত হইলেও নিতান্ত অসার নয়। পরিচ্ছদের সহিত মানসিক ভাবের সম্বন্ধ আছে। অস্মদ্দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, পরমাত্মা নায়ক ও জীবাত্মা নায়িকা, এই ভাব সাধনই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গের সাধন। কথিত আছে, এইরূপ সাধনে সিদ্ধ হইবার জন্য নারীপ্রকৃতি লাভার্থ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সাধনের এক অবস্থায় স্ত্রীলোকের মত বসন ভূষণ পরিধান করিতেন। আমার বোধ হয়, পুরুষকে স্ত্রীলোকের "অংশ" অভিনয় করিতে হইলে, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও নারীপ্রকৃতি আত্মসাৎ করিবার জন্য, নারীর মত বেশ ভূষা করা চাই। কিন্তু অধ্যাপক ত নারী সাজিতে পারেন না।

এক্ষণে কতকগুলি আপত্তি উঠিতে পারে। ১। ছাত্রগণ অভিনয় করিতে শিখিলে জ্যাঠা হইবে। আমরা বলি যদি নাটক পড়িলে জ্যাঠা না হয়, তাহা হইলে অভিনয় করিলেই কেন জ্যেষ্ঠতাত হইবে? ২। অভিনয় শিখিবার বা করিবার সময় কই? ইহাতে তাহাদের পড়া শুনার ক্ষতি হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা অভিনয় শিখিতে পারে। এতদর্থে বি-এ কোর্সের একখানা নাটক কমাইয়া দিলেও চলে! বি-এ পরীক্ষার পর অভিনয় শিক্ষা করিয়া ছাত্রেরা কন্‌ভোকেষ্যন্ বা উপাধি বিতরণ উপলক্ষে অভিনয় করিতে পারে। ৩। অভিনয় শিখায় কে? ইহার উত্তর আপাততঃ দিতে পারিলাম না। ৪। অভিনয় করিতে হইলে সমস্ত সরঞ্জাম ও সাজসজ্জা বিশিষ্ট রঙ্গভূমি চাই; কেন না ছাত্রদিগকে প্রয়োজন মত নানাদেশীয়, নানাজাতীয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন স্ত্রী বা পুরুষ সাজিতে হইবে। এত টাকা কে দিবে? উত্তর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার নির্ম্মাণ ও যন্ত্র ক্রয়ার্থ যদি কলেজের সত্ত্বাধিকারিগণ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, তবে ইহার জন্য কেন না পারিবেন? যদি বাহ্যজগতের বিষয় বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা প্রয়োজনীয় বোধ হয়, তবে মানবের আত্মারূপ যে অন্তর্জগৎ তাহার সম্যক্ জ্ঞান কি আবশ্যক নয়?

মানবচরিত্র অধ্যয়ন শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের একটি প্রধান উপাদান।

কিন্তু সংসারে নানা প্রকার চরিত্রের লোক আছে। সকলের সহিত মিশিয়া তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তদ্ব্যতীত অসাধু ব্যক্তিগণের চরিত্র বুঝিবার জন্য তাহাদের সংসর্গ করা বাঞ্ছনীয়ও নয়, নিরাপদও নয়। ভূয়োদর্শন ভাল ; কিন্তু তদনুরোধে চরিত্র ভ্রংশ ঘটা কদাপি প্রার্থনীয় নহে। এই সকল কারণে অনেক সময় পুস্তকাধ্যয়ন দ্বারাই মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা স্ব স্ব প্রকৃতিতে মানব প্রকৃতির সমুদয় বৃত্তি ভাবাদির অস্তিত্ব অনুভব না করি, ততক্ষণ আমাদের মানবচরিত্র জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বা বন্ধ্যা নারীর নিকট মাতৃস্নেহ যেমন একটা আভিধানিক কথা মাত্র, তদ্রূপ যে ভাব আমি কখনও অনুভব করি নাই, যে চিন্তা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই, যে বৃত্তি দ্বারা আমি কখনও পরিচালিত হই নাই, সেই সেই ভাব, চিন্তা ও বৃত্তি, আমার কল্পনার বস্তু হইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বুদ্ধকে বুঝিতে হইলে ক্ষণেকের জন্যও বুদ্ধ হইতে হয় ; সীতাকে বুঝিতে হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও সীতা হইতে হয়, রাবণকে বুঝিতে হইলে অল্প ক্ষণের জন্যও রাবণ হইতে হয়। এইরূপে সর্ব্ববিধ, অন্ততঃ অনেকবিধ, মানুষকে বুঝিতে পারিলে যেন আত্মার পরিসর বৃদ্ধি হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়। ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন মানব মাত্রেরই সহিত নিজের সাদৃশ্য অনুভব করিয়া মানুষের হৃদয়ে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়, সকলকে "কুটুম্বক" বলিয়া মনে হয়, অপর দিকে তেমনি নিজ হৃদয়ে কাম ক্রোধ জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া অতি সাধুশীল মনুষ্যও আপনাকে "তৃণাদপি সুনীচ" মনে করিতে পারেন। মানব চরিত্রের এইরূপ জ্ঞানলাভ নাটক পাঠ ও অভিনয় দ্বারা অর্জ্জন করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ সুপ্রণালী ক্রমে নাটক পাঠ ও অভিনয় করিলে তাহা হইতে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। অধিকন্তু, সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রগীতবাদ্যাদি যে সকল "ললিত কলা"র (fine arts) উল্লেখ আছে, অভিনয়কে তাহার অন্তর্গত মনে করা যাইতে পারে। যদি উল্লিখিত কলাগুলির অনুশীলন অভিলষণীয় হয়, তবে অভিনয়ের চর্চ্চা করিতে দোষ কি ? অবশ্য সাবধান না হইলে অপরাপর কলার অনুশীলনের ন্যায় অভিনয়ের অনুশীলনেও চরিত্রের লঘুত্বাদি দোষ জন্মিতে পারে। কিন্তু সে সকলের কথা এখন বলিবার স্থান নাই। শেষ

বক্তব্য এই যে, সকল কলেজের না থাকিলেও, অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি "রঙ্গ" অর্থাৎ থিয়েটার থাকা আবশ্যক। আমি বলিতেছি না যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরই অভিনয় শিক্ষা করা উচিত ; অপর সাধারণেরও ইহা শিক্ষণীয়। বালকবালিকাগণের উপযোগী নাটক রচনা করিয়া তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দিলে তাহারা যেমন বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করে, তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি ও মুখভঙ্গীও তেমনি সুসংযত ও আয়ত্তাধীন হয়, এবং হৃদয় বিকসিত হইয়া উঠে।

উপনিবেশ স্থাপন।

বঙ্গদেশ যেরূপ ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত, তাহাতে বাঙ্গালীজাতির শরীর মন সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখা কঠিন ব্যাপার। জাতিগতভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইলে বাঙ্গালী জাতি কখনও উন্নতি লাভ করিয়া অন্য সবল পরাক্রমশালী জাতির সঙ্গে একাসনে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতি যে যে কারণে ঘটিয়াছে, তাহার অনেকগুলি আমরা সচরাচর শুনিতে পাই। তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ স্থানের অস্বাস্থ্য ও বাসগৃহ বিষয়ে অমনোযোগিতা। ঘন পল্লীতে সংকীর্ণস্থানে বহু পরিবারসহ অবস্থিতিদ্বারা একেত বায়ু ও পানীয় জল প্রভৃতি দূষিত হয়, তাহার উপর স্থানের স্বাভাবিক দোষ এই যে উহা ভিজা, সেঁতসেতে নিম্নভূমি। এই সকল কারণে বৎসর বৎসর কত লোক অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতেছে ও চিররুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। গত বৎসরের স্যানিটেরি কমিশনারের রিপোর্টে দেখা গিয়াছে বঙ্গদেশে সাড়ে চৌদ্দ লক্ষের অধিক লোক কেবল জ্বররোগে এবং এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লোক ওলাউঠায় মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। ইহাতে কত পরিবার নিঃস্ব ও শোকে রুগ্ন শীর্ণ হইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ অন্যের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। পনর ষোল লক্ষ লোক যদি জ্বর ও ওলাউঠায় কবলিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহার দশগুণ লোকের অস্থিমাংস এই দুই প্রবল শত্রু চর্ব্বণ করিয়া তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছে। অথচ এই সকল অবস্থাতে আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে অনায়াসে অনেক পরিমাণে বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। দেশের সাধারণ অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্য পয়ঃপ্রণা-

লীর বন্দোবস্ত ও উত্তম পানীয় জল, প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেন্টও বুঝিয়াছেন এবং দেশীয় শিক্ষিত লোকেরাও বুঝিয়াছেন, কিন্তু তথাপি এই সকল বিষয়ে যত্নের ত্রুটি আমাদের জাতিগত অলসতা ও নির্জ্জীবতার পরিচায়ক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল একটি বিষয়েরই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ঘন বস্তি ও অস্বাস্থ্যকর স্থানের উন্নতি করিতে যে চেষ্টা যত্ন ও অর্থের প্রয়োজন, তাহার কিয়দংশও একত্র সংগ্রহ করিয়া স্বাস্থ্যকরস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলে স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুখ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এই বিষয়ে শিক্ষিত দেশহিতৈষী ও উদ্যমশীল বঙ্গবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার এখন সময় আসিয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ের আমরা এখন বিশেষরূপ আলোচনা করিব।

অনেকে বলেন বাঙ্গালী গৃহপ্রিয়, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র বসবাস করিতে অনিচ্ছুক। বাস্তবিকই একটি ক্ষুদ্রগ্রামে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমীতে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে ও গৃহবিবাদে পৈতৃক বাসস্থান খণ্ড খণ্ড করিয়া শত অংশে পরিবারবর্গের মধ্যে বিভক্ত করিয়া থাকিতে বাঙ্গালী যেমন ভাল বাসে, এমন আর কে করে? পৈতৃক দশ বিশ হস্ত জমীর জন্য ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মীয় স্বজনে বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমায় রাশীকৃত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে প্রস্তুত, তবুও বাঙ্গালী স্থানান্তরে নূতন স্বাস্থ্যকর সুখকর গৃহ নির্ম্মাণে পরাঙ্মুখ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ঘন বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর স্থাপনে অবস্থিতি করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে, অথচ স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিলে অকাল মৃত্যু ও দুঃখ দারিদ্র্যের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে দূরে থাকা যায়। দেশে বৎসর বৎসর অনাবৃষ্টি কিম্বা অতিবৃষ্টিতে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতেও কত লোকের মৃত্যু হইতেছে। কিন্তু এই সমুদয়ের প্রতীকার হইতে পারে যদি উপনিবেশ স্থাপনে দেশীয়লোক বদ্ধপরিকর হন। ইংরেজ জাতি আমাদের অপেক্ষা কম গৃহপ্রিয় নহেন, কিন্তু তাঁহাদের গৃহপ্রিয়তা উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান কারণ বলিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা অনুমান করেন; য়ুরোপের অন্য সকল জাতি অপেক্ষা ইংরেজ জাতির উপনিবেশই সমধিক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ইহার একমাত্র কারণ, ইংরেজ গৃহপ্রিয়। ইংরেজ ইচ্ছা করেন, সুখ স্বচ্ছন্দপূর্ণ ও ইচ্ছানুরূপ সজ্জিত একটি বাড়ী তিনি আপনার বলিয়া অভিহিত করিবেন, স্ত্রীপুত্র-

গণ তাহাতে স্বাস্থ্য ও আনন্দ সম্ভোগ করিবে এবং কাজ কর্ম্মের ভিড় হইতে আসিয়া স্বয়ং আরাম, বিশ্রাম ও আনন্দ সম্ভোগ করিবেন। সুতরাং এইরূপ গৃহ পৃথিবীর যে অংশে পাওয়া যায়, তিনি সেখানে চলিয়া যাইবেন। মহাসাগর, পাহাড়পর্ব্বত, নদনদী, মরুভূমি কিছুই ইংরেজের গতির প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমেরিকার জঙ্গল বিদীর্ণ করিয়া ইংরেজের গৃহ, উদ্যান, সুখ শোভার আধার হইয়া হাস্য করিতেছে। আফ্রিকার মরুভূমির সীমা যেখানে পর্য্যবসিত, সেই সকল স্থান এবং অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের জনশূন্য অথচ উর্ব্বর,শ্যামল, মনোহর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আজ ইংরেজের রমণীয় হর্ম্ম্য, বর্ত্ম ও সুশোভন নগরীর সৌন্দর্য্য ও কোলাহলে পরিপূর্ণ,ইংরেজের পদভরে কম্পিত, ও তাহাদের একগুণ শোভা আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশলে শতগুণ বর্দ্ধিত। ইংরেজ যেমন সুন্দর পরিপাটি গৃহের মূল্য বুঝেন,এমন অন্য কেহ বুঝেন কি না সন্দেহ। আমরা কথায় মাত্র বলি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু আজ কাল বিষয় কার্য্যের যেরূপ ধূমধাম, ব্যস্ততা, ও প্রতিযোগিতা, কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিতেছে, আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছে, তাহার নিশ্চয় নাই। পিতা বৎসর বৎসর নানাস্থানে ঘুরিতেছেন,কোন সন্তানের জন্মভূমি এখানে, কোন সন্তানের জন্মভূমি শত ক্রোশ দূরে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্তান নূতন নূতন কার্য্যস্থানে গমন করিতেছেন। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সঙ্গে কোন প্রকারের সম্বন্ধ জ্ঞানই হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রাচীন বাক্যের অর্থ একপ্রকার চলিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। গৃহপ্রিয়তা আমাদিগকে উত্তম গৃহের জন্য লালায়িত ও সচেষ্ট করা উচিত। আপনাদের এবং সন্তানদের, স্বদেশবাসীর এবং সমগ্র জাতির কল্যাণ যদি কামনা করি, তবে নিশ্চয়ই উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আমরা ব্রতী হইব। সম্প্রতি ইংরেজেরা আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে ভারতবাসীর উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আফ্রিকাবাসীদিগকে সভ্য ও শাসনাধীন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে এত পতিত স্থান, বিস্তীর্ণ উর্ব্বর দেশ রহিয়াছে যে, অনায়াসে ঘন লোকাকীর্ণ স্থান সমূহ কিছু কিছু অতিরিক্ত অধিবাসী দ্বারা সেই সকল স্থানকে লোকালয়ে পরিণত, সুশোভিত ও কার্য্যকর করিয়া দিতে পারে। বঙ্গদেশের ঘন পল্লীসমূহ হইতে লোক যাইয়া আপাততঃ বৈদ্যনাথ, মধুপুর, গিরিডি, ছোটনাগপুরে রাঁচি, হাজারিবাগ, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে উপনিবেশ স্থাপন

করিতে পারে। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত স্থান উপনিবেশের উপযুক্ত। আরও দূরে যাইতে ইচ্ছা করিলে বিহার, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতবর্ষের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা যায়। কিন্তু এই মহা অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিতে সমবেত চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন। আজ কাল যেমন দেশে নানাপ্রকার যৌথ ভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়া নানাপ্রকার কল কারখানা ও রেলওয়ের সূচনা হইতেছে, তদ্রূপ কতিপয় সৎসাহসী, ধর্ম্মভীরু ও কার্য্যক্ষম লোক একত্র হইয়া কোম্পানি গঠন করিতে পারিলে এই দুরূহ ব্যাপার সহজ হইয়া পড়িবে। এই উপনিবেশ কোম্পানি প্রথমে মেম্বরগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা কিম্বা এককালীন দান আদায় করিয়া তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের জমী ক্রয় কিম্বা গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, এবং যতদিন যথোচিত মূল্য সংগ্রহ না হইবে, মেম্বরগণের প্রদত্ত টাকার সুদ ব্যাঙ্কে জমা হইবে। এই সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই সমুদয় বিষয় পরিষ্কার হইবে। ইংলণ্ডে এইরূপ দলবদ্ধভাবে জমী ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অনেক কোম্পানী আছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

লীডস্ স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ সমিতি (Leeds Permanent Building Socicty) প্রায় ২০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণের জন্য মাসিক অর্থ সঞ্চয় মিতব্যয়িতা শিক্ষারও প্রকৃষ্ট উপায়। ল্যাঙ্কেশায়েরের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম ও নগরে এই উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। Padihamএর লোকসংখ্যা ৮,০০০ কিন্তু গৃহনির্ম্মাণের জন্য ১৫,০০০ পৌণ্ড সঞ্চিত। Bumleyতে গৃহনির্ম্মাণ সমিতির ৬,৬০০ মেম্বর, ১৬০,০০০ পৌণ্ড সঞ্চিত; অর্থাৎ প্রতি জন গড়ে ২৪ পৌঃ সঞ্চয় করিয়াছে। এই সকল সমিতি ভাল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিয়া থাকেন এবং সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি করেন।

উপরে যে সকল সমিতির বিবরণ প্রদত্ত হইল, সমুদয়ই গরিব, সামান্য ব্যবসায়ী কিম্বা চাকুরেদের দ্বারা গঠিত। আমাদের দেশে মধ্যশ্রেণীর লোক প্রায়ই চাকরী দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। অনেকের সামান্য বেতনে গ্রাসাচ্ছাদনের ভালরূপে সংস্থান হয় না। উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অর্থ কোথায় পাইবেন? কিন্তু মাসে মাসে ৫।৭ টাকা করিয়া যদি যৌথ ভাণ্ডারের হস্তে প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে নিয়মিত

ব্যয় কিছু কমাইয়া অনায়াসে চালাইতে পারেন। মাসিক পাঁচ টাকায় বৎসর ৬০৲ হইবে এবং ৮ বৎসরে সুদসহ ৫০০৲ মজুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যাঁহারা অধিক সঞ্চয় করিতে সমর্থ, তাঁহারা ৮ বৎসরে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সঞ্চয় করিয়া অনায়াসে ভাল বাড়ীর সংস্থান করিতে পারেন। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ কোম্পানির ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাইতে পারেন। বাড়ী নির্ম্মাণ করা না হইলেও, অর্থ অপব্যয় হইবে না, বরং সেভিংস্ ব্যাঙ্কের ন্যায় অর্থ সঞ্চয়ের একটি উপায় হইবে। আপাততঃ বিশটি পরিবার যদি সমবেতভাবে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ব্রতী হন এবং নূতন মনোনীত স্থানে জমী ক্রয় ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অন্য অনেক লোক অনুসরণ করিবে আশা করা যায়। নূতন স্থানে গৃহনির্ম্মাণ, বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রতি জনের অন্ততঃ কত জমী থাকা উচিত, কি প্রণালীতে সকলের গৃহনির্ম্মাণ হইবে, এবং সাধারণ পথ, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, বিদ্যালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করা উচিত। গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে জমী ক্রয় করা আবশ্যক। প্রস্তাবিত কোম্পানী এক বৎসরের সঞ্চিত অর্থে মেম্বরদিগের অর্থানুসারে জমী ক্রয় করিয়া, আর ৫।৬ বৎসরের সঞ্চিত অর্থে আবশ্যকীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশে অনেক নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, পুরাতনের মধ্যে নূতন জীবন ও উৎসাহ আনয়ন করিয়াছেন। আমরা আশা করিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে একদল উৎসাহী লোক এই কার্য্যে পথ-প্রদর্শক হইতে প্রয়াসী হইবেন। আপাততঃ দাসাশ্রমের মণ্ডলী যদি এ বিষয়ে নানা স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করিতে পারেন, বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহারা জানিতে পারিবেন কে কে উপনিবেশ কোম্পানীতে যোগ দিতে প্রস্তুত এবং দেওঘর স্কুলের হেডমাষ্টার আমাদের বন্ধু বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু ও গিরিডি দাসাশ্রমের সেবকগণ তথাকার স্থানাদির বিষয়ে কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে পারিবেন এবং পরে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া স্থান নির্ব্বাচনাদি ব্যাপার ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করা যাইতে পারিবে। আশা করি, এই গুরুতর বিষয়ে দেশহিতৈষী বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীরাজকুমার দাস।

বঙ্কিমচন্দ্র। ১।

(সমালোচনা)

"The great and good do not die, even in this world embalmed in books their spirits walk abroad."—*Smiles.*

ধর্ম্ম বা রাজনৈতিক জগতে মানবের বহুযুগব্যাপী বিশ্বাসের কোনও পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এক একজন প্রচারকের আবশ্যক হয়; তাঁহারা সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত মানবগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগের নিকট যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তাহাদিগের দীর্ঘ কালের বিশ্বাস সত্যের উপর স্থাপিত নহে, তাহা দৃঢ় হইতে পারে না; উন্নতি যখন জগতের আরাধ্য দেবতা, তখন তাহাদিগকে সেই উন্নতির আলোক লক্ষ্য করিয়া গভীর অন্ধকার হইতে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহাদের এক একটি কার্য্যের স্মৃতি অনন্ত-কালের জন্য তাঁহাদের নামকে গিরিসম্রাটের উদয়রবি-রশ্মি-সমুজ্জ্বল চিরতুষার-মণ্ডিত মস্তকের মত উচ্চ এবং যশঃসমুজ্জ্বল করিয়া রাখে। সাহিত্যজগতে কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এইরূপ প্রচারকের আবশ্যক হয়। সাহিত্য-জগতে এই প্রচারকের গৌরব ধর্ম্ম বা রাজনৈতিক জগতে প্রচারকের গৌরব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। এই সকল প্রচারক এক এক জন অবতার। ইঁহারা প্রতিভার অবতার, শক্তির অবতার, উন্নতির অবতার। ইঁহাদিগের কর্ম্মফলে জগতের সুখ সম্পদ বর্দ্ধিত হয়; চিরদুঃখকাতর মানব-হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপ অবতার।

প্রতিভার অবতার কর্ম্মযোগী বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষায় এক নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন। নির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহার প্রতিভার কতকাংশ এবং এই প্রাণদান কার্য্যে তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন প্রভৃতি বঙ্গভাষা নির্ম্মাণের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি তাহাই পরিষ্কৃত করিয়া, সেই শিলাখণ্ড হইতে মূর্ত্তি বাহির করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পায় নাই। তিনি এই মূর্ত্তিতে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই জন্য বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান বড় উচ্চ। সাহিত্যের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ কয় ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, আমরা পৃথক পৃথক ভাবে সে সকলের আলোচনা করিব।

ভাষা।—বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—"অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর, সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী।" ফরাসী কবি ও দেশহিতৈষী মহাত্মা হুগো এক স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,—"জগতের ভবিষ্যতে তরবারি নাই, পুস্তক।" সাহিত্য সেবকদিগের এই কথা বড় মূল্যবান্। বর্ব্বরতার মহান্ধকারের মধ্যে সভ্যতার আলোক প্রকাশের পর সভ্যজগতে যত কিছু মহদনুষ্ঠান বাক্যবলেই সাধিত হইয়াছে। অস্ত্রবল বাক্যবলের নিকট দাসের মত কার্য্য করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অস্ত্রবল অপেক্ষা গুরুতর বাক্যবল ছিল; তাঁহার মধুর ভাষার মোহিনী শক্তিতে পাঠক মাত্রেই মুগ্ধ। তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার প্রধান সহায় ভাষা। কোথাও তাহা জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত বসন্তের নীলাম্বরতলে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালার মৃদু মৃদু আন্দোলিতবক্ষ স্রোতস্বতীর মত বহিয়া গিয়াছে, অপ্সরা-কণ্ঠ সমুদ্ভব গীতির মত সেই কুলুকুলু মৃদুনাদ মধুর; আবার কোথাও তাহা "বর্ষাবারি প্রমথিতা" পরিপূর্ণা স্রোতস্বতীর মত বৃক্ষ লতা তৃণ সুশোভিত বেলাভূমি ভগ্ন করিয়া কল কল নাদে ছুটিয়াছে; কোথাও তাহা বাত্যাবিরল হিমঋতুতে তলতীরহীন সাগরের শান্তছবি; কোথাও তাহা উত্তাল তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ ফেণিল জলরাশির ক্রীড়াভূমি সাগর। কোথাও তাহা জীমূত গর্জ্জনের মত অসীম অম্বর প্রতিধ্বনিত করে; কোথাও তাহা অপ্সরানূপুর নিক্কণের মত কর্ণে আসিয়া মিলাইয়া যায়। তাঁহার উপন্যাসে এক ভাষা, তাহা মধুর কিন্তু তত গভীর বা গম্ভীর নহে, তাঁহার প্রবন্ধে এক ভাষা তাহা গভীর এবং গম্ভীর; আর এক ভাষা তাঁহার মহাগ্রন্থ "সাম্য" পুস্তকে, তাহা তীব্র, জ্বালাময়ী এবং তেজস্বিনী; আর এক ভাষা সেই বিদ্রূপময় "লোক রহস্য" ও "কমলাকান্ত" পুস্তক দ্বয়ে; তাহাও তেজস্বিনী কিন্তু বিদ্রূপপ্রবল। সাহিত্য সাম্রাজ্যে তাঁহার সিংহাসন দৃঢ় করিবার প্রধান সহায় তাঁহার সেই ভাষা—তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দাস সেই আশ্চর্য্য ভাষাকৌশল। কোথাও তাহা কুণ্ঠিত নহে।

উপন্যাস।—বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার উপন্যাস গুলিই সাধারণের বড় প্রিয়। বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেগুলি পাঠ করে। যাহারা তাঁহার মহাগ্রন্থ "সাম্য" ও "কৃষ্ণ চরিত্রে"র নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই, তাহারাও তাঁহার উপন্যাস গুলি সযত্নে পাঠ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন

সেগুলির ভাব তেমনই সেগুলির ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাস দোষশূন্য নহে, তাহারা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসও নহে। কেন তাহাই বলিতেছি: বঙ্কিমচন্দ্র কোন প্রবন্ধে বলিয়াছেন "কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই।" তাঁহার আপনার এই সৃষ্টি ক্ষমতা ছিল, তাই তাঁহার গ্রন্থের এত আদর। তিনি ঐন্দ্রজালিকের মত পাঠককে যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহাই দেখাইতে পারিতেন। ইহার স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার, দেখাইতে পারিতেন; সৃষ্টিক্ষমতা তাঁহার ছিল, তাহারই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় যশোবান। কিন্তু তিনি আবার বলিতেছেন, "সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজী আখ্যায়িকা লেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে গণনা করিতে হয়; কেন না ঐ সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট না হইলে কোন প্রশংসা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি যে সর্ব্বত্রই স্বভাবানুকারী এমন কথা বোধ হয় বলিতে পারি না। তাঁহার উপন্যাসে মানব চরিত্র বিশ্লেষণের অসীম ক্ষমতা দৃষ্ট হয় কিন্তু সময় সময় তাঁহার সৃষ্টি স্বভাবানুকারী নহে। বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ তাঁহার স্বপ্নাদিতে বিশ্বাস এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতির অসীম ক্ষমতায় ভক্তিময় বিশ্বাস। যেখানেই তেজঃপুঞ্জ ধর্ম্মপ্রাণ কোন সন্ন্যাসী বা গুরুকে তিনি সম্মুখে দেখিয়াছেন, সেখানেই সাম্য মহামন্ত্রের প্রচারক আপনাকে যবনিকার অন্তরালে লইয়াছেন। সন্ন্যাসী বা গুরু যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীর ক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহার "রজনী" নামক সুন্দর উপন্যাস খানির শেষভাগে অসম্ভবের ঘন স্নিগ্ধ ছায়া ঘনাইয়া আসিত না। "মৃণালিনী"র গুরুদেব অসীম ক্ষমতাপন্ন। "চন্দ্রশেখর"এ তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবান, তিনি রহস্যময়; তাঁহার এক স্থানের কার্য্যের সমর্থন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার চতুরভাবে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন "যোগ বল না Psychic Force?" পাছে কেবল যোগবল বলিলে কেহ বিশ্বাস না করে তাই এ নামকরণ। "সীতারাম"এ জয়ন্তীর ক্ষমতা সাধারণ মানবের ক্ষমতাপেক্ষা অধিক। "রজনী"র বিজ্ঞাপনে তিনি আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ গ্রন্থে "অনৈসর্গিক বা অপ্রকৃত" ব্যাপার আছে

তথাপি সন্ন্যাসীর জন্য তিনি পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থেই তিনি এই সকল অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মানবগণের অবতারণা করিয়াছেন।

আর বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ বৈচিত্রময় হইলেও তাহার শেষ এক। স্রোতস্বতী যেখান হইতে উৎপন্ন হউক, যত জনপদের মধ্য দিয়া যাউক, সে সাগরে পতিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে যত চরিত্র বা ঘটনা বৈচিত্র প্রদর্শিত হউক না প্রেম তাহার প্রধান অঙ্গ, মেরুদণ্ড। "দুর্গেশনন্দিনী" হইতে "রাজসিংহ" পর্য্যন্ত সেই এক তান। রজনী ত কণ্ঠস্বরেই মজিল। "দেবী চৌধুরাণী" ও "সীতারাম" তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক উপন্যাস কিন্তু সে দুইখানিও প্রেমপ্রবণ। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের জন্য পাগল, শ্রীর জন্য সীতারামের সকল গেল—অবশ্য সীতারামের বাসনা ব্রজেশ্বরের বাসনা অপেক্ষা হীন। "রাজসিংহ"ও প্রেমপ্রবণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে দোষ আছে তাহা স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু গুণের কাছে তাহা নিতান্ত সামান্য "শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র।" তাঁহার উপন্যাস "সাগরবৎ, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ, দুরন্ত রাগদ্বেষ ঈর্ষাদি বাত্যাসন্তাড়িত, ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মি-লীলা—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার বৃক্ষরাজি, ইহার মৃদুগীতি সাহিত্য সংসারে দুর্ল্লভ।" বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য চিত্রকর। হইতে পারে তিনি উপন্যাস রচনার আদর্শ কেবল ইংরাজীতে নহে বাঙ্গালাতেও পাইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র বঙ্গভাষায় উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের একবিন্দুও হানি হয় নাই। বরং আলালী বাঙ্গালা লইয়া তাঁহার বিপদ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভাষা গঠনের সময় তাঁহাকে কেবল পণ্ডিতী নহে, পণ্ডিতী ও আলালী এই উভয় প্রকার বাঙ্গালার মধ্যে যাইতে হইয়াছিল। একদিকে সেই সন্ধিসমাসসঙ্কুল সংস্কৃত-প্রধান জটিল ভাষা, আর একদিকে সেই গাম্ভীর্য্যবিরহিত সাধারণের ব্যবহৃত গ্রাম্য ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এতদুভয়ের মধ্য হইতে সার বাছিয়া বাহির করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তিনি ভাষাকে যেখানে যেরূপ আবশ্যক সেখানে সেইরূপ করিয়াছেন—বঙ্গভাষার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলিকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—সাধারণ—দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা।

সৌন্দর্য্য বিষয়ক—মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ,রজনী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল ও ইন্দিরা।

জাতীয় ভাব বিষয়ক—আনন্দমঠ।

ধর্ম্মভাব বিষয়ক—দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম।

ঐতিহাসিক—রাজসিংহ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গললয় পরমেশ্বরের কৃপায় দাসাশ্রমের আর একটি মাস চলিয়া গেল। নিম্ন আতুরগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

১। দামো, ২। তিতুরাম, ৩। টোকানি, ৪। দেবীয়া, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। শিবু, ৭। ফুলকুমারী, ৮। স্বর্ণ, ৯। কৃষ্ণপ্রসন্ন ইহারা সকলেই এক প্রকার কুশলে আছে।

১০। দুর্গামণি—বার্দ্ধক্যবশতঃ ফুলিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করিবে।

১১। রামজি—ইহার অবস্থাও ভাল নহে।

১২। বাবুরাম—সারিয়া উঠিয়াছে। তাহার ধর্ম্মপিতা বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট হইতে ৫৲ পাঁচটী টাকা চাহিয়া লইয়াছে। তাহার ইচ্ছা,—তাহার আরোগ্য উপলক্ষে ভগবানের নামে আতুরদিগকে একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইবে। টাকা জমা আছে।

দানপ্রাপ্তি।

(২৪.শে মার্চ্চ হইতে ২৩শে এপ্রেল পর্য্যন্ত)

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত দানগুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়ছে। ভগবান পরদুঃখ কাতর দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ।০,বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ১৷০,নবাব সৈয়দ আব্দুল সোভান চৌধুরী মার্চ্চমাসের চাঁদা ১৲ 86, Harrision Road 1st floor mess ।৶, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা চৈত্র মাসের চাঁদা ॥০, রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পুত্র বাবু জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়া ১০৲, নাবালক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বিবাহ উপলক্ষে ১৲, Mr. S. Kattya Naidu ৩৲, বাবু গোপালচন্দ্র সাহা ।০, বাবু কামিনীকুমার গুহ মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৲, বাবু আশুতোষ মিত্র ১৲, বাবু অন্নদা মুখোপাধ্যায় ৸০, কোন হিন্দু মহিলা ১৲, সরকার্স ডিবেটিং ক্লাব হইতে বাবু চারুচন্দ্র মুখার্জি কর্ত্তৃক সংগৃহীত :—বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু ॥০, বাবু ভুপেন্দ্রনাথ মুখো ॥০, বাবু রসগুণাকর মিত্র ॥০, A friend ২৲, বাবু সদয়াচরণ মিত্র M. A. B. L ৪৲, বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ ১৲, বাবু রাধাকান্ত দত্ত বাঁকীপুর ১৲

বাবু দামোদর পাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৷০, শ্রীমতী শশীমুখী দাস গুপ্তা ॥০, বাবু রামযাদব মৈত্র ১৲, বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৵০, বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগছী ৵০, M. B, J ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু শশীকুমার বন্দো ॥০, A friend ॥০, একজন হিতৈষী ॥০, বাবু হরসুন্দর মজুমদার ২৲, বাবু বিষ্ণুচরণ বসু ১৲, গণেশ রামা ৸৫, শিলিগুড়ি বাজার হইতে সংগৃহীত ১৵০, মুন্সী আলীয়ার রহমান ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৲, জনৈক বন্ধু মাঃ বাবু রামানন্দ চট্টো ২৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু মার্চ্চ মাসের চাঁদা ॥০,Mr. N. K. Bose ঐ মাসের চাঁদা ১৲, Mr. P. C. Dutt ১৲, Mr. S. D. Ray ১৲, বাবু যতীন্দ্রমোহন কুমার ১৲, বাবু প্রহ্লাদচন্দ্র পাল ২৲, বাবু এককড়ি সিংহ রায় মাসীর আদ্যশ্রাদ্ধে ১৲, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র রায় ১৲, D. N. Bose Esq. ॥০ বাবু হারানচন্দ্র বন্দো মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৲, বাবু বিপিনবিহারী ধর ৸০, বাবু কেদারনাথ দাস মার্চ্চ মাসের চাঁদা ।০, K. C. Ghosh Esq. ১৲, গোপালচন্দ্র বন্দো ১৸৵১০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী চৈত্র বৈশাখ মাসের চাঁদা ২৲, জনৈক বন্ধু মাঃ শ্রীগোপাল বাবু ।৵০, বাবু দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥০, একজন হিতৈষী ॥০, A Friend ৵০, বাবু রোহিণীরঞ্জন সেন ।০, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ১৲, বাবু রাসবিহারী মজুমদার ।০, মুন্সী আব্দুল রহমান ২৲, মুন্সী রহিম বক্স পেস্কার ২৲, A Friend /০, একজন হিতৈষী ।০, A Friend ৵০, বাবু আনন্দচন্দ্র রাহুত ।০, মুন্সী এনাৎ উল্লা ২৲, একজন হিতৈষী ।০, বাবু রামকুমার চক্রবর্ত্তী ২৲, বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত ১৲, বাবু সর্ব্বেশ্বর নাথ ॥০, মুন্সী আব্দুল গফুর ॥০, বাবু অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু হরিশ্চন্দ্র লাহিড়ী ১৲, বাবু বরদাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ।০, বাবু আশুতোষ প্রামাণিক ১৲, বাবু হীরালাল মণ ১৲, শ্রীমতী গোপেশ্বরী সেন গুপ্তা ১৲, বাবু গুরুচরণ বসু ও বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষ ॥০, বাবু যোগেশচন্দ্র রায় ।০, বাবু শরৎচন্দ্র শীল ।০, বাবু ইন্দুভূষণ ঘোষ ।০, নীলকামারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ৩৷/৫, ডাঃ আনন্দচন্দ্র সেন ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র মুখো ১৲, ডাঃ হরিনাথ সিংহ ১৲, বাবু বিশ্বেশ্বর সেন উকীল ১৲. বাবু প্রসন্নকুমার সেন ৶১০, বাবু মতিলাল হালদারের কোন আত্মীয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে, সেই আত্মীয়ের পুত্রগণ ১৫৲, শ্রীমতী শৈলবালা সেন গুপ্তা ১৲, শ্রীমতী মহামায়া দাসী ১৲, বাবু গুরুচরণ মহলানবীশ ৵০, বাবু শ্যামাচরণ হাজরা ১৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৲, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষাল ॥০, বাবু নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৲. বাবু সাতকড়ি চট্টো বাঁকীপুর ১৵০, ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

চাউল বিক্রয় ৩৲১৫, কম্বল বিক্রয় ১০৲; দাসী হইতে প্রাপ্ত ৩৶০॥, পুস্তক বিক্রয় ॥/০, মিষ্টিকুমড়া বিক্রয় ৵১০, উদ্বৃত্ত জমা ॥০।

বস্ত্রাদি। কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু তিন বারে কতকগুলি কাপড় ও বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ মিষ্টি কুমড়া ১।

ইহা ছাড়া আমরা যথেষ্ট পরিমাণে মুষ্টি ভিক্ষাও পাইয়াছি।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ১২৮॥৵১০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৭।৵৭॥, বিগত মাসের জের ৩৸/১৭॥; মোট আয় ১৫০৲১৫।

ব্যয়।

গিরিডি সেবালয়ে প্রেরণ ৯১৲, আদায় কারীর ব্যয় ১৫৸১৫, পার্শেল ব্যয় ১॥৵১৫,হাওলাৎ কর্ম্মচারী ১০৲, রেবতী বাবুর সংগৃহীত টাকা ফেরত ২৲, ডাক ব্যয় ॥১০, ট্রাম ভাড়া ৵১০, হাওলাৎ বনমালী বাবু ৲১৫, ভিখারী ৲১০, প্রেক ৲৫, মোট আয় ১২১।/০।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৫০৲১৫, মোট ব্যয় ১২১।/০, হস্তেস্থিত ২৮॥৵১৫।

গিরিডির আয় ব্যয়।

মোট জমা।

মণি-অর্ডার ৯০৲, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৲, মাঃ বাবু ধরণীধর বন্দোপাধ্যায় ৮৲, বাবু প্রতিভারঞ্জন রায় /০ একজন সেবালয় দর্শক ৵১০, গত মাসের জের মোট জমা ১০৪৸১২॥।

মোট খরচ।

সংসার খরচ ৩২॥৵০, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৭॥/১০, বাড়ী ভাড়া ১৮৲, গোয়ালা ৪৲, বাজেমের অতিরিক্ত খরচ ৮৲, ধোপা ॥০, বাজে খরচ।০, মোট ব্যয় ১০১৲১০।

মোট আয় ব্যয়।

মোট জমা—১০৪৸১২॥, মোট ব্যয়—১০১৲১০, হস্তেস্থিত—৩৸২॥।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। মার্চ্চ মাসের 'দাসী'র বিজ্ঞাপন স্তম্ভে যে সকল এজেণ্টের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া বাবু রজনীকান্ত দাস মাণিকদহে, এবং বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক কলিকাতায় দাসী ও দাসাশ্রমের এজেণ্টের কার্য্য করিবেন।

২। গ্রাহকগণ এজেণ্টগণের নিকট হইতে আমার স্বাক্ষরযুক্ত মুদ্রিত রসিদ গ্রহণ করিয়া টাকা দিবেন। তাহার ব্যতিক্রম হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। কেহ যদি কাগজ না পান, তবে ইংরেজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন। নতুবা আমরা দায়ী হইব না।

৪। কাহারও কোন জিজ্ঞাস্য থাকিলে, তিনি যেন রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট-সহ পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর দিতে বাধ্য হইব না।

২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
দাসী ও দাসাশ্রম কার্য্যালয়
কলিকাতা

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস
কার্য্যাধ্যক্ষ।

দাসী

আমার পশ্চিম ভ্রমণ।

(শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত)

ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে (১৮৬৭) মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ও ভক্তিভাজন বাবু রামতনু লাহিড়ীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে রামগোপাল বাবু পীড়িত হইয়া জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় ভাগলপুর হইয়া যান। কিছুদিন পরে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। রামতনু বাবু এই সময় তাঁহার ভাগলপুরস্থ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন জাতিবিভেদ লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম, "যখন সকল দেশে সকল সমাজে জাতিবিভেদ কোন না কোন প্রকারে আছে ও থাকিবে, তখন আমাদের দেশের জাতিবিভেদ এতই কি দোষ করিল? আপনি কি আপনার চাকরের সহিত একত্রে খাইতে পারেন?" তিনি বলিলেন, "ও যদি সাবান দিয়া গা হাত পা পরিষ্কার করে, তাহা হইলে আমি খাইতে পারি।" তর্ক যখন খুব জাঁকিয়া উঠিল, তিনি কুপিত হইয়া ইংরাজী বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় বলিলেন, "Had you not stood for the poor widow, আজ তোমায় গালাগালি দিয়া ভূতছাড়া করিতাম।" যে দিন আমি ভাগলপুর ছাড়িয়া আসি, সে দিন তাঁহার সঙ্গে কোন কারণ বশতঃ বিদায়ী দেখা করিয়া না আসাতে বৃদ্ধ আমার সহিত দেখা করিবার জন্য Railway platformএ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। Platformএ দাঁড়াইয়া কথোপকথন কালে দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সাদীর গোলেস্তাঁ হইতে এক বয়াৎ উদ্ধৃত করিয়া আওড়াই। তখন গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে। রামতনু বাবু পার্সী জানেন, কিন্তু ভাল জানেন না। আমি যে বয়াৎ আওড়াইলাম, তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ তিনি তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার এক

মিনিট বিলম্ব আছে, তথাপিও তিনি ছাড়েন না। আমি দেখিলাম, মহা মুস্কিল। কোন ক্রমে তাঁহার হাত এড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক গাড়ীতে ঢুকিলাম। পথে আবার একদিন অবস্থিতি করিয়া এলাহাবাদে আমার হেয়ার সাহেবের স্কুলের সমাধ্যায়ী পুরাতন বন্ধু বাবু নীলকমল মিত্রের বাটীতে অবস্থিতি করি। তথায় তাঁহার পুত্র সপ্তদশবর্ষীয় যুবক চারুচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন। ইনি নামেও চারু, কর্ত্তব্যেও চারু। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য ঐ নামের উপযুক্ত, এমত নহে। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, সরলতা, সৌজন্য ও অতিথি-সেবার জন্য ঐ নামের উপযুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় থাকিতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের মুখে ইঁহার বিবিধ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতি অসাধারণ স্নেহভাবের উদয় হয়। পিতৃস্নেহের ন্যায় স্নেহ উদিত হয়। নীলকমল বাবুর বাটীতে (লালকুটি তাহার নাম) অবস্থিতি কালে পাঁচটি জিনিষ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। (১) একটি অতি বৃহৎ কাকাতুয়া পক্ষী। (২) একটি শিখ ভদ্রলোক। ইনি পূর্ব্বে কোতোয়ালী কার্য্য করিতেন। নীলকমল বাবুর কোন বিশেষ উপকার করাতে তিনি তাঁহার কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় আপনার বাটীতে তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন। (৩) ব্রাহ্মদিগের ঘর। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম জাওয়ান থাকিত। (৪) একটি ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম হরিবোল ব্রাহ্মণ ছিল; নামাবলী গায় দিয়া সর্ব্বদা "হরি হরি বোল" বলিয়া বেড়াইতেন। (৫) একটি ঘর যাহাতে একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ভাগবত পাঠ করিতেন। কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্বপ্নে দৃষ্ট কোন অপূর্ব্ব রমণীয় স্বর্গীয় দৃশ্যের ন্যায় মনোহর তাজমহল দর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক কাইসার বাগস্থ তাঁহার অতি শোভনতম রাজভবনবৎ বাটীতে আমাকে দুই তিন দিন রাখেন। আমার সহিত বিখ্যাত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কর তাঁহার অতিথি হয়েন। এক দিন দক্ষিণা বাবুর বাটীতে উপাসনা করি। সে উপাসনা শুনিয়া হেমচন্দ্র কর বলেন যে এ উপাসনায় কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। লক্ষ্ণৌএ কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে ফিরিয়া আসি। তথায় অবস্থিতি করিবার কালীন কানপুরের

কতকগুলি ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত এক অতি বিনীত আবেদন-পত্র প্রাপ্ত হই। আমি এইরূপ আবেদন-পত্রের উপযুক্ত নহি। সেই পত্রে তাঁহারা কানপুরে কিছুদিন থাকিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ অনুসারে কানপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগের সমাজে উপাসনা করি। তৎপরে লক্ষ্ণৌয়ে পুনরায় গমন করিয়া দক্ষিণা বাবুর আলয়ে তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করি। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিলাতে বিখ্যাত Times পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই একটি প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিসনারি ডাক্তার ডফ্ লর্ড ক্যানিংএর নিকট তাঁহার গুণানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্জন্মদাতা বলিলে হয়। তিনি লক্ষ্ণৌতে ক্যানিং কলেজ ও Oudh British Indian Association সংস্থাপন করেন। দক্ষিণা বাবু বিখ্যাত ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ইহা সকলেই জানেন যে ডিরোজিওর ছাত্রেরা অত্যন্ত ইংরাজীভাবাপন্ন লোক। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় গিয়া টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি তথাকার একটি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র উঁহার ঔরসে ও উঁহার বিবাহিতা বর্দ্ধমানের বিখ্যাত বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে হয়। আমি যে তিন সপ্তাহ তাঁহার ওখানে অতিথি স্বরূপ থাকি, তন্মধ্যে এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করি। ঐ ব্রাহ্মসমাজ লক্ষ্ণৌএ সংস্থাপিত প্রথম ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু আমি উহার ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া সংস্থাপন করি নাই, অন্য একটি নাম দিয়া উহা সংস্থাপন করি। পরে ব্রাহ্মসমাজ নাম ধার্য্য করি। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন উপলক্ষে অনেক লোক আমার নিকট গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল। একদিন দক্ষিণা বাবু আমাকে বলিলেন যে "তুমি জান তোমার পিছু আমি গোয়েন্দা রাখিয়াছি; পাছে পাগলা undo the work I have done in Oudh। অর্থাৎ অযোধ্যায় হিন্দু হইয়া আমি যে কাজ করিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন রূপ অহিন্দু কার্য্য দ্বারা পাগল তাহার বিলোপ সাধন না করে।" আমি তদুত্তরে বলিলাম যে "কেবল আমি পাগল নহি, আপনিও কিঞ্চিৎ পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও British

Indian Association সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।" দক্ষিণা বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন; কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত, কেবল তাহাই হওয়া কর্ত্তব্য, এমন মনে করিতেন। আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। যখন আমরা সকল হিন্দু শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করি এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদিক বাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করি, তখন আমরা কি প্রকারে অহিন্দু হইলাম? দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদকে অত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। লক্ষ্ণৌতে একবার কোন সাহেবের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথনের সময় তিনি গোমতীর অপর পারস্থ প্রকৃতি-পটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "There's the Brahmin's Bible."। তিনি বলিতেন "বেদের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।" কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ হওয়া কর্ত্তব্য, এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক্ ব্রাহ্ম বলিলেই হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা, দক্ষিণা বাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতেন, তখন তাঁহার চাপরাসীদিগকে "ওঁ" অঙ্কিত তকমা পরিধান করাইতেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত রাজ্যের ভার ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে লইয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণা পত্র বাহির করেন। যে দিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও উপনগরে ঐ ঘোষণা পত্র উদ্ঘোষিত হয়, সেইদিন মহা মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার ঢাকার জমিদারীতে ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও অন্যান্য কার্য্য-বৃত্তান্ত যে ইংরাজী পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল, সেই পুস্তকের এক খণ্ড লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতি কালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা আমি অতি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছি। দক্ষিণারঞ্জন বলিতেন যে তিনি যেমন ধর্ম্মসংস্কারক, তেমনি সমাজসংস্কারক। রাণী বসন্তকুমারীকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা আনিয়া কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেট বার্চ্চ সাহেবের সম্মুখে civil marriage করেন। ভাস্কর সম্পাদক

গুড় গুড়ে পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তি এই বিবাহের সাক্ষী ছিলেন। গুড় গুড়ে পণ্ডিতের প্রকৃত নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। লক্ষ্ণৌ অবস্থিতি কালে তিনি (দক্ষিণা বাবু) আমাকে একদিন বলিলেন যে তিনি বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমাজ-সংস্কারক আর কে আছে? ব্রাহ্মেরা তাঁহার কাছে এই বিষয়ে দাঁড়াইতে পারে না। দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়-কন্যার বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করিতেন। আমি যখন লক্ষ্ণৌতে ছিলাম, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল। কেবল পৌত্র বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার নাম ভুবনরঞ্জন।* তিনি উইল না করিলেও এই পৌত্রের বিষয় প্রাপ্ত হইবার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

লক্ষ্ণৌর দক্ষিণা বাবুর ওখানে তিন সপ্তাহ অতিবাহন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে কানপুর ফিরিয়া আসি। সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায় বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতাতে প্রমাণ করি যে আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে। দাদু, কবীর ব্রাহ্ম ছিলেন। যে আট মাস কানপুরে কাটাই, তাহার মধ্যে এক মাস হেমচন্দ্র সিংহের বাটীতে ও আর এক মাস ডাক্তার অক্ষয়কুমার দের বাটীতে থাকি, আর কয়েক মাস ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকি। হেমচন্দ্র সিংহ ব্রাহ্ম ছিলেন। অক্ষয়কুমার দে ব্রাহ্ম ছিলেন না। উভয়ে যার পর নাই আমাকে যত্ন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড় মজার লোক ছিলেন। হিন্দুভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নাম তিনি "নামাবলী" রাখিয়াছিলেন। আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "নামাবলীটী ছাড়ুন।" একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাই, ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি বলিলেন যে আপনার দেরি হওয়াতে আমি মনে করিলাম যে "আপনি নৈমিষারণ্যে চলিয়া গিয়াছেন।" নৈমিষারণ্য কানপুরের পর পারে কিছুদূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমার হিন্দুভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন কানপুরের সকল ব্রাহ্মকে লইয়া আমি বিটুর গ্রামে বাল্মীকি তপোবনে গমন করি। বাল্মীকির তপোবনে বাল্মীকির উপাসিত চিরন্তন ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া বৈকালে পরপারস্থ সীতা-পরিহার মন্দিরের সম্মুখে এ পারের ঘাটে বসিয়া রামায়ণ বিষয়ে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা তত্ত্ব-

* তিনি এক্ষণে (১৮৯৫) জীবিত আছেন।

বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই বক্তৃতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে রামায়ণ অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করে। সমস্ত দিন আনন্দে কাটান যায়। বিটুর গ্রামে বৎসর বৎসর একটী মেলা হয়। ঐ গ্রামের অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই স্থানে একটি মহারাষ্ট্রীয় উপনিবেশ আছে। ঐ স্থানে খ্যাত্যাপন্ন (সুখ্যাতি-সম্পন্ন কি কুখ্যাতিসম্পন্ন, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন) ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের নিবাস ছিল। দেখিলাম, তাঁহার বাটী ইংরাজেরা সমভূমি করিয়াছে। কেবল এক জোড়া প্রকাণ্ড ফটক পড়িয়া আছে। বিটুরবাসী মহারাষ্ট্রীয়দিগের বালিকা কন্যাগুলি চেহারা ও বেশভূষায় ঠিক আমাদের বাঙ্গালি বালিকার ন্যায় দেখিতে। তাহাদিগকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম।

তুকারাম।

সপ্তম প্রস্তাব।

তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত, আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি। দেহুর নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের লোক, তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেন। হরি-কথাতেই তুকারামের আনন্দ, লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখে হরি-কথা শ্রবণ করে, ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই ভাবিয়া তুকারাম আনন্দিত চিত্তে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য, সেই সকল গ্রামে গমন করিতেন। ক্রমে অনেক লোকেই তাঁহার অনুরক্ত ও মতাবলম্বী হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণ লোক, যেমন তাঁহাকে সাধু-ভক্ত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন, ঈর্ষাকলুষিত আত্মাভিমানী ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণও তেমনই তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহীপতি বলেন, "যাহাদিগের বিদ্যা, বয়স, রূপ, জাতি ও কুলের অভিমান প্রবল, সাধুদিগের প্রসাদবাণী তাহাদিগের তৃপ্তিকর হয় না। কাহার কোন বংশে জন্ম, কে কোন পথাবলম্বী, কাহার শাস্ত্রজ্ঞান কতদূর, এই সকল কথা লইয়া ইহারা মত্ত থাকে। প্রকৃত ধর্ম্ম কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা তাহাদিগের লক্ষ্য থাকে না। তুকারাম শূদ্র হইয়া, ব্রাহ্মণকেও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, এবং শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত হইয়া, শাস্ত্রের মর্ম্ম

সাধারণের নিকট প্রচার করেন, ইহা কাহারও কাহারও নিকট নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। দেহুর মোহান্ত মম্বাজী গোঁসাই পূর্ব্বে তুকারামের সঙ্গে কিরূপ অসৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মম্বাজীর ন্যায় রামেশ্বর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণও এই সময় তুকারামের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মম্বাজী নিজের প্রতিপত্তি লোপের আশঙ্কাতেই, তুকারামের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন; কিন্তু রামেশ্বর ভট্টের আক্রোশের কারণ অন্যরূপ ছিল। রামেশ্বর নিজে "রাজমান্য" শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাধারণের সাক্ষাতে তিনি আপ-নাকে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া অভিমান করিতেন। তুকারাম যেরূপ ভাবে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার মনঃপূত ছিল না। সাধারণ শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতগণের ন্যায়, তিনি তুকারামকে একজন অজ্ঞ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চাকারী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহার উপর তুকারাম ব্রাহ্মণের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মর্ম্মদাহ হইত। উপদেশ দিতে হইলে ব্রাহ্মণই দিবেন, ভগবৎ-কথা প্রচার করিতে হইলে ব্রাহ্মণই করিবেন, ইহাই ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত রীতি। বণিকপুত্র তুকারাম কে, যে তিনি, ব্রাহ্মণের ন্যায়, আপনাকে লোকের মুক্তিপথের পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিমান করেন? রামেশ্বর লোকের মুখে তুকারামের কার্য্যপ্রণালী ও সুযশ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে দমন করিবার জন্য তুকারামের যে গ্রামে বাস, তাহার অধিকারীর নিকট যাইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি গ্রামাধিকারীকে বুঝাইলেন, যে তুকারাম শূদ্র হইয়া শ্রুতির মর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, শাস্ত্রানুসারী ক্রিয়াকলা-পাদিতে উৎসাহদানের পরিবর্ত্তে আপাতমধুর ও মোহোৎপাদক সঙ্গীতাদি দ্বারা সরলচিত্ত লোকদিগকে মতিভ্রান্ত করিতেছেন, শূদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্রাহ্মণসন্তানদিগের নমস্কার গ্রহণ করিতেছেন, সকল ধর্ম্ম উৎসাদিত করিয়া, কি এক অদ্ভুত মত "নাম মহিমা" প্রচার ও "ভক্তি-পথ" স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মবিপ্লাবক, ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী ও "পাষণ্ড মতের" পরিপোষক। ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য তাঁহার শাসন একান্ত আবশ্যক।* রামেশ্বর ভট্ট দেশমান্য ব্যক্তি ছিলেন,

* বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অবিদিত নাই যে শ্রীচৈতন্যকেও ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য ঠিক

সুতরাং তাঁহার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া গ্রামাধিকারী দেহুর "পাটিল" বা গ্রামলেখককে তুকারামের নির্ব্বাসনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পাটিল তুকারামকে প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া দেহু ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বলিলেন। দরিদ্র তুকারাম বিষম বিপদে পড়িলেন। হঠাৎ পিতৃপিতামহের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া সহজ কথা নয়; এদিকে গ্রামাধিকারীর অনভিমতে গ্রামে বাস করাও সম্ভব নয়। অনেক চিন্তার পর তুকারাম শেষে রামেশ্বর ভট্টের শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। রামেশ্বর স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, তুকারাম সেই সময় যাইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তুকারাম ভাবিয়াছিলেন যে, যে হরিকথায় পাষাণও বিগলিত হয়, রামেশ্বর তাহা শ্রবণ করিলে আর তাঁহার প্রতি বিরক্ত থাকিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া আপনার অভ্যাসানুরূপ হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রামেশ্বরের হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইল না; তিনি বিরক্তির সহিত তুকারামকে বলিলেন, "তুকারাম তুমি শূদ্র, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন কালে তুমি যে সকল কথা ব্যক্ত কর, তাহাতে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হয়। এরূপ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা গায়ক ও শ্রোতা উভয়কেই নিরয়ভাগী হইতে হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে। অতএব তুমি এখন হইতে আর কখনও এরূপভাবে সঙ্কীর্ত্তন ও কবিতা রচনা করিও না।" ব্রাহ্মণভক্ত তুকারাম "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এই বলিয়া রামেশ্বরের কথার উত্তর দিলেন, এবং তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি একাল পর্য্যন্ত যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে প্রভুর আদেশ কি, জানিতে ইচ্ছা করি।" গর্ব্বিতস্বভাব ও ধর্ম্মাভিমানী রামেশ্বর বলিলেন, "সেই সকল কবিতা ইন্দ্রায়নীর জলে লইয়া নিক্ষেপ কর।" তুকারামের হৃদয় এই নিদারুণ আদেশে ব্যথিত হইল, কিন্তু তিনি হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত না করিয়া, "যে আজ্ঞা, তাহাই হইবে," এই বলিয়া রামেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক, প্রস্থান করিলেন। রচনা উৎকৃষ্ট হউক, বা অপকৃষ্ট হউক, রচয়িতার পক্ষে তাহা বহুমূল্যবান। নিজের পুত্রকন্যার ন্যায় তাহার প্রতি মমতা জন্মে, সুতরাং রামেশ্বরের নিষ্ঠুর আদেশে তুকারাম

এইরূপ নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। চৈতন্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন; শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য শূদ্র তুকারাম যে আরও অধিক বিদ্বেষের আস্পদ হইবেন, তাহা বলা অতিরিক্ত।

যে মর্ম্মপীড়িত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ তুকারাম যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নাম, যশ, বা অর্থলাভের জন্য নয়। তাঁহার সর্ব্বস্বধন বিঠোবার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পদার্থই বিনাশ করিবার জন্য, রামেশ্বর এই কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা, তাঁহার আদেশ সর্ব্বথা শিরোধার্য্য, এইরূপ বিশ্বাসেই তুকারাম রামেশ্বরের আজ্ঞার প্রতিবাদ করেন নাই, ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বাক্য অবশ্যই প্রতিপাল্য বলিয়া, তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কবিতাগুলি ইন্দ্রায়নীতে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় তাঁহার দারুণ ক্লেশ বোধ হইল। যে তুকারাম আপনার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারমূলক কাগজপত্রগুলি স্বহস্তে নদীজলে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কবিতাগুলি নিক্ষেপ করিবার চিন্তা করিতে তাঁহার হৃদয় অধীর হইতে লাগিল। তুকারাম জানিতেন যে, কবিতাগুলি আর তাঁহার নহে, তাঁহার প্রিয়তম বিঠোবার, সুতরাং বিঠোবার মন্দিরে প্রবেশ করা অবধি তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। ভক্তের নিকট ভগবান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখা, সুহৃৎ, সকলেরই স্থান অধিকার করেন; শিশু যেমন মাতার নিকট যাইয়া, আপনার দুঃখ নিবেদন করে, তুকারামও তেমনই বিঠোবাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে আপনার বেদনা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভো, তুমি সকলের কর্ত্তা, তুমিই আমাকে এই সকল কবিতা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিলে, আজ তুমি আবার তাহা ইন্দ্রায়নীতে নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্রাহ্মণের মুখে আদেশ প্রচার করিতেছ। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক।" তুকারাম এই বলিয়া রচিত কবিতাগুলি পাষাণ ফলকে আবদ্ধ করিয়া এবং তাহা উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া বিঠ্‌ঠলের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রায়নীর জলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং ভক্ত যেমন প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে শূন্যমনে গৃহে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ শূন্যমনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কুটিলস্বভাব লোকেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে বিরত হইল না। কেহ বলিল, তুকারাম আপনাকে সাধু মোহান্ত বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ভালই হইল যে, রামেশ্বর ভট্টের ন্যায় একজন সাধু পুরুষের দ্বারা তাহার কুটিলতা ভেদ হইল। তুকারাম প্রথম প্রথম এসকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নিজের ইচ্ছানুরূপ পূজা ধ্যান ইত্যাদিতেই নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু গ্রামের

সকল লোক যখন এক বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল যে, "তুকারাম পূর্ব্বে আপনার পৈত্রিক কাগজপত্রগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার ঐহিক সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়াছিল ; এক্ষণে আপনার একমাত্র সম্বল কবিতা-গুলিও নিক্ষেপ করিয়া নিজের পারত্রিক সম্পদ বিসর্জ্জন করিল ;" তখন তাঁহার হৃদয় নিতান্তই অধীর হইল। তিনি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া বিঠোবার মন্দিরের সম্মুখে যে তুলসীমঞ্চ ছিল, তাহারই নিকটে একটী প্রস্তর খণ্ডের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। দিবারাত্রির মধ্যে তিনি কখনও সে স্থান ত্যাগ করিতেন না বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। মহীপতি বলেন তুকারাম এইরূপ ভাবে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত করিলে পর দেহুর লোকদিগের প্রতি বিঠোবার স্বপ্নাদেশ হইল যে, "আমি তুকারামের কবিতাগুলি জলের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়াছি, তোমরা যাইয়া তাহা উদ্ধার কর।" তৎপরদিন গ্রামের লোকেরা সেই সকল কবিতা প্রাপ্ত হইয়া তুকারামকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। কৃতজ্ঞ তুকারাম এই উপলক্ষে সাতটী অভঙ্গ রচনা করিয়া বিঠোবার বন্দনা করিয়াছেন।

এদিকে রামেশ্বর ভট্ট তুকারামকে তাঁহার কবিতাগুলি ইন্দ্রায়নীর জলে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া, শিষ্যগণের সহিত পুনরায় "নাগনাথ" নামক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের পূজা করিবার জন্য গমন করিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কোন মুসলমান ফকীরের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যস্থ জলাশয়ে স্নান করিলেন। কিন্তু স্নানের পর হইতেই তাঁহার বিষম গাত্রদাহ আরব্ধ হইল এবং কিছুতেই তিনি তাহা প্রশমন করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ফকীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু রামেশ্বর ব্রাহ্মণ হইয়া মুসলমান ফকীরের শরণাপন্ন হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি এই গাত্রদাহ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য, জ্ঞানেশ্বরের সমাধিস্থলে যাইয়া, আশ্রয়প্রার্থী হই-লেন। অনেকেই বলিতেছিল, যে, তুকারামের প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যব-হারের জন্যই তাঁহার এই অপ্রতিবিধেয় গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। রামেশ্বরও এক দিন স্বপ্ন দেখিলেন যে জ্ঞানেশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি ভগবদ্ভক্ত তুকারামের অনিষ্টাচরণ করাতেই তোমার সমস্ত সুকৃত বিনষ্ট হইয়া তোমার এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। তুকারামের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন তোমার আর মঙ্গল নাই।" তুকারামের অভঙ্গ সমূহের পুনরুদ্ধার সংবাদও

এই সময় রামেশ্বরের কর্ণগোচর হইল। তখন আত্মকৃত কার্য্যের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া রামেশ্বর তুকারামের নিকট তাঁহার স্তুতিপূর্ণ এক পত্র প্রেরণ করিলেন। রামেশ্বর তুকারামের প্রতি সেরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও তুকারাম তাঁহার উপর কিছুমাত্র বিরক্ত বা বিদ্বেষভাবাপন্ন হন নাই। তিনি রামেশ্বরের শিষ্যগণের মুখে ভট্টের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত অভঙ্গটী রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

হৃদয় নির্ম্মল, হলে শত্রুদল, সুহৃদ্ সমান হয়।
শার্দ্দূল ভীষণ, না করে ভক্ষণ, নাহি দংশে ফণীচয়।
বিষম গরলে, সুধাফল ফলে, বিপদ সম্পদ প্রায়।
নিষিদ্ধ করম, হয় সে ধরম, সন্তাপে আনন্দ হায়॥
দীপ্ত হুতাশন, না করে দহন, বহ্নিশিখা স্নিগ্ধ হয়।
জগতে সমান, সকলের প্রাণ, কর প্রীতি বিশ্বময়।
তুকা বলে তবে, শিখিলেত এবে, জগতের কিবা রীত্।
দেব নারায়ণ, প্রসন্ন এখন, মনে রেখ সুবিহিত॥

মহীপতি বলেন যে তুকারামের প্রেরিত এই অভঙ্গ পাঠ করিয়া রামে-শ্বরের গাত্রদাহ নিবারিত হইল, এবং রামেশ্বর তুকারামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইলেন। তুকারাম তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, রামেশ্বর তুকারামের নিকট নিজের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য বিশেষরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তুকারাম তাঁহাকে উপযুক্ত সান্ত্বনা দান করিলেন। রামেশ্বর বলিলেন, "আপনার প্রেরিত অভঙ্গই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে। এখন হইতে আমি আর আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না।" এই বলিয়া রামেশ্বর বিদ্যা, কুলাভিমান এবং সাংসারিক প্রতিষ্ঠার মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুকারামের চরণ ধারণ করিলেন। রামেশ্বর এই সময় হইতে তুকারামের অনুরাগী ভক্ত হইয়া তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের ন্যায় সঙ্কীর্ত্তনের সময়, ধ্রুবা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গীতের সাহায্য করিতেন। সত্যেন্দ্র বাবু রামেশ্বর ভট্টের এই পরিবর্ত্তন অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'বোম্বাই চিত্র' হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি সাদরে উদ্ধৃত হইল ;—

"এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের একজন পরম ভক্ত শিষ্য হইলেন—বিদ্বেষ অনুতাপে পরিণত হইল—যাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করি-তেন, তাঁহাকে দেবতারূপে পূজা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বোধ-

গম্য হইল, ভগবদ্ভক্ত জনের কোন জাতি নাই। যেমন শালগ্রাম প্রস্তর হইয়াও পূজার্হ, সেইরূপ ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যাত্মার প্রতি নীচ জাতির দোষ অর্শে না। দশগ্রন্থী বৈদিক পণ্ডিতেরা শাস্ত্র, পুরাণ, ভগবদ্গীতা প্রত্যহ পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহারা সে সকলের সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের কুচক্রে ও জাত্যভিমানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক নহেন,—তিনি বিঠোবার চরণদাস—তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ভক্ত ও ত্যাগী পুরুষ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখি নাই।"* এইরূপে তুকার প্রতি রামেশ্বর ভট্টের ভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল ও তিনি যে সকল কবিতা জলমগ্ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে তুকারামের শিষ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইয়া, কিরূপে তাঁহার সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ পূর্ব্বক পৃথক হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। তুকারামের মহত্বে মুগ্ধ হইয়া, কানাইয়া এবং সেই সঙ্গে আরও কয়েক জন লোক, এই সময় তুকারামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ইন্দ্রায়নী হইতে তাঁহার কবিতা সমূহের পুনরুদ্ধারের পরই তুকারামের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহাকে আর অধিক সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। তবে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পক্ষে চির শান্তি কখনও সম্ভব নয়; সুতরাং দুই এক স্থলে তিনি নির্য্যাতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। একবার তাঁহার কোন শিষ্যের পত্নীর হস্তে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্তি পাইতে হইয়াছিল। তুকারামের শিষ্যদিগের মধ্যে শিবজী কাঁসার নামে একজন কাংস্যকার ছিলেন। তুকারামের উপদেশ গুণে শিবজীকে ক্রমশ সংসার-বিরাগী হইতে দেখিয়া শিবজীর পত্নী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন এবং তুকারামই সকল অনিষ্টের মূল ভাবিয়া তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য একদিন তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক অত্যুষ্ণ জল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। তুকারাম যন্ত্রণায় অধীর হইলেও কাংস্যকার পত্নীকে কোন কথা না বলিয়া বিঠোবার চরণ বন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা হইতে তাঁহার যন্ত্রণা

* রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের স্তুতিবিষয়ক যে কয়েকটি অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

ক্রমশ প্রশমিত হইল। তুকারাম এই উপলক্ষ্যে যে অভঙ্গটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রচণ্ড অনলে দেহ করিছে দাহন।
এ সময় কোথা হরি করগো রক্ষণ॥
জনক জননী প্রভু তুমিই আমার।
এস তবে কৃপা করি এস একবার॥
আপাদ মস্তক হের দহিছে অনলে।
নিবারিতে নাহি পারি ভাসি আঁখিজলে॥
ভেঙে বুঝি গেল বুক সহেনা যে আর,
দাঁড়ায়ে কি দেখিতেছ ওহে গুণাধার।
শান্তির সলিল লয়ে এস ত্বরা করি
তোমাবিনা কেবা মোরে উদ্ধারিবে হরি।
তুকা বলে, তুমিত গো জননী আমার
তোমা বিনা আর কেবা করিবে নিস্তার॥

দুর্ব্বৃত্তা কাংস্যকার-পত্নী তুকারামের উপর একবার এইরূপ অত্যাচার করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। আহারের সময়ও তাঁহাকে বিষমিশ্রিত খাদ্য প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তুকারাম তাহা হইতেও অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। মহীপতি বলেন তুকারামের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের ফলে কাংস্যকার পত্নী অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়াছিল এবং দয়াময় তুকারামের অনুগ্রহে পরে সেই দুর্মোচ্য ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

তুকারামের সহিষ্ণুতার বিষয় আমরা বর্ণন করিয়াছি। তাঁহার আত্মসংযমের দৃষ্টান্তও মহীপতি উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, একবার একটী যুবতী রমণী, তুকারামের নিকট আসিয়া আপনার পাপাভিলাষ ব্যক্ত করে; তুকারাম তাহাকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, দুইটী অভঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তুকারাম যে কিরূপ কঠোর সংযমী পুরুষ ছিলেন, এই দুইটী অভঙ্গ হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অভঙ্গ দুইটীর সত্যেন্দ্র বাবুর কৃত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"স্ত্রী সঙ্গ চাহিনা দেব শুষ্কতরু এ যে
এ পাষাণ দেহ তাহে স্ত্রী সঙ্গ কি সাজে?
ভজন সাধন তাহে সব ঘুরে যায়।
লালসা মজালে পরে রক্ষা পাওয়া দায়॥
তাকানো সে মুখপানে মৃত্যুর সমান।
কামিনী লাবণ্য যেন দুঃখের নিদান॥
তুকা বলে সাধু হয় যদিও আগুণ।
কাছে গেলে দহিবে সে এই তার গুণ॥
পরস্ত্রীকে দেবপত্নী রুক্মিনী সমান
এ দড় বিশ্বাস মোর, ইথে নাহি আন।
যাওমা কি দিব তোরে কিবা মোর আছে।
বিষ্ণুদাস আমরা গো কেন কষ্ট মিছে।
এ তব দুর্দ্দশা হেরি হৃদি দহে দুখে।
ছিছি ছিছি হেন কথা আনিও না মুখে।
তুকা বলে হে সুন্দরী পতি যদি চাও
লোকের অভাব নাই, খুঁজে কি না পাও।*

এরূপ আত্মসংযম না থাকিলে কি আর তুকারাম, স্বদেশীয় সমাজে দেবযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইতেন?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

* প্রয়োজন বোধে সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদের দুই একটি কথা পরিবর্ত্তিত হইল।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

বাঙ্গালা ভাষার এখন আর সে দিন নাই। বাঙ্গালা ভাষা এখন কেবল অশিক্ষিত দোকানদার স্ত্রীলোক ও অর্দ্ধশিক্ষিত সংবাদপত্রলেখকের ভাষা নহে। যাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন ও বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয় বলিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি না হইলে বাঙ্গালী জাতিরও যে উন্নতি হইবে না, ইহা আজকাল অনেকেই বুঝিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিলে সমাজে কোনও ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা এবং কিয়ৎপরিমাণে প্রশংসালাভও হইতে পারে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা যে কখনই স্থায়ী হইবে না, ইহা নিশ্চিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যদি কেবল Captive Lady র ন্যায় আরও কতিপয় ইংরেজী কাব্য লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম আজ কেহ স্মরণ করিত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। কুমারী তরুদত্ত তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভাকে যদি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবায় নিয়োজিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আজ তিনি কখনই তাঁহার স্বদেশীয়গণের স্মৃতির এক কোণে পড়িয়া থাকিতেন না। যাঁহারা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহারা তরুদত্তের নামও শুনিয়াছেন কিনা, সন্দেহ স্থল। প্রসিদ্ধ ইংরেজী-লেখক বাবু ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার Travels of a Hindu নামক পুস্তক যদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ও তাঁহার পুস্তকের আজ কত গৌরব হইত। শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজী ভাষায় যে সমুদয় পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বঙ্গদেশে রাজকৃষ্ণ রায়ের যতটুকু নাম থাকিবে, তাহার শতাংশের একাংশও নাম তাঁহার থাকিবে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। লালবিহারী দের "গোবিন্দ সামন্ত" ও "বঙ্গদেশের রূপ কথা" কেবল ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই নিকট আদৃত হইবে; কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তিনি চিরকালই Dickens বা Thackerayর ন্যায় অপরিচিত থাকিবেন। "রাম শর্ম্মা" ইংরেজের নিকট কস্মিন্‌কালেও ত বাঙ্গালী মিল্টন বলিয়া গণ্য হই-

বেন না; অধিকন্তু একমাত্র বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকটও কখনও পরিচিত হইতে সমর্থ হইবেন না।

প্রকৃত কথা এই, কোনও জাতির সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উন্নতিতেই জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয়। ইদানীং সহস্র সহস্র যুবক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও, তাঁহাদের মধ্যে কেবল যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই উক্ত ভাষায় অধিকার লাভে সমর্থ হন, ইহা এক প্রকার অবধারিত সত্য। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যুবক ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিলেও বাঙ্গালা ভাষা তাঁহারা একেবারে বিস্মৃত হইতে সমর্থ হন না। জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও ইতর সাধারণের সহিত তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষাতেই কথোপকথন করিতে হয়। কেবল সমশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই সহিত তাঁহারা না বাঙ্গালা না ইংরেজী এক "বিতিকিচ্ছি" অদ্ভুত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহাদের যে একটা আন্তরিক প্রবৃত্তি আছে, তাহা বোধ হয় না। ইংরেজীর "বুক্‌নী" দিয়া কথোপকথন করা ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে ইদানীং একটা রীতি (কেহ কেহ বলেন, একটা রোগ) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে কেবল এই রীতিরই অনুসরণ করেন মাত্র। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, অবিমিশ্র বাঙ্গালাতে কথাবার্ত্তা কহিতে পাইলে অনেকেই যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচেন। যাঁহারা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া লিখন, পঠন ও কথোপকথনে কেবল ইংরেজী ভাষাই ব্যবহৃত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থা আমার নিকট বড়ই শোচনীয় প্রতীয়মান হয়। একজন বাঙ্গালী একটী হিন্দুস্থানী মহিলাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেমজ্ঞাপনোদ্দেশে "সই" য়ের স্থলে "সেঁঞা রে" বলিলে যেরূপ হয়, কিম্বা জনেক পীড়িত আতুর ব্যক্তি "বাপরে, মাগো" বলিবার পরিবর্ত্তে "Oh Papa, Oh mamma" বলিলে যেরূপ হয়, বাঙ্গালী হইয়া এবং বাঙ্গালা ভাষা বিস্মৃত না হইয়া বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার করিলেও ঠিক্ তদ্রূপই হয়। হাজার হিন্দী ও ইংরেজী জানিলেও, বাঙ্গালা ভাষাই যেন আমাদের প্রাণ। বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালাতে কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রাণে যেরূপ সুখ ও "সোয়াস্তি" পাওয়া যায়, এরূপ অন্য কোনও ভাষাতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় কথা কহিতে হইলে আমার মনে হয় যেন আমার প্রেমা-

স্পদের সহিত আমার হইয়া আর কেহ প্রেমালাপ করিতেছে। অন্য ভাষায় কথা কহিতে গেলেই যেন পরস্পরের মধ্যে একটী ব্যবধান আসিয়া পড়ে। সে ব্যবধানটি কিছুতেই যায় না।

যাহা হউক, বঙ্গদেশে ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষার বহুল চর্চ্চা হইলেও বাঙ্গালী সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্য ভাষা গ্রহণ করিবে না। বহুভাষাবিদ্ অনেক ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাই জনসাধারণের মাতৃভাষা, হৃদয়ের ভাষা ও সর্ব্বপ্রধান ভাষা হইয়া থাকিবে। জাতীয় উন্নতি সংসাধিত করিতে হইলে, এই বাঙ্গালা ভাষা দ্বারাই জনসাধারণের মন ও চিত্তের উৎকর্ষ-বিধান করিতে হইবে। অন্য কোনও ভাষার অবলম্বনে এই উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না। সুতরাং স্বদেশহিতৈষী, মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন ও পুষ্টিসাধন করা কর্ত্তব্য। এই ভাষা ও সাহিত্য যত উন্নত, মার্জ্জিত ও পবিত্র হইবে, সাধারণ ব্যক্তিবর্গও ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুই চারিটি ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজের কখনও উন্নতি হয় না। সমাজের যাঁহারা অস্থি মজ্জা ও প্রাণ স্বরূপ, সেই জনসাধারণের উন্নতিসমষ্টিতেই জাতীয় উন্নতি অবধারিত হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা এই পবিত্র মাতৃভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কোনও চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের পাঠ্য করিয়া দিয়া এদেশের মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন এবং চিরকাল বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে যে সকল মহাত্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, সহস্র দোষ থাকিলেও কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী সাধারণ আজিও তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিয়া থাকে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস বাঙ্গালী নরনারী

মাত্রেরই সুপরিচিত ও পূজ্য। ইঁহারাই বাঙ্গালী জাতির নীতিপরায়ণতা ও ধর্ম্মানুরাগ এখনও অটল রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহারা বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালা ভাষায় যদি রামায়ণ ও মহাভারত না লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আজ যে বাঙ্গালীর কিরূপ অবস্থা ঘটিত, তাহা বলা যায় না। ইঁহারাই প্রকৃত পক্ষে জাতীয় কবি ছিলেন এবং ইঁহাদেরই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা সার্থক হইয়াছিল। ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত মহাকাব্যদ্বয় বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে যে কি অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারি না। ধনী, জ্ঞানী ও মানী ব্যক্তি হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত—সকল ব্যক্তিই এখনও ইঁহাদের বিরচিত "অমৃত সমান" অপূর্ব্ব কথা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন এবং ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে কৃতনিশ্চয় হন। ইঁহারা জাতীয় জীবনকে যেন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে এক জীবন্ত শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া অকাল মৃত্যু বা ক্ষয় হইতে যেন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী ইঁহাদের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

ইঁহাদের তুলনায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবি ছিলেন। বিষয় নির্ব্বাচন ও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ভাবই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত মার্জ্জিত ভাষায়, রচনা পারিপাট্যে এবং সুকোমল ও সুললিত সঙ্গীত সৃষ্টিতে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণ সমষ্টিই তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল না। আমাদের বক্তব্য আরও একটু পরিস্ফুট করিয়া বলা যাউক। ভাষার পারিপাট্য ও লালিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাব পরিমার্জ্জিত এবং বিষয়ও উন্নত না হইলে, কোন গ্রন্থই সাহিত্যজগতে কখনও উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। হইলে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশেই নাতিসুন্দরী, আড়ম্বরশূন্যা, পবিত্রস্বভাবা কুলমহিলাদের অপেক্ষা বাহ্যবাক্‌চিক্যময়ী,পারিপাট্যশালিনী, কলাবতী বারবনিতাদেরই সমধিক আদর ও পূজা হইত! যাহারা এই শেষোক্তাদের দেহে সৌন্দর্য্য ও লালিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তাহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে চাই না; তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি, তাহারা আমার পূর্ব্বোক্ত কথার যাথার্থ্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

এই কথা পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের কবিতার মধ্যে উন্নত ও মার্জ্জিত ভাব আমি একেবারে কোথাও দেখিতে পাই নাই। ইঁহাদের কবিতার মধ্যে যেরূপ নিকৃষ্ট, তদ্রূপ উন্নত ভাবও আছে। কিন্তু অনেকেরই রচনায় ভাল ভাব অপেক্ষা মন্দ ভাবেরই প্রাধান্য সমধিক। ইহা যে একমাত্র তাঁহাদের বিকৃত রুচিরই দোষ, তাহা নহে। দোষ অনেকটা সেই যুগের—যে যুগে তাঁহারা প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই কারণে কৃত্তিবাস এবং কাশীদাসও এই যুগদোষ হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত হইতে সমর্থ হন নাই। বিষয় নির্ব্বাচন করিতে ক্ষম না হইলে, ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের তুলনায় বাঙ্গলা সাহিত্যজগতে অনেক নিম্নস্থান অধিকার করিতেন, সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এই কবিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্গভাষাকে মার্জ্জিত ও সম্পদশালিনী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যও ইঁহাদের অনেকেরই রচনাগুণে সাহিত্যপদবীতে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছে। এই কারণে বাঙ্গালী ইঁহাদের নিকটেও চিরকাল ঋণী থাকিবে। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঋণী থাকিবে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের নিকটে—যাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনে ও ধর্ম্মভাব সংরক্ষণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

জাতীয় জীবন সংগঠন ও জাতীয় জীবনকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করাই জাতীয় সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্য্য। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের তৎকালীন তাদৃশী আকর্ষণী শক্তির অভাবই তাহার প্রধান কারণ ছিল। বাঙ্গালা-সাহিত্য বলিয়া তখন কোনও একটা জিনিষ ছিল না। যুবকদের হৃদয়ে তখন যে অভিনব আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ অভিলাষ জাগরিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষার কোনও পুস্তকপাঠে তাহা চরিতার্থ হইত না। ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য আর স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইত না। সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে যে বর্ব্বরের ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে বর্ব্বরের সাহিত্য বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? কালক্রমে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায় সেই আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎ

পরিমাণে চরিতার্থ করিবার উপক্রম হইল। যুবকেরাও বাঙ্গালা ভাষার যৎসামান্য আদর করিতে লাগিলেন। ক্রমে উচ্চ বিষয় উচ্চ ভাব ও মার্জ্জিত রুচি লইয়া বঙ্গদেশে কবিসকলও প্রাচুর্ভূত হইতে লাগিলেন। বাঙ্গালী যুবকেরাও মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি নবীন কবিগণের গদ্য পদ্য কাব্যাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে মিল্টন, সেক্ষপীয়র, ওয়ার্ডস্বার্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালী যুবকেরা যে বাঙ্গালী কবিদেরও কাব্যাদি পাঠ করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিরই পরিচয় সন্দেহ নাই। রজনীকান্তের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, চন্দ্রনাথের সমালোচনা, রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শিনী রচনা, কালীপ্রসন্নের জ্বালাময়ী উক্তি ও ভূদেবের প্রগাঢ় চিন্তাশীল বিবৃতি, আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকের আদরের বস্তু। এই সমস্ত গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী আপনার জীবনে এক অভিনব পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছে।

জাতীয় সাহিত্যেই জাতীয় ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালীর সহিত সে কালের বাঙ্গালীর যেরূপ সাদৃশ্য, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেরও তদ্রূপ সাদৃশ্য। দুইটীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে স্থাপন করিলে উভয়ের মধ্যে বংশগত সাদৃশ্যও যেন লক্ষিত হয় না। ইংরেজের শাসনকালে বাঙ্গালী চরিত্রের বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তন মন্দের দিকেও যেরূপ হইয়াছে, ভালর দিকেও তদ্রূপ হইয়াছে। কিন্তু মন্দ অপেক্ষা ভালর দিকেই পরিবর্ত্তনের পরিমাণ সমধিক। পাশ্চাত্য শিক্ষাগুণে বাঙ্গালীর বিশ্বাস, চিন্তা, রুচি, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, আশা, আমোদ, প্রমোদ, পোষাক, পরিচ্ছদ, কার্য্য, চেষ্টা,—সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তনের ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও যে এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? অনেকে এই কারণে আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্যকে বিজাতীয় ভাবপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাহাকে জাতীয় সাহিত্য নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন। কোন্ বিষয়টি জাতীয় ও কোন্‌টি বিজাতীয়, তৎসম্বন্ধে একটী সন্তোষকর মীমাংসায় উপনীত হওয়া সুকঠিন। যাহা প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই যদি জাতীয় বলা যায়, তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য জাতীয় সাহিত্য নহে। কিন্তু কোনও যুগবিশেষে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ যাহাতে

আনন্দ লাভ করে, তাহাকেই যদি জাতীয় নামে অভিহিত করেন, তাহা হইলে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে জাতীয় সাহিত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালীর যেরূপ জাতীয় সাহিত্য ছিল, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যও আধুনিক বাঙ্গালীর তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য। যাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাব এখনও সমধিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, অবশ্য তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা ভারতচন্দ্রের কবিতায়, কবির লড়াইয়ে, পাঁচালী গানে, বিকট রসিকতায়, ও এতাদৃশ ব্যাপারে যে প্রবৃত্তি দেখাইবেন, বঙ্কিমের উপন্যাস পঠে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা রসাস্বাদনে কিম্বা ভূদেবের সামাজিক তত্ত্ববিচারে তাদৃশ প্রবৃত্তি ও আগ্রহ দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহাদের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, তদনুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন। ঠিক্ এই সমস্ত কারণেই, আধুনিক বঙ্গীয় যুবকেরাও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বীতস্পৃহ এবং আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেরই একান্ত পক্ষপাতী এবং ইহাকেই তাঁহাদের একমাত্র জাতীয় সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেই তাঁহারা তাঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও চেষ্টার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখিয়া থাকেন। সুতরাং আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যকেই জাতীয় সাহিত্য বলা তাঁহাদের পক্ষে কিছু বিচিত্র ও অসঙ্গত নহে। সত্য বটে, বর্ত্তমান কালে "শিক্ষিত" ব্যক্তিগণের সংখ্যা জনসাধারণের তুলনায় সামান্য মাত্র। কিন্তু যখন আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবাদি স্তরপরম্পরা ভেদ করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তরেও উপনীত হইতেছে, তখন আশা করা যায়, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য অনতিবিলম্বে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হইবে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ স্থানীয়। অন্ততঃ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শেই অনেকটা গঠিত হইতেছে। বঙ্গদেশে, তথা সমগ্র ভারতবর্ষে, আজকাল পাশ্চাত্য সাহিত্যের যেরূপ প্রতিপত্তি ও প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এইরূপ হওয়া অনিবার্য্য। এই কারণে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিক গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বাঙ্গালা নভেল, কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ—অধিকাংশই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছায়া ও উচ্ছিষ্ট মাত্র। ইংরেজী সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য অপেক্ষা যে

বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় বাঙ্গালা সাহিত্য এখনও শৈশবকাল অতিক্রম করে নাই। শিশু চলিতে শিখিবার পূর্ব্বে যেরূপ তদপেক্ষা কোনও অধিকতর বলবান্ ব্যক্তির অঙ্গুলির সাহায্য গ্রহণ করে, বঙ্গসাহিত্যও স্বপদে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তদ্রূপ সম্পত্তিশালী ইংরেজী সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সে যেন অবলম্বন ব্যতিরেকেও দণ্ডায়মান হইয়া এখন ইতস্ততঃ চলিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্য এখনও শিশু। যৌবনের স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ ও তেজ এখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা দেয় নাই। কিন্তু যৌবন যে অদূরবর্ত্তী, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। আর কিয়দ্দিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ভূরি ভূরি মৌলিক গ্রন্থের আবির্ভাব হইবে, এ আশা সুদূরপরাহত নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিও আধুনিক বাঙ্গালা লেখকগণের সবিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য হইতেই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচুর পুষ্টি সঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য এতদুভয় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি হইবে। সমাজে যে বিশুদ্ধ রীতি ও উন্নত নীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, বাঙ্গালী লেখকগণ মহাভাবে প্রণোদিত হইয়া, জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্যই লেখনী ধারণ করিবেন। অন্য কোনও উদ্দেশে যিনি লেখনী ধারণ করিবেন, তাঁহার লেখনীতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অভিসম্পাত পতিত হইবে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

আসাম ভ্রমণ।

এবার আসাম-ভ্রমণে আসিয়াছি। অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল একবার প্রকৃতির কাম্যকানন আসাম দেশ দেখিব। এবার সে আশা সফল হইতে বসিয়াছে। আজ আসামের মধ্যে ধুবড়ীতে বসিয়া 'দাসী'র পাঠক পাঠিকাগণের নিকটে এই পথের একটা হিসাব দিতেছি। আসাম-ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক বিবরণী অনেক সংবাদ পত্রে বাহির হইয়াছে, দুই চারিখানি পুস্তকও

দেখিয়াছি, এখনও আমার সম্মুখে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের 'প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি' নামে পুস্তকখানি রহিয়াছে। আমি এই স্থানেই বলিয়া রাখি, আসামের ইতিবৃত্ত, সমাজনীতি প্রভৃতি আলোচনা করিবার শক্তি সামর্থ্য আমার নাই। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতির শোভা, আর যে যে ব্যাপার জোর করিয়া আমার দুর্ব্বল মস্তকে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা ব্যতীত আর কিছু বড় একটা আমি অনুসন্ধান করি নাই; সে কালেও করি নাই, এখন ত মোটেই না।

কাজ কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলে দুই বেলা ষোড়শ উপচারে আহার, কুম্ভকর্ণের সঙ্গে আড়ি দিয়া দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় নিদ্রা এবং অবশিষ্ট সময় তাস দাবা বা ততোধিক প্রিয়তর পরনিন্দা পরচর্চ্চা ব্যাপার গুলি মন্দ নহে, তবে আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আহার নিদ্রায় নিতান্ত পৃষ্ঠপদ না হইলেও আর গুলিতে তেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না। তাই অবকাশ সময়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা আমার পক্ষে ক্লেশকর, বেড়াইতে বেড়াইতে এমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে এখন আর বড় ভাবনা চিন্তা হয় না।

এবার তাই আসামের দিকে আসিয়াছি। দারজিলিং মেলট্রেনে দামুকদিয়া ঘাটে যখন পৌছিলাম, তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছে; তাড়াতাড়ি আসিয়া ষ্টীমারে চাপিয়া বসিলাম। ষ্টীমার আর ছাড়ে না। শুনিয়াছিলাম দারজিলিং মেলগাড়ী কিছুতেই বিলম্ব করে না, এখন দেখিলাম সে কথা মিথ্যা। ইংরেজ বিজ্ঞানবলে অনেক কাজ করিয়াছেন, অনেক অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, কিন্তু একটী কাজ এখনও বাকী। এই ঝড় বাতাসের সঙ্গে একটা সুবিধামত বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই হয়। আজ এই দারজিলিং মেল ষ্টীমারে দাঁড়াইয়া পদ্মা নদীর তুফান দেখিয়া এই কথাই বার বার মনে হইয়াছিল। প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছিল, চড়ার উপরের বালুকারাশি উড়িয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, আকাশে যেমন মেঘ তেমনি গর্জ্জন। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য উপরের ডেকে গেলাম। উপরের ডেকে তৃতীয়শ্রেণী আরোহিগণের আশ্রয় স্থান; স্থান যথেষ্ট আছে কিন্তু মাথার উপরে কিছুই নাই, সুধু সেই ভীষণ মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে মাথার উপরে যে ক্যান্‌ভ্যাসের আবরণ থাকে, বাতাস দেখিয়া তাহা জড়াইয়া লওয়া হইয়াছে, নতুবা ষ্টীমারে বড়ই বাতাস লাগে। সে কথা বেশ বুঝিলাম, কিন্তু এই যে একদল লোক ছেলে মেয়ে স্ত্রীলোক বাক্স গাঁটুর

লইয়া এখানে বসিয়া আছে, বৃষ্টি আসিলে তাদের কি উপায় হইবে? ধনীর ভাবনা ভাবিবার লোক যথেষ্ট আছে, দরিদ্রের ভাবনা কে ভাবে? আমি সেই ভীতিবিহ্বল জনকোলাহলের মধ্যে মিশিয়া গেলাম। ডেকের উপর অতি কষ্টে এদিক ওদিক করিতেছি, দেখি একটী স্ত্রীলোক একটী ছোট মেয়ে লইয়া ডেকের একপার্শ্বে বসিয়া আছে, আর যখন বড়ই বাতাস জোরে আসিতেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বালুকাকণা সকল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তখন স্ত্রীলোকটী মেয়েকে কোলের দিকে টানিতেছে, আর "মা দুর্গা রক্ষা করো" বলিতেছে। ভাবে বুঝিলাম তাহাদের সঙ্গে পুরুষ নাই; এই রাত্রের গাড়ীতে একাকিনী স্ত্রীলোক, সঙ্গে ৭।৮ বৎসর বয়সের একটী মেয়ে, তার পর আবার একটী মাঝারী রকমের জিনিস পত্রের মোট। তাহারা কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করায়, স্ত্রীলোকটী বলিল, তাহারা "হিলী" ষ্টেসনে নামিবে, সেখানেই বাড়ী, এদিকে কোন গ্রামে মেয়েকে দেখিতে গিয়াছিল, সঙ্গে পুরুষ নাই। ষ্টীমার তখনও ছাড়ে নাই, কিছুতেই কলের জাহাজ বাতাসের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ষ্টীমার ধীরে ধীরে অতি কষ্টে পার হইল। আমি সেই অনাবৃত ডেকে বাতাসের মধ্যে স্ত্রীলোকটীর কাছেই বসিয়া থাকিলাম; সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন, তিনিও হিলী যাইবেন। স্ত্রীলোকটীকে তাঁহার হস্তে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

সারা ঘাট ষ্টেসনে ষ্টীমার পৌছিবার একটু পূর্ব্বেই আমি নীচে নামিয়া আসিলাম; দেখি, মধ্যশ্রেণীর আরোহী স্ত্রী পুরুষে একেবারে স্থানটী বোঝাই। যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে "রঙ্গপুর যাইব।" রেলওয়ে কোম্পানী যাতায়াতের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহারা প্রত্যহই একটী কথা ভুলিয়া যায়। মানুষের যে প্রাণ আছে, তাহাদের যে নিদ্রাকর্ষণ হয়, এবং তাহারা যে ৫।৭ ঘণ্টা ক্রমাগত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, এ কথা রেলকর্ম্মচারী মহাশয়েরা সর্ব্বদাই বিস্মৃত হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান।

রঙ্গপুর যাত্রীর বাড়াবাড়ি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, আজ সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়াই যাইতে হইবে। এ সময়ে আত্মরক্ষার পথ দেখিতে হইল। ষ্টীমার লাগিতে না লাগিতেই আমি তীরে উত্তীর্ণ হইলাম, এবং সর্ব্ব প্রথমেই মধ্য শ্রেণীর একটা hanging bed দখল করিয়া শুইয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য

hanging bed এ বসিবার যো নাই, কষ্টে স্বষ্টে শুইয়া থাকা যায়। সেই থানে শুইয়া শুইয়া যাত্রিগণের কষ্ট দেখিতে লাগিলাম। আমি রঙ্গপুরে যাইব, ধুবড়ী মেলে আমাকে যাইতে হইবে। দেখিলাম দুইখানি মধ্যশ্রেণীর গাড়ী দিয়াছে; তার আধখানি মেয়েদের গাড়ী, আর একটী গাড়ীর আধখানি রিজার্ভ; সবে রহিল একখানি গাড়ী, তাহাতেই এতগুলি লোক। গাড়ীতে স্থান হয় না। আমাদের গাড়ীতে একটী বাঙ্গালী সাহেব উঠিয়া বসিলেন, তাঁর জিনিস পত্রে গাড়ী বোঝাই হইয়া গেল। একটী ভদ্রলোক আর উঠিবার স্থান পান না; বাঙ্গালী সাহেবকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তিনি যে সেই জোরে হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কিছুতেই ছাড়িবেন না। ভদ্রলোকটীর ব্যবহার দেখিয়া বড়ই রাগ হইল; আমার সেই শয়ন কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া অতি কষ্টে দ্বারের নিকট আসিলাম। বাঙ্গালী সাহেবটী এমনই রুক্ষস্বরে "কি চাই" বলিয়া উঠিলেন যে সে কথা ভাষায় বলিবার যো নাই; আমি ধীরেই বলিলাম, "একবার দোরটী খুলিব।" বাবুটী সেই স্বরেই বলিলেন, "এখন খুলিবার যো নাই।" "আছে না আছে আমি বুঝিব" এই কথা বলিয়া তাঁহার পার্শ্ব হইতে হাত দিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়াই "আসুন দেখি মহাশয় ভিতরে" বলিয়াই তাঁহার ছোট ব্যাগটী লইলাম। বাবু সাহেব "what's that, what's that, no room, no room" বলিয়া ইংরাজী ঝাড়িতে লাগিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটীকে আমার সেই hanging bed এ উঠিয়া শুইতে বলিলাম। ভদ্রলোকটী আমার কি দশা হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন বলিলাম, এ সাহেব বাবুটীরও যে দশা, আমারও তাই, সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া রহিব। নীচের বেঞ্চে যে কয়েকজন আরোহী ছিলেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বসিবার একটু স্থান করিয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িল, বাঙ্গালী বাবু তখন বসিবার জন্য স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কেহই নড়ে না। তখন বেচারী, একটু নরম হইয়া বলিলেন, "আমার কি একটু স্থান হইবে না?" তখন আমার রহস্য করিবার প্রবৃত্তিটা একটু বেশী মাত্রায় উত্তেজিত হইয়াছিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "yes, come to-morrow." বেচারী আর কথাটী কহিল না, নাটোর ষ্টেসনে নামিয়া একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চলিয়া গেল; বেচারীর জন্য আমাদের কাহারও মনে একটুও কষ্ট হইল না। বলা বাহুল্য, সমস্ত রাত্রি যোগাসনে কাটিয়া গেল।

রেলগাড়ীতে একটী রোগের কিছু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটী গান গাহিবার ইচ্ছা; যার তৃতীয় পুরুষের মধ্যে কেহ কখন সঙ্গীত-বিদ্যার ত্রিসীমাও স্পর্শ করে নাই, সেও গাড়ীতে বসিয়া একবার নিজের গলাটা শানাইয়া লইবে। আর গানেরইবা তাল মান সুর কেমন সুন্দর; তার পর আজ কাল থিয়েটারের দৌরাত্ম্যে সুরুচিসঙ্গত গানের অভাব নাই; এখন দুই একজন বকেয়া গাঁজাখোর ব্যতীত 'তারা ব্রহ্মময়ী মা' বলিয়া আর কেহ বড় গান ধরে না। এখন পথে ঘাটে থিয়েটারের গান। গাড়ীর মধ্যেও থিয়েটারের গান চলিতে লাগিল; কেহবা মানভঞ্জন আরম্ভ করিলেন; কেহবা 'ফাটকে আটক রব না' জুড়িয়া দিলেন; একজন টেরীকাটা বাবু চাঁদের সঙ্গে দুইটা মনের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, চাঁদ বেচারী রেলের সঙ্গে কতদূর দৌড়িয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু বাবুটী গানটী ভাল করিয়া জমাইতে না পারিয়া অর্দ্ধ পথেই থামিয়া গেলেন। এ সব দৌরাত্ম্য রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্তই হইয়া থাকে, তাহার পরে আর কাহারও বড় সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।

যথা সময়ে রঙ্গপুরে গাড়ী থামিল, আমিও দুই এক দিনের জন্য নিস্তার পাইলাম। দুই দিন বিশ্রাম করিয়া আবার যাত্রা।

রঙ্গপুর হইতে ধুবড়ী পর্য্যন্ত একখানি মধ্যশ্রেণীর টিকিট লইয়া গাড়ীতে বসিলাম। কোন দিন এ পথে আসি নাই, ভাবিলাম সমস্ত পথ এই প্রকার মধ্যশ্রেণীতে বেশ আরামে বসিয়া যাইব; তাহা হইল না। রঙ্গপুরের পরের ষ্টেসনের নাম কাউনিয়া। সেখানেই গাড়ী হইতে নামিলাম; ষ্টীমারে পার হইতে হইবে। একখানি দোতালা ষ্টীমার দাঁড়াইয়া আছে, উপরে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী, নীচে আর সব। মধ্যশ্রেণীর জন্য কোনই বন্দোবস্ত নাই। আসাম-যাত্রী অনেকগুলি কুলী আমাদের সঙ্গে যাইতেছে। তাহারা যেদিকে ছিল, সেদিকে একটু জনতা কম দেখিয়া সেইদিকে দাঁড়াইতে যাইতেছিলাম। আড়কাঠীর সর্দ্দার সেদিকে যাইতে দিল না, কাজেই অন্যান্য সব লোক যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। শুনিলাম, আমাদের ষ্টীমারে কুচবিহারের মহারাজা যাইতেছেন। কথাটা বিশ্বাস হইল না। আমাদের দেশের মাঝারী রকমের একটা জমীদার যদি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যান, তবে তাঁর লোক জন সিপাহী বরকন্দাজ, চাকর বাকরের জ্বালায় সেদিন রেল ষ্টেসনে ভদ্রলোকের

ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যাওয়া বিপদ হয় ; আর কুচবিহারের মহারাজা যাইতেছেন, তাঁর সাড়া শব্দ নাই, সিপাহী, বরকন্দাজ নাই, পাঁচ সাত হাতের মধ্যে হৈ হৈ শব্দ নাই, এ কথা আমার মনে লাগিল না। মনে হইল যাহারা বলিতেছে, তাহারা হয় ত জানে না। তাহার পর যখন ষ্টীমার কাউনিয়ার অপর পারে লাগিল, তখন দেখিলাম, সত্যসত্যই কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর ষ্টীমার হইতে নামিলেন, সঙ্গে ২।৩টী বাবু, আর খানসামা চাকর হয় ত চার পাঁচ জন ; ষ্টীমার হইতে নামিয়া উপরে উঠিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার তখনই বাহিরে আসিলেন। ষ্টেসনে দুইখানি গাড়ী প্রস্তুত থাকে, একখানি কুচবিহার অভিমুখে যাইবে, অপরখানি কুড়িগ্রামে যাইবে। আমরা কুড়িগ্রামের গাড়ীতে উঠিলাম। মহারাজা গাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া একটী বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন; তাঁহার ভাব গতিকে রাজার মত কিছুই দেখিলাম না, সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা বলিতেছেন, ষ্টেসন মাষ্টারেরা পর্য্যন্তও তাঁর সঙ্গে নির্ভয়ে আলাপ করিতেছে। আমার তখন ইচ্ছা হইল, দেশের ছোট বড় রাজা জমীদারকে ডাকিয়া আনিয়া এই দৃশ্য দেখাই। তাহার পরে দেখিলাম, যে বাবুটীর সঙ্গে মহারাজা কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাকে লইয়া পশ্চাৎ দিকের কয়েকখানি মাথাখোলা ইট-বোঝাই গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া কতক বাঙ্গালায় কতক ইংরাজীতে কি বলিতে লাগিলেন। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়াছে ; নিজের গাড়ীর দিকে না গিয়া সেই ইটের গাড়ীতেই উঠিয়া বসিলেন ; আপন হাতেই কয়েকখানি ইট সমান করিয়া লইয়া তাহার উপর রাজার মত বসিয়া গেলেন, মাথার উপরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। ষ্টেসন সুদ্ধ লোক অবাক্ ; গার্ড আসিয়া গাড়ী ছাড়িবার অনুমতি প্রার্থনা করিল ; সে বেচারী নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিল, মহারাজা সত্যসত্যই ইটের গাড়ীতে বসিয়া যাইবেন না ; কিন্তু তার অনুমান বৃথা হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল ; কুচবিহার রাজ্যের অধীশ্বর চলিয়া গেলেন।

তাহার একটু পরেই আমাদের গাড়ী ছাড়িল। আজ এইখানেই বিশ্রাম।

ধুবড়ী। শ্রীজলধর সেন।

বাদ প্রতিবাদ।

হরিদাস ঠাকুর—প্রতিবাদের উত্তর।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যবনকুলপাবন হরিদাস ঠাকুর, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যবনকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় কি প্রমাণে ইহা অবগত হইয়াছেন, মার্চ্চ মাসের "দাসী"তে আমরা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বিগত এপ্রিল মাসের "দাসী"তে অচ্যুত বাবু এই জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপ একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই উত্তর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে লিখিত হইল।

১। হরিদাস যে যবনকুলে জন্মিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমরা চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। কোন প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার বিরোধী প্রমাণ আছে কি না, আমরা ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু অচ্যুত বাবু "চৈতন্য সঙ্গীতা" নামক একখানি বাঙ্গালা পয়ার গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া উপরিউক্ত সর্ব্বজনমান্য বৈষ্ণবগ্রন্থদ্বয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীচৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বৈষ্ণবভক্তগণ ভক্তিতে বিগলিত হইয়া ঘটনা ও কল্পনার সহযোগে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি করিতেছেন। এই সমস্তকেই প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অবধারণ করিলে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের আর কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকে না। ঘটনার সমসাময়িক লোকের লিখিত বিবরণেও নানাপ্রকার সংস্কার ও বিশ্বাসমূলক কল্পনা এবং জনশ্রুতি মিশ্রিত হইয়া যায়। পরবর্ত্তী কালের রচনার তো কথাই নাই। পরবর্ত্তী সময়ে এই গুলিই ঐতিহাসিক প্রমাণ স্থলে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই কারণ বিরোধস্থলে পরবর্ত্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকেই সাধারণতঃ প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিতে হয়। "চৈতন্য সঙ্গীতা" গ্রন্থকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, এই গ্রন্থ কত দিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে—কি অবস্থায় রচিত হইয়াছে—কাহাকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, এই সকল কথার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অচ্যুত বাবু তাহার কিছুই করেন নাই। কেবল বর্ণনার ক্রমের উল্লেখ করিয়া, "এই ক্রমানুসারে চৈতন্য সঙ্গীতা গ্রন্থে বহুতর অভিনব কাহিনী* বর্ণিত আছে", বলিলেই ইহা প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে প্রতিপাদিত

* এই গ্রন্থে দুই একটী অভিনব অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা দেখিয়াই অচ্যুত বাবু মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এই "অভিনবত্ব"ই এই গ্রন্থের অপ্রামাণিকতার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কিছুদিন হইল রয়াল ১২ পেজী ৪৮ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকার আকারে বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম "শ্রীল শ্রীযুক্ত ভগীরথ বন্ধু"। ইনি গ্রন্থের নানাস্থানে আপনাকে "শঙ্খকার" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, গ্রন্থকার "শাঁখারি"-জাতীয় ছিলেন। গ্রন্থখানি কতদিন হইল রচিত হইয়াছে, গ্রন্থের কোন স্থানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটী অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনামূলক কথা আছে। পাছে কেহ এই গল্পগুলি অবিশ্বাস করে, তজ্জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"শিবের বচন এই তন্ত্রের প্রচার। চৈতন্যসঙ্গীতা কহে দীন শঙ্খকার ॥"

গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "পার্ব্বতীরে সদাশিব গোপনেতে কন। শ্রীচৈতন্যের মহিমাদি নাম সংকীর্ত্তন ॥" এই গোপনীয় বৃত্তান্ত কোনও উপায়ে অবগত হইয়াই বোধ হয় "বন্ধু" মহাশয় এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। "বন্ধু" মহাশয় পুনশ্চ বলিতেছেন, যদিও "বহু গ্রন্থে প্রকাশিত মহিমা সকল। চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্য মঙ্গল ॥" তথাপি তিনি অতি অজ্ঞান ও দীন হীন হইয়াও "ভাষামত কিঞ্চিৎ বর্ণনা" করিলেন। কিন্তু এই

হইতে পারে না। বিশেষতঃ চৈতন্য সঙ্গীতার লিখিত বিবরণ মহাপ্রভুর অপ্রকটের অনেককাল পরে রচিত চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের বিরোধী। আমরা লিখিয়াছিলাম, বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থকে অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নয়। দেখিলাম, চৈতন্যভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থের বিরুদ্ধে অচ্যুত বাবু কোন "বিশেষ প্রমাণ" উপস্থিত করিতে পারেন নাই। "বিশেষ প্রমাণ" তো দূরের কথা, চৈতন্যসঙ্গীতার ন্যায় কোন গ্রন্থ ঐতিহাসিক বিতর্কস্থলে কোনওরূপ প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত শ্লোকমাত্রই যেমন অভ্রান্ত ঋষি-বাক্য নয়, পয়ারাদিচ্ছন্দে লিখিত চৈতন্য বা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থমাত্রই সেই প্রকার প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থ নয়। এ কথা বিজ্ঞব্যক্তিকে আর অধিক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না।

২। আমরা চৈতন্যভাগবত হইতে "জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে॥ ইত্যাদি" যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, অচ্যুত বাবু তাহার কোন

"কিঞ্চিৎ বর্ণনার" মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়জনক দুই চারিটী কথা না থাকিলে চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের ন্যায় ইহার প্রাধান্য ও প্রামাণ্য হয় না, এই নিমিত্ত বোধ হয় হরিদাসের জন্মবিবরণ ও শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে দুই চারিটী "অভিনব কাহিনী" লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে হরিদাসের "ব্রহ্ম হরিদাস" নাম কেন হইল, তাহার এইরূপ কারণ উল্লিখিত হইয়াছে,—"নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিলা পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস॥" কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বত্র এ সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম কিনা, ইহা পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই কারণ ব্রহ্মাকে যবনকুলে হরিদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ বিশ্বাস নিবন্ধন বৈষ্ণবগণ হরিদাসকে "ব্রহ্ম হরিদাস" বলিয়া থাকেন। "চৈতন্য সঙ্গীতা"য় এই প্রবাদটী এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া লিখিত হইয়াছে,—"একদিন পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিতেছেন,—"ব্রহ্ম হরিদাসের কি পাপ। যবনে পালিল তারে, নানাস্থানে বেত্র মারে, কেন পায় এত মনস্তাপ॥" মহাদেব উপরিউক্ত গোবৎস হরণের বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "গোহরণ পাপে ব্রহ্মা হইল যবন। বেত্রাঘাতে হৈল তার পাপ বিমোচন॥ অতএব সেই ব্রহ্মা কলিতে যবন। ব্রহ্ম হরিদাস নাম তাহির কারণ॥" গ্রন্থকার ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—"নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিলা পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস॥" বৈষ্ণব সমাজের প্রসিদ্ধ প্রবাদটীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে গিয়াই "বন্ধু" মহাশয় আপনার কথা আপনি খণ্ডন করিয়াছেন। ফলতঃ প্রথমাবস্থায় হরিদাসকে কেহই "ব্রহ্ম হরিদাস" বলিতেন না, বহুদিন পরে উপরি কথিত প্রবাদের সৃষ্টি হয়। "চৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

"মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়। হরিদাস স্মরণে সকল পাপ ক্ষয়॥ কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস। কেহ বলে প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥ সর্ব্ব মতে মহা ভাগবত হরিদাস। চৈতন্য গোসাঞির সঙ্গে যাহার বিলাস॥" বোধ হয় এই মূল অবলম্বনে উক্ত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। পরে ক্রমশঃ বৈষ্ণব সমাজের অবনতি সঙ্ঘটিত হইলে কতকগুলি লোকের মধ্যে জাত্যভিমান আবার প্রবল হয়। হরিদাস মুসলমান ছিলেন, একথাটি তাঁহাদের অসহ্য হওয়ায় হরিদাসের মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হওয়ার কথা পরিকল্পিত হয়। তৎপরে তাহাই পল্লবিত হইয়া আলোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকায় নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাই অনেকের মতে সৎসিদ্ধান্ত। যাহা হউক, "চৈতন্য সঙ্গীতার" ন্যায় কোন গ্রন্থ অবলম্বনে ঐতিহাসিক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়াটা নিতান্তই হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় সম্প্রতি আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, এই "চৈতন্য সংগীতা গ্রন্থখানি অতি আধুনিক, এবং সাহজিক সম্প্রদায়ের রচিত; সুতরাং ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।"

সমীচীন উত্তর দেন নাই। কেবল একস্থানে এইমাত্র বলিয়াছেন, "যে দুই এক স্থানে হরিদাসকে যবন বা নীচ বলা হইয়াছে, তাহা ভজন ও বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ। তাহার মূল্য অধিক নহে।" হরিদাসকে মুসলমানেরা নিদারুণরূপে প্রহার করিয়াছিল, তাহাও কি ভজন-মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ? চৈতন্যভাগবতের "জাতিকুল নিরর্থক" ইত্যাদি বাক্য গ্রন্থকারের উক্তি নয়। ফুলিয়া গ্রামে একদা "ডঙ্কের" নৃত্য * হইতেছিল, নাগরাজ অনন্ত নৃত্যকারী "ডঙ্কের" দেহে আবির্ভূত হইয়া নৃত্য গীত করিতেন, সুতরাং নৃত্যকালে ডঙ্কের বাক্য অভ্রান্ত দেববাণী, সকলে এই প্রকার বিশ্বাস করিত। উপরিউক্ত "জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর-আজ্ঞাতে॥" ইত্যাদি বাক্য হরিদাস সম্বন্ধে ডঙ্ক মুখে বিবৃত হইয়াছিল। ইহা মানবোক্তি নহে—দেববাণী; নাগরাজ ডঙ্কের শরীরে অবতীর্ণ হইয়া এই সকল কথা বলিয়াছেন, তৎকালে সকলে এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। "প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য কপি হনুমান। এইমত হরিদাস নীচ জাতি নাম॥" এই দৃষ্টান্ত দ্বারা "ডঙ্ক" হরিদাসকে স্পষ্টতঃ যবনবংশোৎপন্ন বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হওয়ায় ইহাকে অর্থবাদ বলা যায় না। হরিদাসও এইকালে উপস্থিত ছিলেন। ফলতঃ হরিদাস যে মুসলমানকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এই "ডঙ্ক-বাক্য" একটী অকাট্য প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে। ইহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ, এবং তৎকালে দেববাণী বলিয়া গৃহীত। কষ্ট কল্পনা করিয়া ইহার ভিন্নরূপ অর্থ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। অচ্যুতবাবু এই প্রমাণটী খণ্ডন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

৩। আমাদের আর একটী যুক্তি—হরিদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার মুসলমান ধর্ম্মে আনিবার জন্য মুসলমানেরা অত্যাচার করিত না। হরিদাস মুসলমানকুলে জন্মিয়া হিন্দু হইতেছেন বলিয়াই মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। মুলুকপতি হরিদাসকে স্পষ্টতঃ যবনকুলজাত বলিয়াছেন। যথা—

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।" ইত্যাদি।

অচ্যুত বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, মুলুকপতির এই স্পষ্ট কথাটাও কি "ভজন ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ" প্রশংসা বাক্য মাত্র? বস্তুতঃ কি এই কথাটার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই? অচ্যুত বাবু বলেন, "ইহার মূল্য অধিক নহে।" কি সর্ব্বনাশ! অচ্যুত বাবু যে সরল কথার কুটিল অর্থ করিতে গিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-ইতিহাসের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছেন না? এরূপ স্পষ্ট উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিলে, বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে তিনি কি প্রকারে ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করিবেন, বুঝিতে পারা যায় না। অচ্যুত বাবুর ব্যাখ্যা-নীতির অনুসরণ করিলে কেবল বৈষ্ণব-সাহিত্য কেন, কোন সাহিত্য হইতেই কিছুমাত্র ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্ভেদের সম্ভাবনা থাকে না!

৪। আমাদের আর একটী কথা—হরিদাসকে লইয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। হরিদাস ব্রাহ্মণসন্তান হইলে এই আন্দোলনের সময় এ কথা অপ্রকাশিত থাকিত না; এবং চৈতন্য-ভাগবতে এই বৃত্তান্ত অবশ্যই উল্লিখিত হইত। অচ্যুত বাবু ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন, "এতদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ও বৃন্দাবন দাস বর্ণন করেন নাই। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ মালা জপ করিতেন * * * এই বিষয়টীর উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে নাই। ইত্যাদি।" কি আশ্চর্য্য! অচ্যুত বাবু কি মনোযোগ সহকারে চৈতন্যভাগবত পাঠ করেন নাই? এই দেখুন,—

---

* তৎকালে এক জাতীয় লোক সর্ব্বাঙ্গে অহিভূষা ধারণ করিয়া নৃত্য গীত করিয়া বেড়াইত। ইহার নাম "ডঙ্কের নৃত্য"। সবিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত "শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

"তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা করি।
থাকেন নিরন্নে অহর্নিশি কৃষ্ণ-স্মরি॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ ভবন॥"

চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড।

"বারবনিতার বিবরণ" চৈতন্যভাগবতে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের উৎপীড়নের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। হরিদাসের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণের কথা, এই ঘটনার সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। এ কথা পরিজ্ঞাত থাকিলে, উৎপীড়ন বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার উল্লেখ না করিলেই চলিতে পারে না। ফলতঃ ইহা উল্লেখ না করিবার কারণ এই যে, বৃন্দাবন দাস এবং সাময়িক হিন্দু মুসলমান সকলেই হরিদাসকে মুসলমান-সন্তান বলিয়াই জানিতেন, চৈতন্যসঙ্গীতা গ্রন্থের "অভিনব কাহিনী" তখন প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্যই বৃন্দাবন দাস নানাস্থানে হরিদাসকে মুসলমানকুলতিলক বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন।

৫। বিচারের সময় হরিদাস মুলুক পতিকে বলিয়াছিলেন, "শুন বাপ সভারই একই ঈশ্বর ; ইত্যাদি।" হরিদাস ইহাতে আপনাকে মুসলমান বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন।

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি কর্ম্ম॥"

ইত্যাদি পয়ারের সরল অর্থ এই যে, কোন ব্রাহ্মণ স্ব-ইচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হিন্দুরা তাহাকে কি অত্যাচার করে? হরিদাসের এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, আমিও ঐরূপ আপন ইচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা, 'লওয়াইয়া আছে চিত্তে করি আমি তেন।") আমাকে কেন শাস্তি দাও। কিন্তু অচ্যুত বাবু এই সরল পয়ারের অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া কিরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সহৃদয় পাঠকগণ একবার দেখুন। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, "অঘোর বাবু বলেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ হইলে কাজিকে [কাজিকে নয়, মুলুকপতিকে। অচ্যুত বাবু অনেক স্থলেই ভ্রমবশতঃ মুলুকপতির পরিবর্ত্তে "কাজি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।] উত্তর দিতেন, হরিনাম করাই তাহার কুলধর্ম্ম। * * লেখার ভঙ্গীতে কি তাহাই বুঝাইতেছে না? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ধৃত পয়ারে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ থাকায় তাহাই নির্দ্দেশিত হইতেছে।" অচ্যুত বাবুর এই কয়টী কথার অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, "ব্রাহ্মণ" শব্দে হরিদাস নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও মুসলমান হইয়াছিলেন, এই কথাই বলিয়াছেন। হরিদাস দৃষ্টান্ত স্বরূপে একথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা দৃষ্টান্ত বাক্য, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু অচ্যুত বাবু বলেন, তাঁহার ব্যাখ্যা "বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত"। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নয়, অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বটে! অচ্যুত বাবুর মতে হরিদাস ৬ মাস বয়সের সময় মুসলমান গৃহে নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিত আপন ইচ্ছায় মুসলমান হন নাই যে "ব্রাহ্মণ" শব্দে তাঁহাকেই বুঝাইবে?

৬। হরিদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, "একথা ভাবিবার কয়েকটী সূক্ষ্ম হেতু" অচ্যুত বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার লিখন ভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, এই "সূক্ষ্মহেতু" গুলি যেন কেবল তর্কের খাতিরে উপস্থিত করা হইয়াছে। যাহাহউক আমরা এই হেতুগুলির উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি।

(ক) "হরিদাস মূলে যবন ছিলেন না বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ সেই হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের কালেই হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতে ভয় করিতেন না।" ইহার উত্তরে বলা যায়, একজন

মুসলমান-সন্তান একান্ত হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া দিবারাত্র হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রমুখ হিন্দুগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন। অনেক ফকির দরবেশকেও হিন্দুগণ ভক্তি করিয়া থাকেন। আর সংস্পর্শে আসিবার অর্থ কি? হরিদাসের সঙ্গে এই সকল ব্রাহ্মণেরা কি আহার ব্যবহার করিতেন? হরিদাসকে সকলেই সাধুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, ইহা ত হিন্দুজাতির স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি। সাধু যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, হিন্দুগণ তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকেন। পরিয়াবংশোদ্ভব "বল্লুবর," 'জোলা'-কুলোৎপন্ন "কবিরজী", কশাইজাতীয় "সধনা" প্রভৃতি অনেকেই হিন্দুদিগের নিকট সম্মান ও ভক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান হরিদাসের অপূর্ব্ব ভক্তিনিষ্ঠা এবং অলৌকিক প্রেম-চেষ্টা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শন করিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে।

(খ) "অদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে 'শ্রাদ্ধপাত্র' ভোজন করাইয়াছিলেন। * * সমাজের সাধারণ লোক আর ভক্তির অনুরোধে কিছু সামাজিকতা ত্যাগ করে না ; ইত্যাদি।" সাধারণ লোকে সামাজিকতা কেন ত্যাগ করিবে? অদ্বৈত আচার্য্যকে অচ্যুত বাবু কি 'সাধারণ লোক" মনে করেন? অদ্বৈতই বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের মূল। তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ লোক, এবং তাঁহার এই "সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্যের—এ অসম-সাহসের মূলে" কেবল অসাধারণ হরিভক্তিপরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, হরিদাস "হিন্দুসমাজে এক প্রকার পরিগৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়া "শ্রাদ্ধপাত্র" দেওয়ায় হিন্দুগণ আপত্তি করেন নাই।" হরিদাস সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, ইহাও একটী "অভিনব কাহিনী", ইহার কোনও মূল নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই হরিদাস আচার্য্যকে বলিতেছেন, তুমি কুলীনসমাজে বাস করিয়া আমাকে প্রত্যহ অন্ন দাও, তোমার কি লজ্জা ভয় নাই? যাহাতে সমাজে তোমার কোন বিপদ না ঘটে, তাহাই কর। আচার্য্য ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, আচার্য্য সমাজ-ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, কেবল ভক্তকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই যবন হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। হরিদাস সমাজে পরিগৃহীত হইলে প্রত্যহ কেবল অন্ন প্রদানের জন্যই আচার্য্যকে সমাজ-ভয় প্রদর্শন করিবেন কেন? ফলতঃ হরিদাসের হিন্দুসমাজে পরিগৃহীত হওয়ারূপ "অভিনব তত্ত্বটী" শ্রীচরিতামৃত বিরুদ্ধ, সুতরাং অচ্যুতবাবুকেই ইহার আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

আর একটী কথা—হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানরূপ সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অদ্বৈতাচার্য্যের সাহস ছিল না, এই কথার প্রমাণ স্বরূপ অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, "নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের পূর্ব্বে 'গাঁই গোত্র' উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উপবীত ধারণ করিতে" হইয়াছিল। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম হইতে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইহা দুর্ব্বলতার পরিচয় নহে। নিত্যানন্দ সমাজভীত দুর্ব্বল-চেতা ছিলেন না। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি নিজে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইয়া বারেন্দ্রবংশীয় মাধবাচার্য্যের সহিত স্বীয় দুহিতা গঙ্গাদেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হরিদাসকে ব্রাহ্মণ-কুলজাতরূপে প্রমাণ করিতে অচ্যুত বাবু এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন যে, সেজন্য সমগ্র বৈষ্ণবজগতের পরম পূজনীয় শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য ও অবধূত নিত্যানন্দকে সমাজভীতরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ইহা বৈষ্ণবতা ও প্রকৃত তথ্যের একান্ত বিরোধী।

(গ) অচ্যুত বাবুর তৃতীয় "হেতু" এই—হরিদাস "চৈতন্যের ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে" কুলীনগ্রামের সত্যরাজ ও রামানন্দ বসুকে শিষ্য করিয়াছিলেন। হরিদাস "হিন্দুসমাজে

এক প্রকার পরিগৃহীত” না হইলে খাঁটি যবনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিতে কুলীনগ্রামী সাহস করিতেন, বোধ হয় না। সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু হরিদাসের শিষ্য হইয়াছিলেন, অচ্যুত বাবু এ কথা কোথায় পাইয়াছেন ? চরিতামৃতের মূল-শাখা গণনার মধ্যে লিখিত আছে, “তার উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন। সত্যরাজ আদি তার কৃপার ভাজন॥” এই-টুকু পাঠ করিয়াই অচ্যুত বাবু সত্যরাজ ও রামানন্দকে হরিদাসের শিষ্য মনে করিয়াছেন। চরিতামৃতের এই পরিচ্ছেদের অন্যত্র আবার কুলীনগ্রামীদিগকে সাধারণ শাখার মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আদিলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে আবার রামানন্দ বসুকে নিত্যানন্দের স্কন্দ শাখার অন্তর্গতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক কুলীনগ্রামিগণ নিত্যানন্দের শিষ্য। রামানন্দ বসুর পরিবারবর্গ অদ্যাপি নিত্যানন্দ বংশীয় খড়দহের গোস্বামিগণের শিষ্য। রামানন্দ বসুর বংশধর কুলীনগ্রামবাসী আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যিনি মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অদ্যাপি শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে প্রতি বর্ষে পট্টডুরী প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রমুখাৎ আমরা কুলীনগ্রামের বসু বংশের বিশেষ বিবরণ অবগত আছি। সত্যরাজ বা রামানন্দ বসু কস্মিন্‌কালেও হরিদাসের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। সত্যরাজের পিতা এবং রামানন্দের পিতামহ, গুণরাজ খান উপাধিযুক্ত মালাধর বসু একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব ও কবি ছিলেন [ইনিই বাঙ্গালার আদিকাব্য “শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” কাব্য রচয়িতা।] এই বংশ বহুকাল হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। হরিদাস ঠাকুর, সত্যরাজ প্রভৃতির স্নেহ ও ভক্তিতে বাধ্য হইয়া কিছুদিন কুলীনগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। রামানন্দ বসু হরিদাসকে এতদূর ভক্তি করিতেন যে, সমাজ-ভয় অগ্রাহ্য করিয়া, কুলীন-গ্রামস্থ হরিদাসের আশ্রমে, দারুনির্ম্মিত হরিদাসের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হরিদাসের সঙ্গে ইহাঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এইজন্য কবিরাজ গোস্বামী ইহাঁদিগকে হরিদাসের কৃপাভাজনরূপে ও তাঁহার উপশাখার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কুলীনগ্রামে হরিদাসের যে প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত আছে, তাহার আকৃতি মুসলমান ফকিরের ন্যায়। এখানে হরিদাস মুসলমান-সন্তান বলিয়াই বিখ্যাত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন।*

(ঘ) অচ্যুতবাবুর আর একটী ‘সূক্ষ্ম হেতু’ এই,—হরিদাস গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ-গৃহেই অন্ন ভোজন করিতেন। হিন্দুসমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য “ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্নগ্রহণ করিতেন না ; ইত্যাদি।” ইহার উত্তরে বলা যায়, হরিদাস, বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করার পর, সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন। এজন্য সাত্ত্বিক আহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ—দেবদ্বিজে কোন ভেদ নাই, ব্রাহ্মণের অন্ন ভগবানের প্রসাদ—ইহা ভোজন করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়—দুজাতির জন্য সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়—এই প্রকার বিশ্বাস করিয়াই হরিদাস ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিতেন, ইহাই “সৎসিদ্ধান্ত।” হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশের চেষ্টায় হরিদাস এই কার্য্য করিতেন বলিলে তাঁহার মাহাত্ম্য নিতান্তই খর্ব্ব করা হয়।

উপসংহারে আমরা একটা কথা বলি। তর্কস্থলে যদি স্বীকারও করা যায় যে, হরিদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি ৬ মাস বয়ঃক্রম হইতে মুসলমান গৃহে প্রতি-পালিত হওয়ায় বিশিষ্টরূপেই যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ হিন্দুর চক্ষে তিনি প্রকৃতই যবন। সুতরাং কষ্ট-কল্পনা করিয়া এতদিন পরে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার কোন সার্থকতা নাই। হরিদাসকে যবন-সন্তান মনে করিয়া আমাদের ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন কারণ নাই। যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধু, সুতরাং আমাদের পূজ্য।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

* কুলীনগ্রামস্থ হরিদাস ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত “শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবন-চরিত” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রতিবাদের উত্তর।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত (হরিদাস সম্বন্ধে) আর অধিক বাদ প্রতিবাদ করিতে রুচি নাই। আমাদের অভিমত আমরা লিখিয়াছি ; যেটী সত্য, পাঠকবর্গ কর্ত্তৃক তাহাই গৃহীত হইবে। অদ্য চৈতন্যসঙ্গীতা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুটী কথা বলিতেছি।

এবারকার প্রতিবাদে অঘোর বাবু আমার লিখিত উত্তরের (দাসী ৪র্থ সং) কথাগুলি খণ্ডনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ৬ষ্ঠ ও ৭মাঙ্কিত হেতু সম্বন্ধে (রূপ সনাতন প্রসঙ্গে) কোন কথা না বলিবার কারণ কি ? আমার প্রস্তাবের মধ্যে, ৭ম হেতুটীই বিশেষ আবশ্যকীয়। সর্ব্বপ্রথম ইহারই প্রতি মনোযোগ দেওয়া অঘোর বাবুর উচিত ছিল, কিন্তু তিনি ইহার উল্লেখও এবারকার প্রতিবাদে করেন নাই। যে “অকাট্য-যুক্তি” বলে তিনি হরিদাসকে যবন-ঔরস-জাত বলেন, এ কথাগুলি তাহার অনুকূল না প্রতিকূল ?

অঘোর বাবুর এবারকার সুদীর্ঘ প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য চৈতন্যসঙ্গীতাকে অপ্রামাণ্য প্রদর্শন করা। চৈতন্যসঙ্গীতাখানিকে আধুনিক বলিয়াই তিনি অপ্রামাণ্য বলেন। (কিন্তু “পূর্ব্ব পরয়োর্মধ্যে পরবিধির্ব্বলবানিতি।—পাণিনিসূত্রম্। চৈতন্যসঙ্গীতা সম্বন্ধে খাটিতে পারে কি না জানি না। কবিরাজ গোস্বামী ব্যবহারেও ঐ বিধি দিয়াছেন।) চৈতন্য-সঙ্গীতাকার কত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, গ্রন্থখানি কেমন আধুনিক, ইহা তিনি কিছু বলেন নাই। কেবল বলিয়াছেন—এক, “অপ্রামাণ্য।” যদি বা গ্রন্থখানি আধুনিকই হয়, তথাপি চৈতন্যসঙ্গীতারও একটা মূল আছে। সে মূল একখানি তন্ত্র, যাহার কথা চৈতন্য-সঙ্গীতাকার গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন। যথাঃ—“শিবের বচন এই তন্ত্রের প্রচার।” “পাছে কেহ গল্পগুলি অবিশ্বাস করে তজ্জন্য গ্রন্থকার” মিছামিছি শিবের দোহাই দেন নাই, চৈতন্য-সঙ্গীতার মূল যথার্থই একখানি তন্ত্র। ঐ তন্ত্রের নাম “শিবগীতা।” যদি বলেন, মহাপ্রভুর বা তদ্ভক্তগণের জীবনী সম্বন্ধে তন্ত্রের কথা মানি না, তবে আমরা অনন্তসংহিতা এবং ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতা প্রভৃতির নাম করিতে পারি। এ দুখানিই তন্ত্র এবং মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তগণের কাহিনীতে পূর্ণ। অনন্ত সংহিতার শ্লোক চৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত আছে, এবং ভক্তিরত্নাকরে ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অঘোর বাবু প্রাচীন শিবগীতা তন্ত্রখানি মানিবেন কি না জানি না। কিন্তু সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ঐ তন্ত্রখানি অবলম্বন করিয়া স্বীয় অপূর্ব্ব গ্রন্থ অমিয় নিমাই-চরিত ১ম খণ্ডের ১৭৭ পৃষ্ঠায় হরিদাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

“হরিদাস ব্রাহ্মণের পুত্র, পিতৃমাতৃহীন বলিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, কাজেই হরিদাস মুসলমান। কিন্তু হরিদাস পরমসাধু হইয়া উঠিলেন।” ইত্যাদি।—অমিয় নিমাই-চরিত ১ম খণ্ড।

এবং চৈতন্যসঙ্গীতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেনঃ—“শ্রীশিবগীতা একখানি তন্ত্র, চৈতন্য-সঙ্গীতা তাহার অনুবাদ।”

আর একজন বৈষ্ণব মহাজন (কেশব-ভারতীর বংশসম্ভূত শ্রীল অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী) বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার (২য় খণ্ড) ২৭১ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ড বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৩২৩ পৃষ্ঠায় একটী সম্পাদকীয় প্রস্তাব বাহির হয়। তাহাতে হরিদাস সম্বন্ধে কি লিখা ছিল, উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“হরিদাস ব্রাহ্মণ সন্তান বটেন, কিন্তু শৈশবাবধি মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানই ছিলেন। ইহার পিতার নাম ছিল সুমতি, এবং মাতার নাম গৌরী।” ইত্যাদি।

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক বর্ত্তমান বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অগ্রণী ও নমস্য পণ্ডিত শ্রীল প্রভু

রাধিকানাথ গোস্বামী (অদ্বৈত-সন্তান) ও পণ্ডিত শ্রীল প্রভু শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি (নিত্যানন্দ-সন্তান) এবং ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট। বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে ইহাঁদের কথা কেহই অমান্য করেন না। অতএব আমার প্রবন্ধটী "অদ্ভুত ব্যাখ্যা" নহে, সৎসিদ্ধান্তই বটে।

প্রতিবাদ প্রস্তাবের উপসংহারে অঘোর বাবু লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় সম্প্রতি আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, এই চৈতন্য সংগীতা গ্রন্থখানি অতি আধুনিক এবং সাহজিক সম্প্রদায়ের রচিত, সুতরাং ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।"

ভক্তিনিধি মহাশয় অঘোর বাবুকে যাহা লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন। তবে হরিদাস সম্বন্ধে ভক্তিনিধি মহাশয়ের কি মত, তাহা আমরা বিশেষরূপে জানি। বিগত পৌষ মাসের (দ্বাদশ খণ্ড-নবম সংখ্যা) নব্যভারত পত্রিকার ৫০৪ পৃষ্ঠায় ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—

"প্রথমতঃ হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্ম ঔরসে ব্রহ্মকুলে বূঢ়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রস্থ বেণাপুরের জঙ্গলে থাকিতেন। শকুন্তলা শকুনী কর্ত্তৃক যেরূপ রক্ষিতা ও পশ্চাৎ মহাতপা কণ্বমুণি কর্ত্তৃক পালিতা হইয়াছিলেন, ব্রহ্ম হরিদাস সেইরূপ শৈশবে পিতামাতা বিয়োগ জন্য জনৈক যবন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ গঙ্গাতীরস্থ * * ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।" পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তিনিধি মহাশয় নব্যভারতে এরূপ লিখার পর যখন চৈতন্য সঙ্গীতাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, (অঘোর বাবুর লিখায় জানা গেল) তখন বোধ হয়, তিনি অন্য একখানি প্রামাণিক গ্রন্থাবলম্বনে হরিদাস সম্বন্ধে নব্যভারতোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানি বোধ হয়—শিবগীতা। আর একটী কথা—চৈতন্য সঙ্গীতায় আমরা বহু অনুসন্ধানেও সাহজিক মতের কথা পাই নাই।

শিবগীতা তন্ত্র সংস্কৃত এবং বহু প্রাচীন, অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। (ঐনামে বটতলায় মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ আছে, সেখানি স্বতন্ত্র।) শিবগীতা ব্যতীত আর একখানি বাঙ্গালা পয়ার গ্রন্থে (পয়ার ব'লে যদি বা অগ্রাহ্য না হয়) হরিদাসের হিন্দুত্বের কথা পাওয়া যায়, তাহার নাম—নামামৃত লহরী। রচয়িতা—উদ্ধব দাস। উদ্ধব দাসের পদ, সংগ্রহ গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। চৈতন্য সঙ্গীতারই ন্যায় তাহার কথা; উদ্ধৃত করিবার বিশেষ চেষ্টা করা গেল না। (বিশেষতঃ বর্ত্তমানে গ্রন্থখানি আমার হাতে নাই।) অঘোর বাবু এ দুই গ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারেন ; এবং তাহা প্রমাণোপযোগী গ্রন্থ কিনা, দেখিতে পারেন। আমার বক্তব্য এই।*

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

জীবনোপায়।

(২৬৬ পৃষ্ঠার পর।)

মিখাইলাকে হাস্য করিতে দেখিয়া সাইমন যেমন আশ্চর্য্যান্বিত ও অভিভূত হইল, আগন্তুক জমীদার-পুত্রও তেমনই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"কোথাকার গর্দ্দভ তুই, যে অমন করিয়া দন্ত বাহির করিতেছিস্? ইহা যেন স্মরণ থাকে যে আমার জুতা ঠিক্ সময়ে প্রস্তুত চাই এবং যেরূপ বলিয়া দিয়াছি, তাহার যেন এক চুল ব্যতিক্রম না হয়।"

* হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে অতঃপর আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না।—সম্পাদক।

মিখাইলা উত্তর করিল,—"জুতার জন্য যখনই লোক আসিবে, তখনই প্রস্তুত পাইবে ; তাহাতে কালবিলম্ব হইবে না।"

জমীদার-পুত্র "আচ্ছা" বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র দ্বার তাঁহার বিশালায়তন দেহের নির্গমন পক্ষে একান্ত অল্লায়তন প্রতিপন্ন হইল। তিনি মস্তক নমিত করিতে গিয়া দ্বারদেশে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর সাইমনকে, তাহার ব্যবসাকে, তাহার জাতিকে এবং এক কথায়, জগতের সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীকে, ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গালি দিতে দিতে বহির্গত হইয়া স্বীয় যানারোহণ-পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আগন্তুকের ত্রম্বকা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে সাইমন মাত্রিওনার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"বাবা! শরীর নয় যেন একটা পাহাড়! হাতুড়ির ঘা মরিলেও কিছু করিবার যো নাই। তাঁহার মাথার আঘাতে আমার চৌকাঠটী ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার যে কিছু হইয়াছে, এরূপ ত বোধ হইল না।" মাত্রিওনা উত্তর করিল,—"এসব লোক যেরূপ খায় এবং যেরূপ থাকে, তাহাতে তাহাদের শরীর হৃষ্টপুষ্ট না হইয়া কি করে?"

অনন্তর সাইমন মিখাইলার দিকে চাহিয়া বলিল,—"দেখ তোমারই কথাতে আমি এই কাজ লইয়াছি ; নতুবা চামড়া যেরূপ দামী ও জমীদার-পুত্র যেরূপ অগ্নিশর্ম্মা, আমি একা হইলে এরূপ কাজ হাতে লইতাম না। একটু বেশকম করিলে প্রাণান্ত করিবে। তোমার জোয়ানের হাত! এই লও, মাপ লইয়া চামড়া কাট। যেরূপে পারা যায়, ভাল জুতা তৈয়ার করিতেই হইবে।"

মিখাইলা হাত বাড়াইয়া চামড়া লইল এবং টেবিলের উপর তাহা বিস্তার করিয়া অতি মনোযোগের সহিত কাটিতে আরম্ভ করিল। মাত্রিওনা মনে করিল, বিশ রুবল মূল্যের একখণ্ড চামড়া কাটিতে দেখাতেও বাহাদুরী আছে ; এই ভাবিয়া মিখাইলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মাত্রিওনা চর্ম্মকার-পত্নী ; আজীবন চর্ম্মকারের সহবাস করিয়াছে। কাজেই চর্ম্মকারের ব্যবসায়ের কোন কার্য্য তাহার অজ্ঞাত ছিল না। মিখাইলাকে চর্ম্ম কাটিতে দেখিয়া সে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল ; কারণ তাহার মনে হইতে লাগিল যে মিখাইলা যেরূপ করিয়া কাটিতেছে, তাহাতে বুটজুতা

প্রস্তুত হইতে পারে না ; অথচ সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে যে জমীদার-পুত্র বুট-জুতার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছেন। মাত্রিওনা একবার ভাবিল, মিথাইলাকে এই ভুলের বিষয় বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিল যে হয়ত মিথাইলা কোন নূতন প্রণালীতে বুট-প্রস্তুত করিতে যাইতেছে ; তাহার না জানিয়া কথা কহা ভাল নহে। এই ভাবিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। মিথাইলার চর্ম্মকর্ত্তন শেষ হইলে সে সেলাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাত্রিওনা আবার সভয়ে দেখিতে পাইল যে বুটজুতা যেরূপ দোহারা সূতা দ্বারা সেলাই করিতে হয়, মিথাইলা তাহা না করিয়া একসূত্র দ্বারা সেলাই করিতেছে। তথাপি সে নিজের অজ্ঞতা অনুভব করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন সমাগত হইল। সাইমন স্বীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং মিথাইলা কি করিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে সাইমনের চক্ষু স্থির! সাইমন ভয়চকিত নেত্রে দেখিতে পাইল যে মিথাইলা জমীদার-পুত্রের চর্ম্ম দ্বারা এক যোড়া শবের পরিধানের উপযোগী চটীজুতা প্রস্তুত করিতেছে!! * সাইমন কতক্ষণ হতচেতনের ন্যায় রুদ্ধকণ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল—"এ কি করিয়াছ? তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছ যে জমীদার-পুত্র বুট প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তুমি তৎপরিবর্ত্তে চটীজুতা প্রস্তুত করিয়াছ ; তাও আবার শবের পায়ের চটী! এখন উপায় কি হইবে? তুমি এতদিন হইতে আমার আলয়ে কার্য্য করিতেছ, কিন্তু কখনওত এরূপ ভুল কর নাই। আজ তুমি এরূপ ভুল করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাত স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই চামড়া কোথায় পাইব? হায়! তোমারত মাথা যাইবেই, সেই সঙ্গে আমার নিজের এবং আমার স্ত্রী পুত্র সকলেরই মাথা যাইবে।......"

সাইমন এইরূপ বকিয়া যাইতেছিল, এমন সময় একজন অশ্বারোহীর অশ্বপদশব্দ কর্ণগোচর হওয়াতে সে তাহার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানে থামিয়া পড়িল। তাহার মনের ভিতর কে বলিয়া উঠিল যে ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি তাহারই গৃহে আসিতেছে। মাত্রিওনার মনেও যুগপৎ ঐ ভাবের

* ইয়ুরোপে মৃতব্যক্তিকে নগ্নপদে কবর দেওয়ার রীতি নাই। শবের পায়ে এক প্রকার চটীজুতার ন্যায় পাদুকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদয় হওয়াতে সে শীঘ্রগতি দ্বার খুলিয়া দিল। পরক্ষণেই অশ্বারোহী ব্যক্তি তাহাদের দ্বারে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে তাহারা সকলে সভয়ে দেখিল, যে এ ব্যক্তি জমীদার-পুত্রের সমভিব্যাহারী ভৃত্য!

ভৃত্য গৃহপ্রবেশ করিলে সাইমন তাহাকে অভ্যাগতোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিল। ভৃত্য উপবেশন না করিয়া আদনদানার্থ গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"আজ প্রাতে যে জমীদার-পুত্র তোমার দোকানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী আমাকে তোমার নিকট পাঠাইলেন।"

সাইমন,—"তাঁহার কি আদেশ?"

ভৃত্য,—"তিনি কহিলেন যে তোমাকে যে বুটের জন্য আদেশ করা হইয়াছিল, তাহার প্রয়োজন হইবে না। যদি বুটের জন্য চামড়া না কাটিয়া থাক, তবে তাহার পরিবর্ত্তে একযোড়া শবের চটী যত সত্বর পার, প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি এখানে বসিয়া তাহা প্রস্তুত করাইয়া একেবারে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া সাইমন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া, একবার আগন্তুকের মুখের দিকে ও একবার মিথাইলার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন সে কোন প্রেতপুরে বা স্বপ্নরাজ্যে উপনীত হইয়াছে। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা তাহার জীবনে আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থিতির পর সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মাপে চটী করিতে হইবে?" ভৃত্য বলিল,—"যে মাপ তোমার কাছে আছে, সেই মাপে ; চটী আমার মনিবের জন্য।"

সাইমন,—"কি বলিতেছ?"

ভৃত্য,—"আমার প্রভু তোমার গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে তোমার দ্বারের চৌকাঠে যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে ললাটের একটী শিরা ক্ষত হওয়ায় অজস্র রক্তস্রাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাড়ী পৌঁছিলে দেখা গেল, তাঁহার শবমাত্র ত্রয়কায় পড়িয়া আছে।"

সাইমন এই বাক্য শুনিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিস্ফারিতনেত্রে মিথাইলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু দেখিতে পাইল যে সে তাহাদের কথোপকথনে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া একান্তমনে চটী জুতা সেলাই করিতেছে ; দেখিলে মনে হয় যেন যে বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা

সে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল, অথবা ঐ কথোপকথন তাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। এতদিনের পর সাইমনের মনে এই প্রথম সন্দেহ হইল যে মিথাইলা কোন দেবতা বা দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবে! সে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া এইরূপ নানা ভাবনা ভাবিতেছে, এমত সময় মিথাইলা আপন কার্য্য সমাধা করিয়া আগন্তুকের হস্তে চটী জুতা আনিয়া দিল। আগন্তুককে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না বলিয়া সে একান্ত হৃষ্টচিত্তে চর্ম্মকারকে যথোচিত পারিশ্রমিক প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

এক, দুই করিয়া ক্রমে আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল। মিথাইলা ঠিক পূর্ব্বমত আছে;—সে কাহারও বাড়ী যায় না, কখনও ঘরের বাহির হয় না, কাহারও সহিত কথা কহে না, আপন মনে আপন কাজ করে এবং কার্য্যশেষে গৃহকোণে বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। সাইমনের গৃহে আগমনাবধি তাহাকে দুইবার মাত্র হাস্য করিতে দেখা গিয়াছে; তদ্ব্যতিরিক্ত তাহার মুখে আর কখনও হাসির লক্ষণ মাত্র দেখা যায় নাই। সাইমন কিম্বা মাত্রিওনা তাহাকে আর কখনও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। সাইমন এক্ষণে, মিথাইলা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, সেই সকল ভাবনা না করিয়া দিবানিশি এই ভাবিতে থাকে যে মিথাইলা তাহাকে কোন দিন ছাড়িয়া না যায়।

একদা অপরাহ্নে গৃহস্থ সকলেই আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে;—মাত্রিওনা বৈকালিক রন্ধনে মনোনিবেশ করিয়াছে, সাইমন এক জানালার পার্শ্বে বসিয়া কার্য্য করিতেছে এবং মিথাইলা অপর জানালার সম্মুখে বাহিরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া সাইমনের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে। সাইমনের বালকবালিকাগণ কখনও বেঞ্চের উপর, কখনও টেবিলের উপর উঠিয়া লাফালাফি করিতেছে। একটী সপ্তমবর্ষীয় বালক দৌড়াইয়া মিথাইলার কাছে উপস্থিত হইল এবং তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র দেহটী জানালার চৌকাঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। তখন সে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মিথাইলার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া জানালার বাহিরে দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে বাহিরে নেত্রপাত করিবামাত্র চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"কাকা! কাকা! (সাইমনের সন্তানেরা

মিথাইলাকে 'কাকা' বলিত।) দেখ, আমাদের বাড়ী এক সওদাগর-পত্নী আসিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে দুইটী ছোট মেয়ে; তাহার মধ্যে একটীর পা খোঁড়া!"

মিথাইলা এই কথা শুনিবামাত্র হস্তস্থিত পাদুকা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতি সত্বর স্কন্ধ হইতে বালককে নামাইয়া অতি উৎসুক-নেত্রে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল! মিথাইলা যতদিন সাইমনের গৃহে অবস্থিতি করিতেছে, তত দিনের মধ্যে কেহ কখনও তাহাকে কোন বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতে দেখে নাই। আজ তাহাকে সামান্য কারণে এরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া সাইমন ও মাত্রিওনা একান্ত বিস্মিত হইল। সাইমন উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিল। সে দেখিতে পাইল যে একটী ভদ্র মহিলা দুইটী বালিকার হাত ধরিয়া তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিলে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া ধারণা হয়। বালিকা দুইটীর আকার প্রকার ও পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই; দেখিলে কিছুতেই পরস্পর হইতে পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। কেবল একটী বালিকার এক পদ ভগ্ন, তাই লাঠি ভর করিয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছিল। সাইমনের মনে হইতে লাগিল যে যদি এই পার্থক্য না থাকিত, তবে তাহাদের বিবাহ হইলে তাহাদের স্ব স্ব স্বামী আপন আপন স্ত্রী চিনিয়া লইতে পারিত কিনা, সন্দেহস্থল। সাইমন দেখিয়াই বুঝিল, বালিকা দুইটী যমজ; কিন্তু যমজেতেও এইরূপ সৌসাদৃশ্য অতি বিরল!

সাইমন এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছে, ইত্যবসরে উক্ত মহিলা বালিকা দুইটীর হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সাইমন ও মাত্রিওনা তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিল এবং স্বাগত জিজ্ঞাসার পর বিনীতভাবে তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মহিলা উত্তর করিলেন যে তিনি বালিকা দুইটীর জন্য ছাগলের চর্ম্মের দুই যোড়া উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করেন। সাইমন উত্তর করিল,—"আমরা সচরাচর এত ছোট পায়ের জুতা তৈয়ার করি না; তবে আমার কর্ম্মকারক বেশ চতুর লোক। সে আপনার পসন্দ মতন অতি সুশ্রী জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে।"

সাইমন এই বলিয়া মিথাইলার দিকে নেত্রপাত করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মিথাইলা অনিমেষনেত্রে বালিকা দুইটীর মুখপানে চাহিয়া

রহিয়াছে। তাহার হাতের কাজ মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। মিথাইলা এত বিহ্বল যে সাইমন যে তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার চৈতন্য নাই। সে নিস্পন্দ হইয়া বালিকাদ্বয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে। সাইমন ভাবিল, বালিকা দুইটী অলোকসামান্যা রূপবতী বটে, কিন্তু একান্তই বালিকা! যদি যুবতী হইত, তবে মিথাইলার এইরূপ মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণের কিছু কারণ বুঝা যাইত। কিন্তু এই শিশু সুকুমারীদ্বয়ের প্রতি মিথাইলার দৃষ্টি এরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যে মনে হয়, যেন তাহাদিগকে দৃষ্টির অন্তরাল করিতে গেলে মিথাইলার নেত্রদ্বয়ও সেই সঙ্গে উৎপাটিত হইয়া যাইবে। যাহা হউক, মহিলাটীর দৃষ্টি ঐদিকে আকৃষ্ট হইলে তিনি পাছে সাইমনের কর্ম্মকারককে একান্ত অভদ্র মনে করেন, এই জন্য সে নিজেই জুতার মাপ লইতে বসিল।

আগন্তুক মহিলা খোঁড়া মেয়েটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া সাইমনকে বলিলেন,—"ইহার খোঁড়া পায়ের মাপ আগে লও; পরে ইহার ভাল পায়ের মাপ লইলেই দুজনের হইবে। কারণ ইহার ভাল পা ভাল মেয়েটীর পায়ের সহিত এক মাপের, ইহারা উভয়ে যমজ।" সাইমন মাপ নিতে নিতে বলিল,—"ইহার পা কি জন্মাবধিই খোঁড়া? এমন চমৎকার রূপত কখনও দেখি নাই। তাহার উপর এই বিপদ কিরূপে ঘটিল?"

আগন্তুক মহিলা,—"ইহার জন্মিবার পর তাহার মায়ের শরীর চাপা পড়িয়া এই পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।"

এই কথা হইতে হইতে মাত্রিওনাও ঐ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল; এক্ষণে বলিয়া উঠিল,—"তবে কি আপনি ইহাদের মা নন?"

আগন্তুক মহিলা,—"না, গো, আমি ইহাদের কেহই নই। আমার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই,—অথবা 'ছিল না' বলিতে হইবে; কারণ এখন আমিই ইহাদের সর্ব্বস্ব এবং ইহারাই আমার সর্ব্বস্ব।"

মাত্রিওনা,—"আপনি ইহাদের মা না হইলেও মায়ের অধিক যত্ন করেন, দেখিতে পাইতেছি।"

আগন্তুক মহিলা, —"কেন করিবনা? ইহাদের জন্মকালে আমাকেও ঈশ্বর একটী পুত্রধনে ভূষিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা কে খণ্ডাইবে? তিনি আমার কোলের ছেলেকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন

এবং আমার কোল জুড়াইবার জন্য ইহাদিগকে আমার কোলে তুলিয়া দিলেন। ইহাদের তখন আপন বলিবার জগতে কেহ ছিল না।" এই বলিয়া তিনি বালিকাদ্বয়কে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহাদের মুখচুম্বন করিলেন।

মাত্রিওনা,—"আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে এবং একটি চর্ম্মকার-পত্নীর এইরূপ কুতূহল ধৃষ্টতা মনে না করেন, তাহা হইলে আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইহাদের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করি।"

আগন্তুক মহিলা একান্ত আশ্বস্তভাবে মাত্রিওনার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং বালিকাদ্বয়কে আপনার দুই পার্শ্বে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার স্বামী পূর্ব্বে ধান চাউলের ব্যবসা করিতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া ধান কিনিয়া আনিতেন; ঐ ধান এক কলের অধিকারী ক্রয় করিয়া লইত এবং কলে তাহার তুঁষ ছাড়াইয়া চাউল করিয়া সহরে গিয়া বিক্রয় করিত। এক্ষণে আমাদের অবস্থা খুব ভাল হইয়াছে, আমরা নিজেরাই এক কল করিয়া সমস্ত ব্যবসা নিজেরা চালাইতেছি। যখনকার কথা বলিতে যাইতেছি, তখন আমরা কেবল গ্রামে গিয়া ধান্য ক্রয় করিতাম মাত্র। একবার,—তখন আমার বয়স ১৯ কি ২০ বৎসর হইবে, সবেমাত্র এক বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে, কোলে একটী ১॥ মাসের ছেলে,—আমরা এক গ্রামে গিয়া ধান্য ক্রয়ার্থ বসতি করিতেছিলাম। তথায় আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে এক কাঠুরিয়া ছিল। কাঠুরিয়ার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, এমতাবস্থায় একদিন তাহার স্বামী জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গিয়া একটী কাঠ চাপা পড়িয়া মারা যায়। পরিবারটী একান্ত দরিদ্র বলিয়া আমরা গিয়া নানা প্রকারে কাঠুরিয়া-পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে যত্ন করিলাম। তাহারও বয়স আমারই মতন। একে যুবতী, তাহাতে গর্ভবতী, আবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাহার উপর একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে রমণী একেবারে শোক দুঃখে অভিভূতা হইয়া শয্যাশায়িনী হইল। আমি প্রত্যহ একবার গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতাম। তাহার স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন পরে একদা প্রত্যূষে গিয়া দেখিলাম যে রমণী মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার পার্শ্বে পড়িয়া দুইটী সদ্যঃপ্রসূতা দিব্য-লাবণ্যময়ী বালিকা ক্রন্দন করিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া রমণীকে স্পর্শ করিলাম; তখন জানিতে পারিলাম যে রমণী প্রসবান্তেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দরিদ্র বলিয়া কেহ গ্রাহ্য করিবে না, এই আশঙ্কায় অথবা লোকাভাবে সে

প্রসববেদনা অনুভব সময়ে কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই। প্রসবকালে বোধ হয় অর্দ্ধোপবিষ্টাবস্থায় ছিল এবং প্রাণবায়ু বিনির্গমনান্তে তাহার দেহটী গড়াইয়া পড়িয়াছিল; কারণ বালিকা দুইটীকে উঠাইতে গিয়া দেখিলাম যে তাহার দেহের চাপে একটি বালিকার একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

"ক্রমে এই সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। গ্রামস্থ সকল গৃহস্থ ব্যক্তিরা একত্র হইয়া নানারূপ শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা মরণান্তে শোক ও সহানুভূতি যথেষ্ট প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সহানুভূতিটুকু অল্প অল্প খরচ করিয়া রুগ্নের সেবার সহায়তা করিলে অনেকস্থলে শোকটুকু বাঁচিয়া যাইতে পারে। এই রমণীকে গ্রামের লোকেরা পূর্ব্ব হইতে একটু যত্ন করিলে তাহার এই অকালমৃত্যু ঘটিত না। আমিও তখন নিজের অমনোযোগের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। যাহা হউক এক্ষণে সকলে পরামর্শ করিতে লাগিল যে বালিকা দুইটিকে লইয়া কি করা যাইবে? গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্থির করিল যে যাহাদের শিশু ক্রোড়ে আছে, এরূপ মহিলাদিগের হস্তে ইহাদের ভারার্পণ করিতে হইবে; পরে চাঁদা করিয়া ইহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে। আমার তখন প্রথম যৌবন, সুস্থ সবল দেহ যেন যৌবনগর্ব্বে ফাটিয়া পড়িতেছে। আমি অগ্রসর হইয়া মেয়ে দুইটিকে কোলে তুলিয়া লইলাম এবং 'আমিই ইহাদের ভার গ্রহণ করিলাম' বলিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলাম। এই দুইটীই আমার সেই পালিতা কন্যাদ্বয়!" এই বলিয়া মেয়ে দুইটীকে পুনরায় কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিয়া আগন্তুক মহিলা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"ইহাদের জন্মের দুই বৎসর পরে আমার নিজের ছেলেটী ঈশ্বর কাড়িয়া লইয়াছেন; কিন্তু আমি ইহাদিগকে লইয়া সুখে আছি। ইহারা না থাকিলে আমার কি হইত, বলিতে পারি না, কারণ আমার আর এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই।"

আগন্তুক মহিলা এইরূপে আপন কাহিনী শেষ করিয়া বালিকাদ্বয়কে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন সাইমনের দৃষ্টি মিখাইলার দিকে আকৃষ্ট হইল। ওকি! মিখাইলার দেহে যেন আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে;—মুখে হাসির ছটা বিদ্যুতের ন্যায় খেলা করিতেছে, সমস্ত শরীর যেন জ্যোৎস্না মণ্ডিত হইয়া গৃহকোণ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। মিখাইলার প্রত্যেক অঙ্গে যেন স্বর্গীয় জ্যোতির প্লাবন বহিতেছে।

মিখাইলার হাস্য ও দেহের জ্যোতি দেখিয়া সাইমন ও তাহার পত্নী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। মিখাইলা যখন দেখিতে পাইল যে সাইমনের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন সে মৃদু হাস্য করিতে করিতে স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া সাইমনের দিকে অগ্রসর হইল এবং গদগদ স্বরে বলিতে লাগিল,—"ভ্রাতঃ, আমার দুঃখের দিন ফুরাইয়া গেল; আমি এক্ষণে তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করি। তোমাদের অন্নে এতদিন প্রতিপালিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা উভয়ে স্বচ্ছন্দমনে আমাকে স্বস্থানে গমন করিতে অনুমতি দাও।"

সাইমন,—"তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে হইতেছে না যে তুমি কোন পার্থিব নর; কিন্তু তুমি সাধারণ মানুষের মত কথা কহিতেছ, তাই আমিও তোমাকে সাধারণ মানুষের মত সম্বোধন করিতেছি। ভ্রাতঃ মিখাইলা, তুমি যাইতে চাহিলে তোমাকে যে ধরিয়া রাখি, এমন সাধ্য আমার নাই। আর, তোমাকে যখন দেবরূপী দেখিতেছি, তখন তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবারও আমার অধিকার নাই। তবে একটী বিষয়ে আমার বড় সংশয় রহিয়াছে, তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দাও, তবে একান্ত কৃতার্থ হইব। তুমি আমার গৃহে আসিয়া অবধি কখনও হাস্য কর নাই; কেবল তিনবার মাত্র হাস্য করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারও কোন কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস যে যদি তুমি ঐ তিনবার হাস্য করিবার কারণ বুঝাইয়া দাও, তবে আমার মত অজ্ঞ লোকেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। আশা করি, আমাকে এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবে না।"

মিখাইলার মুখে এখন আর বিষাদের ছায়া নাই; প্রফুল্লতা মুখ ও অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে হাস্যমুখে স্নেহার্দ্র কোমল স্বরে বলিতে লাগিল,—"আমি যতদিন তোমাদের গৃহে ছিলাম, ততদিন তোমরা যে আমাকে প্রতিনিয়ত বিষণ্ণ দেখিয়াছ, তাহার কারণ এই, আমি ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন হেতু শাস্তিভোগ করিতেছিলাম। এই শাস্তি হইতে মুক্তিলাভকরণার্থ আমার উপর ঈশ্বরের তিনটী আদেশ হইয়াছিল। আমি যে পাপ করিয়াছিলাম, তাহা জগতের তিনটী নিগূঢ় সত্য না জানার ফল। তাই ঈশ্বরের এই আদেশ হইয়াছিল যে, আমি যে পর্য্যন্ত ঐ তিনটী সত্য পরিজ্ঞাত না হই,

সে পর্য্যন্তই আমার শাস্তি। প্রথম, যখন তোমার গৃহে আসিলাম, তখন তোমার স্ত্রী নিজেদের অবস্থা ভুলিয়া আমাকে আহার ও বস্ত্রদান করিলেন; তাহাতে আমি একটী সত্য শিক্ষা করি। আমার শাস্তির একতৃতীয়াংশ খণ্ডন হইল বলিয়া তখন আমি প্রথম হাস্য করিয়াছিলাম। তাহার পর বহুদিন গত হইলে যখন এক জমীদার-পুত্র জুতা প্রস্তুত করাইতে আসিয়াছিল, তখন আমি দ্বিতীয় সত্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমার শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়া গেল বলিয়া তখন আমি দ্বিতীয়বার হাস্য করিয়াছিলাম। তৎপর ঐ বালিকা দুইটীর জন্ম বৃত্তান্তে আমি তৃতীয় সত্য লাভ করিয়া শাস্তি হইতে সম্যক্ মুক্তি লাভ করিয়াছি। তোমরা যে আমার দেহ হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে দেখিয়াছ, তাহার কারণ এই যে, ঈশ্বর এই উপায়ে আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, আমি শাস্তি হইতে সম্যক্ মুক্তি লাভ করিলাম।”

সাইমন,—“তুমি কি কি সত্য শিক্ষা করিলে এবং কি পাপে শাস্তিভোগ করিয়াছ, তাহা যদি কৃপা করিয়া আমাকে শুনাও, তবে আমিও সত্য শিক্ষা করিতে পারি এবং তোমার পাপের বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহা হইতে নিজকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে পারি। ভাই, আমাকে সমস্ত বিস্তার করিয়া বল।”

মিখাইলা পুনরায় বলিতে লাগিল,—“ঈশ্বর আমাকে কেন শাস্তি দিয়াছেন, তাহা বলিতে হইলে আমাকে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে হয়। তুমি আমার এমন উপকারী বন্ধু যে তোমার নিকট আর আত্মগোপন করিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে; অতএব বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি একজন স্বর্গীয় দূত; ঈশ্বরের আদেশে পৃথিবীস্থ সুকৃতি-পরায়ণ মানবদিগের মরণান্তে তাহাদের আত্মা স্বর্গস্থ করিবার নিমিত্ত আমরা নিয়ত পৃথিবীতে যাতায়াত করিয়া থাকি। একদা আমি নিজের অজ্ঞানতা বশতঃ ঈশ্বরের একটী আদেশ অবহেলন করাতে স্বর্গচ্যুত হইয়া এই শাস্তি ভোগ করিয়াছি। তাহার বিবরণ কহিতেছি। একদিন ঈশ্বর আমাকে ধরণীস্থ একটী রমণীর আত্মাকে স্বর্গে আনয়নার্থ আদেশ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা পক্ষবিশিষ্ট, মর্ত্ত্য ও স্বর্গের মধ্যে উড়িয়া যাতায়াত করি। আদেশমাত্র আমি উড়িয়া ধরাতলে উপনীত হইলাম এবং ঐ আসন্নমৃত্যু রমণীর সিয়রে গিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে রমণী কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র হইল দুইটী লাবণ্যময়ী

যমজ কুমারী প্রসব করিয়াছে। সে যাতনায় ছটফট করিতেছে; মেয়ে দুইটী ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। রমণী হাত বাড়াইয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারিতেছে না, এবং নিজে উঠিয়া তাহাদিগকে কোলে তুলিবার কিম্বা অন্য কোন উপায়ে সান্ত্বনা করিবার ক্ষমতা হইতেছে না। দুই তিন বার চেষ্টার পর উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিল, কিন্তু যাতনায় ক্রন্দন করিতে লাগিল; তথাপি অপত্যস্নেহ তাহাকে নিশ্চেষ্ট হইতে দিল না। সে যেমন উঠিবার জন্য পুনরায় মাথা তুলিল, অমনি আমার দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। আমাকে দেখিবামাত্র মৃত্যু আসন্ন জানিয়া সে হতচেতন হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে চেতনালাভ করিয়া আর্ত্তস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—‘দেবদূত,’ আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; তুমি স্বর্গের সৌরভ লইয়া মর্ত্ত্যে বিচরণ কর, তোমাকে কি চিনিতে বাকী থাকে? তুমি আমাকে লইতে আসিয়াছ, আমি সংসারের দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, ইহাতে আমার আনন্দ ছাড়া নিরানন্দ হইতে পারে না। কিন্তু আমার এই সদ্যঃপ্রসূতা বালিকা দুইটীর কি দশা হইবে? তাহাদের এজগতে আপনার বলিবার কেহ নাই। আমি গেলে তাহারাও অযত্নে অনাহারে মারা যাইবে। অতএব দেবদূত, আমি করযোড়ে প্রার্থনা করি, আমার মেয়ে দুইটীর জন্য, অন্ততঃ তাহারা যতদিন না চলিয়া বেড়াইতে পারে, তত দিন পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা কর। আমাকে আজ নিও না। পিতা মাতা বিহনে শিশুসন্তান বাঁচিতে পারিবে না।’ হায়! অভাগিনী জানিত না যে সে নিজে বাঁচিলেও তাহার রুগ্নাবস্থায় কে শিশুদিগের ভরণপোষণ করিবে? যাহা হউক, তাহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া আমার প্রাণ গলিয়া গেল। আমি কোন প্রাণে এমত কাতরতাপূর্ণ প্রাণটী কাড়িয়া লইয়া বালিকা দুইটীরও মৃত্যুর কারণ হইব? আমি একটী বালিকাকে তুলিয়া জননীর বক্ষে এবং অপরটীকে হাতের কাছে রাখিয়া পুনরায় ঈশ্বরের সিংহাসনতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

“ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইয়া আমি এই নিবেদন করিলাম,—‘মহাপ্রভু! আমা দ্বারা ঐ রমণীর আত্মা আনয়ন হইল না। কারণ তিন দিন হইল তাহার স্বামী বৃক্ষ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। তাহাদের জীবিকার সংস্থান কিম্বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কিছুই নাই। রমণী এই মাত্র দুইটী

সুকুমারী প্রসব করিয়াছে। মাতা বিহনে ইহাদের জীবন ধারণ অসম্ভব! একারণ রমণী অনেক কাতরোক্তি করাতে আমি তাহার আত্মা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঐ কাতরোক্তি আপনার চরণেও পৌঁছিয়াছে এবং আপনিও তাহার প্রতি করুণাবর্ষণ করিবেন জানিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি।’

“বিধাতা পুরুষ আমার বাক্য শুনিয়া এইমাত্র আদেশ করিলেন যে ‘যাও, পুনরায় গিয়া ঐ রমণীর আত্মা গ্রহণ কর। তোমাকে ধরাতলে গিয়া কিছুকাল মানবরূপে বাস করিয়া জগৎপালনের বিধান শিক্ষা করিতে হইবে। ঐ বিধানের তিনটী সত্য তোমার নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। যতদিন তাহা শিক্ষা না হইবে, ততদিন তুমি আর স্বর্গধামে বাস করিবার অধিকারী হইবে না। সেই সত্য তিনটী এই—(১) মানুষের ভিতরে কি আছে? (২) মানুষকে কি জানিতে দেওয়া হয় নাই? ও (৩) মানুষের জীবনোপায় কি?’

“আমি বিধাতার আদেশে পুনরায় মর্ত্ত্যধামে আগমন করিলাম। আসিয়া দেখি, রমণী আমার গমনে আশ্বস্তা হইয়া শয্যাতলে উপবেশন করিয়া কন্যাদ্বয়কে স্তন্যদান করিতেছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার আত্মা গ্রহণ করিলাম;—তাহার হাত অশক্ত হইয়া পড়িল, বালিকাদ্বয় শয্যাতলে গড়াইয়া পড়িল এবং রমণীর মৃতদেহ তাহাদের একটীর উপর পড়িয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিল। আমি তাহাদের রোদন সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর মর্ত্ত্য ছাড়িয়া স্বর্গাভিমুখে চলিলাম। অর্দ্ধপথে প্রচণ্ড ঝটিকা উঠিয়া আমার হস্ত হইতে রমণীর আত্মাটী উড়াইয়া লইয়া গেল। আমি আরও দেখিলাম যে আত্মা আমার হস্তস্খলিত হইয়া আপনাআপনি ঊর্দ্ধদিকে উড়িয়া যাইতেছে কিন্তু আমি ক্রমশঃ নিম্নদিকে চলিয়াছি। আমার অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। আমার পক্ষ দুইটী ঝটিকাতে উড়িয়া চলিয়া গেল এবং আমি জড়পিণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

“স্বর্গে কাহারও কোন অভাব বোধ থাকে না, তাই অভাব পূরণ জন্য স্বর্গবাসীদের কোন চেষ্টাও হয় না। আমি ভাবিতাম যে অভাব বোধ ও অভাব পূরণ, ইহাই মানুষের জীবন, এবং মানুষ নিজের অভাব নিজের চেষ্টাতেই পূরণ করিয়া থাকে। ধরাতলে নিপতিত হইয়া আমি প্রথমেই ক্ষুৎপিপাসা ও শীত বোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু অভাব পূরণের কোন

উপায়ই খুজিয়া পাইলাম না। আমি প্রথমে উড়িয়া চলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতেও সক্ষম হইলাম না। এরূপ অবস্থায় আমি যখন গীর্জ্জার পার্শ্বে পড়িয়াছিলাম, তখন সাইমন আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল।”

এতদিনে সাইমন ও মাত্রিওনা বুঝিতে পারিল যে, কিরূপ লোককে তাহারা এতদিন অশন বসন দিয়া পালন করিয়াছে। তাহারা মিখাইলার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাহার নিকট দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। মিখাইলা তাহাদিগকে হাত ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,— “আমি এইরূপ অবস্থায় একান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময় সাইমন, তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে। আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি নিজে দিনান্তে খাইতে পায় না, পরিধানে গলিত বস্ত্র, ইহাদ্বারা কিরূপে আমার সংস্থান হইবে? আর তাহা না হইলেও আমি ত আর কোন উপায় দেখি না। ইতিমধ্যে তুমি আমাকে দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছিলে, তখন আমি আরও হতাশ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম, তুমি আমার দিকে অগ্রসর হইতেছ। তখন তোমার মুখের ভাব অন্যরূপ হইয়াছিল। তোমার মুখে আমি ঈশ্বরের প্রীতি দেখিতে পাইয়া অনেক আশ্বস্ত হইলাম। তুমি আসিয়া আপন বস্ত্রে আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিলে। তখন মাত্রিওনা, তোমার মুখ দেখিয়া আমি আবার হতাশ হইয়া পড়িলাম। তোমাদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া দেখিয়া আমার মনে হইল না যে, আমি আমার অভাব পূরণোপযোগী কিছু তোমাদের নিকট প্রত্যাশা করিতে পারি। আমার প্রাণ একান্ত আকুল হইয়া উঠিল; আমি মুক্তির উপায় ভুলিয়া গিয়া উদরের জ্বালায় একান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, তোমারও মুখের পরিবর্ত্তন ঘটিল; তোমার স্বামী ঈশ্বরের নাম লইবামাত্র তোমার মুখে ঈশ্বরের প্রেম ফুটিয়া উঠিল। তুমি সমস্ত রাগ দ্বেষ ভুলিয়া আমার অভাব নিজের প্রাণে অনুভব করিলে, আমাকে আহার দিয়া জীবন দান করিলে! তখন হঠাৎ আমার মনে হইল, ঈশ্বর আদেশ করিয়াছিলেন, আমাকে শিক্ষা করিতে হইবে, মানুষের প্রাণে কি রহিয়াছে, যাহার বলে জগৎ চলিতেছে, যাহা না থাকিলে জগৎ বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস হইয়া যাইত,—মানুষের প্রাণে আছে—‘প্রেম’!

“তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার এক সত্য লাভ হইল। আমার

নির্ব্বাসনের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া গেল ভাবিয়া আমি আনন্দে হাস্য করিয়াছিলাম।

"প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আমি আশ্বস্ত চিত্তে অপর সত্য লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত আমি আর কিছুই নূতন শিক্ষা করিতে পারিলাম না। তৎপর কিছুদিন অতীত হইলে এক জমীদার-পুত্র জুতা প্রস্তত করাইতে আসিল। আমি সভয়ে দেখিতে পাইলাম যে তাহার পশ্চাতে আমার পূর্ব্ব সহচর অপর এক দেবদূত দাঁড়াইয়া আছে। গৃহস্থ কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি দেখিবামাত্র চিনিলাম এবং জানিলাম যে জমীদার-পুত্রের আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত। এদিকে দেখিতে পাইলাম যে তিনি এক বৎসরের জন্য জুতার বন্দোবস্ত করিতে বসিয়াছেন। তখন হঠাৎ আমার মনে ঈশ্বরের দ্বিতীয় আদেশ উদয় হইল। মানুষকে কি জানিতে দেওয়া হয় নাই? আমি ভাবিলাম, 'হায়! এব্যক্তি অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে গতাসু হইবে, কিন্তু এখনও তাহা না জানিয়া কতরূপ কল্পনা ও কত বিষয়ের কালব্যাপী বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছে!' মানুষকে জানিতে দেওয়া হয় নাই—তাহার নিজের "জীবনের পরিণাম!" মানুষ নিজের জীবনের পরমুহূর্ত্তে কি ঘটিবে, তাহা জানিতে পারে না; তাই নানারূপ কল্পিত অভাব সূচনা করিয়া তাহার পূরণ জন্য কত প্রকার বৃথা আয়োজন করিয়া থাকে। ঈশ্বরের এই দ্বিতীয় সত্য উপলব্ধি হওয়াতে আমার পাপের দুই তৃতীয়াংশ কাটিয়া গেল জানিয়া, আমি দ্বিতীয়বার হাস্য করিয়াছিলাম।

"তৎপর এই বালিকাদ্বয়ের জীবনে আমি তৃতীয় সত্য পরিস্ফুট দেখিতে পাইলাম। ইহারা যখন প্রথম এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন হইতেই আমি ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলাম এবং কিরূপে ইহারা জীবিত থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহাদের পালয়িত্রীর উপাখ্যানে আমি জানিতে পারিলাম, মানুষের জীবনোপায় কি। মানুষের জীবনোপায়, পিতামাতা কিম্বা তাহাদেরই চেষ্টা যত্ন, এসব কিছুই নহে; তাহা কেবল ঈশ্বরদত্ত 'প্রেম'। ঈশ্বরের প্রেম এই দয়াবতী রমণীর প্রাণে না থাকিলে এই শিশু দুইটী কিছুতেই রক্ষা পাইত না।

"এই তিন সত্য হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে ঈশ্বর 'প্রেমস্বরূপ'—

যেখানেই ঈশ্বরের প্রেম বিরাজ করিতেছে, সেখানেই স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন। যেখানেই ঈশ্বর প্রেমরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেখান হইতেই মানুষের জীবনের উৎস প্রবাহিত হইতেছে। মানুষ নিজের চেষ্টা যত্নে কিছুই করিতে পারে না; বৃক্ষ যেরূপ মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানুষ ঈশ্বরের প্রেমরূপ উৎস হইতে আপন জীবনোপায় সংগ্রহ করিয়া থাকে। সন্তানের জীবন ধারণ জন্য কি প্রয়োজন তাহা জানিতে না পারিয়া জননী শোকাতুরা হন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম যে কোন উৎস হইতে কোনদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। মানুষ সর্ব্বক্ষণ নিজের পরিণাম ভাবিয়া কাতর হয়, কিন্তু ঈশ্বরের বিধান তাহাকে সেই পরিণাম জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখে। আমি আজ জানিতে পারিলাম যে ঈশ্বর স্বয়ং প্রেমরূপে মানুষের জীবনোপায় বিধান করিতেছেন! অতএব মানব-জীবনের উপায়, অবলম্বন, সমস্তই একমাত্র 'প্রেম'!!"

মিখাইলার এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তাহার দেবরূপ প্রতিভাত হইয়া উঠিল; দীপ্তিমান নক্ষত্রমণ্ডিত দুই পক্ষ সমুদ্গত হইল। হঠাৎ যেন স্বর্গ হইতে আলোক অবতীর্ণ হইয়া মিখাইলাকে মণ্ডিত করিয়া ফেলিল। সাইমন ও মাত্রিওনা যুগপৎ ভয়, বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। অনন্তর উভয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিতে পাইল যে গৃহে আর কেহই নাই, মিখাইলা অন্তর্হিত হইয়াছে!*

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

জগদ্রাম রায়।

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.
—*Gray.*

কত সময় যে কবি-কল্পনা সত্যে পরিণত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উপরে যে কবি-কল্পনা উদ্ধৃত হইয়াছে, এই প্রবন্ধের শীর্ষের

* এই গল্পটি বিখ্যাত রুশীয় উপন্যাস-লেখক কাউণ্ট টলষ্টইয়ের একটি গল্পের তাৎপর্য্যানুযায়ী অনুবাদ।

লিখিত জগদ্রাম রায়ের পক্ষে তাহা ঠিক মিলিয়া যায়। পাঠক! আপনি কখনও জগদ্রামের নাম শুনিয়াছেন কি? ইনি কবি-কল্পিত, মরুভূমিজাত পুষ্পের ন্যায়, স্বীয় কবিতা-মাধুরী দ্বারা স্বদেশীয় কয়েক জনের মাত্র মন মুগ্ধ করিয়া unwept, unhonored and unsung হইয়া কবি রাজ্যে গমন করেন। ইনি যদি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়া প্রত্যেক ইংরাজী-শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকের কণ্ঠাভরণ হইত এবং তাঁহার বিমল যশোরাশি দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। কিন্তু তিনি ত সেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া এ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সেরূপ পুণ্য থাকিলে এই ভারতবর্ষের এক তমসাচ্ছন্ন প্রদেশ বাঁকুড়া জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন কেন? ইংলণ্ডের কথা দূরে থাক্, তিনি যদি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার যশোরাশি কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের যশের ন্যায় দিগন্ত বিস্তৃত হইত। কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের নামের সহিত জগদ্রাম রায়ের নাম উল্লেখ করায়, এখন বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন যে জগদ্রাম রায়ও একজন কবি ছিলেন। জগদ্রাম রায় আজ কালকার কবি নহেন। ইনি বঙ্গভাষায় একজন পুরাতন ও প্রধান কবি ছিলেন। একশত বৎসরের উপর হইল, তিনি নানাবিধ সুললিত ছন্দে 'অদ্ভুত রামায়ণ' প্রভৃতি তিন চারিখানি সুবৃহৎ মহাকাব্য রচনা করিয়া স্বদেশবাসীদের মন মুগ্ধ করিয়া যান। স্বদেশবাসীদের মনমুগ্ধ করিয়া যান, এই কথা বলিলাম বলিয়া যেন এরূপ কেহ মনে না করেন যে, তাঁহার সেই মধুর পদাবলী অপর দেশবাসীদের মন মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। স্বদেশবাসী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার পদাবলী এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেশের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যায় নাই। অনেকে সুযোগ্য ডেপুটি ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ বাবু শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। উপস্থিত সময়ে আমি নিজে জগদ্রাম রায়ের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, শিবদাস বাবু তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, অদ্য পাঠকগণকে তাহাই শুনাইব। ইনি জগদ্রাম রায়ের রচিত অদ্ভুত রামায়ণের ভরত-সংবাদ নামক অংশবিশেষ মুদ্রিত করেন, এবং তাহার ভূমিকাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"বাঁকুড়া জেলায় ডেপুটি ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ থাকা কালে স্কুল পরীক্ষার

ব্যপদেশে আমি একবার ভুরিসুট পরগণায় যাই এবং ঠিক সন্ধ্যার সময় একটী পল্লীতে উপস্থিত হই। যদিও আমার গন্তব্য স্থান অন্যত্র ছিল, তথাপি রাত্রিকালে উক্ত দেশে গমনাগমন বিপদসঙ্কুল জানিয়া রাত্রিতে আমার গন্তব্য স্থানে যাইতে সাহস করিলাম না। উক্ত পল্লীর একটী চণ্ডীমণ্ডপে অশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে দুই একটী করিয়া প্রায় ২০।২৫ জন গ্রামবাসী হুঁকা হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইটী সমবয়স্ক যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের কক্ষদেশে একখান হস্ত লিখিত পুঁথি ও অপরের হস্তে একটী প্রজ্বলিত মৃন্ময় প্রদীপ ছিল। যুবকদ্বয় মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া তানলয়ে পুস্তকটী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অংশটুকু যুবকদ্বয় পাঠ করিতেছিলেন, তাহা করুণারসে এরূপ পূর্ণ যে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নয়নাশ্রু গণ্ড-স্থল প্লাবিত করিয়া বক্ষদেশে বহিতে লাগিল। যদিও আজন্মকাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়া আমার মেজাজ কতকটা ইংরাজী ধরণের হইয়াছে, তথাপি আমার বেশ মনে হইতেছে, দুই এক বিন্দু অশ্রুকণা আমারও নয়ন-প্রান্তে দেখা দিয়াছিল। ইত্যাদি।"

শিব বাবু জগদ্রামের কবিতায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ঐ অংশটুকু অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। জগদ্রাম রায়ের সম্যক্ গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য শিব বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জগদ্রাম রায়ের কপাল নিতান্ত মন্দ, তাই শিব বাবু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আমি জগদ্রাম রায়কে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের কবি বলিয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ করি নাই। এক্ষণে উক্ত বিষয়ে কিছু প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশে জগদ্রামের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহার গ্রন্থের কথঞ্চিৎ পরিচয় লইবার জন্য আমি একবার তাঁহার জন্মভূমি ভুলুই গ্রামে যাই।

এই ভুলুই গ্রামটী রাণীগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রসিদ্ধ দামোদর নদের দক্ষিণ তটে অবস্থিত। গ্রামটী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত এবং বাঁকুড়ার ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামটী পল্লী হইলেও তাহাতে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে। একা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব জগদ্রাম রায়ের বংশাবলী গ্রামখানির প্রায় অর্দ্ধেক অংশ

ব্যাপিয়া বসবাস করিতেছেন। যদিও তাঁহারা আধুনিক মতে শিক্ষিত নহেন (আজ কাল অল্প ইংরাজী না জানিলে কেহ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হন না), তথাপি তাঁহারা ভদ্রের একশেষ ও অতিশয় অতিথিপ্রিয়। ভুলুই গ্রামটী এক্ষণে যে স্থানে আছে, পূর্ব্বে এ স্থানে ছিল না। পুরাতন ভুলুই বর্ত্তমান ভুলুইয়ের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে ছিল। ১২৩০ সালের দামোদর নদের বিখ্যাত বন্যাতে পুরাতন ভুলুই নদীগত হইলে গ্রামবাসীরা বর্ত্তমান ভুলুইয়ে উঠিয়া যান এবং তাঁহাদের জন্মস্থানের নামেই আধুনিক ভুলুই গ্রামের নামকরণ করেন। পুরাতন ভুলুই গ্রামের এক্ষণে কোন চিহ্নমাত্র নাই; কেবল একটী পুরাতন শিবমন্দির নদীর দক্ষিণ তটে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ স্থানটী দর্শকগণকে দেখাইয়া দিতেছে। ১২৩০ সালের বিখ্যাত বন্যায় যে কেবল ভুলুই গ্রামটী নদীগত হইয়াছে, তাহা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর অনেকগুলি গ্রামও নদীগর্ভে লীন হয়। ১২৩০ সালের বন্যা সম্বন্ধে একটী গ্রাম্য কবিতা উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাহার এক স্থানে এইরূপ আছে;—

ভাঙ্গিল আধগাঁ, ভাড়া, গয়লাপাড়া,
ভাঙ্গিল বাবুইশোল,
তা' পরে ভাঙ্গিল গিয়ে নপুর বল্লভপুর।
বান ছুটিছে (যেন) টাঙ্গন ঘোড়া,
তা' পরে ভাঙ্গিল গিয়ে মেজে মহিষাড়া।

বান-ভাঙ্গা কবিতাটীর যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ভুলুই গ্রামের নাম নাই বটে, কিন্তু তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রাম সকলের উল্লেখ আছে; যথা—পূর্ব্বে আধগাঁ বা অর্দ্ধ গ্রাম ও মেজে, পশ্চিমে ভাড়া, উত্তরে নপুর ও বল্লভপুর। পুরাতন ভুলুই এই চতুঃসীমার মধ্যে ছিল; তবে গ্রামখানি পূর্ব্বকালে সামান্য পল্লীগ্রাম ছিল বলিয়াই উক্ত কবিতাতে উহার কোন উল্লেখ নাই। অনেকেই বলেন, জগদ্রাম রায়ের স্বহস্ত লিখিত পুস্তকটী ঐ বন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম; কারণ আমি ভুলুই গিয়া জগদ্রাম রায় মহাশয়ের বংশধর রামনয়ান রায় মহাশয়কে জগদ্রামের গ্রন্থ আনিয়া আমাকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি গ্রন্থকর্ত্তার স্বহস্তে লিখিত পুঁথিটী আনিয়া দেখাইলেন। গ্রন্থটী এরূপ ভক্তি ও যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে যে, দেখিলেই সহসা মনের মধ্যে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়। পুঁথিটী প্রথমতঃ একটী বৃন্দাবনী নামাবলী দ্বারা আবৃত আছে। ঐ পবিত্র আবরণ খুলিলে পর সম্পূর্ণরূপে শ্বেত

চন্দনে চর্চ্চিত দুইখান পাটা দৃষ্ট হইল। গ্রন্থটী এরূপ ভাবে শ্বেত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত কেন হইল, জিজ্ঞাসা করায়, রামনয়ান রায় মহাশয় কহিলেন যে, তাঁহারা গ্রন্থটীর প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকেন, সেই জন্য এরূপ চন্দন লাগিয়াছে। রামনয়ান রায় মহাশয় জগদ্রাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রামনয়ান রায় গ্রন্থটী খুলিয়া গ্রন্থের কোন অংশ জগদ্রাম রায়ের স্বহস্তের লিখা এবং কোন অংশ জগদ্রাম রায়ের উপযুক্ত পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের স্বহস্তের লিখা তাহা আমাকে দেখাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ রায়কে জগদ্রামের উপযুক্ত পুত্র বলিবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, তিনিও পিতার ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ও ভক্ত ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনিও নিজে একজন সুকবি ছিলেন। জগদ্রাম রায় পুত্রের কবিত্বশক্তি দেখিয়া স্বরচিত "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র নবমী ও দশমীর গান রচনা করিবার জন্য পুত্রকে অনুমতি দেন। রামপ্রসাদ রায় নবমী পালার গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ লিখিয়াছেন—

* * * * *

ষষ্ঠী আর সপ্তমী অষ্টমী সুশোভন।
এ তিন দিনের গান করিলা রচন॥
নবমী, দশমী দুই দিবসের গান।
বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান॥
আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার।
যেমন মশকে লয় মার্জ্জারের ভার॥
বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে।
পঙ্গু লঙ্ঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে॥
তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বচনে।
আগু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে॥ ইত্যাদি।

রামপ্রসাদ দুর্গা পঞ্চরাত্রির নবমী ও দশমীর গান শেষ করিয়া কৃষ্ণলীলামৃত-রস নামক একটী প্রকাণ্ড কাব্য লিখিয়া যান।

অদ্ভুত রামায়ণ কোন শকে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমি পুস্তকটীর শেষ পৃষ্ঠা বাহির করিলাম। তথায় নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত আছে;—

সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশ যুক্ত তাথে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
ঊনত্রিংশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।
জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥
দ্বিজ জগদ্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ।
রামধ্বনি কর পাপ তাপ হ'ক শীর্ণ॥

উল্লিখিত কবিতা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জগদ্রাম রায় ১৭১২ শকের ফাল্গুন মাসের ঊনত্রিশ দিনে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে জন্মভূমি ভুলুই গ্রামে বসিয়া এই অদ্ভুত রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। বর্ত্তমানে ১৮১৭ শকাব্দা চলিতেছে। ১৮১৭ হইতে ১৭১২ বাদ দিলে ১০৫ থাকে। সুতরাং ১০৫ বৎসর হইল এই অদ্ভুত রামায়ণ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটী নিতান্ত ছোট থাট নহে। কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হইতে ইহার আকার অনেক বড়; কারণ সপ্তকাণ্ড রামায়ণে যে সকল কথা আছে, তাহা ত ইহাতে আছেই, অধিকন্তু পুষ্করকাণ্ড বলিয়া একটী অষ্টমকাণ্ড ইহাতে আছে। এই পুষ্করকাণ্ডে সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। সহস্রস্কন্ধ রাবণের সহিত রামচন্দ্রের বহু দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ হয়। পরে রামচন্দ্র পরাজিত হইলে সীতা অসিতা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন। এই অদ্ভুত রামায়ণ ব্যতীত দুর্গা পঞ্চরাত্রি ও আত্মবোধ নামক অপর দুইটী কাব্য জগদ্রাম রায় রচনা করেন। শেষোক্ত দুইটী গ্রন্থও নিতান্ত ছোট নহে। দুইটীতে প্রায় অদ্ভুত রামায়ণের তুল্য হইবে। এখন দেখা যাউক, এইরূপ তিনখান সুবৃহৎ কাব্য লিখিতে কত সময় আবশ্যক হয়। জগদ্রাম রায় সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি একজন সংসারী লোক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সমস্ত ছিল। তিনি নিজে দুই একখান তালুক করিয়া যান। ইহার উপর তিনি নিজে একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন, সুতরাং দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি সন্ধ্যা-পূজাদিতে অতিবাহিত করিতেন। সন্ধ্যা-পূজা, বিষয়-পর্য্যবেক্ষণ ও পরিবারদের তত্ত্বাবধান করিয়া যাহা অল্প সময় থাকিত, সেই সময়টুকু তিনি কাব্য লিখিয়া অতিবাহিত করিতেন। এরূপ অবস্থায় এরূপ সুবৃহৎ তিনখান কাব্য লিখিতে ২০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে বলিলে অন্যায় বলা হয় না। তৎপরে, জগদ্রাম রায় কিছু জন্মগ্রহণ করিয়াই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই; অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর বয়সে কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং অদ্ভুত রামায়ণ রচনার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০।৪৫ বৎসর হওয়া খুব সম্ভব। এমতে ৪৫+১০৫=১৫০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে ১৮১৭ শকাব্দা চলিতেছে। ইহা হইতে ১৫০ বাদ দিলে ১৬৬৭ শক হয়। সুতরাং জগদ্রামের জন্ম ১৬৬৭ শকে বা তাহার দুই চারি বৎসর অগ্রে বা পরে

হইয়াছিল বলিলে বিশেষ ভ্রমে পড়িবার সম্ভব নাই। এই কারণেই আমি জগদ্রাম রায়কে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের কবি বলিয়াছি।

জগদ্রাম রায়ের কবিতা সম্বন্ধে পাঠকগণকে পরের মুখে ঝাল খাওয়াইয়াছি অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে শিবদাস বাবু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণকে তাহাই বলিয়াছি। দ্বিতীয় প্রস্তাবে জগদ্রাম রায়ের পুস্তক হইতে দুই চারিটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কবিতার হার পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। আশা করি, পাঠকগণ, জগদ্রামের কবিতারস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলা।

যে যে ভাবে জীবন কাটায়, তাহার কথাবার্ত্তা হইতে তাহা বুঝা যায়। উকীলের মুখে মোকদ্দমার কথা, শিক্ষকের মুখে শিক্ষকতার কথা, মুদির মুখে চাল ডালের কথা, কেরাণীর মুখে বড় সাহেবের গল্প প্রায়ই শুনা যায়। মেয়েরা একত্র হইলে তরি-তরকারী ও গহনাদির কথা বলেন। কথাবার্ত্তা হইতে যেমন মনুষ্যের ব্যবসায়াদি নির্ণয় করা যায়, তদ্রূপ তাহার চরিত্র ও প্রকৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। উন্নতচরিত্র সদাশয় ব্যক্তির কথাবার্ত্তা একরূপ, পশুপ্রকৃতি বাসনাসক্ত ব্যক্তির কথাবার্ত্তা অন্যবিধ। ব্যক্তিবিশেষের সহিত তাহার কথাবার্ত্তার যে সম্বন্ধ, কোন জাতির সহিত তজ্জাতীয় সাহিত্যের সেই সম্বন্ধ। কারণ, সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব। জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়। যে দেশের অধিবাসিবর্গের জাতীয় জীবন যত দীর্ঘকালব্যাপী, তাহার সাহিত্যের ইতিহাসও তত দীর্ঘকালব্যাপী। যে দেশের লোকেরা জীবনের যত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে স্ব স্ব শক্তির নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের সাহিত্যও তত বৈচিত্রপূর্ণ। অনেকে বলেন, কোন মার্কিন লেখক যে এ পর্য্যন্ত মার্কিন জীবনঘটিত কোন অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিতে সমর্থ হন নাই, তাহার কারণ, আমেরিকার অধিবাসিবর্গের মধ্যে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের অভাব। পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর স্বার্থ, প্রকৃতি, শ্রেণীগত সংস্কার প্রভৃতির সহযোগিতা ও সংঘর্ষেই উপন্যাসের বৈচিত্রপূর্ণ জীবন্ত

ছবির উৎপত্তি হয়। যে জাতি যত গভীরভাবে সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাহার জাতীয় সাহিত্যও ভাবের গভীরতার জন্য সেই পরিমাণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় যে কোন উৎকৃষ্ট নাটক লিখিত হইতেছে না, তাহার একটি কারণ এই যে বাঙ্গালী জাতিগত ভাবে কোন সুখ বা কৃতিত্বে উৎফুল্লচিত্ত হয় নাই, কিম্বা কোন গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করে নাই। সুস্থ শরীরেই হর্ষের উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। অপর দিকে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত অসাড় অঙ্গে কোন বেদনা অনুভূত হয় না। আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য কোথায়, জাতীয়তাই বা কোথায়, যে আমরা জাতীয় গৌরবে আত্মহারা এবং জাতীয় অপমানে ম্রিয়মান হইব? যে জাতি নিজ শক্তি ও উদ্যম-শীলতা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার সাহিত্যে আত্মগৌরব, আশা ও উদ্যমের চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। আবার যে জাতি অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার সাহিত্যে অবসাদ ও নৈরাশ্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অধঃপতিত জাতির সাহিত্যে পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতিজনিত অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতাও কখন কখন পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা উন্নত জাতির আত্মগৌরব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ।

সাহিত্যে যেমন জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ জাতীয় প্রকৃতিও প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ জাতীয় চরিত্র ও জীবন একই বস্তুর দুইটি দিক্ মাত্র। উভয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। চরিত্র অন্তরের জিনিষ, জীবন তাহারই বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। হিন্দু আত্মা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; তজ্জন্য তাঁহার সভ্যতায় বাহ্য ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বৈভব অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। হিন্দু ধ্যানপরায়ণ, আত্মরত ও কর্ম্ম-বিমুখ। তাই তাঁহার সাহিত্যে প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস-গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। আত্মার উন্নতি, সম্প্রসারণ, বিকাশ ও মুক্তি যাঁহার প্রধান চিন্তা ও সাধনের বস্তু, তিনি আত্মার ইতিহাস লিখিবেন; কিন্তু তিনি অনিত্য বাহ্য ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিতেও পারেন;—যদিও বাহ্য ইতিহাস ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। হিন্দুর সাহিত্যে যেমন হিন্দুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, অন্যান্য জাতির সাহিত্যেও তদ্রূপ তাহাদের চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

জাতীয় জীবন বলিলে শ্রেণীবিশেষের জীবন বুঝায় না। রাজা, অভি-জাতবর্গ, কিম্বা ধন ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের জীবনই জাতীয়

জীবন নয়। যাহারা খাটিয়া খায় ও খাটিয়া খাওয়ায়, বরং তাহাদের জীবনই জাতীয় জীবন নামে আখ্যাত হইবার অধিকতর দাবী করিতে পারে। বণিক্, কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সকলেরই জীবন জাতীয় জীবনের অন্তর্ভূত। সুতরাং কোন সাহিত্য বাস্তবিক জাতীয় নামের যোগ্য কি না, বিচার করিতে হইলে, দেখা উচিত, তাহাতে সকল শ্রেণীর সুখ, দুঃখ, স্বার্থ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, উদ্যম, আমোদ প্রভৃতির যথাযথ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কি না। আমরা শৈশবে যে সকল উপকথা শুনিতাম, তাহার অধিকাংশই রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, মন্ত্রিপুত্র, সহরকোটাল, সুয়ো ও দুয়ো রাণী প্রভৃতির কাহিনীতে পূর্ণ। উপকথা-রাজ্যে চাষাভুষা গরিব লোকদের অতি বিরল বসতি। যদিবা তাহারা তথায় বাস করে, অধিকাংশ স্থলে সে কেবল রাজরাজড়াদের সুবিধার জন্য। অনেক জাতির সাহিত্যও তেমনি কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন লইয়াই ব্যস্ত। গরিব-লোকদের কথা তাহাতে নাই।

এখন দেখা গেল যে, সাহিত্যকে জাতীয়তা দিতে হইলে তাহাতে সকল শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের ছবি থাকা চাই। তাহাতে এরূপ কথা থাকা চাই, যাহা সকল শ্রেণীর লোকের মর্ম্মস্পর্শী হয়, এবং সকলেরই হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে। চাষা চাষার সুখ-দুঃখের কাহিনী, মাঝি মাঝির সুখ-দুঃখের কাহিনী, যে যে শ্রেণীর লোক সে সেই শ্রেণীর লোকের সুখ দুঃখের কাহিনী যেমন বুঝিবে, অপরের কাহিনী তেমন বুঝিবে না। জীবন কথাটী কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছি, এক্ষণে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। যে সকল চিন্তা ও ভাবের স্রোত মানুষের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়, আভ্যন্ত-রীণ জীবন বলিলে আমরা সেই সমস্তই বুঝি। বাহ্য জীবন বলিলে বুঝি, মানুষ কি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, কি ভাবে বিশ্রাম-সময় যাপন করে, কিরূপ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া করে, কিরূপ বেশভূষা করে, ইত্যাদি। ধর্ম্মবিশ্বাস আভ্যন্তরীণ জীবনেরই অন্তর্ভূত। ইহা মানুষের অনেক কার্য্যের নিয়ামক, অনেক সুখ দুঃখের মূলীভূত। সুতরাং মানুষের জীবন বলিলে আমরা তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহও বুঝিব।

বাঙ্গলা সাহিত্যকে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য নামের উপযুক্ত করিতে হইলে, সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর কথা ইহাতে লিখিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী-জীবনের সত্য, পূর্ণাঙ্গ ছবি দিতে হইলে বাঙ্গালী যত প্রকার কার্য্য

করে, এবং আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়, সকলেরই কথা ইহাতে থাকা চাই। সুতরাং এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ করা চাই, যাহা লিখিত বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত নয়। চাষা, গাড়োয়ান, ছুতার, কামার, নৌকার মাঝি, মুচি, রাখাল, রাজমিস্ত্রি, কুম্ভকার, সহিস, দোকানদার, তাঁতি, ঘরামী, ময়রা, দরজি, কাঁসারি, শাঁখারি, পোদ্দার, কলু, গোয়ালা, মুদি, তামুলি, প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসায়ে যে সকল শব্দ ব্যবহার করে, তৎসমুদায় এবং তাহারা যে সকল যন্ত্র ও হাতিয়ারাদি লইয়া কার্য্য করে, তাহাদের নাম অধিকাংশ স্থলেই "সাধুভাষা"র বহির্ভূত। তাহারা যে সকল ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়, তাহারও অনেক পারিভাষিক শব্দ পুস্তকের ভাষায় অপ্রচলিত। তাহাদের নানাবিধ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্যদ্রব্যাদির সমুদয় নামও লিখিত বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না; এই সকল শব্দ কথিত বাঙ্গলার অন্তর্গত। তাহাদের অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্রবহির্ভূত, সুতরাং কথিত বাঙ্গলার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল সাধুভাষায় অবর্ণনীয়। তাহাদের স্বভাবচরিত্র বুঝিতে হইলে, শুধু তাহাদেরই বা কেন? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বভাব চরিত্র বুঝিতে হইলে—বঙ্গদেশের উপকথা ও মেয়েলি ছড়া রূপ যে অলিখিত জাতীয় সাহিত্য আছে, তাহার অনুশীলন করা আবশ্যক। এই সকলেও সাধুভাষার বহির্ভূত অনেক কথিত বাঙ্গলা শব্দ আছে।

ভাষা যতদিন লিপিবদ্ধ না হয়, ততদিন অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল থাকে, এবং সহজেই পৃথক্ পৃথক্ প্রভাষা বা প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। অসভ্যদেশে দুই এক ক্রোশ অন্তর যেরূপ ভাষার পার্থক্য দেখা যায়, সভ্য দেশে তদ্রূপ দেখা যায় না। ভাষা লিপিবদ্ধ ও পুস্তকগত হইলে, অনেক পরিমাণে তাহার পরিবর্ত্তনশীলতা ও বিভাজ্যতা হ্রাস পায়। এই জন্য দেখা যায়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার লেখকগণের পুস্তকের ভাষা প্রায় এক, কিন্তু তত্তৎ অঞ্চলের কথিত ভাষা অতিশয় বিভিন্ন; এত বিসদৃশ যে একজন বর্দ্ধমানবাসী একজন চট্টগ্রামবাসীর খাঁটি কথিত ভাষা বুঝিতে পারে না।* ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, এমন কি এক জেলারই ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে একই জিনিষ, একই গাছ, একই প্রাণীর স্বতন্ত্র নাম। এইজন্য প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলার একটি অভিধান প্রস্তুত করা উচিত।

* অনেকে মনে করেন, পুস্তকের ভাষাই আদি ও আদর্শ [illegible]; প্রাদেশিক কথিত প্রভাষাগুলি তাহারই অপভ্রংশমাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। [illegible] গুলিই স্বাভাবিক; পুস্তকের ভাষা অনেক পরিমাণে মানুষের হাতগড়া একটি কৃত্রিম বস্তুমাত্র।

প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গালার অভিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অন্যান্য দিক্ দিয়াও বুঝা যায়। (১) বঙ্গদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে এই সকল কার্য্যের বিবিধ প্রক্রিয়ার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে গুলি বুঝিতে হইলে, ঐ সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেক জেলায় প্রচলিত পারিভাষিক নাম জানা চাই। কারণ, তাহা না জানিলে, নানাস্থানে প্রচলিত প্রক্রিয়া জানিয়া তাহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ বুঝা যাইবে না। বিদেশ হইতে আনীত কোন অভিনব উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়ার প্রচলনার্থও এবম্বিধ জ্ঞান প্রয়োজন। (২) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে নানাবিধ কৃষিজাত ও স্বভাবজ গাছ গাছড়ার নানা জেলায় প্রচলিত নানাবিধ নাম জানা দরকার। আমরা স্বদেশজাত উদ্ভিদ্‌সমূহের নাম জানি না, কিন্তু Roxburgh প্রভৃতি ইংরাজগণ বহুবিধ ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদের বাঙ্গলা, হিন্দি, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি নাম নিরূপণ করিয়াছেন। সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদে অনেক উদ্ভিদের নাম আছে, যাহাদের বাঙ্গলা নাম একস্থানে একপ্রকার, অন্যস্থানে অন্যপ্রকার। এই সমুদায় নাম সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। (৩) প্রাণিবিদ্যার উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার পশু পক্ষ্যাদির স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার বহুবিধ নাম সংগৃহীত হওয়া দরকার। বড় বড় জানোয়ারের নাম প্রায় সর্ব্বত্রই এক। কোথাও কোথাও বা একাধিক নাম প্রচলিত। যেমন মহিষ বা "মোষ" বলিলে সকল বাঙ্গালীই বুঝিতে পারে যে কোন্ চতুষ্পদের নাম করা হইতেছে। কিন্তু পশ্চিম বাঁকুড়া ও মানভূম অঞ্চলে মহিষকে "কাড়া" বা "কাড়া" এবং মহিষীকে কাড়ীও বলে। ইহার একটি "শিষ্ট প্রয়োগ" মনে পড়িল। কথিত আছে, মানভূম অঞ্চলে একবার এক যাত্রার দলের অধিকারী রামায়ণের একটি পালা গাহিতে গাহিছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের চন্দনচর্চ্চিত দেহের শোভা বর্ণন প্রসঙ্গে গাহিলেন—"রামের গায়ে চন্দন কিবা সাজে রে, যেমন পাঁকমাখা কাড়াটা;" অর্থাৎ "রামের গায়ে চন্দন কিবা সাজে রে, যেন তিনি একটি পঙ্কাক্তদেহ মহিষ!!" রাম ও মহিষের গায়ের রঙ্গ এক কিনা, কবিগণ বিচার করিবেন। বড় বড় জানোয়ারের নাম সম্বন্ধে যাহাই হউক, ক্ষুদ্র চতুষ্পদ, নানাবিধ পক্ষী, মৎস্য ও কীটপতঙ্গাদির নামে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। (৪) একটি কথিত বাঙ্গলা শব্দ এক জেলায় শ্লীল, অপর জেলায় হয়ত অতি অশ্লীল। ইহাতে অনেক সময় অনেককে পুরুষ এবং মহিলা উভয় সমাজেই

বড় অপ্রতিভ হইতে হয়। প্রাদেশিক বাঙ্গলার অভিধান থাকিলে এরূপ লজ্জিত হইতে হয় না। (৫) আমাদের সাহিত্যে প্রাকৃতিক শোভার বর্ণন, ঋতু বর্ণন, নরনারীর রূপ বর্ণন, প্রভৃতি বড় একঘেয়ে ও পুঁথিগত হইয়া পড়িয়াছে। যেন পূর্ব্ব কবিগণ সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঃশেষরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং উপমারও আর নূতন বস্তু রাখিয়া যান নাই। উপমা ও বর্ণনাগুলি তাঁহাদের মানসোদ্যান হইতে সদ্যশ্চয়িত, সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত বোধ হয় না। খঞ্জন পক্ষী কয়জন দেখিয়াছেন, জানিনা, কিন্তু চক্ষুর প্রশংসা করিতে হইলেই যেন কেহ "খঞ্জন গঞ্জন আঁখি" বলিতে মাথার দিব্য দেয়। যিনি গজেন্দ্রগমন ভাল বাসেন না, তিনিও হয়ত নিজ তন্বঙ্গী নায়িকাকে "গজেন্দ্রগমনী রাই" এর সহিত তুলনা করেন। যিনি কোন জন্মে হয়ত মুক্তা দেখেন নাই, তিনিও "মুক্তার মত দন্ত পাঁতি" বলিতে ছাড়েন না। তুষারদর্শন খুব কম বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঘটে, কিন্তু তবু সকলেই নিষ্কলঙ্ক শ্বেত বুঝাইবার জন্য তুষারের উল্লেখ করেন। সংস্কৃত কবিগণ কেকার বড় ভক্ত। আমার কিন্তু ময়ূরের ডাক ভাল লাগে না। আমি কেন কেকার মোহিনী শক্তির বর্ণনা করিব? আমরা বাস্তবিক যে সকল পশুপক্ষীর রূপে, গতিতে, বা স্বরে মুগ্ধ হই, যে সকল বৃক্ষলতা, ফলপুষ্পের শোভা ও সৌরভে আকৃষ্ট হই, যদি কাব্যে তৎসমুদয়েরই উল্লেখ করি, তাহা হইলে বাস্তবিকই পাঠকগণের মনে একটা সৌন্দর্য্য, সুস্বর বা সৌরভের ছাপ পড়ে। কারণ পুরাতন পুঁথিগত উপমাগুলা কথার কথা হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা হৃদয়ে কোন ভাববিশেষের উদ্রেক করিয়া দেয় না। কিন্তু প্রত্যেক কবিকে যদি স্বানুভূত সৌন্দর্য্যের কথাই বলিতে হয়, তাহা হইলে অনেক সময় "সাধু" ভাষায় কুলায় না; তাঁহাকে প্রাদেশিক কথিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই কথিত ভাষার অভিধান না থাকিলে অপর প্রদেশের লোকেরা তাঁহার কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে না।

(৬) প্রাদেশিক ভাষা হইতে চরিত্রতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলনের বিশেষ সুবিধা হয়। এই বিষয়টি এরূপ গুরুতর যে ইহা লইয়াই একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। আমরা এখানে কেবল দুই একটী সামান্য উদাহরণ দিব। যে জাতির ভাষায় দুরূহ ও শ্রুতিকটু অক্ষরের যত বেশী প্রচলন, সাধারণতঃ তাহাদের স্বভাব তত রুক্ষ ও বীর্য্যশালী। যেমন মারাঠাদিগের ভাষা। জাতি ও ভাষা সম্বন্ধে এই নিয়ম যেমন সত্য

এক জাতি ও ভাষার অঙ্গীভূত পৃথক্ পৃথক্ স্থানের লোক ও প্রভাষা সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মানভূম অঞ্চলের কথা বড় কর্কশ। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঁকুড়ার মত বঙ্গের আর কোথাও বোধ হয়, "ড়" অক্ষরটির এত ব্যবহার নাই। প্রথম, "বাঁকুড়া" নামটিতেই "ড়" আছে। তাহার পর আরও কতকগুলি স্থানের নাম শুনুন। লড়্রা, কড়্রা, বদ্ড়া, মুড়্রা, সেন্দড়া, কেঞ্জ্যাকুড়া, আড়্রা, মোষ্যাড়া, কু'লমুড়া, তেঁতুলমুড়ী, হাড়্মাস্ড়া, খামারবেড়্যা, জামজুড়ী, বেল্যাড়া, বেল্যাতোড়, বড়জোড়া, কলাইবেড়্যা, প্রভৃতি। "ড়" যুক্ত নামের একটি ছড়া আছে। সেটি ভুলিয়া গিয়াছি। নতুবা তাহা নিশ্চয়ই পাঠকগণের কৌতুক উৎপাদন করিত।

আর একটি উদাহরণ দিতেছি। "মুখ-খোলা" স্পষ্ট উচ্চারণ অপেক্ষা "মুখ-বুজা" অস্পষ্ট উচ্চারণ সভ্যতর বটে, কিন্তু উহা আলস্যের পরিচায়ক। যেমন, বাঁকুড়ার লোকের মত" "হুঁকা" বলিতে হইলে মুখ যতটা "হাঁ" করিতে হয়, এবং যেমন স্পষ্ট "আ" উচ্চারণ করিতে হয়, সভ্যতর কলিকাতাবাসীর মত "হুঁকো" বলিতে হইলে ততটা মুখব্যাদান করিতে হয় না, অন্ত্য স্বরটাও না স্পষ্ট "ও"কার, না স্পষ্ট "আ"কারের মত উচ্চারিত হয়। এখন প্রাদেশিক ভাষা হইতে ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষার কিরূপ সুবিধা, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। ভিন্ন ভিন্ন প্র-ভাষার মধ্যে ব্যাকরণ, উচ্চারণ ও শব্দগত বিস্তর পার্থক্য আছে। প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা ব্যতীত এগুলি বুঝা যায় না। প্রথম, ব্যাকরণের কথা। মধ্য ও পশ্চিম বাঙ্গলার লোকেরা বলেন, "আমি যাই নাই;" পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা বলেন, "আমি গিয়াছিলাম না।" "যাইব, করিব," প্রভৃতির পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গে "যাইমু, ক'রমু" প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়। এই শেষোক্ত পদ দুইটির সহিত সংস্কৃত "যামি" ও "করোমি" পদদ্বয়ের সাদৃশ্য সকলেই অনুভব করিবেন। এইরূপ সাদৃশ্য হইতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের সম্বন্ধ নির্ণয় পক্ষে কিছু সুবিধা হইতে পারে। তাহার পর দেখুন হিন্দীতে বলে, "নেহি যাঙ্গে;" বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মানভূম অঞ্চলে বলে, "নাই যাব;" কিন্তু বঙ্গের অন্যত্র সকলে বলে, "যাব না"। ইহা হইতে হিন্দী এবং পশ্চিম বাঁকুড়া ও মানভূমের প্রভাষার নিকট সম্বন্ধ অনুভূত হইবে। এই নিকট সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সংস্কৃত অঙ্গন শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ "আঙ্গিনা," "বাঁকুড়ী" প্রতিশব্দ "আগন্যা" বা

"এগন্থা"। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পদাবলীতে স্নানের ব্রজভাষানুযায়ী প্রতিশব্দ "সিনান" কথাটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বাঁকুড়ার লোকেও "সিনান" বলে। বঙ্গের অন্যত্র সকলে বলে, "কি জন্যে যাব", পশ্চিম বাঁকুড়াবাসী বলে, "কিস্‌কে যাব।" এই "কিস্‌কে" কথাটি হিন্দীর অনুরূপ। এইরূপ বহু-সংখ্যক উদাহরণ সংগৃহীত হইলে হিন্দী ও ব্রজভাষার সহিত বাঁকুড়ার প্রভাষার সম্বন্ধ নির্ণীত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, কেবল বাঁকুড়ার প্রভাষা সম্যক্‌রূপে জানি বলিয়াই ইহার এতবার উল্লেখ করিতেছি। আর একটি কথা। বাঙ্গলা ভাষায় যেমন সংস্কৃত ব্যতীত, পারসী, আরবী, ইংরাজী প্রভৃতি শব্দও প্রবেশ করিয়াছে, তদ্রূপ অনেক সাঁওতালী প্রভৃতি অনার্য্য ভাষার কথাও মিশ্রিত হইয়াছে। যেমন, বাঁকুড়া ও মানভূমের অনেক স্থানে "মার্ দৌড়্" না বলিয়া "মার্ দেলাং" বলে। এই "দেলাং" কথাটি সাঁওতালী ভাষা হইতে গৃহীত।

প্রভাষা সমূহের অভিধান প্রণয়নের আবশ্যকতা বুঝা গেল। এখন কথা এই, এরূপ অভিধান প্রণয়নের ভার কে লইবে? শুনিলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা এই সমিতিরই কার্য্য। তবে জানিনা, পরিষদ কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন। উক্ত সভার কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া, আমি একটি পদ্ধতির উল্লেখ করিতেছি। পরিষদ একটি প্রশ্ন-তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক জেলার বিভিন্ন উপবিভাগ বা গ্রামবাসী দুই চারিজন লোককে প্রেরণ করিয়া প্রশ্নের উত্তর আনয়ন করুন। তালিকায় নিম্নলিখিত ও তদ্বৎ অপরাপর প্রক্রিয়া, বিষয় ও বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

চাষ—হলচালন, বীজবপন, আগাছা উৎপাটন, জলসেচন, শস্য কর্ত্তন, আহরণ, ইত্যাদি। ধান, আক, গম, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চাষের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করিতে হইবে।

চাষের যন্ত্রাদি—লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতি। ভূমি সম্বন্ধে নানা প্রকার বন্দোবস্ত, যেমন খাজনা (টাকায় কিম্বা আবাদী ফসলে) বন্দোবস্ত, ভাগে বন্দোবস্ত, ইত্যাদি।

ধানভানা। ধান ভানিবার ঢেঁকি প্রভৃতি যন্ত্র ও তাহাদের বিবিধ অংশ, ধানভানার নানাবিধ প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

বিবিধ শস্য ও তরকারীর নাম।

শকট—শকটের চক্র ও অপরাপর অংশের নাম।

নৌকা—বিবিধ প্রকার নৌকার ও নৌকার নানা অংশের, ও নৌকা চালাইবার নানাবিধ কৌশল ও প্রক্রিয়ার নাম।

শিল্পী ও শ্রমজীবী—ছুতার, কামার, মুচি, রাজমিস্ত্রি, কুম্ভকার, সহিস, খনির কুলি, তাঁতি, ঘরামী, ময়রা, দরজি, কাঁসারি, শাঁখারি, কলু, গোয়ালা, পোদ্দার, প্রভৃতির ব্যবসায় ও কার্য্যের বিবিধ প্রক্রিয়া ও হাতিয়ারের নাম। এক একটি ব্যবসায় ধরিয়া বিস্তৃত তালিকা করিতে হইবে।

গৃহ—পাকা এবং খড়ের বা খোলার ঘরের নানা অংশের নাম।

গৃহস্থালী—নানা প্রকার ঘটি বাটী, বসন ভূষণ, তরকারী, খেলা প্রভৃতির নাম।

উদ্ভিদ্ ও পশুপক্ষ্যাদি—নানা প্রকার উদ্ভিদ্ ও পশু পক্ষ্যাদির নাম।

ধর্ম্মানুষ্ঠান—নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানঘটিত ক্রিয়াকলাপের নাম।

উপকথা ও মেয়েলি ছড়া—একই উপকথা বা মেয়েলি ছড়ার জেলাভেদে যে আকার ভেদ হইয়াছে, তাহাও নিরূপণ করা উচিত।

কিছু আয়াস স্বীকার করিলেই এই অসম্পূর্ণ তালিকাটিকে অনেকটা কার্য্যোপযোগী করা যায়। অনেক স্থলে সংস্কৃত বা ইংরাজী শব্দ দিয়া কথিত বাঙ্গলায় তাহার প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। অনেক সময় গৃহ, যন্ত্র, প্রাণী ইত্যাদির ছবি দিয়া চিহ্নিত প্রত্যেক অংশের নাম জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইবে। আবার যেখানে এই সকল উপায় ব্যর্থ হইবে, সেখানে বিশদ বর্ণনা দ্বারা প্রক্রিয়া বা বস্তু বা প্রাণীবিশেষের নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আশা করি "দাসী"র পাঠক পাঠিকাগণ এই বিষয়ে নিজ নিজ সাধ্যমত উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকিবেন। যথাসময়ে শ্রম সফল হইবে।

পরিশিষ্ট।

বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলি শব্দের তালিকা।

সংস্কৃত বা বঙ্গদেশের অন্যত্র প্রচলিত শব্দ প্রথমে, তাহার পরে "বাঁকুড়ী" প্রতিশব্দ দেওয়া গেল।

স্ত্রী—মেইয়া, মাইয়া; কন্যা বা মেয়ে—বিটী; ভাদ্রবধূ—ভাদর বৌ, ভ্যাসিন্; পা—পা, ভোঁড়; মুখ—মুখ, মু, ব্যাঁত; গোঁপ—মচ; কাছা—ছোট; তাকিয়া—গিরদ্যা, তাকিয়া; দা—কাটারী; ঢেঁড়স্—রামঝিঙ্গা; বিলাতী কুমড়া—ডিংল্যা, ডিঙ্গাল্যা; পেয়ারা—পেয়ারা, আঞ্জির; বরবটী—

রমাকলাই, তেলাকুঁচা—তিঁৎপল্লা, অলস (কুঁড়ে)—গোড়্যা ; ভীরু (ভীতু) —ডরপুক্‌ন্যা ; নিষ্কর্ম্মা ; গোঁয়ার—উঁকা জানালা—জানালা, ঝরকা ; ফর্‌সা (মনুষ্য সম্বন্ধে)—গরা, গোরা ; কবরী (খোঁপা)—ঝুঁটি ; বায়না (শিশুদের নির্ব্বন্ধাতিশয়)—রগড়, লগড় ; লালভেরেণ্ডা—সম্বর ; বোগ্‌না —লোকী ; ধুচুনী—টঁকা ; ধনু—কাঁড়বাঁশ ; ঝিনুক—সিতুই ; গিরগিটী—কেঁকলাস ; ল্যাটামাছ—গোড়ুই ; চিংড়ী—চিংড়ী, ইঁচ্‌লী ; কাক—কাগ, কেউআ, কেগুআ ; ক্রৌঞ্চ—কোঁচবগ ; ছাতারে পাখী—ফেঙ্গা ; বাড়ী—বাকুল ; মজুর—মুনীস ; উকুন—ইকুন, উকুন, ডেঙ্গর ; শূকর—শূয়ার, বরা ; শশক—খরগোস্‌, সড়্‌সড়্যা ; গোখ্‌রা সাপ—খরীস ; কেউটে—কেল্যাসাপ ; ধীবর (জেলে)—ক্যায়ট ; কাঠঠোক্‌রা—টেঁস্কনা ; গ্রাম্যপথ—কুলি ; মনিব (মজুরদের)—গলা ; ছিদ্র—ভিন্দ ; কাঁটা ফুটেছে—কাঁটা ভুঁকেছে ; চৌকীদার—চৌকীদার, দিগার ; ডুগ্‌ডুগি—ডুগ্‌ডুগি, বিষম ঢাকী ; চড় (চপেটাঘাত)—চড়, টালা ; মাটীর দেওয়াল—কাঁথ ; আতা—মান্দা'র ; মা—(সম্বোধনে) মা, মাই ; ঘড়া—গোর্‌যা ; লঙ্কা—সুঁপ্‌র্যা, সঁপোর্‌যা ; ছোট পুকুর বা ডোবা—গোড়্যা ; তঞ্চকতা—তঞ্চকতা, তকল্লোবী।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় দাসাশ্রমের আর একটী মাস নিরাপদে অতীত হইয়া গেল। নিম্নে আতুরগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

১। দামো, ২। তিতুরাম, ৩। টোকানী, ৪। দেবীয়া, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। শিবু, ৭। ফুলকুমারী, ৮। স্বর্ণ, ৯। কৃষ্ণপ্রসন্ন, ১০। বাবুরাম। ইহারা সকলেই পূর্ব্ববৎ দিন কাটাইতেছে।

১১। দুর্গামণি—এই জন্ম দুঃখিনী নারী নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া কিছু দিন হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিযাছে। ভগবান ইহার কল্যাণ করুন।

১২। রামজি—এই দুর্ভাগ্য একে খঞ্জ, তাহাতে আবার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বড় কষ্ট পাইতেছে। বাঁচিবার আশা নাই।

সহর এবং মফস্বলের সহৃদয় বন্ধুগণ যদি তথাকার সহায়হীন অন্ধ, খোঁড়া, প্রভৃতি আতুরগণকে আমাদের নিকট কৃপা করিয়া পাঠাইয়া দেন, তবে আমরা বড়ই কৃতার্থ হইব। সংবাদ দিলে আমরা স্বয়ং গিয়াও লইয়া আসিতে পারি।

গিরিডি সেবালয়ের আয় ব্যয়।

আয়। মণিঅর্ডার ১৫৲, বাবু সত্যানন্দ বসু মহাশয়ের স্ত্রী ৫৲, বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় চৌধুরী

মহাশয়ের স্ত্রী ৫৲, বাবু প্রতিভারঞ্জন রায় ৫১০, শিশি বিক্রয় /০, পুরাতন কাপড় বিক্রয় /১০, বাবুরাম বাবত জমা ৫৲, গত মাসের জের ৬৮২॥০, বাক্‌সে দান প্রাপ্ত ৫১০, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু ১৲, মোট আয়—১০৪৬৶১২॥, ।

ব্যয়। সংসার খরচ ৪০।৵১০, ধোপা ২।০, বাড়ী ভাড়া ১৮৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৫৬/৫, দাহ খরচ ১॥০, বাজে খরচ ১৵০, গোয়ালা ৩।/১০, মোট ব্যয় ১০২১।৶৫।

মোট আয় ব্যয়।

আয়—১০৪৬৶১২॥, ব্যয়—১০২১।৶, হস্তেস্থিত ২॥৭॥০।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর এই পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদ-বারি সিঞ্চন করুন।

(২৪শে এপ্রিল হইতে ২৩শে মে পর্য্যন্ত)

বাবু শীতলদাস রায় ১৲, বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ১৲, A Lady c/o. Babu S.N. Das এপ্রিল মাসের চাঁদা ১৲, একজন মুসলমান মহিলা ৶০, বাবু গোলামচরণ গোঁরাই ২৲, ২নং সরকার্স লেনস্থ ছাত্রনিবাসের উদ্বৃত্ত বাসা খরচ মাঃ বাবু শশিভূষণ চট্টো ১৲, বাবু শ্রীনাথ সিংহ ।০, Dr. M. M. Bose ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥০, বাবু ভগবানচন্দ্র চৌধুরী ১৲, বাবু যজ্ঞেশ্বরচরণ চৌধুরী ॥০, বাবু বিপিনকৃষ্ণ চৌধুরী ॥০, শ্রীমতী প্রিয়বালা চৌধুরী ॥০, শ্রীমতী তারামণি দাসী ।০, বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী ॥৵০, একটী গরিব /০, বাবু সারদাচরণ বসু ১৲, বাবু যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ॥০, বাবু যাদবেশ্বর তর্করত্ন ৬৶০, বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲, Mr. K. N. Majumdar ২৲, A friend ২৲, একজন বন্ধু ॥০, একজন বন্ধু ১৲, শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী ১৲, শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ।০, বাবু মনোমোহন বসু ॥০, মুন্সী নকাৎউল্লা ১৲, বাবু মনোমোহন বক্‌সী ২৲, The Charity fund ২৲, বাবু উমাচরণ শেঠ ।০, বাবু রাখালদাস মিত্র ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চের চাঁদা ॥০, ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টো স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধে ৫৲, বাবু খগেন্দ্রনাথ বসু ১৲, শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ মাতৃশ্রাদ্ধে ১৲, বাবু শশীভূষণ মল্লিক ॥০, বাবু প্যারীমোহন ভড় এপ্রিল ও মে মাসের চাঁদা ॥০, সৈয়দ আব্‌দুল জব্বর চৌধুরী জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ১৲, N. K. Bose Esq. এপ্রিলের চাদা ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর এপ্রিলের চাঁদা ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ মাসের চাঁদা ।০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের চাঁদা ২৲, বেথুন স্কুলের কোন ছাত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে ৬/৫, A. Sen, Through G. N. Sen এপ্রিল মাসের চাঁদা ।০, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস নবেম্বর, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিলের চাঁদা ৪৲, বাবু হরিনাথ চট্টো ৵০, রায় হেমচন্দ্র সরকার বাহাদুর ২৲, বাবু মন্মথমোহন মুখো ১৲, বাবু কৃষ্ণদাস লাহা ১৲, বাবু বিজয়কৃষ্ণ মিত্র ২৲, নবাব সৈয়দ আব্‌দুস্‌ সোভান চৌধুরী এপ্রিলের চাঁদা ১৲, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর এপ্রিলের চাদা ১৲, N. C. Baral Esq. মার্চ্চ ও এপ্রিলের

চাদা ২৲, কুমার জগদীন্দ্রনারায়ণ ১৲, বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ১৲, একটী ছাত্র ৵০, বাবু প্রসন্নকুমার দেব বক্‌সী ১৲, বাবু রজনীকান্ত রায় ১৲, মুন্সী জাফর আলী সরকার ॥০, বাবু সর্ব্বানন্দ ঘোষ ।০, শ্রীমতী সীতাদেবী চৌধুরী ১৲, বাবু সীতানাথ বন্দ্যো ১৲, বাবু দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস ১৲, বাবু সর্ব্বমোহন চৌধুরী ॥০, বাবু কৃষ্ণকুমার গুহ ॥/০, দীনহাটা স্কুলের বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণ ৵৫, একটী ভদ্রলোক ৵০, বাবু উমেশচন্দ্র খাসনবীশ ১৲, বাবু জনকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু অভয়নাথ রায় ১৲, A friend ।/০, বাবু সারদাচরণ সেন ১৲, শ্রীমতী মহামায়া ঘোষ ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস এপ্রিলের চাঁদা ।০, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টো এপ্রিলের চাঁদা ১৲, বাবু ললিতমোহন বসাক পুত্র বিজন প্রসূনের নামকরণে ১৲, বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ১৲, বাবু নীলমাধব বসু ২৲, বাবু নন্দলাল দত্ত মার্চ্চ মাসের চাদা ১৲, বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মেজর ১৲, বাবু পরেশনাথ রায় ॥০, বাবু যোগেশচন্দ্র দে বি-এল ২৲, বাবু সতীশচন্দ্র মুখো ১৲, A friend, Cornwallis Square ২৲, বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক ॥০, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী অপরাজিতার জন্মদিনে ১৲, বাবু হীরালাল হালদার ।৴০, বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত ৵০, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যো ২॥৴৫, বাবু সত্যরঞ্জন কাস্তগিরী স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র খাঁ ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ এপ্রিলের চাঁদা ১৲, বাবু বেণীমাধব মিত্র ।০, বাবু রসিকচন্দ্র রায় মোক্তার দিনাজপুর মাসিক চাঁদা বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৮৲, শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুহ ঠাকুরমা ও দিদির মৃত্যুদিন উপলক্ষে ২৲, মৌলবী ইয়াকিন উদ্দীন ॥০, বাবু প্রসন্নকুমার বসু ১৲, পণ্ডিত ভুবনমোহন কর ১৲, বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যো ১৲, বাবু অশ্বিনীকুমার গুহ ১৲, বাবু হরকালী সেন ১৲, বাবু জানকীগির গোস্বামী ১৲, বারুই ষ্টেশন মাষ্টার ॥০, একজন সহানুভূতিকারক ॥০, দেবী চৌধুরাণী ১৩২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ১৲, A friend ।০, বাবু সুশীলচন্দ্র মিত্র ১৲, Mrs. N. R. Sircar ।০, বাবু প্রমথনাথ দত্ত ১০৲, বাবু সীতানাথ রায় B.L. ২৲, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু এপ্রিলের চাঁদা ॥০, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ॥০, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ॥০, রায় কালিকানন্দ দত্ত দেওয়ান বাহাদুর ২৲, বাবু কৃষ্ণসুন্দর সেন ১৲, বাবু হরিদাস মুখো ১৲, বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় ১৲, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুহ ॥০, একজন বন্ধু /৫।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

চাউল বিক্রয় ৫৸/১৫ দাসী হইতে এপ্রিল ও মে মাসের সাহায্য ৫০৲, মোট ৫৫৸/১৫।

বস্ত্রাদি। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং ধুতি ২, বিছানার চাদর ১, জ্যাকেট ১, বালিসের ওয়াড় ৪, বাবু পরেশনাথ রায় পাঙ্গাসিয়া ধুতি ১।

চাউল।

বিগত মাসে যাঁহারা মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াছিলেন, এমাসেও তাঁহারা কৃপা করিয়া দিয়াছেন।

মোট আয়।

দান ও মাসিক চাঁদা প্রাপ্তি ১৩৪॥৵০, অন্যান্য প্রকারে আয় ৫৫৸/১৫, বিগত মাসের জের ২৮॥৴১৫, মোট আয় ২১৯৴১০।

ব্যয়।

অপার সার্কুলার রোডের অবশিষ্ট বাড়ী ভাড়া শোধ ৫০৲, গিরিডি সেবালয় (মঃ অঃ কমিশন সহিত) ৭৫৸০, আদায় কারীর ব্যয় ২৪।৴৫, বাবু ইন্দুভূষণ রায় ২০৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৪৲, এক থান নূতন কাপড়, বাতি, গালা ও সাবান প্রভৃতি ৩৲১০, সাইন বোর্ড ও ভিক্ষার বাক্‌সে নামলিখা ১॥০, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের ঋণ শোধ ১৲, পার্শ্বেল খরচ ৸০, খাতা ৸০, ডাক খরচ ।৴০, অচ্যুত বাবুর মঃ অঃ খরচ ৵০, ট্রাম ভাড়া ।১০, চট্‌ ৵১৫, রসিদ ষ্ট্যাম্প /০, নিব ৫, বিগত মাসের উদ্বৃত্ত জমা ॥০, হিসাব গরমিল ॥০, কেরোসিন তৈল ৴৫।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ২১৯৴১০, মোট ব্যয় ১৮৩৵০, হস্তেস্থিত ৩৫৸/১০।

ভ্রম সংশোধন।

৫ম সংখ্যার দান প্রাপ্তিতে "বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ।০" স্থলে "বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ১।০" হইবে।

" " " "বাবু সদয়াচরণ মিত্র M.A.B.L. ৪৲" স্থলে "বাবু সারদাচরণ মিত্র M. A. B. L ৪৲" হইবে।

" " 'দাসী'র মূল্য প্রাপ্তি স্বীকারে 'সাবেক' স্তম্ভে "বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।৵০" সংযোজিত হইবে।

"দাসী"র নিকট হইতে দাসাশ্রমের সাহায্যপ্রাপ্তি।

গত জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত "দাসী" দাসাশ্রমকে নগদ ২৮০৲ টাকা দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতাস্থ দাসাশ্রম কার্য্যালয়ের ঘরভাড়া ও কর্ম্মচারীর বেতনাদির ব্যয়ও "দাসী" নির্ব্বাহ করিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি—প্রথম ভাগ। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী-প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এই পুস্তকখানিতে কবীর, নানক, তুলসীদাস ও তুকারাম এই চারি জন ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবির জীবনচরিত সংক্ষেপে এবং সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় আখ্যাত হইয়াছে। এতন্মধ্যে কবীরের জীবনী কিছু বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। কবীর, তুলসীদাস এবং নানকের পদাবলীর কিছু কিছু অনুবাদসমেত নমুনাও দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।

ব্রহ্ম-সাধন। শ্রীকালীনাথ দত্ত-প্রণীত। মূল্য ।৶০ আনা মাত্র। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলি আছে ;—নিগূঢ়-প্রেম ; চরিত্র-সংগঠন ; শাস্ত্র, পুরাতন ও নূতন ; সাধনের অবস্থাত্রয় ; প্রসঙ্গ ; সদালাপ ; অচ্যুত-পদ ; ভাবাঙ্গগঠন ; প্রকৃত আত্ম-দর্শন ; আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ ; ভয়, জ্ঞান ও ভক্তি ; হিন্দু ও য়িহুদী জাতির বিশেষ ধর্ম্মভাব। প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে কোন কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সকলগুলিতেই লেখকের ধর্ম্মভাব, চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে অল্প কথায় ধর্ম্মের অনেক গভীর সত্য সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। যথা—“প্রার্থনা আত্মার শ্বাসত্যাগ, ব্রহ্মকৃপা আত্মার শ্বাসগ্রহণ।”

জলকষ্টাদির কাহিনী ও বৃষ্টিতত্ত্ব। শ্রীসাগরচন্দ্র কুণ্ডু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ আনা মাত্র। এই বাহ্যাড়ম্বরশূন্য ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিত হইয়াছে। যথা—মেঘের উপর বনের প্রভাব, জলাশয় সংস্কার, আর্টেশিয়ান ওয়েল বা প্রস্রবণ-কূপ প্রভৃতি। সর্ব্বত্র এই সকল বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত।

ভবানীপুর সাহায্য-সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণ। সন ১৩০১ সাল। ভবানীপুর সাহায্য সমিতির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। “ভবানীপুরবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে সম্পত্তিহীন নিরুপায় বিধবা, পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকবালিকা এবং শারীরিক বা মানসিক বৈকল্য, পীড়া বা অন্য কোন বিপদ্‌হেতু অন্ন-সংস্থানের উপায়রহিত ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য দান, ভবানীপুর সাহায্য-সমিতির উদ্দেশ্য।” ১২৯৯ সালে ৩৭ জন ও ১৩০০ সালে ৪৪ জন অন্তঃপুরবাসিনী অসহায়া বিধবাকে সমিতি প্রতি মাসে সাহায্য দিয়াছেন। “১২৯৯ সালের মাসিক চাঁদা ২০৯ জন দাতার নিকট হইতে ২১৮৬৷৵০ টাকা ও এককালীন দান ২৯৯৲ টাকা, মোট ২৪৬৭৷৵০ টাকা সমিতির আয় সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং ১৩০০ সালে ২৪১ জন দাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ২৭১০৷৵০ টাকা মাসিক চাঁদা ও এককালীন দান ১৫৩৲ টাকার সহিত সমিতির মোট আয় ২৮৬৩৷৵০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বর্ষে দাতার সংখ্যা ৩২ জন ও আয়ের পরিমাণ ৩৯৬৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং ১২৯৯ সালে ৫৭৯ জন প্রার্থীকে ১২২৮৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, এবং ১৩০০ সালে ১১১২ জন প্রার্থীকে ২৩০৬।৶১০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। অতএব প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে, দাতার সংখ্যা ৩২ জন, আয়ের পরিমাণ ৩৯৬৲ টাকা, সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা ৫৩৩ জন ও ব্যয়ের পরিমাণ ১০৭৮।৶১০ বৃদ্ধি হইয়াছে।”

The Report of the Calcutta Orphanage for the year 1892, 1893 & 1894 অর্থাৎ কলিকাতা অনাথাশ্রমের ১৮৯২, ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালের কার্য্যবিবরণ। ১৮৯৩ সালের শেষে আশ্রমে ৫টি বালক ও ৫টি বালিকা ছিল। ১৮৯৪ সালের শেষে ৭টি বালক ও ৬টি বালিকা ছিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে ৯ বৎসর বয়স্ক একটি বধির-মূক বালক হারাইয়া গিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তখন তাহাকে পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি বালকটিকে আবার পাওয়া গিয়াছে। বালকগণ কলিকাতার দুইটি স্কুলে শিক্ষা পাইতেছে; বালিকাগণকে আশ্রমেই শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে আশ্রম ৪০ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে অবস্থিত আছে। ১৮৯২, ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে ইহার আয় যথাক্রমে ২৭২৷৵১৫, ৫৮৯।/৫ ও ১১৮।১০, এবং যথাক্রমে ২৮০৷৶০, ৫৯৪৷০ ও ১২২৮।১০ হইয়াছিল। অনাথাশ্রমের কথা আমরা “দাসী”তে অনেকবার বলিয়াছি ; সুতরাং এখন আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

শিশুগাথা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। মূল্য দুই আনা। ইহার অনেকগুলি কবিতা শিশুগণের পাঠোপযোগী হইয়াছে।

গুরু ও সাধনতত্ত্ব। শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য ৷০ আনা মাত্র। এই পুস্তকে গুরু-আনুগত্য ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-তত্ত্ব শীর্ষক দুইটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। “দাসী”তে ধর্ম্মমতের আলোচনা করা হয় না, সুতরাং এই পুস্তকে যে সকল ধর্ম্মমত সমর্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিলাম না। সাহিত্য হিসাবে পুস্তকখানি ভাল হয় নাই। ইহার ভাষা জটিল এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলার মিশ্রণে কিছু অদ্ভুত রকমের হইয়াছে। কিছু আয়াস স্বীকার করিয়া লেখকের যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিলে মনে হয় লেখক নিজের বাগ্‌জালে নিজেই জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। পুস্তকের ৭৮ পৃষ্ঠায় লেখক দুর্নীতির একপ্রকার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

এই কি রামের অযোধ্যা? অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার অবস্থা। [ঐতিহাসিক উপন্যাস।] শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। ইহার নামেই এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ও অন্যান্য ভারত-প্রবাসী ইংরাজগণ কিরূপ অর্থগৃধ্নু ছিল, এই বহিখানি পড়িলে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ঠগীর বৃত্তান্তও ইহাতে কিছু কিছু আছে। যাহারা গলায় গামছা দিয়া বা অন্য উপায়ে পথিকগণের প্রাণবধ করিত, গ্রন্থকার তাহাদিগকেই “ঠগী” বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের নাম “ঠগ” এবং তাহাদের কার্য্যের নাম “ঠগী।” সব্‌জিখাঁর হত্যার বিবরণটি কর্ণেল মেডোজ্ টেলার প্রণীত Confessions of a Thug নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হইল। ১৭ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন, “ইংলণ্ডের চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে আত্মীয়তা কিম্বা বন্ধুতা প্রদর্শনার্থ রমণীগণ পুরুষের মুখচুম্বন করেন এবং পুরুষকেও আপনাপন মুখচুম্বনের অধিকার প্রদান করেন।” আমরা বিলাত যাই নাই, এখানেও ইংরাজসমাজে মিশি নাই ; সুতরাং নিজ অভিজ্ঞতা হইতে পূর্ব্বোক্ত রীতিটি ইংরাজসমাজে “চিরপ্রচলিত” এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু চেম্বার্সের এন্‌সাইক্লোপীডিয়া নামক বিশ্বকোষের নূতন সংস্করণে Salutations (অভিবাদন) শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে মনে হয়, এই রীতি ইংলণ্ডে বহুকাল পূর্ব্বে অপ্রচলিত হইয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধ হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। “In England it was *formerly* the custom to kiss at the beginning and end of a dance, as well as on meeting a lady or taking leave of her.” “The Puritans objected strongly to it, but its *disuse* was really the result of the French airs that came in with Charles II., and it lingered among honest country-folk till the times of the *Spectator*.”

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর সাধারণতঃ "দাসী"তে আর গ্রন্থ-সমালোচনা থাকিবে না। প্রয়োজন হইলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থবিশেষের সমালোচনার্থ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। দাসাশ্রমের কল্যাণার্থ এইরূপ নিয়ম করিতে হইল।

দাসাশ্রম মেডিক্যাল হল।

দাসাশ্রমের বন্ধুগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে দাসাশ্রমের স্থায়ী আয়ের সংস্থান করিবার জন্য ইহার একটি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দাসাশ্রমের স্থায়ী ৺সুরাজমোহিনী ফণ্ডে যে টাকা ছিল, তাহা ঋণ লইয়াই এই কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ঔষধালয়ের লাভ হইতে উক্ত ঋণের ৩০০৲ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। এই প্রকারে ৺সুরাজমোহনী ফণ্ডের সমুদয় টাকা পরিশোধ হইয়া গেলে, ঔষধালয়টি দাসাশ্রমের একটি ঋণশূন্য সম্পত্তি হইয়া যাইবে। ৺সুরাজমোহিনী ফণ্ডের টাকা যেমন শোধ হইতে থাকিবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দাতার ইচ্ছানুসারে কোম্পানীর কাগজ কেনা হইবে। সুদ দাসাশ্রম পাইবেন। ইহা হইতে আমাদের বন্ধুগণ বুঝিতে পারিবেন যে ঔষধালয়ের আয় মাসে মাসে খরচ করিয়া না ফেলিয়া আমরা ঐ আয় জমাইয়া উহাকে "দাসাশ্রম মেডিক্যাল হল" নামক একটি ঋণশূন্য সম্পত্তিতে পরিণত করিতেছি।

কলিকাতা, ২০৮।২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "দাসী"-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীললিতমোহন দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"দাসী"র মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(১৫ই এপ্রিল হইতে ২৮শে এপ্রিল পর্য্যন্ত)

সাবেক।—তারাপদ ঘোষ ১৲, কুঞ্জবিহারী সরকার ১৲, R. N. Ray Esq. ১৲, হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ১৲, যোগীন্দ্রনাথ সেন ১৲, উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যো ১৲, কুমার সত্যবাদী ঘোষাল ১৲, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲।

৪র্থ বর্ষ।—৩৭৩ হরমোহন দাস ১॥০, ২৫০ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১॥০, ৩৪১রামরতন গুপ্ত ১॥০, ৩১৫বিপিনবিহারী বসু ১॥০, ৭০সদয়াচরণ দাস ১॥০. ৭৬চারুচন্দ্র গোস্বামী ১॥০, ৪১৭ সুমতিবালা দেবী ১॥০. ২৮ ললিতমোহন বন্দ্যো ১॥০, ৩৬৩ চন্দ্রকান্ত মল্লিক ১॥০, ৩৫৭ রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল ১॥০, ১৯৪ মনোমোহন চট্টো ১॥০, ২৭৫ নাথমল চাড়ালিয়া ১॥০, ৩০৭ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ১॥০, ৫১৭ রাধিকানাথ মুখো ১॥০. ৬০৮ যদুপতি চট্টো ১॥০, ৫৭১ ঈশানচন্দ্র চট্টো ১॥০, ৭০৭ রতিকান্ত মজুমদার ১॥০, ৬২৯ হেমচন্দ্র গুহ ১॥০, ৫৬৭ লালগোপাল সেন ১॥০, ৫৮২ Union Coal Co. ১॥০, ৭৯ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যো ১॥০, ৩৪৭ কুমার সতীপ্রসাদ গর্গ ১॥০, ১২৮১ অক্ষয়কুমার বসু ২৲, ১২৮২ কানাইলাল বিশ্বাস ২৲, ১২৮৩ মুন্সী রহমৎ উল্লা ২৲, ১২৮৪ ব্রজকুমার ভট্টাচার্য্য ১৲, ১২৮৫ রজনীকান্ত সরকার ১৲, ১২৮৬ গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ২৲. ১২৮৭ কালীপ্রসন্ন রায় ২৲, ১২৮৮ রেবতীমোহন চৌধুরী ১৲, ১২৮৯ প্রসন্নকুমার সেন ১৲, ১২৯০ জানকীনাথ বিশ্বাস ২৲, ৮৬ রামলাল সিংহ ১॥০, ৬৬ প্রিয়লাল মিত্র ১॥০, ১২৮৮ হরিমোহন বন্দ্যো ১৲. ১২৯১ নাগ এণ্ড কোং ২৲, ১২৯২ ভূপতিনাথ বসু ২৲, ২০০ জয়শঙ্কর গুপ্ত ১॥০, ৩১২ দেবেন্দ্রনাথ সেন ১॥০. ৩৮৭ নন্দলাল মল্লিক ১॥০, ৫৩৪ দেবনাথ মজুমদার ১॥০, ৬৫৭ অভয়ানন্দ দাস ১॥০, ৬৬২ কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১॥০, ৬৭৬ হরকান্ত সেন ১॥০, ৬৯৩ দীনবন্ধু সেন ১॥০, ৬৮৫ মহাদেব মুখো ১॥০, ৭২১ প্যারীলাল রায় ১॥০, ৭২৫ গোরাচাঁদ দাস ১॥০, ৭৩০ কালীপ্রসন্ন দাস ১॥০, ১২৯৩ অন্নদাপ্রসাদ সেন ২৲, ১২৯৪ নীলকমল লাহিড়ী ২৲, ১২৯৫ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ২৲, ১২৯৬ করুণাসিন্ধু মুখো ২৲. ১২৯৭ ক্ষীরোদবাসিনী রায় ২৲, ৫৭৭ বান্ধব-সমিতি ২৲, ১৪৭ শরৎকুমারী বন্দ্যো ১॥০, ৯৭৮ আনন্দগোপাল গুঁই ২৲, ৯৮১ শশীকুমার চৌধুরী ২৲, ৭০২ বিপিনচন্দ্র পাল ১॥০. ১০০৬ কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ ২৲. ১০০২ আশুতোষ বন্দ্যো ২৲. ৯৯১ ধর্ম্মনারায়ণ ঘোষ ২৲. ৭৮১ কৈলাসচন্দ্র বাগচী ১॥০, ৯৮২ লক্ষ্মীনারায়ন চট্টো ২৲ ৯৮৬ তারকচন্দ্র দাস ২৲ ৩১৪ হেমনলিনী বসু ১॥০, ৫৮৩ দুর্গানারায়ন বসু ১॥০, ১৮০ দেবেন্দ্রনাথ রায় ১॥০, ৫১৫ সুবালা হালদার ১॥০. ৭১২ কেদারনাথ সেন ১॥০, ৫৭৮ শাক্তকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ১॥০, ৫৫৭ মুনসী আব্দুল সায়েদ ১॥০, ২৯৫ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ১॥০, ২৪৯ রাখালচন্দ্র বন্দ্যো ১॥০, ৪৭ দীননাথ গাঙ্গুলী ১॥০, ১২৯৮ শিবপ্রসন্ন ভট্টা ২৲, ১২৯৯ চারুচন্দ্র মল্লিক ২৲, ১৩০০ নিমাইচরণ মল্লিক ২৲ ১১৬৩ মাধবচন্দ্র চট্টো ১৲. ১৩০১ রাজচন্দ্র চন্দ ২, ১৩০২ কুমার

সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব ২৲, ৬৩ লোকনাথ দত্ত ১৷৹, ১১২ দীননাথ মুখো ১৷৹, ১৬১ হরিপ্রসন্ন ঘোষ ১৷৹, ৬১৭ মনীন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস ১৷৹, ৬১৬ উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ১৷৹, ৬৫৪ বসন্তকুমার ঘোষ ১৷৹, ৫৭২ ক্ষেত্রনাথ সরকার ১৷৹, ৬০৩ রাজনন্দিনী বসু ১৷৹, ৬৬৮ রজনীকান্ত দাস ১৷৹, ৭০৪ কালীপদ বসু ১৷৹, ৬৮৯ সারদাচরণ ঘোষ ১৷৹, ৬৮৩ তারিণীকুমার গুপ্ত ১৷৹, ৭২২ মথুরা নাথ গুপ্ত ১৷৹, ৬৭৭ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টো ১৷৹, ৬৮৮ রাখালচন্দ্র চট্টো ১৷৹, ৭৪৮ অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৷৹, ৮৪১ বিনোদিনী রায় ১৷৹, ৪৫৯ বৃন্দাবনচন্দ্র বারিক ১৷৹, ৩৩৭ আদ্যনাথ চট্টো ১৲, ১৩০৩ মাধবানন্দ বসাক ২৲, ১১৮৫ হরিপদ ঘোষাল ১৲, ১৩০৪ শৈলবালা সেন গুপ্ত ২৲, ১৩০৫ মহামায়া দাসী ২৲, ৪৭০ বিধুমুখী সরকার ১৷৹, ৫৫২ মধুসূদন সরকার ১৷৹, ৭০৬ জ্ঞানদা প্রভা দে ১৷৹, ৭২৮ কামিনীকান্ত সেন ১৷৹, ৭৩৪ প্রসন্নকুমার কারকর্ম্মা ১৷৹, ৮৬৩ ললিতচন্দ্র মজুমদার ১৷৹, ৮০৯ চৈতন্য লাইব্রেরী ১৷৹, ৪৪১ রাধাকৃষ্ণ সিংহ ১৷৹, ৮৪৪ বিশ্বনাথ সিংহ ১৷৹, ৭১০ সরলাসুন্দরী দত্ত ১৷৹, ৮৫১ তারিণীচরণ দত্ত ১৷৹, ৮৪২ হরিচরণ বন্দো ১৷৹, ৬৭৩ অখিলচন্দ্র রায় ১৷৹, ৪৭৯ স্বর্ণপ্রভা দত্ত ১৷৹, ৫৪৫ ইন্দুরেখা রায় ১৷৹, ৫৩ মণিমোহন রায় ১৷৹, ২২ কুমুদবন্ধু সেন ১৷৹, ৮৮১ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৷৹, ৬৮২ রাখালচন্দ্র বসু ১৷৹, ৩৭৮ ননীগোপাল চট্টো ১৷৹, ১৩০৬ প্রমিলাসুন্দরী দেবী ২৲, ৮১৬ সারদা মঞ্জরী দত্ত ১৷৹, ৮১৭ প্রকাশচন্দ্র দেব ১৷৹, ৫১৯ হেরম্বচন্দ্র ঘোষ ১৷৹, ৬৩২ পিংনা স্কুলের ছাত্রগণ ১৷৹, ৩৯১ মাহিলাড়া বালিকা বিদ্যালয় ১৷৹, ২৩ কৈলাসচন্দ্র প্রধান ১৷৹ ৬৬১ উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১৷৹, ৬৩৮ কুঞ্জবিহারী দে ১৷৹, ৬৩৬ যোগেন্দ্রনাথ বন্দো ১৷৹, ৬৪২ কৈলাসচন্দ্র সেন ১৷৹, ৬৪০ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস ১৷৹, ৬৪৯ মৌলবী বরকত উল্লা ১৷৹, ৬৪৬ রাসবিহারী বসু ১৷৹, ৫৫৬ রাজকৃষ্ণ সাহানা ১৷৹, ৪৬৬ তারকগোপাল ঘোষ ১৷৹, ৪৫০ অঘোরচাঁদ বন্দো ১৷৹, ৪২৯ গোপালচন্দ্র দে ১৷৹, ১৭৯ জ্ঞানদা মজুমদার ১৷৹, ১৩ সারদাকান্ত সেন ১৷৹, ৮২ অক্ষয়নাথ রায় ১৷৹, ১৩০৮ বিনোদ বিহারী হালদার ২৲, ১০০৮ মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী ২৲, ৪৩১ তারা চাঁদ বেরা ১৷৹, ২৮৯ উমেশচন্দ্র নাগ ১৷৹, ৩০৬ সাতকড়ি চট্টো ১৷৹, ১৩০৯ চন্দ্রশেখর রায় ১৲, ১৩১০ শীতলদাস রায় ২৲, ৮০১ হেমবতী সেন ১৷৹, ৪৩৩ শিবরাম বসু ১৷৹, ৪৫৮ বিপিনবিহারী শাশমাল ১৷৹, ৪৬১ ক্ষেত্রমোহন বেরা ১৷৹, ৬৫৩ মহম্মদ বাসেক ১৷৹, ৪৩৪ মাখনলাল মোদক ১৷৹, ৪৩০ দ্বারকানাথ দাস ১৷৹, ১১৩১ কানাইলাল দে ১৲, ১৩১১ নবীনচন্দ্র সেন ১৲, ১৩১২ অমূল্যচরণ বসু ২৲, ১৩১৩ J. Barooah ২৲, ১৫৫ হেমাঙ্গিনী বসু ১৷৹, ৩৭৯ সোমনাথ রায় ১৷৹, ৬১৪ গোবিন্দনারায়ণ সিংহ ১৷৹, ৭৫২ বিনোদলাল মুখো ১৷৹, ৭৫৮ রজনীকান্ত দত্ত ১৷৹, ১৩১৫ পরেশরঞ্জন রায় ২৲, ১২৭১ ডাঃ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ১৲, ৪২৭ B. Chatterji Esq. ১৷৹, ৩৫৬ ঈশানচন্দ্র বেরা ১৷৹, ৮২৬ মতিলাল চট্টো ১৷৹, ১৩১৬ শ্রীনাথ সিংহ ১৲, ৪৭৭ বিপিনবিহারী সাহা ১৲, ৫৮৫ বিনোদবিহারী বসু ১৷৹, ১৩১৭ রতিকান্ত ঘোষ ১৲।

(ক্রমশঃ)

দাসী

বালুকাময় জলশোধকের উপযোগিতা ও ব্যবহার।

গত মার্চ্চ মাসের দাসীতে 'বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা ও সংগ্রহোপায়' প্রকাশিত হইয়াছে।—নিত্য পানীয় জল বালুকাময় শোধক দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বালুকাময় জলশোধকের উপযোগিতা কতদূর বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাও তথায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

বালুকাময় জলশোধকের কার্য্যক্ষমতা পাঠকগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে তদ্বিষয় এখানে সবিস্তারে বলা যাইতেছে। বালুকা দ্বারা পানীয় জল কি প্রণালীতে শোধন করিতে পারা যায়, এবং ব্যবহারোপযোগী ও প্রকৃষ্ট জলশোধকই বা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয় প্রকটিত করা যাইতেছে। এই নিত্য রোগভোগে কাতর বঙ্গদেশে পানীয় জলের বিষয় যতই আলোচিত হয়, মঙ্গলের ততই সম্ভাবনা।

বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা ও সংগ্রহোপায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কোন কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকটিত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কথাটা নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। কেন না, তাঁহাদের নিকট এরূপ তর্ক কিম্বা ঔদাসীন্য কখন আশা করি নাই।

কথাটা কিন্তু নূতন নহে। অনেক সময় অনেক লোককে বিবিধ আকারে এই তর্ক উত্থাপন করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞানের মতেরই যখন স্থিরতা নাই, তখন তাহার উপদেশ পালন করায় না করায় সমান ফল। "আজ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী ঘোষণা করিলেন যে অমুক জিনিসটী আহার করিলে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। আবার কয়েক বৎসর পরে শুনা গেল যে তত্তুল্য উপকারী সামগ্রী কদাচিৎ পাওয়া হয়। এই

দেখুন না, সামান্য বালুকাময় জলশোধকের বালুকা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবার আদেশ শুনিয়াছিলাম ; এক্ষণে, সে মত পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে বালুকা বিলোড়িত না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলা হইতেছে। আজ বলা হইতেছে, অণুজীবগণ (microbes) নানা রোগের নিদান, আবার হয়ত দুই চারিবৎসর পরে শুনিব যে তাহা নহে, রক্তের সহিত কোন প্রকার বিষ মিশ্রিত হয়, তাহাতেই সংক্রামক রোগের উৎপত্তি। ইত্যাদি।”

উপরে যে প্রকার তর্কের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, বোধ হয় তাহার মূল সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। চিরাভ্যস্ত রীতির পরিবর্ত্তনে আলস্য এবং ঔদাসীন্য ব্যতীত ঐ প্রকার তর্কের অপর কোন মূল নাই।—“কে আবার নূতন কূপ নির্ম্মাণ করে, কে আবার জলশোধনের ভাবনায় সময়ক্ষেপ করে ; ভাল মন্দ যা হবার তা হবেই। ইত্যাদি।”

অলস, উদ্যোগ-বিমুখ কার্য্যদ্বেষী ব্যক্তির নিকট তর্কের অভাব নাই। বৃথা তর্ক দ্বারা মনকে শান্ত করিবার প্রয়াসে তাঁহারা যতই কেন আস্ফালন করুন না, প্রকৃতির নিয়ম তাহাতে অণুমাত্রও শিথিল হয় না। পাপের ফল নিশ্চিতই ভুগিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার অবহেলা করিলে যে পাপ হয়, তাহার ফল প্রত্যক্ষ। * ভাল হউক, মন্দ হউক, কথাটা যখন উঠিয়াছে, তাহার একটা উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বড় দুঃখ হয় যে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট মূল তত্ত্বগুলিও তত পরিস্ফুট নহে !

বিজ্ঞানের মূলধন দুইটি,—পরীক্ষা ও পরিদর্শন। ঐ দুই মূলধন প্রয়োগ করিয়া বিচার-শক্তির সাহায্যে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করা যায়। বিজ্ঞানে কেন, শিশুর ও বৃদ্ধের সামান্য জ্ঞানের প্রভেদের কারণ, ঐ মূলধন ব্যবহারের বৈষম্য। বলা বাহুল্য, পরীক্ষা দ্বারা যেরূপ সূক্ষ্ম ও যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়, পরিদর্শনে তদ্রূপ জ্ঞান সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন্ কারণে কোন্ রোগের উৎপত্তি বা কোন্ বিধানে রোগবিশেষের উপশান্তি,— এ সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রধানতঃ পরিদর্শনই একমাত্র উপায়। মানুষ লইয়া পরীক্ষা করা চলে না। সময় বুঝিয়া নানা বিষয়

* এখনও কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন যে ‘কেন আমরা এমন নদীর জল পান করি, অমন কূপের জলের তুল্য সুস্বাদুজল আর নাই, ইত্যাদি।’ কিন্তু নদী তড়াগ সাগর থাকিলেই জল পেয় হয় না, কিম্বা কোন জল মিষ্ট বা স্বচ্ছ হইলেই তাহা নির্দ্দোষ নহে। কোন জল ব্যাধিকর অণুজীবহীন না হইলে তাহা পেয় নহে। কোন্ জল পেয় এবং কোন্ জল অপেয়, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা গিয়াছে।

লক্ষ্য করিয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অধিকাংশ তত্ত্ব অবগত হইতে হয়। এই জন্যই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কখনও জড়বিজ্ঞানের ন্যায় সূক্ষ্ম হইতে পারে না। একটি মনুষ্য-দেহ বলিতে যে শক্তি-সমষ্টি বুঝায়, তাহার ক্রিয়া ও প্রভাব আমাদের সম্যক্ অনধীত। মানুষের “ধাতু” বলিয়া যে একটা অনির্দ্দেশ্য শক্তি আছে,—তাহার স্বরূপ বা ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাত। এই জন্যই একই দ্রব্য ব্যক্তিবিশেষে বিষবৎ কার্য্য করে, অপরের তাহাতে কিছুই হয় না। এই জন্যই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অধিকাংশ উপদেশ কেবল নিষেধার্থক।

কিন্তু তা বলিয়া বর্ত্তমান জ্ঞানের অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিশীল। অর্জ্জিত বর্ত্তমান জ্ঞান লইয়াই আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। এখনকার কোন্ কথাটা ভবিষ্যতে উল্টাইয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা সাংসারিক কাজ করি না। যখন যেমন জ্ঞান বাড়িবে, তখন তেমন কাজ করিতে হইবে। অর্থচেষ্টা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যে এক নিয়ম ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আদেশ পালনে অন্য ব্যবস্থা, এমন ব্যবহার কখনও আদরণীয় নহে।

পানীয় জল শোধন করিয়া পান কর। যেহেতু, শোধন না করিলে রোগ-ভোগের আশঙ্কা। এই সামান্য অথচ অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রতিপালন করিতে এত পরাঙ্মুখ কেন ? অনেকে চাল ডাল প্রভৃতি সামগ্রী কত বাছিয়া কত ধুইয়া রন্ধন করেন। জল সহজে যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়াই কি তাহার প্রতি অনাদর ?

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত কূপ নির্ম্মাণে আর একটি আপত্তি হইয়াছে। সাধ্যমত তাহার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

কথাটা এই।—“নগরবাসিগণের নিমিত্ত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া কূপ বা বিলাতী কলযোগে পানীয় জলের উপায় করা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু দেশের লোক যে অজ্ঞ, তাহারা উহার আবশ্যকতা বুঝেনা। যেখানে সেখানে যে কোন জলপানেই তাহাদের প্রবৃত্তি। তাহারা যে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া নবরচিত কূপ হইতে জল আনিয়া ব্যবহার করিবে, এমন আশা নাই। সুতরাং পেয় জল সংগ্রহের উপায় করা বৃথা।”

এ আপত্তিটা তত অসার নহে। জলের গুণাগুণ সহজে বুঝা যায় না। স্বচ্ছন্দলব্ধ জল ছাড়িয়া বহির্দৃষ্টিতে সেই একই প্রকার জলের নিমিত্ত দশ

পা যাবার কষ্ট করিতে চায় কে? বাস্তবিক, পাত্র বিবেচনা করিলে নিরাশ হইতে হয়।

কিন্তু নিরাশ ও বিষণ্ন হইলে চলিবে কি? যখন তোমার প্রতিবেশীর গৃহ অগ্নিসাৎ হইতে থাকে, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক কি? যখন তোমার পাড়ায় কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হয়, তখন তোমার ভয় হয় নাকি? যাহার দোষে ঘরে আগুন লাগিয়াছিল, তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে ত্রুটি কর কি? কঠিন হৃদয়ে পাড়ার বসন্তরোগীকে দূরে পাঠাইবার মানস হয় না কি? যখন নগরে সমাজবদ্ধ হইয়া ঘন বসতির লাভ আকাঙ্ক্ষা কর, তখন তাহার সঙ্গে কতকগুলি রক্ষণনিয়মও অবশ্য পালনীয়। স্বেচ্ছাচারী হইয়া আমাকে বিপদে বা কষ্টে ফেলিবার অধিকার তোমার নাই। *

এই কয়েকটী কথা আমরা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত অনেক মিউনিসিপালিটীতে দেখা যায়। কমিশনার মহোদয় হয়ত কিঞ্চিৎ করুণহৃদয়। স্থূল দৃষ্টিতে করুণা প্রকাশ করিতে গিয়া ঘোর অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া ফেলেন।

আর এক কথা।—কোন্ জল পেয়, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া না দিলে, তাহারা তদনুসারে কাজ করিবে কেন? তাহাদিগকে শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের পদানুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা আবশ্যক। আবার, যাচনা থাকিলে সঞ্চয় আবশ্যক, নতুবা নহে;—এ বাক্য সকল স্থলে প্রযোজ্য নহে। লোকশিক্ষার নিমিত্ত সঞ্চয় যাচনার পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। সামান্য সামান্য মূল তত্ত্ব লইয়াই গোলযোগ। যাহা হউক, কি প্রকার পরীক্ষা বা পরিদর্শন দ্বারা বালুকাময় জলশোধকের উপযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহার কয়েকটি বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে মনে করা যাইত যে, জলমধ্যে ভাসমান কর্দ্দমাদি দূর করিয়া জল স্বচ্ছ করাই বালুকাময় শোধকের উদ্দেশ্য। এক্ষণে অণুজীব-বিদ্যার সাহায্যে জানা যায় যে, তদ্দ্বারা ব্যাধিকর অণুজীব দূরীভূত করাই বালুকাস্তরের উদ্দেশ্য। সুতরাং যে বালুকাময় শোধক দ্বারা এ কার্য্য সুচারুরূপে

* আবশ্যক হইলে বঙ্গদেশের মিউনিসিপাল আইনের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। See Sections 199 A and 200 of the amended Municipal act of 1894, and also paras 23 and 24 of the explanatory circular issued by the Bengal Govt.

সম্পন্ন না হয়, তাহার ব্যবহারে তাদৃশ উপকার নাই বালুকাময় শোধকের কার্য্যক্ষমতা স্থির করিতে হইলে পূর্ব্বে এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা হইত। জলের সহিত অঙ্গার বা নীলরঙ্গ চূর্ণ মিশাইয়া শোধকে সেই জল ক্ষরিত করা হইত। তাহা দিয়া বর্ণহীন স্বচ্ছ জল নির্গত হইলে শোধক উত্তম বলিয়া গণ্য হইত। বস্তুতঃ যে শোধকের মধ্যস্থিত রন্ধ্রগুলি যত ক্ষুদ্র হইত, তাহাই তত উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যাইত। ফলতঃ স্বচ্ছ জল পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে সূক্ষ্মরন্ধ্রবিশিষ্ট শোধকই ব্যবহার্য্য।

কিন্তু সূক্ষ্ম রন্ধ্র দ্বারা জলে অবলম্বিত কর্দ্দমকণিকা প্রতিরুদ্ধ হইলেও, তদ্দ্বারা সূক্ষ্মতর অণুজীবগণ আবদ্ধ হয় না। সুতরাং যদ্দ্বারা অণুজীবগণ প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তদ্রূপ শোধকের প্রয়োজন। কোন শোধক কার্য্যক্ষম কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা উচিত, শোধকে ঢালিবার পূর্ব্বে জলে কতগুলি অণুজীব থাকে, এবং তদ্দ্বারা ক্ষরিত হইবার পরেই বা কত থাকে। যে শোধক দিয়া যত অল্পসংখ্যক অণুজীব নির্গত হয়, তাহাই তত উৎকৃষ্ট।

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যত পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, একটিও অণুজীব যাইতে পারিবে না এমন শোধক নির্ম্মাণ করা দুরূহ ও অসম্ভব। অণুজীব সংখ্যার হ্রাস ব্যতীত উহা দ্বারা সমুদায় দূরীভূত করিতে পারা যায় না। যে সে প্রকার শোধকেই অল্প বা অধিক অণুজীব হ্রাস করা সহজ।

কয়েক বৎসর ধরিয়া আমেরিকায় সামান্য বালুকাময় শোধকের কার্য্যকারিতা পরীক্ষিত হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় জানা যায় যে—বালুকাময় শোধক এমনভাবে নির্ম্মিত হইতে পারে যে, তাহাতে শতকরা ৯৯.৫টি অণুজীব দূরীভূত করিতে পারা যায়। যে বালুকার পৃষ্ঠদেশ প্রায় তিন বিঘা, তদ্দ্বারা আড়াই লক্ষ মণ জল ক্ষরিত করিয়া ঐ ফল পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বালুকার পৃষ্ঠফল এক বর্গফুট ধরিলে প্রায় ৫।৬ মণ জল নির্গত করা হইয়াছিল।*

বালুকাশোধকের কার্য্যকারিতা বুঝিতে হইলে দুইটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার করা আবশ্যক। (১) বালুকা-স্তরের গভীরতা এবং (২) জল

* এই প্রবন্ধের কয়েকটি কথা গত এপ্রিল মাসের Knowledge নামক পত্রিকা হইতে গৃহীত।

নির্গমের বেগ। অবশ্য, দুই চারি অঙ্গুলি স্থূল বালুকাস্তর দিয়া জল ক্ষরিত হইলে যত অণুজীব প্রতিরুদ্ধ হইবে, আরও স্থূল স্তর দিয়া তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক অণুজীব আবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বালুকাস্তর যত স্থূল হউক না, দ্রুতবেগে জল নির্গত হইলে যত অণুজীব বহির্গত হইবে, মন্দবেগে হইলে তদপেক্ষা অল্প অণুজীব জলের সহিত চলিয়া আসিবে।

অণুজীবগণ সূক্ষ্ম বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যে শোধকের বালুকা যত সূক্ষ্ম হইবে, তাহাই তত কার্য্যকারী। কিন্তু এ বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পরীক্ষার নিমিত্ত কোন জলের সহিত এক প্রকার অণুজীব মিশ্রিত করা হইয়াছিল। ঐ অণুজীব অনেক বিষয়ে টাইফইড রোগের অণুজীবের সদৃশ। শোধকে এত মোটা বালুকা ব্যবহৃত হইয়াছিল যে, তাহার শতটি পাশাপাশি রাখিলে এক ইঞ্চ বিস্তৃত হয়। এরূপ বালুকার ৬০ ইঞ্চ গভীর স্তর দিয়া ঐ অণুজীব মিশ্রিত জল ক্ষরিত করা হইয়াছিল। ক্ষরিত জলে দেখা গেল যে শতকরা ৯৮টি জলের সামান্য অণুজীব এবং ৯৯.৫টি উক্ত মিশ্রিত অণুজীব দূরীভূত হইয়াছে। বালুকাস্তরের ক্ষেত্রফল তিন বিঘা এবং ২৪ ঘণ্টায় লক্ষাধিক মণ জল নির্গত হইয়াছিল। অর্থাৎ বালুকার পৃষ্ঠফল এক বর্গফুট ধরিলে ৬০ ইঞ্চ গভীর বালুকা-স্তর দিয়া প্রায় ২৬ মণ জল নির্গত করা হইয়াছিল।

এই প্রকার পরীক্ষায় যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা আমেরিকার মাসাচিউ-সেটস্ প্রদেশের লরেন্স নগরের জল সংগ্রহে প্রযুক্ত হইয়াছে। যে নদীর জল ঐ নগরবাসিগণ ব্যবহার করিত, উহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের মল তাহার সহিত মিশ্রিত হইত। প্রতি বর্ষে টাইফইড রোগে লরেন্স নগরে অনেক লোক মারা পড়িত। সেই নদীর উপর দিকে লাওয়েল নামক একটি নগর আছে। প্রতি বর্ষে লাওয়েল নগরে টাইফইড রোগের মড়কের পর লরেন্স নগরে উক্ত রোগ আবির্ভূত হইত। মলদূষিত জল পান করিয়াই যে লরেন্সবাসিগণের রোগভোগ ঘটিত, তাহা এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায়। প্রায় এক বৎসর হইল লরেন্স নগরে বালুকাময় শোধক স্থাপিত হইয়াছে। তদবধি নগরের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে খৃঃ ১৮৯২ অব্দের হামবর্গ নগরের ওলাউঠা মড়কের বিষয় লিখিত হইয়াছে। অণুজীববিদ্ অধ্যাপক কোক সাহেব (Dr. Koch)

প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এল্‌ব নদীর অশোধিত জল পান করাতে হামবর্গ নগরে ওলাউঠার প্রকোপ ঘটে।* তাহার পর তথায় বালুকাশোধিত জল পানের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিদিন নগরে যত জল আবশ্যক হয়, তাহা নদী হইতে তুলিয়া প্রকাণ্ড পুষ্করিণীতে একদিন রাখা হয়। পরদিন সেই জল বালুকাশোধকের উপরে গিয়া পড়ে। প্রথমে সিকি ইঞ্চ গভীর ছোট ছোট পাষাণ খণ্ড, তদুপরি মোটা বালির আট ইঞ্চ পুরু স্তর, তাহার উপরে প্রায় তিন ফুট সরু বালি আছে। এইরূপে তথায় বালুকাময় শোধক নির্ম্মিত হইয়াছে। জল নির্গমের বেগ সর্ব্বদা সমান রাখিবার অভিপ্রায়ে বালির উপর তিন ফুটের অধিক জল এককালে আসিতে দেওয়া হয় না। তদবধি আরও কয়েকটি নগরে বালুকাময় শোধক স্থাপিত হইয়াছে।

কয়েক ফুট বালুকা ভেদ করিয়া জল নিঃসৃত হইলে কিরূপে তদ্দ্বারা অণুজীব ধ্বংস হয়, তাহার প্রকৃত কারণ সম্যক্ অবগত হওয়া যায় নাই। পূর্ব্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, সদ্যোনির্ম্মিত বালুকাময় শোধক তত ফলোপ-ধায়ক নহে। জলক্ষরণবশতঃ বালুকার উপরে যে একপ্রকার পিচ্ছিল কর্দ্দম পতিত হয়, এই পঙ্কই জল শোধনের কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু পঙ্ক দ্বারাই বা অণুজীব ধ্বংস কিরূপে সম্ভবে? অনুবীক্ষণ সাহায্যে উক্ত পঙ্ক পরীক্ষা করিলে তাহাতে অসংখ্য অণুজীব বাস করিতে দেখা যায়। বোধ হয় উহারা বায়ুর অম্লজনক গ্যাসের (oxygen) সাহায্যে

---

* হুগলির অন্তর্গত জাহানাবাদে গত বৎসর বর্ষাকালে হঠাৎ ওলাউঠা দেখা দেয়। জাহানাবাদের অনেক লোক তথাকার দ্বারকেশ্বর নদীর জল ব্যবহার করে। ক্রমে প্রকাশ হইল যে, তাহার কয়েক ক্রোশ উপরে একখান গণ্ডগ্রামের কয়েকটা ওলাউঠা রোগী ঐ জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জাহানাবাদের নীচেও কয়েকটা গ্রামের লোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়। ঐ ঐ গ্রামের যে সকল পরিবার ঐ নদীর জল ব্যবহার করিত, তাহাদেরই ঘরে নাকি ওলাউঠা দেখা দেয়। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, জাহানাবাদ অঞ্চলে ওলাউঠা ক্বচিৎ দেখা যায়। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত আয়েনপুর থানার মধ্যে বাউশখালি, রাজনগর, বল্লভদি প্রভৃতি গ্রাম সকল কুমার নদীর দুই পার্শ্বে অবস্থিত। সম্প্রতি ঐ নদীতীরবর্ত্তী প্রায় ২০।২৫টি গ্রামে ওলাউঠা রোগে অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। ঐ সকল গ্রামের অধিবাসিগণ ঐ নদীর জল পান করিয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত নদীর আদৌ স্রোত নাই এবং উহাতে এত জৈবপদার্থ মিশ্রিত হইয়াছে যে, জলের উপরিভাগে সবুজবর্ণের একটা সর সর্ব্বদা ভাসিয়া রহিয়াছে। এরূপ স্থলে যে ঐ ঐ গ্রামে বহুলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে!

জলের জৈব পদার্থকে অজৈব পদার্থে পরিণত করে। সাধারণতঃ জলে যথেষ্ট অম্লজনক মিশ্রিত থাকে, তদ্ভিন্ন বায়ু হইতেও অম্লজনক প্রাপ্ত হয়। জৈব পদার্থ না পাইলে অণুজীব বাঁচিতে পারে না ; কেন না উহাই তাহাদের আহার। এজন্য বোধ হয় আহারাভাবে অণুজীবগুলি মরিয়া যায়। এমনও হইতে পারে পঙ্কস্থিত অণুজীবগণ এমন কোন দ্রব্যবিশেষ উৎপাদন করে, যাহা অপর অণুজীবের পক্ষে বিষবৎ কার্য্য করে।

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, অণুজীব ধ্বংসের সহিত পঙ্কের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কেন না ঐ পঙ্ক চাঁচিয়া ফেলিলে, শোধক পূর্ব্ববৎ তত অণুজীব দূরীভূত করে না। এজন্য ঐ পতিত পঙ্কস্তর যাহাতে বিলোড়িত না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বালুকার উপরে কিম্বা ভিতরে কোন ফাঁক বা ছিদ্র রাখাও কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু, সেই ছিদ্র দিয়া অবিশোধিত হইয়াই জল নিঃসৃত হইবে।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে বালুকা-শোধক পরিষ্কার করাও কর্ত্তব্য। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য। (১) বহুকাল ব্যবহারে বালুকার উপরে সঞ্চিত পঙ্ক ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া বালুকার ভিতরে প্রবেশ করে। (২) ঐ পঙ্ক বালুকার উপরে এমন জমাট বাঁধে যে তদ্দ্বারা জল নিঃসরণ নিতান্ত মৃদু হইয়া পড়ে।

অল্প গভীর কূপজল পরিত্যাজ্য। কেন পরিত্যাজ্য তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। গভীর কূপ খনন করিয়া যাহাতে নিম্নস্তরের জল সংগৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই শ্রেয়স্কর। এই স্বাভাবিক উপায়ে বিশোধিত জল নানাস্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। কৃত্রিম জলশোধক অপেক্ষা এই স্বাভাবিক জলশোধককে বঙ্গীয় স্বাস্থ্যরক্ষক সমিতি অধিক উপযোগী বলিতেছেন।*

যেখানে এরূপ কূপ জলের অভাব, সেখানে নিত্য ব্যবহার্য্য জল বালুকা-পূর্ণ কলস বা হাঁড়ির ভিতর দিয়া ক্ষরিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বেশী মূল্য দিয়া বিলাতী জল-শোধক ক্রয় না করিলে অনেকের সন্দেহ যায় না। বাস্তবিক, সামান্য বালুকাপূর্ণ হাঁড়ি দিয়া এত সহজে পানীয় জল বিশুদ্ধ হইতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না। অনায়াসলব্ধ সামান্য ঔষধের পরিবর্ত্তে যেমন মূল্যবান্ ঔষধের প্রতি কাহারও কাহারও প্রগাঢ় ভক্তি দেখা যায়, তেমনই মূল্যবান্ জলশোধকের প্রতি তাঁহাদের অটল বিশ্বাস।

* Sanitary Board's circular No. 11 dated the 15th. Nov. 1894.

ডাঃ কোক প্রভৃতি অনেকে বাজারের নানাবিধ কৃত্রিম জলশোধক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যোপযোগী থাকে, এমন কোন ক্ষুদ্র জল-শোধক নাই। ডাঃ কোক বলেন স্বাভাবিক মৃত্তিকা-বালুকা-স্তর দিয়া ক্ষরিত জল পানই শ্রেয়স্কর।

যাহা হউক, গভীর কূপজল দুষ্প্রাপ্য হইলে, গৃহে বালুকাময় শোধক দ্বারা জল শোধন করা কর্ত্তব্য। উপরি বর্ণিত পরীক্ষাগুলির ফল অবলম্বন করিয়া সামান্য বালুকাময় শোধক নির্ম্মাণের প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

জলের অণুজীব ধ্বংসের নিমিত্ত কয়লার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু অনেকে যেরূপে শোধকে কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে বরং অহিত হইবার সম্ভাবনা। চুল্লীর সদ্য কয়লা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহা সাবধানে ধৌত করা কর্ত্তব্য। নতুবা পাংশুক্ষার যোগে পানীয় জল অনর্থক বিস্বাদ করা হয়।

প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে প্রতিদিবস কত মণ জল আবশ্যক। জল-শোধকের আকার এতদনুসারে করিতে হইবে। মনে কর, প্রতিদিন ৫।৬ মণ জল আবশ্যক। এজন্য বালুকা-স্তর অন্ততঃ এক ফুট গভীর ও এক বর্গ ফুট বিস্তৃত হওয়া চাই। জল ক্ষরণের বেগ এমন হইবে যেন সমস্ত দিবা-রাত্রিতে ৬ মণের বেশী জল ক্ষরিত না হয়। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ৯।১০ সের জলের অধিক ক্ষরিত হইতে দিবে না।*

ঐ নিয়মটি স্মরণ রাখিয়া আপনার ইচ্ছামত বালুকাময় জলশোধক নির্ম্মাণ করিতে পার। কলসীর উপর কলসী রাখিয়া কিরূপে জলশোধক নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। উপরি উপরি তিনটী কলসী বা হাঁড়ি বসিতে পারে, কাঠের বা বাঁশের এমন একটা ফ্রেম আবশ্যক। যে জল শোধিত করিবার আবশ্যক, সকলের উপরের হাঁড়িতে তাহা রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়টির তলায় ধৌত অঙ্গার, শিলা, বা ইট খণ্ড, তাহার উপরে গলার নিম্ন পর্য্যন্ত সুপরিষ্কৃত ও ধৌত বালুকা রাখিয়া হাঁড়িটি পূর্ণ করিবে। উহাই বালুকাময় শোধক। নীচের তৃতীয় হাঁড়িটিতে বালুকা-ক্ষরিত জল, ব্যবহারের নিমিত্ত সঞ্চিত হইবে। অবশ্য, জল ও বালুকাপূর্ণ হাঁড়ি দুইটির তলায় ছিদ্র থাকিবে। ঐ ছিদ্র দিয়া ফোঁটা ফোঁটা আকারে জল পতিত হইতে থাকিবে।

* See Bengal Sanitary Board's circular.

হাঁড়ির আকার ক্ষুদ্র হইলে একটির পরিবর্ত্তে দুইটি হাঁড়ি বালুকাপূর্ণ করা কর্ত্তব্য। হাঁড়ি রাখিবার ফ্রেমটি ৩ হাত উচ্চ হইলেই চলিবে। ছিদ্রের আকার বড় হইয়া পড়িলে, অনেকে তুলার বা বস্ত্রের পলিতা পরাইয়া ছিদ্রমুখ ক্ষুদ্র করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ করিলে কয়েক দিবস পরে পলিতা পচিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে একটা লৌহ প্রেক ছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে পুনঃ পুনঃ পলিতা পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। যাহা হউক, উদ্দেশ্য বুঝিলে নানা উপায়ে জলনির্গমবেগ খর্ব্ব করা যাইতে পারে। কাঠের ফ্রেমের অভাবে মোটা দড়ির শিকায় কলসী ঝুলাইলেও কার্য্য চলিতে পারে।

কোন কোন স্থানে কূপ খনন করিবার সুবিধা নাই, কিম্বা কূপ খনন করিলেও উত্তম জল পাওয়া যায় না। তথায় নদীর বা বৃহৎ পুষ্করিণীর জল বালুকাময় শোধক দ্বারা নির্দ্দোষ করিয়া লওয়াই একমাত্র সহজ উপায়। বর্ষাকালে অনেক স্থানেই ওলাউঠা আমাশয় প্রভৃতি উদরপীড়া জন্মিয়া থাকে। ব্যবহার্য্য জল সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের যে উপদেশ প্রকটিত করা হইল, তখন তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাল্য সখী।

সায়াহ্ন সময় বকুলের মূলে
খেলে পল্লী শিশুদল।
কলহ চীৎকার আনন্দের ধ্বনি,
পূর্ণ করে নভস্তল ॥

নব কিসলয় সুচারু ভূষণে
শোভা পায় তরুবর।
পল্লব মাঝারে বসি পিক তাহে,
তুলে কুহু কুহু স্বর ॥

সন্ধ্যা সমীরণ বহি ধীরে ধীরে,
কাঁপায় বিটপ কুল।
নীরবে খসিয়া, পড়িছে ভূতলে
রজত-কণিকা ফুল ॥

সচল কুসুম শিশুগণ কত
তরুমূলে করে খেলা।
আঁচল ভরিয়া কেহ আনে ফুল,
কোন জন গাঁথে মালা ॥

পিক-কুহুরবে মিলাইয়ে স্বর,
কেহ কুহু কুহু করে।
যতন করিয়া গাঁথি ফুলহার,
কেহ নিজ গলে পরে ॥

কত উচ্চ হাসি, কত করতালি,
কত আনন্দের গীত।
স্বরগ শোভায় পূর্ণ করি ধরা,
হয় সেথা উথলিত ॥

ক্রমে দিবা শেষ, লোহিত বরণ
অস্তাচলে ডুবে রবি।
শঙ্খ ঘণ্টারব উঠে চারিদিকে,
ম্লান হয় বন ছবি ॥

সাঙ্গ করি খেলা শিশুগণ যত,
নিজ নিজ ঘরে চলে।
বালক বালিকা দুইটী কেবল
রহে বসি তরুতলে॥

দ্বাদশ বরষ বালকের বয়ঃ,
বালিকা নবম গত।
সুঠাম সুন্দর মূরতি দোঁহার,
যেন দেবশিশুমত ॥

সরলতা মাখা সুচারু বদন,
অধরে ফুটেছে হাসি।
প্রফুল্ল কমলে শোভিতেছে যেন
প্রভাত কিরণ রাশি ॥

কুড়াইয়া ফুল আনিছে বালক;
একমনে বসি বালা,
যতন করিয়া সুকোমল করে
গাঁথিছে বকুলমালা ॥

আকুল কুন্তল ঢাকি গ্রীবা দেশ,
পড়িয়াছে পৃষ্ঠ পরে।
দ্বিগুণ শোভায় শোভিছে বদন,
নবোদিত শশিকরে ॥

মুগধ বালক নিরখি সে শোভা,
হেরে অনিমেষ হয়ে।
কি উচ্ছ্বাস যেন বালকের প্রাণে
উঠে, মুখ পানে চেয়ে ॥

গাঁথা হ'ল মালা, হাসিয়া বালক,
ধরি বালিকার কর,
কহিলা, "কুমুদ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে,
চল দোঁহে যাই ঘর॥

গাঁথিয়াছি মালা এই লও তুমি",
এত বলি স্নেহ ভরে।
লয়ে কণ্ঠহার, বালিকার গলে
পরাইল সমাদরে ॥

হাসিল বালিকা, নিজ কণ্ঠমালা
দিলা বালকের গলে।
হাতে হাত ধরি, হরষিত মনে
দোঁহে গৃহ পানে চলে ॥

২

দ্বাদশ বরষ গিয়াছে চলিয়া,
কোথা হায় সেই দিন।
কি যেন ব্যথায় অভাগী কুমুদ,
হইতেছে ক্রমে ক্ষীণ ॥

বাল্য সাথী তার নরেন্দ্র এখন
গেছে চলি কোন দেশে।
ভগ্ন বক্ষ লয়ে কাঁদে অভাগিনী,
বিশুষ্ক মলিন বেশে ॥

কুলীন কুমারী এখনও অনূঢ়া,
কেহ নাই ত্রিসংসারে।
হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে চাপিয়া,
ভাসে বালা অশ্রুধারে ॥

জনকের সনে নাহি দেখা কভু,
জননী শৈশবে মৃত।
পরগৃহ মাঝে দাসীপনা করি,
অভাগীর দিন গত ॥

শৈশবে তাহারে বাসিত যে ভাল,
সেও দূরে গেছে চলি।
বারতা তাহার না জিজ্ঞাসে কভু,
নিজে আছে সুখে ভুলি ॥

ভুলেছে নরেন্দ্র, কিন্তু অভাগিনী
ভুলিতে না পারে তায়।
ত্রিজগৎ যেন অভাগীর চোকে
তার(ই) ছবি মাখা হায় ॥

দ্বাদশ বরষ গেল একে একে,
তবু আশা পথ চেয়ে।
আজ(ও) অভাগিনী রয়েছে বাঁচিয়া,
নরেন্দ্রের নাম লয়ে ॥

নাহি গন্ধ লেশ, গিয়াছে শুকায়ে
সেই বকুলের মালা।
তবুও যতনে, হৃদয়ে তুলিয়া,
এখনও রেখেছে বালা ॥

সেই পথ, ঘাট, সেই তরু লতা
সেই বন, উপবন।
রয়েছে তেমনই, অভাগিনী শুধু
করে অশ্রু বিসর্জ্জন ॥

ফুরাইলে বেলা, শূন্য কুম্ভলয়ে,
যায় বালা নদীকূলে।
মনে পড়ে তার শৈশবের কথা,
ভাসে বুক অশ্রুজলে ॥

যে বকুল মূলে নরেন্দ্রের সনে
গেঁথেছিল ফুল হার।
হেরিলে সে তরু ফেটে যায় বুক,
ঝরে তপ্ত অশ্রুধার ॥

প্রতিবাসী কেহ নরেন্দ্রের নাম
যদি কোন দিন করে।
চাহি জিজ্ঞাসিতে ফোটেনা বচন,
অভাগিনী লাজে মরে ॥

উদাসীন ভব দুখিনীর দুখে,
বারেক না ফিরি চায়।

কাননের ফুল কাননে ফুটিয়া,
যেন গো ঝরিয়া যায় ॥

৩

রাজপথ পাশে উঠেছে প্রাসাদ,
কিবা শোভা মনোহর।
বিচিত্র সজ্জায় শোভিত ভবন,
নরেন্দ্রের বাসঘর।
আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠে গৃহ হ'তে,
মধুর বাদিত্র বাজে।
কুসুম স্তবকে, বসনে, ভূষণে,
শোভে পুরী চারু সাজে ॥
বালক নরেন্দ্র যুবক এখন,
ধনে, মানে, বিভূষিত।
পত্নী, পুত্রলয়ে সে পুরীর মাঝে,
বাস করে হরষিত ॥
প্রবেশি সংসারে ভুলেছে নরেন্দ্র
শৈশবের ধূলি খেলা।
কে রাখে স্মরণে কোন্ বালিকায়,
কবে পরাইল মালা ॥
জগৎ এখন কর্ম্মক্ষেত্র তার,
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা।
সে কেন স্মরণে রাখিবে গো বল,
বালিকার ভালবাসা ॥
ধনে, মানে, জ্ঞানে, ভূষিত যে জন,
খ্যাতি যার দেশময়।
স্বপন সমান শৈশবের প্রেম
তার কিগো মনে রয় ॥
প্রকোষ্ঠ মাঝারে হরষে নরেন্দ্র
করে সুখ আলাপন।
দ্বার দেশে তার আছে দাঁড়াইয়া
কাঙালিনী একজন ॥
দূর পল্লী হ'তে এসেছে দুখিনী
লয়ে নরেন্দ্রের নাম।
একবার শুধু দেখিবে তাহারে,
এই তার মনস্কাম ॥
মলিন বসন অঙ্গে পরিধান,
শিরে রুক্ষ কেশভার।
পথশ্রমে তনু অবসন্ন প্রায়
নাহি শক্তি দাঁড়াবার ॥
যৌবনের কান্তি না ফুটিতে দেহে
অকালে ধরেছে জরা।
জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কালিমা নয়নে
জিয়স্তে যেন গো মরা ॥
বিনয়ে দুখিনী কহে দ্বারপালে
"প্রভু পাশে তব যাও।
কাঙালিনী এক ডাকিছে তাঁহারে,
এ সংবাদ গিয়া দাও।।"
গর্ব্বিত বচনে কহে দ্বারপাল,
"বলিতে না হয় লাজ।
তোর কথা শুনি প্রভুরে আমার
ডাকিব এখানে আজ ॥"
কাঁদে অভাগিনী, হেরি দ্বারপাল
নরেন্দ্রের কাছে যায়।
কহে, "নারী এক দ্বারে দাঁড়াইয়া,
প্রভুরে দেখিতে চায় ॥"
কৌতুকী নরেন্দ্র গবাক্ষ হইতে
চাহি দেখে নিজ দ্বারে।
অভাগীর সনে মিলিল নয়ন,
কিন্তু চিনিবারে নারে ॥
অনিমেষ হয়ে নরেন্দ্রের পানে
চাহি রহে কাঙালিনী।
দুই গণ্ড দিয়া বহে অশ্রু ধারা,
বদনে না সরে বাণী ॥
বিস্মিত নরেন্দ্র, না পারে বুঝিতে
কি বেদনা প্রাণে তার।
ভাবে মোরে হেরি, কেন অভাগিনী
ফেলে এত অশ্রুধার ॥
ডাকি নিজ জনে কহিলা নরেন্দ্র,
"কেবা আছ, হোথা যাও।
কে ওই রমণী এস জিজ্ঞাসিয়া,
ভিক্ষা যদি চাহে, দাও ॥"
দুখিনীর কাণে পশিল সে কথা,
না পারি সহিতে আর।
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল অভাগী
দ্বার দেশে শবাকার ॥
ত্রস্ত ব্যস্ত হ'য়ে ছুটিলা নরেন্দ্র,
বাঁচাইতে রমণীরে।
দেখে অভাগীর স্পন্দ নাই বুকে,
শ্বাস মাত্র বহে ধীরে ॥
হেরি ক্ষণ কাল চমকি নরেন্দ্র,
রমণীরে তুলে কোলে।
পরশি সে তনু কণ্টকিত দেহ
অভাগিনী আঁখি মিলে ॥

মুহূর্ত্তেক তরে চাহি মুখ পানে
নয়ন মুদিলা বালা।
কণ্ঠ হ'তে তার পড়িল খসিয়া
বিশুষ্ক বকুল-মালা ॥

২৯এ মার্চ্চ, ১৮৯৫। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু। বৈদ্যনাথ।

জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দ।

১। গত জানুআরি মাসের "দাসী"তে "লাভেরিয়ে" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ উপভোগ করিলাম। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তকের অত্যন্ত অপ্রতুল; ইহার কারণ বোধ হয়, আমাদের সমাজে বিজ্ঞান অনুরাগী লোকের সংখ্যা কম এবং লেখকও কম। যদিও কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের অভাব প্রযুক্ত এবম্বিধ প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্তি ও শক্তি সত্ত্বেও পরাঙ্মুখ হন।

লাভেরিয়ে প্রবন্ধটি অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। জ্যোতিষ, গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ক এরূপ প্রস্তাব লিখিত হইলে, পাঠকসাধারণের পক্ষে, পরম উপকার দর্শে, এবং বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন হয়। প্রবন্ধের অন্তর্গত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি।

২। অর্থানুবাদ (Translation) এবং বর্ণানুবাদ (Transliteration), ভাষান্তর করিবার এই দুই মাত্র উপায়; কিন্তু ইউরোপীয় ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় আনিতে হইলে অনেক স্থলে স্বরানুবাদ (Transphonation) অবলম্বন করিতে হয়; ইংরাজীতে "Transphonation" বলিয়া কোন কথা আছে কিনা, বা হইতে পারে কিনা, বলিতে পারি না। Le Verrier কথাটি ফরাশী ব্যক্তিবিশেষের নাম; ফরাশী ভাষায় শব্দের অন্তস্থিত অনেক ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না। অতএব উক্ত ফরাশি কথাটি আমাদের ভাষায় লিখিতে হইলে, অন্তেস্থিত r (র)এর উচ্চারণ ছাড়িয়া এবং স্বরানুবাদের রীত্যনুসারে vকে অন্তঃস্থ ব করিয়া লে বেরিয়ে করিতে হয়; কিন্তু আমাদের ওষ্ঠ্য ও অন্তঃস্থ ব এর আকার ও উচ্চারণের ভেদ নাই; সুতরাং v ও b এক ব দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়; এই কারণ বশতঃ অনেকেই vকে ভ=bh করেন। অতএব ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অনুসারে অন্তঃস্থ ব এর পেটে কএটি শূন্য দিয়া কিম্বা পেট কাটিয়া (ৰ) ওষ্ঠ্য ব হইতে প্রভেদ করিলে ভাল

হয় ; নচেৎ বিক্‌টোরিয়া, বর্জিনিয়া, বিক্‌টর, বা ভিক্‌টোরিয়া, ভর্জিনিয়া, ভিক্‌টর ইত্যাদি শব্দ শুনিতে ভাল লাগে না। এখন আর ব এর পেট কাটিয়া র করিবার রীতি নাই ; অতএব এখন ব এর পেট কাটিলে আর র বলিয়া ভুল হইতে পারিবে না।

৩। "সৌরমণ্ডলের আলোচনার প্রবেশ দ্বারেই আমরা দেখিতে পাই, একটি প্রকাণ্ড দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া অপর কতকগুলির স্থিতিগতি নির্দ্ধারণ করিতেছে।" এই বাক্যটিতে সৌরমণ্ডল কথাটি যে solar system এর স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ("আলোচনার প্রবেশ দ্বার" threshold of enquiry, এ কথায় এখন আমার দরকার নাই)। কিন্তু সৌরমণ্ডল বলিলে আমরা রবিবিম্ব-ভিন্ন আর কিছু কি বুঝি ? Solar system বলিলে রবিচন্দ্র পঞ্চ বা সপ্ত তারা-গ্রহ এবং ধূমকেতু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান যে জ্যোতিষ্কগণ দেখিতে পাই, তাহাই বুঝিয়া থাকি এবং বহুবর্ষাবধি বহু পুস্তকে solar systemএর স্থানে সৌরজগৎ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে সৌরমণ্ডল ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। সৌরমণ্ডল, ভূমণ্ডল, মুখমণ্ডল বলিলে যথাক্রমে রবিবিম্ব, ভূগোল এবং মুখ মাত্রেই বুঝায়। সৌরমণ্ডল বলিলে সজ্যোতিষ্কগণ সূর্য্য বুঝায় না ; অতএব solar system এর স্থলে সৌরজগৎ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়। "এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশি জগৎপতে" এই মন্ত্রে সূর্য্য জগৎপতি দেখিতেছি, অতএব যে জগতের পতি সূর্য্য, সেই সৌরজগৎ solar system।

৪। ইংরাজী force কথার স্থানে বাঙ্গালা শক্তি দেখিতেছি, কিন্তু force এর স্থানে "বল" কথা অনেকে অনেক দিন অবধি ব্যবহার করিতেছেন, এখন কি বলে "বল"কে বেদখল করিয়া স্বত্ব-হীন শক্তিকে বলের স্বত্বে স্বত্ববতী করিবেন ? অতএব force এর বাঙ্গালা "বল" থাকিলে ক্ষতি কি ? বল আর শক্তিতে ভেদ নাই বটে, তথাপি পারিভাষিকত্ব রক্ষার জন্য এক শব্দ এক অর্থেই ব্যবহার্য্য।

৫। Planetary perturbationএর বা disturbanceএর তরজমা ভ্রষ্টতা করিয়াছেন, কিন্তু ভ্রষ্টতা শব্দে কি perturbationএর ভাব আসে ভ্রষ্টের ভাব ভ্রষ্টতা ; ভ্রষ্ট শব্দ ভ্রন্‌স (পতন fall) ধাতু নিষ্পন্ন। এতদ্বারা প্রায় কেবল অধঃপতনই বুঝায়। কিন্তু perturbation তো কেবল অধঃ-

পতন নয়। perturbation স্থানচ্যুতি অর্থাৎ মন্দ বা শীঘ্র ফল দ্বারায় গ্রহের গণিতাগত স্থান এবং বেধলব্ধ স্থান এতদুভয়ের যে অন্তর তাহাই perturbation। perturbation জনিত বেধলব্ধ গ্রহ, গণিতাগত গ্রহের অগ্রে বা পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধে বা অধঃ, দক্ষিণে বা বামে, যে কোন দিকে থাকিতে পারে। তবেই ভ্রষ্টতা দ্বারা এরূপ অবস্থানের ভাব আসে না ; অতএব সবিনয়ে নিবেদন যে বিক্ষোভ কথাটী খাটে কি না একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। বিক্ষোভ বি+ক্ষুভ্‌ অর্থ চঞ্চলনে to agitate। বিক্ষোভ perturbation, বিক্ষুভিত perturbed, বিক্ষোভক perturber বা perturbing.

৬। সূর্য্য, চন্দ্র এবং গ্রহগণ আমাদের উপাস্য দেবতা। সূর্য্য বা কোন গ্রহ বাক্য মধ্যে থাকিলে মর্য্যদাব্যঞ্জক বিভক্তি ব্যবহার কি কর্ত্তব্য নহে ? "অর্থাৎ যদি সূর্য্যই একমাত্র নিয়ন্তা হইত" না বলিয়া "হইতেন" বলিলে ভাল হয় না ? তত্ত্বতঃ যদি সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা না হন, কেবল জড়পিণ্ড মাত্র, তাহা হইলেও মর্য্যাদাব্যঞ্জক বিভক্তি ব্যবহার করায় কি কোন দোষ দৃষ্ট হয় ? ইংরাজী ব্যাকরণে অপ্রাণিবাচক শব্দমাত্রেই ক্লীবলিঙ্গ ; তথাপি সূর্য্যের বেলা প্রায়ই he এবং চন্দ্রের বেলা she ব্যবহৃত হয়, অথচ সূর্য্য পুরুষ নন, চন্দ্রও স্ত্রী নন। তাই বলি রবি-চন্দ্রকে দেবতা বলিয়া মানুন আর না মানুন, তাঁহাদের প্রসঙ্গে কথা কহিবার সময় একটু ভক্তিভাব দেখাইলে দোষ কি ? এ পরিচ্ছেদে পারিভাষিক শব্দ নাই, অতএব ইহা আমার প্রতিজ্ঞাত আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া ব্যামৃষ্ট হইতে পারে।

৭। Uranusকে ইন্দ্র বলা হইয়াছে; সুদত্ত নামধেয় ; ইউরোপীয়েরাও এই অর্থে ইউরেনস নাম রাখিয়াছেন ; কিন্তু এই নব আবিষ্কৃত গ্রহের নাম লইয়া ইউরোপে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি নানা সময়ে নানা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইঁহাকে (foot noteএ) টিপ্পনীতে চুপি চুপি ইন্দ্র বলিয়া যাওয়া কি উচিত হইয়াছে ? এখন যে নাম রাখিবেন, তাহাই রহিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নাম রাখিলেই ভাল হয় ; নচেৎ এখনকার ছেলে মেয়েদের মত গিরীন্দ্রকুমার সতীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, প্রিষিতোষ, নিভাননা প্রভৃতি নিরর্থক নামধেয় হইবার আশঙ্কা থাকে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মথুরা হইতে নন্দালয়ে আনীত হইলে নন্দ, যশোদা, গোপ এবং গোপাঙ্গনারা

ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম থুইয়াছিলেন।

"নন্দ থুইল নাম শ্রীনন্দের নন্দন। যশোদা থুইল নাম যাদু বাছাধন॥
কেলেসোনানাম থুইল রাধা বিনোদিনী। ননীচোরা নাম থুইল যতেক গোপিনী॥"

তেমনি সর উইলিয়ম হরশেল কর্ত্তৃক এই নবীন ব্যোমচর মর্ত্ত্যলোকে পরিচিত হইলে ইউরোপে নন্দোৎসব সদৃশ হরশেলোৎসব হইল। আবিষ্কর্ত্তার মর্য্যাদার্থে তদীয় নামানুসারে কতিপয় বর্ষ পর্য্যন্ত গ্রহটি হরশেল নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তজ্জন্য উহা অদ্যাপি Herschelএর নামের আদি বর্ণসহ একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত হয়। হরশেল স্বয়ং তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর জর্জের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রহটিকে জর্জ বলিয়া ডাকিতেন। পরে প্রস্তাব হইল যে,ইহার নাম ধর্ম্ম থাকুক; কারণ নরলোকে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, এখানে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারে না; অতএব ধর্ম্মদেবতা Asteræa এই নব আবিষ্কৃত গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী হউন। একজন বলিলেন, ইহার নাম Cybele অর্থাৎ দেবমাতা অদিতি থাকা উচিত। কারণ ইউরোপীয়দের মতে দেবতাদিগের আদিপুরুষ শনি ও বৃহস্পতি ত্রিদশালয়ে বহুকালাবধি আধিপত্য করিতেছেন, অথচ দেবপ্রসূতি অদিতির লোক দেখা যায় না; অতএব এই সুযোগে তাঁহাকে এই নবপ্রকাশিত গ্রহের অধিষ্ঠাতৃত্ব পদে নিযুক্ত করা যাউক। জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ প্রক্টর (Proctor) বলিলেন যে গ্রীকদিগের মতে সুরজননীর অন্যতর নাম যে হ্রিয়া তাহা দিলেই ভাল হইত, কারণ হ্রিয়া আর রাহু স্বরতঃ আর অর্থতঃ এক। প্রক্টর জানিতেন, ব্রহ্মদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা রাহু নামে যে এক গ্রহ আছে বলে, তাহা এই ইউরেন্স; হরশেল তাহার পুনরাবিষ্কারমাত্র করিয়াছিলেন। রাহু যে কোন বিগ্রহবিশিষ্ট গ্রহ নহে, তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। রাহু কেতু ক্রান্তিবৃত্তে চান্দ্রকক্ষার পাতদ্বয় (ascending এবং descending nodes) মাত্র। প্রক্টর অস্মদ্দেশীয় জ্যোতিষে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত এরূপ অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। উক্ত কয়েকটি নামের মধ্যে বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কোনটি কাহারও মনে লাগিল না। প্রসপেরিণ বলিলেন, ইহার নাম বরুণ (নেপতুন) হইলে ঠিক হইত, কারণ বরুণ শনির কনিষ্ঠ পুত্র আর বৃহস্পতি তাহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র; পুত্রদ্বয় পিতার পার্শ্বে ঊর্দ্ধ অধোভাগে থাকিলেই বেশ দেখায়, সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর হয়। অবশেষে মিষ্টার বোডের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত গ্রহের নাম Uranus রহিল। প্রাচীন ইউরোপীয় মতে ইউরেন্স দেব-পিতামহ। বৃহস্পতির পিতা শনি,;বৃহস্পতি অপেক্ষা ঊর্দ্ধ আকাশে বৃহত্তর কক্ষায় ভ্রমণ করেন; এখন বৃহস্পতির পিতামহ শনির পিতা ঊর্দ্ধতম আকাশে বৃহত্তম কক্ষায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল, ইউরেন্‌সের ঊর্দ্ধদেশে আর গ্রহ নাই, কিন্তু ৬৫ বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ইউরেনসের কক্ষার ঊর্দ্ধতর আকাশে আর একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইল। ইহার নাম নেপ্‌তুন রহিল।

এখন দেখুন ইউরেনস শব্দটি যথারীতি বর্ণানুবাদ করিলে বরুণ হয়। অর্থানুবাদ করিলে ইন্দ্র হয়। স্বর সাদৃশ্যের অনুরোধে অর্থ বিস্পষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু বরুণত্বে ও ইন্দ্রত্বে কি সবিশেষ ভেদ দৃষ্ট হয়? বরুণ "কশ্যপস্য অদিতিনাম্না পত্ন্যাং জাতঃ"। ইনি "পুষ্করাদ্যৈর্গণৈঃ সর্ব্বৈ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ"। বৃষ্টির জন্য ইঁহার জপনীয় মন্ত্র, "পুষ্করাবর্ত্তকৈ মেঘৈঃ প্লাবমন্তং বসুন্ধরাং। বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিত সন্নদ্ধং তোয়াত্মনং নমাম্যহং॥ যস্য কেশে জীমূতা নদ্য সর্ব্বাঙ্গ সন্ধিষু। কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চতারঃ তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥" বরুণ মন্ত্র "ওঁ বৃষ্টিরিহানাব্যন্তরয়ো মরুতাস্পৃশতীং গচ্ছবশাপগ্নিদৃত্বা দিবং গচ্ছতং তেনো বৃষ্টিমাবহ।"

এই তো গেল বরুণের পরিচয়। ইন্দ্র কে? ইনিও অদিতির পুত্র, বরুণের সহোদর। ইনিও দিক্‌পাল,—পূর্ব্বদিকের অধিপতি। বরুণের ন্যায় ইঁহারও মেঘের উপর আধিপত্য দেখা যায়। ইন্দ্রের অপর এক নাম মেঘবাহন। ইনি পর্য্যন্য বা পর্জ্জন্য = "শব্দায়মান মেঘঃ বা অগর্জ্জন্নপি মেঘঃ"। বৈদিক ভারতে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিদেব। মিত্র বরুণ অর্য্যমা প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত, ইন্দ্রও তাহাই। যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব হয় * * * তখন ইন্দ্রের শক্তি বিস্তর খর্ব্ব হইয়াছিল এবং এই সময়েই বরুণকে নভ্য আধিপত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্‌পতিত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তবেই ইউরেনস্ বৈদিক বরুণ হইলেন।

আমি অভিভাবক স্বরূপে সাহিত্য আদালতে এই দরখাস্ত করি যে, নেপ্‌তুন যখন ত্রিদশালয়ের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত, তখন অর্থতঃ তিনি যে হউন সে হউন, আমরা "দখলিকারের দখল সাব্যস্ত থাকুক" এই আইন

অনুসারে তাঁহাকে ইন্দ্রত্ব পদে অভিষেক করিতে পারি। নেপ্‌তুন বিলাতি জলাধিপতি বলিয়া আমরা কেন তাঁহাকে বরুণ বলিব? যথন দেবলোকে তাঁহার উচ্চতম আসন দেখিতেছি, তখন তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিব। হরশেলের আবিষ্কারের পর আর নূতন গ্রহ বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই, এই বিশ্রম্ভবিমূঢ় হইয়া তদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদেরা হরশেলের ইউরেনস্ নাম রাখিয়াছিলেন। যথন নেপতুন বাহির হইল, তখন ইউরেনস প্রাপ্তব্যবহার হওয়ায় জ্যোতিষ জগতে তাঁহার নাম জারি হইয়াছে, কাজেই নাম বদলাইবার আর অবকাশ হইল না। আর বদলই বা কতবার হইবে? সুতরাং ইন্দ্রের উপর বরুণকে বসাইতে হইল। আমরা যথন ৬ চাঁদের স্থানে ৬০০ চাঁদের থোকার নামকরণ করিতেছি, তখন আর গুণানুরূপ সার্থক নাম ভিন্ন উপনাম দিবার আবশ্যক কি? আর এক কথা। বিলাতি বরুণকে আমরা বরুণ বলিব কি বিলাতি ইন্দ্রকে আমরা ইন্দ্র বলিব, তাহার কোন নজীর দেখি না। তাহা হইলে সুরসুন্দরী কামপ্রসবিনী ৰিনস কেমন করিয়া অসুরগুরু শুক্র হইবেন? এবং শনিতনয় যুপিতর (দেবপিতৃ) কেমন করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতি হইবেন? এ সকল কারণ বশতঃ ইউরেনসকে বরুণ ও নেপতুনকে ইন্দ্র বলা সঙ্গত বোধ হয়।

৮। Observationএর অর্থ ঠিক পর্য্যবেক্ষণ বটে, কিন্তু প্রাচীন সিদ্ধান্তীরা উক্ত অর্থে "বেধ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। লক্ষ্য যেমন শর দ্বারা ভেত্তব্য; তেমনই গ্রহবিম্ব নলিকাদি যন্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হয় তাঁহারা এরূপ কল্পনা করেন, তজ্জন্য দর্শন স্থলে বেধ ব্যবহার করেন। যথা,—

"গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়োঃ যথা যেন প্রকারেণ দৃক্‌তুল্যতাং বেধিত গ্রহসমতাং
গচ্ছন্তি তৎ তাদৃশং স্ফুটীকরণং স্পষ্টক্রিয়া গণিত প্রকারা প্রবক্ষ্যামি।"

স্যঃ সি. ২।১৪। রঙ্গনাথ টী.।

"অত্র সমায়াং ভূমৌ স্থিতো গণকেন বেধঃ কর্ত্তব্যঃ।"

সি. শি. ১১।৪১। টী.।

"কেন্দ্রার্ধ যষ্টি বেধাদকেন্দ্বোরন্তরাংশকার্কাংশঃ।
স্ফুট নষ্ট তিথিজ্ঞেয়া তস্মাৎ কার্য্যা তথা চান্যাঃ॥"

পঞ্চ. সি. বরাহমিহির ১৪।১২।

অহগণাৎ সাধিতো যো গ্রহঃ স মধ্যমঃ যতো যত্র বেধেনাকাশে বিলোক্যমানে তারান্ গ্রহো দৃষ্টঃ কিঞ্চিদন্তরং দৃষ্টং প্রত্যহং গতে র্বিসদৃশত্বাৎ। এবং প্রত্যহং গ্রহান্ গোলেন চক্র যন্ত্রেণ বা বিদ্ধা অহর্গনোৎপন্ন মধ্যম গ্রহ বেধিত স্পষ্ট গ্রহযো অন্তরাণি সাধিতানি।"

গ্রহলাঘব ২।১ টী.। গণেশ দৈবজ্ঞ।

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুখের নদী

এখানে বয় নির্ঝরিণী
মধুর গেয়ে নিরবধি,
মেঘের মেয়ে, নীলবসনা,
আপন মনে, সুখের নদী;
—গেয়ে কত আনন্দ গান
নেচে নেচে যায় সে চলে;
চুল গুলিতে, কপোলে তার
সোনার কিরণ পড়ে ঢলে'।

সাঁঝের রবি কিরণ মাথা
দিনের কার্য্য করে' শেষ,
যায় সে সোনার মেঘে চড়ি'
সাগর পারে আপন দেশ।
উঠে তারা নীল আকাশে,
কোমলতার রাজ্য গড়ে;
পদতলে, মুখে হাসি,
জগৎ—শোভায় ঢলে পড়ে;—
জগৎ—কনক রূপে ভরা;
আকাশ—সুখে উজল প্রাণ;
নদীর উপর যায় ভেসে এই—
প্রেমের, হাসির, আলোর গান।—

"হাঁ রে তোরা কাঁদিস কেন?
থাকিস্ বিরস সদাই রুষি'—?
সকলেরই জন্যে এ সুখ,
ধনী, গরিব—নে' যার খুসি;
আশাময় এ সুখের জগৎ,
রূপের, ভালবাসার ধরা;
এ নহে ত কাঁটার বন, —এ
শোভার বাগান, গোলাপ ভরা।"

ভাসায়ে আয় প্রেমের তরি—
ধরবে সকল ভগ্নী ভাই;
হাসির দাঁড়ে, উজল সন্ধ্যায়,
গানের দেশে ভেসে যাই;
ডুবায়ে দে' দুঃখ জ্বালা
আজ এ শান্ত সন্ধ্যা বেলা;
ধনের, যশের ঝগড়া বিবাদ—
ভুলে যা'—সব ছেলে খেলা;
ভবিষ্যতের ভূতে প্রেতে
আনিস না ক হেথায় ডেকে';
পাস্‌নে ভয় রে সুখী হ'তে
নিজের সুখের ছায়া দেখে;
আকাশেতে নাইক আঁধার,
বজ্র ঝড় ত নাইক সেথা;
আকাশে ও স্বর্ণরাজ্য,
ঝর্ঝরিছে নদী হেথা।
মলয় চুমে কুসুম; আসে
স্বর্গের হাসি ধরায় নেমে;
সোনার আকাশ, সোনার জগৎ,—
পূর্ণ রূপে, পূর্ণ প্রেমে।

আয়
দূরে রাখি ঘৃণায়, ক্রোধে,
প্রাণের প্রাণের পাওনা দেনা;
এ সুখ ও এ স্বপ্ন কেহ
হেথায় এসে শুধাবে না।

এ নদী, এ সুখের নদী,
লহরী তার মধুর হাসি;
ভাবেনা সে ভবিষ্যতে,
জানে না সে দুঃখরাশি;
জানে না সে হতাশা, কি
দুঃখের জ্বালা, প্রাণের ব্যথা;
ভাবে বর্ত্তমানের সুখ সে—
স্বপ্ন, শান্তি, গানের কথা;
আননে তা'র প্রসন্নতা
মৃদু সান্ধ্য রবির কর;
তরঙ্গে তার প্রাণের নৃত্য;
ঝর্ঝরে তার গীতের স্বর।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কন্যাদায়।

রামধন বাবু সামান্য গৃহস্থ। আজ কাল যে বাজার, তাহাতে কত শত বি-এ, এম্-এই জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ, তায় রামধন বাবুত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া স্পর্শ করেন নাই। বাল্যকালে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। নয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই পিতার রক্ত জল করিয়া সমাহৃত অন্ন ধ্বংস করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। মধ্যাহ্নে দু পয়সার জলখাবারও খাইতেন, ৪টার পর বাটীও ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু পড়াশুনা কতদূর হইত, তাহা ঠিক জানা যাইত না। ইতিপূর্ব্বেই রামধন বাবুর পিতা পিতৃকার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ছেলেকে লেখা পড়া শেখান ততটা আবশ্যক কিনা জানিনা, বিবাহটা দেওয়া অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য—"পিণ্ড লোপ হয়! কি কথা!!" ক্রমে পিতৃদেবের পিণ্ডের প্রত্যাশাও হইল, কিন্তু পুত্র না হইয়া একটী কন্যা হইল। তাহার তিন বৎসর পরে পিতৃদেবের আশাও ফলবতী হইল। পৌত্র মহাশয় ক্রমে দিগম্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে রাজপথ সুশোভিত করিতে লাগিলেন। রামধন আর বাবাজীবনের "বার্ডস্ আই" ক্রয় করিবার পয়সা যোগাইয়া উঠিতে পারেন না। আজ গুণধর পুত্র ঘোষেদের ননীর লাঠিম কাড়িয়া লইয়াছে, কাল বোসেদের শ্যামের ঘুড়ি ছিঁড়িয়া দিয়াছে,—নানা প্রকার আর্জ্জি দাখিল হইতে লাগিল। সে সকলের খেসারতও রামধনকে দিতে হইতে লাগিল। শিষ্টস্বভাব পুত্ররত্ন প্রাণান্তেও অত্যাচারের কথা স্বীকার করেন না, প্রত্যর্পণ দূরের কথা। মধ্যে মধ্যে "বক" "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ" প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গীসহ অমৃতায়মান বালকণ্ঠবিনিঃসৃত বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রবণবিবর পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই পিতৃদেব পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া পিণ্ডলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পিণ্ড-প্রত্যাশায় অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। অগত্যা রামধনের চাকরী না করিলে আর দক্ষিণ হস্ত চালান সুকঠিন হইয়া উঠিল। যাহা যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সঞ্চিত অর্থ ছিল, পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডপ্রদাতা শ্রীমান্ বংশধর বাবাজীবনের আমোদ প্রমোদে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। বহুকষ্টে ২।১টা প্রতিবাসীর মোকদ্দমা জুটাইয়া Purloin চাটুর্য্যে কোং র উকীলের

আফিসে ৩০৲ ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরী হইল। চাকরী হইল, পৈতৃক ঢিলে পায়জামা, ও চাপকান বাহির হইল, ৯টার পূর্ব্বে ভাতের জন্য গৃহিণীর রাত্রে নিদ্রা বন্ধ হইল। মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কিন্তু মাহিয়ানার টাকা কৈ? উকীল-বাটী নাকি মাসে মাসে কেরাণীরা বেতন পায় না। এদিকে ধোপার পয়সা, ট্রামের পয়সার জন্য বিব্রত হইতে হইল। রামধন বাবুর সৌভাগ্য, ছেলের লেখা পড়ার খরচ নাই; বংশধর স্কুলে যান না। সে বড় কম খরচা নয়, বৃষোৎসর্গ ব্যাপার। বৎসর বৎসর নূতন ধরণের কেতাব; অঙ্কের কেতাবও বৎসর বৎসর, কোন বৎসরে বা দুই দফা নূতন নূতন চাই। তার পর পাখার পয়সা, জলের পয়সা, প্রশ্ন ছাপানর পয়সা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম ব্যয়। ভগবানের কৃপায় এবং শ্রীমান্ বংশধরের কল্যাণে সে সকল কোন কষ্টই কোন উৎপীড়নই রামধন বাবুকে সহ্য করিতে হইল না। কিন্তু বার্ডস্ আই, কামিজের হাতার ষ্ট্রাপ, হাফ্ মোজার টানা ইত্যাদির খরচা প্রায় স্কুলের খরচার সমান হইতে লাগিল। অগত্যা, রামধন বাবু ঠিকা কাজ লইয়া সমস্ত রাত্রি লিখিয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য পূর্ব্বোক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সুখে দুঃখে অনশনে অর্দ্ধাশনে, কোনরূপে দিন কাটিতেছিল, কিন্তু আবার এক নূতন দায় উপস্থিত। কন্যাটীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইতে যায়। রামধন বাবুর পিতা সংকল্প করিয়াছিলেন পৌত্রীকে অষ্টম বর্ষে পাত্রসাৎকরণ জনিত গৌরীদানের ফল লাভ করিয়া বংশে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু কালের কুটিল গতি হঠাৎ দেহের নশ্বরতা প্রতিপাদিত করিয়া তাঁহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। রামধন বাবু নানা স্থানে পাত্র অপাত্র চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যেখানে যান, পাত্র লেখা পড়ায় ধনুর্দ্ধর হউক আর নাই হউক, বিষয় আশয় থাকুক আর নাই থাকুক, এত বেশী খাঁই করিয়া উঠে যে রামধন বাবু তত টাকা কখন একত্রে দেখেন নাই অথবা কন্যার বিবাহে এত টাকা যে ব্যয় হয়, তাহাও তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জাতিপাতের ভয়ে, আত্মীয়বর্গের তাড়নায়, গৃহিণীর গঞ্জনায়, সমাজের শাসনে, মুন্সীগঞ্জের হীরালাল দত্ত মহাশয়ের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্রটী রূপে শৈলসুতাসুতের ন্যায়। সকলেই রূপের কথা উঠিলে শৈলসুতাসুতের সহিত উপমা দেয়। আমরাও চির প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম

না। তবে রামধন বাবুর ভাবী জামাতা, রামধন বাবুর পিতৃদেবের সংকলিত গৌরীদানের গৌরীর গৌর কনিষ্ঠ না হইয়া জ্যেষ্ঠ শৈলসুতাসুত সদৃশ;— আর কোন অঙ্গে তাদৃশ সৌসাদৃশ্য থাকুক আর নাই থাকুক উদর দেশটীতে সম্পূর্ণ আছে। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহা গুণে কিছু ন্যূন হয়। কিন্তু আমাদের এ উপমায় অলঙ্কার শাস্ত্র পরাস্ত। যেহেতু জামাতার উদর শৈলসুতাসুত অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বাবাজীবনের প্লীহা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে চিৎ হইয়া শয়ন করিতেও কষ্ট হয়। সর্ব্বাঙ্গের মাংসগুলি বোধ হয় একত্রিত হইয়া উদরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিদ্যার কথা আর কি বলিব ? মাতৃভাষায় নাম লিখিতেও লজ্জা বোধ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া বি এ, এম্ এ, উপাধি ত আজকাল হাড়ী, মুচি পাইতেছে; সুতরাং এরূপ জঘন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অপমানের কথা। বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর ৫ মাস। বাবাজীর এটী তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম দুইটী সংস্করণই নিজ ভাগ্যবলে বিবাহের অব্যবহিত পরেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রামধন বাবুর কন্যার বড়ই জোর কপাল, তাই এহেন পাত্রের যোগাযোগ ঘটিয়া উঠিয়াছে।

দেনা পাওনা স্থির, বিবাহের দিন স্থির, সমস্তই স্থির। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডন করে কার সাধ্য ? শুভ গাত্রহরিদ্রার পূর্ব্ব রাত্রে হীরালাল বাবুর পুত্রের জ্বর হইল। জ্বর পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু হইত কিন্তু তাহাতে স্নানাহার সহ্য হইত। বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে স্নানাহার সহ্য হওয়ার কথাটা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। উত্থানশক্তি রহিত বা চৈতন্য রহিত না হইলে আর তাঁহাদের মতে স্নানাহার অসহ্য হয় না। হীরালাল বাবুর পুত্রের সেই স্নানাহারসহিষ্ণু জ্বর হইল। অগত্যা গাত্র হরিদ্রা বন্ধ হইল, এত ধূমধাম, এত আয়োজন আপাততঃ বন্ধ হইল। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নকালে রামধন বাবুর ভাবী জামাতা পিতামাতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভাবিনী প্রণয়িনীর আশা ভরসা অতলজলে ভাসাইয়া লীলা সম্বরণ করিলেন। হীরালাল বাবুর বংশ লোপ হইল, পিণ্ড লোপ হইল। পিণ্ডের সম্ভাবনা কস্মিন্ কালেই ছিল না। তবে হীরালাল বাবুর মনে আশা ছিল বটে; সে আশাটুকুও গেল।

এদিকে রামধন বাবুর মাথায়ও আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বহুকষ্টে সন্ধান করিয়া কন্যার বিবাহের পাত্র স্থির করিলেন, অদৃষ্ট দোষে বা

গুণে তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। আবার গণ্ডূষ করিতে হইল। আবার স্থানে স্থানে চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু সেই কথা।—রূপার ঘড়াসুটে বাসন, চুড়িসুট ডায়মনকাটা সোণার গহনা ইত্যাদি ইত্যাদি। রামধন বাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া হাটখোলার রামসেবক মিত্রের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। রামসেবক বাবু চাকরি বাকরি করেন না, আবশ্যকও নাই। পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট। দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ সমস্তই করিয়া থাকেন। পুত্রটীও রত্ন বিশেষ। কলিকাতার কোন বিখ্যাত কালেজে বি এ, পড়েন; সুবোধ, শিষ্ট, সচ্চরিত্র, সুরূপ, সকলই "সু", এই "সু"ই "কু"র কারণ হইয়া উঠিয়াছে। রামসেবক বাবুর গৃহিণী রূপার ঘড়া না পাইলে কন্যাকে দুধে আল্তার পাথরে দাঁড়াইতে দিবেন না। অগত্যা রামধন বাবু সম্মত হইলেন। রামসেবক বর্ত্তমান প্রথা মতে নগদ টাকা লইতে একেবারেই নারাজ। পাঁটা পাঁটি বিক্রয়ের মত টাকা লওয়া কি ? তবে ফুলশয্যা দিতে হইলে বৈবাহিক মহাশয়ের বিস্তর ব্যয় হইবে। রামধন বাবু ছা-পোষা, বিশেষ কুটুম্ব হইতে চলিলেন, তাঁহার স্বাশ্রয় করাও কর্ত্তব্য। আর এপক্ষেও ফুল শয্যার তত্ত্ব লইয়া যে সকল লোক আসিবে, তাহাদের বিদায় এবং ভোজনা-দিতে তাঁহারও বিস্তর ব্যয় হইবে। অথচ জিনিষ গুলি ত আর সম্ভ্রমের দায়ে বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবেন না—হতভাগা প্রতিবাসিবর্গকে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। এরূপ কার্য্যে কোন পক্ষেই লাভ নাই। অতএব ও সম্বন্ধে নগদ ৪০০৲ দেওয়াই স্থির হইল। সে টাকা ফুলশয্যার দিনে দিতে হইবে। রামসেবক বাবু পূর্ব্বে লইবেন না। তাহা হইলে যে শুক্রবিক্রয়ী হইয়া ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে ? আহা কি ধার্ম্মিক ! এরূপ ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ২।১টা লোক আছে বলিয়াই এঘোর কলিযুগে আজিও সোমবারের পর মঙ্গলবার হইতেছে, বৈশাখ মাসের পর জ্যৈষ্ঠ মাস আসিতেছে, সূর্য্যের পর চন্দ্র উঠিতেছে।

যাহা হউক বিবাহের দিন স্থির হইল। ক্রমে দিন আসিল, বরপাত্র সভায় বসিলেন। ৩।৪ শত বরযাত্রও আসিয়াছেন। ক্রমে সম্প্রদানের সময় উপস্থিত হইল। রামধন বাবু গরদের জোড় পরিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণবর্গের অনুমতি লইয়া কন্যা পাত্রস্থ করিলেন। বরকন্যা অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বরযাত্রবর্গ আহারের জন্য ব্যস্ত। এমন সময় রামধন বাবু

সভা মধ্যে গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিলেন,—"মহোদয়গণ, আমার একটা দুঃখের কথা শুনুন। আমি অতি দরিদ্র। দুবেলা আহার হয় না, অতি কষ্টে দিন পাত করি, তাহার উপর কন্যাদায়। হাতে পায়ে ধরিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু কাহারও দয়া হইল না। বুঝিলাম এসংসার গরিবের নহে। এদিকে জাতিপাত হয়। অগত্যা রামসেবক বাবুর পুত্রের সহিত বিবাহের স্থির করিলাম। এই যে রূপার ঘড়া গাড়ু দেখিতেছেন, এগুলি ভাড়া করা। ঐ যে লোকটী দাঁড়াইয়া আছে দেখিতেছেন, এদ্রব্য গুলি উহারই। এখনি এগুলি উঠাইয়া লইয়া যাইবে। খাট বিছানাও তাই। কন্যার গাত্রে যে অলঙ্কার গুলি দেখিলেন, ওগুলি আমার প্রতিবাসিবর্গের। কল্য প্রাতেই যাহার যে গহনা ফিরাইয়া লইবে। ইহাতে রামসেবক বাবু অবশ্য আমার প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হইবেন, হয়ত আমার কন্যা আর আমার বাটী পাঠাইবেন না। তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। যেহেতু আমার বাটী থাকিলে ত মাসের অর্দ্ধেক দিন উপবাস করিতে হইবে। তবে আমার একমাত্র দুঃখ ক্ষোভ কষ্ট অপমানের বিষয় এই যে এতগুলি ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটী পদধূলি দিয়াছেন, আর আমি এমনি হতভাগ্য যে ইঁহাদিগকে একটু মিষ্টমুখ করাইতে পারিলাম না। হা আমার অদৃষ্ট! যাহা হউক সমস্ত দিন উপবাসে ও এই বৃহৎ কার্য্যের আয়োজনে আমার শরীর আজ বড়ই ক্লান্ত। এখন অনুমতি হয় ত বাটীর মধ্যে যাই, জল খাইগে।"

রামধন বাবুর কথা শুনিয়া সকলেই নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ! রামসেবক বাবু চৈতন্যহীন!

সুভদ্রা।

সুভদ্রাচরিত্রের ন্যায় মধুর নারী-চরিত্র জগতের ইতিবৃত্তে অতীব দুর্লভ। তিনি মানবী, মানবের দুহিতা, মানবের পত্নী এবং মানবের জননী; কিন্তু তাঁহার জীবনের একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্য দেখিলেই তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভ্রান্তি হয়। তাই অনেক হিন্দু তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্র সর্ব্বাংশেই পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত। নারী-জীবনে যাহা কিছু আবশ্যক, সুভদ্রায় তাহার কোনটীরই অভাব ছিল না। সুভদ্রা-চরিত্র সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত আয়াস ও শ্রম সাপেক্ষ

এবং বর্ত্তমানে আমার উদ্দেশ্যও সেরূপ নহে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার কুরুক্ষেত্র ও রৈবতক নামক কাব্যদ্বয়ে এই মধুর চরিত্র অতীব সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। এস্থলে আমি কেবল তাঁহারই উক্ত কাব্যদ্বয়ের অবলম্বনে সুভদ্রার অলৌকিক এবং আদর্শ প্রাণিপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

সুভদ্রা রাজার নন্দিনী, সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যেই তাঁহার জন্ম, এবং তিনি সেই সুখসমৃদ্ধির মধ্যেই লালিতা ও বর্দ্ধিতা। দরিদ্রের অন্নাভাবে হাহাকার, পীড়িতের রোগশয্যার কাতরোক্তি, ব্যথিতের আর্ত্তনাদ, পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকার অশ্রুজল, এ সকলের কিছুই তাঁহার নয়নগোচর হইবার উপায় বা সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জন্মাবধি জগতের চিরোজ্জ্বল ও নিত্যসুখময় চিত্রাবলীর মধ্যে থাকিয়াও অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার হৃদয় যেন করুণার আকর স্বরূপ ছিল। অপরের কোন কষ্ট দেখিলেই তিনি একেবারে দ্রবীভূত হইয়া পড়িতেন; কাহারও চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখিলে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না; কাহারও কোন প্রকারের দুঃখ দেখিলে তাহা বিমোচন করিবার জন্য তিনি একেবারে অধীরা হইয়া পড়িতেন এবং সে সময়ে তিনি তাঁহার নিজের বসন ভূষণ বা নিজের স্বাস্থ্য ইহার কিছুরই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। কাহারও কোন প্রকারের অভাব দেখিলে তাহা দূরীকরণার্থ তিনি এতদূর ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন যে তৎকালে তিনি গুরুজনবর্গের বিরক্তি বা তিরস্কারের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া নিঃসঙ্কোচে আপনার অঙ্গের অলঙ্কার তাহাকে খুলিয়া দিতেন। পিতামাতা বা অন্য কোন গুরুজন যখন তাঁহার এইরূপ কার্য্য অন্যায় বলিয়া বোধ বা অসন্তোষ-প্রকাশ করিতেন, তখন সেই ভীতা বালিকার স্থির নিশ্চল সাশ্রু বদনমণ্ডল আর সেই রুষ্ট গুরুজনের প্রতি মার্জ্জনা-প্রার্থনাব্যঞ্জক দৃষ্টি যাঁহার নয়নগোচর হইত, তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইত এবং তিনি সেই বদনমণ্ডলে ও সেই দৃষ্টিতে এক অতুল স্বর্গীয় মাধুরী অনুভব করিতেন। ব্যাসাশ্রম দর্শনকালে কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকটে ছোট ছোট ঋষিকুমার কুমারী-গণের আধ আধ কথায় তাহাদের সুভদ্রামাতার স্নেহ বর্ণন, এবং তচ্ছ্রবণে ধনঞ্জয় কৌতুহলাক্রান্ত হইলে তাঁহার নিকট বাসুদেব কর্ত্তৃক আপন ভগিনীর

পরিচয় পাঠ করিবামাত্রই সেই করুণার ছবিখানি যেন নয়নপথে আবির্ভূত হয়।

* * একটী বালিকা
বাম করে জড়াইয়া কণ্ঠ অর্জ্জুনের,
বলিল আহ্লাদে—"দেখ, সুভদ্রা জননী
কেমন সুন্দর বস্ত্র, কুণ্ডল, বলয়
দিয়াছেন, আমার যে নাহি মাতা পিতা।"
* * *

অর্জ্জুন। কে সুভদ্রা বাসুদেব ?
কৃষ্ণ। আমার ভগিনী। প্রাণের অধিক
আমি ভাল বাসি তারে। স্নেহ ভরা মুখ
তার, স্নেহে ভরা বুক ; স্নেহ সুধারাশি,
ভদ্রার ঈষৎ হাস্যে পড়ে ছড়াইয়া।
পরিবারে পরিচিতে সর্ব্বত্রে সমান,
পালিত, বনের পশু বিহঙ্গ নিচয়ে,
উদ্যান কুসুমে,—সদা সেই স্নেহামৃত
বরষে আমার ভদ্রা অজস্র ধারায়।
যেই খানে রোগী, শোকী ; ভদ্রা সেই খানে
মূর্ত্তিমতী শান্তি রূপে ; অশ্রু যেই খানে,
সেখানে ভদ্রার কর। যেখানে শুকায়
পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পলতা ; আছে সেই খানে
সলিলরূপিণী ভদ্রা। ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশু, পক্ষী, দরিদ্র ভিক্ষুক ;
সেই খানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার।
* * *
সংসারের স্বার্থ ছায়া, কুটিলতা দাগ,
নাহি পায় স্থান পার্থ তাহার হৃদয়ে—
নির্ম্মল সরল সেই দয়ার সাগরে।
চির উদাসিনী ভদ্রা ; দরিদ্র দেখিলে
খুলে দেবে আপনার অঙ্গের ভূষণ
গোপনেতে। বড় সাধ আশ্রম দর্শন ;
আসিলে আশ্রমে, করে যায় সর্ব্ব অঙ্গ
আভরণহীন। যদি কর তিরস্কার,—
সতত সজল দুই প্রশস্ত নয়ন
স্থাপিয়া তোমার মুখে রহিবে চাহিয়া
নিরুত্তরে। সেই দৃষ্টি নহে সংসারের,
নহে বালিকার তাহা, নহে মানবীর।

কেবল মাত্র বালকবালিকা ও নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইয়া এবং তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয় জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক প্রাণীর দিকেই কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে প্রধাবিত হইত। মানবের কষ্ট, মানবের যাতনা দেখিলে

তাঁহার করুণ হৃদয় যেরূপ আর্দ্র ও ব্যথিত হইত, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির মধ্যে কোন সামান্য প্রাণীর কোন প্রকারের যাতনা দেখিলেও তিনি সমভাবেই অনুভব করিতেন। কৈশোরাবস্থায় একটী নীড়ভ্রষ্ট শুকশাবক লইয়া সখী সুলোচনার সহিত তাঁহার কথোপকথন শ্রবণ করিলে নরনারী মাত্রেই মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

ওটী ওকি ?—এক শুকের শাবক
পড়ি বৃক্ষ মূলে, আহত দেহ।
চলে গেল সব তৃষ্ণা কাতরতা,—
সেই ভিক্ষা নাহি বুঝিল কেহ।
দেখিলা সুভদ্রা সেই কাতরতা,
সে করুণ ভিক্ষা শুনিলা তার ;
কাঁদিল পরাণ ভিজিল নয়ন
ছুটিল লইয়া সরসী পার।
সুলোচনা। একি লো তোর কুমারী ব্রত ?
ভদ্রা। জীবনের ব্রত, স্বজনি মোর।
সুল। চল বিহঙ্গিনী চল যাই তবে
নারায়ণ কাছে মাগিগে বর
বিহঙ্গম পতি, কানন যৌতুক,
গাছের আগায় বাসর ঘর।
সুভ। না দিদি মাগিব, সর্ব্ব প্রাণিপতি,
জগৎ যৌতুক প্রকৃতি ঘর।
বল দিদি বল কেমন বিবাহ
কেমন যৌতুক কেমন বর।

কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে অষ্টাদশ দিবস ধরিয়া অহোরাত্র আহত সৈনিকের শুশ্রূষা তাঁহার পরদুঃখকাতরতার ও জীবসেবার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বপক্ষীয়ই হউক আর শত্রুপক্ষীয়ই হউক রণক্ষেত্রে সেবার সময়ে তিনি সকলকেই সমানচক্ষে দেখিতেন এবং সেই ঘোরতর সংগ্রামের সময় আহতের সেবার জন্যই তিনি আপন পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আহত সৈনিকের সেবা করিয়া আপনার সুকুমার দেহ পতন করা সম্বন্ধে সুলোচনার সহিত তাঁহার কথোপকথন অতীব হৃদয়গ্রাহী ও গভীর উপদেশপূর্ণ। এই কথোপকথনের মধ্যেই তাঁহার কোমল-হৃদয়ের জনকজননীর স্নেহময় ক্রোড়ে যাপিত শৈশবজীবনের, ভ্রাতা ভগ্নী পরিবেষ্টিত কৈশোরজীবনের, পতিপ্রেম পরিপূরিত যৌবনজীবনের, এবং মাতৃস্নেহাভিষিক্ত প্রৌঢ়জীবনের, তত্তৎকালীন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অতীব সুন্দররূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

সুলো।—

অভাগি! এরূপে কিলো, অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার?
নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি অঙ্গে আহত সবার।

* * *

এইরূপে রাত্রি দিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ।

সুভ। রোগে শান্তি দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ?
যেমতি অনল জল, সৃজিলেন নারায়ণ
সৃজি সেইরূপ দিদি! রোগ শোক দুঃখ,
সৃজিলা অনন্ত প্রেমপূর্ণ নারী বুক।
আছে আর কিবা সুখ হায়! এইরূপে যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণীজীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায়।

* * *

সুলো। মানিলাম নারীধর্ম্ম, আর্ত্ত আহতের সেবা,
কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন?

* * *

সুভ। শত্রু! শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত?
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার?
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ?
একজল ভিন্ন জলাধার।
তাও এক ধাতুময়, অস্ত্রে এক রূপে হয়,
সবর দেহ ক্ষত ও বিক্ষত;
সহে একরূপ ব্যথা, এক রূপ মৃত্যুমুখে
শত্রু মিত্র হয় নিপাতিত।
শত্রু! এক ভগবান সর্ব্ব দেহে অধিষ্ঠান
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি কেবা আমি, কেবা শত্রু মিত্র কেবা?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?

* * *

যেই জন পুণ্যবান্ কেনা তারে বাসে ভাল?
তাহাতে মহত্ব কিবা আর?
পাপীরে যে ভাল বাসে, আমি ভাল বাসি তারে
সেই জন প্রেম অবতার।

* * *

শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেই জন দেবতা আমার।
জনক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত
শিশু কিছু নাহি জানে আর।

ক্রমে বাড়ে পরিসর কিশোর কিশোরী দেখে
ভ্রাতা ভগ্নী পূর্ণ এ সংসার।
পতি পত্নী প্রেমরঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অনন্ত মুখ—
পুণ্যতীর্থ সাগর সঙ্গম।
প্রেম ধর্ম্ম এই দিদি। কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার।
মাতৃস্নেহ পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার।

এতদূর দয়ার্দ্রচিত্তা ও কোমলস্বভাবা হইয়াও সুভদ্রার হৃদয়ে ধীরা রমণীর ন্যায় তেজ, কর্ত্তব্য জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা ছিল। স্নেহ মমতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়াও তাঁহার হৃদয় অযথা অপত্যস্নেহবিগলিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে কখন প্রতিবন্ধক জন্মায় নাই। শৈলজার মুখে পরদিন রণে একমাত্র পুত্র ষোড়শ বৎসর বয়স্ক কুমার অভিমন্যুর অমঙ্গল সম্ভাবনা, এবং তজ্জন্য সে দিবস তাহাকে সমরগমন নিবারণার্থ তাঁহার অনুরোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি জননী হইয়া যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, সেই প্রত্যুত্তরই তাঁহার হৃদয়ের অমানুষিক তেজস্বিনী বৃত্তি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

শৈল। —কর এ প্রতিজ্ঞা—
কালি রণে পুত্রে তব দিবে না যাইতে।

* * *

শুনিয়াছি কৌরব মন্ত্রণা
অলক্ষিতে। বীরধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের,—

* * *

সুভ।

* * *

ধর্ম্ম যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সনাতন,
জান শৈল। ধর্ম্ম যুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী, অভিমন্যুর জননী?
হইবে পতিতা আহা! কৃষ্ণের ভগিনী?

শৈল। ষোড়শ বর্ষীয় শিশু করিবে সমর,
একি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের?

সুভ। ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের!
কেশরীর ধর্ম্ম,—ধর্ম্ম কেশরীশিশুর।
ষোড়শবর্ষীয় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান

বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসন্তান
ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানি।

অবশেষে যখন সমরক্ষেত্রে সেই কুমার অভিমন্যুর মৃতদেহ ক্রোড়ে ধরিয়া তিনি অশ্রুবিন্দুশূন্য নয়নে অবিচলিত চিত্তে ও অটলহৃদয়ে গোবিন্দের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন সেই দেবীমূর্ত্তি কি এক অপূর্ব্ব সৌম্যভাব ধারণ করিয়াছিল। সেই একমাত্র দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই তাঁহাকে মানবী-শ্রেণী হইতে অনেক দূরে লইয়া যায়।

কেবল দুইটী নেত্র শুষ্ক বিস্ফারিত,
এই মহাশোকক্ষেত্রে; কেবল অচল
এই মহাশোকক্ষেত্রে একটী হৃদয়!
সেই নেত্র সেই বুক মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,
আদর্শ-বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাহিতেছে কৃষ্ণনাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী।

বঙ্কিমচন্দ্র।

(২)

দুর্গেশনন্দিনী—"বঙ্কিমচন্দ্র" লেখক বলিয়াছেন,—"দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমবাবুর প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। কিন্তু ইহা তাঁহার সর্ব্বপ্রথম লিখিত উপন্যাস নহে। দুর্গেশনন্দিনীর পূর্ব্বে তিনি বঙ্গভাষায় আর একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।" কিন্তু সাহিত্যসম্পর্কে ধরিতে গেলে ইহাই তাঁহার প্রথম উপন্যাস বলিতে হইবে। গ্রন্থ পাঠ করিলেও তাহা বোধ হয়। তবে অনেক সময় প্রথম পুস্তকের যাহা হয়, দুর্গেশনন্দিনীর তাহা হয় নাই। ইহা ধীরে ধীরে সাহিত্য-সাগরগর্ভে বিস্মৃতির অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে নাই; ইহার যশ এখনও অক্ষুণ্ণ। বহুকাল পরে প্রথম বয়সে রচিত উপন্যাস পুনর্মুদ্রিত করিতে বিকন্সফিল্ড সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। জীবিতকালে টেনিসন প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তক পুনর্মুদ্রিত করেন নাই; কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর এখনও সংস্করণের পর সংস্করণ হইতেছে। ইহাতে গ্রন্থকারের ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে তিনটি চরিত্র প্রধান; প্রথমা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী সদা প্রফুল্লা ও

স্থিরসঙ্কল্পা বিমলা; দ্বিতীয়া, বৃষ্টিবারিবিধৌতা যূথিকাকলিকার মত তিলোত্তমা; তৃতীয়া, ফুল্লনলিনীতুল্য গম্ভীরা অথচ হাস্যময়ী, প্রণয়কাতরা কিন্তু স্বার্থত্যাগিনী আয়েষা। এই চরিত্রেই বিশেষ বিশেষত্ব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তিনজনের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় সৌন্দর্য্যই প্রকাশিত। বিমলা "অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়; নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ।" তিলোত্তমা "বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়, নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়।" আয়েষা "নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; নাসঙ্কুচিত, নাবিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণদলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।"

"কাব্যসুন্দরী" লেখক বলিতেছেন, "বিমলা বঙ্কিমবাবুর আদর্শচিত্র। বঙ্কিমবাবু বঙ্গকুলবধূকেও যেরূপ স্বাধীনতা ও তেজস্বিতায় ভূষিতা করিতে চাহেন, যেরূপ বুদ্ধিমত্তায় চতুরা করিতে চাহেন, স্বাধীনতার সহিত যেরূপ কর্ম্মবলে বলবতী করিতে চাহেন, তাহার প্রথম আদর্শ বিমলায় প্রদর্শিত হয়।" তখন গ্রন্থকার নবীন; বিমলা সর্ব্বত্র আদর্শোপযোগিনী নহেন। "বিমলা একেইত ক্রীড়াকৌতুকিনী, বিমলা নিজ প্রবৃত্তি-পরায়ণা, বিমলা নিপীড়িতা, তেজস্বিনী রমণীরত্ন।" ক্রীড়াকৌতুকিনী ঠিক আদর্শের মত নহেন। নবীন গ্রন্থকার সময় সময় সীমা অতিক্রম করিয়াছেন; কোথাও একটু বর্ণনার খাতিরে, কোথাও একটু সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য, কোথাও একটু রসিকতার জন্য তিনি ক্রীড়াকৌতুকিনী বিমলাকে অঙ্কিত করিতে যাইয়া সময় সময় বর্ণে একটু অধিক চাকচিক্য দিয়াছেন। নিজ প্রবৃত্তিপরায়ণা বিমলাচিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকার অধিকাংশ সময় সফলচেষ্ট এবং নিপীড়িতা তেজস্বিনী রমণীরত্ন বিমলাচিত্র অঙ্কনে তাঁহার ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ। দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিলে আমরা সে বিমলাকে ভুলিতে পারি না; শৈশবের সুখস্মৃতির মত সে চিত্র আমাদিগের স্মৃতিপট আলোকিত করিয়া রাখে; ব্যথিত কাতরজীবনের শত ঘটনা সে স্মৃতি মুছিতে পারে না।

তিলোত্তমার চরিত্র গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তও করেন নাই, সম্পূর্ণ অব্যক্তও রাখেন নাই। তিনি রবিকরোজ্জ্বল গিরিচূড়ার কুজ্ঝটিকায়

অর্দ্ধাবৃত সৌন্দর্য্যের মত, তরল ক্ষুদ্র মেঘাবগুণ্ঠনান্তরায়বর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্যের মত তাহা দেখাইয়াছেন। কেবল এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তিলোত্তমার অর্দ্ধ বিকশিত নিশ্চেষ্ট সরলতা কুন্দনন্দিনীতে পূর্ণ বিকশিত।

আয়েষা চরিত্র আশ্চর্য্য সুন্দর। গ্রন্থকার আপনি বলিয়াছেন,—"যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা।" দুর্গেশনন্দিনী পাঠের পরও যাঁহাকে আয়েষাচরিত্র বুঝাইতে হয়, বৃথা তাঁহার উপন্যাস পাঠ। আয়েষা দেবী না মানবী? কারাগারে ওস্‌মানের সহিত তাঁহার কথোপকথন পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার হৃদয় যেমন গর্ব্বিত, তেমনই কোমল। সেই গর্ব্বিত বাক্যাবলির পার্শ্বে তাঁহার স্নেহবিগলিত বাক্যগুলি যেন উত্তুঙ্গ তরঙ্গকুলসঙ্কুল সাগরের পার্শ্বে শান্তসাগরের ছবি। তিনি জগৎসিংহকে হৃদয় দান করিয়াছিলেন কিন্তু স্বার্থ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি আপনি দাঁড়াইয়া আপনার সুখের আশার সমাধি দেখিয়াছিলেন। এই মুসলমান কন্যার চরিত্র গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উদার জাতীয়ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র ভারতবাসীদিগকে জাতীয় ভাবে দর্শন না করিলে বোধ হয় তিনি মুসলমান কন্যাকে এমন সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। আইভ্যান হোর রেবেকায় ও আয়েষায় আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন,—"নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।" বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসে রসিক ছিলেন। "তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্রহাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে।" কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে হাস্যরসের অবতারণায় তিনি কৃতকার্য্য নহেন। দিগ্‌গজ তেমন উজ্জ্বল নহে, সে আপনি পাঠককে হাসাইতে পারে নাই; বিমলা বা আশ্‌মানি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সময় সময় পাঠককে হাসাইয়াছে মাত্র। শূন্য ভাণ্ডারে রসিকতার চেষ্টার দোষ বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন এবং "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।" তুষারের উপর মসীবিন্দুর মত গ্রন্থমধ্যে দিগ্‌গজের বর্ণমালিন্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অন্যান্য চরিত্র বিশদরূপে সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; বীর জগৎসিংহ ও ওসমান সহজবোধ্য, সরল, সুন্দর। এই গ্রন্থের অভিরামস্বামী বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকলের সন্ন্যাসী প্রভৃতির প্রথম অবস্থা। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাতে নির্ঝরমুক্ত বারিধারার সহজ গতি নাই। পাশ্চাত্য মহাদেশের সাম্যগীতির ঝঙ্কারমুগ্ধ শিক্ষিত যুবকের হৃদয়ে যে সকল উদার মত স্থান পাইয়া থাকে, এই গ্রন্থে তাহাদের ছায়া দৃষ্ট হয়।

কপালকুণ্ডলা—কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহাতে গ্রন্থকারের ক্ষমতাও দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অগ্রসর। কপালকুণ্ডলা ক্ষুদ্রায়তন কিন্তু ক্ষুদ্রের অনাদর মূঢ়ের কাছে; যূথিকাকুসুম, তারকা, ইহারাও আমাদের চক্ষে ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহাদিগের সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথায়? কপালকুণ্ডলা এক শান্ত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। ইহার ভাষা সহজগতি; এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার সংস্কৃতবহুল ভাষা ভাল বাসিতেন এবং সেই জন্য কপালকুণ্ডলার ভাষা কিছু জটিল। এইরূপ ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকলে ভাষা এমন কুসুমসুষমাসম্পন্ন নহে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত নিয়মে চলিবে কিনা, এ সম্বন্ধে তিনি স্বীয় মত পরিবর্দ্ধিত রাজসিংহ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনটি চরিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হয়—কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি ও কাপালিক। প্রকৃতিপালিতা সরলা কপালকুণ্ডলাই কবির আশ্চর্য্য সৃষ্টি। আমরা সাহিত্য জগতে আরও দুইটি প্রকৃতিপালিতা রমণীর দেখা পাই, শকুন্তলা ও মিরাণ্ডা। আশ্রমপালিতা শকুন্তলা সংসারজ্ঞানবিরহিতা নহেন, মিরাণ্ডাও সংসারজ্ঞানশূন্য, এমন বলিতে পারি না; সংসারজ্ঞানশূন্যা হইলে প্রকৃতির কোমল বক্ষে পালিতা হইয়াও তিনি বলিতে পারিতেন না, "Sweet lord, you play me false!" কিন্তু কপালকুণ্ডলা স্বতন্ত্র সৃষ্টি। "কপালকুণ্ডলা কেবল মাত্র প্রকৃতির স্নেহে বর্দ্ধিত। ভীষণ নিষ্ঠুর পশুহৃদয় কাপালিকের স্নেহ, স্নেহই নহে। কঠিন পাষাণ নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার স্তূপ—বজ্রে গড়া করুণার ছদ্মবেশ।" কপালকুণ্ডলাকে কবি একেবারে সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা করিয়াছেন। বিবাহের কথায় যখন তিনি বলিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?" তখন বুঝিলাম তিনি

সংসারের কিছু বুঝেন না ; তাহার পর সংসারে প্রবেশ করিয়াও যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন না, ফুটিয়া ফুলের কি সুখ এবং বলিলেন "বোধ করি সমুদ্র তীরে, সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" তখন বুঝি লাম তিনি এখনও সেইরূপ সরলা। সেই সাগরতীরবর্ত্তী কানন যেমন স্নিগ্ধ সুন্দর, কপালকুণ্ডলাও সেইরূপ। কপালকুণ্ডলার আদর্শ সংসারী গ্রন্থকার বোধ হয় আপনার কল্পনা ব্যতীত আর কোথাও প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাঁহার ক্ষমতা এই যে, তিনি সে চরিত্রে আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তিনি একবারও বনবাসিনী কপালকুণ্ডলাকে সংসারজ্ঞানময়ী কপালকুণ্ডলা করেন নাই। কপালকুণ্ডলা যে সেই কপালকুণ্ডলা তাহার প্রমাণ শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ আনিতে গমন ও গ্রন্থশেষে শোচনীয় আত্মত্যাগ। "বঙ্কিমচন্দ্র" লেখক বলিয়াছেন, "এই স্বার্থময় কপটতাজড়িত সংসারে থাকিয়া থাকিয়া আমরা একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি—সরলতাময়ী পরময়ী কপালকুণ্ডলা তাই আমাদিগের এত ভাল লাগে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বনবাসিনীর উপযুক্ত স্থানে "সেই গম্ভীর নাদি বারিধিতীরে সৈকত ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে" তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, আর "সেই অনন্ত গঙ্গা প্রবাহ মধ্যে, বসন্ত বায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত" করিতে করিতে উপযুক্ত স্থানেই তাঁহাকে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র এক সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ; তিনি সুন্দরী মতিবিবিকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড় করাইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য্যের কাছে তাঁহার সৌন্দর্য্য ম্লান। তিনি যেন পাঠককে বলিয়াছেন, যে তুমি জান মতিবিবি বড় সুন্দরী, কিন্তু একবার আমার প্রতিভার দুহিতা কপালকুণ্ডলাকে দর্শন কর ; তাহার পর রোমিয়োর মত "I will make thee think thy swan a crow।" বাস্তবিক মতিবিবির পার্শ্বে কপালকুণ্ডলাকে দাঁড় করাইয়া লেখক যে কেবল তাঁহার রূপের গৌরব দেখাইয়াছেন এমন নহে, তিনি গুণেরও গৌরব দেখাইয়াছেন ; কারণ অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক আরও সুন্দর দেখায়, পাপের পার্শ্বে পুণ্য আরও স্বর্গীয় বোধ হয়। চরিত্র বৈপরীত্যে সৌন্দর্য্য আরও উছলিয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃতি অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক স্থাপিত করিয়া তাহার মাধুরী দেখান, চিত্রকর দুই বিষম্যময় বর্ণ পাশাপাশি স্থাপন করিয়া বর্ণের মাধুরী দেখান। বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি চরিত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা চরিত্র আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন—সে দুইজন সংসার-সুখসম্ভোগেচ্ছাবতী শ্যামা-সুন্দরী এবং ইন্দ্রিয়সেবারত ও প্রণয়বিদগ্ধ মতিবিবি। তিনি তাঁহার "প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয় সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" মতিবিবির চরিত্রে সেই কথাই পরিস্ফুট। এখানে তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে পাপের পঙ্কে পুণ্যের শতদল বিকশিত হইতে পারে—প্রণয় পরশ-পাতর স্পর্শে পাপপঙ্কিল হৃদয় নির্ম্মল হইয়া উঠে। অনুতাপানলবিদগ্ধা মতিবিবি যখন পেষ্‌মন্‌কে বলিলেন, "অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? * * * * ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলইত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আমি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র।" তখন পাঠকের মনে হয়, "ইন্দ্রিয় সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" ইহাই গ্রন্থের মহান্ নৈতিক উদ্দেশ্য।

কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি উভয়েরই হৃদয়ে স্বাধীন থাকিবার প্রবল বাসনা। "উভয়েই স্বাধীনা—স্বেচ্ছাচারিণী—কিন্তু একজনের ইচ্ছা নির্ম্মল সলিলরাশির ন্যায় বক্ষদেশে বিমল চন্দ্রালোক প্রতিবিম্বিত করিয়া বিজন কাননাভ্যন্তরে আপন মনে বহিয়া যাইতেছিল, অপরের অভিলাষ অদৃষ্টদোষে পঙ্কিলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রখর সূর্য্যালোকে কলঙ্করাশি সুপ্রকাশিত করিয়া বহুজনসমাকুল নগর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল।" প্রথম হইতেই মতিবিবি আপনার বাসনা সংযত করিতে অভ্যাস করে নাই। পতিপ্রেম হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া যুবতী পাপ-পথে ধাবিত হইতে লাগিল—গরল পান করিতে লাগিল। শেষে সমস্ত হৃদয় বিষাক্ত হইয়া গেল। তখন মহাকবি বায়রণের মত মতিবিবিও সেই অবস্থাপন্ন। ঃ—

"Untaught in youth my heart to tame
My springs of life were poisoned."

মতিবিবি কখন প্রেম দেয় নাই, কিন্তু

"এ সুখ ধরণীতে কেবলি চাহনিতে,
জান না হবে দিতে আপনা,

স্নেহের ছায়া ফেলি কখন্ যাবে চলি
বরিবে সাধ করি বেদনা !"

বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে অগ্নিতে পুড়িলে অঙ্গারের মলিনত্ব লোপ পায়। ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগেচ্ছাবতী মতিবিবি অনুতপ্তা হইল। দিল্লীর সম্রাটের সিংহাসনার্দ্ধের আশা ত্যাগ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রেমের জন্য পাগল হইল। শেষকালে বলিল,—"বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিয়ো, কেবল চক্ষুঃ পরিতৃপ্তি করিব।"

শার্দ্দূলচর্ম্মাবরণ, অস্থিভূষণ, ছিন্নশির-গলিত-শবাসন ভীষণ কাপালিক গ্রন্থ মধ্যে একটি প্রধান চরিত্র; সে নিষ্ঠুরতার স্তূপ।

গ্রন্থের আর দুইটি বিষয়ে কিছু বলিলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হয়। প্রথম ভবানীর পদ হইতে ত্রিপত্রচ্যুতি, দ্বিতীয় স্বপ্নদর্শন। এই দুইটি গ্রন্থের গল্পাংশকে কতক পরিমাণে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন করিয়াছে মাত্র। স্বপ্ন এখনও একটা অমীমাংসিত অদ্ভুত ব্যাপার। তাহা কি বর্ণে বর্ণে সত্য হয়? গ্রন্থে এই সকল সন্নিবেশ করা কেন? তবে গ্রন্থকার বোধ হয় স্বপ্নাদিতে বিশ্বাস করিতেন, তাই এত গ্রন্থে সে সকল আসিয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

জগদ্রাম রায়।

(২)

প্রথম প্রস্তাবে জগদ্রাম রায়ের কবিতা সম্বন্ধে শিবদাস বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পাঠকগণকে শুনাইয়াছি। এই প্রস্তাবে তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিছু কবিতা পাঠকগণকে উপহার দিব।

যাঁহারা কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, রামচন্দ্র লঙ্কাপুরে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস যেরূপে এই পূজার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অল্প অল্প অস্বাভাবিকের গন্ধ পাওয়া যায়; কারণ, কৃত্তিবাসে বর্ণিত হইয়াছে যে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাবণ দুর্গাকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি রাবণকে রক্ষা করিবার জন্য

রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। রামচন্দ্র দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই চারি দিন দেবীর পূজা করেন; পরে পঞ্চম দিনে অর্থাৎ দশমীতে দেবীর নিকট বর গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ স্থলে রাবণকে বধ করেন। রামচন্দ্র যে পাঁচ দিন দেবীর পূজায় নিযুক্ত ছিলেন, সে কয়েক দিন রাবণ রণস্থলে বসিয়া রহিল। এ'টা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না? জগদ্রাম রায় কিন্তু অস্বাভাবিকের দিকে যান নাই। তাঁহার মতে রামচন্দ্রের এই দেবী-পূজা লঙ্কাতে না হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার কাননে হয়। কিষ্কিন্ধ্যাতে এ পূজা কেন হয়, তাহার কারণ জগদ্রাম এইরূপ দিয়াছেন।—

হনূমান সীতাদেবীর অন্বেষণ করিয়া আসিলে পর রামচন্দ্র তাঁহাকে লঙ্কার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে বলেন। হনূমান প্রভুর আদেশ মত লঙ্কার বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থানে বলিলেন,—

"দশানন রাবণ সে বিদিত সংসারে।
শঙ্কর শঙ্করী-পদ সদা সেবা করে॥
পূর্ব্বে হরগৌরী বর দিলেন রাবণে।
সমরে সহায় মোরা হব দুই জনে।
শূল খড়্গ ধরি রণে অগ্রেতে থাকিব।
তোমা সনে রণে সব পরাভব হব (১)॥
পশুপতি পার্ব্বতীতে পুত্র ভাব গণে।
তে কারণে ত্রিভুবন তৃণ তুল্য গণে॥"

হনূমানের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া বিষণ্ণ চিত্তে,—

"সুগ্রীব মিতায় কন দেব রঘুমণি।
রাবণ সতত সেবে শিবা শূলপাণি॥
ভক্তিতে ভজিয়া ভুলায়েছে ভোলানাথে
সে ভাবে ভবানী ভব আছেন লঙ্কাতে॥
পুত্র ভাবে ভগবতী দিয়াছেন বর।
যাঁর তেজ ধরে সেই রাজা লঙ্কেশ্বর॥
বিবরণ সকল কহিল হনূমান।
অতেব ভাবহ মিতা তার অনুষ্ঠান॥
যেকালে লঙ্কাতে যাব রাবণ বধিতে—
অব্যাজে আসিব (১) রাজা সংগ্রাম করিতে॥
পরাভূত হয়্যা দ্রুত যাইয়া ভবনে।
সঙ্কটে সেবিব (১) শিব দুর্গার চরণে॥
দাসের দুঃখেতে দুঃখী হয়্যা দুই জনে।
লঙ্কা জন্য যদ্যপি আসিয়া মোর স্থানে॥
রাবণে অভয় দিতে বলেন শঙ্কর।
রাক্ষসে করিতে হবে অজয় অমর॥
সঙ্কট আগামী আমি কহিনু তোমায়।
জানকীর উদ্ধারে পড়িল বড় দায়॥"

এই বাক্য শুনিয়া,—

"সুগ্রীব কহেন নাথ এ অতি আনন্দ।
বিনা যুদ্ধে সীতারে পাইব রামচন্দ্র॥
আশ্বাস (২) ঘুচিল ইথে ভাব মনে মনে।
সীতা ভেট দিয়া শিব মাগিব (১) রাবণে॥
রাবণ করুক কার্য্য আপন লঙ্কাতে।
আমরা অযোধ্যা যাব সীতা লঞা সাথে॥"

---

(১) জগদ্রাম রায়ের গ্রন্থে প্রায় সকল স্থানেই তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়াপদ এইরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বোধ হয় তাঁহার সময় এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

(২) হস্তলিখিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় আশ্বাস শব্দ প্রায় সকল স্থানেই আশঙ্কা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, "উপায় করিয়া গেলে আশ্বাস ঘুচিবে।" ঠিক বলিতে পারা যায় না গ্রন্থকর্ত্তার সময়ে আশ্বাস শব্দ আশঙ্কা অর্থে ব্যবহৃত হইত কিম্বা লিপিকরের ভ্রম বশতঃ এরূপ ঘটিয়াছে।

রামচন্দ্র কিন্তু এই উপদেশে আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি সুগ্রীবকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন।

"শ্রীরাম বলেন মিতা পূর্ব্ব কথা বলি।
যে কালে হরণ হৈলা প্রাণের মৈথিলী॥
প্রতিজ্ঞা করেছি যেবা হরিল বনিতা
সবংশে বধিয়া তারে উদ্ধারিব সীতা॥
রাবণে অভয় দিলে নষ্ট হৈল পণ।
শ্রীরামের নহে কভু দ্বিতীয় বচন॥
বিফল সাধন মোর নাহিক ধনুকে।
মোর পণ ভঙ্গে পীড়া পাব (১) তিন লোকে॥
নিজ নারী করি ত্যাগ পণ ত্যাগ নারি।
ইহার বিধান বল বানরাধিকারী॥"

ইহার উত্তরে—

"সুগ্রীব বলেন নাথ এ কোন ভাবনা।
তুষ্ট নষ্টে শিব কেন করিবেন মানা॥
তোমার যে দ্রোহী বটে, শিব দ্রোহী সে।
অভিন্ন তোমাতে তাঁথে কি আশ্চর্য্য এ॥"

সুগ্রীবের এই যুক্তি শুনিয়া ভক্তবৎসল রামচন্দ্র যাহা উত্তর করিলেন, তাহা তাঁহারই মুখে শোভা পায়।

"শ্রীরাম বলেন মিত্র সে কথা নিশ্চয়।
শিব রামে ভেদ হইলে বেদ মিথ্যা হয়।
কিন্তু সেবকের জন্য সর্ব্ব কর্ম্ম হয়।
ভক্তের ভাবেতে বেদবিধি নাহি রয়॥
কোন্ শাস্ত্রে বলিয়াছে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে?
উচ্ছিষ্ট খাইনু কেন শবরীর স্থানে?
চণ্ডালে করিতে স্পর্শ কোন্ শাস্ত্রে বলে?
সখা ব'লে কোলে নিনু গুহক চণ্ডালে॥
বিপ্র নারী অহল্যা সে আমার পূজিত।
তাঁরে পদ রজঃ দিনু এ কোন্ বিহিত?
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার হেতু।
গর্ভবাস সহ্য করি হয়ে দেবকেতু॥
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম ঘটে ভক্তের পিরীতে।
ভক্তাধীন নাম তেঁই বলয়ে জগতে॥
ভক্তের যে বাসনা এড়ান নাহি যায়।
নিজ প্রাণ দিতে হয় ভক্ত যদি চায়॥
ভক্ত হইতে পূজ্য নহে জনক জননী।
দাসের সদৃশ দারা সুত নাহি গণি॥
বেদ বিপর্য্যয় কর্ম্ম হয় ভক্ত হৈতে।
সেবক সদৃশ বস্তু নাহি ত্রিজগতে॥
অতেব শত্রুর বাক্য নারিব হেলিতে।
ভকত বৎসল নাম যাব (১) সীতা হইতে॥
বরঞ্চ থাকুন সীতা রাবণ ভবনে।
বৈষ্ণব প্রধান শিবে লঙ্ঘিব কেমনে॥"

সুগ্রীব শুনিয়া কহিলেন, তবে উপায়? রামচন্দ্র কহিলেন, উপায় আছে।

"অকালে অম্বিকা পূজা করিয়া আশ্বিনে।
বিজয়া দশমী যাত্রা করহ দক্ষিণে॥
আশুতোষ হন সে ভবানী-ভূতপতি।
সাদরে সেবিলে সে সন্তোষ হব (১) অতি।
ভক্তি করি পূজিলে ভুলিব (১) ভোলানাথ।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ হব (১) ঘুচিব (১) উৎপাত॥
নিজে ভোলানাথ হন নাহি আত্ম-পর।
সন্তুষ্ট হইলে দিব নাহি হেন বর (৩)
অতএব পূজ ভব ভবানী সহিত।
কায়মন বাক্যে সেব যাতে হন প্রীত॥
দোঁহা তুষ্ট করি আগে রাবণে মারিব।
অবশ্য শঙ্কর শিবা অনুকুল হব (১)॥"

এই কারণে দেবী-পূজা কিষ্কিন্ধ্যাতেই হয়। জগদ্রাম রায়ের রামে দূরদর্শিতার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামে অন্যান্য গুণ ষোল কলায় পূর্ণ থাকিলেও দূরদর্শিতার পরিচয় বড় মিলেনা। কৃত্তি-

(৩) এমন কোন বর নাই যাহা তিনি সন্তুষ্ট হইলে না দিতে পারেন।

বাসের রামায়ণে দেখুন, যেখানে যেখানে রামচন্দ্র মন্ত্রণা করিতে বসিয়াছেন, সেই সেই স্থানে নিজে কিছুমাত্র মন্ত্রণা না করিয়া, কেবল, ভারতবর্ষের মিত্র রাজাদের রেসিডেণ্টের মতে মত দেওয়ার ন্যায়, জাম্বুবান বা বিভীষণের মতে মত দিয়াছেন। জগদ্রামের রাম সেরূপ নহেন। তিনি মন্ত্রণার জন্য মন্ত্রিগণকে আহ্বান করেন বটে, কিন্তু পরের হাত তুলা দেখিয়া তিনি নিজে হাত তুলেন না। তিনি সকলের মত শুনিয়া নিজের একটা মত স্থির করেন। আমার এই কথা শুনিয়া কেহ এমন মনে করিবেন না যে, আমি কৃত্তিবাস অপেক্ষা জগদ্রামকে বড় বলিতেছি। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে আত্মবিস্মৃত করিয়া এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জগদ্রামের রাম আত্মবিস্মৃত নহেন। তিনি আপনাকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলিয়া জানেন; সুতরাং তিনি অন্যের হাতে কাঠের পুতুল হইবেন কেন?

তাজমহল কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ যদি তাজমহল হইতে একটি প্রস্তর আনিয়া দেখায়, তাহা হইলে যেমন হয়, কোন কাব্যের পরিচয় দিবার জন্য কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলেও প্রায় তেমনই হয়। তথাপি উপায়ান্তর অভাবে আমরা প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছি। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র কায়মন ঐক্য করিয়া সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি হস্তে দেবীর আবাহন করিতেছেন,—

"আগচ্ছ আগচ্ছ দুর্গা প্রতিমা ভিতরে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ নারায়ণি প্রণতি তোমারে।
প্রসীদ, পার্ব্বতি, দেবি, আনন্দদায়িনি,
নবদুর্গা শুদ্ধচিত্তে শত্রুসংহারিণি।
দুর্গা দেবি ইহাগচ্ছ পূজাসন্নিধানে।
যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর মা নিজ গুণে॥
রক্ষা কর দক্ষসুতা, সপক্ষ হইবে।
অধিষ্ঠান হবে গো অম্বিকা সদাশিবে॥
দেবি, জগন্মাতা সৃষ্টি-সংহারকারিণি।—
শরতে সরতে পূজা নও মা তারিণি।
ত্রাণ-কর নেত্রে-হের শঙ্করবনিতা।
যাবৎ পূজিব তাবৎ থাক জগন্মাতা॥
তব আগমনে যে যে দেবেরাগমন।
সে সব সহিত আমি করি আবাহন।
সংসার সাগর পারে তুমি সে তরণী।
তরাবে তাপিত জনে তারা ত্রিলোচনি॥—
উর মাতা মহিষ-মর্দ্দিনি প্রতিমাতে।
পঞ্চানন, ষড়ানন, গজানন সাথে॥
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে এ'স ত্বরাপর।
কৈলাস ত্যজিয়া মাতা মেড়ে (৪) কর ভর।
ভৈরব সহিত ভীমা আইস ভূতলে।
সেবিব বিমল পদ শীতল কমলে॥
লাল জবাযুত রক্ত চন্দনে চর্চ্চিয়া।
আমোদে ওপদে দিয়া পূজিব অভয়া॥"

রামচন্দ্র একে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাহার উপর তিনি ভক্তির সহিত দেবীর আবাহন করিতেছেন; সে পূজা কখন কি বিফল হইতে পারে? তাহার অন্তরের সহিত মা মা বলিয়া ডাকার ফল ফলিল; কৈলাসে

(৪) মেড়—প্রতিমাপঞ্জর।—

হরগৌরী একাসনে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাদের আসন টলিয়া উঠিল। অমনি,—

"করপুটে কাত্যায়নী, প্রণমিয়া শূলপাণি
জিজ্ঞাসা করেন বিবরণ।
বল প্রভু ভূতনাথ, কেহ হেন অকস্মাৎ
টল মল করয়ে আসন॥
শুন ত্রিনয়ন প্রভু, বাম অঙ্গ নাচে কভু
দক্ষ অঙ্গ স্পন্দয়ে কখন।
কভু থাকি হর্ষ মনে, কভু প্রাণ কাঁন্দে কেনে
হরষ বিষাদ হয় মন॥
কি জানি কি লভ্য হয়, না জানি কি অপচয়,
বুঝিতে না পারি কিছু আমি।
ক্ষণে দন্তে জিহ্বা কাটে ক্ষণে মনে হর্ষ উঠে,
একি বটে বল মোর স্বামি॥"

কবির কেমন রচনাকৌশল দেখুন। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেবীর পূজা করিতেছেন, তাই মায়ের কখন বাম অঙ্গ নাচিতেছে, কখন বা মনে হর্ষ উদয় হইতেছে; এদিকে ভক্তপ্রধান রাবণের বিনাশ হইবে, তাই মায়ের কখন দক্ষিণ অঙ্গ নাচিতেছে, কখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, কখন দন্তে জিহ্বা কাটিতেছেন, কখন বা হর্ষে বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র যতই অন্তরের সহিত মা মা বলিয়া ডাকিতেছেন, কৈলাসে মায়ের অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি হইতেছে। পরিশেষে তিনি আর স্থির হইতে না পারিয়া মহাদেবকে পুনরায় কহিলেন,—

"স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, কেবা ডাকে দুর্গা বলে,
কে পড়িল বিষম সঙ্কটে।
স্থির হৈতে নারি আর, বল বটে কি প্রকার,
দ্রুত যাব তাহার নিকটে॥"

ইহা অপেক্ষা জগন্মাতার মাতৃস্নেহের জলন্ত দৃষ্টান্ত, এইরূপ অল্প কথায় বর্ণিত হইতে প্রায় দেখা যায় না। দেবীর এইরূপ অস্থিরতা দেখিয়া মহাদেব ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে রামচন্দ্রে পূজার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার

"পুলকে পুরিত গাত্র, প্রেমে ছল ছল নেত্র,
আনন্দ উথলে মনে ঘন।"

তিনি ধ্যান হইতে উঠিয়া দেবীকে কহিলেন,—

"শিব কন শুন শিবা, আজি অতি শুভ দিবা,
পরম আনন্দ ক'রে মানি।
কিষ্কিন্ধ্যা কাননে হরি, প্রতিমা প্রকাশ করি
তোর পূজা করিছেন তিনি॥

নির্ম্মাইয়া দশভুজা, আশ্বিনে তোমার পূজা,
প্রকাশিলা রাজীবলোচন।
ষাটি সহস্রেক মুনি, সঙ্গে লঞা চক্রপাণি,—
তোমার করেন আবাহন॥
সে পূজা বসন্তে ছিল, সে শরৎ কালে হৈল
ইহা বৈ * কি আনন্দ আর।
প্রভু রাম কৃপানিধি তিনি পূজা কৈলা যদি,
তবে হৈল সংসারে বিস্তার॥
বাম অঙ্গ নেচে উঠে, এই সে মঙ্গল বটে,
চল চল চণ্ডিকা চপলে।
শুহ গজানন নেহ, ব্যাজ আর না করিহ
লঘুগতি চল ভূমিতলে॥"

রামচন্দ্রের পূজায় মহাদেব সুখী হইলেন বটে, কিন্তু জগন্মাতা সুখী হইতে পারিলেন না; কারণ স্ত্রীলোকদের মনের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা থাকিলে তাঁহারা শুভসংবাদে সুখ অনুভব করিতে পারেন না। মায়ের দক্ষিণ অঙ্গ নাচিতেছে, এবং কেন নাচিতেছে, তাহা মহাদেব প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন না; এই কারণে পূজার কথায় সুখী না হইয়া তিনি পুনর্ব্বার মহাদেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শঙ্করের কথা শুনি বলেন শঙ্করী। বিবরণ ত্রিলোচন বলহ এখনি॥
বাম অঙ্গ নৃত্য প্রভু বলিলে বিচারি॥ শ্রীরাম করেন পূজা কি কার্য্য বিশেষ।
দক্ষ অঙ্গ নাচে তাথে কিবা হবে হানি। বিবরণ বনিতারে বল ব্যোমকেশ॥"

এই প্রশ্ন শুনিয়া শিব কিছু বিপদে পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে রাবণবধের কথা ভগবতীর প্রীতিকর হইবে না; সেই জন্যই তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত সংবাদ গোপন করিয়া কেবল বাম অঙ্গ নাচার শুভ-ফল বলিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে দক্ষিণ অঙ্গ নাচার ফল না বলিলে ভগবতী ছাড়িবেন না, তখন অগত্যা মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনে গমন করিলে রাবণ তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতা দেবীকে হরণ করিয়াছে। রাবণ তোমার দাস, সেই জন্য রামচন্দ্র তোমার পূজা করিতেছেন।" পরে কহিলেন—

"তোমারে করিয়া তুষ্ট মাগিবেন বর। রাবণ হইবে নাশ এই মাত্র হানি॥
সবংশেতে ধ্বংশ হবে রাজা লঙ্কেশ্বর॥ এই অপচয় তেঞি নাচে দক্ষ অঙ্গ।
এ নিমিত্তে পূজা চিত্তে ভাবহ ভবানি। অল্প দায় বটে মন না করিহ ভঙ্গ॥

* বৈ—অপেক্ষা।

মহাদেব হিসাব করিয়া বাকী কাটিয়া দেখাইয়া দিলেন যে লোকসান হইতে লাভের ভাগ বেশী এবং দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন—

"পিত্তল বিফল হয় পাইলে কাঞ্চন।
ইন্ধন করয়ে ত্যাগ পাইলে চন্দন॥
কূপ জল দিয়া যদি পাই গঙ্গাজল।
শুক্তির বদলে প্রিয়ে পাই মুক্তাফল॥
পাষাণ ব্যয়েতে যদি স্পর্শ-মণি মিলে।
এ সকলে হানি কি পরম লভ্য বলে॥
রাবণে ত্যজিলে যদি রাম তুষ্ট হন।
ইথে হৈতে লভ্য কিবা ত্রিভুবনে ধন॥"

এইরূপ প্রায় প্রত্যহই দৃষ্টিগোচর হয় যে একটী স্ত্রীলোক আপনার প্রিয়তম পতির নিকট বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছেন এবং নানা প্রকারে পতির মনস্তুষ্টি করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। এমন সময় স্বামী যদি কোন কারণ বশতঃ ঐ আদর্শ পত্নীর সম্মুখে আপন পুত্রকে ভর্ৎসনা বা প্রহার করেন, তবে তখন আর স্ত্রীলোকটীর পত্নীভাব থাকে না। মাতৃস্নেহের প্রবল স্রোত হৃদয়ে উত্থিত হইয়া ঐ আদর্শ পত্নী-ভাবকে একেবারে ডুবাইয়া দেয়। তখন তিনি প্রিয়তম পুত্রকে কোলে লইয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতে থাকেন। আজ জগজ্জননীর সেই দশা উপস্থিত হইল। এতক্ষণ তিনি আর্য্য-রমণীর আদর্শ পত্নীভাবে মহাদেবের নিকট বসিয়াছিলেন; কোন কথা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইলে স্বামীর পদে প্রণতা হইয়া করপুটে উক্ত কথা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কিন্তু ভক্ত-প্রধান রাবণের বিপদ শুনিতে পাইয়া এবং মহাদেবকে সেই বিপদের সহায় বুঝিয়া সে আদর্শ পত্নীভাব ক্ষণকালের জন্য লোপ পাইল এবং প্রবল মাতৃস্নেহ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। জগদ্রাম রায়ের এই স্থানের বর্ণনা এত সুন্দর যে আমি সমস্তটুকু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"ভক্তের বিপত্তি হবে চিত্তে ভেদ হইল।
লোহিত লোচন দেহে ঘর্ম্ম উপজিল॥
কলেবর থর থর কম্পিত অধর।
মহাদেবে মহামায়া করেন উত্তর॥
কি বলিলে কাশীনাথ অল্প দায় বটে?
যে কথায় প্রাণ যায় হিয়া মোর ফাটে॥
দ্বি-গুণ আগুণ মোর উঠিল জ্বলিয়া।
সেবক বধের কথা কর্ণেতে শুনিয়া॥
শুন পশুপতি এবে বলি যে উচিত।
ভূত ভবিষ্যতে হেন না দেখি এ রীত॥
জননী জনক ভাবে যেমতি বালকে।
যারে ভজে সে ভাবয়ে তেমতি সেবকে॥
সেবক প্রভুতে হয় এমন সম্বন্ধ।
ভক্তের আনন্দ হইলে প্রভুর আনন্দ॥
দাসের দুর্গতি হৈলে স্বামী দুঃখ মানে।
এইরূপ আচার করয়ে ত্রিভুবনে॥
তুমি হে অখিল-স্বামী কি বল বচন।
কৌশল করিয়া বুঝি বুঝ মোর মন॥
একবার শিব বলি যদি কেহ ডাকে।
শূল ধরি শঙ্কটে সহায় হও তা'কে॥
উগ্র তপ জপ কত করিল রাবণ।
ধ্যান করি যুগ ধরি কৈল অনশন॥
এক পদে তা'পর সহস্র বর্ষ ছিল।
সহস্র পূর্ণেতে এক মুণ্ড কাটি দিল॥
দশম হাজার বর্ষে দশ শিরঃ দিয়া।
তব পদ সেবিল সকল তেয়াগিয়া॥

সে কালে সরল হৈয়া কিনা বর দিলে।
পুত্র বলে অগ্নিকুণ্ড হ'তে তুলে নিলে॥
মোর কোলে দিয়া পুনঃ বলিলে আমারে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণের ভার লাগে তোরে॥
তদবধি হৈল মোর লঙ্কা পুরে বাস।
উগ্রচণ্ডা খাণ্ডা ধরি রক্ষা করি দাস॥
রাবণ ভুবনে মোর ভকত প্রধান।
কার্ত্তিক গণেশ নহে তাহার সমান॥
পুত্রভাব রাবণের জানয়ে সংসারে।
সে যদি মরিবে ধিক্ থাকুক আমারে॥"

সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোকেরা কোন্দলের সময় নিজের ক্ষমতা অল্প জানিতে পারিলেই ক্রন্দন করিয়া সেই ক্ষমতার অভাব পূরণ করেন; কিন্তু আদ্যাশক্তি নিজের ক্ষমতা বেশ বুঝেন। তিনি জানেন যে তাঁহার শক্তির অংশ মাত্র লইয়া এই বিশ্বরাজ্য চলিতেছে; তাই সগর্ব্বে মহাদেবকে কহিলেন,—

"আমি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মোর খ্যাতি।
মোর দাস করে নাশ কাহার শকতি॥
প্রচণ্ডা চামুণ্ডা আমি খাণ্ডা ধরি যাব।
রাবণেরে পৃষ্ঠে রাখি সংগ্রামে দাণ্ডাব॥
দেখিব দানব দৈত্য অসুর রাক্ষস।
সুপর্ণ পন্নগ যক্ষ দেবের সাহস॥
ভূত প্রেত পিশাচ গন্ধর্ব্ব বেতালেতে।
নর কি বানর যেবা আসিবে সাক্ষাতে॥
সমূলেতে সংগ্রামেতে সংহার করিব।
ভক্তের কারণে ভূমি শোণিতে ভাসাব॥
নিশুম্ভ শুম্ভেরে আমি নাশ কৈলাম ক্ষণে।
মহিষ-মর্দ্দিনী নাম্ কি লুকা'ল ভুবনে॥
মহি অহি সহিত করিব সর্ব্বনাশ।
তথাপি রাখিব হে রাবণ নিজ দাস॥
মোর দাস নাশ কেবা সাধ করে মনে।
সর্ব্ব-সংহারিণী নাম্ কি লুকা'ল ভুবনে॥"

মাতৃস্নেহের প্রবল স্রোতে জগন্মাতার হৃদয়ে পত্নীভাব ডুবিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা একেবারে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। প্রবল বন্যাতে ভাসমান তৃণের ন্যায় এক এক বার পত্নীভাব মাতৃস্নেহের প্রবল স্রোত ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। তাই মা পুনর্ব্বার কহিলেন,—

"অন্য জন যদি হেন বচন বলিত।
উগ্রচণ্ডা নিকটে এখনি ফল পাইত॥
তুমি স্বামী দারা আমি তেঞি সহ্য হৈল।
এ কথা কহিতে মুখে লজ্জা না জন্মিল॥"

পরে জগন্মাতা সামান্যা রমণীর ন্যায় মহাদেবকে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

"তুমি হে যেমন, বলিলে তেমন,
এমতি তোমার কায়।
তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়,
তেঞি সে এমন সাজ॥
এই করিয়া, সব খোয়াইয়া,
হয়েছ দিগম্বর।
তোমার গুণে, বিবিল খুণে,
আমার অন্তর॥
বিভূতি গায়, দেবের সভায়,
যে যায় নাংটা বেশে।
এত কথা, বলিতে হেথা.
লাজ কি মুখে এসে॥
ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে,
চলিতে ঠাহর নাই।
জটার ঘটা, বিভূতি ফোঁটা,
দেখিলে ভয় পাই॥
যাবত কাল, হাড়ের মাল,
ভূতের সনে খেলা। (৫)
নাচিলে কেনে, তোমার সনে,
ফিরিছে দানবগুলা॥
কিসের ভাবে, দেবতা সবে,
চরণ দুটা পুজে।
বুঝিতে নারিলাম, ভাবিয়া মরিলাম,
পুড়িল এ সব লাজে॥

(৫) "ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।" ভারতচন্দ্র।

* * *
হেন নহিলে, সব খোয়া'লে,
কাঁধে করিলে ঝুলি।
ভেক করিয়া, ভিক্ষা মাগিয়া,
ফিরিছ কুলি কুলি॥ (৬)
ক্ষণেতে রোষ, ত্বরিতে তোষ,
দোষগুণ সমজ্ঞান।
শ্মশান বাস, সদা উদাস,
উপহাস নাহি মান॥
আচার বিচার, নাহিক তোমার,
যার তার ঘরে খাও। (৭)
বদন বাদ্য, করিলে সদা—
তখনি ভুলে যাও॥"

পরে তিনি সোজা কথায় মহাদেবকে বলিলেন,—

"তোমার পারা, হইবে যারা,
তারা বুঝিতে পারে।
আপনার দাস, তাহার বিনাশ,
শিবা দেখিতে নারে॥
অশেষ মত, বুঝাতে কত,
পারিব ত্রিলোচন।
বলি হে উজা, (৮) চাই না পূজা,
বাঁচুক রাবণ ধন॥"

নিম্ন শ্রেণীর কবি হইলে তিনি মহাদেব দ্বারা ভগবতীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে রাবণ অতিশয় পাপী এবং রামচন্দ্র অতিশয় ধার্ম্মিক পুরুষ। অতএব রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের সহায় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জগদ্রাম রায় সে শ্রেণীর কবি নহেন। জগদ্রামের মহাদেব এক জন প্রধান Politician এবং নারী-চরিত্রের পারদর্শী। তিনি বেশ বুঝিয়া-ছিলেন যে ভগবতী যেরূপ রাগান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে রাম বড় কি রাবণ বড় লইয়া তর্ক-বিতর্ক উঠাইলে একটি ছোট খাট রকমের ফৌজদারী হইবার খুব সম্ভব। তিনি একে বৃদ্ধ তাহার উপর,—

"ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে,
চলিতে ঠাহর নাই।"

কি জানি ফৌজদারীতে গিয়া কোন কথা ভুল বলিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহার ঘাড়ে পিনাল কোডের ২১১ধারা চড়িতে পারে; সেই জন্য তিনি ফৌজদারীর দিক দিয়া চলিতে নারাজ। এই সকল নানা কারণে মহাদেব রাম রাবণের কথাটা উড়াইয়া দিলেন। তিনি নারী-চরিত্র বুঝিতে বেশ সক্ষম ছিলেন। তিনি বুঝিতেন যে রমণী-হৃদয়ে একবার রোষ উপস্থিত হইলে লজ্জার উদ্রেক ব্যতীত উক্ত রোষ সহজে যায় না; সেই কারণে অন্য কথার উল্লেখ না করিয়া যে কথায় ভগবতীর লজ্জা জন্মিতে পারে, সেই কথা পাড়িলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে ভগবতীকে কহি-লেন—

(৬) কুলি—রাস্তা।
(৭) "বেদাচার বহিষ্কৃত।" ভারতচন্দ্র।
(৮) উজা—উজু। বাঁকুড়া জেলায় উজু শব্দ সোজা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"শুন লো শিবা, বলিব কিবা,
তোমার গুণের কথা।
কহিলে মরম, পাইবে সরম,
গণপতির মাতা॥
পূর্ব্বকালে রণস্থলে
রক্তবীজ নাশে।
ভীষণ আকার, কর মার্ মার্
দেবতা পলায় ত্রাসে॥
নগ্ন কালী, মুণ্ডমালী,
লহ লহ করে জিহ্বা।
করাল বদন, বিকট দশন,
গলিত বসন কিবা॥
* * * * *
যোগিনী সঙ্গ, সব উলঙ্গ,
তোমার সনে নাচে।
অসুর অমর, করে থর থর,
ভয়ে না এসে কাছে॥
গুহ গজানন, ভাই দুই জন,
মা বলিয়া কাছে গেল।
মায়ের সজ্জা, দেখিয়া লজ্জা-
সাগরে ডুবিয়াছিল॥
বধিয়া বৈরি, নাচ ফিরি ফিরি,
ঘন ঘন দাও লম্ফ।
অহি মহীযুত, কমঠ পীড়িত,
ত্রিজগত ভয়ে কম্প॥
ভূমি টলমল, যায় রসাতল,
চরাচর ডুবে জলে।
খাইয়া সিদ্ধি, পাগল বুদ্ধি,
পড়ি তোর পদতলে॥
এ সব মনে, পড়িবে কেনে,
সে গেল অনেক দিন।
তে কারণে কৈ, মোর হৃদে এই,
দেখ তোর পদ চিন্॥" (৯)

মহাদেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কারণ,—

"পতির বাণী, শুনি ভবানী,
হরের হৃদয়ে চান।
চরণাঙ্কিত, হৃদি ভূষিত,
নিজে দেখিতে পান॥
হৈলা লজ্জিত, কোপ বর্জ্জিত,
গদগদ অধোমুখী।
অতি প্রমোদে, হরের পদে,
পড়িল যুগল আঁখি॥"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, সমুদয়ই জগদ্রাম-রচিত দুর্গাপঞ্চরাত্রি হইতে। অতঃপর জগদ্রামের প্রধান কাব্য অদ্ভুত রামায়ণের কথা বলিব।

শ্রীবলরাম বন্দোপাধ্যায়।

"ছেলেটী যেন কার্ত্তিক।"

কালিদাসের কুমার-সম্ভব বোধ হয় অনেকে পড়িয়াছেন—নিদান তাহার কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। অথবা এই মহাকাব্যের কথা জানা না থাকিলেও পুরাণবিবৃত কুমারের জন্মবৃত্তান্ত অনেকের বোধ হয় জানা আছে। তারক নামে এক অসুর এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়। সে এরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে যে দেবতারা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। কাজেই তাহাকে মারিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। জানা গেল মহা-

(৯) চিন্—চিহ্ন।

দেবের ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন কেহই তারকাসুরকে বধ করিতে পারিবেন না। কাজে কাজেই দেবগণ শিবের শরণাপন্ন হইলেন। ইহার ফল শিবের সহিত উমার বিবাহ এবং কুমারের জন্ম। ক্রমে ইনি দেবসেনাপতিরূপে বরিত হন এবং তারকাসুরকে বধ করেন।

কুমার দেবসেনাপতি—কাজে কাজেই মহাবীর। শিবদুর্গার পুত্র বলিয়াও দেবসমাজে ইহাঁর খুব প্রতিষ্ঠা। বঙ্গদেশে আজও ইহাঁর সঙ্গে বৎসরে আমাদের দুইবার দেখা হয়। শারদীয় পূজা উপলক্ষে মাতার সঙ্গে ইনি অনেক বঙ্গগৃহে একবার আবির্ভূত হন, কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে ইনি একলা আসেন। বাসন্তী পূজার উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহা দেশে অতি বিরল।

ছেলেবেলা আমরা যে কার্ত্তিককে দেখিতাম, তিনি সুন্দর যুবাপুরুষ, তাঁর বাউরি কাটা চুল, ওষ্ঠে গোঁফের রেখা, ফিন ফিনে ধুতি পরিহিত, গলায় কোঁচান উড়ানি দোদুল্যমান, পায়ে জরির জুতা, ময়ূরাসন, ও এক হাতে একটা ছোট ধনু এবং আর এক হাতে একটা ছোট তীর। আজ কাল তাঁর একটু ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তাঁর বাউরি কাটা চুলের পরিবর্ত্তে এলবার্ট টেরি, জরির জুতার পরিবর্ত্তে পায়ে ইংরাজী জুতা ও গাত্রে কোট দেখা দিয়াছে। বুট জুতা ও মোজা এখনও শ্রীঅঙ্গে উঠে নাই, কিন্তু যদি হিন্দুয়ানি বজায় থাকে, ক্রমে যে তাহা হইবে না, কে বলিতে পারে? এবং আমরা না দেখিতে পাই, আমাদের পুত্র কিম্বা পৌত্রেরা ক্রমে যে দেবসেনাপতির পরণে পেণ্টুলান, মাথায় পিরালী পাগড়ি, মুখে চুরট ও চক্ষে চসমা দেখিতে পাইবে না, তাহা বলা যায় না। অবশ্য আমরা ধরিয়া লইলাম, তাহাদের সময়ে আজকালকার সুসভ্য পোষাক বজায় থাকিবে।

কুমারের পোষাকের এরূপ ক্রম পরিবর্ত্তনের কারণ কি? অনেকেই বলিবেন, কালমাহাত্ম্য। ইংরাজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার খরস্রোত দেশ মধ্যে বহিতেছে। আমাদের গৌরবস্থল ঊনবিংশ শতাব্দীর ঢেউ যে দেবমহলে না পৌঁছিবে কেন তাহার কারণ বুঝা যায় না। যে সভ্যতার খাতিরে কার্ত্তিকের জননী সিংহবাহিনী দশভুজার অঙ্গে সাটিনের জ্যাকেট, ও তাঁর ভগ্নীদ্বয় বীণাপাণি ও কমলার বেশ আজ সুসভ্য ও পরিমার্জ্জিত, সেই খাতিরেই তিনি আজ বাঙ্গালী বাবু। সভ্যতার ঢেউ তাঁহাদের পরিবারের দুইজনের গাত্রে কেবল বিশেষ লাগে নাই;—তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মহাদেব ও তাঁর দাদা গণেশ। তাঁহাদের শোধরাইবার আর উপায় নাই। মহাদেব সেকেলে বৃদ্ধ, ইংরাজী মতে old fool, তাঁহার সভ্য হইবার ক্ষমতা গিয়াছে। নূতন নেশাটাই তিনি ধরিতে পারিলেন না,—আজও যখন সিদ্ধি ও ধুতুরার জন্য লালায়িত, তাঁকে কি আর হস্তি অজিন বা ব্যাঘ্র চর্ম্ম ছাড়াইয়া স-মোজা ইংরাজী জুতা ও কোট পেণ্টুলান পরান যাইতে পারে? গণেশ দাদাও তথৈবচ। তাঁরও হস্তিমুণ্ড এবং চারি হাত এ সভ্য জগতে আর চলে না। যদি তাঁর চেহারার কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাঁর পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা বৃথা।

কার্ত্তিকের পোষাকের উন্নতির কারণ এখন আমরা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাবুত্বজ্ঞাপক বাহিক চিহ্ন সমূহের যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনি ভদ্রলোকের আসরে স্থান পাইবার জন্য তারকারিকেও কতকটা পোষাকের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয় বেশ ভূষাটা সম্পূর্ণ সময়ের উপযোগী করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁর কথা বার্ত্তা কি পরিমাণে ইংরাজীভাবাপন্ন ও বাঙ্গালা কহিবার সময় তাহাতে শত করা কত ইংরাজী মিশান, তাহা আমি আজ ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না। যদি জানিতে পারি, পাঠকদিগকে জানাইতে কালবিলম্ব করিব না।

যাহা হউক কার্ত্তিকের কিন্তু কতকটা বাঙ্গালী-বাবুর আদর্শ। ইহার আর একটা প্রমাণ দিব। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি "ছেলেটী যেন কার্ত্তিক।" এই তুলনা কি ভাবব্যঞ্জক? আমরা কি ছেলেটী বীরত্বলক্ষণযুক্ত এই ভাবিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকি? প্রত্যেক বঙ্গবাসীই জানেন তাহা নয়। যখন ছেলেটী গৌরবর্ণ, পাতলা চেহারা, এক "গোঁয়ার গোবিন্দ" নয়, এবং ভাল করিয়া কাপড় চোপড় পরাইলে ঠিক বাবুটীর মত দেখায়, তখন কার্ত্তিকেয় তাহার উপমান। তখনই আমরা বলিয়া থাকি "ছেলেটী যেন কার্ত্তিক।" আমাদের সঙ্গে কুমারের আর একটি সম্বন্ধ আছে। তিনি বন্ধ্যানারীর উপাস্য। তাহার কারণ, তিনি ষষ্ঠীদেবীর স্বামী বলিয়া। কিন্তু যখন কোন বঙ্গমহিলা পুত্রকামনায় কার্ত্তিকের অর্চ্চনা করেন, তখন কি তিনি কার্ত্তিকেয় যে দেবসেনাপতি মহাবীর, একথা ভাবেন, এবং বীরভাবাপন্ন পুত্র ইচ্ছা করেন? নবীনারা কি করেন বলিতে পারি না, কিন্তু অশিক্ষিতা প্রবীণারা যে তাহা করিতেন না, একথা আমি বলিতে পারি।

এইখানেই থামিতে পারিতাম কিন্তু আরও দুই কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। কুমারের এরূপ অবস্থা আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য প্রদান করে নাকি? অনেক সময় কোন কোন দেব-হৃদয় কোন কোন দেবশরীর এরূপ ছাঁচে ঢালা হয় যে জাতীয় মন, জাতীয় হৃদয় তাহাতে বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যে জাতি যুদ্ধপ্রিয়, যাহাদের মধ্যে বীরত্বের গৌরব আছে, যাহাদের আত্ম-মর্য্যাদা বোধ আছে, তাহারা যে কখন দেবসেনাপতিকে আমরা যে ভাবে দেখিতে শিখিয়াছি, সেই ভাবে দেখিতে পারিত, তাহা আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি না। রাজপুতেরা কুমারের পূজা করে কি না জানি না, এবং করিলেও কিভাবে করে বলিতে পারি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে বীরপ্রসূ রাজপুতনায় তিনি কখনও বাবুভাবাপন্ন নন এবং হইতে পারেন না। বাঙ্গালী-চরিত্র, বাঙ্গালী জীবনের ইতিহাস অনেক পরিমাণে বাঙ্গালার কার্ত্তিকেয়তে প্রতিবিম্বিত। যদি আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস একেবারে না জানিতাম, তাহা হইলেও কুমারের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাঙ্গালা হইতে মনের উন্নত ভাব, হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত এবং জাতীয় আত্মসম্মান যে অনেক কাল বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতাম। বহুকাল হইতে আমরা পর-পদ-দলিত, বহুকাল হইতে আমরা প্রবলের পদানত, বহুকাল হইতে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে শৌর্য্য বীর্য্য নির্ব্বাসিত। ইহার ফল জাতীয় চরিত্রের হীনতা। সেই হীনতাই বঙ্গপূজিত কুমারের আকারে ও বেশভূষায় প্রতিফলিত। আমাদের ক্ষমতা থাকিলে বোধ হয় তাঁহার হস্তস্থিত ক্ষুদ্রীভূত ধনুর্ব্বাণের পরিবর্ত্তে আজ ছড়ি কিম্বা কলম ও রেনল্ড্‌সের কোন উপন্যাসরত্ন শোভা পাইত। পাঠক স্বীকার করিবেন কি জানি না, কিন্তু আমাদের চরিত্রমাহাত্ম্যেই "ভবেশ-ঔরস" দেবসেনাপতি স্কন্দ আজ বাঙ্গালী বাবু।

দ।

দাসাশ্রম।

উদ্দেশ্য।—নানাপ্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত মানবগণের সাধ্যানুসারে হিত-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগের ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে।

সাধারণ বিভাগ।—সেবালয়—ইহা গিরিডিতে অবস্থিত।

"দাসী" বিভাগ।—জনহিতৈষণা প্রবর্ত্তনা ও দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ হইতে "দাসী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

ডিস্পেন্সারি বিভাগ।—দাসাশ্রমকে ঔষধ সাহায্য করিবার জন্য এবং ইহার স্থায়ী ও পাকা আয়ের সংস্থান করিবার জন্য ইহার এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকানা, ৮৬ হারিসন রোড, কলিকাতা।

কার্য্যপ্রণালী।—ইহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সম্প্রতি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপার উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা ও কার্য্যে সেইরূপ চেষ্টা করা হয়।

পারিবারিক আমোদ প্রমোদ।

সংসারের কঠোর সংগ্রামে পরিশ্রান্ত মানবের আরামের স্থান পরিবার। সুতরাং মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই পরিবারে থাকা আবশ্যক। মানুষের আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই পরিবার সংস্কার এবং সঙ্গঠন করা কর্ত্তব্য।

মানুষ পরিবারে যত রকম সুখের প্রত্যাশা করে, তন্মধ্যে আমোদ প্রমোদ একটি প্রধান জিনিস। দরিদ্রতায় উৎপীড়িত, রোগে শোকে জর্জ্জরিত এবং পরিশ্রমে ক্লিষ্ট প্রাণে শান্তি পাইবার পার্থিব উপায়ই আমোদ প্রমোদ। সুতরাং মানুষ আপনার পরিবারেও যদি একটু আমোদ প্রমোদ না পায়, পরিবারটাও যদি একটা আফিস গৃহ হয়, এখানেও যদি হাকিম সমীপে কেরাণী বাবুর মত গুরু গম্ভীরভাবে বসিয়া কেবল কাজের কথা—কেবল সংসারের খাতাপত্র লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে হয়; তবে এই পরিবার প্রথা উঠিয়া গেলে ক্ষতির যে কি কারণ আছে, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আর ইহার পরিবর্ত্তে সমস্ত দিন আফিস এবং স্কুল কলেজের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত দেহে শ্রান্তমনে বাঙ্গালী যখন গৃহে

আসিলেন, তখন যদি পিতামাতা ভাই বোন এবং স্ত্রীপুত্রের হর্ষোৎফুল্ল অমিয়-মাখা বাণীর সঙ্গে, আমোদ প্রমোদ একটু প্রাপ্ত হন, তবে কি সংসার তাঁহার নিকট স্বর্গ বলিয়া মনে হয় না? সুতরাং প্রত্যেক পরিবারেই আমোদ প্রমোদের কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু এমন এক শ্রেণীর উৎকট কার্য্যবাদী লোক আছেন, সরস ইক্ষু-দণ্ডকে ঘানিতে পেষণ করিয়া যেমন শুষ্ক নীরস করিয়া ফেলা হয়, তেমনি সংসার তাঁহাদিগকে কার্য্যের ঘানিতে পিষিয়া এমন কঠোর করিয়া ফেলিয়াছে, যে, তাঁহারা আমোদ প্রমোদের ভিতর সময়ের অপব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না! পাছে বা চতুর সময় মূহুর্ত্তের জন্য ইহাঁদিগকে ফাঁকি দিয়া যায়, তাই ইহাঁরা কার্য্যের যষ্টি লইয়া সর্ব্বদা সময়ের পথ আগুলিয়া রহিয়াছেন!

কিন্তু একটি কথা। আমোদ প্রমোদের মধ্যে যে একটুও দোষ নাই, এমন কথা বলা যায় না। আমোদ প্রমোদের ভিতর ভয়ঙ্কর একটা মোহ আছে। এই মোহে মানুষ এমন অন্ধ হয় যে, আমোদে একেবারে মত্ত হইয়া পড়ে, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। অনেক লোক এই আমোদের কুহকে পড়িয়া সৎকাজ সৎসংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দেশের অনেক ধনীর সন্তান এই আমোদেই মাটি হইয়া গিয়াছেন—এখনও যাইতেছেন।

এমন অনেক খাদ্য দ্রব্য দেখা যায়, যাহার অল্প একটু খাও, তোমার নির্জ্জীব প্রাণ সবল হইবে; বেশী খাও, তোমার সবল প্রাণকেও সংহার করিবে। আমোদ প্রমোদও ঠিক সেই প্রকার। ইহা যতক্ষণ পরিমিত ততক্ষণই ভাল, আর যখন দেখিলে অপরিমিত হইল, তখনই জানিবে, তাহার ফল বিষময় হইবে। আমোদপ্রমোদের আরো দুইটী দিক্ আছে। আমোদপ্রমোদ যতক্ষণ পরিবারে, আপনার পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্ত্রী পুত্র অথবা প্রকৃত বন্ধুদিগের মধ্যে আবদ্ধ, ততক্ষণই ইহার ফল অতি শুভ; কিন্তু যখন সে আমোদ ঐ সকল অতিক্রম করিয়া বাহিরে "এয়ারের" এবং অসৎ কার্য্যের মধ্যে চলিল, তখনই ভয়ানক আশঙ্কার কথা। তখন হয় তো ঐ আমোদ প্রমোদই তোমার হাত দুখানি ধরিয়া তোমাকে নরকের পথে লইয়া যাইবে। ইহার দৃষ্টান্ত, বর্ত্তমান সময়ে একবার আমাদের যুবক এবং বালক মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া দেখ,—তাহারা বাহিরের কুৎসিৎ আমোদের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া কোন্ নরকের দেশে চলিয়াছে!

বর্ত্তমান সময়ে বালক এবং যুবকদিগের নৈতিক দুর্গতি ও চরিত্রহীনতার প্রধান কারণ কি? সুরুচিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা দেখিতে পান, বাহিরের কুৎসিৎ আমোদই ইহার একটি বিশেষ কারণ। ঐ দেখ না বেশ্যাশ্রিত থিয়াটারগুলি বালক এবং যুবকদিগের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহাদের কোমল প্রাণে কি কীট প্রবেশ করাইয়া দিতেছে! তাহাদের সেই সুধাময় মুকুল-জীবন গুলিকে কি বিষময় করিয়া ফেলিতেছে। হায়! দেশের লোকগুলি একবার এদিকে চাহিয়াও দেখে না। চাহিয়া দেখা ত দূরের কথা, আরো দেখি একদল রুচিবিহীন সাহসশূন্য দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক,—যাঁহারা সমাজের ভয়ে পরিবারে কোনরূপ আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না, ওদিকে আমোদের সখ্‌টিও বিলক্ষণ; তাই আর কি করেন,—দায়ে পড়িয়া ঐ সমস্ত রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া আমোদ-স্পৃহা চরিতার্থ করেন; আর লম্বা চৌড়া প্রশংসাপত্র বাহির করিয়া এই যুবক-জীবন-বিনাশকারী থিয়েটারগুলির পক্ষ সমর্থন করেন। আমরা বুঝিতে পারি না, যখন ঐ সকল প্রশংসাকারীদিগের সমক্ষে অভিনেতা ভদ্র সন্তানগুলি অভিনেত্রী বারাঙ্গনাদিগকে কখনও স্ত্রী সম্বোধনে আলিঙ্গন, কখনও মাতৃ সম্বোধনে তাহাদের চরণ বন্দন, কখনও বা অন্য কোন সম্বোধনে একত্র উপবেশন এবং হাস্য পরিহাস করিতে থাকে, তখন ঐ লোকগুলির দুর্দ্দশা ভাবিয়া কেমন করিয়া তাঁহারা চক্ষুর জল সম্বরণ করেন!

বেশ্যাশ্রিত থিয়েটার গুলির এই এক দোষত চক্ষুর সম্মুখেই দেখা যাইতেছে, যে কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্যাদিগের আওতায় পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। কোন বুদ্ধিমান যদি বলেন, "বেশ্যাদিগের সঙ্গে থাকিলেই যে মারা পড়িতে হইবে, এমন তো কোন কথা নাই।" আমরা বলি, যে দেশের শাস্ত্রে বলে "ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্" সে দেশের লোকের মুখে ও কথা আর শোভা পায় না। তার পর যে সমস্ত অসংযত অগঠিতচরিত্র যুবক এবং বালকেরা এই রঙ্গালয় দর্শন করিতেছে, তাহাদের রুচি বিকৃত হইয়া যাইতেছে। মায়াবিনী কলঙ্কিনীদিগের কুহকে পড়িয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমি একবার একটি ছাত্রালয়ে কিছুদিন বাস করিতাম; সেখানে দেখিতাম, অনেকগুলি ছাত্র পড়াশুনা ফেলিয়া, অভিনয়ের প্রত্যেক বারগুলিতে থিয়েটার দেখিতে যায়। তাহার একজনকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ধৈর্য্য যে দেখিতেছি

আশ্চর্য্য ! আপনি যে রাত্রি জাগিয়া কত ক্লেশ সহ্য করিয়া রোজ রোজ থিয়েটার দেখিতে যান, ইহাতে কি আপনার বিরক্তি হয় না ?" তিনি বলিলেন—"আপনি শুনিলে আরো অবাক্ হইবেন, আমি বরাবর একই থিয়েটারে যেয়ে থাকি।" আমি বলিলাম "তাহার অর্থ কি ?" তিনি বলিলেন—"অর্থ আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ! সেই যে একদিন একটা স্ত্রীলোকের মুখে কি এক সঙ্গীত শুনিয়াছি, কিভাবে যে তাহার মুখখানি দেখিয়াছি, আর সে মুখ, সে কণ্ঠ ভুলিতে পারি না। সরল প্রাণে বলিতে কি, আমি সুধু সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেই রোজ থিয়েটারে যাই।" আমার মনে হইল, হায় ! এতদূর যখন গড়াইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই এই যুবক সেই বেশ্যার প্রলোভনে থিয়াটারে ঢুকিবে।

এই থিয়েটার দেখিয়া যুবকদিগের আরো কতকগুলি কুশিক্ষা হইতেছে—অশ্লীল সঙ্গীতে রুচি-বিকৃতি, নারীচরিত্রে ঘৃণা এবং সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ। থিয়েটারের প্রহসনগুলি সম্প্রদায়বিশেষের অযথা নিন্দায়, শিক্ষিতা মহিলাদিগের অনর্থক কুৎসায় এবং কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। আমরা দেখিয়াছি, যুবক ও বালকগুলি অভিনয় দেখিয়া যখন বাসায় আসে, তখন যে সমস্ত উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় দেখিয়াছে, তাহার বড় একটা আলোচনা করে না ; কিন্তু প্রহসনগুলিতে সম্প্রদায়বিশেষকে এবং শিক্ষিতা রমণীদিগকে যে সমস্ত গালাগালি দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা করে এবং অশ্লীল সঙ্গীত গাহিয়া সমবয়স্কদের সঙ্গে এয়ারকি দেয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যুবক এবং বালকদিগের থিয়েটারে যাইবার প্রবল গতিটাকে কিরূপে ফিরান যাইতে পারে ? কি উপায়ে তাহাদের কুৎসিৎ আমোদ বন্ধ হইতে পারে ? ইহার একমাত্র উপায় পারিবারিক আমোদ প্রমোদ। যুবক এবং বালকদিগের উল্লিখিত আমোদের ঝোঁকটা যে এত প্রবল, তাহাতে তাহাদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির দৌরাত্ম্যে দিবানিশি দর্শন ও বিজ্ঞান লইয়া বেচারীদের তরল মস্তিষ্ক কতই না ঘুরাইতে হইতেছে, শিরঃপীড়াও এই সুযোগে দর্শন দিয়াছে। ইহাতে যদি আমোদের সুশীতল বরফ জল একটু তাহাদের মাথায় না পড়ে, তাহা হইলে চলিবে কেন ? ইংরাজ বালকগুলির জন্য তাহাদের ঘরে বাহিরে কত রকম আমোদের বন্দোবস্ত। আর আমাদের পরিবারেও কোন প্রকার আমোদের

বন্দোবস্ত নাই, বাহিরেও কোন প্রকার বিশুদ্ধ আমোদ নাই। কাজেই যুবক এবং বালকেরা বাহিরের কুৎসিৎ আমোদে যোগ দেয়। এখন আমরা পরিবারে যদ্যপি বিশুদ্ধ আমোদের বন্দোবস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাদের বাহিরের কুৎসিৎ আমোদে যোগ দেওয়াও বন্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার বন্ধনটাও দৃঢ় হয় এবং এই উপলক্ষে নৈতিক শিক্ষারও সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, এই পারিবারিক আমোদের কিরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে ?

চারি বৎসর হইল, আমি কোন স্থানে কোন একটি সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাস করিতেছিলাম। সেই পরিবারের কয়েকটি ছেলে মেয়ে যেন এক একটি স্বর্গের ফুল। বেশ সুন্দর সুকুমার হাসিখুসি মুখ, সরল শুভ্র সুকোমল প্রাণ। কয়েকটিতে আমোদ প্রমোদে সেই পরিবারটিকে এমন সুখশান্তিময় করিয়াছিল, যে, আমরা তো অনেক সময় আনন্দে ডুবিয়া থাকিতাম ; যাঁহারা এই পরিবারে বেড়াইতে আসিতেন, তাঁহারাও আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন, বালকবালিকাদিগকে প্রাণের ভাল বাসা দিয়া যাইতেন। ইহাঁদের আমোদ ছিল কি রকম, শুনুন। একটি বালিকা হইত ধ্রুব। আর দুটি হইত ধ্রুবের সখা ; দু একটি গান, একটু অভিনয় করিয়া দশ পোনের মিনিটের মধ্যে এ দৃশ্যটি সমাপ্ত করিত। আবার একটি বালিকা হইত মা ; দুটি হইত মেয়ে ; ইংরাজীতে বালিকারা বেশ এদৃশ্যটি অভিনয় করিত। আবার একটি বালিকা হইতেন লক্ষ্মী, আর কয়টি হইত সখী ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুমিষ্ট গান করিত। এক ঘণ্টার মধ্যেই অভিনয় শেষ হইত। উক্তরূপে অভিনয় ব্যতীত কোন বালিকা হারমোনিয়ম বাজাইত, কেহ বা গান করিত ; বেশী বয়সের পুরুষ রমণীরা শিক্ষাপ্রদ গল্প করিতেন। ইহাতে এক দিকে যেমন আমোদও পাওয়া যাইত, অন্য দিকে তেমনি শিক্ষাও হইত।

আমরা বলি, আমাদের পরিবার গুলিতে কি, উল্লিখিত পরিবারের মতন আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে না ? আমাদের পরিবারের অভিভাবকেরা যদ্যপি, আমোদও হয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়, অথচ কোনরূপ লজ্জাজনক দৃশ্য না থাকে, এপ্রকার দু এক খানি ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া বালকবালিকাদিগকে শিখাইয়া দেন, তাহা হইলে বোধ হয় বালকবালিকারা মিলিয়া মাঝে মাঝে অভিনয় করিতে পারে, তাহাতে গৃহের আত্মীয় স্বজন এবং পাড়াপ্রতিবাসীরা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিতে পারেন। ইহার সঙ্গে যদি বালকবালিকাদিগকে হারমোনিয়ম, পিয়ানো কিম্বা অন্যান্য যন্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল পরিবারের সকলে বসিয়া বালকবালিকাদের সঙ্গীত এবং বাজনা শুনিতে পারেন।

বালকদের সঙ্গে বালিকাদিগকে যুক্ত করিয়াছি বলিয়া কথাটি অনেকের কাছে নূতন বোধ হইতে পারে। অনেকে বলিতে পারেন, "মেয়েরা, ছি ! তারা আবার গান করিবে কি !" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথাটা এদেশের পক্ষে

নূতন নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ভদ্ররমণীদিগের মধ্যে সঙ্গীতের প্রথা ছিল। বিবাহ বাড়ীতে কিম্বা অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে দল বাঁধিয়া ঘরের বধূরা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিতেন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ইংরাজী শিক্ষার ঢেউ লাগায়, শিক্ষিত বাবুরা এখন তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। তা, সে সময়কার সেই মেয়েদের সঙ্গীত যেরূপ অশ্লীল ছিল, তাহা তুলিয়া দেওয়াই ভাল হইয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত যে রমণীজাতি, তাঁহাদিগকে সঙ্গীত-বিদ্যা হইতে একেবারে বঞ্চিত করাও একটা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা হইয়াছে। তাহাতে দেশেরও বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষিত বাবুরা রমণীদিগের অশ্লীল সঙ্গীত তুলিয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে যদি বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে মেয়েদের দুটি গান শুনিবার জন্য আজ তাহাদের এই পাপ থিয়েটার কিম্বা অন্য কোন কুস্থানে যাইতে হইত না।

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, বিরাট রাজার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুন নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া সঙ্গীত করিতেন। যাউক, আমাদের সে সব মহাভারতের কথায় আর দরকার নাই। আমরা বলি, ১৩।১৪ বৎসরের ভাইদের সঙ্গে মিশিয়া ১১।১২ বৎসরের বোনেরা যদি অভিনয় করেন, সঙ্গীত করেন, তাহাতে আর আপত্তি কি? এইরূপ হইলেই পারিবারিক আমোদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় এবং পরদুঃখকাতর দাতাগণের সাহায্যে দাসাশ্রমের আর একটী মাস নিরাপদে অতীত হইয়া গেল। নিম্নে আতুরগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

১। দামো, ২। তিতুরাম, ৩। টোকানী, ৪। দেবীয়া, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। শিবু ৭। ফুলকুমারী, ৮। স্বর্ণ, ৯। বাবুরাম। ইহারা সকলেই পূর্ব্ববৎ দিন কাটাইতেছে।

১০। নেসবতী—জাতিতে গোয়ালা। নিবাস দিনাজপুর। বয়স ২৩।২৪ বৎসর। জন্ম হইতেই ইহার শরীরের বামপার্শ্ব অবশ। অন্য কোন পীড়া নাই। দিনাজপুরের ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয় নিজে আসিয়া সেবালয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।

১১। দুখীয়া—ঐ নেসবতীর পুত্র। ইহার বয়স প্রায় চা'র বছর। পেটটী প্লীহাতে পূর্ণ। ইহার অন্য কোন রোগ নাই। অতটুকু শিশুকে মা ছাড়া করিয়া রাখা যায় না বলিয়া, ইহাকেও সেবালয়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

১২। নবদুর্গা সরকার। বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। দুটী চক্ষু অন্ধ। ইহাকে মাণিকদহ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৩। রামজী—কিছুদিন হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।—ভগবান ইহার আত্মার কল্যাণ করুন।

১৪। ১৫ বুড়া ও বুড়ী—মেহেরপুরে অতি দুরবস্থায় কাল কর্ত্তন করিতেছিল। উভয়েরই বয়স প্রায় ৬০।৭০ বৎসর। বৃদ্ধটীর উত্থান শক্তি নাই। বৃদ্ধাও প্রায় তদ্রূপ।

তথাকার স্কুল সমূহের সহৃদয় সব্ ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। মেহেরপুর হইতে কলিকাতা আসিতে ইহারা এত ক্লেশ পাইয়াছিল যে, এই খানে আসিয়া কথা বলিবারও শক্তি ছিল না ; এমন কি ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল। যখন ইহারা আমাদের কার্য্যালয়ে পঁহুছিল, তখন অসাড় অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় আমরা গিরিডিতে পাঠাইতে কিছুতেই সাহস করিলাম না। অবশেষে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া এবং শুষ্ক পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করাইয়া Little sisters of the poor এর নিকট লইয়া গেলাম। তাঁহারা ইহাদের অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন।

১৬। একজন হিন্দুস্থানী—আড়কাটীরা ফাঁকি দিয়া আসামে লইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে নানা রোগে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ একটী খোলার ঘরে মলমূত্রে মাখামাখি হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কার্য্যালয়ে খবর দেওয়ায়, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করাইয়া, হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে।

গিরিডি সেবালয়ের আয় ব্যয়।

আয়।—মণি অর্ডার ৯০৲, শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্টবিহারী কুণ্ডুর চাঁদা ১৲, গত মাসের জের ২৷৷৭৷৷ হাওলাৎ জমা ১৯৲, সর্ব্বসুদ্ধ জমা ১১২৷৷৭৷৷ এক শত বার টাকা আট আনা দেড় পয়সা মাত্র।

ব্যয়।—কর্ম্মচারীর বেতন ৫০৸/২৷৷ সংসার খরচ ৩৮।৵২৷৷, গোয়ালা ।/৫, ধোপা ।৵১৫, দাহ খরচ ১৷৷০, বাড়ী ভাড়া ১৮৲, বাজে খরচ ।১৫, মোট ১০৯৸০।

মোট জমা খরচ।

জমা—১১২৷৷৭৷৷ ।—

বাদ খরচ ১০৯৸০, হস্তেস্থিত ২৸৭৷৷, দুই টাকা বার আনা দেড় পাই।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদবারি সিঞ্চন করুন।

(২৫শে মে হইতে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত)

মাসিক চাঁদা।

বাবু অনাথনাথ দেব মে মাসের চাঁদা ১৲, বাবু নন্দলাল দত্ত এপ্রিলের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী বৈশাখের চাঁদা ১৲, N. K. Bose Esq মে মাসের চাঁদা ১৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ঐ ১৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস ঐ ঐ ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ ঐ ১৲, A. Lady ঐ ঐ ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ঐ ঐ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ ঐ।০, বাবু কেদারনাথ দাস ঐ ঐ।০. নবাব সৈয়দ আবদুল সোভান চৌধুরী ঐ ঐ ১৲ A. Sen Through G. N. Sen ঐ ঐ।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু ঐ ঐ৷৷০, বাবু রাখালদাস মিত্র এপ্রিল ও মের চাঁদা ৷৷০, N. C. Baral Esq মে মাসের চাঁদা ১৲,

এককালীন দান।

বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ৷৷০, বাবু রামতনু লাহিড়ী ৷৷০, বাবু বসন্তকুমার লাহিড়ী ৷৷০, বাবু দুর্গাদাস বসু ১৲, বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মুখো ৷৷০, বাবু গোষ্ঠবিহারী সামন্ত ৵০, বাবু বসন্তকুমার সরকার ৷৷০, মৃত কালীপ্রসন্ন বসু শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৷৷০, মিসেস সেন—লেডী ডাক্তার চুঁচুড়া পুত্রের জন্মদিনে ১৲, বাবু প্রমথনাথ দাস ১৲, বাবু হরিচরণ দাস ৩৲, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দাস ২৲, ডাঃ শরৎচন্দ্র চন্দ ৷৷০, বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত ২৲, বাবু অভয়াচরণ দাস M. A, ২৲, বাবু নারায়ণচন্দ্র বসু ২৲, বাবু রাজচন্দ্র দাস ১৲, বাবু কালীমোহন দেব ১৲, বাবু বিপুলচন্দ্র গুপ্ত

২৲, শ্রীমতী মনোমোহিনী ঘোষ ১৲, শ্রীমতী হরিদাসী দেবী ১৲, বাবু জগৎচন্দ্র দাস ৫৲, বাবু শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৫৲, বাবু কামিনীকুমার চন্দ ৫৲, বাবু হেমেন্দ্রনাথ দত্তরায় পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ১৲, বাবু বিহারীলাল মজুমদার ১৲, বাবু রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৫৲, বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু হরকান্ত বসু মৃতঝির পরিত্যক্ত ৵১২॥, বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু M. A. ৬৲, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ২৲, বাবু ইন্দ্রনারায়ণ সাধু খাঁ ৲১০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র সিংহ ১৲, J. Ghoshal Esq ১৲, রায় রামশঙ্কর সেন বাহাদুর ১৲, বাবু অভয়াচরণ পাল ২৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় ॥০, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বৈদ্যরত্ন ১৲, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার।০, বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় ॥০, বাবু কিশোরীলাল সরকার ১৲, বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২৲, বাবু চারুচন্দ্র সরকার ১৲, বাবু চন্দ্রকান্ত সেন ১৲, বাবু হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ১৲, মা—জামালপুর ৮৲, বাবু জয়কৃষ্ণ বসু।০, অজ্ঞাত ১৫৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ২৲, বাবু রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, বক্স এলাহি।০, বাবু কেদারনাথ কুলভী ১৲, বাবু বিজয়বিহারী চট্টো ১৲, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন।০, বাবু লক্ষ্মীশ্বর হাজারিকা ১৲, A friend, Victoria Hostel /০, বাবু নলিনাক্ষ রায় চৌধুরী।০, বাবু হরিপদ বসু।০, বাবু রাইচরণ বিশ্বাস।০, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় /০, পণ্ডিত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন ৩৲, বাবু নিরুপমকুমার বিশ্বাস ১৲, বাবু কেদারনাথ দত্ত ১৲, বাবু প্রসন্নকুমার মুখো ১৲, মৌলবী মহম্মদ ইয়সুফ খাঁ ১৲, বাবু আনন্দচন্দ্র দাস ২৲, বাবু যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ।০, বাবু বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ ১৲, বাবু অক্ষয়কুমার মুখার্জি ১৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

এজেণ্ট দ্বারা পুস্তক বিক্রয়, কমিশন ও পার্শেল খরচ বাদ, ২০৲, চাউল বিক্রয় ২৸/০।

চাউল।

মুষ্টি ভিক্ষা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

বস্ত্রাদি।

বাবু বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ—গরম কোট ১, বাবু কেদারনাথ মজুমদার দ্বিতীয় M. B. পরীক্ষায় পাশ উপলক্ষেঃ—ধুতি ৬, চাদর ২, সার্ট ৫, বালিসের ওয়ার ১, বিছানার চাদর ১, খাট ১, গঞ্জিফ্রক ১।

বাবু হরকান্ত বসু মৃতঝির পরিত্যক্তঃ—সোনার মাদুলী ১, ধুতি ৪, সোনার দানা ৩, নূতন ধুতি ১, ফ্লানেলের জামা ১, বিছানার চাদর ১।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ১২৸০, দানপ্রাপ্তি ১০৩॥/২॥০, অন্যান্য প্রকারের আয় ২২৸/০, বিগত মাসের জের ৩৫৸/৲১০, উদ্বৃত্ত জমা ৵০, মোট আয় ১৭৮/১২॥।

ব্যয়।

পূর্ব্বের পার্শেল খরচ ॥/১০, আদায় কারীর ব্যয় ১৮।/১৫, মুটে ৵০, গিরিডি সেবালয় মঃ অঃ কঃ সহিত ১১১।৵০, ডাক ব্যয় ১৲, মেহেরপুরের দুটী রোগীর জন্য ১৩॥৵০, একটী পথে পরিত্যক্ত রোগী হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যয় ॥০, এজেণ্টের দরুণ ব্যাগ ২৲, মাণিকদহের একটী আতুর গিরিডিতে পাঠাইবার ব্যয় ১০৵০, রোগীর আহার ৵০, বিবিধ ৷৵১॥, মোট ব্যয় ১৬০৲১৭॥।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৭৮/১২॥, মোট ব্যয় ১৬০৲১৭॥, হস্তেস্থিত ১৮৲১৫।

স্থানাভাবে মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার দেওয়া গেল না।

কলিকাতা, ২০৮ ২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "দাসী"-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীললিতমোহন দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দাসী

তুকারাম।

নবম প্রস্তাব।

তুকারাম যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা মহারাষ্ট্রজাতির ইতিহাসে বিশেষরূপে স্মরণীয়। একদিকে বাহুবল ও জ্ঞানবল এবং অপর দিকে ভক্তিবল, এই তিনের সম্মিলনে মহারাষ্ট্র দেশ তখন অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বাহুবলের অবতার স্বরূপ শিবাজী, জ্ঞানবলের অবতার স্বরূপ রামদাস স্বামী* এবং ভক্তি ও প্রেমবলের অবতার স্বরূপ তুকারাম, তিন জনই এক সময়ে মহারাষ্ট্রজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমগ্র হিন্দুজাতির অভ্যন্তরে নবজীবন সঞ্চারের জন্যই যেন বিধাতা তাঁহাদিগের তিন জনকে সমকালে মহারাষ্ট্র দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায়, জাতীয় জীবনেও এমন এক একটী "শুভযোগ" উপস্থিত হয় যে, সেই সময় নানা বিষয়ে তাহার উন্নতি ও সমৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দী মহারাষ্ট্রজাতির ইতিহাসের এই শুভ যোগকাল। বীরবর শিবাজীর বলে বলীয়ান্ হইয়া, মহারাষ্ট্র সৈনিকগণ যে সময় বিজয়নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিত, তুকারামের রচিত অভঙ্গসমূহ সেই সময়ই গৃহে গৃহে সংকীর্ত্তিত হইয়া, সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্র নরনারীকে ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত করিত। যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, শিবাজী কেবলই বাহুবলের দ্বারা মহারাষ্ট্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; এক পদে বিচরণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ন্যায়, একমাত্র বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। মুসলমানগণ যে শত বর্ষের মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র হইতে ভারত-সাগর

* ইনি শিবাজীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। শিবাজীর সাংসারিক ও বৈষয়িক (Public) অধিকাংশ কার্য্য ইহাঁরই আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে সম্পাদিত হইত। সর্ব্ব কার্য্যে সক্ষম ও সর্ব্বার্থদর্শী বলিয়া, ইহাঁর স্বদেশীয়গণ ইহাঁকে "সমর্থ রামদাস স্বামী" এই গৌরবজনক আখ্যায় অভিহিত করেন।

পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা কেবল বাহুবলের গুণে নয়, ধর্ম্ম-বলও তাহার অন্যতর কারণ। মুসলমানজাতির ন্যায় মহারাষ্ট্র জাতিতেও বাহুবলের সহিত ধর্ম্মবলের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়াই, তাঁহারা সমাগত "পবনাগ্নির" ন্যায় তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই সম্মিলনেরই গুণে, সমস্ত বিষয় লইয়া বিবেচনা করিলে, মহারাষ্ট্র জাতি এখনও ভারতের* জাতিসাধারণের মধ্যে অন্যতর অগ্রবর্ত্তী জাতি। শিবাজী ও রামদাস স্বামী প্রভৃতির ন্যায়, কুটীরবাসী দরিদ্র তুকারামও তাঁহার স্বজাতির মহত্ব সংস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন; তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি।

তুকারাম, শিবাজী এবং রামদাস স্বামী, কেবল একই সময়ে আবির্ভূত হন নাই, পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধেও সম্বদ্ধ ছিলেন এবং নিজের নিজের প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুসারে পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তুকারামের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ ও সম্মিলন, তাঁহাদিগের উভয়েরই জীবনের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা হইতে তাঁহাদিগের উভয়ের প্রকৃতি সুন্দররূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। শিবাজীর বীরত্বের, ততোধিক তাঁহার বুদ্ধি চাতুর্য্যের বিষয় সাধারণ্যে পরিচিত; কিন্তু তিনি যে কিরূপ সংযতচিত্ত ও বৈরাগ্যশীল পুরুষ ছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলেও তিনি একজন আদর্শ সন্ন্যাসী হইতেন। এক দিকে রাজপদ তুচ্ছ করিয়া, শিবাজী যেমন মুনিজনোচিত কঠোরতা ও নিগ্রহ অভ্যাস করিতে পারিতেন, অপর দিকে তুকারামও, তেমনই দরিদ্রতার গ্রন্থিনিষ্পেষক যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইয়াও, সাংসারিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য ধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। শিবাজী এবং তুকারামের সাক্ষাৎকারে আমরা এই উভয়েরই দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। বাল্যকাল হইতে পুরাণ ও কথকতাদি শ্রবণে শিবাজীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেও† তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "রাজ্যসাধন রূপ মহাব্রত সম্পন্ন করিতে হইলে, সাধুপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদ, উপদেশ ও সঙ্গ-

* বুদ্ধি বিদ্যা সম্বন্ধে বাঙ্গালিই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত: কিন্তু রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের ন্যায় ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশেও অধিক জন্মগ্রহণ করে নাই।

† দাদাজী কোণ্ডদেব নিজেও তুকারামের বিশেষ গুণপক্ষপাতী ছিলেন। একবার দুইজন ব্রহ্মচারী, তুকারামের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে কোণ্ডদেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত

লাভ নিতান্ত আবশ্যক। শিবাজী সেইজন্য কখনও সাধুসঙ্গ লাভের অবসর ত্যাগ করিতেন না। তুকারামের সদ্‌গুণাবলী এবং তাঁহার কথকতার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন। তুকারাম সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা করিবার জন্য এই সময় লোহগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে আপনার রাজধানী পুনায় আনয়নের জন্য, সম্ভ্রমসূচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করিলেন। তুকারাম শিবাজীর নাম অবগত ছিলেন, এবং ধর্ম্মানুরাগী ও স্বজাতিবৎসল রাজপুত্র বলিয়া, তিনি মনে মনে তাঁহাকে সমাদর করিতেন। কিন্তু তাঁহার বহুজনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরপূর্ণ সভায় গমন করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতেই তুকারাম নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়াছিলেন। ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট গমন করিলে পাছে তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপায়নাদি গ্রহণ করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতেন। সুতরাং তিনি শিবাজীর আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। শিবাজীর কারকুন তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনার দর্শনের জন্য আতুরের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহাকে দর্শন দানে সনাথ করুন্।" তুকারাম বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। এক দিকে রাজপুত্র শিবাজীর ব্যাকুল আহ্বান এবং অপর দিকে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি, উভয় বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার চিত্ত দোলায়মান হইল। তুকারামের আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক ছিল না। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ সাধু সন্ন্যাসীদিগকে, সাক্ষাতের সময়, এত অধিক অর্থ উপায়ন প্রদান করিতেন, যে, নিতান্ত নিস্পৃহ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহার প্রলোভন অতিক্রম করা দুরূহ হইত। শিবাজীর আমন্ত্রণে তাঁহার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, নিম্নানুবাদিত অভঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইবে;—

"চাহিনা যে সব নাথ, কেনগো দিতেছ মোরে?
নিরন্তর কেন হেন ফেলিছ সঙ্কট ঘোরে?
সংসার হইতে সদা দূরে রহিবারে চাই।
মানবের সাথ আর করিতে বাসনা নাই॥

বিজন বিপিন মাঝে সতত হরষে র'ব।
জগতের কার(ও) সনে কখনও না কথা ক'ব॥
এইমাত্র চাহি শুধু যেন দেহ, ধন, জন।
বমন সদৃশ সদা করি প্রভু দরশন॥

করিল, তিনি তুকারামকে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। তুকারাম সেই উপলক্ষে যে সকল অভঙ্গ গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, অভিযোগকারী সন্ন্যাসীদ্বয়ের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। দাদাজী তুকারামকে সমাদর ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক নিন্দক সন্ন্যাসীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় দান করিলেন।

তুকা বলে, পদে তব এই নিবেদন করি।
সকলই তোমারই ইচ্ছা হে পণ্ঢরপতি হরি॥*

এ সম্বন্ধে আরও একটী অভঙ্গের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"সম্ভ্রমের চিহ্ন ছত্র, ঘোটক, মশাল,
চলিতে পুণ্যের পথে বড়ই জঞ্জাল॥
হে পণ্ঢরপতি, মোরে বল কেন তবে,
বিষম বন্ধনে তার জড়াইছ এবে?
সম্মান, ঐশ্বর্য্য, দম্ভ, আড়ম্বর হায়।
শূকর পুরীষ সম ঘৃণি সে সবায়॥
তুকা বলে, ত্বরা করি এস একবার,
বিপদ-পতিতে হরি করগো উদ্ধার॥

শিবাজীকেও তুকারাম তাঁহার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে চারিটী অভঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শিবাজীকে তাঁহার রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সংসারের প্রতি উদাসীন হইলেও তুকারামের সাংসারিক অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। নিম্নে সেই কয়টী অভঙ্গের অনুবাদ প্রদত্ত হইল;—

বিশ্বস্রষ্টা এ জগৎ করি নিরমাণ,
বিচিত্র নৈপুণ্য-লীলা করিলা বিধান॥
সপ্রেম লিপিতে তব হ'তেছে প্রত্যয়।
ধর্ম্মজ্ঞ, চতুর, তুমি সাধু, সদাশয়॥
গুরুর চরণে তব আছে স্থির মতি।
বিশ্বাস আছয়ে দৃঢ় ধরমের প্রতি॥
পবিত্র এ "শিব" নাম সেজেছে তোমারে।
প্রজাদের ভাগ্যসূত্র ধৃত তব করে॥
ধ্যান-যোগ, ব্রত আর যম, আরাধন।
করিয়াছে মুক্ত তব সংসারবন্ধন॥
দেখিতে আমায় তব দৃঢ় অভিলাষ।
পত্রেতে তোমার তাহা করেছ প্রকাশ॥
কিন্তু নিবেদন মোর শুন নরবর।
দিতেছি পত্রের তব এই সদুত্তর॥
কাননিবাসী আমি উদাসীন বেশে,
বাসনাবিহীন হয়ে ভ্রমি দেশে দেশে॥
কদাকার, ধূলিময়, বসন বিহনে
ফল মূলাহারে তনু ক্ষীণ দিনে দিনে॥
শুষ্ক কর পদ, সদা বিকট মূরতি।
দেখিলে আমারে তুমি না পাইবে প্রীতি॥
বন্ধুভাবে এই আমি করি নিবেদন।
মোরে দেখিবার কথা তুলো না রাজন্॥

সদয় তোমারে সর্ব্ব অন্তর্যামী যিনি।
তাই লিখিতেছি আজ হেন দীন বাণী॥
তা না হলে বিঠ্‌ঠলের সেবক যে জন,
কৃপার ভিখারী সে ত নহে কদাচন॥
রক্ষক, পোষক মোর প্রভু ভগবান।
কেবা আছে এ জগতে তাঁহার সমান॥
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
শূন্য করিয়াছি, ছিল যত অভিলাষ॥
ত্যজিয়া বিষয়-তৃষা সংসারের কাম,
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম॥
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে।
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিঠ্‌ঠলের তরে॥
কিছু নাহি হেরি ভবে শুধু নারায়ণ।
তোমারেও তাঁর মাঝে কার দরশন॥
ভাবিতাম তোমারেও বিঠ্‌ঠল বলিয়া,
কেন তবে হেন লিপি দিলে পাঠাইয়া?
সাধুগুরু রামদাস, শিষ্য তুমি তাঁর,
অচলা ভকতি পদে রাখিবে তাঁহার॥
অন্য গুরু প্রতি তব চিত্ত যদি ধায়,
তাঁর প্রতি ভক্তি তব কিসে রবে হায়॥
তুকা বলে, শুন ওগো বুদ্ধির সাগর।
ভক্তিতে ভক্তের মোক্ষ ঘটে নিরন্তর॥

যাব যে তোমার কাছে, কি ফলিবে ফল?
পথশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল॥
মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, হবে ক্ষুধা নাশ,
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ছিন্ন বাস॥

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট অভঙ্গগুলির, সত্যেন্দ্র বাবুর কৃত অনুবাদ সত্ত্বেও, আমরা নিজে অনুবাদ করিয়া দিলাম। অবলম্বিত মূলের সহিত পার্থক্য বশতঃ আমাদিগের অনুবাদের সহিত সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদে পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন।
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ॥
পর অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে,
আয়ুমাত্র ক্ষয় হয় বাসনার বশে॥
সম্মান প্রয়াসী জন রাজগৃহে যায়।
কিন্তু বল শান্তি কভু মিলে কি সেথায়?
সমাদর পায় সেথা ধনবান জন,
দরিদ্রের ভাগ্যে মান না মেলে কখন্॥
বেশ, ভূষা, আড়ম্বর হেরিলে নয়নে
মৃত্যু সম বিভীষণ বোধ হয় মনে॥
হয় ত এ সব কথা করিয়া শ্রবণ,
বিরত আমার প্রতি হবে তব মন।
কিন্তু আমি জানি ভাল অন্তর্যামী যিনি,
মোর প্রতি নিরদয় না হবেন তিনি॥
গরীয়ান যেই জন সাধু সদাচার,
কঠোর সংযমে নিত্য দিন গত যার;
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদা করে অনুষ্ঠান,
কামনা থাকিলে সেও নীচের সমান।
তুকা বলে ধনি জন, তোমাদের মান
নশ্বর, আমরা কিন্তু চির-ভাগ্যবান্॥

শুভ যাহা, ঘৃণা কভু করিও না মনে॥
যে কার্য্য করিলে হয় পাপের সঞ্চার।
যতনে করিও তাহা নিত্য পরিহার॥
তোমার অধীনে যদি থাকে খল জন,
তাদের বচনে কভু নাহি দিও মন॥
গুণী যেবা, রাজ্য যেই করিছে রক্ষিত,
বিচার করিয়া তুমি দেখিবে বিহিত॥
সকলই ত জান ভূপ, কি বলিব আমি,
অনাথ দুর্ব্বলে কভু ভুলিওনা তুমি॥
শুনিলে এ সব গুণ, পাব আমি প্রীতি।
সাক্ষাতে নাহিক কায শুন নরপতি॥
দরশনে নাহি হ'বে কোন ফলোদয়।
বৃথা কাযে দিন মাত্র হইবেক ক্ষয়॥
দু একটী কায যাহা ভাল বুঝি মনে।
হ'ক্ ভ্রম, তাই লয়ে রহিব যতনে॥
সর্ব্বজীবে এক আত্মা দেব নারায়ণ।
এই সার কথা সদা রাখিও স্মরণ॥
গুরু রামে চিত্ত সদা স্থাপন করিবে।
গুরুরামদাসে নিত্য আপন ভাবিবে॥
মানব জনম তব ধন্য নরপতি।
কীর্ত্তির গৌরবে তব পূর্ণ আজ ক্ষিতি॥

এই মহাযোগ নিত্য সাধিও যতনে,

আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া* তুকারাম যেরূপ দৃঢ়তার অথচ মধুরতার সহিত শিবাজীর পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু দায়োজিনিস্ আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট উপস্থিত না হইলে, আলেক্‌জাণ্ডারই দায়োজিনিসের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুকারামের অভঙ্গসমূহ পাঠ করিয়া এবং তাঁহার নিস্পৃহতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, শিবাজীর তাঁহাকে দর্শনের ইচ্ছা আরও বলবতী হইল এবং তিনি নিজেই তুকারামের নিকট আগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং বস্ত্র, ভূষণ, পূজার উপচার সামগ্রী ও বহুমূল্য উপায়নাদি সঙ্গে লইয়া, সানুচর তাঁহার নিকট লোহগ্রামে আগমন করিলেন। তুকারামকে প্রণাম ও অর্চ্চনানন্তর শিবাজী একটি পাত্র স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া তাহা তুকারামের

* কেহ কেহ এইরূপ সাতটী অভঙ্গ তুকারামের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু মহীপতি তাঁহার গ্রন্থে ৪টী মাত্র অভঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে অপর অভঙ্গগুলি তুকারামের রচিত কি না সন্দেহ হওয়ায় আমরা তাহার অনুবাদ করিলাম না। প্রথমোল্লিখিত অভঙ্গ দুইটী শিবাজীকে লিখিত নয়, তুকারামের নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিব্যক্ত।

সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। পাছে শিবাজী তাঁহাকে কোনরূপ উপহার প্রদান করেন, সেই আশঙ্কায় তুকারাম তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে শিবাজীকে এরূপ উপায়ন প্রদান করিতে দেখিয়া তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, যাহারা হরির সেবক, তাহাদিগের নিকট ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও রাজাধিরাজ উভয়েই তুল্য। তুমি আমাকে যে উপহার প্রদান করিয়াছ, তাহার সহিত মৃত্তিকার কোন পার্থক্য নাই। হরিভক্ত হইয়া আমরা কলির প্রধান বন্ধন মোহ ও আশা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি। বিঠোবাই আমাদিগের সর্ব্বস্ব; তাঁহার কৃপায় আমরা (হরিভক্তগণ) ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; বিঠোবা আমাদিগের জনক, জননী; তাঁহার বলে আমরা অসীম বলীয়ান্; সমগ্র বৈকুণ্ঠ এক্ষণে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে এবং সর্ব্বত্র আমাদিগের প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধন, প্রভুতা ও বল, এই তিনটীতেই রাজার রাজপদ, কিন্তু বিঠোবার কৃপায় এই তিন বিষয়েই আমরা রাজাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি যাহাতে আনন্দ করি, তুমিও তদনুসরণ কর। হরিনাম গান কর, কণ্ঠে তুলসীমাল্য ধারণ করিয়া ও একাদশী-ব্রত পালন করিয়া, আপনাকে হরিদাস রূপে পরিণত কর; তাহা হইলেই আমার সন্তোষ বিধান করা হইবে।"

আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত দায়োজিনিসের ব্যবহার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছে। তাহার সহিত পাঠক তুকারামেরও নিস্পৃহতা ও দৃঢ়চিত্ততা তুলনা করুন্। মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি আসিয়া আজ তুকারামের দ্বারে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; অথচ চীরধারী তুকারাম তাঁহার প্রদত্ত স্বর্ণরাশির দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না, এদৃশ্য বাস্তবিকই অবলোকনীয় এবং কবির লেখনীতে ও চিত্রকরের তুলিকায় অমর হইবার যোগ্য। নিস্পৃহতায় তুকারাম ও দায়োজিনিস্ সমকক্ষ হইলেও, উভয়ের উক্তিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিভিন্নতা।

শিবাজী তুকারামের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার নিস্পৃহতা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি তুকারামের প্রত্যাখ্যাত ধন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার আশায় কয়েক দিন লোহগ্রামে অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন সশিষ্য তুকারাম মহোৎ

সাহে সঙ্গীত করিতেন। ভক্তগণের আনন্দোচ্ছ্বাসে এবং মধুর বীণা ও মৃদঙ্গধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইত। শ্রোতাগণের সপ্রেম একাগ্রতায় এবং তুকারামের ভক্তিপ্রধান উপদেশ গুণে সঙ্কীর্ত্তন অতি মধুর ও হৃদয়স্পর্শী হইত। শিবাজী একবারে বিমোহিত হইলেন। এক দিন তুকারাম নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সঙ্কীর্ত্তন করিলেন;—

হরি, তুমি মম পিতা, তুমি মম মাতা হে।
সুহৃদ্, সখা তুমি, তুমি মম ধন জন,
প্রাণ রমণ তুমি, শান্তি সদন হে॥
আপন বলিতে প্রভু তোমা বিনা কেহ নাই।
সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে।
ত্রিভুবন পূর্ণ করি, রহিয়াছ তুমি হরি,
তব দরশন বিনা বৃথা এ নয়ন হে।
তব দরশন বিনা বৃথা এ নয়ন হে॥
তব গুণ যে রসনা, কভু না করে ঘোষণা,
বিনাশ মঙ্গল তার কি ফল রহিয়া হে॥
যেথা তব অধিষ্ঠান, সেই পুণ্য তীর্থ স্থান
না ভ্রমিল যদি পদ কি ফল তাহায় হে॥
ত্যজিয়ে বিষয় সুখ তব শ্রীচরণে হরি,
তনু, মন, সব মম করেছি অর্পণ হে॥
বিনা তব গুণ গাথা, অসার জ্ঞানের কথা,
বিফল প্রয়াস শুধু, চাহিনা শুনিতে হে॥
এ বিষম ভবনদী, চাহ রে তরিতে যদি,
এস, বিঠোবার পদে লইগে শরণ হে॥

তুকারাম, ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনানন্তর, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে মানসিক বলে তিনি দ্বারস্থ নরপতিকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার সহিত তুলনা করিতে ভীত হন নাই, তাহা দর্শন করিয়া শিবাজী বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং অক্ষৌহিণী পতির অপেক্ষা এরূপ সন্ন্যাসীর শক্তি অধিক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নিজের রাজ অপেক্ষা, তুকারামের সন্ন্যাসী পদ তাঁহার নিকট শ্লাঘ্য বোধ হইল। তিনি তুকারামের ন্যায় নির্জ্জনে ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তনের পর অরুণোদয়ের পূর্ব্বে মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া অন্যান্য সকলে যখন আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিলেন, শিবাজী তখন তুকারামকে নমস্কার পূর্ব্বক রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া, নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং আপনার কর্ম্মচারীদিগকে আজ্ঞা দিয়া গেলেন যে, তাঁহারা যেন কোন কারণে তাঁহার নিকট গমন না করেন। সমস্ত দিন অরণ্যবাসের পর শিবাজী প্রতিদিন রাত্রিতে তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য সেই গ্রামে আগমন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভীত হইয়া তাঁহার জননী জিজিবাইকে এই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। জিজাবাই শুনিবামাত্র ব্যাকুলিত চিত্তে লোহগ্রামে উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর কর্ম্মচারিগণ জিজিবাইকে বলিয়াছিলেন যে, তুকারাম হইতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে,

তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিবাজী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন। জিজিবাই শুনিয়া তুকারামের শরণাপন্না হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন,—“আমার একটী মাত্র পুত্র আপনার উপদেশে সংসারত্যাগী হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন পুত্র কন্যা হয় নাই; সুতরাং আমাদিগের বংশের স্থিতি ও রাজ্য রক্ষা কে করিবে? আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার পুত্রটীকে আমায় ভিক্ষা দিন।” এই বলিয়া তিনি অঞ্চল প্রসারণ পূর্ব্বক, তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। করুণহৃদয় তুকারাম তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, “শিবাজী কীর্ত্তন শুনিতে আসিলে, আমি তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা পুনর্ব্বার সংসারে প্রবিষ্ট করাইব, আপনি চিন্তিত হইবেন না; বিঠোবার ভজন করুন্, তিনি আপনার দুঃখ দূর করিবেন।” পরদিন রাত্রিতে শিবাজী সঙ্কীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইলে তুকারাম তাঁহাকে সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, সৎকর্ম্মই “সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলেন, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই; অপরের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলে তাহার আচরণে কোন ফল লাভ হয় না। বিধাতা মানবসমাজ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং সকলেই নিজের নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, ইহাই শ্রুতির আদেশ। যে শ্রুতি-বাক্য প্রতিপালন না করে, সে অধঃপতিত হয়।” এই বলিয়া তুকারাম ব্রাহ্মণাদি জাতির ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, শিবাজীকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিলেন, “সম্মুখ যুদ্ধে শত্রু জয় ও প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। বিলাসী ব্যক্তি নিজের অবয়বের পুষ্টিসাধন করিয়া, যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, নরপতিগণ স্ব স্ব প্রজাপুঞ্জকে সুখী দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করেন। সদ্বিবেকের সহিত প্রজা পালন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহত্তর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ক্ষত্রিয়গণ অনৈচ্ছুধ্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রজাপুঞ্জের সুখে সুখানুভূতি, সর্ব্বভূতে দয়া এবং সর্ব্বকালে হরিস্মরণ দ্বারা ভগবানের করুণা লাভ করেন; তাঁহাদিগের পক্ষে অরণ্যাশ্রয়ের কোন আবশ্যক নাই. ভগবান স্বয়ং আসিয়াই তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন।” তুকারামের এই উপদেশে শিবাজীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি পুনর্ব্বার রাজচিহ্ন সমুদায় গ্রহণ করিলেন এবং জননীর সহিত কয়েকদিন সেখানে বাস করিয়া তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে পরিতৃপ্ত

হইলেন। অঞ্চলের নিধি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া, জিজিবাইয়ের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল; তিনি তুকারামকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কয়েকদিন এইরূপে অবস্থানের পর শিবাজী তুকারামের প্রসাদ * গ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর শিবাজী কখনও তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না। একবার পুনায় তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন কালীন, শিবাজী পুনা হইতে ১৫মাইল দূরবর্ত্তী সিংহগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু তুকারামের সঙ্কীর্ত্তনের তিনি এমনই অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, যে কয়দিন সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার প্রতিদিনই তিনি সিংহগড় হইতে পুনায় গমনাগমন করিতেন। মহীপতি বলেন যে এই উপলক্ষে একবার কতকগুলি মুসলমান সৈনিক সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তন স্থলে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা করে। শিবাজী আত্মরক্ষার জন্য সঙ্কীর্ত্তন স্থল পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, তুকারাম তাঁহাকে নিবারণ করেন এবং পরে তুকারামের প্রার্থনায় বিঠোবা স্বয়ং আসিয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করেন। ঘটনাটী কতদূর ঐতিহাসিক সত্য, তাহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
বৈদ্যনাথ।

কোম্পানী বাহাদুরের মনুষ্য-তৈল বিক্রয়।

দুই বৎসর অতীত হইল, দাসাশ্রমের জনৈক বন্ধু গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী কোন স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। একদিন একটী ছাত্র আসিয়া তাঁহাকে খবর দিল—“মাষ্টার মহাশয়! আমাদের গ্রামের একটী বৃদ্ধা গোয়াল ঘরের আগুনে পড়িয়া একখানি পা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। সংসারে তাহার কেহ থাকিয়াও নাই। পা খানি পচিয়া ভয়ানক ঘা হইয়াছে এবং তাহাতে

* কথিত আছে শিবাজী তুকারামের নিকট বিদায় লইবার সময় এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, যে তুকারাম যদি আমাকে তাঁহার প্রসাদচিহ্নস্বরূপ “ভাকর” (ভূট্টা হইতে প্রস্তুত একরূপ রুটী) প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের রাজ্য মুসলমানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধৃত হইবে; আর যদি তিনি আমাকে একটী নারিকেল ফল প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার পুত্র লাভ হইবে। তুকারাম শিবাজীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দুইই প্রদান করিয়াছিলেন।

পোকা পড়িয়াছে। আপনি ত দাসাশ্রমের কথা কতই বলিয়া থাকেন। ইহাকে যদি সেখানে পাঠাইয়া দেন, তবে বড় উপকার হয়।” এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় তখনি সেই ছাত্রটীকে লইয়া পূর্ব্বকথিত গ্রামে বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গিয়া যে শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন, তাহা ভাবিতেও চোখে জল আসে! তিনি দেখিলেন, সেই বাড়ীর কর্ত্তা (নাম মনে নাই) জ্বর, প্লীহা, যকৃত, উদরী এবং শোথে শয্যাগত। মৃত্যু যেন তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। গৃহিণীরও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। তাহাকেও গ্রহণী, সূতিকা ও জ্বরে শয্যাগত দেখিলেন। দুইটী অপোগণ্ড শিশুর উত্থানশক্তি আছে বটে, কিন্তু পেটগুলি প্লীহাতে পূর্ণ। বৃদ্ধাটী ঐ কর্ত্তার শাশুড়ী। তাহার বয়স প্রায় ৬০।৭০ বৎসর হইবে। চোখে ভাল দেখিতে পাইত না, তথাপি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিত। সে অঞ্চলে গোয়াল ঘরের মশা নিবারণের জন্য এক একটী অগ্নিকুণ্ড থাকে। দুর্ভাগিনী একদিন সেই অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া একখানি পা ভয়ানক রূপে পুড়াইয়া ফেলে। তাহাতে ঘা হইয়া পোকা পড়িয়াছে। বৃদ্ধা যাতনায় চীৎকার করিতেছে! সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। বাড়ীর মধ্যে কেবল ৯।১০ বৎসরের একটী মেয়ে ভাল ছিল। সে কোন প্রকারে কষ্টে স্বষ্টে সকলের পথ্য যোগাইত। শিক্ষক মহাশয় সেই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ইহাদিগকে দাসাশ্রমে পাঠাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর কর্ত্তাটী যদিও বা যাইতে রাজী হইল, তথাপি গৃহিণী কিছুতেই সম্মত হইল না। গৃহিণী তীব্রস্বরে স্বামীকে বলিল—“প্রাণ গেলেও বিদেশ বিভুঁইয়ে যাইব না। তুমি যদি যাও, তবে গলায় কলসী বাঁধিয়া আমি আত্মহত্যা করিব। যেতে হয় বুড়ী যাক্।” সেই শিক্ষক, ছাত্র ও গ্রামের দুই একজন মাতব্বর ব্যক্তি কত বুঝাইলেন, গৃহিণী কিছুতেই সম্মত হইল না। শত যুক্তি তর্ক পরাস্ত হইল, গৃহিণীরই জয় হইল। স্থির হইল—আর কেহ যাইবে না, কেবল বুড়ীই শিক্ষকের সঙ্গে যাইবে।

সেই দিনই বৃদ্ধার ঘা পরিষ্কার করিয়া পোকাগুলি বাহির করিয়া দেওয়া হইল; এবং পরদিন যাওয়া স্থির করিয়া শিক্ষক তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাথেয় সংগৃহীত হইল; কিন্তু

৫ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া কিরূপে বৃদ্ধাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে আনা যায়? ইহারা জাতিতে চাঁড়াল, কোন পাল্কী-বেহারা বা গাড়োয়ান তাহাকে আনিতে রাজী হইল না। কত প্রলোভন, কত ভয় দেখান হইল, তথাপি সেই জাতিভেদের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে কেহই সাহসী হইল না। অবশেষে কি করা যায়? সকলেই নিরাশ হইলেন। শিক্ষক স্থির করিলেন, যে কোনরূপে তাহাকে দাসাশ্রমে পাঠাইতেই হইবে। সন্ধ্যার সময় সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া দুই একজন মাতব্বর ব্যক্তিকে বলিলেন—“তোমরা ত এই বৃদ্ধার জ্ঞাতি; তোমরা ইহাকে ষ্টেশনে রাখিয়া আসিতে পারিবে না কি?” সকলেই অস্বীকার করিল। তখন সেই শিক্ষক নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—“আচ্ছা তোমরা না যাও, আমি একাই ইহাকে সমস্ত রাত্রি ধীরে ধীরে বহন করিয়া ষ্টেশনে লইয়া যাইব।” শিক্ষকের এই কথায় ছাত্রটীও তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। তখন গ্রামের একটী কৃষক যুবা উত্তেজিত স্বরে বলিল,—“যে যাহা বলে বলুক, আমিও আপনাদের সহিত যোগ দিব। আজ আর বেলা নাই; কাল বিকালে আসিবেন। আমরা তিন জনে ইহাকে ষ্টেশনে লইয়া যাইব।” শিক্ষক এই আকস্মিক বন্দোবস্তে আনন্দিত হইয়া সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। পরদিন আবার শিক্ষক ও ছাত্র সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। যেমন গ্রামে প্রবেশ করা, অমনি চারিদিক হইতে সকলে বলিতে লাগিল—“হ্যাঁগো হ্যাঁ, এই কি ভদ্রলোকের কাজ? এমন সর্ব্বনাশ করিতে আছে? ছি! ছি! ছি!!” শিক্ষক ত অবাক্! তিনি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন না। যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই লোকে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। অবশেষে একজন আসিয়া বলিল—“মহাশয়! এই গ্রামে মহেশ নামে এক চৌকিদার বাস করে। সে নাকি থানা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে, কোম্পানী বাহাদুর কলিকাতায় মানুষের তেল বিক্রয় করেন। বুড়াবুড়ীদের কাটিয়া তেল প্রস্তুত হয়। আপনি নাকি সেই কোম্পানীর এজেণ্ট! তাই এই বুড়ীকে এত আগ্রহের সহিত নিতে আসিয়াছেন। নতুবা আজিকালিকার দিনে কে কার উপকার করে? মহেশ চৌকিদারের কথায় সকল লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আপনি সতর্ক হউন।” শিক্ষক ত অবাক্! একি ব্যাপার? আজিকালিকার দিনেও মানুষের এমন কুসংস্কার থাকে? যে লোকটী সাহায্য করিবে

বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তিনি অন্যমনস্কভাবে তাহার বাড়ীতেই উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র সেও বলিল,—"আমি আপনাদের সাহায্য করিতে পারিব না।" শিক্ষকের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গ্রামের মেয়েরা পর্য্যন্ত বলিতে লাগিল—"ভদ্রলোকের ছেলে, মানুষের এমন সর্ব্বনাশ করে?" তখন শিক্ষক মহাশয় হাসিবেন কি কাঁদিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সকলকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না। তিনি জনৈক প্রতাপশালী জমীদারের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, নতুবা সেদিন অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন—"তোমরা মহেশ চৌকিদারকে ডাক। সে কোন্ স্থানে এ কথা শুনিয়া আসিয়াছে, প্রমাণ করুক। যদি প্রমাণ করিতে না পারে, আর এই বুড়ী যত্নাভাবে এখানে মারা যায়, তবে তাহার নামে আমরা আদালতে নালিশ করিয়া শাস্তি দেওয়াইব।" এই কথা শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল—"ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা, মহেশকে ডাক।" ধীরে ধীরে গ্রামের মাতব্বরগণ একত্রিত হইল। মহেশের জন্য লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু চৌকিদার মহাশয় শিক্ষকের নিদারুণ সঙ্কল্প শুনিয়া পূর্ব্বেই চম্পট দিয়াছিলেন। কাজেই মহেশকে পাওয়া গেল না। সুতরাং সকলেই শিক্ষকের কথা সত্য বলিয়া স্থির করিল এবং বৃদ্ধাকে লইয়া যাইবার অনুমতি দিল। তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। শিক্ষক ও ছাত্র দুই জনে একটা বাঁশের দোলা প্রস্তুত করিয়া সেই বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অন্য লোক না পাওয়ায় তাঁহারা দুই জনেই বৃদ্ধাকে লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গ্রামের আরও দুই একজন কৃষক উপস্থিত হইল। বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, ছাত্রটী বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিল—"ওগো ওঠ, মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন। এখনি তোমাকে যাইতে হইবে।" বৃদ্ধা পূর্ব্বেই তেল বিক্রয়ের কাহিনী শুনিয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ্য বৈঠকে সে কথা মিথ্যা বলিয়া যে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা শুনে নাই। সে তাঁহাদের সাড়া পাইয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, শীঘ্র আমায় রক্ষা কর। জীয়ন্ত যম আমায় নিতে আসিয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে সেই রুগ্ন বালকবালিকা, এমন কি সেই মুমূর্ষু কর্ত্তা ও গৃহিণী পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। গ্রামের লোক ব

বুঝাইল, দরজা খুলিতে বলিল, কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে ২।৩ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া শিক্ষক মহাশয় নিরাশ মনে ফিরিয়া গেলেন। ইহাদের আর দাসাশ্রমে আসা হইল না। কয়েক দিন পরেই শুনা গেল, বৃদ্ধা এবং তাহার জামাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। হায় কুসংস্কারে মানুষের কত সর্ব্বনাশ করে!

এই ত গেল এক ঘটনা। মাস খানিক হইল এই প্রকার আরও একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহাও এইখানে লিখিত হইল।

যশোহর জেলার অন্তর্গত কুলবাড়িয়া বাগআঁচড়া গ্রাম হইতে আমরা গত মাসে একটি অবশাঙ্গ আতুর পাইয়াছি। নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি তাহার স্বগ্রামস্থ একজন ভদ্রলোকের লিখিত।

"এই ব্যক্তির নাম শ্রীরসিকলাল পাড়ুই। ইহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও কঙ্কাল-মাত্র সার। যশোহর জেলার অন্তর্গত কুলবাড়িয়া বাগআঁচড়া গ্রামে ধীবর-বংশে ইহার জন্ম। ইহার পিতা জগমোহন পাড়ুই অতি সজ্জন ছিল। রসিকের শৈশবেই তাহার মাতাঠাকুরাণীর কাল হয়। সুতরাং বৃদ্ধ জগ-মোহনকে তাহার এক ভগ্নীর সাহায্যে শৈশব হইতে রসিক, প্রসন্ন ও কৈলাস এই তিন পুত্রকে মানুষ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আজ যে রোগে রসিককে চিরদিনের জন্য শয্যাশায়ী করিয়াছে, উহা তাহার ১৩।১৪ বৎসরের সময় তাহাকে আক্রমণ করে। আমরা শুনিয়াছি, ঐ সময়ে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহাকে এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন এক গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের সাহায্যে তাহার শরীরের উপরার্দ্ধ অনেক পরি-মাণে ভাল হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু নিম্নভাগ পূর্ব্ববৎ অসাড় রহিয়া গেল। সেই অবধি রসিকের জীবন-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকিয়াও তাহার গৃহকে যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর দূর করিবার উপায় নাই। তাহার কি শোচনীয় অবস্থা, তাহা কি কল্পনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়? তাহার প্রকৃত অবস্থা কি, না দেখিলে কখন হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। তাহার জন্য তাহাদের ঘরের দাওয়ায় এক পার্শ্বে একটু দূরে একখানা বংশমঞ্চ বান্ধিয়া দেওয়া হইল। রসিক সেই বাঁশের মাচায় যে ভাবে শুইল, কত কত বৎসর চলিয়া গেল, তাহার স্থানের পরিবর্ত্তন হইল না। সে যে অবস্থায় শুইয়াছিল, সেই অবস্থায় থাকিয়াই মল-মূত্র পরিত্যাগ করিত;

মঞ্চের মধ্যস্থিত ছিদ্র দিয়া মল-মূত্র নিম্নে পতিত হইত ; মলমূত্র হইতে পরিষ্কার করিয়া রাখিবার কেহ তাহার ছিল না। মাছি ভন্ ভন্ করিয়া তাহার গাত্রে জড়াইয়া থাকিত, মশা রাশি রাশি আসিয়া তাহাকে কামড়াইত কিন্তু হস্তপদ প্রভৃতি সকল অবয়ব থাকিতেও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সেই অবস্থার থাকিয়াই আবার তাহাকে অন্যের আনীত অন্নের দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতে হইত। বিষ্ঠার গন্ধে সে বংশমঞ্চের নিকট যাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। তাহার আত্মীয়েরা কেবল নাকে কাপড় দিয়া কোন রকমে তাহার আহারীয় মঞ্চোপরি রাখিয়া আসিত।* যদি তাহার জননী জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের এদশা সহ্য করিতে পারিতেন না। মলমূত্রমণ্ডিত অবস্থায় দূরে উদাসীন ভাবে রাখিয়া দিয়া তিনি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। জননী জীবিত না থাকিলেও তাহার পিতা তাহার উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিত, তাহার ভ্রাতারাও তাহার অভাব মোচনে যত্নবান থাকিত। তাহাদের সংসারে স্ত্রীলোকের অভাব ছিল বলিয়া তাহারা গৃহমধ্যে রাখিয়া তাহার সেবা করিতে পারিত না। আর সেরূপ সেবা কেবল জননী ভিন্ন আর কাহারও নিকট পাওয়া সম্ভব নহে। বৃদ্ধ জগমোহন যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন রসিক বরং নিকটে ছিল, জগমোহনের মৃত্যুর পর সে তদপেক্ষা দূরে গিয়া পড়িল। তাহার মঞ্চ গৃহ হইতে দূরে নির্ম্মিত হইল। কেন না মলমূত্রের গন্ধে সে গৃহে অবস্থান করা কঠিন হইয়াছিল। জগমোহনের মৃত্যুর পর মধ্যম ভ্রাতা প্রসন্নের উপর সংসারের ভার পড়িল। প্রসন্ন খুব বলিষ্ঠ এবং স্বীয় ব্যবসায়ে অত্যন্ত পটু ছিল। তাহার সংসার বেশ স্বচ্ছলতার সহিত চলিতে লাগিল। এই সময়ে সে বিবাহ করে। কিন্তু ইহাদের স্বচ্ছল অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিনের মধ্যে প্রসন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। একমাত্র কন্যা রাখিয়া তাহার স্ত্রীও ইহলোক পরিত্যাগ করিল। কনিষ্ঠভ্রাতা কৈলাস এখন সংসারের ভার গ্রহণ করিল। সেও খুব বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যক্ষম। কোন রূপে সংসার

* এই সকল ন্যক্কারজনক বর্ণনা পাঠ করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না ; কিন্তু অনেক হতভাগ্য লোক কিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা সাধারণের গোচর করিবার নিমিত্ত এই বর্ণনাগুলি যেমন পাইয়াছি, তেমনি রাখিয়া দিলাম। সম্পাদক।

চালাইতে লাগিল। কিন্তু হায় তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না। কয়েক মাস হইতে সে রক্ত আমাশয় ও জ্বরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন না করিলে সংসার চলে না। মধ্যে ঔষধ সেবন করিয়া কিছু আরাম হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না হইতে তাহাকে উদরান্নের জন্য জলে ডুব দিয়া মৎস্য ধরিতে হইয়াছিল। ইহাতেই তাহার রোগ বৃদ্ধি হয় ও জ্বর হইয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এই কৈলাসের উপর আতুর রসিকের জীবিকার ভার। মধ্যম ভ্রাতা প্রসন্নের কন্যাটীরও এই কৈলাস কাকা ভিন্ন আর গতি নাই।

"আমরা ইহার এই দুরবস্থা দেখিয়া রসিককে দাসাশ্রমে আনিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। দাসাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের নিকট তাঁহার পাথেয় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের লোকের এমনি দুরবস্থা —তাহারা মনে করিল, আমরা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে দাসাশ্রমে আনিতে চাহিতেছি। কেহ কেহ বলিল, সরকার বাহাদুরের কিছু মানুষের তেলের দরকার হইয়াছে, তাই কলে কৌশলে রুগ্ন অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলে ও জ্বাল দিয়া তৈল প্রস্তুত করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল। তাহাদের যে সকল জ্ঞাতি দুর্গন্ধের জন্য তাহার মঞ্চের নিকট যাইত না—যাহারা তাহার দুর্দ্দশায় এক কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করিতেছে না বা করিবে না, তাহারা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না যাওয়া উচিত নহে। গেলেই মারিয়া তেল করিবে।

"সবিশেষ বুঝাইয়া বলায় রসিক আসিতে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার জ্ঞাতিরা বাধা দিয়া আসিতে দেয় নাই।

"ঈশ্বরেচ্ছায় ও দুইটী যুবকের চেষ্টায় রসিক আজ দাসাশ্রমে আনীত হইয়াছে। ইঁহারা রসিককে আনিতে গিয়া যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। রসিকের আত্মীয় স্বজনকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ও দাসাশ্রমের বিবরণ তাহাদিগকে শুনাইয়া— এবং গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া তাঁহাদের দ্বারা বুঝাইয়া ও অনুরোধ করিয়া ইঁহারা রসিককে দাসাশ্রমে আনিবার জন্য প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে দিন রসিককে আনা হইল, সে দিনের

দৃশ্য কি মনোহর! যুবকদ্বয়ের একজন বাবু সুশীলচন্দ্র মল্লিক রসিকের আত্মীয় দুই এক জনকে মঞ্চ হইতে রসিককে নামাইবার জন্য বলিলে তাহারা নাকে কাপড় দিয়া অতি কষ্টে মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু ২।১ মিনিট সেখানে থাকিতে থাকিতে ওআক ওআক করিয়া বমি করিতে করিতে পলাইয়া আসিল। অবশেষে একটী ধীবর বালক রসিকের মস্তক ও সুশীল বাবু রসিকের পদদ্বয় ধারণ করিয়া অতি কষ্টে তাহাকে নামাইলেন। রসিকের মাথায় এক ঝোপের মত চুল হইয়াছিল। জীর্ণ মঞ্চের আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া ২০।২২ বৎসরের বৃষ্টি পড়িয়া তাহার চুল যে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রামের পরামাণিককে চুল কাটিবার জন্য ডাকিয়া আনা হইল, কিন্তু সে তাহাকে স্পর্শ করিতে চাহিল না। তখন সুশীল বাবু নিজে কাঁচি হস্তে চুল কাটিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ঐরূপ চুলের জটা কাটা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব? তাঁহার হাতে লাগিতে লাগিল, তিনি পারিলেন না। অবশেষে যথেষ্ট পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়া উক্ত প্রামাণিকের সাহায্যে চুলগুলি কর্ত্তন করা হইল। প্রামাণিক সুশীল বাবুদের প্রজা ছিল বলিয়া অবশেষে স্বীকৃত হইয়াছিল। সে চুলগুলিও দর্শনীয় বিষয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় সুশীল বাবু সেখানে উহা রাখিয়া আসিয়াছেন। চুল কাটার পর রসিকের সুন্দর মুখশ্রী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার হাতের নখও খুব বড় হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর তাহাকে স্নান করাইয়া একখানা তক্তার উপর শয়ন করাইতে হইল এবং তৎপরে নৌকা, গোযান ও রেলগাড়ীর সাহায্যে কলিকাতায় আনিয়া দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করা হইল। সেদিন প্রত্যূষে তক্তায় করিয়া যখন রসিককে দাসাশ্রম-কার্য্যালয়ের নিকট আনা হইল, তখন সকলে দেখিয়া অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমরাও সে দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

“ইহার পর রসিককে গিরিডিতে দাসাশ্রমের সেবালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। আশা করি সে সেখানে সুখে জীবনের অবশিষ্ট দিন গুলি কাটাইতে সক্ষম হইবে।

“বাড়ী হইতে যখন আইসে, তখন তাহার বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত রোদন করিয়াছিল। রসিকও বাড়ীর সকলকে ছাড়িয়া আসিয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব

করিতেছিল। তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় সেই রোগক্লিষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাসের কষ্টের কথা ভাবিয়া কাতর হইতেছিল। সুশীল বাবু ও তাঁহার সঙ্গী বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যাহাতে তাহার ভাইটী রোগমুক্ত হইয়া সুখে থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। তাঁহারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। রসিকের ইচ্ছা যে তাহার এই ভাইটী দাসাশ্রমে থাকিয়া রোগমুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যায় এবং সে স্বচক্ষে তাহাকে সুস্থ দেখিয়া কৃতার্থ হয়।”

খণ্ডগিরি।

“এই সেই খণ্ডগিরি? এইখানেই অর্হতগণ সংসারে বীতরাগ হইয়া নির্ব্বাণের পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন? এইখানেই রাজেন্দ্রগণ বৌদ্ধযতিগণের ধ্যান ও সমাধির নিমিত্ত গিরিদেহ খোদিত করাইয়াছিলেন?”

পশ্চিমগগনে নানারঙ্গ ছড়াইয়া ভানু ক্রমশঃ ধরাশায়ী হইতেছেন। গিরিপাদ হইতে অপক্ক ধান্যের শ্যামল দুকূল পরিয়া বিস্তীর্ণ বসুন্ধরা স্বীয় কলেবর মাণ্ডিত করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে দেবাদিদেব ভুবনেশ্বরের তুঙ্গ মন্দিরচূড়া নয়নে অস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। সন্ধ্যা-সমাগম দেখিয়া সমুদ্র-সমীর ক্লান্ত শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। লোকালয়ের কোলাহল নাই, সংসারের আকুলতা নাই, চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

শরৎকাল। একদিন অপরাহ্নে আমরা খণ্ডগিরি দেখিতে আসিয়াছিলাম। তথায় পাষাণময় গুম্ফা (খোদিত গৃহ) দেখিয়া আসিয়া উদয়গিরির উপরে ক্লান্তদেহে উপবিষ্ট। সম্মুখে ও নীচে “রাজারাণী গুম্ফা” নামক গিরিদেহখোদিত পাষাণময় দ্বিতল গৃহশ্রেণী।

হয় ত বাহ্যপ্রকৃতি আমাদের চিন্তাস্রোতকে নূতন মার্গে চালিত করে, হয় ত আমাদের মনই প্রকৃতিকে ইচ্ছানুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া আপনার সহচরী করিয়া লয়। কোথায় সেই প্রাচীন বৌদ্ধগণ, আর কোথায় আমরা! প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রথিত হইয়াছিল; সামীপ্যগুণে আজ আমরা সেই কালের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নীরবে সেই পুরাতন কাহিনীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম। যেন কালের পরিবর্ত্তন হয় নাই, যেন সেই সকল গিরিগুহা এখনও ভিক্ষুগণে পরিপূর্ণ, যেন আমরা তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

খণ্ডগিরির সম্মুখে পূর্ব্বদিকে কয়েকটা আম্র বৃক্ষের বাগান। তন্মধ্যে এখানে সেখানে কয়েকটা বট ও অশ্বত্থ গাছ। কিঞ্চিৎ দূরে কুচিলা ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষের জঙ্গল। একটা অশ্বত্থবৃক্ষস্থ কয়েকটা বানরের আকস্মিক চীৎকারে আমাদের চিন্তাস্রোত প্রতিহত হইল। আমার বন্ধু বলিলেন, "চলুন, তৃতীয়ার চাঁদ ডোব ডোব হইতেছে। এখানে হিংস্র জন্তুর অসদ্ভাব নাই।" বাস্তবিক, সেই বৌদ্ধযতিগণের পুরাতন কুটীর সকল এখন হিংস্র জন্তুর আবাস-ভূমি হইয়াছে। পাষাণময় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে; উচ্চগিরিশেখর বলিয়াই এখনও ভগ্ন স্তূপে পরিণত হয় নাই।

পাষাণও কালের হাত এড়াইতে পারে নাই। স্থানে স্থানে গুম্ফা ভগ্ন হইয়াছে, স্থানে স্থানে শিলা সকল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বন্য বৃক্ষে গৃহ ও প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত হইয়াছে। দুই এক উচ্চ স্থান ব্যতীত সমুদয় গিরিদেহ বৃক্ষাদিতে আবৃত হইয়াছে।

নীচে হইতে উপরে আরোহণের তেমন পথ নাই। তবে, প্রাচীন আর্য্যগাথা শুনিতে মধ্যে মধ্যে কোন কোন লোক সে সকল স্থানে বিচরণ করে বলিয়া, লতাপাতার ভিতর দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ অস্পষ্ট পথ পড়িয়াছে।

সেই ভিক্ষুগণসেবিত বহুকষ্টে খোদিত গুম্ফা সকল এখন সর্পাদির ক্রীড়াভূমি। যেখানে যতিগণ ধ্যানে দিবসরজনী যাপন করিতেন, এখন তাহা আরণ্য বৃক্ষের উর্ব্বরাভূমি। কত কত সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি হয়ত সেখানে লগ্নসমাধিচিত্তে বাস করিতেন, কত কত সংসার-বিরাগী সেখানে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অন্ধকার রাত্রি সমাগত দেখিয়া আমরা আর অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে পারিলাম না। লতাপাতার ভিতর দিয়া গাছের ডালপালা বাঁকাইয়া আমরা উদয়গিরির শেখর হইতে নিঃশব্দে অবতরণ করিতে লাগিলাম।

আমার বন্ধুর সহধর্ম্মিণী আমাদের সঙ্গিনী হইবার অভিলাষে পাহাড়ের কিয়দ্দূর উঠিয়াছিলেন। লতাপাতায় পথ আবৃত, স্থানে স্থানে বিশ্লিষ্ট শিলা সকল পতনোন্মুখ দেখিয়া তিনি কিয়দ্দূর উঠিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উদয়গিরির পাদদেশে এক বৈষ্ণবের কুটীর রহিয়াছে। তাঁহার কুটীরে বন্ধুগেহিনী আশ্রয় লইয়াছিলেন।

একটি ক্ষীণ প্রদীপ গৃহের এক পার্শ্বে মিট্‌ মিট্‌ করিতেছিল। নানা দেশদেশান্তরের নানা ভক্তযোগী সন্ন্যাসীর পাদুকা-শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া

বৈষ্ণব ঠাকুর তাহাদের ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন। কাষ্ঠময় পাদুকার বিচিত্র রচনা ও তদুপরি চন্দনলেপ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তৎসমুদয়ের অধিকারী নানাদেশীয় সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণবঠাকুরের অচলা ভক্তি। বৈষ্ণবঠাকুর শুভ্র শ্মশ্রুতে হাত দিয়া পাদুকা-কাহিনী ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; অদূরে সম্ভ্রমে অবনতমস্তকে বন্ধুগেহিনী তাহা শুনিতেছিলেন।

আরতির সময় অতীতপ্রায় দেখিয়া বৈষ্ণবঠাকুর আমাদিগকে পরদিন আসিতে বলিলেন। আমরাও সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় নাই। কি যেন গাম্ভীর্য্যে, কি যেন পূর্ব্বগৌরবস্মৃতিতে, কি যেন আশাভঙ্গে, আমার বন্ধুর চিত্ত পূর্ণ হইয়াছিল। কতক্ষণ পরে বন্ধু বলিলেন, "আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ঐ সকল গিরিগুহায় কালাতিপাত করিতেন? যদি তাঁহারা মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আশ্রম বিলুপ্ত করিয়া গেলেন না কেন?"

ছয় বৎসর পরে আবার খণ্ডগিরি দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। কটকের ঠিক দক্ষিণে পুরী। পুরী যাইবার এক সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়া ৮ ক্রোশ গেলে পশ্চিম দিকে বাঁকিতে হয়। পাকা রাস্তা হইতে প্রায় ২॥০ ক্রোশ দূরে মহাদেব ভুবনেশ্বরের পুণ্যক্ষেত্র। তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে আরও ২॥০ ক্রোশ গেলে খণ্ডগিরি। অতএব এ পথে গেলে খণ্ডগিরি প্রায় ১৩ ক্রোশ দূরে পড়ে।

এবার আমাদের খণ্ডগিরিই দেখিবার সংকল্প ছিল। এজন্য ঐ বাঁকা পথে না গিয়া সোজা চাঁদগা পথে যাবার বন্দোবস্ত করা গেল। ঐ পথ দিয়া খুরদা যাইতে হয়। এজন্য উহার নাম খুরদা রাস্তা হইয়াছে। এই পথে খণ্ডগিরি কটক হইতে ৮।৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

এবার এক জন প্রত্ন ও ভূ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বন্ধু সপরিবারে যাইতেছিলেন। এবার সেই নীরব কবি সঙ্গে ছিলেন না। আহারাদি সমাপন করিয়া রাত্রি দশটার সময় স্প্রীংযুক্ত গোযানে চড়িয়া খণ্ডগিরি যাত্রা করা গেল। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, পথের দুই পার্শ্বে অরণ্যানী। ঘোর অন্ধকার রাত্রে এরূপ পথ আরও অতিক্রম করিয়াছি শুনিয়া ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

শীতকালের সূর্য্য, দেখিতে দেখিতে শীঘ্রই আকাশে উঠিয়া বসিলেন।

শীঘ্রই ৮টা বাজিল। আমরা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া উদয়গিরির পাদদেশে স্থিত বৈষ্ণবঠাকুরের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

বাস্তবিক, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি, একই গিরি; মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দ্বারা একটি হইতে অন্যটি খণ্ডিত দেখায়। বোধ হয়, এই জন্যই একটির বিশেষ নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে। উভয়ই বালুকাপ্রস্তরে গঠিত, উভয়ই প্রায় এক দিকে বিস্তৃত, উভয়ই প্রায় একই প্রকার উচ্চ। চারি দিকের ভুমি হইতে উহারা প্রায় ৮০ হাত উচ্চ মাত্র। উদয়গিরি প্রায় ৮০০ হাত দীর্ঘ, খণ্ডগিরিও প্রায় সেইরূপ।

বালুকাপ্রস্তর বলিয়া গুম্ফা-খননের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু বালুকা-প্রস্তর বলিয়াই গুম্ফার কারুকার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া যে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তাহাদিগকে এখানে গুম্ফা* বলে। এরূপ গুম্ফা পশ্চিমদিকের খণ্ডগিরি এবং পূর্ব্বদিকের উদয়গিরি, উভয়েই বর্ত্তমান। তবে উদয়গিরিতে যত আছে, খণ্ডগিরিতে তত নাই।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা প্রথমে উদয়গিরি দেখিতে উঠিলাম। একটির পর একটি সমুদয় গুম্ফা দেখিতে লাগিলাম। উদয়গিরির পূর্ব্বাংশে “রাণী নঅর” বা রাজারাণী নামক পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল গুম্ফা। ‘নঅর’ শব্দটা নগর শব্দের অপভ্রংশ। এই নাম হইতেই উহার অপরাপর নাম ‘রাণীগুম্ফা’, ‘রাণী অন্তঃপুর’ ইত্যাদির উৎপত্তি।

উহার তিন দিকে দ্বিতল গৃহশ্রেণী। কেবল দক্ষিণ-দিক্ উন্মুক্ত। ঐ দিকেও গৃহ থাকিলে গুম্ফাটি আজ কালকার চকমিলান বাড়ীর মত দেখাইত। মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণ প্রায় ৩০ হাত লম্বা এবং ১৬ হাত চৌড়া। দক্ষিণদিকে পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা বলা যায় না। কেন না, এক্ষণে তাহা বিচ্ছিন্ন পাথরে এবং তৃণ-গুল্মাদিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে।

* গুম্ফা বা গুম্ফ শব্দ সংস্কৃত বলিয়াই বোধ হয়। ইহার অর্থ গুহা। তিন চারিখানি সংস্কৃত অভিধানে গুম্ফ শব্দের গ্রন্থন অর্থ পাইলাম। কিন্তু গুম্ফার অর্থ গুহা না করিলে নিম্নের শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট হয় না।

“যেন স্বৈরমপাণি পাণিনিমতং
প্রাণাদি কানাদবাগ্ গুম্ফে।”

সাহিত্য রত্নাকর।

“অন্তস্তন্ত্রমরংস্ত পন্নগগবী গুম্ফেষু চাজাগরীৎ।”

মল্লিনাথ কৃত টীকায়াঃ মঙ্গলাচরণম্।

গৃহগুলি হঠাৎ দেখিলে দ্বিতল বোধ হয়। কিন্তু নীচের তলার ঠিক উপরে উপর তলা নহে। বোধ হয় পাহাড়ের গা যেমন ঢালু ছিল, তদনুসারে উপর তলের গৃহগুলি নীচের তলার পশ্চাদ্দিকে খোদিত হইয়াছে।

প্রাঙ্গণের তিন দিকে সারি সারি ঘর। ঘরের সম্মুখে থামযুক্ত বারান্দা। দ্বার প্রকোষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুই জন বর্ম্মাবৃত প্রহরী পাষাণদেহ বহির্গত করিয়া আছে। এই বারান্দার কোথাও বিকটবদন স্থূলদেহ বামনমূর্ত্তি, কোথাও কিম্ভূতকিমাকার হ্রস্বমূর্ত্তি, আর কোথাও বা বঙ্কিমবপু সুকুমারীর দেহ যষ্টি। ইহাদের মস্তকে উপরিস্থিত গুরুভার অর্পিত হইয়াছে।

নীচের বারান্দা প্রায় ৪০ হাত লম্বা, ৬ হাত চৌড়া এবং ৪৷৹ হাত উচ্চ। উপর তলার এক একটা ঘর প্রায় ১০ হাত লম্বা, ৫ হাত চৌড়া এবং ২৷৹ হাত উচ্চ। এই রাণী গুম্ফাই সকলের মধ্যে প্রকাণ্ড। দ্বারের উপরে যে সকল নরনারীমূর্ত্তি আছে, তাহাদের ধুতি চাদর, আভরণ, সঙ্গীত-যন্ত্র ইত্যাদি আজও প্রায় অবিকৃত আকারে উড়িষ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের আরও উচ্চে গণেশ-গুম্ফা। গণেশ-গুম্ফাও বিস্তৃত। কিন্তু উহা দ্বিতল নহে। উহাতে দুই খানি মাত্র ঘর, ঘরের সম্মুখে বারান্দা। গুম্ফার দুই পার্শ্বে দুইটা পাষাণময় হস্তীমূর্ত্তি রহিয়াছে। গজকে গজানন ভাবিয়াই বোধ হয় উহার নাম গণেশ-গুম্ফা হইয়া থাকিবে।*

স্বর্গপুরী গুম্ফা প্রকৃত দ্বিতল, অর্থাৎ ইহার নীচের তলার ঠিক উপরে উপর তলা। কিন্তু ইহাই উহার ধ্বংশের কারণ হইয়াছে। তদনন্তর জয়া বিজয়া, বৈকুণ্ঠ, সর্প প্রভৃতি অনেকগুলি গুম্ফা দেখিতে লাগিলাম। ব্যাঘ্র গুম্ফাটি

* গণেশ-গুম্ফার দ্বারে কতকগুলি প্রস্তর ও তদুপরি কাঁচা লতাপাতা দেখিয়া বড় কৌতূহল জন্মিল। আমরা শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বদিন কেহ পাহাড়ে উঠে নাই। এখানে লতাপাতা কে রাখিল? নিকটে গিয়া দেখি, ঘরের ভিতরে এক ভীমকলেবর রক্তচক্ষু পুরুষমূর্ত্তি। সেখানে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। মূর্ত্তি দেখিয়াই তাহাকে কোন দুর্বৃত্ত দস্যু বলিয়া মনে হইল। সে সেই নির্জ্জন উচ্চ পাহাড়ের গুম্ফার ভিতরে কেন? লোকটা প্রথমে কোন উত্তর দিল না। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে লোকটা বলিল, সে তিন দিন হইতে কোন রোগ শান্তির আশায় গণেশ-গুম্ফায় “হত্যা” দিতেছে। তিন দিন উপবাসী ব্যক্তির সেইরূপ সবল দেহ, রক্তচক্ষু ও তাহার গোপন চেষ্টা দেখিয়া সে কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া সেখানে লুক্কায়িত আছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া তত্রত্য চৌকীদারকে উহার প্রকৃত তথ্য লইতে পাঠান গেল। সে আসিয়া বলিল, সে ব্যক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে।

দেখিতে ব্যাঘ্রমুখের মত। গোল বৃহৎ লোল চক্ষু যেন বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। নাসারন্ধ্রও আকারসদৃশ বৃহৎ। মুখবিবরে গুম্ফা খোদিত হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বিশাল দংষ্ট্রা বিকসিত করিয়া মুখব্যাদান করিয়া আছে। এইরূপ, সর্পগুম্ফায় একটা সর্পের ফণার নীচে ক্ষুদ্র গৃহ খোদিত হইয়াছে।

এইরূপ, প্রাণীর আকারে কয়েকটি গুম্ফা খোদিত হইয়াছে। কোনটার ঘর নিতান্ত ক্ষুদ্র ; এত ক্ষুদ্র যে তন্মধ্যে কিরূপে কেহ সোজা হইয়া বসিতে পারিত, তাহাই অসম্ভব মনে হয়। আবার এক একটা ঘর বড় হইলেও তাহার দ্বারটি এত ক্ষুদ্র যে, কচ্ছপের ন্যায় হস্তপদাদি আকুঞ্চিত না করিলে তন্মধ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। কোন কোনটার দ্বারের উপরিভাগে কত লতাপাতা, কত নরনারীর মূর্ত্তি, কত যুদ্ধ সজ্জা। এক্ষণে কোন মূর্ত্তি প্রায় |মিশিয়া গিয়াছে, কোনটার হাত আছে ত পা নাই, পা আছে ত মাথা নাই। আবার কোথাও ফলপুষ্প এখনও যেন সদ্যোনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন। শীতকাল হইলেও তাঁহার কিরণজাল ক্রমশঃ অসহ্য হইতে লাগিল। দ্রুতপদে আমরা উদয়-গিরি সমাপন করিয়া তত্রত্য ডাক বাঙ্গালায় মাধ্যাহ্নিক আহার নিমিত্ত পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

বৈকালে খণ্ডগিরি আরোহণ করিলাম। উহাতে উঠিবার নিমিত্ত কিয়-দ্দূর পর্য্যন্ত একটা সোপানশ্রেণী আছে। কিয়দ্দূর উঠিলেই বামে ও দক্ষিণে দুই দিকে দুইটা পথ। দক্ষিণ দিকে অনন্ত গুম্ফা। উহাতে এক খানি লম্বা ঘর, ঘরের সম্মুখে বারান্দা। গৃহমধ্যে বুদ্ধদেবের ভগ্নপ্রায় প্রতি-মূর্ত্তি। দ্বারের উপরে রাণীগুম্ফার ন্যায় কতকগুলি স্থাপত্য অলঙ্কার। দুই পার্শ্বে অনন্তের ফণা সকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

সোপানশ্রেণীর বাম পথে গেলে কয়েকটা গুম্ফা দেখা যায়। এগুলি জৈন গুম্ফা। কোনটার মধ্যে ধ্যানী বৌদ্ধের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি, কোন-টায় বা জৈনদের জিনমূর্ত্তি।

খণ্ডগিরির শিখরদেশে একটা আধুনিক জৈন মন্দির। অমন সুন্দর স্থান আর নাই। তথা হইতে চারিদিক সুন্দর দেখায়। উচ্চ বলিয়া শাদা পাথরে এখনও উদ্ভিদ্-জন্মোপযোগী মৃত্তিকা সঞ্চিত হয় নাই। দূর হইতে

গিরিকন্দরের আচ্ছাদন স্বরূপ বৃক্ষাদির ভিতর দিয়া ঐ জৈন মন্দির দৃষ্টি-গোচর হয়।

ঐ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দেবসভা নামক বৌদ্ধ-চৈত্য। উহার পূর্ব্বদিকে আকাশগঙ্গা বা গুপ্তগঙ্গা নামক একটা বাপী। প্রায় ৪০ হাত উচ্চে পাহাড় কাটিয়া ঐ বাপী প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে বার মাস জল থাকে। বোধ হয়, কোন পার্ব্বত্য প্রস্রবণের জলে উহা পূর্ণ থাকে। এক্ষণে উহার আদর নাই, জলও হরিদ্বর্ণ। বোধ হয় পূর্ব্বে গুম্ফাবাসিগণের ঐ জলই পানীয় ছিল।

তিন বৎসর পরে পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে আবার খণ্ড-গিরি দেখিতে আসিলাম। খণ্ড-গিরি যতই দেখি, ততই যেন উহাতে নূতন নূতন রহস্য দেখিতে পাই।

ভূবনেশ্বর হইতে আসিতে আসিতে খণ্ড-গিরির শিখরস্থিত পূর্ব্বোক্ত শ্বেত জৈন মন্দির গাছপালার ভিতর দিয়া অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড সূর্য্য চারি দিক্ দগ্ধ করিতেছিলেন। প্রখর কিরণে মৃতপ্রায় হইয়া উদ্ভিদ্‌গণ এক প্রকার বিকটগন্ধ বাষ্প উদ্গীরণ করিতে-ছিল। যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, বন্যবৃক্ষাচ্ছাদিত গিরিদেহের উন্মুক্ত স্থান সকল ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল।

ভারতের পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ পূর্ব্বঘাট গিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণী সকলেই অবগত আছেন। সেই পূর্ব্বঘাট গিরি চিলিকা হ্রদেই শেষ হয় নাই। আরও উত্তর দিকে উড়িষ্যার ভিতর দিকে উহা বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রভেদ এই যে, এখানে স্থানে স্থানে অবিচ্ছিন্ন আকার ত্যাগ করিয়াছে। চারিদিকের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যেন উহার শাখাগুলি উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল বিশ্লিষ্ট গিরির মধ্যে খণ্ডগিরি একটি।

উহাকে একটী গিরি বলা সঙ্গত হইল না। কেন না, বিশ্লিষ্ট গিরি সকল পরস্পর প্রায় সংলগ্ন। উহাদের পূর্ব্বদিকে উদয়গিরি, তারপর খণ্ডগিরি,তার পর নীলগিরি, তার পর ধবলাগিরি বা ধৌলির পাহাড়। এই ধৌলির পাহাড় উদয়গিরির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি,উভয়েরই সামান্য নাম খণ্ডগিরি। ঐ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে হইলে পূর্ব্বদিকেরটিকে উদয়-গিরি বলা যায়। নীলগিরিতে কোন দর্শনযোগ্য বস্তু নাই। ধৌলির

পাহাড়ে অশোকখোদিত অশোক-বার্ত্তা এখনও সভ্য জগতকে লজ্জিত করিতেছে। ধন্য প্রিন্‌সেপ সাহেবের অধ্যবসায়, ধন্য তাঁহার গবেষণা-বৃত্তি! তিনিই প্রথমে ধৌলির পাষাণ-দেহ হইতে প্রিয়দর্শী অশোকের অহিংসাধর্ম্ম,—রোগ দুঃখের সময় ইতর প্রাণিগণের প্রতি দয়া, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের ইতিহাস উদ্ধার করেন।

বিদ্যাকেশরী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাসে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার Antiquities of Orissa এবং Indo-Aryans নামক পুস্তক দুই খানিতে ভারতের লুপ্ত কীর্ত্তি, আচার ব্যবহার প্রভৃতির জ্বলন্ত ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

খণ্ডগিরির গুম্ফা সকল কে কবে খোদিত করিয়াছিলেন? কোন কোন গুম্ফায় কি লেখা আছে। কালের কুটিলগতিতে লেখাগুলি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। দুই এক স্থানে যাহা পড়া যায়, তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, সমুদয় গুম্ফা এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। কোন কোন গুম্ফা খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল। ঐর নামক কোন কলিঙ্গাধিপতির নাম কোন কোন লেখায় পাওয়া যায়। তিনিই অনেক গুম্ফা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

উড়িষ্যায় যত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ক্রমিক নিদর্শন গিরি-গুম্ফায়, মন্দিরে, মঠে এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পর প্রায় সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া এখানে তাঁহার ধর্ম্ম অপ্রতিহত ছিল। সেই সময়েই ঐ সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ গুম্ফা রচিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রাকার গুম্ফাগুলি না কি সকলের প্রাচীন।

সেইদিন চিন্তা করুন। যেদিন মাগধীয় বৌদ্ধরাজগণ দেশদেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। যেদিন ধর্ম্মের গৌরবে কত কত লোক ভিক্ষু হইয়া লোকালয় স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। নির্জ্জন স্থান পাইলে কে ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত কোলাহলময় নগরে বাস করিতে চায়? মধ্যে মধ্যে যে গৃহের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হয়, সে গৃহ ছাড়িয়া কে না গিরিগুহায় থাকিতে চায়?

আবার ভানু পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলেন। আবার অতনুবনরাজিশ্যামিত উপত্যকা অন্ধকারে আরও শ্যামিত হইয়া উঠিল। উচ্চ খণ্ডগিরির জৈন মন্দিরের চূড়া হইতে ক্ষীণ কিরণ ক্রমশঃ নামিয়া পড়িতে লাগিল। নির্জ্জন

স্থান আরও যেন নির্জ্জন হইয়া উঠিল। একজন বঙ্গদেশীয় পাগলা বৈষ্ণব কখন জৈন-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সায়াহ্ন দেখিয়া মৃদঙ্গের ঘোর বাদ্যে তাহার স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুখে আরতি করিতে লাগিল। সেই মৃদঙ্গ কাঁসরের রবে গিরিকন্দর দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে অস্তাচলগামী সূর্য্যের ক্ষীণ আলোকে, মৃদঙ্গের ঘোর নিনাদে, পাগলের বিকট হাস্য, বৃক্ষাদির ভিতর দিয়া সামুদ্র সমীরের হু হু শব্দ, চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বর্ষা-দিবার মৃত্যু।

মেঘের অঞ্চলে ঝাঁপি' অরুণ আনন,
কাঁদিতে কাঁদিতে আজি এসেছিল দিবা;
ভেদিয়া জলদ-বাস, অতি মৃদুতর
পড়ে'ছিল ধরণীতে বরণের বিভা।
সারা বেলা বর্ষি অশ্রু, অতি ধীরে ধীরে
সমস্ত আকাশ পায়ে করি অতিক্রম,
ক্লান্ত স্বর্ণ তনুখানি পড়েছে মূরছি'
অস্তাচল প্রান্তে এবে, রোদন-রক্তিম
করুণ নয়নাকাশ অর্দ্ধ উন্মীলিত;
মুখ হ'তে সরে গেছে মেঘ অবরণ!
ম্লানমুখী সন্ধ্যাসখী বসি এলোকেশে
শিয়রেতে, শ্রান্ত শির স্নেহে কোলে লয়ে,
নত নেত্রে হেরিছে সে বিশীর্ণ বয়ান;
বিন্দু বিন্দু শিশিরাশ্রু ফেলিয়া ভূতলে!
মিলা'ল জীবনজ্যোতি দিবাদেহ হ'তে
জন্মশোধ, পড়ে এল ছায়ার পল্লব
আঁখি পরে, পরশিল শীতল মরণ।
টানি' দিয়া মৃত কায়ে আঁধার বসন
সায়াহ্ন বিষণ্ণ মুখে পশিল সুধীরে
নক্ষত্রপ্রদীপ জ্বালা নিশার মন্দিরে!

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

সেকালের পাঠশালা।

(১)

একালের পাঠশালার কথা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ "চোখের জল" ফেলিয়া থাকেন। একালের পাঠশালা সম্বন্ধে আমার তেমন অভিজ্ঞতা না থাকায়, এইরূপ কার্য্য করা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেকার পাঠশালা সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতাবলে, আমি কাহারও অনুরোধ বা প্ররোচনাতেও, সেকালের পাঠশালার কথা চিন্তা করিয়া চোখের জল ফেলিতে সম্মত হই না।

একালের পাঠশালার অন্তর্বাহ্য কিছু কিছু যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সেকালের পাঠশালার সহিত ইহার সাদৃশ্য অল্প। এই পরিবর্ত্তনশীল যুগে পাঠশালাতেও পরিবর্ত্তনের ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালী যেরূপ না-বাঙ্গালী না-ইংরেজ; আধুনিক কৃষ্ণযাত্রা যেরূপ না-যাত্রা না-থিয়েটার; আধুনিক পাঠশালাও আমার চক্ষে তদ্রূপ না-পাঠশালা, না-স্কুল!

প্রথমে বাহ্য বিষয়ই ধরুন। আধুনিক অনেক পাঠশালাতে আপনি সেই চিরন্তন "চট, চেটাই ও মাদুর" আর দেখিতে পাইবেন না। সুদৃঢ়, সুগঠিত কাষ্ঠময় বেঞ্চসমূহই আজ কাল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। আধুনিক পাঠশালার গুরুমহাশয়ও অনেক স্থলে ইংরেজী-জুতো-পরা, কোট-কামিজ-আঁটা, টেরি-কাটা নব্যবাবু। কিন্তু সেকালের গুরুমহাশয়দিগকে আমরা কখনও চটী ভিন্ন অন্য কোনও জুতা পরিতে দেখি নাই; আর অঙ্গে কোট-কামিজ চড়ানো দূরে থাকুক, তিনি চক্ষে সে সকল সামগ্রী কখনও দেখিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি পাঠশালার মধ্যে খোলা গায়েই বসিয়া শিক্ষাদান-কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং বড় বড় পাঠশালা-পরিদর্শকেরা আসিলেও কদাচ নগ্নবপু সমাবৃত করিবার চিন্তা পর্য্যন্ত করিতেন না। আধুনিক কোন কোন গুরুমহাশয়ের ন্যায়, তিনি বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্তও পাঠশালা করিতেন না এবং রবিবারেও পাঠশালা বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন না। তাঁহার পাঠশালা প্রায় সর্ব্ব দিনই খোলা থাকিত; কেবল পর্ব্বদিনেই এই প্রথার ব্যতিক্রম হইত। সে সব কথা যথাস্থানে বলিতেছি।

এ কালের পাঠশালায় আপনি ক্বচিৎ সেই পবিত্র তালপত্র ও "তক্তি" দেখিতে পাইবেন। ঘৃণ্য স্লেট্ পেন্‌সিল এখন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। ম্যাজেণ্টা ও গুলেল রংএর দৌরাত্ম্যে এবং ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কেমিষ্টদের জ্বালায় আজ কাল বেচারা বালকেরা ভূষা ও বাব্‌লা আঠা মাড়িয়া ঘোরকৃষ্ণবর্ণা চাক্‌চিক্যময়ী মসী প্রস্তুত করিবার আমোদটি পর্য্যন্ত সম্ভোগ করিতে পায় না! তালপত্র ও তক্তিতে না লিখিলে হাতের "আঁখর" যে কখনও বসিতে পারে, সে বিশ্বাস আমার নাই। সে কালের পাঠশালার ছাত্র—আমাদের মত কে "মুক্তা" বসাইতে পারে, তাহা জানিতে চাই।

আমি স্থিতিশীল সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও, "পাষাণ-হৃদয়" স্লেটের উপর চিরকালই চটা। পাষাণে দাগ বসে না, আঁখর বসিবে, ইহাও কি বিশ্বাস হয়? তাহার পর, তাহার দয়ামায়ার পরিচয় তাহার নামেই বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতেছে; তৎসম্বন্ধে আমাকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া অধিক কিছু বলিতে হইবে না। যদি তুমি স্লেট ধরিলে, তবে স্লেটও তোমায় ধরিয়া বসিল। তোমার আর কোথাও একটী পাও নাড়িবার যো রহিল না। একবার যে ডোবার ঘাটে স্লেটখানা ধুইতে যাইবে, সে আশার মুখে একবারে ছাই পড়িল। গুরুমহাশয়ের হুকুম,—স্লেটের সঙ্গে একটু সিক্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া রাখ। তদ্দ্বারাই স্লেট মোছা যাইবে। ডোবার ঘাটে যাইবার আবশ্যকতা কি? কিন্তু বলুন দেখি, তক্তি বা তালপত্রের বেলায় গুরুমহাশয় কখনও কি মুখ হইতে এই আদেশ উচ্চারণ করিতে পারিতেন? আমরা যখন পাঠশালায় পড়িতাম, তখন প্রত্যহ ডোবার ঘাটে তালপত্রগুলি ধুইতে যাইতাম। তালপত্রের লেখাগুলি সযত্নে ধুইয়া না ফেলিলে, কোন মতেই তাহা হইতে কালীর দাগ উঠিত না। সুতরাং এই কষ্টসাধ্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যাপারে যে ঘণ্টা খানেক সময় লাগিত, তাহার আর বিচিত্রতা কি? তাহার পর সেই জলসিক্ত তালপত্রগুলিকে শীঘ্র বিশুষ্ক করিবার জন্য, তাহাদিগকে মেলিয়া তাহাদের উপর ধূলিজাল বর্ষণ করিতে হইত। ধূলিকণাসমূহ জলবিন্দুসমূহকে শোষণ করিলে, তালপত্র হইতে তাহাদিগকে আবার ঝাড়িয়া ফেলিতে হইত। তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্যও আবার ডোবার ঘাটে যাইতে হইত। সুতরাং একবার ভাবিয়া দেখুন, তালপত্র ব্যবহারের কত সুবিধা ছিল! বুদ্ধিমান্ বালকেরা এই দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিত ও কত নূতন তথ্যের

আবিষ্কার করিতে পারিত ! "পাষাণ হৃদয়" স্লেট যে কত বালককে পাষাণ-হৃদয় ও জড়প্রকৃতি করিয়া দিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে সত্যসত্যই আমার চক্ষু হইতে অশ্রু বাহির হয়।

আমি পাঠশালার বুদ্ধিমান্ বালকদের মধ্যে পরিগণিত ছিলাম না। আমার বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কখনও কোনও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না। কিন্তু অনেকেই আমার কার্য্য দেখিয়া কারণের অস্তিত্ব অনুমান করিতেন। পাঠশালায় সমস্ত দিন আবদ্ধ হইয়া থাকিতে বড়ই নারাজ ছিলাম, আর শুভঙ্করের "আর্য্যা" মুখস্থ করিতেও অতীব অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতাম। কুক্কুর, বিড়াল, পারাবত, পক্ষিশাবক, ইহাদের প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ ছিল; আর সুপক্ক ফলাদিরও উপর বিলক্ষণ অনুগ্রহদৃষ্টি ছিল। শুভঙ্কর দাসের—

"কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লীয্যে।
কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লীয্যে ॥"

এই অদ্ভুত শ্লোকগুলি মুখস্থ না করিয়া আমি গোপনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামরাবণের যুদ্ধবৃত্তান্ত পড়িতে অতিশয় আগ্রহ প্রদর্শন করিতাম। আমার মতিগতি দেখিয়া গ্রামের জনেক প্রবীণ ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে জাজ্বল্যমান আছে।

"পা'খ পায়রা পাঁচালী,
তিনে ছেলে মজালি।"

আমাকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞবর উপরোক্ত শ্লোকটি মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু ইহাতেও ডোবার ঘাটে "তক্তি" বা তালপত্র ধুইতে যাইবার প্রবৃত্তি আমার কিছুমাত্র কমে নাই!

ডোবার ঘাটে তালপত্র ধুইতে যাইবার সঙ্গে "পা'খ, পায়রা, পাঁচালী"র কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা এস্থলে বলা কর্ত্তব্য। তালপাতাগুলি জলে কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে হইত। সেই অবসরে আমি নানা স্থানে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। কোন দিন ডোবার পাড় পার হইয়া খিড়কি দ্বার দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতাম এবং জননীর সহিত দুই চারি গ্রাস অন্ন খাইয়া চলিয়া আসিতাম। কোন দিন মেনী বিড়ালীর ছানাগুলিকে চোর-কুঠরী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতাম, অথবা পায়রার বাচ্চাগুলা উড়িবার চেষ্টা করিতেছে কি না, তাহা দেখিয়া

আসিতাম; কিম্বা কোন দিন হালদারদের মালতীর সহিত গোপনে পাকা কুল, পাকা তেঁতুল, লবণলঙ্কাযুক্ত পিষ্ট আম ও পিষ্ট আমড়া মনের সুখে খাইয়া আসিতাম, অথবা দত্তদের ভাবিনী ও ন'বৌয়ের সহিত একপাড়ি অষ্টাচৌকা খেলিয়া আসিতাম। যদি কোন দিন কোন দুষ্টাশয় বালক তাল পাতা ধুইতে আসিয়া আমাকে ডোবার ঘাটে না দেখিয়া গুরুমহাশয়কে "লাগাইয়া" দিত, আর গুরুমহাশয় তদনুসারে ভূমির উপর সশব্দে বেত্রাঘাত করিতে করিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিতেন, তখন আমি সেই দুষ্টাশয় বালকের মিথ্যাবাদিত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে অম্লানবদনে আমার ঔদরিক বিকারের কথা বলিয়া ফেলিতাম। গুরুমহাশয় আমার কথায় প্রায়ই অবিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং এই উত্তরের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য কোনও দিন কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন নাই। করিলে, নিশ্চিত আমাকে বিপদে পড়িতে হইত।

তালপত্র ব্যবহারের জন্য এবম্বিধ আরও অনেক সুযোগ সুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইত। তালপত্র ছিঁড়িয়া গেলে, নূতন পত্র সংগ্রহ করিতে হইত। আমরা যে অঞ্চলে বাস করিতাম, সেখানে বাজারে তালপত্র বিক্রীত হইত না। আমাদিগকে গাছ হইতে তালপত্র কাটাইয়া লইতে হইত। যেদিন তালপত্র কাটাইতে হইত, সেদিন প্রায় সমস্ত দিনই ছুটী! তাল"বেল্লো" কাটাইয়া, তাহা হইতে সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত পত্রগুলি বাছিয়া, ও তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং প্রত্যেকের গোড়া ও আগা উত্তমরূপে "মুছাইয়া" একটী বৃহৎ "পাততাড়ি" প্রস্তুত করিতে প্রায় সমস্ত দিনই যাইত। পাততাড়ির "বেতী" এবং মালতীকে দিবার জন্য তালপত্র নির্ম্মিত বালা, কঙ্কণ, অনন্ত, মল, হার ও অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতেও অনেক সময় অতিবাহিত হইত। অবশ্য, মালতীর জন্য এই সমস্ত "মরকত"ময় অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার কথা মালতী ও আমি ভিন্ন কেহ জানিত না।

তালপত্র ব্যবহারের এতই সুবিধা ছিল। "তক্তি" ব্যবহারেও কতক সুবিধা ঘটিত; কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া স্লেট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি এই সুবিধাটুকু আর ঘটিত না। গুরুমহাশয়ের পূর্ব্ব আদেশানুসারে আমরা সকলেই স্লেটের সঙ্গে দড়ি দিয়া এক খণ্ড সিক্ত ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া রাখিতাম। স্লেটে "আঁক" কসিতে থাক, আর সেই সিক্ত বস্ত্র দিয়া তাহা মুছিয়া ফেল! এই কবিত্বশূন্য ব্যাপারে কি কাহারও মেজাজ ঠিক্ থাকিতে পারে? আমার

তো মেজাজ গরম হইয়া উঠিত। কোথাও একটি পা নড়িবার যো ছিল না, আর মালতীর সহিত সেই পাকা কুল পাকা তেঁতুলের ভাগ পাড়িবারও অবসর থাকিত না। স্লেট থানার উপর এক দিন এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিলাম যে তাহা মাটিতে আছাড়িয়া ফেলিলাম। গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল ?" আমি বলিলাম, "হাত হইতে স্লেট থানা পড়িয়া গেল।" স্লেট থানা ভাঙ্গিল কিন্তু ভাল করিয়া ভাঙ্গিল না। সেই ভাঙ্গা স্লেটেই কাজ চলিতে লাগিল ! আর একদিন পেন্‌শিলটার উপর রাগ করিয়া তাহা কড়মড় শব্দে চিবাইয়া ফেলিলাম। চিবাইয়া দেখি, তাহা থাইতে বেশ। একটা নূতন আবিষ্কার হইল, ও সেই দিন হইতে আমার পেন্‌সিল ভক্ষণ প্রবৃত্তিও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। যে দিন অঙ্ক কসিতে মন লাগিত না, সেই দিন পেন্‌সিলটা উদরস্থ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু জনেক দুষ্টাশয় সহপাঠী আমাকে এক দিন পেন্‌সিল থাইতে দেখিয়া গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিল। গুরুমহাশয়ের কাছে ঘটনাটি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। একবার জিহ্বা পরীক্ষা করিলেই সত্য কথা ধরা পড়িত। বেগতিক দেখিয়া সে দিন বলিলাম, "আমার মুখে পেন্‌শিলটা ছিল বটে ; কিন্তু কখন তাহা চিবাইয়া ফেলিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই।" ডোবার ঘাটে যাইবার এইরূপে চারি দিকে পথ বন্ধ দেখিয়া এক দিন স্লেট থানাকে বাড়ী হইতে একটু তৈল মাথাইয়া লইয়া আসিলাম। অঙ্ক কসিবার সময় কোন মতেই আর স্লেটে লেখা গেল না। অগত্যা গুরুমহাশয় বলিলেন, "কয়লা দিয়া স্লেট থানা মাজিয়া লইয়া আয়।" সেই দিন আমার আনন্দ দেখে কে ? একবার মনের সাধে চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু এই সুবিধা প্রতিদিন ঘটিত না। গুরুমহাশয় বলিতেন, "একদিন স্লেট মাজিলে চার পাঁচ দিন আর মাজিতে হয় না।" যাহাই হউক, স্লেটের উপর আমি যে কেন চটা, তাহা আশা করি সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এথন সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ বলুন দেখি, পাঠশালা হইতে তালপত্র ও তক্তি উঠিয়া যাওয়াতে সুকুমার বালকবৃন্দের কষ্টের সীমা আছে কি না ?

সে কালে অতি প্রত্যূষে আমাদিগকে পাঠশালায় উপস্থিত হইতে হইত। গুরুমহাশয় বলিতেন, খুব প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠে রত হইলে উত্তমরূপে পাঠাভ্যাস হয়। আমরা প্রত্যূষে উঠিতাম বটে, কিন্তু পাঠে ক্বচিৎ রত হইতাম। সূর্য্যোদয় না হইলে গুরুমহাশয় শয্যাত্যাগ

করিতেন না। সুতরাং আমরা এই সময়ে শৌচসম্পাদনোদ্দেশে মাঠ ও ময়দানের দিকে যাইতাম। বাল্যকালে বীরোচিত কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিটা আমাদের মধ্যে বড়ই বলবতী ছিল। আমাদের মধ্যে যাহাকে দুর্ব্বল ও ভীরু দেখিতাম, তাহাকে আমরা মনে মনে ঘৃণা করিতাম। নিকটবর্ত্তী সহরে আমরা কখন কখন সিপাহীদের প্যারেড্ দেখিতে যাইতাম। দেখিয়া আমাদেরও সিপাহী হইবার ইচ্ছা হইত। সুতরাং বন্দুকাদির উপায়াভাবে আমরা এক একটি বাঁশের লাঠী ঘাড়ে করিয়া এক সঙ্গে পা ফেলিয়া সিপাহী হইবার সখ্ মিটাইতাম। কখন কখন চারি পাঁচ জনে সারি সারি দাঁড়াইয়া লাঠী ঘাড়ে করিয়া সমান ভাবে প্রায় এক মাইল দৌড়িয়া যাইতাম ও আসিতাম। আমাদের এই প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রত্যূষ ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে সুযোগ ও অবসর পাইতাম না। সুতরাং প্রত্যূষেই এই প্যারেড কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। প্রত্যূষে কেহ আমাদিগকে এই কার্য্য করিতে দেখিতেও পাইত না। এই কারণে আমাদিগকে কখনও কাহারও তিরস্কারভাজন হইতে হয় নাই।

আমাদিগকে প্রাতরুত্থান অভ্যাস করাইবার জন্য গুরুমহাশয় আমাদের "হাতছড়ি"র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থা এইরূপ :—যে বালক সর্ব্বাগ্রে পাঠশালায় আসিত, গুরুমহাশয় তাহার করতলে বেত্রাগ্রভাগ দ্বারা সামান্য আঘাত করিতেন মাত্র। ইহার নাম "শন্যি" অর্থাৎ "শূন্য"। যে "শন্যি" হইত, তাহার খুব সম্মান। সে ছুটীর সময় সর্ব্বাগ্রে বাড়ী যাইতে পারিত। তৎপরে যে বালক পাঠশালায় আসিত, অর্থাৎ দ্বিতীয় বালকের করতলে গুরুমহাশয় একবার মাত্র বেত্রাঘাত করিতেন। এইরূপে তিনি তৃতীয় বালকের করতলে দুইবার, চতুর্থ বালকের করতলে তিনবার ও সর্ব্বশেষ বালকের করতলে উপস্থিত বালকবর্গের সংখ্যানুসারে কখনও ত্রিশ এবং কখনওবা চল্লিশবারও বেত্রাঘাত করিতেন। সর্ব্বশেষ বালকেরই মরণ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গুরুমহাশয় প্রত্যহ "হাতছড়ি" করিতেন না। তাঁহার যেদিন অভিলাষ হইত, সেইদিনই "হাতছড়ি" হইত। কিন্তু "হাতছড়ি" হউক আর না হউক, আমাদিগকে প্রতিদিনই তাহা "থাইবার" জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত।

প্রাতঃকালে সচরাচর সাহিত্য, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির পঠন ও পাঠনা হইত। এই সময়ে বালকেরা প্রায় সকলেই মন লাগাইয়া স্ফূর্ত্তির

সহিত পাঠাদি প্রস্তুত করিত। পাঠশালার বালকবৃন্দের কলরবে পল্লীখানি প্রতিধ্বনিত হইত। বেলা ১০টার সময় "জলখাবারের ছুটী" হইত। বালকেরা এই সময়ে দন্তধাবনের জন্য দলে দলে নানাদিকে গমন করিত। কিন্তু এই অবসরে তাহারা একবার আপন আপন নবসঞ্চিত জড়তাও বিদূরিত করিয়া লইত। এই উদ্দেশ্যে কেহ কূর্দ্দন, কেহ লম্ফন, কেহ ইতস্ততঃ ধাবন এবং কেহবা ফল বা পক্ষিশাবক সংগ্রহের জন্য বৃক্ষাদিতেও আরোহণ করিত। কিন্তু ক্ষুধার সময় বলিয়া, এই সময়ের স্ফূর্ত্তিটা প্রায়ই অল্পক্ষণস্থায়ী হইত।

জলখাবার খাইয়া বালকেরা স্লেট, পেন্‌সিল তক্তি ও অঙ্কের পুস্তক লইয়া পাঠশালায় উপস্থিত হইত। যাহারা অঙ্কাদি কসিতে জানিত না, তাহারা বামকক্ষে পাততাড়ি লইয়া ও দক্ষিণ হস্তে মাটীর দোয়াত ঝুলাইয়া পাঠশালায় উপনীত হইত। তাহাদের কলমগুলি পাততাড়ির "বেতী"র মধ্যে গুঁজা থাকিত। বসিবার জন্য সকল বালককেই গৃহ হইতে আপন আপন আসন আনিতে হইত। ছোট ছোট বালকেরা আসনটি পাততাড়িতে জড়াইয়া আনিত। ইহাতে সেটি বহন করা তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইত। এইরূপে নিজ নিজ আসনে বসিয়া বালকেরা কেহ কেহ অঙ্ক কসিত এবং কেহ কেহবা তাল পাতে "আঙ্ক" "আঙ্ক" লিখিত। পাঠশালার মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী থাকিত। কোন শ্রেণীতে হয়ত একটীমাত্র বালক, কোন শ্রেণীতে দুইটী এবং কোন শ্রেণীতে বা ততোধিক। কিন্তু সকল বালকই এক সঙ্গে বসিত; সুতরাং বাহিরের লোকের পক্ষে শ্রেণী ঠিক্ করিয়া লওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার হইত। কিন্তু গুরুমহাশয় সকল শ্রেণী নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন।

গুরুমহাশয়ের পক্ষে একাকী এতগুলি বালকের ও শ্রেণীর তত্ত্বাবধারণ করা সহজ ব্যাপার হইত না। এই কারণে "সর্দ্দার পোড়ো" বালকেরা অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ সহায়তা করিত। এই বালকেরা প্রায়ই পাঠশালার প্রথমশ্রেণীভুক্ত ও গুরুমহাশয়ের একান্ত প্রিয়পাত্র। "সর্দ্দার পোড়ো" বালকেরা এক একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুরুমহাশয়। ইহাদের হস্তে নিম্নশ্রেণী সমূহের ভার থাকিত। ইহারা নিম্নশ্রেণীর বালকসমূহের পাঠ লইয়া আবার পাঠ বলিয়া দিত এবং কাহারও পাঠে অনবধানতা ও দুষ্টামী দেখিলে নিজেরাই তাহার দণ্ডবিধান করিত। ১টা বাজিলে বালকেরা

স্নান ও মধ্যাহ্নভোজনের জন্য একে একে গৃহে গমন করিত। কিন্তু সকলে এক সঙ্গে ছুটী পাইত না। গুরুমহাশয় সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। কাহার বাড়ীতে কখন ভাত হইত, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। সুতরাং কোন বালক তৎপূর্ব্বে বাড়ী যাইতে চাহিলে, নিশ্চিত গুরুমহাশয়ের তাড়না খাইত। এইরূপ তাড়না সত্ত্বেও একটা হইতে তিনটার মধ্যে পাঠশালায় অধিক বালক দেখা যাইত না। গুরুমহাশয়ও স্বয়ং এই সময়ে স্নানাহারে ব্যস্ত থাকিতেন; সুতরাং তখন দেখিবার ও বলিবার লোক কেহ পাঠশালায় থাকিত না। বালকদের পলায়ন করিবার ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ আর কখন ঘটিত?

গুরুমহাশয় যে সময়ে স্নান করিতে যাইতেন, কোন বালকই সে সময়ে পুষ্করিণীর ঘাটে যাইত না। বিশেষতঃ যাহাদের সন্তরণ-প্রবৃত্তি কিছু প্রবল, তাহারা তো তাঁহার স্নানের পূর্ব্বে স্নানের নামই করিত না। গুরুমহাশয়ের স্নানাদি হইয়া গেলে, সন্তরণপটু বালকেরা উৎফুল্লচিত্তে স্নানার্থ বহির্গত হইত। স্নানভোজনের পর বালকেরা অপরাহ্ন সময়ে পুনর্ব্বার পাঠশালায় একত্র হইত। এই সময়ে পাঠশালা আবার গুলজার হইত। বালকদের এই সময়ের প্রধান কার্য্য ছিল হস্তলিপি। উচ্চশ্রেণীর বালকেরা কাগজে লিখিত; নিম্নশ্রেণীর বালকেরা পূর্ব্ববৎ তালপত্রে লিখিত এবং সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর বালকেরা ভূমিতে "দাগা" বুলাইত। লেখা শেষ হইলে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে নামতা পড়িবার জন্য সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় কাতার দিয়া দাঁড়াইত। জনেক "সর্দ্দার পোড়ো" বালক সকলকে নামতা পড়াইত। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে নামতা পড়িত, কিন্তু অনেকেই গণ্ডায় "ণ্ডা" মিলাইত মাত্র। নামতা পড়ার পরই ছুটী।

"ছুটী"র সহিত অনেক বালক "গরম-গরম-রুটী" ভক্ষণজনিত আনন্দের তুলনা করিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে "গরম গরম রুটী" অপেক্ষাও "ছুটী" মিষ্টতর সামগ্রী ছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, ছুটী হইবামাত্র, বালকেরা যেরূপ চীৎকার ও আনন্দধ্বনি করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইত, "গরম গরম রুটী" বা লুচী ভক্ষণ করিবার কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিলে তাহারা কখনও তদ্রূপ আনন্দধ্বনি ও চীৎকার করিত না। কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিলে কারাবদ্ধ ব্যক্তির যেরূপ আনন্দ হওয়া সম্ভবপর, পাঠশালা-মুক্ত বালকদের যেন তদপেক্ষাও অধিকতর আনন্দ হইত। বয়োজ্যেষ্ঠ

বালকেরা সন্ধ্যার পরও গুরুমহাশয়ের নিকট অবস্থান করিয়া মৌখিক অঙ্কাদি শিক্ষা করিত। কিন্তু অপর বালকেরা সমস্ত দিন অবরোধের পর বাড়ীতে গিয়া ক্রীড়াদির ব্যবস্থা করিত। গোল্ডস্মিথও বলিয়াছেন, "The playful children just let loose from school." সকল দেশেই বালক—তথা মানব-প্রকৃতি সমান। বালকদের ক্রীড়াদির কথা পরে বলিব।

আসাম ভ্রমণ।

এবারে 'আসাম ভ্রমণ' লিখিবার পূর্ব্বেই একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া নিতান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। এই সমালোচক-প্লাবিত বঙ্গদেশে কালী কলম এক সঙ্গে করিয়া, সমালোচকের কঠিন দণ্ডাঘাত সহ্য করেন নাই, এমন সৌভাগ্যবান্ লেখক অতি কমই আছেন; ক্ষুদ্রপ্রাণ আমি সেই ভয়েই আপন সাফাই গাইয়া রাখিতেছি।

আমার একজন কলিকাতাবাসী বন্ধু অনেক দিন হইতে 'বাঙ্গাল দেশ' দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি আর বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে একটা দিন সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া সিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিলেন, আমরা ষ্টেশন অবধি যাইয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। পর দিন দেখি তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন; রাণাঘাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত তিনি গিয়াছিলেন। দশ পনর দিন পরেই বন্ধুপ্রবর ফুলস্কেপ কাগজের আট কি নয় তক্তা ভরিয়া খুব লম্বা চৌড়া করিয়া East Bengal নামে এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া হাজির। আমরা তখন কতই হাসিয়াছিলাম। আমার 'আসাম ভ্রমণ' বৃত্তান্তও তাহার অপেক্ষা কম রহস্যের ব্যাপার নহে। আমি সবে ধুবড়ী অবধি গিয়াছিলাম। আসামের প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিবার বলবতী বাসনা আমার মনে জাগ্রত ছিল; কামাখ্যায় যাইব, বাল্যকাল হইতে যে কামাখ্যার ইতিহাসের সঙ্গে কত বিভীষিকা শুনিয়া রাখিয়াছি; ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্রতম গৃহস্থের ঘরের বারান্দায় শয়ন করিয়া বর্ষিয়সীগণের মুখে 'ভেড়া বানাইবার' গল্প শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতাম, সেই স্থান দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ ছিল। মনে পড়ে, কিশোর বয়সে 'রণচণ্ডী' নামে একখানি গল্পবই পড়িয়াছিলাম। সেই সময়ে কুকীদিগের কথা, 'কালনাগ' পর্ব্বতের বর্ণনা,

অভ্রভেদী শালতরু, ধীরবাহিনী নির্ঝরিণীর কথা পড়িয়া আসামের সঙ্গে প্রাণের কেমন একটা সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই বয়সেই কল্পনা-চক্ষে দীর্ঘ-যষ্টি হস্তে প্রকাণ্ডকায় তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধগামী পার্ব্বতীয় পথ দেখিতাম, অসভ্য কুকীদিগের অব্যর্থ তীর চালনার দৃশ্য আমার দুর্ব্বল বাঙ্গালী-হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিত। তাহার পর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক দুরারোহ পর্ব্বতেও আরোহণ করিয়াছি, অনেক পবিত্রসলিলা নির্ঝরিণী তীরে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু আমার বাল্যকল্পনার লীলাস্থলী আসামে যাওয়া হয় নাই। তাই এবার বাহির হইয়াছিলাম। ধুবড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। জীবন সংগ্রামে আমি পরাজিত বন্দী; এখন আর সে বল নাই, সে উৎসাহ নাই; তাই ধুবড়ীতে বসিয়া, যে 'আসাম ভ্রমণ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, ধুবড়ীতেই তাহার পরিসমাপ্তি। আমার পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুবর বলিতেছেন, ধুবড়ীও ত আসামের মধ্যে। তা এখন আপনারা যিনি যা বলেন।

তিস্তা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া সেবার বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিস্তা নদীর অপর পারেই ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে একখানি গাড়ী কুচবিহারের দিকে যায়, অপর খানি কাউনিয়ার দিকে যায়; রেলের নাম 'কাউনিয়া ধরলা রেলওয়ে,' এখন রেলের মুটে মজুরেরাও সংক্ষেপ নাম 'কে, ডি রেলওয়ে' বলে। গাড়ী সবে আট ন খানি; প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী এক একখানি, ইহারা এদেশের উক্ত শ্রেণীর গাড়ীর কনিষ্ঠ স্থানীয়; মধ্য শ্রেণীর একখানি গাড়ী, তাহার অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে। তাহার পর তৃতীয় শ্রেণীর ট্রামগাড়ী; কলিকাতার ট্রাম গাড়ীতে রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণের জন্য পরদার ব্যবস্থা আছে; এ রেলওয়ে কোম্পানীর অধ্যক্ষমহোদয়েরা সে ব্যবস্থার ভার আরোহিগণের বিবেচনার উপরে ন্যস্ত রাখিয়া বিশেষ সদ্বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন, এবং এত অনুগ্রহের জন্য তাঁহারা প্রতিদিন শত শত আরোহিগণের সসম্মান ধন্যবাদও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! প্রতিদিন নূতন নূতন লোকের কুটুম্ব ও আত্মীয় স্থানীয় হইয়া রেল কর্তৃপক্ষগণ না জানি কতই আনন্দ অনুভব করেন; নতুবা এমন একটা বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্যের অন্য কোন পার্থিব কারণ আমি ত অনেক ভাবিয়াও পাই না।

একখানি মধ্য শ্রেণীর গাড়ী, আরোহী আমি একাকী, সঙ্গে কোন

জিনিসই নাই ; থাকিবার মধ্যে একখানি ইংরাজী বই ; সেই খানিকে উপাধান করিয়া গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিলাম। রেলের গাড়ীতে এমন ভাবে একাকী কখন চড়ি নাই! তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণ রৌদ্রে পুড়িতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পথের মধ্যে একটা ষ্টেশন হইতে একজন ভদ্র মুসলমান আমার গাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তিনি আমাকে রঙ্গপুর জেলার ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। তিনি যে, সে দেশের মধ্যে একজন গণ্য মান্য লোক, কুড়িগ্রাম মহকুমার সকলেই যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাও তিনি আমাকে অম্লানবদনে জানাইয়া দিলেন। লোকটীর অনেক সংবাদ জানা আছে দেখিলাম। জাতীয় মহাসমিতির কথা তুলিলেন। এই সমিতির জন্যই হিন্দু মুসলমানে এত দাঙ্গা হাঙ্গামা, গো-হত্যা নিবারণ একটা উপলক্ষ মাত্র, কংগ্রেস্ করিয়া বাবুরাই লাভবান হইবেন, মুসলমানদের কিছুই হইবে না। তাঁহার সমস্ত কথার সারসংগ্রহ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে আমরা (হিন্দুরা) ভিক্ষা করিয়া সাহেবদের উচ্ছিষ্ট সামান্য কিছু পাইব, আর তাঁহারা লেখা পড়া শিখুন আর নাই শিখুন, তাকিয়া বুকে ফরসীর নল মুখে দিয়া মধ্যে মধ্যে সামান্য একটা হুঙ্কারের জোরে বড় বড় চাকুরী সাহেবসমাজে সম্মান প্রতিষ্ঠা সকলই লাভ করিবে। এসব কথার প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে শুনিয়া গেলে বেশ আনন্দ বোধ হয়। মুসলমান কুলতিলকের সঙ্গে যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলাম, ততক্ষণ তাঁহার অবিশ্রান্ত বক্তৃতায় আমার মনে প্রচুর আনন্দোদয় হইয়াছিল। এদেশের লোকের মনে এখনও বিশ্বাস আছে, "লেখা পড়া না শিখিতে পারে, দারোগাগিরি করিবে।" সঙ্গী আরোহী কুড়িগ্রামে অবতরণ করিলেন, আমি আবার একাকী হইলাম।

গাড়ীর মধ্যে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল না। কুড়িগ্রাম ষ্টেশন ছাড়িয়া ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই ধরলা-নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম ; এখানে নদী পার হইতে হইবে। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া দেখি, তিন চারিখানি নৌকা রহিয়াছে ; তাহার এক খানির উপরে আবরণ আছে, আর সবগুলিই খোলা নৌকা। কেহ বলিয়া না দিলেও বুঝিলাম এই খোলা নৌকাগুলি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের জন্য, আর সেই আবরণ-যুক্ত নৌকা উচ্চ শ্রেণীর আরোহিগণের। এই বৈশাখের ভয়ানক রৌদ্রের মধ্যে

মাথা খোলা নৌকায় বসিয়া থাকা যে কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা আর বলিতে হইবে না। বেলা প্রায় ১০টা ; এসময়ে রৌদ্রের তেজ অতি প্রখর হয়। তাহার পর দেখিলাম কর্ণধার মহাশয়গণের হুকুমে আরোহিগণকে ছাতামুড়িয়া বসিতে হইল, নতুবা বাতাসে "নৌকা চলেন না, বাহে।"

অপর পারে এক জলশূন্য বালুকাময় প্রান্তরে নৌকা লাগিল, সকল যাত্রীই অবতরণ করিল। প্রবল বাতাসে বালুকারাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগকে একেবারে আকুল করিয়া ফেলিল। কোন দিন মরুভূমিতে যাই নাই, যাইবার আশাও নাই, কিন্তু এই ধরলা নদীর অপর পারে আজ মরুভূমির কষ্টটা ভোগ করিতে লাগিলাম। ক্ষুদ্র একটী রেলের রাস্তা সেই বালুকা প্রান্তরে পড়িয়া আছে ; পূর্ব্বজন্মের বহু পাপের ফলে লৌহবর্ত্ম এই উত্তপ্ত বালুকা শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। শুনিলাম, বর্ষার সময়ে ইহার শাপান্ত হইবে ; তখন ধরলা নদীর জল বাড়িতে থাকিবে, রাস্তাও পশ্চাতে হটিতে থাকিবে।

গাড়ী আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অধিকাংশ আরোহী স্নান করিতে নামিয়া পড়িলেন ; আমি সেই ছায়াশূন্য বালুকার মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের স্নান দেখিতে লাগিলাম। এমন সময়ে দূরে বংশীধ্বনি হইল। বাল্যকাল হইতে এতদিন পর্য্যন্ত পড়িয়া শুনিয়া আসিতেছি, বৃন্দাবনে শ্যামের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপমণ্ডলী একেবারে মোহিত হইয়া যাইত, তাঁহাদের প্রাণে আর আনন্দ ধরিত না। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করি নাই, সে সুখও অদৃষ্টে হয় নাই ; বংশীস্বরে আকুল হইয়া কুল মান ত্যাগ করিবারও সুবিধা হয় নাই। এই স্থানে সভয়ে কথাটা বলিয়া রাখায় দোষ নাই যে শ্যামের বংশীর দৌরাত্ম্য এখন আবার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বহু যুগ ধরিয়া সে বংশী বাজিতেছে, তাহাতেও কাহারও অরুচি জন্মে নাই। এখনও মাসান্তে কোন না কোন সাময়িক পত্রে শ্যামের বাঁশী বাজিবেই বাজিবে ; আর তাতে কুলত্যাগ ত সামান্য কথা, দেশত্যাগের আয়োজন করিতে হয়। সে কথা যাক। রেলের বাঁশীর শব্দে আমরা সত্যসত্যই কুল পাইলাম ; এই ভয়ানক মাঠের মধ্যে ছায়াহীন তৃণশূন্য প্রান্তরে একটা আশ্রয় পাইব মনে করিয়াও আরাম বোধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল ; মধ্যশ্রেণীর গাড়ী খুঁজিতে লাগিলাম, আমার দৃষ্টিপথে সে গাড়ী ত পড়িল না। গার্ডবাবু তখন স্নানান্তে একহস্ত প্রস্থে ও

জিনিসই নাই; থাকিবার মধ্যে একখানি ইংরাজী বই; সেই খানিকে উপাধান করিয়া গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিলাম। রেলের গাড়ীতে এমন ভাবে একাকী কখন চড়ি নাই! তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণ রৌদ্রে পুড়িতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পথের মধ্যে একটা ষ্টেশন হইতে একজন ভদ্র মুসলমান আমার গাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তিনি আমাকে রঙ্গপুর জেলার ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। তিনি যে, সে দেশের মধ্যে একজন গণ্য মান্য লোক, কুড়িগ্রাম মহকুমার সকলেই যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাও তিনি আমাকে অম্লানবদনে জানাইয়া দিলেন। লোকটার অনেক সংবাদ জানা আছে দেখিলাম। জাতীয় মহাসমিতির কথা তুলিলেন। এই সমিতির জন্যই হিন্দু মুসলমানে এত দাঙ্গা হাঙ্গামা, গো-হত্যা নিবারণ একটা উপলক্ষ মাত্র, কংগ্রেস্ করিয়া বাবুরাই লাভবান হইবেন, মুসলমানদের কিছুই হইবে না। তাঁহার সমস্ত কথার সারসংগ্রহ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে আমরা (হিন্দুরা) ভিক্ষা করিয়া সাহেবদের উচ্ছিষ্ট সামান্য কিছু পাইব, আর তাঁহারা লেখা পড়া শিখুন আর নাই শিখুন, তাকিয়া বুকে ফরসীর নল মুখে দিয়া মধ্যে মধ্যে সামান্য একটা হুঙ্কারের জোরে বড় বড় চাকুরী সাহেবসমাজে সম্মান প্রতিষ্ঠা সকলই লাভ করিবে। এসব কথার প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে শুনিয়া গেলে বেশ আনন্দ বোধ হয়। মুসলমান কুলতিলকের সঙ্গে যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলাম, ততক্ষণ তাঁহার অবিশ্রান্ত বক্তৃতায় আমার মনে প্রচুর আনন্দোদয় হইয়াছিল। এদেশের লোকের মনে এখনও বিশ্বাস আছে, "লেখা পড়া না শিখিতে পারে, দারোগাগিরি করিবে।" সঙ্গী আরোহী কুড়িগ্রামে অবতরণ করিলেন, আমি আবার একাকী হইলাম।

গাড়ীর মধ্যে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল না। কুড়িগ্রাম ষ্টেশন ছাড়িয়া ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই ধরলা-নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম; এখানে নদী পার হইতে হইবে। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া দেখি, তিন চারিখানি নৌকা রহিয়াছে; তাহার এক খানির উপরে আবরণ আছে, আর সবগুলিই খোলা নৌকা। কেহ বলিয়া না দিলেও বুঝিলাম এই খোলা নৌকাগুলি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের জন্য, আর সেই আবরণ-যুক্ত নৌকা উচ্চ শ্রেণীর আরোহিগণের। এই বৈশাখের ভয়ানক রৌদ্রের মধ্যে

সাধা খোলা নৌকায় বসিয়া থাকা যে কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা আর বলিতে হইবে না। বেলা প্রায় ১০টা; এসময়ে রৌদ্রের তেজ অতি প্রখর হয়। তাহার পর দেখিলাম কর্ণধার মহাশয়গণের হুকুমে আরোহিগণকে ছাতামুড়িয়া বসিতে হইল, নতুবা বাতাসে "নৌকা চলেন না, বাহে।"

অপর পারে এক জলশূন্য বালুকাময় প্রান্তরে নৌকা লাগিল, সকল যাত্রীই অবতরণ করিল। প্রবল বাতাসে বালুকারাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগকে একেবারে আকুল করিয়া ফেলিল। কোন দিন মরুভূমিতে যাই নাই, যাইবার আশাও নাই, কিন্তু এই ধরলা নদীর অপর পারে আজ মরুভূমির কষ্টটা ভোগ করিতে লাগিলাম। ক্ষুদ্র একটী রেলের রাস্তা সেই বালুকা প্রান্তরে পড়িয়া আছে; পূর্ব্বজন্মের বহু পাপের ফলে লৌহবর্ত্ম এই উত্তপ্ত বালুকা শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। শুনিলাম, বর্ষার সময়ে ইহার শাপান্ত হইবে; তখন ধরলা নদীর জল বাড়িতে থাকিবে, রাস্তাও পশ্চাতে হটিতে থাকিবে।

গাড়ী আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অধিকাংশ আরোহী স্নান করিতে নামিয়া পড়িলেন; আমি সেই ছায়াশূন্য বালুকার মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের স্নান দেখিতে লাগিলাম। এমন সময়ে দূরে বংশীধ্বনি হইল। বাল্যকাল হইতে এতদিন পর্য্যন্ত পড়িয়া শুনিয়া আসিতেছি, বৃন্দাবনে শ্যামের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপমণ্ডলী একেবারে মোহিত হইয়া যাইত, তাঁহাদের প্রাণে আর আনন্দ ধরিত না। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করি নাই, সে সুখও অদৃষ্টে হয় নাই; বংশীস্বরে আকুল হইয়া কুল মান ত্যাগ করিবারও সুবিধা হয় নাই। এই স্থানে সভয়ে কথাটা বলিয়া রাখায় দোষ নাই যে শ্যামের বংশীর দৌরাত্ম্য এখন আবার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বহু যুগ ধরিয়া সে বংশী বাজিতেছে, তাহাতেও কাহারও অরুচি জন্মে নাই। এখনও মাসান্তে কোন না কোন সাময়িক পত্রে শ্যামের বাঁশী বাজিবেই বাজিবে; আর তাতে কুলত্যাগ ত সামান্য কথা, দেশত্যাগের আয়োজন করিতে হয়। সে কথা যাক। রেলের বাঁশীর শব্দে আমরা সত্যসত্যই কুল পাইলাম; এই ভয়ানক মাঠের মধ্যে ছায়াহীন তৃণশূন্য প্রান্তরে একটা আশ্রয় পাইব মনে করিয়াও আরাম বোধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল; মধ্যশ্রেণীর গাড়ী খুঁজিতে লাগিলাম, আমার দৃষ্টিপথে সে গাড়ী ত পড়িল না। গার্ডবাবু তখন স্নানান্তে একহস্ত প্রস্থে ও

তাহারই দ্বিগুণ দীর্ঘ একখানি গামোছা পরিধান করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ভিজা কাপড় নিঙ্‌ড়াইতেছেন, এ সময়ে তাঁহার কাছে যাইতে আমার লজ্জা হইল, কিন্তু তাঁর তাতে লজ্জার কোন কারণই নাই। আমাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইয়া, আমি গাড়ীতে কেন উঠি নাই, জিজ্ঞাসা করিলেন। মধ্যশ্রেণীর গাড়ী খুঁজিয়া পাইতেছি না, এই কথা শুনিয়া তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, এ রেলে মধ্যশ্রেণীর গাড়ী নাই, আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেই যাইতে হইবে; পাছে আমি বলিয়া বসি, "এ মন্দ নয়, খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার," এই জন্য তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন যে, টিকিটের ভাড়া হিসাব করিবার সময়ে এ রাস্তাটুকু তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াই হিসাব করা হয়। আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম। মনে ভয় হইল, ইহার পরে না বলে যে দুই ক্রোশ রাস্তা পদব্রজে যাইতে হইবে ও একটা নদী সাঁতার কাটিয়া পার হইতে হইবে। অল্প কয়েকখানি গাড়ী, তাহাতে আরোহী বোঝাই; দাঁড়াইবারও স্থান নাই, আর সে দেশের দুই বেঞ্চের মধ্যে দাঁড়াইবার যো নাই। গার্ড-বাবু আসিয়া আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে বলিলেন। আরও দুই একটি লোক গাড়ীতে স্থান না পাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; গার্ডবাবুর সদয় আদেশ তাহাদের উপরেও হইল মনে করিয়া তাহারাও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে আসিল; কিন্তু যেই একজন গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, আর সেই গার্ডের প্রকাণ্ড হুহুঙ্কার, 'তোমাদের জন্য এ গাড়ী নহে' বলিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমিও গাড়ী হইতে নামিতে গেলাম। গার্ড মহাশয় 'আপনাকে নামিতে হইবে না' বলিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিল। আমি সোজাসুজী তাহাকে বলিলাম, 'আমি অনুগ্রহ প্রত্যাশী নহি, গাড়ীতে স্থান না থাকিলে পরবর্ত্তী উচ্চ শ্রেণীতে আরোহী তুলিয়া দিবার ক্ষমতা গার্ডের আছে জানিয়া আমি উঠিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, গাড়ীতে স্থান নাই বলিয়া নহে, আমাকে ইংরাজী কেতাব হাতে চসমা চোখে ভদ্রলোক দেখিয়া আমারই উপর আপনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেছেন, অপর যাহারা স্থান পাইতেছে না তাহারা এ অনুগ্রহে বঞ্চিত; আমি এ অনুগ্রহ চাহি না, আপনাকে ধন্যবাদ!" এই বলিয়া একটু রাগের ভরেই আমি একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আসিয়া বহু-কষ্টে প্রবেশ করিলাম, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ব্রহ্মপুত্রের

তীরে যাত্রাপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এই স্থানেই রেল কোম্পানীর শেষ। এখান হইতে ইণ্ডিয়ান জেনারেল ষ্টীম নেবিগেশন কোম্পানী (I. G. S. N. Co.) ও রীভার ষ্টীম নেবিগেসন কোম্পানীর (R. S. N. Co.) জয়েণ্ট ষ্টীমারে আসাম রওনা হইতে হইবে। ষ্টীমার নদীর মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। এই খানেই আজ বিদায়।

শ্রীজলধর সেন।

পৃথিবীর বয়স।

জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন না জননীর ভূমিষ্ঠ (?) হইবার সময় তাঁহার সন্তানসন্ততিবর্গের মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেই জন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল নির্দ্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতা প্রদর্শনে বড়ই লজ্জাবোধ হয়।

কেশের পক্কতার প্রাচুর্য্য ও চর্ম্মের লোলতার পরিমাণের সহিত ভগ্নাব-শিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইয়া অতি বড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রমটা অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রচলিত সাধারণ উপায় অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।

তবে এরূপ প্রাজ্ঞের অস্তিত্বও বিরল নহে, যাঁহারা কররেখা বা ললাটরেখা মাত্র দর্শনে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া জন্মকালীন রাশি-নক্ষত্র লগ্নাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বোধ হয় এইরূপই কোন বিচারের দ্বারা এককালে স্থির হইয়াছিল, বসুন্ধরার বয়ঃক্রম মোটামুটি ছয় হাজার বৎসর মাত্র। আমরা এই সকল কোষ্ঠী-উদ্ধারকের ক্ষমতার প্রশংসা করি;—কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত প্রণালীর মাহাত্ম্য আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আসে না। সুতরাং তাঁহাদের গণনার যাথার্থ্য-বিচারে আমাদের অধিকারও নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

অগত্যা প্রথমোক্ত আন্দাজ নামক বিচারপ্রণালী অবলম্বনে যাহা ধার্য্য হইয়াছে, তাহারই উল্লেখে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড মতভেদ দেখা যায়। মোটের উপর ইঁহারা দুইদলে বিভক্ত; একদল বলেন মাতাঠাকুরাণীর বয়সের গাছপাথর নাই। আর একদল বলেন, জননীর জন্মগ্রহণ, সে ত কা'লকার কথা। প্রথম দল চর্ম্মের লোলতা ও সন্ততিসংখ্যার প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এইত সেদিন জননীর জন্যে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সূতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা পাইতেছি।

আন্দাজ ব্যাপারকে যদি যুক্তি অভিধান দেওয়া যায়, উভয় সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত যুক্তি কতকটা এইরূপে দেখান যাইতে পারে।

ভূবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা প্রথম সম্প্রদায়ের অবলম্বন। আমাদের বর্ত্তুলাকারা জননীর দেহের অভ্যন্তরে অস্থিকঙ্কালের সমাবেশ কিরূপ আছে তাহা ঠিক্ জানি না; তবে ভিতরটা বড় গরম; এবং সময়ে সময়ে অন্তরিন্দ্রিয়টা চঞ্চল হইলে যেরূপ হৃৎস্পন্দন ও ক্রোধবহ্নির উদ্গীরণ ঘটে, তাহা ছেলেপিলের পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

যাই হউক, উপরের চর্ম্মখানা অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে অপোগণ্ড গুলি কোন রকমে কোলেপিঠে বসিয়া দিন কাটাইতেছে।

উপরের সেই চর্ম্মখানি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দেখা যায়,—কতকটা পেঁয়াজের খোসার মত। কিন্তু হায়, সেই স্তরগুলি অনুসন্ধান করিলে আমাদের কত ভাই ভগিনীর অস্থিকঙ্কালের অবশেষ সেই স্তরমধ্যে প্রোথিত ও নিহিত দেখিয়া আমাদের নিজের পরিণামের জন্য দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই স্তর মধ্যে যাহাদের অবশেষ দেখা যায়, তাহারাও এককালে আমাদেরই মত দর্পের সহিত পা ফেলিয়া বিচরণ করিত; কিন্তু আকার প্রকারে তাহাদের সহিত আমাদের কত তফাত! তাহারাও আমাদের মত জীবধর্ম্মী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কেমন জীব!

স্তরগুলি সর্ব্বত্র যথাবিন্যস্ত নাই, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাঁকিয়া জননীর পৃষ্ঠদেশের ভীষণ বন্ধুরতা সম্পাদন করিয়াছে সত্য; কিন্তু তথাপি মোটের উপর স্তরগুলির সমাবেশে একটা পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন জীবের অবশেষ স্তরে স্তরে নিহিত দেখি, তাহাদেরও আকারে প্রকারে গঠনে একটা কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক বিকাশ বা উন্নতি বা অভিব্যক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে অদ্যাপি

অসংখ্য স্রোতস্বতী ও জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরামে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া গুঁড়িয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে; ও প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে; এবং অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্র ধারা "গতপ্রাণী মৃতকায়া" সহস্রজীবের কাকশৃগাল পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যকালের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।

অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিসর প্রদেশে নীলনদ মুখে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, কতকোটি বৎসর ধরিয়া কতকোটি নদনদী ভূ-পৃষ্ঠের সেই বন্ধুরতাপনোদন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। অদ্যাপি যে প্রণালীতে অলক্ষিত ভাবে এই স্তরবিন্যাস ব্যাপার চলিয়াছে; অতি প্রাচীন কালেও যে সেই প্রণালীক্রমেই অলক্ষিত ভাবে স্তরবিন্যাস ব্যাপার ঘটিত, তাহাতে সংশয় করিবার সম্যক্ কারণ দেখা যায় না। সেই প্রণালীক্রমেই স্তরের উপর স্তর জমিয়া প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল কঠিন ত্বক্ খানি ধরণীর পৃষ্ঠোপরি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড় বড় স্রোতস্বতী বৎসরে কত মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়া, পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ কতকালে নির্ম্মিত হইয়াছে, কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটি মৃত আচার্য্য হক্স্‌লির নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, যখন বড় বড় ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে উদ্ভিদের অবশেষ জমিয়া গিয়া একটা বিস্তীর্ণ আস্তরণ স্বরূপ হইত। কালক্রমে ভূগর্ভের সংকোচনে সেই ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রাকারে পরিণত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য নদনদী মাটি আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উপর একটা মৃণ্ময় আস্তরণ বিন্যস্ত করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভ পূরণ হইয়া আবার স্থলে ও মহারণ্যে পরিণত হইত। আবার তাহার উপর উদ্ভিজ্জ আস্তরণ; আবার তদুপরি মৃৎস্তর। এইরূপে কতকাল ধরিয়া উদ্ভিজ্জ স্তরের উপর মৃণ্ময় স্তর, তদুপরি আবার উদ্ভিজ্জ স্তর, জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর ত্বক্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা সেই ত্বকের আবরণ স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া পাথর কয়লা তুলিয়া স্বকার্য্য সাধন করি। ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থূল এক একটা পাথর কয়লার স্তর দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে এইরূপ দুই শত আড়াই শত স্তর উপর্য্যুপরি থাকে থাকে সজ্জিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর ৫০ পুরুষ উদ্ভিদের

দেহাবশেষ জমিয়া এক ফুট স্তর জন্মে ; মনে কর এক এক পুরুষ উদ্ভিদের জীবনকাল গড়ে—দশ বৎসর। তাহা হইলে এক ফুট স্তর জমিতে পাঁচ শ বৎসর লাগে। পঞ্চাশ ফুট জমিতে পঁচিশ হাজার বৎসর লাগে ; এবং পঞ্চাশ ফুট স্থূল স্তর আড়াইশটা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইতে ষাটি লাখ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়।

মনে কর পাথর কয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসের এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। বুঝিয়া দেখ পৃথিবীর বয়স কত।

ভূতত্ত্ব-বিদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কালের আদি কল্পনা করিতে পারি না। অনাদি কালের নিকট কোটি কোটি বৎসর নিমেষের মত। তাই ভূ-তত্ত্ববিৎ নিরুদ্বেগে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক একটা স্তর নির্ম্মাণে দশবিশ কোটি বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না।

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রায় একই পথে চলেন। জীববিদ্যা বলেন, মানুষের নিকট জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণতি পাইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্য কোন প্রণালী সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, তাহাই নির্ণয় করা দুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষ বৎসরে মনুষ্যশরীরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্কটদেহের মনুষ্যত্বে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে মর্কটমহাশয়ের অভিব্যক্তি ব্যাপারে যে কত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে।

অতএব নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হইল, যে বিগত কোটি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ভূপঞ্জরে স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার আজিকার মতই চলিতেছে ; এবং বিগত কোটি কোটি কোটি বৎসরে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভিব্যক্তির ধারাক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ কি না, প্রাচীনা বসুন্ধরার বয়সের কূল কিনারা নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্ ও জীবতত্ত্ববিদ্ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন সময়ে বিখ্যাত সার্ উইলিয়ম টমসন্ (লর্ড কেলবিন) একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত করেন। তিনি বলিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে,—সে বড় বেশীদিনের কথা নয়,—পৃথিবীর অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তখন বসুন্ধরার জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল মাত্র।

এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থ-বিদ্যা সেই সূতিকাগৃহের প্রাচীরে নির্ম্মাণের তারিখ অঙ্কিত দেখিতেছে। আজ যে ভাবে নদনদী স্তরনির্ম্মাণ করিতেছে, তখন সে ভাবে স্তরনির্ম্মাণ চলিত, তাহা বলা যায় না। তখন যে পৃথিবী জীবাধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহের কারণ প্রধানতঃ তিনটি।

প্রথম, সম্প্রতি পৃথিবী একদিনে এক পাক আবর্ত্তিত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ঘুরিতেছে ; চন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রের জলরাশিকে আপনার দিকে আকৃষ্ট রাখিয়াছে। তাই পৃথিবীর আবর্ত্তনে বাধা পড়ে। আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। গত দুই হাজার বৎসরে আবর্ত্তনের বেগ একটু কমিয়া গিয়াছে, আবর্ত্তনের কাল একটু বাড়িয়া গিয়াছে, অহোরাত্রির পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই কারণে বহুদিন হইতে পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগ মন্দীভূত হইতেছে। সহস্র কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর বেগ বর্ত্তমান বেগের দ্বিগুণ ছিল, গণনায় কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। আজ কাল যে ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টায় রাত্রি দিন হয়, তখন সেই ঘণ্টার বার ঘণ্টায় রাত্রি দিন হইত। সুতরাং তখন পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত আজিকার অবস্থার কোন তুলনা হইতে পারে না। ভূতত্ত্ববিদেরা যে এক নিঃশ্বাসে লক্ষ কোটি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে তাহার কোন মূল নাই। একালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার দেখিয়া সেকালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপারের সহিত কোন তুলনা আনিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়, সূর্য্য পৃথিবীতে সম্প্রতি যে পরিমাণে তাপ দিতেছে, তাহার মোটামুটি পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই তাপের কিয়দংশ মাত্র লইয়া নদনদীর সৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি চলিতেছে। সূর্য্য কিছু চিরকাল এই পরিমাণে তাপ দিতেছে না। বোধ হয় পাঁচশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য তাপ একেবারেই দিত না। তখন সূর্য্যের তাপ বিকীরণ শক্তি ছিল না। সুতরাং তখন পৃথিবীতে মেঘবৃষ্টিও ছিল না, নদনদীও ছিল না ; জীবের অস্তিত্বের কথাই নাই।

তৃতীয়, পৃথিবী একটা তপ্তপিণ্ড মাত্র। কেবল উপরের চামড়াটা অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে মাত্র। বৎসর বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাপ পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া দিগন্তে বিস্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ কিনা, পৃথিবী

ক্রমেই শীতল হইতেছে। আজ পৃথিবীর অবস্থা কেমন, ও বৎসর বৎসর তাপ কত খরচ হইয়া যাইতেছে, জানিলে ভবিষ্যতে কোন্ দিন পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইবে, গণিয়া বলা যাইতে পারে। সেইরূপ অতীতকালে পৃথিবীর কখন্ কি অবস্থা ছিল, তাহাও গণিয়া বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে পৃথিবী আরও গরম ছিল, সন্দেহ নাই। লর্ড কেলবিনের গণনায় দশ কোটি কি জোর বিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এত গরম ছিল, যে তখন ভূপৃষ্ঠে শীতল কঠিন চর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। তখন ভূ-পৃষ্ঠ উষ্ণ ও তরলাবস্থ ছিল। সুতরাং তখন পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব হয় নাই। টেট্ সাহেবের গণনায় এই কাল দশ বিশ কোটি বৎসর পর্য্যন্ত হয় না। তিনি দুই এক কোটি বৎসরের ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহেন না।

দাঁড়ায় এই। পৃথিবীর বয়ঃক্রম বড় বেশী নহে। ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা বয়সের ইয়ত্তা করিতে চাহেন না, সেটা বিষম ভুল। কয়েক কোটি বৎসর মাত্র, হয় ত এক কোটি বৎসরও নহে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়াছে। পৃষ্ঠে স্তরবিন্যাস, জীবের উদ্ভব, জীবপর্য্যায়ে উন্নতি ও বিকাশ, হয় ত কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্রেই ঘটিয়াছে।

উভয় পক্ষের বিবাদের ফল এইরূপ দাঁড়াইল। ভূপৃষ্ঠের কাঠিন্য প্রাপ্তির পর হইতে যদি পৃথিবীর বয়ঃক্রম হিসাব করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি অথবা কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তৎপূর্ব্বে পৃথিবী এত গরম ছিল যে তখন জীবনিবাস ঘটিতে পারিত না। হয় ত সূর্য্য হইতে সম্যক্ পরিমাণ তাপও তখন আসিত না। হয় ত পৃথিবীর আবর্ত্তন বেগ এত ছিল, যে একালের দিবারাত্রি ঋতু পরিবর্ত্তনাদির সহিত সেকালের তত্তৎ ঘটনার কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। ভূবিদ্যা যে অম্লানভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের একখানি সূক্ষ্ম পরদা গাঁথিতে দশবিশ কোটি বৎসর চাহিয়া বসেন এবং জীববিদ্যা যে কেবল মর্কটকে মানুষ বানাইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর চাহেন, তাঁহাদের সেরূপ দাবী অগ্রাহ্য।

আচার্য্য হক্সলি ভূবিদ্যাবিৎ ও জীববিদ্যাবিদের তরফ হইতে জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কেলবিন্ ভূবিদ্যাকে কোটি দশেক বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রথমে রাজী ছিলেন। ভূপৃষ্ঠে প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল স্তর জমিয়াছে। তাহা হইলে গড়পরতা হাজার বৎসরে এক ফুট করিয়া জমিয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। ইহা

কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। এবং হক্সলির মতে ভূবিদ্যারও এই পরিমিত কালের অধিক দাবী করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই দশ কোটি বৎসর মধ্যেই লক্ষ ফুট স্তর জমিয়াছে ও এই বিচিত্র জীবজগতের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বিকাশ ঘটিয়াছে, ইহা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে।

আর একটা কথা; কেলবিনের বিচার প্রণালীতে কোন ভুলের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তৎপ্রদত্ত সংখ্যাগুলি তাঁহার নিজের কবুল মতেই আন্দাজে প্রদত্ত। ভূপৃষ্ঠে জলস্থলের সমাবেশের একটু ব্যবস্থাভেদ ঘটিলেই অথবা সমুদ্রের জল খানিকটা জমাট বাঁধিয়া বরফস্তূপ আকারে মেরুপ্রদেশ দিয়া সারিয়া গেলেই পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগের এক আধটু ব্যতিক্রম হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ সময়ে জলস্থলের বা জল বরফের সমাবেশ কিরূপ ছিল, না জানিলে আবর্ত্তন-বেগ সম্বন্ধে কোন একটা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা কঠিন। লর্ড কেলবিন্ এই সকল কথা স্বয়ংই তুলিয়াছেন। তার পর সূর্য্যের অবস্থা সম্বন্ধে এবং সূর্য্য কর্ত্তৃক বিকীর্ণ তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই কম। কেলবিন্ স্বয়ংই এই বিষয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত কয়েকবার পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং ঠিক এত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য তাপ বিকীরণ করিত না, নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাহসিক ব্যাপার। তার পর পৃথিবীর নিজের তাপের কথা। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অবস্থা বিষয়ে আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভূগর্ভে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের তাপ পরিচালন শক্তি কিরূপ, এবং উষ্ণতা সহকারে তাহাদের তাপ পরিচালন শক্তি বাড়ে কি কমে, এই সকল গণনায় না ধরিলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। সম্প্রতি লর্ড কেলবিনের জনৈক শিষ্যই গুরুপ্রদত্ত গণনার বিশুদ্ধিপক্ষে সন্দিহান হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে আমাদের আরও ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। আজ কেলবিন্ যেখানে দশ কোটি বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন, একটু অভিজ্ঞতা বাড়িলেই হয় ত সে স্থলে পঞ্চাশ কোটি দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে ভূবিদ্যাবিদের ও প্রাণিতত্ত্ববিদের লজ্জিত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ নাই।

আশা করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সহিত একটা সালিসী বন্দোবস্ত করিয়া

মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইব।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ইংলণ্ডে নিরামিষ ভোজন চলে কি না ?

বৎসরাধিক হইল, আমি ইংলণ্ডে বাস করিতেছি; এখানে নিরামিষ-ভোজন চলিতে পারে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রসর হইলে এখন আর বোধ করি, আমার অনধিকার-চর্চ্চা হইবে না। আমি অতি শৈশবাবস্থায় আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার ইংলণ্ডে আসিবার কথা শুনিয়া দেশের বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন, "এবার ত তোমাকে মাংস আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইবে, অতএব দেশ ছাড়িবার আগেই মৎস্য ও মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ কর।" তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, "ইংলণ্ডে নিরামিষ-ভোজন করিয়া লোকে থাকিতে পারে কি না, আমি ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিব; জীবনধারণের জন্য আবশ্যক হইলে আমিষ-ভোজনে আমার আপত্তি থাকিবে না।" আত্মীয়েরা ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি বুঝিতেছ না; মাংস-ভোজন ব্যতীত ইংলণ্ডে চলে কি না, ইহার পরীক্ষা করিতে গিয়া আপনার শরীর নষ্ট করিবে কেন? মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নিরামিষ-ভোজী ছিলেন বলিয়াই ইংলণ্ডে তাঁহার পীড়া হইয়াছিল; তবু ত তিনি সেখানে ছয় মাসের অধিক ছিলেন না। তোমাকে তিন বৎসর সেই শীতপ্রধান দেশে বাস করিতে হইবে; গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইবে; সুতরাং আহার-প্রণালীর পরিবর্ত্তন না করিলে তোমার সকল আশা ও আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে; অধিকন্তু জীবন থাকিবে কি না সন্দেহ।" তাঁহাদিগের ভয়প্রদর্শনেও আমি তখন বিচলিত হই নাই। অবশেষে আমার ইংলণ্ড আগমনের সময় উপস্থিত হইল। ১৮৯৪ অব্দের ১০ই মার্চ্চ দিবসে আমি বম্বে নগরে পোতারোহণ করিলাম। পি, এণ্ড, ও, কোম্পানির "কার্থেজ" নামক বাষ্পীয়পোত আমাদিগকে বক্ষে লইয়া অকূল মহাসাগরে ভাসমান হইল। পোতারোহণ করিবার পরেই ভাবিতেছিলাম, "জাহাজে আমার আহারের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? শুনিয়াছিলাম, পি, এণ্ড, ও কোম্পানি প্রথম শ্রেণীর যাত্রিবর্গকে আহারার্থ

যথেষ্ট ফলমূল দিয়া থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে মাংস প্রভৃতি সাধারণ আহার গ্রহণ করিয়াই জীবনধারণ করিতে হয়। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী; আমি কি আহার করিয়া বাঁচিব?" এমন সময়ে দেখিলাম, সেই জাহাজে আরও তিন জন স্বদেশীয় যাত্রী রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত আলাপ হইল; সেই তিন জনের মধ্যে দুই জন নিরামিষ-ভোজী। একজন গুজরাটী; তাঁহার নাম মুদি। অপর জন মহারাষ্ট্রীয়; তাঁহার নাম কুকৃড়ে। নিরামিষভোজী সহযাত্রী পাইয়া আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। মুদি বলিলেন, "সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" তিনি জাহাজের প্রধান পাচকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের তিন জনের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন; পাচককে ব্যঞ্জন-রন্ধনের প্রণালীও বলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারের পরেই আমি সামুদ্রিক পীড়ায় অভিভূত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম; আমার উপরি-উক্ত বন্ধুদ্বয় যে ঐ পীড়া হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। আহার-কালে আমাদের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শয্যাপার্শ্বে নীত হইল; আমরা কথঞ্চিৎ ভোজন করিলাম। ব্যঞ্জন পলাণ্ডু-মিশ্রিত ছিল বলিয়া আমি তাহা ভোজন করিতে পারি নাই; বন্ধুরা সুখে আহার করিয়াছিলেন। পাঁউরুটী, বিস্কুট জাহাজে যথেষ্ট পাওয়া যায়, সুতরাং ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য পোতাধ্যক্ষেরা যদি দুগ্ধের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অনেক কষ্টের লাঘব হইয়া যায়। পি, এণ্ড, ও, কোম্পানি দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে দুগ্ধসার-চূর্ণ দ্বারা পানীয় প্রস্তুত করিয়া দেন বটে, কিন্তু তাহা কখনই দুগ্ধের ন্যায় সুখাদ্য হইতে পারে না। আমরা যদি প্রথম শ্রেণীর যাত্রিবর্গের ন্যায় অকৃত্রিম দুগ্ধ পাইতাম, তাহা হইলে আমরা সুখে দুধভাত খাইয়া দিনযাপন করিতে পারিতাম। যাহা হউক আমরা যাহাতে প্রতিদিনই আমাদের গৃহমধ্যে আহার পাই, পরদিন তাহার বন্দোবস্ত করিলাম। ওট পরিজ্, অন্ন, পাঁউরুটী ও কৃত্রিম দুগ্ধ আহার-পানে আমাদিগের দিন কাটিতে লাগিল। সাধারণ আহারগৃহে বসিয়াও আমরা কয়েকদিন আহার করিয়াছিলাম। ইংরেজ যাত্রীরা আমাদিগের নিরামিষ-ভোজন দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন। আমরা ইংলণ্ডে যাইতেছি, অথচ নিরামিষ ভোজন পরিত্যাগ করি নাই, ইহাই তাঁহাদিগের বিস্ময়ের বিষয়। গুজরাটী বন্ধু মুদি

বম্বে হইতে অনেক ফল আনিয়াছিলেন, আমরা প্রতিদিনই কিছু কিছু সেই ফল খাইতাম। জাহাজ ইটালীর উপকূলে ব্রিণ্ডিসি নগরীতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইয়োরোপের মধ্যদিয়া স্থলপথে ইংলণ্ডাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময়ে আমাদিগকে তাঁহার কতকগুলি ফল দিয়া গেলেন। শুনিয়াছি, ইটালী ও ফ্রান্স প্রভৃতির মধ্য দিয়া আসিবার সময়ে নিরামিষভোজী বলিয়া তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তিনি বম্বে হইতে এক প্রকার মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন; তাহা খাইয়াও কোন কোন সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে আমরা ২রা এপ্রিল রাত্রিকালে ইংলণ্ডে পোঁছিলাম। তখন আমরা নিতান্ত ক্লান্ত। ভূমধ্যস্থ সাগরে ও বিস্কে উপসাগরে আমাদিগের জাহাজ ভয়ানক আলোড়িত হইয়াছিল; আমি ত কয়েক দিন শয্যা হইতে উঠিতেই পারি নাই। সকল খাদ্যেই আমাদিগের ভয়ানক অরুচি জন্মিয়াছিল। জাহাজ সে রাত্রিতে কূলে লাগিল না; টেম্‌স্ নদীর বক্ষে স্থিতি করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, যে সকল যাত্রী সেই রাত্রিতেই লণ্ডনে যাইতে চান, তাঁহাদিগকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য অপর একখানি জাহাজ আসিয়া উপস্থিত; আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমার পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম, বি, সি, এম, সেই জাহাজে করিয়া আসিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু কুকৃড়ে ও আমি উভয়ে চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লণ্ডনে উপস্থিত হইলাম। কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে সে রাত্রিতে লণ্ডনে আনিলেন, তাহা বলা যায় না। প্রথম মহানগর লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া কি দেখিলাম, কি ভাবিলাম, তাহা উল্লেখ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আহারের কথা বলাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া আমরা যথেষ্ট আহারাভাবে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। আমাদিগের বাস-বাটীর গৃহিণীকে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলাম; কিন্তু সকল দিন আমাদিগের ভাগ্যে সুপক্ব অন্নও জুটিত না। চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে নিরামিষ হোটেলে লইয়া গিয়াছিলেন; আমি পলাণ্ডুর দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারি না বলিয়া সেখানকার খাদ্যাদিও গ্রহণ করিতে পারি নাই। কুকৃড়ে ও আমি উভয়েই মৎস্য খাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। কুকৃড়ে কয়েক দিন পরে স্কটলণ্ডে এডিনবরা নগরীতে চলিয়া গেলেন। শুনিয়াছি, এডিনবরাতে ভারতবাসী ছাত্রদের কষ্ট

নাই। সেখানে অনেকগুলি ভারতবাসী ছাত্র একত্রে বাস করেন। এক জন নবাগত তথায় উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহার প্রতি অতিশয় যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অনেকে আমাদিগের দেশের ব্যঞ্জনাদি রাঁধিতে জানেন। কোন কোন বাসাবাটীর গৃহিণীকেও তাঁহারা ঐ সকলের রন্ধন-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশের পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন করেন। কোন নূতন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলে সুবোধচন্দ্র তাঁহাদিগের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন; আহারাদির যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহার উপায় বলিয়া দেন। আমার বন্ধু কুকৃড়ে এডিনবরায় চলিয়া গেলেন; আমি লণ্ডনে রহিলাম। প্রথম দুই এক মাস আমার আহারের কষ্ট কি ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সময়ে সময়ে মনে করিতাম, বোধ হয় ইংলণ্ডে নিরামিষ-ভোজন চলে না। আমার বন্ধু চট্টোপাধ্যায় আমাকে মৎস্য ও মাংস প্রভৃতি ভোজন করিবার জন্য প্রতিদিন অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সুবিজ্ঞ ডাক্তার লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত লণ্ডনে আসিলেন। তিনিও আমাকে বলিলেন, "মাংস প্রভৃতি আহার না করিলে চলিবে না; গ্রীষ্মকালে যদিও চলে, দারুণ শীতে কখনই চলিবে না।" আমারও শরীর আহারের কষ্টে দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। প্রথম তজ্জন্য ঔষধ খাইতে লাগিলাম। অবশেষে বাধ্য হইয়া কয়েক দিন মৎস্য, হাঁসের ডিম ও মেষমাংস খাইয়াছিলাম। ঐ সকল দ্রব্য মুখে তুলিতে যেরূপ ঘৃণা হইত, ও যেরূপে উদরসাৎ করিতাম, তাহা আর কি বলিব? কয়েকদিন পরে ভাবিলাম, ইংলণ্ডে নিরামিষ-ভোজন চলে কি না, তাহার ত আমি পরীক্ষা করিতে পারিলাম না। ঐ সময় মধ্যে আমি লণ্ডনের নানা স্থান ও নানা ব্যাপার দেখিয়াছিলাম, লণ্ডন সম্বন্ধে আমার কতকটা অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। আমি পলাণ্ডু খাইতে পারিলে আমাকে কয়েক দিনের জন্যও আমিষ-ভোজন করিতে হইত না। লণ্ডন নগরে নিরামিষ-ভোজীদিগের জন্য অনেকগুলি হোটেল আছে। তন্মধ্যে একটী হোটেলে ৬ পেনি দিলে উদর পুরিয়া খাইতে পাওয়া যায়। এরূপ সুলভ শুনিয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তথাকার কোন দ্রব্য মুখে করিতে পারি নাই। ব্যঞ্জনাদি তথায় পলাণ্ডু-সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছিল।

আমার না খাইতে পারার আর একটী কারণ আছে। দেশে আমি সুখাদ্য ব্যতীত কিছু খাইতে পারিতাম না; নিত্য নূতন ব্যঞ্জন না হইলে আমার তৃপ্তিকর হইত না। আমি অল্পাহারে সন্তুষ্ট হইতাম বটে, কিন্তু নূতন ও উৎকৃষ্ট না হইলে আমার রুচিকর হইত না। সেই জন্যই এ দেশের অনেক দ্রব্য আমি মুখে করিতে পারি নাই। লণ্ডনে চ্যারিংক্রস্ নামক স্থানে, টটন্‌হাম কোর্ট রোডে, ও অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে নিরামিষ-ভোজীদিগের জন্য উৎকৃষ্ট হোটেল আছে। অনেক ভদ্রলোক ব্যয় লাঘব করিবার জন্য ঐ সকল নিরামিষ-হোটেলে আহার করিয়া থাকেন। আমিও দিবসের মধ্যাহ্ন কালে টটন্‌হাম কোর্ট রোডে "আইডিয়াল ক্লব" নামক হোটেলে গিয়া "পুডিং," ও ফল প্রভৃতি আহার করিতাম। ঊষাকালে এক বাটী চা ও একটু পাঁউরুটী খাইতাম, বেলা ৯টার পর দুধ ভাত খাইতাম। অধিকাংশ দিনই সুপক্ব অন্ন পাইতাম না। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আলুসিদ্ধ, দুধভাত ও পাঁউরুটী চর্ব্বণ করিতাম। এই সকল দ্রব্য বাটীতেই পাইতাম। এইরূপে লণ্ডনে আমারও প্রায় পাঁচ মাস কাটিয়াছিল। যে ব্যক্তি পলাণ্ডুমিশ্রিত ব্যঞ্জন খাইতে পারেন, হোটেলে অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ হইবার সম্ভাবনা। কেন্‌সিংটন্ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে কতকগুলি বাসা আছে, সেই সকল বাসায় থাকিলে কষ্ট না হইবারই সম্ভাবনা। আমায় যে উপরিউক্ত প্রকার আহারে ও কষ্টে কাল কাটাইতে হইয়াছিল, ব্যবস্থার দোষ ও আমার অনভিজ্ঞতাই তাহার মূল কারণ। যে সকল আমিষ-ভোজী ভারতীয় ছাত্র লণ্ডনে আহার ও বাসাভাড়ার জন্য সপ্তাহে দেড় পাউণ্ড ব্যয় করেন, সেই ব্যয় করিয়া নিরামিষ-ভোজন করিলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। আমিষভোজী ছাত্রেরা সাধারণতঃ লণ্ডনে কিরূপ আহার প্রাপ্ত হন, অনেকের তাহা জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। তাঁহারা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পরে দু একটা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম, দু এক টুক্‌রা পাঁউরুটী ও দুই টুক্‌রা অর্দ্ধসিদ্ধ শূকর মাংস ভোজন করিয়া থাকেন, এক বাটী চাও তৎসঙ্গে খাইতে পান। ইহার নাম "ব্রেক-ফাষ্ট।" তৎপরে বেলা ১টার সময় লঞ্চন্ বা জলযোগ। তৎকালে দুই টুক্‌রা গোমাংস, এক টুক্‌রা পাঁউরুটী ও আপেল প্রভৃতি ফলের পুডিং খাইবার ব্যবস্থা। অপরাহ্নে তাঁহারা এক বাটী চা খাইয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আহার; তাহার নাম

ডিনার। সে সময়ে পুনরায় গোমাংস, শূকরমাংস, পাঁউরুটী ও কোন প্রকার পুডিং যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যাহারা মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহারা অন্ন ও রুটীকে প্রধান খাদ্য ও মাংসকে ব্যঞ্জন বলিয়া জানেন। এদেশে মাংসই প্রধান খাদ্য; অন্ন বা রুটী প্রভৃতি, মাংসের সহিত সময়ে সময়ে একটু একটু খাইবার জন্য। নিরামিষ-ভোজী মাংসের পরিবর্ত্তে অন্ন ও রুটীকে প্রধান আহার করিতে পারেন; প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, নানা প্রকার পুডিং ও ফল প্রতিদিন ভোজন করা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। আপেল, আঙ্গুর, কলা, আনারস, কমলা লেবু এখানে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত এদেশীয় পেয়ারা, কূল, ষ্ট্রবেরি, চেরি প্রভৃতি ফল আছে। আমি যেদিন লণ্ডনে আনারস ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, দাম শুনিয়া আমাকে অবাক্ হইতে হইয়াছিল। ছয় শিলিংএর কমে একটী আনারস পাওয়া যায় না। তখন ছয়শিলিংএর মূল্য ছয় টাকা। ছয় টাকা খরচ করিয়া একটী আনারস খাইতে প্রথম আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে এদেশে ফল অতি উপাদেয় ভোজ্য। যে সকল ভারতবাসী ছাত্র রন্ধন-প্রণালী জানেন, তাঁহারা বাটীর গৃহিণী বা পাচিকাকে অনায়াসে শিখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। সকল বাসার গৃহিণী প্রতিদিন আমাদের প্রণালীতে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে সম্মত হয় না। এদেশে লোকে কেবল সিদ্ধ আর অর্দ্ধসিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিতেই ভাল বাসে। ফ্রান্সের লোকেরা এদেশের লোকের রন্ধনানভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া উপহাস করিয়া থাকে। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তৎকালে হেমচন্দ্র নারায়ণ নামক এক গুজরাটী তথায় বাস করিতেন। তিনি একটু বাঙ্গলা জানেন; পাঁচ ছয় বৎসর এদেশে থাকিয়া ইংরাজীও সামান্য একটু শিখিয়াছিলেন। সহজ সহজ ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি অনেকগুলি গুজরাটী পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে দেখিয়া আমি তাঁহাকে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত গুজরাটী ভাষায় লিখিতে বলি। তদনুসারে তিনি ব্রিটিস্ মিউজিয়মের পুস্তকালয় হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রণীত "কেশবচরিত" গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই হেমচন্দ্র নারায়ণ নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি মধ্যাহ্নে নিরামিষ-হোটেলে গিয়া আহার করিতেন;

অন্যান্য সময়ে বাটীতে স্বয়ং রাঁধিয়া খাইতেন। আমাকে তিনি একদিন মোহনভোগ খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি ছাত্র ছিলেন না বলিয়া রন্ধনের সময় পাইতেন। শুনিয়াছি, তাঁহার লণ্ডনে থাকার ও আহারাদির খরচ প্রতিমাসে তিন পাউণ্ড পড়িত। তিন পাউণ্ড ব্যয়ে কোন ব্যক্তি লণ্ডনে থাকিতে পারেন, ইহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বোধ করি, তিনি বড় কষ্টে ছিলেন। আমাদিগের দেশে অনেক যুবক ইংলণ্ডে আসিবার জন্য বড় ব্যাকুল, তাঁহারা এ দেশকে ইন্দ্রপুরী বলিয়া বোধ করেন। তাঁহাদিগের কেহ যেন তিন পাউণ্ডে লণ্ডনে থাকা যায় মনে করিয়া বাটী হইতে এ দেশে পলাইয়া না আসেন। লণ্ডনে থাকিবার ব্যয় সাধারণতঃ সাপ্তাহিক দেড় পাউণ্ড; তদ্ব্যতীত পাঠাদির ব্যয় বিস্তর। সে সমস্ত কথা এ প্রবন্ধে বলিবার নহে। নিরামিষভোজন যে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-কর, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরামিষভোজীর শরীর-রক্ষার্থে ব্যয়-সংক্ষেপ না করিয়া উৎকৃষ্ট ভোজন করাই উচিত। আমার আহারের কষ্ট হইত বলিয়া ডাক্তার দত্ত স্বয়ং রাঁধিয়া যত্ন পূর্ব্বক আমাকে এক দিন খাওয়াইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের নিরামিষ ব্যঞ্জন টিনের কৌটার ভিতর সুরক্ষিতাবস্থায় এখানে পাওয়া যায়; একটী কৌটার মূল্য এক শিলিং। রন্ধনপাত্রে জল চড়াইয়া সেই জল উষ্ণ হইলে, তাহাতে উক্ত কৌটা নিক্ষেপ করিতে হয়। জল ফুটিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে কৌটার ভিতর ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া যায়। তদনন্তর কৌটার মুখ খুলিলে ভিতর হইতে সুন্দর ব্যঞ্জন বাহির হয়। ডাক্তার দত্ত আমাকে ঐ রূপ ব্যঞ্জন প্রথম খাওয়ান। তাহাতে সজ্‌না খাড়া ও বেগুন ছিল; সজ্‌না খাড়া বা বেগুন এদেশে নাই। রন্ধনপ্রণালী জানা থাকিলে, ও বাটীর গৃহিণীকে শিখাইয়া ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিলে ভারতবাসী এ দেশেও অনেক স্বদেশীয় ব্যঞ্জনাদি পাইতে পারেন। আলু, কপি, সিম, কড়াইসুঁটী, মুসুর ডাল এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং নিরামিষ-ভোজী ভারতবাসীকে যদি কখনও লণ্ডনে আহারের কষ্ট পাইতে হয়, অনভিজ্ঞতাই তাহার মুখ্য কারণ।

প্রায় পাঁচ মাস লণ্ডনে অতিবাহিত করিয়া আমি কেম্ব্রিজে আসিলাম। কেম্ব্রিজে আমাকে বহুদিন থাকিতে হইবে, সেখানে আহারের কষ্ট পাইতে হইবে কি না, ইহা আমার চিন্তার বিষয় ছিল। কেম্ব্রিজে আসিয়া দেখিলাম, এখানে ৫।৬ জন গুজরাটী ছাত্র আছেন, তাঁহারা নিরামিষ-ভোজী।

আমার জাহাজের বন্ধু মুদি কেম্ব্রিজে বহুপূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা কয়েকটী বাটীর গৃহিণীকে নিরামিষ ভারতীয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে শিখাইয়াছিলেন। আমি যে বাটীতে স্থান পাইলাম, সেই বাটীর গৃহিণী নিরামিষ ভারতীয় ব্যঞ্জন রন্ধনে বিখ্যাত। যদিও গৃহিণীর রন্ধন ভাল নহে, তথাপি এ দেশে ইহাই আমাদিগের নিকট অতি আদরণীয়। এখানে আসিবার পর আমার আহারের কষ্ট প্রচুর পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। আলু ও সিমের ছক্কা, কপির ডান্‌লা এখানে পাইতে লাগিলাম। আমি কিছুই রন্ধন জানি না; কিরূপে রাঁধিতে হয়, তাহা আমার আত্মীয়েরা দেশ হইতে পত্রে লিখিয়াছিলেন; আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বাটীর গৃহিণীকে দিয়াছিলাম; তদ্দ্বারা গৃহিণী অনেক বস্তু রাঁধিতে শিখিয়াছে। আমার বাসার গৃহিণী খিচুড়ি, মোহনভোগ, পায়স, লুচি ও কড়াইসুঁটীর ডান্‌লা করিতেও শিখিয়াছে। এখন আমি প্রাতে ওট্‌পরিজ্, টোষ্ট্, দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করি; মধ্যাহ্নে অন্ন বা খিচুড়ি, ভাজাভুজি ও সুস্বাদ ব্যঞ্জন, মোহনভোগ, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রাপ্ত হই। অপরাহ্নে চা, বিস্কুট ও কেক, এবং সন্ধ্যাকালে টোষ্ট্, দুগ্ধ ও পুডিং প্রভৃতি আহার করিয়া থাকি। নানাবিধ ফলও দুষ্প্রাপ্য নহে। মাংস খাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। মধ্যে আমার একটু অসুখ হওয়ায় হাঁসের ডিম খাইয়াছিলাম; তাহা যে না খাইলে চলিত না, আমার ত তাহা বোধ হয় না। দশ মাস আমার কেম্ব্রিজে কাটিল। নিরামিষ-ভোজনে ভারতবাসী ইংলণ্ডে থাকিতে পারেন, এ বিষয়ে আমার এখন আর কোন সন্দেহ নাই। আমাকে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন ও অন্যান্য কারণে বাধ্য হইয়া তবু কয়েক দিন হাঁসের ডিম খাইতে হইয়াছিল, কিন্তু কয়েকজন গুজরাটী ছাত্র এদেশে আসিয়া অবধি একদিনের জন্যও কোন প্রকার আমিষ-ভোজন করেন নাই। আমার জাহাজের বন্ধু মুদি এখন ডিম খাইয়া থাকেন; কিন্তু অপর চারজন গুজরাটী ছাত্র এখানে এখনও সম্পূর্ণরূপ নিরামিষ-ভোজী আছেন। লণ্ডনেও একজন নিরামিষ-ভোজী গুজরাটী ছাত্র আছেন। এখানকার গুজরাটী ছাত্রদিগের মধ্যে একজন ও লণ্ডনের একজন উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। এই দুইজন এখন বাতুলালয়ে বাস করিতেছেন। ইঁহাদিগের একজনের নাম ভীমভাই দেশাই ও অপরের নাম বেদান্ত। লোকে বলেন, নিরামিষ-ভোজন উহাঁদিগের বাতুলতার হেতু। ঐ কথা

বলিয়া এখানকার লোকে আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভীম-ভাই দেশাইকে দেশে পাঠাইবার উদ্যোগ করা হইয়াছিল, কিন্তু পোতাধ্যক্ষেরা উন্মাদকে লইয়া যাইতে চান না। কি ভয়ানক! এ ব্যক্তিকে কত কাল বিদেশে বাতুলালয়ে কাটাইতে হইবে, কে জানে? আর একজন গুজরাটী নিরামিষ-ভোজী ছাত্রের যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হইয়াছে; লোকে তাহার কারণও "নিরামিষ-ভোজন" বলিয়া থাকেন। নিরামিষ-ভোজন হইতেই যে বাতুলতা ও যক্ষ্মারোগ জন্মিয়াছে, এ কথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস্য নহে। এখন এদেশে নিরামিষ-ভোজী ইংরাজেরও অভাব নাই। কত নরনারী যে এখন নিরামিষ-ভোজী হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ প্রভৃতির শাখা নগরে নগরে স্থাপিত হইয়াছে, এদেশে নগরে নগরে তেমনই নিরামিষ-ভোজীদিগের সভা স্থাপিত হইয়াছে। লণ্ডন, বর্ম্মিংহাম, মাঞ্চেষ্টর, গ্লাসগো প্রভৃতি সকল স্থানেই নিরামিষ-ভোজীদিগের দল প্রবল হইতেছে। ঐ সকল সভা হইতে প্রচারকেরা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গমন পূর্ব্বক নিরামিষ-ভোজন প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রচার-প্রণালীও অতি চমৎকার। প্রচারক কোন নগরে উপস্থিত হইয়া নিরামিষ-ভোজনের উপকারিতা সম্বন্ধে পাঁচ ছয়টী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলের নিকটেই নিরামিষ খাদ্য প্রস্তুত হইতে থাকে। নিরামিষ খাদ্য কত উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা শ্রোতৃবর্গকে অবগত করিবার জন্য এক এক পাত্র নিরামিষ খাদ্য প্রত্যেক দর্শককে বক্তৃতান্তে অর্পণ করা হয়। এরূপ প্রণালীতে আমাদের দেশে সভা ও বক্তৃতা হইলে বোধ করি সভাস্থলে বহু দর্শকের সমাবেশ হইতে পারে। কিছু দিন হইল, কেম্ব্রিজে নিরামিষ-ভোজন-সভার উৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ভিন্ন স্থান হইতে প্রচারক আসিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাটীন-অধ্যাপক বৃদ্ধ মেয়র সাহেব একজন নিরামিষ-ভোজন প্রচারক। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি কুব্জ হইয়া পড়িয়াছেন। লোকের কেমন সংস্কার, কেহ কেহ তাঁহার কুব্জ হইবার কারণও নিরামিষ-ভোজন বলিতে কুণ্ঠিত হন না। কেম্ব্রিজে ডিক্সন্ নামে এক দরজী আছে; ঐ ব্যক্তি নিরামিষ-ভোজী। যাহার সহিতই কেন সে ব্যক্তির আলাপ হউক না, ঐ ভদ্রলোক নিরামিষ-ভোজী কি না, সে জিজ্ঞাসা করে। আমার সহিত যখন ডিক্সনের পরিচয় হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নিরামিষ-ভোজী কি

না?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি নিরামিষ-ভোজী।" সে কহিল, "দেখিবেন, যেন, এদেশের লোকের কথা শুনিয়া আপনি নিরামিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিবেন না। তাহারা বলিবে, নিরামিষ-ভোজন ভারতবর্ষের উপযোগী হইতে পারে, এদেশের উপযুক্ত নয়; সে কথা গ্রাহ্য করিবেন না।" আমি বলিলাম, "আমাদের কাছে ও সকল কথা বলা বাহুল্য মাত্র।" আমি নিরামিষ-ভোজী বলিয়া ঐ দরজী আমার ক্যাপ্ ও গাউনের মূল্য পঁচিশ শিলিংএর পরিবর্ত্তে বিংশ শিলিং লইয়াছিল। আমি একদিন ঐ দরজীর দোকানে গিয়াছি,—দেখি, ডিক্সন এক ব্যক্তিকে নিরামিষ-ভোজনের উপকারিতা বুঝাইতেছে. ও তাঁহাকে নিরামিষ-ভোজী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। এইরূপ প্রচারানুরাগ ইংরেজ জাতির প্রত্যেকের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট রহিয়াছে। কোথাও সুরাপানের বিরুদ্ধে, কোথাও রাজনীতি সম্বন্ধে, কোথাও বা অপর কোন বিষয়ে লোকে প্রচার করিতেছে। আমাদিগের দেশে বক্তৃতার মূল্য নাই, এখানে লোকের বক্তৃতা দ্বারাই আইন সকল প্রস্তুত হয়; পার্লামেণ্ট সভার পরিবর্ত্তন-সংগঠনও রাজনৈতিকবর্গের বক্তৃতার দ্বারাই হইয়া থাকে। এই কারণেই এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই নিরামিষ-ভোজীদিগের দল গঠিত হইয়াছে। এই কারণেই ব্ল্যাকপুল, বার্মিংহাম, বোর্ণ্‌মাউথ, ব্রাইটন্, ক্যাণ্টারবরি, কভেণ্ট্রি, ডর্সেট, ডেভন, ডবলিন, এপিং, ফেলিক্‌স্‌টো, ষ্টান্‌ব্রিজ্, ইয়ারমাউথ, হেষ্টিংস্, হেভর, কিলার্নি, হাম্পটন্, লণ্ডন, মেলভারণ্, মেথ্‌ওল্ড. নিউক্যাসল্, নরউইচ্, নর্‌ফোক্, নটিংহাম, স্কারবো, সাউথ্‌পোর্ট, সাউথ্‌সি, সণ্ডারলাণ্ড, টুইক্‌বরি, ভেণ্ট্‌নর, উইডন্, ওয়াইমাউথ, উইঞ্চেষ্টর, উড্‌ফোর্ড প্রভৃতি স্থানে নিরামিষ-ভোজীদিগের জন্য প্রকাশ্য বাসাহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রীস, ইটালি, ফ্রান্স ও সুইট্‌জর্লাণ্ডেও নিরামিষ-ভোজন প্রচারিত হইয়াছে। এদেশের নিরামিষ-ভোজীরা সকলেই ডিম খাইয়া থাকেন, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে সহজে নিরামিষ-ভোজী বলিয়া গণ্য করিতে চাই না। যখন এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মাংসভোজন স্বচক্ষে দর্শন করি, তখন ডিম্বভোজীদিগকে নিরামিষ-ভোজী বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা নিরামিষ-ভোজী হইয়াও যখন সুস্থ ও সবল রহিয়াছেন, তখন এদেশে নিরামিষ-ভোজন চলে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আর কঠিন নহে। নিরামিষ-ভোজনে এদেশে স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে না, ঈদৃশ ভয় বা সন্দেহ নিতান্ত অমূলক।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী এবং বাঙ্গালা মনঃসন্তোষণী।

কিছুদিন হইল, আমরা তুলটকাগজে লিখিত বহু প্রাচীন একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী। ইহার প্রতিলিপি একখানি, মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ দাস মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি; তিনি তাহা সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নামেই পাঠক তাহার বর্ণনীয় বিষয় কিছু বুঝিয়া থাকিবেন। গ্রন্থখানিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশাগমনকাহিনীই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে লিখিত হইয়াছিল—"১৪২৬ শকে উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চৈতন্য বঙ্গদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীহট্টে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাড়ী (শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী) সুতরাং পৈতৃক বাসস্থান দেখিতে কৌতূহল জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদিও এ যাত্রায় শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন না, তথাপি, বোধ হয় পৈতৃক বাসস্থান সন্দর্শনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।"

বঙ্গদর্শনের লেখক মহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশাগমনের উদ্দেশ্য স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থপাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, মহাপ্রভু শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত হস্তলিখিত পুথির শেষে লিখা ছিল—"শ্রীমৎ উপেন্দ্র মিশ্র বংশোদ্ভব প্রদ্যুম্ন মিশ্রেণ বিরচিতম্।" ইহাতে গ্রন্থকারের বংশপরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তবে গ্রন্থখানি কত কালের? গ্রন্থের সর্ব্বশেষ শ্লোকটী দ্বারা এসম্বন্ধে একটু সাহায্য পাওয়া যায়। সে শ্লোকটী এই:—

"তস্যৈবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্যো দয়ানিধেঃ।
প্রদ্যুম্নাখ্যেন মিশ্রেণ কৃতেয়মুদয়াবলী॥"

ইহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর সমকালে তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারেই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি পাইয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ জন্মে এবং শ্রীচৈতন্যের শ্রীহট্টাগমন সম্বন্ধে আরো কিছু পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করা হয়; তাহাতে, ঐ গ্রন্থেরই প্রমাণ স্বরূপ আর একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম—মনঃসন্তোষণী। প্রণেতা—শ্রীজগ-

জীবন মিশ্র। জগজীবন মিশ্রের বাস শ্রীহট্ট,—ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। সার্দ্ধ শত বর্ষের পূর্ব্বে যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

চরিতামৃতে লিখিত আছে:—

"শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান॥
সপ্ত পুত্র তার হয় সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥"

—আদি ১৩ পরি।

এখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র উপেন্দ্র মিশ্র বংশীয়। অতএব তিনিও শ্রীহট্টবাসী। কেন না উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্রদের মধ্যে কেবল মাত্র জগন্নাথই নবদ্বীপে বাড়ী করিয়াছিলেন। আবার, প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর সমসাময়িক হওয়ায়, তাঁহাকে উপেন্দ্র মিশ্রের পৌত্র অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

মনঃসন্তোষণী গ্রন্থ চৈতন্য উদয়াবলীর এক প্রকার অনুবাদ বিশেষ। ইহার রচয়িতা মঙ্গলাচরণের শেষে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"অল্পাক্ষরে চৈতন্য উদয়াবলী নাম।
এই গ্রন্থে কৈলা চৈতন্যের গুণ গান॥"
"প্রভুর জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রদ্যুম্ন মিশ্রবর।
তাহার পদদ্বন্দে মোর প্রণতি বিস্তর॥"

—মনঃসন্তোষণী।

মনঃসন্তোষণীর এই "জ্ঞাতি ভ্রাতা" শব্দ দ্বারা, প্রদ্যুম্ন মিশ্র যে উপেন্দ্র মিশ্রের পৌত্র, তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। জগন্নাথাত্মজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও উপেন্দ্র মিশ্রের পৌত্র, অতএব প্রদ্যুম্ন মহাপ্রভুর "জ্ঞাতিভ্রাতা।"

শ্রীহট্টে ঢাকাদক্ষিণ নামে একটী গ্রাম আছে, মিশ্রখ্যাতি কএক ঘর ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে আছেন; তাঁহারা আপনাদিগকে উপেন্দ্র মিশ্র বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। এখানে মহাপ্রভুর প্রাচীন এক বিগ্রহ (মূর্ত্তি) ও আছেন, মিশ্র ঠাকুরগণ তাহার সেবা করেন। (এই মূর্ত্তির কথাও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়।) ঢাকাদক্ষিণ গ্রামেই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী ছিল, (পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রভু মূর্ত্তি ঐ বাড়ীতেই আছেন।) ঢাকাদক্ষিণস্থ এই মিশ্র ঠাকুরদের নিকট হইতে আমরা যে বংশতালিকা প্রাপ্ত হই, তাহার কিয়দংশ এই।

মধুকর মিশ্র (শ্রীহট্টে প্রথম) *

কীর্ত্তিদমিশ্র রঙ্গদমিশ্র উপেন্দ্রমিশ্র কীর্ত্তিবাসমিশ্র

কংসারি পরমানন্দ জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর পদ্মনাভ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।

প্রদ্যুম্নমিশ্র (চৈঃ উঃ রচয়িতা) রামচন্দ্র

বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর (শ্রীচৈতন্যদেব)

গঙ্গাদাস বিষ্ণুদাস

গঙ্গাধর ? মথুরেশ কৃষ্ণবিদ্যানিবাস।

হরিনাথ বিদ্যাভূষণ

রূপেশ্বর পঞ্চানন।

শিবরাম সার্ব্বভৌমিক।

রামজীবন (অপর নাম, জনার্দ্দন)

জগজীবন (মনঃসন্তোষণী রচয়িতা।)

এই বংশ তালিকায় প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও জগজীবন মিশ্রের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক রামচন্দ্র মিশ্র হইতে গণনায় জগজীবন মিশ্র ৬ষ্ঠ পুরুষ। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে রামচন্দ্রের ২০০ বর্ষ পরে জগজীবনের জীবনকাল দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে ৪১০ চৈতন্যাব্দ চলিতেছে। ৪১০ হইতে ২০০ বিয়োগে ২০০ থাকে। অতএব ২০০ বর্ষ পূর্ব্বে জগজীবন জীবিত ছিলেন বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে যে তিনি মনঃসন্তোষণী রচনা করিয়াছিলেন, তার আর সংশয় নাই।

জগজীবন মিশ্রের রচনা স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর—সুখ-পাঠ্য, সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল। যথা—

"এই বাক্য পঞ্চামৃত,
পান করি মোর চিত,
শীতল হইল প্রাণ মোর।" ইত্যাদি।

নবীন জলদ মাঝে,
যেমন আশ্চর্য্য সাজে,
ইন্দ্র ধনু শ্রেণী বিনিন্দন॥" ইত্যাদি।

যথা—"—কেশ মধ্যে অপূর্ব্ব বন্ধন।

* বিশ্বকোষ-সম্পাদক বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় দিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছিলাম, তাহাতে মিশ্র বংশ তালিকার এই অংশটুকু লিখিয়াছিলাম। ১২২ সংখ্যক [illegible] তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সম্পূর্ণ বংশাবলী এস্থলে লিখিত হইল না। লেখক।

তাঁহার উপমা প্রয়োগেও স্থানে স্থানে নূতনত্ব আছে যথা—

"মণি মকর কুণ্ডল,
জ্যোতি দীপ্ত গণ্ডস্থল,
দর্পণে বিদ্যুৎসম ভায়।"
ইত্যাদি।

জগজীবন মিশ্রের রচনার আর একটী নমুনা দিতেছি। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রদর্শনে গিয়াছেন, শচী নিমাইকে আনিয়া দেখাইতেছেন, শিশুর অধরে যেন হাস্য প্রস্ফুটিত হইতেছে। যথা—

"কেছন রূপ, অনুপ বর কাঞ্চন
মুচুকি মুচুকি মুখ হাস।
দামেন দমক, চমক চিত চঞ্চল,
তাহি মে করত নিবাস॥
দশ নখ ছান্দ, চান্দ মদ ভঞ্জন,
নও নও দারিম কোর।
অধর নাল, নালবর শোভন,
নিরখি সবহি বিভোর॥
নয়ন বাণ, বাণ পরিশীক্ষণ,
সতত বাতাওত কামে।
ভুককোহু জ্যোতি, জীতি সউ কার্ম্মুক,
পৈঠল আথ উপরমে॥
শ্রওণ বরণ, অরুণাবলি নিন্দিত,
গণ্ড মুকুরবিছ ভানু।
সোবরণ সাপকি, পেখম গঞ্জিত,
করযুগ লম্ব আজানু॥
শিরপর কেশ, বেশ মন মোহন,
শিখি আনা কণ্টকি কাঁতি।
লোহিত থল, কমলাবলী রাজিত,
চরণ যুগলক হি ভাতি॥
উরু গুরু চারু, কদল তরু গঞ্জন,
রোমকি বিবরে অঙ্গে।
তাহি মে ঐছন, রোম সব শোহন,
চীকণ রেখ সুরঙ্গে॥
ঐ ছন মূরত, আখি ভর দেখত,
মত ওর হোই মাতারি।
তৈছে পতিকো, দেখাওল আনি,
কোকরি শচীবর নারী॥
সব নরনারী, নিরন্তর ভাসল,
রূপ দরশ অনুরাগে।
ঐছে অনূপ পহুঁ, হৃদি নাহি পৈঠল,
জগ জীওনে কি অভাগে॥"
(মনঃসন্তোষিণী)

চৈতন্যচরিতামৃতের পঞ্চম পরিচ্ছেদে অবগত হওয়া যায় যে, প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে রামানন্দ রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা জানিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দের আচার ব্যবহার প্রদ্যুম্নের ভাল লাগে নাই, তিনি ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে তাহা জানাইলেন।

রামানন্দ রায়ের উপর দোষারোপ ও মহাপ্রভুকে ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করা কম কথা নহে। এই দুইটী কারণে জানা যায় যে, প্রদ্যুম্ন মিশ্র সামান্য লোক ছিলেন না। রামানন্দ রায়কে স্বয়ং মহাপ্রভু অতি সমাদর করিতেন। রামানন্দ রায় রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি স্বরূপে কাঞ্চিনগরের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধির জন্য স্বয়ং প্রতাপরুদ্র রামানন্দকে সম্মান করিতেন। রামানন্দ প্রসিদ্ধ "জগন্নাথবল্লভ" নাটকের রচয়িতা। মহাপ্রভু যে পাঁচখানি গ্রন্থ অতি ভাল বাসিতেন, তন্মধ্যে জগন্নাথবল্লভ একখানি। যথা—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"
('চৈতন্যচরিতামৃত')

রামানন্দ রায় অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, নীলাচলবাসী সকলেই তাঁহাকে চিনিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহাকে চিনিতেন না, জানা যাইতেছে।

এই সকল কারণে বোধ হয় যে, উদয়াবলী-বচয়িতা এবং চৈতন্য চরিতামৃতের ৫ম পরিচ্ছেদোক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র এক ব্যক্তি। একই ব্যক্তি বলিয়াই সম্বন্ধের গৌরবে তিনি মহাপ্রভুকে কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন। নতুবা যে সে ভক্ত মহাপ্রভুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেন না। এবং এই জন্যই, অর্থাৎ অপরিচিত ও ভিন্নদেশী বলিয়াই বোধ হয়, বিখ্যাত রামানন্দ রায়ের সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না।

এই সময় শ্রীহট্টবাসী কেহ কেহ শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গ চৈতন্য-ভাগবতে আছে। এই সুযোগেই প্রদ্যুম্ন মিশ্রও নীলাচলে গিয়া থাকিবেন। যথা—

"সহস্র সহস্র লোক না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরাবাসী কেহ চাটীগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী॥"
(চৈতন্য ভাগবত)

মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া আসিলে সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলবাসী ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সহ মিলাইয়া দেন। তন্মধ্যে একজনের নাম প্রদ্যুম্ন মিশ্র ছিল। তিনি নীলাচলবাসী, এবং রামানন্দ রায়কে অবশ্যই জানিতেন। যে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে গমন করেন, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি, অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

অদ্য শ্রীহট্টবাসী এই দুইজন গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়া বিদায় লইতেছি। সময়ান্তরে তাঁহাদের গ্রন্থের সারমর্ম্ম উপহার দিতে অভিলাষ রহিল। ইতি।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় এবং পরদুঃখকাতর দাতাগণের সাহায্যে দাসাশ্রমের আরও একটী মাস নিরাপদে অতীত হইয়া গেল। নিম্নে আতুরগণের বিবরণ প্রদত্ত হইল ঃ—

১ দামো, ২ তিতুরাম, ২ বাবুরাম, ৪ টোকানি ঋষি, ৫ রসিকচাঁদ, ৬ খেদনা, ৭ দুর্গা-তারিণী, ৮ শিবু, ৯ দেবীয়া, ১০ স্বর্ণ, ১১ ফুলকুমারী, ১২ নবদুর্গা, ১৩ নেসবতী, ১৪ দুখীয়া।

রসিক চাঁদ। বাড়ী যশোহর জেলার বাগআঁচড়া গ্রামে, বয়স ৫০।৫১। ১৩।১৪ বৎসর বয়সের সময় পক্ষাঘাতে হাত পা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। এখন ঐ সমস্ত শুষ্ক স্থানে ক্ষত হইতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ "কোম্পানী বাহাদুরের মনুষ্য-তৈল বিক্রয়" নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

খেদনা। হাজারিবাগ জেলার চাতরা গ্রামে ইহার বাড়ী, বয়স ২৫ বৎসর। ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে ইহার চক্ষুতে ছানি পড়ায় অন্ধ হইয়াছে। একদিন মগধপুরে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় দেড় মাস চিকিৎসার পর এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে এখন শয্যাশায়ীই আছে।

নেসবতী ও দুখীয়া—কোন অপরিহার্য্য কারণে ইহাদের প্রেরক দিনাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয়ের নিকট ইহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আয়।

পূর্ব্ব মাসের জের ২৸৭॥, রোগীদিগকে আম কাঁঠাল খাওয়াইবার জন্য দান ৩৲, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু মাসিক চাঁদা ১৲, মণিঅর্ডার ১১৮৲, কলিকাতা দাসাশ্রম কার্য্যালয় হইতে নাঃ বাবুগোপালচন্দ্র নন্দী ৩৲, কর্জ্জ জমা ২৲। মোট জমা—১২৯৸৭॥।

ব্যয়।

সংসার খরচ ৪৬৵৭॥, বাড়ী ভাড়া ১৮৲, পূর্ব্ব মাসের হাওলাত শোধ ১৮৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৯॥৵০, রোগী পাঠান খরচ ৬॥৫, রোগী আনিবার জন্য (মুটে, গাড়ী, খোরাকী) ৸১৫, বাজে খরচ /৫। মোট খরচ—১২৯৵১২॥।

হস্তেস্থিত—॥/১৫।

দান।

বাবু শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ২৲, বাবু শ্যামাচরণ পাল ১৲ ও ৫টী ভাল আম।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বারি সিঞ্চন করুন।

(২৫শে জুন, হইতে ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত)

রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর ১ম মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ১৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জুন মাসের চাঁদা ১৲, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ঐ ঐ ১৲, N. K, Basu Esq. জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ মে মাসের চাঁদা ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র জুন মাসের চাঁদা ১৴, বাবু অনাথনাথ দেব ঐ ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ঐ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ ।০, নবাব সৈয়দ আব্‌দুল্‌ সোভান চৌধুরী ঐ ১৲, জনৈক মহিলা ঐ ১৴, বাবু তেজচন্দ্র বসু ঐ ॥০।

দান।

বাবু রামগোপাল বিশ্বাস পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১৲, জনৈক মহিলা মাঃ কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু ৫৲, বাবু বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাবর্গ ২৫৲, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী ।৵০, বাবু মন্মথকুমার বসু ।০, A friend of 25, Sutharpara ।০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার ৸০, বাবু চন্দ্রমোহন সাহা ॥০, খানখানাপুর ছাত্রসমাজ ১৲, ১১নং মুসলমানপাড়ার ছাত্রনিবাস ৵০, বাবু অবিনাশচন্দ্র রায় ১৴, ১১নং রাধানাথ মল্লিকের লেন ।০, বাবু রাসবিহারী কর্ম্মকারের সংগৃহীত /০, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, বাবু হেমচন্দ্র সেন ।০, বাবু রজনীমোহন কর ৵০, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিকের সংগৃহীত ৵১০, বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ ॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধর ॥০, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৫৲, বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী ।০, বাবু যুগলকিশোর ত্রিপাঠী ।০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু ৵০, A friend of Eden Hostel ।০, বাবু চন্দ্রশেখর রায় ৵০, বাবু শরচ্চন্দ্র সিংহ ৵০, A sympathiser, Eden Hostal ৵০, A poor friend do. ৵০, বাবু রমেশচন্দ্র হট্টি /০, কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ২৲, বাবু রামগোপাল রায় ১৲, জনৈক প্রচারক ৵০, বাবু কিরণচন্দ্র সিংহ ৵০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখো ৵০, বাবু বৈদ্যনাথ বন্দ্যো ৵০, বাবু শশীভূষণ বসু সুব্রতার জন্মদিনে ১৲, বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ।০, বাবু লালমোহন দাস M.A. B.L., ৫৲, বাবু সতীশচন্দ্র মুখার্জি ।০, বাবু শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ২৲, বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন ১৲, বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ১৲, বাবু শশীভূষণ ঘোষ ॥০, বাবু চন্দ্রকালী ঘোষ ২৲, বাবু সারদাপ্রসন্ন রায় ১৲, Hon. Sir R. C. Mitter ৫৲, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ॥০, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ১৲, বাবু অবনীমোহন চট্টো ৴১০, শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা দেবী ৴১০, বাবু পঞ্চানন দত্ত ৵০, বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু ১৲, Hon. A. M. Bose ৩৲, বাবু হীরণমোহন দাস গুপ্ত ।০, ১৭।৩, ঝামাপুকুরের ছাত্রগণ ॥০, বাবু প্রবোধচন্দ্র বড়দলৈ ৵০, ৪০, পঞ্চাননতলার ছাত্রগণ ।০, ১৯/৫, ছকুখানসামার লেন ।০, বাবু নীলরতন রায় ॥০, বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যো ১৴, বাবু রোহিণীমোহন দান ১৲, ১০৬/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ।৵০, একজন ভদ্রলোক ৴১০, সৈয়দ সাম্‌সুল্‌ হুদা ৫৲, বাবু হারাণচন্দ্র দত্ত ১৴, Messrs G. C. Dey & Co. ১৲, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখো ১৴, বাবু রমণীকান্ত দাস ৵০, বাবু যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ৵০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন ৵০, বাবু সতীশচন্দ্র রায় ৵০, A poor friend ৴১০, শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ৫৲, বাবু কিশোরীমোহন দাস ৵০, বাবু মোহিনীমোহন

ঘোষ ৵০, বাবু সানুকুলচন্দ্র রায় ৵০, বাবু কুমুদবান্ধব চট্টো ৵০, বাবু বিধুভূষণ দাস ৵০, বাবু অতুলচন্দ্র বসু ৵০, বাবু মঙ্গল সিংহ ৵০, বাবু বিপিনচন্দ্র বাগ্‌ছী ৵০, বাবু কেদারনাথ রায় ১৲, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ।০, বাবু দীননাথ গোপ ১৲, বাবু রামপ্রসাদ রায় ১৲, বাবু মহিমচন্দ্র সরকার ।০, বাবু শুকচাঁদ গোপ ১৲, বাবু মথুরানাথ গোপ ॥০, বাবু প্রাণনাথ প্রামাণিক ।০, বাবু নবীনচন্দ্র গোপ ১৲, মুন্সী মিয়াজান বিশ্বাস ।০, ডাঃ প্রসন্নকুমার সরকার ॥০, বাবু রামচরণ বিশ্বাস ১৲, বাবু জয়ধর প্রামাণিক ।০, বাবু অদ্বৈত প্রামাণিক ॥০, বাবু ব্রজলাল আগরওয়ালা ।০, একজন বন্ধু ৴৫, বাবু শশীভূষণ চন্দ ॥০, বাবু বিশ্বেশ্বর সেন ৵০, বাবু বিধুভূষণ দত্ত ৵০, বাবু প্রমথনাথ পাল ৵০, বাবু হরিনাথ মজুমদার ।০, বাবু পূর্ণানন্দ সাহা ॥০, কতিপয় ছাত্র ।৫, বাবু সতীশচন্দ্র আচার্য্য /০, বাবু রমণীমোহন সাহা ৵০, শ্রীমতী বিনোদিনী কুণ্ডু /০, শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী সাহা /১০, শ্রীমতী সরোজিনী সাহা ৵০, বাবু মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু /১০, বাবু গোপেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু ৵০, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী পুত্রের রোগারোগ্য উপলক্ষে ১৴, বাবু রাধারমণ সাহা ১৲, একজন ভদ্রলোক ৵০, বাবু দীননাথ কুণ্ডু ১৴, বাবু রজনীকান্ত বৈরাগী ৵০, বাবু মহিমচন্দ্র মৈত্র ।০, বাবু বসন্তকুমার সাহা ৵০, বাবু কান্তিচন্দ্র দত্ত /০, বাবু সুরেশচন্দ্র সান্নাল ৴১০, বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু /০, শ্রীমতী দামিনীসুন্দরী প্রামাণিক ৵০, কুমারখালী স্কুলের ছাত্রগণ ॥৵১৫, বাবু অনুকুলচন্দ্র রায় ১৲, নীতি-বিদ্যালয় ১৲, বাবু শশীভূষণ ঘোষ বি.এ. ১৲, বাবু ভবানীচরণ নন্দী ।০, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৫৲, বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ মুখো ॥০, বাবু অমৃতলাল কুণ্ডু ১৴, বাবু প্রবোধচন্দ্র দত্ত B.L. ।০, বাবু শিবচন্দ্র বসু ॥০, শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২৲; বাবু রমাপ্রসাদ মল্লিক ৫৲, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা গুপ্তা ১৲, বাবু যদুনাথ সাহা /০, আমলাপাড়া মেস্‌ /০, B. C. Sen Esq. ৫৲, J. Fairlie Esq. ৫৲ বাবু দক্ষিণারঞ্জন আচার্য্য ১৲, বাবু ক্ষুদীরাম মিত্র ।০, বাবু গতিনাথ সান্ন্যাল ।০, বাবু বনমালী কর্ম্মকার ৵০, বাবু সীতানাথ সরকার ৵০, বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় ॥০, বাবু বিহারীলাল দাস ।০, সৈয়দ আলি উল্লা ॥০, বাবু দুর্গাচরণ বিশ্বাস ১৲, একজন গরিব ৴১০, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১০৲, বাবু নরেন্দ্রমোহন রায় ।০ বাবু কৃষ্ণকিশোর বসাক ৫৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুরাতন গদী বিক্রয় ৪৲, চাউল বিক্রয় ৫॥৵০, পুস্তক বিক্রয় ৵০, বস্ত্র বিক্রয় ১৲।

মুষ্টি ভিক্ষা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

বস্ত্রাদি।—১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটী ছাত্র ধুতি ১, শ্রীমতী মুক্তকেশী দত্ত মৃতকন্যার পরিত্যক্ত—সাড়ী ৫, ঝুটা জরির সাড়ী ১, বেনারসী সাড়ী ১, আলোয়ান ১, গরম পেটি কোট ১, তোয়ালে ১, গরম জ্যাকেট ৫, সাদা জ্যাকেট ৩, সেমিজ ১, ইজের ৩, ডুরে সাড়ী ১, মোজা ৫ জোড়া, গরম রুমাল ১, টুপি ১, পেটী কোট ৪, গরম পেটি কোট ১, বালিসের ওয়াড় ১, কোঁচান সাড়ী ১ ; কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসুর জনৈক আত্মীয়া পর্দ্দা ১, নূতন ধুতি ৮, পেটি কোট ১, জ্যাকেট ১ ; শ্রীমতী অমূল্যকুমারী বসু পুরাতন সাড়ী ৬।

মোট আয়।

দানপ্রাপ্তি ১৫৫॥/১৫, মাসিক চাঁদা ১২৸০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১০৸০, বিগত মাসের জের ১৮৲১৫, মোট আয় ১৯৭৵১০।

ব্যয়।

গিরিডি সেবালয় ১১২॥০, আদায়কারীর ব্যয় ২২॥৵০, "দাসী"কে ধার ৮॥৶১০, রোগীর পাথেয় ১০/১০, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের ঋণ শোধ ১০৴, খাতা ক্রয় /১০, হাঁড়ি ৴৫, ডাক খরচ ১৵৫, মুটে ৴১০, হিসাব গরামল ॥০। মোট ব্যয় ১৬৫॥৶১০।

মোট আয় ব্যয়।

আয়—১৯৭৵১০, ব্যয়—১৬৫॥৶১০, হস্তেস্থিত—৩১।৶০।

দাসাশ্রম মেডিকেল হল।

৮৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ের সমস্ত আয় দাসাশ্রমকে দেওয়া হয়।

এখানে উচিত মূল্যে উৎকৃষ্ট ঔষধ পাইবেন।

আমরা অনেক বিচক্ষণ ডাক্তার মহোদয়গণের

প্রেস্ক্রিপ্শ্যন পাইয়া থাকি।

প্রেস্ক্রিপ্শ্যনের লিখিত ঔষধ সকল উপযুক্ত

লোকের দ্বারা বিশেষ সতর্কতার

সহিত প্রস্তুত করিয়া

দেওয়া হয়।

এখান হইতে ঔষধ লইলে ভাল ঔষধ পাইবেন, অধিকন্তু

গরিব দুঃখীরও সাহায্য করা হইবে।

ছাত্রগণকে সুবিধাদরে ঔষধ দেওয়া হয়।

দাসী

তুকারাম।

দশম প্রস্তাব।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রজাতির কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছিল, পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। সূর্য্যের প্রথম রশ্মি পৃথিবীতে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে, আলোকমণ্ডিত আকাশ যেমন তাঁহার উদয় সূচনা করে, সেইরূপ কোন দেশপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে দুই একজন পূর্ব্বগামী সাধুপুরুষ তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়া রাখেন। এই সকল সাধুপুরুষদিগের দ্বারা উত্তরকালীন মহাপুরুষদিগের পথ পরিষ্কৃত হয়। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে সেণ্টজনের আবির্ভাব ইহার সর্ব্বজন-পরিচিত উদাহরণ। আমাদিগের বঙ্গদেশেও শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব-ভক্তগণ তাঁহার আগমনসূচক ভেরী নিনাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যাংশে সুপ্রসিদ্ধ একনাথ স্বামী* মহারাষ্ট্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিরোভাবের সমকালেই রামদাস স্বামী আবির্ভূত হন এবং তাঁহার পরেই তুকারামের অভ্যুদয়। বঙ্গদেশে যেমন শ্রীচৈতন্যের সমকালে নিত্যানন্দ, সনাতন, হরিদাস প্রভৃতি অনেক সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশেও তেমনই জয়রাম স্বামী, রঙ্গনাথ স্বামী, কেশব স্বামী, বোধ্‌লে বাবা প্রভৃতি ভক্তসাধুগণ তুকারামের সমকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের ন্যায় ইঁহারাও ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ডের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া, ধর্ম্মের সরসভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যপ্রণোদিত ধর্ম্মের ন্যায় ইঁহাদিগেরও প্রচারিত ধর্ম্ম কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভক্তিগুণে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তির অধিকারী, এই মহাসত্য ইঁহারাও প্রচার করিয়াছিলেন। তুকারাম যে শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত

* ইহাঁর পরিচয় এবং ইহাঁর সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যান ৪র্থ প্রস্তাবে (দাসীর ৪র্থ ভাগ ২য় সংখ্যায়) প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ইহাঁদিগেরই ব্যবহারের ও উপদেশের ফল। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার-বিরোধী, এই অধুনা প্রচলিত বিশ্বাস সত্য নয়। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের মধ্যেও এমন কোন কোন উদারচেতা ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কারক-দিগের কার্য্য তাঁহাদিগের কার্য্যের অপেক্ষা অধিকতর উদারতার পরিচায়ক কি না সন্দেহ। জাতিভেদ ভারতের জাতিসাধারণের সম্মিলনের প্রধান অন্তরায় বলিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট চিরদিন নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আহারে ও সামাজিক ব্যবহারে জাতিভেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেও ভারতবাসিগণ জাতি বিচার করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের সম্মাননায় কুণ্ঠিত নহেন। ধার্ম্মিকব্যক্তি যে জাতিতেই উৎপন্ন হউন, তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাপাত্র ও ব্রাহ্মণোচিত সম্মানে সম্মানিত। ব্রাহ্মণত্বপ্রধান ভারতের অনেকগুলি প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকও ব্রাহ্মণেতর জাতিতেই উৎপন্ন। বুদ্ধ ক্ষত্রিয়, নানক (কেহ কহ বলেন ক্ষত্রিয়) তুকারাম শূদ্র, কবীর জোলা, তিরু-বল্লিয়ার পারিয়া বা চণ্ডাল।* ইহাঁদিগের সমকালীন ব্যক্তিগণ ইহাঁদিগকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিতেন এবং এখনও ইহাঁরা দেবোচিত আদর প্রাপ্ত হইতে-ছেন। তুকারাম শূদ্র হইয়াও কি জন্য তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। আরও একটী কারণ আছে। তুকারামের সমকালবর্ত্তী হিন্দু-সাধুগণের ন্যায় কয়েকজন মুসলমান সাধুরও নাম আমরা মহীপতির গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাই। মুসলমান হইয়াও, ইহাঁরা হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হিন্দুসাধুগণের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেখ মহম্মদ নামক কোন মুসলমান সাধুকে তুকারাম ও রামদাস স্বামী প্রভৃতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন। আজন্ম হিন্দুর ন্যায় তিনিও হিন্দু-তীর্থক্ষেত্রে সম্মিলিত সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন।† এখন যেমন "পার্লামেণ্ট অফ্ রিলিজন্" বা ধর্ম্ম মহাসভা আহ্বান করিয়া, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামত জ্ঞাত হইবার

* ইনি তামিলভাষীদিগের তুকারাম। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ইহাঁর মূর্ত্তি দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে।

† এখনও এভাব ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। আমাদিগের কোন পরিব্রাজক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে, হিমাচলস্থিত "ব্যাস গুহার" নিকটে এখনও কোন মুসলমান সাধু বাস করিতেছেন। ইহাঁর প্রতিবাসী সাধুগণ ইহাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং অনেক সময় ইহাঁর আশ্রমে আসিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনা করেন।

চেষ্টা হইতেছে, ভারতের পূর্ব্বকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণও এইরূপ কোন তীর্থক্ষেত্রে তদধিষ্ঠাতা দেবতার উৎসবে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন ও মানসিক ভাবের আদান প্রদান দ্বারা নিজের নিজের ধর্ম্মমত গঠিত ও মার্জ্জিত করিয়া লইতেন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র পণ্ঢরপুরে অনেকবার এইরূপ সাধু-সম্মিলন হইয়াছিল। একবার বিঠোবার যাত্রা উপলক্ষে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ পণ্ঢরপুরে সম্মিলিত হইলে, তুকারামও সেখানে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামদাস স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রামদাস স্বামী সে সময় মহারাষ্ট্রদেশের অগ্রগণ্য সাধুপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির জন্য এবং শিবাজীর দীক্ষাগুরু বলিয়া তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না। তুকারাম এবং রামদাস স্বামী উভয়েই পরস্পরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, সুতরাং এই সাক্ষাতে উভয়েই পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। প্রত্যেক সাধুই আপন আপন পন্থানুযায়ী পূজা, অর্চ্চনা ও প্রচার আরম্ভ করিলে, তুকারামও তাঁহার অভ্যাসানুরূপ সংকীর্ত্তন ও কথকতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সংকীর্ত্তনে সমাগত তীর্থযাত্রিগণ ও সাধুমণ্ডলী বিমুগ্ধ হইলেন। একদিন সাধুগণ তুকারামকে তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে, তুকারাম নিম্নলিখিত অভঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ;—

শূদ্র জাতি, করিতাম বৈশ্য ব্যবসায়।
পূজিতাম কুলপূজ্য দেব বিঠোবায়॥
আত্মকথা সাধুগণ বলিবারে নাই।
কিন্তু জিজ্ঞাসিছ সবে কহিতেছি তাই॥
পিতামাতা পরলোকে করিলে গমন।
সহিলাম নিদারুণ দুঃখের পীড়ন॥
দুর্ভিক্ষের গ্রাসে মোর গেল ধন মান।
অন্ন বিনা জ্যেষ্ঠা পত্নী ত্যজিলেন প্রাণ॥
বড় লজ্জা হ'ল, কিন্তু কি করিব হায়।
ক্ষতি হ'ল, করিলাম যত ব্যবসায়॥
নিদারুণ ক্লেশ আর না পারি সহিতে।
করিলাম স্থির এই বিচারিয়া চিতে॥
বিঠোবার ভগ্ন গৃহ সংস্কারি যতনে।
কাটাইব কাল সেথা ভজন সাধনে॥
একাদশী দিনে আরম্ভিনু সংকীর্ত্তন।
অভ্যাস আমার তাহে না ছিল কখন॥
সাধুগণ বিরচিত গুটী কত গান।
লইনু কণ্ঠস্থ করি হ'য়ে ভক্তিমান॥
সুগায়কগণ যবে গাইতেন গীত।
ধ্রুবা ধরিতাম আমি হ'য়ে শুদ্ধ চিত॥
সাধু-পাদোদক নিত্য করিতাম পান।
লোকভয় অন্তরেতে না দিতাম স্থান॥
কায়মনোবাক্যে দেহ সঁপি আপনার।
করিতাম যথাসাধ্য পর উপকার॥
জন্মিল বিরাগ মোর সংসারের প্রতি।
আত্মজন বাক্যে আর না রহিল প্রীতি॥
সত্যাসত্য সাক্ষী করি আপনার মনে,
লোকের গঞ্জনা বাক্য না শুনি শ্রবণে,
স্বপ্নে গুরুদত্ত মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
করিলাম হরিনামে বিশ্বাস স্থাপন॥
কবিত্ব শকতি ক্রমে উপজিল মনে।
স্থাপন করিনু চিত্ত বিঠোবা চরণে॥
হইল নিষেধ পরে কবিতা লেখায়।
বড় কষ্টে কয় দিন গিয়াছিল তায়॥

নিক্ষেপিয়া গ্রন্থ মোর ইন্দ্রায়ণী নীরে।
ত্যজিতে পরাণ গেনু বিঠোবা মন্দিরে ॥
অপার করুণাসিন্ধু দেব নারায়ণ।
কহিলেন মোরে সেথা আশ্বাস বচন ॥
বিস্তারিয়া কহি যদি সব বিবরণ।
বিলম্ব ঘটিবে বহু, কিবা প্রয়োজন ॥
যে দশায় আছি এবে প্রত্যক্ষ সকল।
ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানেন বিঠল ॥
কৃপাময় হরি মোর নিজ ভক্তগণে।
না ত্যজেন, স্থির ইহা বুঝিয়াছি মনে ॥
তুকা বলে পাণ্ডুরঙ্গ যে কথা সকল।
বলালেন, তাই মাত্র আমার সম্বল ॥

তুকারামের বিনীত ব্যবহার ও অকৃত্রিম ভক্তি দর্শন করিয়া, সাধুগণ সকলেই পরমপ্রীত হইলেন। তাঁহার বৈরাগ্যের ও নিঃস্বার্থতার জন্য তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন, এবং তাঁহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিতেন। আত্মাভিমানশূন্য সরলস্বভাব তুকারামের সে প্রশংসা ভাল বোধ হইত না। তিনি একদিন একটী অভঙ্গে সাধুগণের নিকট বলিলেন;—

এই নিবেদন মোর শুন সাধুগণ।
অধম পতিত আমি অতি অভাজন ॥
আমারে সম্মান হেন উচিত না হয়।
এত সমাদর মোর যোগ্য কভু নয় ॥
আমি যে কেমন মোর চিত্ত জানে তাই।
সত্য, সত্য, আজও মোর মুক্তি ঘটে নাই ॥
নিজ মনে একজন একভাবে থাকে।
বাহিরের লোক তারে অন্যভাবে দেখে ॥
আত্মপরিচয় কিবা দিব, সাধুগণ।
সংসার করিল মোরে বহু নিপীড়ন ॥
লাঙ্গুল মর্দ্দন করি বলীবর্দ্দগণে
পারি নাই ব্যবসায়ে পোষিতে স্বজনে ॥*
তাই এ বৈরাগ্য-ব্রত করেছি গ্রহণ।
কি প্রশংসা ইথে মোর আছে সাধুগণ ॥
স্বভাবতঃ অর্থ মোর হয়েছিল ক্ষয়।
অল্প মাত্র দানে শুধু করিয়াছি ব্যয় ॥
পত্নী পুত্র প্রতি আমি হইয়া উদাস।
হীনবুদ্ধি, মন্দভাগ্য করেছি প্রকাশ ॥
সরম হইল বড় দেখাতে বদন।
আশ্রয় লইনু তাই বিজন কানন ॥
আপন উদর জ্বালা পালিবার তরে।
নির্ম্মম হইনু, ভুলি আত্ম পরিবারে ॥
না ছিল উপায় বনে গিয়াছিনু তাই।
প্রশংসার কথা ইথে কিছুইত নাই ॥
থাকিতাম দিবানিশি উদাসীন মনে।
"হাঁ" দিতাম, না বিচারি লোকের বচনে ॥
পূর্ব্ব পিতৃগণ মোর ছিলা ভক্তিমান।
তেই আমি বিঠোবায় সঁপিয়াছি প্রাণ ॥
আমি যে বৈরাগ্য ব্রত করেছি গ্রহণ।
সে কেবল সংসারের সহি নিপীড়ন ॥
কিন্তু সাধুগণ মোর চিত্ত এই চায়।
ভক্তিগুণে যেন কেহ এই পথে ধায় ॥

তুকারাম যে কিরূপ সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার এইরূপ উন্মুক্তহৃদয়ে আত্মগতভাব প্রকাশের চেষ্টায়ই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তুকারাম প্রতিদিনই পণ্ঢরীপুরের উৎসবে সংকীর্ত্তন করিতেন। একদিন নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সংকীর্ত্তন করিলেন ঃ—

কি আর বলিব, বলহ সকলে, ধরম করম নীতি
সার কথা এই, বিঠোবা চরণে, রাখ সদা স্থিরমতি ॥

---

* ব্যবসায়ীগণ দ্রুতগমনের জন্য আপনাদিগের ভারবাহী বলীবর্দ্দদিগের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া থাকে। তুকারামের এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, এমন কি বলীবর্দ্দদিগকে প্রহাররূপ অধর্ম্ম কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াও সংসার প্রতিপালন করিতে পারি নাই। তবে আমার সংসারত্যাগের জন্য প্রশংসা কি ?

এ জগত মাঝে, যাহা কিছু আছে, ক্ষর অক্ষর রূপ ;
পণ্ঢরীনাথ, সার তাহার, সে চরণে কর নতি ॥
আগম জলধি, মন্থনে যদি, উঠিল এ নবনীত ;
সার ভাবিয়া, হৃদয়ে রাখিয়া, দিবানিশি কর প্রীতি ॥

সেদিন প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। পরদিন সমবেত সাধুগণের উপরোধে রামদাস স্বামী স্বয়ং সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। সাতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন ও উৎসবের পর পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের আদর্শে সাধুগণ (দধিকাদা) উৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুদিগের মধ্যে কেহ নন্দ, কেহ যশোদা, কেহ বালগোপাল সাজিলেন। তুকারাম গোপবালক হইলেন। যিনি যে ভাবে অভিনয় করিতেন, তুকারাম তৎক্ষণাৎ নব নব অভঙ্গ রচনা করিয়া তাঁহার অভিনীত সেই সেই ভাব আরও পরিস্ফুট করিতেন। দেশপ্রসিদ্ধ, পলিতকেশ সাধুগণ এইরূপ বালকের ন্যায় সরলভাবে নৃত্যগীতাদির দ্বারা উৎসবানন্দ ভোগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। তুকারামের বিনীত ব্যবহারে ও সঙ্কীর্ত্তনের গুণে অনেক নীরস হৃদয়ও আর্দ্র হইল। রামদাস স্বামী একজন "রামায়ৎ" সন্ন্যাসী ছিলেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত, উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ এবং শিবাজীর গুরু বলিয়া তিনি প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ ধর্ম্মাভিমানী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ভিন্ন অপর কোন দেবমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু পণ্ঢরীপুরের সাধুসম্মিলনের পর হইতে তাঁহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। মূর্ত্তিমান্ ভক্তিধর্ম্মরূপী তুকারামকে দর্শন করিয়া এবং সমাগত সাধুগণের নিষ্ঠা, প্রেম ও পরস্পরের প্রতি উদ্ধতভাবশূন্য ব্যবহার আলোচনা করিয়া তাঁহার আত্মাভিমান খর্ব্ব হইল। পণ্ঢরীপুরে আগমন করিয়া বিঠলের মূর্ত্তি দর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন, "হে মনোমোহন মেঘশ্যাম শ্রীরাম, চাপ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তুমি এখানে ইষ্টকোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছ কেন ?" কিন্তু পণ্ঢরীপুর হইতে প্রতিগমনের সময় তিনি বলিলেন, "সকল স্থানই দেবসত্তায় পরিপূর্ণ, তবে কোন্ তীর্থে গমন করিব ?" অনেকে অনুমান করেন যে তুকারামের সহিত পরিচয়ই রামদাস স্বামীর এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। ইহার পরও রামদাস স্বামীর সঙ্গে তুকারামের কয়েকবার পণ্ঢরীপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একবার উত্থানএকাদশীর উৎসব উপলক্ষে সমস্ত সাধুগণ সম্মিলিত হইলে, শিবাজীও সেখানে আগমন করিলেন। প্রাচীনকালের

নরপতিদিগের ন্যায় শিবাজী সমাগত সাধু সন্ন্যাসীদিগের যথারীতি অভ্যর্থনা ও সৎকার করিলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মকার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য উৎসবক্ষেত্রে সানুচর বর্ত্তমান রহিলেন। এই সকল উৎসবক্ষেত্রে সাধু সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় সন্ন্যাসিনীগণও উপস্থিত থাকিতেন। আকাবাই নাম্নী রামদাস স্বামীর কোন শিষ্যার কথা মহীপতির গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই উপলক্ষ্যে সমাগত ব্যক্তিদিগকে রামদাস স্বামীর প্রণীত "দাসবোধ" নামক কোন অধ্যাত্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। পণ্ঢরীপুরের উৎসবের পর আমরা তুকারামকে আরও একটী উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিতে পাই। শিবাজী পরলীগড় নামক কোন গিরিদুর্গে রামচন্দ্রের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহারাষ্ট্রদেশের প্রসিদ্ধ সাধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তুকারাম সেখানে উপস্থিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। শিবাজী স্বয়ং এবং আকাবাই, বেণুবাই, বহিনাবাই প্রভৃতি রামদাস স্বামীর কয়েকজন ধর্ম্মানুরাগিনী শিষ্যাও এই উপলক্ষ্যে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই উৎসবক্ষেত্রে অনেক সঙ্গীতপারদর্শী ও ভক্তিমান ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামেরই সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর হওয়াতে, প্রায় এক মাসকাল সকলে তাঁহারই সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। উৎসব শেষ হইলে, শিবাজী সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধুসন্ন্যাসীদিগের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামেরও অর্চ্চনার জন্য তিনি স্বর্ণমুদ্রা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু তুকারাম যে হঠাৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। শিবাজী তুকারামকে চারিখানি গ্রাম দান করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামের অন্তর্দ্ধানে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। তিনি রামদাস স্বামীর নিকট তুকারামের ব্যবহার সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলে রামদাস স্বামী তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস ধার্ম্মিকদিগের নিকট ত্রৈলোক্যেরও সম্পদ তুচ্ছ। তুকারাম মহাসিদ্ধিকেও পদাঘাত করিয়া নিষ্কামভাবে বিঠোবার ভজনে রত আছেন। চতুর্ব্বিধ মুক্তিও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর; এই সামান্য পার্থিব সম্পদের তাঁহার নিকট মূল্য কি ?" মহীপতি বলেন যে তুকারামের নিস্পৃহতা দর্শন করিয়া রামদাস স্বামী বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তুকারামের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তুকারাম প্রত্যেক বৎসর আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী একাদশী উপলক্ষে পণ্ঢরপুরে গমন করিতেন। একবার পীড়ার জন্য তিনি সেখানে গমন করিতে পারেন নাই। দৈনিক অন্ন জল প্রাপ্ত না হইলে, তুকারামের ক্লেশ বোধ হইত না, কিন্তু নিরূপিত ধর্ম্মচর্চ্চায় কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে তিনি একবারে অস্থির হইয়া পড়িতেন। একাদশীর দুই চারিদিন পূর্ব্বে যখন অন্যান্য সকলে পণ্ঢরপুরে গমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, তখন তুকারাম মাতৃদর্শনোৎসুক বৎসের ন্যায় অধীর হইতে লাগিলেন। তিনি কেবলই ভাবিতেন, 'হায়! আমি এমনই অধম যে এই পুণ্য দিনে বিঠোবার দর্শনে বঞ্চিত হইলাম।' ক্রমে পণ্ঢরপুরে যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে, তুকারামের শিষ্য ও অনুচরগণ সমারোহের সহিত ধ্বজপতাকা ও বাদ্যভাণ্ডসহ যখন তাঁহার গৃহের সমীপবর্ত্তী হইলেন, তখন তুকারাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অতি কষ্টে আপনার গৃহের বহির্দ্দেশস্থ রাজপথে আসিয়া, শিষ্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা গিয়া বিঠোবাকে বলিবে যে, আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমাকে এবার তাঁহার দর্শনসুখে বঞ্চিত করিলেন। তাঁহাকে বলিও, তিনি যদি আমাকে এখনও একটু বল দেন, আমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি এবং ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া নৃত্য করি। তোমরা বিঠোবাকে আমার এই পত্র দিও।" এই বলিয়া তিনি ২৪টী অভঙ্গ শিষ্যদিগের হস্তে প্রদান করিলেন।

তুকারাম এই সকল অভঙ্গ বা পত্র শিষ্যদিগের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিলে, তাঁহারা পণ্ঢরপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে তুকারামের দারুণ ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। তিনি সেই পীড়িত অবস্থায়ও ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অল্পে অল্পে চলিতে লাগিলেন। শেষে তুকারাম গমন শক্তির অভাবে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। তুকারামের কোন চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, মাতা যেমন শ্বশুরালয়গামিনী দুহিতাকে বিদায় দান করিয়া, চক্ষুর অন্তরাল না হওয়া পর্য্যন্ত সজলনেত্রে সেইদিকপানে চাহিয়া থাকেন এবং দুহিতাও যেমন অশ্রুমোচন ও পিতৃভবনের দিকে পুনঃপুনঃ গ্রীবাবর্ত্তন করিতে করিতে পতিগৃহাভিমুখে অগ্রসর হন,

তুকারাম ও তাঁহার শিষ্যগণ সেইরূপ পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর তুকারামের শিষ্যগণ পন্ঢরপুরে গমন করিয়া তুকারামের পত্র বা প্রেরিত অভঙ্গসমূহ বিঠোবাকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। মহীপতি ইহার পর যে সকল অতিলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে বর্ণনা করা অনাবশ্যক।

উৎসব সম্পূর্ণ হইলে তুকারামের শিষ্যগণ দেহুতে প্রত্যাগমন করিলেন। তুকারাম যেখানে তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব হইতে সেখানে যাইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পরস্পরের প্রণাম ও অভিবাদনাদির পর তুকারাম তাঁহাদিগকে উৎসবের সবিস্তর বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে তাহা শ্রবণ করাইয়া, বিঠোবার প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বৈদ্যনাথ দেওঘর।

সূর্য্যের তাপ ও পরমায়ুঃ

সূর্য্যই আমাদের জীবনস্বরূপ। সহস্ররশ্মির কৃপাতে ধরাতলে প্রাণিমাত্রেরই কোন অভাব নাই। সকলেই জানেন যে কার্বন ও অক্সিজেনের সংযোগে এক অনিষ্টকর পদার্থ উৎপন্ন হয়। উহা পৃথিবীতে অহরহঃ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্যের কিরণে এরূপ এক রাসায়নিক শক্তি আছে, যাহা গরলকেও অমৃত করিয়া তুলে। কার্বন ও অক্সিজেন সূর্য্যের প্রতাপে পৃথক হইয়া যায়, এবং কার্বন উদ্ভিদের আহারে পরিণত হয়। অতএব সহস্ররশ্মিই উদ্ভিদ্‌রাজ্যের জীবন। জীবরাজ্যেও তদীয় মহৎ কার্য্যের অবধি নাই। আমিষভোজীই হউন, আর নিরামিষভোজীই হউন, সকলকেই সূর্য্যের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। মাংসাশী উদ্ভিদাহারে গঠিতশরীর জীবেরই মাংস খাইয়া থাকেন। সুতরাং সূর্য্যই সকলের আহারদাতা। যিনি আহারদাতা, তিনিই ত যাবতীয় কার্য্যই করিতেছেন; আমরা তাঁহার হস্তে অবলম্বন মাত্র। রেলগাড়ি চলিতেছে, বাষ্পপোত চলিতেছে, বহুবিধ কলকারখানা হইতেছে, কাহার কৃপায়, কাহার ক্ষমতায়? সূর্য্যই লক্ষ লক্ষ হস্ত বিস্তার করিয়া আমাদের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করিতেছেন। সে কয়লায় বাষ্পপোত চলিবে, তাহা ভূগর্ভ-নিহিত উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ। অতএব সূর্য্যের মঙ্গলকামনা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। উদ্ভিদের জীবন, জীবের পালনকর্ত্তা ও কর্ম্মের গুরু সবিতা অক্ষয়, অমর, অক্ষুণ্ণতেজা হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু যাহাকে যত ভালবাসা যায়, তাহারই তত বিপদের আশঙ্কা করা যায়। অনেক জ্যোতির্বেত্তারা বলেন যে যিনি অদ্য সদর্পে অপ্রতিহত প্রভাবে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন, তিনিই কালের মাহাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব ও গতাসু হইয়া ম্লানমুখে সৌরজগৎ অন্ধকার করিয়া থাকিবেন। সূর্য্যের ভূত ও ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত ব্যাকুলতা উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণে তাদৃশ ব্যাকুলতার কারণ কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা যাউক।

জ্যোতির্বিদেরা সূর্য্যের তাপ-বিকিরণ শক্তি অবলম্বন করিয়া তদীয় পরমায়ুঃ স্থির করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু সে তাপের সম্যক্ নির্দ্ধারণ করাও বড় সহজ কথা নহে। সূর্য্যসম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়ই মহত্ত্বব্যঞ্জক। সূর্য্য ও পৃথিবীর অন্তর নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল; সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় নিকটবর্ত্তী হইলে, সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী গলিয়া পরিশেষে বাষ্পময় হইয়া যাইত। সূর্য্য হইতে যে পরিমাণে তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহার কেবল দুই শত কুড়ি কোটি ভাগের এক ভাগ আমরা পাইয়া থাকি। এক্ষণে বিবেচনা করুন যে সূর্য্যের তাপমান কত হইতে পারে। সূর্য্যের পৃষ্ঠফল পৃথিবীর পৃষ্ঠফলের বারহাজার গুণ। সূর্য্যের সমগ্র পৃষ্ঠের উপর বিশ ফুট উচ্চ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট কয়লা সাজাইয়া তাহাকে সুন্দররূপে পোড়াইলে যে পরিমাণে তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেই পরিমাণে তাপ সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া থাকে। সূর্য্যের ঘনফল পৃথিবীর ঘনফলের প্রায় তের লক্ষ গুণ। ঈদৃশ মহাকায় হইলেও, সূর্য্য যদি একটী জ্বলন্ত কয়লার পিণ্ড হইত, তাহা হইলে ছয় হাজার বৎসরে পুড়িয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে বহুকাল হইতে সূর্য্যের তাপবিকিরণ শক্তি সমান রহিয়াছে, হ্রাস বা বৃদ্ধি ধরিতে পারা যায় না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কয়লার মত কোন বস্তুবিশেষের দহন দ্বারা সূর্য্যের তাপ সংরক্ষিত হইতেছে না, কারণ তাহা হইলে অনতিকালেই দহন শেষ হইয়া উহা ভস্মাবশেষ হইয়া যাইত।

তবে কি প্রকারে সূর্য্যের তাপসংগ্রহ চলিতেছে? এবিষয়ে দুইটী মত

আছে। মেয়ার সাহেব বলেন যে রাশি রাশি উল্কাখণ্ড সূর্য্যোপরি পড়িয়া সংঘর্ষণে তাপ উৎপাদন করিয়া সূর্য্যের তাপ রক্ষা করিতেছে। হেল্মহোল্জ্ বলেন যে সূর্য্যপিণ্ডের আকুঞ্চন দ্বারা তদীয় তাপ সংরক্ষিত হইতেছে। মেয়ারের মত সম্বন্ধে দুইটি প্রধান আপত্তি আছে।

(১) ধূমকেতু সকল বহুদূর হইতে আইসে, এবং সূর্য্যকে স্পর্শ না করিয়া, কেবল প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। তদ্রূপ যদি কোন উল্কাখণ্ড বহুদূর হইতে সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয়, তবে উহা সূর্য্যে পতিত না হইয়া সূর্য্যের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার সম্ভব। সুতরাং যদি কোন উল্কাখণ্ড সূর্য্যে পতিত হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে সূর্য্য হইতে অনতিদূরে অগণ্য অমেয় উল্কারাশির মহাসমুদ্র আছে, যাহা হইতে স্খলিত উল্কাখণ্ড সকল সূর্য্যে নিপতিত হইয়া অচিন্ত্য-কালের জন্য তদীয় তাপ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে তাদৃশ বিপুল উল্কারাশি অবশ্যই সূর্য্যের সন্নিকটস্থ বুধ ও শুক্রের গতির সবিশেষ পরিবর্ত্তন করিত। কিন্তু সেরূপ কোন গতিবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না।

(২) অধ্যাপক পিয়র্স বলেন যে মেয়ার সাহেবের মত স্বীকার করিলে, গণনা দ্বারা পাওয়া যায় যে পৃথিবী স্বপৃষ্ঠে পতিত উল্কাখণ্ডের দ্বারা বৎসরে যে তাপ পাইয়া থাকে, তাহা সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত তাপের অর্দ্ধেক। কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীর উপর উল্কাবর্ষণ জনিত তাপ সূর্য্যপ্রদত্ত তাপের কোটিভাগের একভাগও হয় কিনা বলা যায় না।

সুতরাং সম্প্রতি একমাত্র হেল্মহোল্জের মতই বলবান্ রহিয়াছে। ১৮৭০ খৃঃঅব্দে লেন্ সাহেব প্রমাণ করেন যে যদি কোন বাষ্পময় বর্ত্তুল চতুর্দ্দিকে তাপ বিকীর্ণ করে, ও নিজের অণুসকলের পরস্পর আকর্ষণে ক্রমে ছোট হইয়া আইসে, তাহা হইলে উক্ত বর্ত্তুলের উষ্ণতার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ক্রমেই যত বর্ত্তুলের আকুঞ্চন দ্বারা বাষ্পময় অবয়ব ঘন হইয়া জলবৎ হইবার সম্ভাবনা হয়, ততই তাহার আকুঞ্চন দ্বারা উত্তপ্ত হইবার গুণ কমিয়া যায়। সূর্য্যকে বাষ্পময় স্বীকার করিলে (ইহাতেও মতদ্বৈধ আছে,) সূর্য্যের অচঞ্চল উষ্ণতার কারণ পাওয়া যাইতে পারে। সূর্য্যের ব্যাস যদি সম্প্রতি বৎসরে দুইশত পঞ্চাশ ফুট করিয়া কমে, তাহা হইলেই গোল মিটিয়া যায়। সন্দেহ হইতে পারে যে সূর্য্যের ব্যাস যদি বাস্তবিকই হ্রাস পাইত, তাহা হইলে সেরূপ হ্রাস দূরবীক্ষণযন্ত্রের হস্ত

হইতে কিরূপে মুক্তি পায়? তাহার উত্তর এই যে সূর্য্যের ব্যাস প্রায় আট-লক্ষ ছয়ষষ্টি হাজার মাইল। তাহা আড়াইশত ফুট করিয়া বৎসরে কমিলে কি ধরিতে পারা যায়? কিন্তু তাহা হইলেও বহুকালের পরে সূর্য্যের বিশাল বপুঃ সবিশেষ ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। নিউকম্ব সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে সম্প্রতি সূর্য্যের যে ব্যাস আছে, তাহার অর্দ্ধেকে পরিণত হইতে পঞ্চাশলক্ষ বৎসরের বেশী লাগিবে না। তৎকালে সূর্য্যস্থ বাষ্পসকল আটগুণ ঘন হইবে। তাহা হইলে আর উহা প্রকৃত বাষ্পময় থাকিবে না, সুতরাং ক্রমেই তৎপরে তাপবিকিরণ দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় শীতল হইয়া পড়িবে। এখনই ত অনেকে বলেন যে সূর্য্যপিণ্ডোপরি যে সকল মেঘাকার বিন্দু লক্ষিত হয়, সে সকল জলবৎ তরল পদার্থে গঠিত। নিউকম্ব সাহেব আরও সিদ্ধান্ত করেন যে আর এককোটিবৎসর পরে সূর্য্যের তাপ এত কমিয়া যাইবে যে পৃথিবী হইতে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

সূর্য্যের মৃত্যুদিনের ত কতকটা আভাস পাওয়া গেল। এক্ষণে সূর্য্যের জন্মতিথি কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বহুকালেও সূর্য্যের তাপবিকিরণের হ্রাস বৃদ্ধি ধরিতে পারা যায় না। সুতরাং সূর্য্যের উষ্ণতা স্থির স্বীকার করিলে, সূর্য্যের বয়স সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়। সূর্য্যকে প্রথমে অনন্তকায় ধরিলেও, গণনাদ্বারা স্থির হয় যে সূর্য্যের উষ্ণতা একই থাকিলে, অনন্তকায় গুটাইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইতে প্রায় এককোটি আশী হাজার বৎসর লাগে। অনেক সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরা এরূপ বলিতে সাহস করেন যে জ্যামিতির কোন প্রতিজ্ঞাও উক্ত গণনা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতএব সূর্য্য যে পরিমাণে তাপবিকিরণ করিয়া থাকেন, দুইকোটি বৎসরের পূর্ব্বে সে পরিমাণে কিছুতেই তাপ দিতে পারিতেন না। সুতরাং সূর্য্যের তাপ-বিকিরণশক্তি একই থাকিলে, তাঁহার বয়স দুইকোটি বৎসরের অধিক বলা যায় না। সুতরাং পৃথিবীর বয়সও দুইকোটি বৎসরের বেশী কিরূপে বলা যায়? কিন্তু এক গোল উপস্থিত। সূর্য্যের তাপবিকিরণ-শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি দুই বা চারিশত বৎসরে বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু দুই বা দশ হাজার বৎসরে তাহার পরিমাণ বড় অগ্রাহ্য না হইতে পারে। এরূপই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়, যে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমানভাবে তাপ প্রেরণ করিতেছেন? লেন সাহেব বলেন যে

বাষ্পময় পদার্থ আকুঞ্চনদ্বারা উত্তরোত্তর সমধিক উষ্ণ হইয়া থাকে। তবেই আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে সূর্য্য দিগন্তব্যাপী বাষ্পময় শরীর লইয়া অবতীর্ণ হইলেন, ক্রমেই আকুঞ্চনদ্বারা উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া জলন্ত পিণ্ডাকারে পরিণত হইলেন, এবং ক্রমেই বর্ত্তমান তাপবিকিরণশক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। ঈদৃশ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা সুদূর ভবিষ্যদ্-গর্ভে সমাহিত। যেখানে দুইকোটি বৎসর পাওয়া যাইতেছে, সেখানে দুইশত কোটি বৎসরেও কূল পাইবে না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ।

জ্ঞানবৃক্ষ ও তাহার একটি সুফল।

মনুষ্য সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ইডেন উদ্যান তৈয়ারি হয়। এই রম্য উদ্যানের মধ্যস্থলে জ্ঞানবৃক্ষ রোপিত হয়। কেন যে মানুষের উপর হুকুম ছিল যে সে যেন ঐ বৃক্ষের ফল স্পর্শ না করে, তাহা এখন ঠিক করা বড় কঠিন। মানব জাতির "অতি বড় বৃদ্ধ প্রপিতামহী" প্রথম ঐ বৃক্ষের একটী ফল পাড়িয়া খাইতে সাহসী হন। স্ত্রীলোকের জ্ঞানপিপাসা চিরকালই বলবতী। আদি পিতা আদম কিছু স্ত্রৈণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে সময় স্ত্রৈণ হওয়া ছাড়া তাঁর উপায়ান্তর ছিল না। আদম ইহুদী ছিলেন এবং সেই জন্য আমরা অনুমান করি যে হয় ত তাঁহার বহুবিবাহের পক্ষপাতী হওয়া খুব সম্ভব। কিন্তু হইলে কি হয়, "তখন সবে ধন নীলমণি" "হবা" ভিন্ন আর রমণী নাই। পিতা মহাশয়ের বিবাহেচ্ছা যতই বলবতী থাকুক না কেন, তাহা সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যে কারণেই হউক, তিনি সহধর্ম্মিণীর অনুগামী হইলেন—জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলেন। অনেক সময় আমি এই আদি পিতা মাতাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিই। যদি তাঁহারা ঐ জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খাইতেন, তাহা হইলে আমরা কি প্রগাঢ় অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন থাকিতাম! তাহা হইলে আমরা বাল্মীকি ও কালিদাস, হোমার ও সেক্সপিয়ারের কাব্য পড়িতে পারিতাম না, রেল খাল দেখিতে পাইতাম না, তারে খবর পাঠাইতে পারিতাম না, এমন কি বর্ত্তমান সভ্যতার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র চিহ্ন সামান্য পোষ্টকার্ডখানারও মুখ দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ। উপরে যে জ্ঞানবৃক্ষের দুই একটি

ফলের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহারা যে বহুমূল্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাহারা না থাকিলে সমাজ সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে পারিত না। কিন্তু সমাজ রক্ষার জন্য ইহাদের তাদৃশ আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা বলেন খৃঃপূঃ ৪০০৮ বৎসরের সময় আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথ্বী ও তাহার সঙ্গে মানবজাতি সৃষ্ট হয়। রেলগাড়ী, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি সেদিন আবিষ্কৃত হইল। প্রায় ৬০০০ হাজার বৎসর কাল মানব সমাজ উহাদের অভাবেও বেশ চলিয়াছিল। বাল্মীকি ও হোমারের জন্মের পূর্ব্বেও সমাজের স্থায়িত্বের কোন বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞানবৃক্ষের এই সব ফল, বোম্বাই, ল্যাংড়া বা ফজলি আম, মজফরপুরী লিচু বা ভাল মর্ত্তমান কলার সমান। সমাজের জীবন ধারণের পক্ষে উহাদের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। এই প্রবন্ধে আমরা কিন্তু যে ফলটির কথা বলিব, তাহা সমাজের জীবন ধারণের প্রধান উপায়; বলিতে কি উহা না থাকিলে সমাজ এত দিনে মরিয়া যাইত। ফলটী কি? ফলটীর নাম পরনিন্দা। উহা যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল, তাহা বুঝাইতে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। (১) জ্ঞান না হইলে আমরা কোন বিষয় জানিতে পারি না। (২) যাহার নিন্দা করি তাহার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অসীম হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে আমরা তাহার দোষ বাহির করিতে সক্ষম হইব কি প্রকারে? এই দুইটী কথা ভাল করিয়া বুঝিলে, পরনিন্দা যে জ্ঞানবৃক্ষ-জাত তাহা বুঝিতে কোন বুদ্ধিমান্ লোকের কষ্ট হইবেক না।

পরনিন্দা এত ভাল লাগে কেন? এমন কোন মহান্ উদারস্বভাব পুরুষ থাকিতে পারেন, যিনি পরনিন্দা করেন না এবং পরনিন্দা যাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু তাঁহার দর্শন খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে। অসভ্য জাতিদের মধ্যে পরনিন্দা প্রচলিত আছে কিনা বলিতে পারি না; যদিও থাকার খুব সম্ভব। পরনিন্দা যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহারা সমাজবদ্ধ হইবে কি প্রকারে? কিন্তু কোন সভ্যসমাজ যে পরনিন্দা অর্থাৎ পরচর্চ্চা বিরত হইয়া থাকিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতেও আমি অক্ষম। যখনই আমরা পাঁচজনে মিশি, তখনই পরচর্চ্চা করিবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। সুবিধা পাইলেই পরচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করি। পরচর্চ্চা করিতে পাইলে কি আনন্দ! যেদিন পরচর্চ্চা করিতে না পাই, সে দিনটা বৃথা

গেল বলিয়া বোধ হয়। শুনিয়াছি সুদূর বিদেশে কোন স্বদেশী সঙ্গীত শুনিতে পাইলে নাকি মনে অসীম আনন্দের উদয় হয়। আমার এক ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বন্ধু একবার বলিয়াছিলেন যে এক সময় লিভারপুল সহরে দূর হইতে এক খালাসীর মুখে লক্ষ্ণৌ ঠুংরি শুনিয়া তাঁর মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। আমার ভাগ্যে এরূপ আনন্দভোগ কখনও ঘটে নাই, ঘটিবে বলিয়াও বোধ হয় না। আমার কিন্তু একটা কথা মনে হয়। এইরূপ গান কি পরনিন্দা অপেক্ষাও মধুর? পরনিন্দা অপেক্ষা মধুরতর জিনিস যে আর থাকিতে পারে, তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে আমি নারাজ।

পরনিন্দা এত ভাল লাগে কেন? একটু তলাইয়া বুঝিলে শুধু ভাল লাগে নয়, পরনিন্দা একটা সামান্য ভোগের বস্তু নয়, ইহা এক অত্যাবশ্যক পদার্থ। ইহা না থাকিলে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। সময়ের ভার বড় ভার। আমার মনে হয়, পরনিন্দা না থাকিলে এই ভারে আমাদিগকে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইত। জীবনে মানুষ হতাদর হইত, এবং হয় তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া সকল ক্লেশের হাত এড়াইতে হইত, না হয় সে শুধু বিরক্তিতে ঠায় মারা যাইত। "রাম বাবুর ছেলেটি একটী বাঁদর", "শ্যাম বাবু একটী জানোয়ার", "মদের ভাঁটীতে না চোঁয়াইলে ঈশান বাবুর ক্ষুধা হয় না," ঈদৃশ ও অন্যাদৃশ গুরুতর প্রশ্ন সমূহের যদি বিচার করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে জীবন ধারণ করা যে কি কঠোর হইয়া দাঁড়াইত, তাহা সকল শিক্ষিত ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। "নরুদের বউটী বড় কালো" "সুহাসিনীর মার মত বউ কাঁট্‌কী শ্বাশুড়ী আর নাই," সময় কাটাইবার নিমিত্ত আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের কাছে যদি এইরূপ প্রশ্ন সব উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে হয় তাঁহারা গহনার মায়া পর্য্যন্ত কাটাইয়া আমাদের গৃহ অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেন, কিম্বা গৃহ এরূপ আলোকিত করিয়া তুলিতেন যে ক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ আমাদিগকে সেই আলোতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত। আমার বোধ হয় পরনিন্দা সংসার-পথে অন্ধের যষ্টি, সংসার-মরুতে তৃষিতের বারিবিন্দু, সংসার-অরণ্যে সুখের কল্পতরু, সংসার-উদ্যানে "বসোরা" গোলাপ।

পরনিন্দা না করিয়া লোকে করে কি? যদি পাঁচ জন এক ব্যবসায়ী লোক একত্র হন অনেক সময় তাঁহারা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কথা কহিয়া

থাকেন। চারি জন হাকিম বাবু একত্র হইলে হয় ত তাঁদের উপরওয়ালার গুণাগুণের সমালোচনা আরম্ভ করেন, নয় ত অমুক মকদ্দমাটার এইরূপ বিচার হইলে ভাল হইত, একাউণ্টাণ্ট জেনরালের বা হাইকোর্টের এক নূতন সার্কুলার আসিয়াছে, এইরূপ কথা অনেক সময়েই পাড়িয়া থাকেন। উকিল বাবুদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সময় আইনের বাজে তর্ক চলিতেছে, কিম্বা "নূতন জজ সাহেব বড় কড়া," "অমুক জায়গার মুন্‌শেফ বাবুকে দেখিলাম একটী গবাকান্ত", "অমুক ডেপুটী বাবু ইংরাজীতে যে রায় লেখেন, কালেক্টর সাহেব তাহা বুঝিতে না পারিয়া এবার হইতে তাঁহাকে বাঙ্গলায় রায় লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন," এইরূপ সব অত্যাবশ্যক সত্যের আলোচনা হইতেছে। জন কয়েক মাষ্টার মহাশয় একত্র হইলে দেখা যায় কেহ আজকালকার ছেলে গুলা বড় বিগ্‌ড়াইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতেছেন, কেহ শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের সমালোচনা করিতেছেন, কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দিগ্‌গজ প্রশ্নকর্ত্তার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে ডাক্তার বাবু, কেরাণী বাবু ও অন্যান্য বাবুদের কোন উল্লেখ করিলাম না। যদি পাঁচ শ্রেণী হইতে পাঁচজন লোককে একত্র করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় তাঁহারা "বারিশূন্য মীনবৎ" হইয়া পড়েন। কেহই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না যে কি কথা কহিব। অনেক সময় দেখা গিয়াছে এক মজ্‌লিশে জন কয়েক ভিন্ন ব্যবসায়ের লোক একত্র হইয়াছেন। সকলেই হয় ত সকলকে চিনেন। কিন্তু সব চুপ চাপ। এক পার্শ্বে হয় ত দুইজন সমব্যবসায়ী লোকে ফুস্‌ফাস্ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিতেছেন। হঠাৎ একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির কথা পড়ুক দেখি, অমনি সকলের মুখ প্রফুল্ল হইবে, মনের শূন্যতা ব্যঞ্জক মুখের ভাব মিলাইয়া যাইবে, ফুস্‌ফাস্ বন্ধ হইবে, সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া, অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা-প্রণোদিত হইয়া, তাঁর কথা শুনিতে আরম্ভ করিবেন। আজ কাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রসাদে, সস্তায় বিদ্যাদান প্রথা প্রচলিত হওয়ার প্রসাদে বহুল পরিমাণে দেশে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। দেশময় এম্, এর ছড়াছড়ি। বি, এ উপাধিধারী ব্যক্তি আজ কাল অনেকের কাছে অর্দ্ধশিক্ষিত ও দয়ার পাত্র। দেশের অবস্থা এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত মজ্‌লিসে এতক্ষণ সকলে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিলেন। কেহই এমন একটী প্রসঙ্গ খুঁজিয়া

পাইতেছিলেন না, যাহা সকলের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। শুনিতে পাই, মৃত্যু প্রভেদের অরি। তাহার কাছে, রাজা, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্দ্ধন, যুবা, বৃদ্ধ এবং স্ত্রী পুরুষের কোন প্রভেদ নাই। একটু ভাবিয়া দেখুন দেখি, পরনিন্দাও নিদেন কিয়ৎ পরিমাণে কি এ সম্বন্ধে মৃত্যুর সদৃশ নয়? যিনি যে অবস্থার লোক হউন না কেন, পরনিন্দার চক্ষে সব সমান। উপরিউক্ত মজ্‌লিশটীতে নানা বর্ণের নানা অবস্থার লোক আছেন। এতক্ষণ তাঁহাদের মনের কবাট বন্ধ ছিল। আকৃতিগত সাম্য না থাকিলে তাঁহারা যে সকলে এক জাতীয় জীব, এবং পরস্পর পরস্পরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম, সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু যেমন পরের কথা উঠিল, অমনি স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সমস্ত বৈষম্য দূর হইল। পরস্পরের প্রতি একজাতীয়ত্ব-জাত সহানুভূতির বিকাশ পাইল। সকলেই পরস্পরের কাছে একটু ঘেঁসিয়া বসিলেন, এবং পরনিন্দারূপ উৎস হইতে আনন্দ-সুধা পান করিয়া সকলেই সমান বিভোর হইলেন। পরনিন্দার প্রতি আমার ভক্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। উহাকে আমার সমাজবন্ধনের এক প্রধান উপকরণ বলিয়া বোধ হইতেছে। "প্রধান" বলিলে বোধ হয় সব বলা হইল না। পরনিন্দা না থাকিলে মানব-সমাজ কিরূপে গঠিত হইত, তাহা আমি ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইন্দ্রের অশনি নির্ম্মাণার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া দধীচি মুনি আপনাকে হিন্দুজগতে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তির নিন্দা করিয়া আমরা সমাজবন্ধন বজায় রাখি, মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিশিতে ও সহানুভূতি করিতে শিক্ষা দেই, ভাবিতে গেলে তাঁহাদের গৌরবের কাছে দধীচি মুনির গৌরব নিষ্প্রভ। নিন্দিত ব্যক্তিগণ সমাজের যে কত উপকারক, তাহা আমার ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণন করিতে অক্ষম। সমাজের উচিত, প্রধান প্রধান নিন্দিত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করা, তাঁহাদের নাম দেবশ্রেণীভুক্ত করা। রোমের অনেক সম্রাটকে দেবশ্রেণীতে উন্নীত করা হইত। হিন্দুদের মধ্যেও এ প্রথা সম্পূর্ণ বিরল ছিল না। কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তিদিগকে দেবতার পর্য্যায়ে তোলা ও রোমক সমাটদিগের প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করার মধ্যে একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। সম্রাটেরা অনেকেই অতি কদর্য্য প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের হইতে জগতের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়াছিল।

কিন্তু আমি যাঁহাদের হইয়া ওকালতি করিতেছি, তাঁহারা মানবসমাজের নিঃস্বার্থ বন্ধু। "প্রধান প্রধান" বলিবার একটু অর্থ আছে।—

যদি সকল নিন্দিত ব্যক্তিকে দেবশ্রেণীভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে দেবগণের তালিকা কিছু বড় হইয়া পড়িবে। একেই ত আমাদের দেবতার সংখ্যা কিছু অধিক। সংখ্যা বেশী বাড়াইলে সামলাইতে পারা যাইবেক না।

পরনিন্দার আর একটী মহতী উপকারিতার কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। যখনই আমি বলি, "কৈলাস বাবু বড় মাতাল" এবং তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসি, তখন কি একটা কথা উহ্য থাকে না যে "আমি মাতাল নই।" যখন আমার কোন মান্য প্রতিবেশী আমাকে কৃপণ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না, সমাজ এ [illegible] কি তাঁর অলক্ষিত ভাবে ইহা প্রচার করা হয় না যে তিনি নি বৈদ্যজাতি [illegible]র্ণ নাই হউন, নিদান বৃষকেতু কিম্বা তাঁর বংশধর। মুখোপাধ্যায় মঃ বঙ্গসাহিত্যে [illegible]ণী যখন পার্শ্বস্থ গরীব দত্তদের ছেলেদের দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলি গণ "মাগো ওদের ছেলেগুলা দেখিতে যেন কাক্রী এবং বাড়ীতে খাইতে পায় না বলিয়া যখনই নিমন্ত্রণে যায় হাঁসের মত গেলে," তখন কি বস্তুতঃ মনে মনে এই কথা ভাবিয়া তিনি আনন্দে আটখানা হন না যে "তাঁর ছেলেগুলি সব কন্দর্পের বাচ্চা এবং বাড়ীতে নানাবিধ জিনিষ খাইতে পায় বলিয়া মোটে পেটুক নয়।" উপরি উক্ত কয়টি উদাহরণ হইতে সুবিজ্ঞ পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, পরচর্চ্চা হইতে কি এক বিমল আত্মপ্রসাদ জন্মায়। এই আত্মপ্রসাদ যে কি মূল্যবান পদার্থ, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস করা অনাবশ্যক। আরও একটা কথা আছে, আমি যদি সর্ব্বদা পরের দোষ অনুসন্ধান করি ও তাহার সমালোচনা করি, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে স্বতঃই উহার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিবে এবং এমন দিন আসিবেই আসিবে যেদিন আমাতে ঐ দোষ লক্ষিত হইবে না। যদি আমার ভাগ্য এরূপ হয়, যে নানা লোকের নানাপ্রকার দোষ আমার চক্ষে পড়ে, ও তাহাদের সমালোচনা করিবার আমার যথেষ্ট সুবিধা হয়, তাহা হইলে বুঝিবে দেবতারা আমার প্রতি খুব সুপ্রসন্ন, এবং আমার ধর্ম্মময় হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। অনেক অপরিপক্ক বুদ্ধি লোক আছেন যাঁহারা পরনিন্দার প্রতি খড়্গহস্ত। দাঁত থাকিতে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। পরনিন্দা উঠিয়া গেলে সমাজের যে কি দুর্গতি হইবে, সমাজ থাকিবে কিনা, বাবুদের যদি এ কথাটা বুঝিবার শক্তি থাকিত, তাহা

হইলে আর ভাবনা কি ? ভরসার বিষয় এরূপ অদূরদর্শী লোকের দল আজও প্রবল হয় নাই। তাহা হইলে তাহারা সভা করিয়া পরচর্চ্চা উঠাইয়া দিত। আজও জগতে সূক্ষ্মবুদ্ধি সমাজনীতিবিশারদ সুপণ্ডিত অনেক আছেন। ইঁহারাই আমাদের একমাত্র আশাস্থল। ইঁহারা যতদিন আছেন, ততদিন পরনিন্দার কোন ভয় নাই, এই ভরসায় বুক বাঁধিয়া প্রবন্ধ শেষ করা গেল।

দ।

রামপ্রসাদ কিন্তু বৈ।

ম্য দূর হই

সম্প্রতি নব্যভারত পত্রিকায় (৮ পাইল ।৩০২) "রামপ্রসাদ"শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকরূপ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে "কল্পনাপ্রিয় অনবধান লেখক" ও ৺ রামগতি ন্যায়রত্নকে "গড্ডলিকার" ন্যায় তাঁহার অনুকরণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন; তিনি বৈদ্যজাতির উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রুদ্ধ। এক স্থলে লিখিয়াছেন "সেই প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ কায়স্থই বঙ্গভাষার যাহা কিছু অনুশীলন করিয়াছিলেন। এক কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত বৈদ্যদিগের মধ্যে কাহাকেও এ পথে বড় দেখা যায় নাই। * * * * চিকিৎসা ব্যতীত তৎকালে তাঁহারা অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। রামপ্রসাদ বৈদ্য হইলে তাঁহাকে আমরা চিকিৎসাব্যবসায়ী কবিরাজরূপেই দেখিতে পাইতাম। গীত-রচক, গ্রন্থপ্রণেতা, জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞরূপে দেখিতে পাইতাম না।" অন্য এক স্থলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা উল্লেখ করিয়া বৈদ্যদিগের প্রতি একটু ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন—"বৃন্দাবনের শীতল ছায়ায় তাঁহার চিত্তে ত্রিদোষ চিন্তা আর ভাল লাগে নাই।" অপর এক স্থলে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"শিশুকালে মাতা মলো রাজ্য নিল পরে।" এই গীতাংশ দ্বারা তাঁহার পিতা পিতামহদিগকে জমিদার বলিয়া বোধ হয়। সে কালে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত বঙ্গদেশে বৈদ্যের জমিদারীর কথা কোন পুঁথিতে, পুস্তকে বা লোকমুখে শুনা যায় নাই। সুতরাং রামপ্রসাদ যে কায়স্থ ছিলেন তাহা নিশ্চিত।" লেখকের প্রায় সবগুলি "সুতরাং" এরই যুক্তিবল এইরূপ। লেখক বৈদ্যজাতির উপর

যেরূপ বিদ্বেষপরায়ণ, স্বজাতির উপর সেই পরিমাণেই সহৃদয়; উদ্ধৃত অংশে 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ' না লিখিয়া "কায়স্থ ব্রাহ্মণ" লিখিয়াছেন।

উদ্ধৃত লেখার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কারণ বিদ্বেষ-জনিত লেখা সমালোচনার অনুপযুক্ত। লেখক ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগকে যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বালকোচিত চাপল্য-পূর্ণ। তিনি যেরূপ লগুড় লইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার সমালোচকও সেইরূপ লগুড় লইয়া দাঁড়াইলে, পাঠকবৃন্দ কলহের চিত্রটিতে আকৃষ্ট হইতে পারিতেন। তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়াছে, এই জন্য তাঁহার বৈদ্যকে শত্রু জ্ঞান করা স্বাভাবিক হইয়াছে; এ অবস্থায় রাগের প্রত্যুত্তরে রাগ করা আমাদের ধর্ম্ম নহে, বৈদ্যসমাজ এ অবস্থায় চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

প্রথম অভিযোগ—বৈদ্যজাতি বাঙ্গলাভাষার অনুশীলন করেন নাই; ইহা অমূলক। লেখকের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস পড়া নাই। বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন জন্য বৈদ্যগণ প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে এ দেশে তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষ। বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্যও তাঁহারা কম প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই—চৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্বে পদ্ম-পুরাণের আদি লেখক, উৎকৃষ্ট কবি—বিজয়গুপ্ত বৈদ্য; কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস, ত্রিলোচন দাস, কবিকর্ণপুর, মুরারি গুপ্ত, ইঁহারা বৈষ্ণবযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার; ইঁহারা ছাড়াও বৈষ্ণব কবিগণের বহুসংখ্যক বৈদ্যজাতীয় ছিলেন—বৈষ্ণবসমাজে তাঁহাদের নাম সুপরিচিত। পরবর্ত্তী যুগে লালা জয়নারায়ণ সেন, রামগতি সেন, আনন্দময়ী গুপ্তা, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন,—বৈদ্যসমাজের কবি; বঙ্গভাষার অনুশীলনেও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ, সে কালে বৈদ্যগণ কখনও অর্থশালী জমিদার ছিলেন না। বল্লালসেন প্রভৃতিকে লেখক যাহাই মনে করুন না কেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অন্যরূপই বিশ্বাস করিয়াছেন। সে কালের চিরাগত বিশ্বাস প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রতারিত হয় নাই—এ বিষয়ে আমরা তাঁহাদের মতই প্রামাণ্য মনে করি। আবুল ফাজল লিখিয়াছেন, বঙ্গের অধিকাংশ জমিদারই কায়স্থ, তিনি খোট্টাদের মুখে শুনিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন—সে দেশে বৈদ্যসম্প্রদায় নাই। সুতরাং তাঁহাদের কায়স্থবৈদ্যদিগকে এক কায়স্থরূপেই বর্ণনা করা সম্ভব। যে সময় রামপ্রসাদ জীবিত, তখনই মহারাজ রাজবল্লভের অতুল্য কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—আজ কীর্ত্তিনাশার জলে সেই শিল্প-নৈপুণ্য-

পূর্ণ বিবিধ রত্নমণ্ডিত অসংখ্য মন্দির চূড় বিলীন হইয়াছে ;—অথবা এত কথাই বা কেন ? সামান্য "রাজ্য নিল চোরে" কথা হইতে বঙ্গদেশের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রতি এরূপ অনুদার কথার উদয় হয় কেন ? ইহা সামান্য ভদ্রতার নিয়ম বিরুদ্ধ।

তারপর রামপ্রসাদের কথা ; লেখকের যুক্তিগুলির একটিও আমাদের নিকট সমীচীন বোধ হয় না। তিনি রামপ্রসাদের কয়েকটি ভণিতায় দাস রামপ্রসাদ পাইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি কায়স্থ। এ বিষয়ে তাঁহার অন্য কোনও প্রমাণ নাই। অন্য যে কয়েকটি অনুমান উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বাতুলের ন্যায় ; যথা—(১) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈদ্য-কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া আর কেহ নাই, সুতরাং রামপ্রসাদ বৈদ্য-কবি নন। (২) রামপ্রসাদের উপাধি 'কবিরঞ্জন' কিন্তু বৈদ্যগণের উপাধি কবিরাজ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। (আমরা ইতিপূর্ব্বে কবিকর্ণপুরের উল্লেখ করিয়াছি।) সুতরাং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বৈদ্য নহেন। (৩) রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"রাজ্য নিল চোরে"—রাজ্য অর্থাৎ ভূমি কায়স্থ ভিন্ন আর কাহারও ছিল না, সুতরাং রামপ্রসাদ নিশ্চিতই কায়স্থ। উল্লেখমাত্রই এই তিন যুক্তির অসারতা দৃষ্ট হয়—আমরা এ বিষয়ে আর কিছু বলা সঙ্গত মনে করি না।

রামপ্রসাদের ভণিতায় 'দাস রামপ্রসাদ' পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে লেখকের মত এই—"কায়স্থগণের ন্যায় দাস উপাধির বহুল ব্যবহার করেন বৈষ্ণবেরা * * * রামপ্রসাদ বৈষ্ণব নহেন, ঘোর শাক্ত। এই জন্য তাঁহার দাস উপাধি দর্শনে তাঁহাকে কায়স্থ জাতীয় বলিয়া নিশ্চয় করি।"

রামপ্রসাদের সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধারণ ভাবগুলি ও বিনয়-মাখা রচনা-পদ্ধতি বঙ্গীয় সমাজে এতদূর অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল যে "ঘোর শাক্ত" হইলেও রামপ্রসাদ তাহা হইতে অব্যাহতি পান নাই, তিনি দাসানুদাস, দীন, দাস, প্রভৃতি শব্দ অনেকবার ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—

"প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস, দাসীপুত্র হই ॥"

এই ভাবের ভণিতা প্রায় পত্রে পত্রে দৃষ্ট হয় ;—তাহা ছাড়া,

"কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন,
দীন দয়াময়ি দুর্গে, ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি।"

"অরসিক অভক্ত অধম লোক হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥"
"কালীর পদে, মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদ ভাসে।"
"দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয়া চরণ পাবার আশে।"
"দীন রামপ্রসাদ বলে বলে,
মা এবার কালী কি করিলি।"
"কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন।"
"দীন রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।" ইত্যাদি।

এই সঙ্গে সঙ্গে দাস রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্তও কয়েকটি পদ পাওয়া যায় ; 'দাস—দাস' 'দাসী—পুত্র' 'দীন' 'দাস' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া তিনি বৈষ্ণবের ন্যায় বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন ; এজন্য তাঁহার জাতি যায় নাই। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্রই 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন ; রামপ্রসাদের রচনায়ও এই 'শ্রী' শব্দের বহুলতা দৃষ্ট হয়, যথা,—"শ্রীমণ্ডপ" "শ্রীরঞ্জন" "শ্রীরামপ্রসাদ" "শ্রীরামদুলাল" ইত্যাদি।

বৈদ্যের মধ্যেও 'দাস' আছে ; লক্ষ্মীনারায়ণ দাস তাঁহার সহোদরাভগ্নীপতি নাও হইতে পারেন ; সুতরাং "দাস রামপ্রসাদ" হইলেই যে তিনি কায়স্থ হইবেন, এ কথার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। তাঁহার বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন সুতরাং তাঁহাকে 'বৈদ্যদাস' কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই ; 'দাস' 'দীন' "দাস—দাস" প্রভৃতি শব্দ তাঁহার বিনয়ের পরিচায়ক ; তাঁহার পদ্ধতি 'সেন'। রামপ্রসাদ বৈদ্য ছিলেন, এ কথা তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক অস্বীকার করিলে কি হইবে ? তাঁহার একটি গানের শেষ চরণ এইরূপ ;—

"কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত।" *

রামপ্রসাদ যতবার নিজকে 'দাস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে অধিকবার 'দ্বিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে ॥"

---

* কবিরঞ্জন কাব্য সংগ্রহ, যোগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা প্রকাশিত, ৮৫ পৃঃ। আমরা সমস্ত পদাংশই এই পুস্তক হইতে উঠাইয়াছি।

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে এ চরিত্র শিখলে কোথা ॥"
"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয় হলে ॥"
"দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে।"
"দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস।"
"দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাবিয়া সার।"
"বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ আছে এ মনের সাধ মা।"
"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরী ॥"
"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপালে বুঝি অগ্নি ওই।"
"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে ॥"
"দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কারে ভয়।"
"দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।"
"দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, তারা নামটি সার।"

এরূপ আরও অনেক আছে; বাহুল্য ভয়ে উঠাইলাম না। প্রবন্ধলেখক অনুমান করেন, এগুলি পরবর্ত্তী গায়কের যোজনা; বহুসংখ্যক 'দ্বিজ' শব্দ যদি গায়কদের যোজনা হয়, তবে অল্পসংখ্যক 'দাস' শব্দ না হইবে কেন?—তাঁহার যুক্তির স্থিরতা নাই।

বৈশ্যজাতি (পূর্ব্ববঙ্গের কথা বলিতেছি না) চিরকালই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং দ্বিজ লেখাতে ৺ রামপ্রসাদের কোনও অসঙ্গতি হয় নাই।

প্রবন্ধলেখক নিজে যুক্তিবলে যে ঐতিহাসিক মত গঠন করিয়াছেন, তাহার অসারতা প্রদর্শিত হইল; এখন তিনি নিজ মত প্রবল করিতে দুইটি ঐতিহাসিক খাঁটি সত্য ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আজুগোসাঞি রামপ্রসাদকে সেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আজুগোসাঞি নিশ্চয়ই ভুল লিখিয়াছেন কিম্বা তিনি কল্পিত ব্যক্তি হইবেন; ইহার অন্য কোন যুক্তি কি প্রমাণ নাই; তিনি তাঁহার মতের বিপক্ষ সকলকেই মিথ্যুক বলিবেন, এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিবেন। রামপ্রসাদের বংশধরগণ এখনও আছেন—তাঁহারা এ রামপ্রসাদ নয়, অন্য কোন রামপ্রসাদ হইতে উদ্ভূত। এই সব অলৌকিক যুক্তির সহায়ে তিনি যে ননীর মন্দির উঠাইয়াছেন, তাহা আলোকে আপনিই গলিয়া পড়িবে; ইহা ভাঙ্গিতে কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই।

কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়া কবিগণের জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ বেশী প্রাচীন লেখক নহেন; গুপ্তকবির সময় এই ব্যবধান আরও অল্প ছিল; কবিবরের বিশেষ পরিশ্রম ও পর্য্যটনের ফলে যে সব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঘরে বসিয়া একখানা পুস্তকের দুপাতা উল্টাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অবমাননাসূচক ভাষায় মত প্রচার করিতে কণ্ঠ উত্থিত করিতে যাওয়া সমীচীন নহে; রামপ্রসাদের বাড়ী "কুমারহট্ট" এ কথা প্রবন্ধলেখক অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া এরূপ করার কোনও কারণ দেখিতে পাইলাম না।

কীর্ত্তন।

ঐ গান গে'তে গে'তে চলে' যায়
পথে পথে কেরে নদীয়ায়;
ও কে নেচে নেচে চলে, মুখে হরি বলে;
ঢলে' ঢলে' পাগলের প্রায়।

সে কে যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু, প্রেম যেচে যেচে,
সে কে দেবতা ভিখারী মানবের দ্বারে;—
দেখে যা'রে তোরা দেখে যা এ;

সে যে বলে "কৈ ত কেউ পর নাই"
সে যে বলে "সবাই যে নিজ ভাই"।
সে যে বলে "শুধু হেসে, শুধু ভাল বেসে
আমি ভ্রমি দেশে দেশে, প্রাণ চায়"
ও কে গান গে'তে গে'তে [ইত্যাদি]

ও কে প্রেমে মাতোয়ারা, চ'খে বহে ধারা,—
কেঁদে কেঁদে সারা—কেন, ভাই?
ঐ দ্বেষহিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি,
ও তার ধূলি মাথা দুটি—রাঙ্গা পায়;

বলে "ছেড়ে দেও মোদের, চলে' যাই,—
নয় যে প্রভু তোমার প্রেমে গলে' যাই ;—
এ যে নূতন মধুর প্রণয়ের পুর,
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?"

ঐ নরনারী সব পিছে ধায় ;
ঐ জয়ধ্বনি উঠে নীলিমায় ;
তোরা আয় সবে চলে', মুখে 'হরি' বলে',
ও তোদের ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে' আয়।
ও কে গান গে'তে গে'তে [ইত্যাদি]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সর্পবিষ।

কথিত আছে, রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। কুক্ষণে আস্তীক-মুনি সর্পযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও প্রতিবর্ষে সর্পযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেছেন। রাজা জনমেজয়ের চেষ্টা সফল হয় নাই এবং আমাদের বর্ত্তমান রাজা বিস্তর পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়াও আমাদিগকে নিরাপদ করিতে পারেন নাই।

গত ইং ১৮৯৩ সালে কেবল বঙ্গদেশে প্রায় ৫৫,৭০০ সর্প নিহত হইয়াছে। অবশ্য কেবল বিষধর সর্প মারিতে রাজার আজ্ঞা। তথাপি ঐ বৎসরে বঙ্গদেশে প্রায় এগার হাজার লোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আর, সকল সংবাদই কি রাজার গোচর হয় ?

প্রায় দেড় হাজার জাতীয় সর্প আছে। বৈজ্ঞানিকেরা সর্পকুল নয়টী পরিবারভুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবারের দুই চারিটী জাতি ভারতে বসতি করিতেছে। এক এক জাতীয় কত সর্প আছে! পোড়াইয়া কিম্বা মারিয়া সর্পকুল নির্ম্মূল করা অসম্ভব। সুখের বিষয়, সকল সর্পই বিষধর নহে ; সকলগুলি বিষধর হইলে ভারতভূমিতে তাহারাই রাজ্য করিত।

বিষধর সর্প। কোন্ সাপ সবিষ, আর কোন্ সাপ নির্বিষ, তাহা দেখিবামাত্র চিনিবার উপায় নাই। যিনি সমুদয় সর্প দেখিয়াছেন, সমুদয় সর্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই কেবল কোন্টা বিষধর, আর কোন্টা নয়, বলিতে পারেন।

সবিষ ও নির্ব্বিষভেদে পূর্ব্বে সর্পকুল দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত। কিন্তু অনেক সর্পের বিষে মানুষের বা অপর কোন বড় প্রাণীর বড় একটা কিছু হয় না। কোন কোনটা শিকার গলাধঃ করিবার সময় তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। বাস্তবিক, সবিষ ও নির্ব্বিষ, এই দুই শ্রেণীতে সর্পকুল বিভাগ করা অবৈজ্ঞানিক।

তবে একটা স্থূল উপায় এই। বিষকোষে সর্পবিষ সঞ্জাত হয়। এই বিষকোষ চক্ষুর পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত। বিষকোষ হইতে বিষদন্ত পর্য্যন্ত একটা নালী আছে। আবার বিষদন্তেও একটা নালী আছে। কামড়াইবার সময় সেই বিষকোষ বা বিষের থলিটি নিষ্পিষ্ট হয়। তখন তথা হইতে প্রথমে বিষদন্তমূলে, পরে তথা হইতে বিষদন্তের নালী দিয়া দষ্টস্থানে বিষ আসিয়া পতিত হয়।

অতএব যে সকল সর্পের দাঁতে নালী থাকে, সে গুলিই বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয়। যদি কোন সর্প বিষাক্ত বলিয়া জানা না থাকে, তাহার দন্তে নালী দেখিলে, তাহাকে বিষাক্ত বলিয়া সন্দেহ করা কর্ত্তব্য। কেন না নালী আছে, অথচ নালীর ক্রিয়া নাই, এরূপ না হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু সর্প কামড়াইলে কে তাহার বিষদাঁত বা বিষনালী দেখিতে যাইবে ? একটা সহজ লক্ষণ জানা থাকিলে, অনেক স্থলে বৃথা আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার ফেরার সাহেব আমাদের দেশের অনেক সর্প পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি একটা সহজ লক্ষণ বলিয়াছেন। এই লক্ষণটা অধিকাংশ বিষধর সম্বন্ধে ঠিক।

লক্ষণটা এই। আমাদের মুখের নীচে এক পাটী এবং উপরে এক পাটী দাঁত আছে। অর্থাৎ মোট দুই পাটী দাঁত। কিন্তু সর্পের তিন পাটী দাঁত আছে। মুখের নীচে এক পাটী এবং উপরে দুই পাটী। উপরের দুই পাটীর মধ্যে আমাদের মত মুখের সম্মুখে এক পাটী এবং কিঞ্চিৎ ভিতরে তালুতে আর এক পাটী। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিষধরের মুখের উপরের দুই পাটীর সম্মুখের পাটী না থাকিয়া তাহার জায়গায় দুই চারিটা মাত্র দাঁত আছে। এই দাঁতগুলিই বিষদাঁত। সুতরাং কোন সর্প কামড়াইলে যদি ভিতরে ও বাহিরে দুই সারি দাঁতের চিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে

তাহা বিষাক্ত নহে, মনে করা যাইতে পারে। এইরূপে ঢেমনা সাপ কামড়াইলে বাহিরে ও ভিতরে দুই সারি দাঁতের দংশন চিহ্ন দেখা যাইবে।

গোক্ষুর, চন্দন বা উলুবোড়া সম্বন্ধে এ নিয়মটা ঠিক। কিন্তু কোন কোন সাপের বিষদাঁত আছে, অথচ তাহাদের বিষ মারাত্মক নহে। আবার, সমুদ্রের লোণা জলে এক প্রকার সাপ আছে। তাহাদের বিষদাঁত এত ছোট যে কামড়াইলে বিষদাঁতের ও অপর দাঁতের চিহ্ন একই রকম দেখায়। অথচ তাহাদের দংশন মারাত্মক হইতে পারে।

বাসস্থান ভেদে সর্পকুল নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে যেগুলি বিষাক্ত বলা গেল, সেগুলি বঙ্গদেশের সর্প সম্বন্ধে ঠিক মনে করিতে হইবে। *

১। গাছের সাপ। ইহাদের অধিকাংশের দেহ সবুজবর্ণ। ইহাদের মধ্যে সবিষ ও নির্ব্বিষ উভয় বিধ সর্পই আছে।

২। জলের সাপ। মিষ্ট জলের সাপ বিষাক্ত নহে। লোণা জলের সাপ বিষাক্ত। লোণা জলের সাপ গুলার লেজ মাছের লেজের মত চেপটা।

৩। ডাঙ্গার সাপ। আমাদের দেশের অধিকাংশ সর্প এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ইহাদের দণ্ডাকার দেহ বাঁকাইতে পারে।

৪। গর্ত্তের সাপ। ইহারা গর্ত্তে বাস করে। ইহাদের মুখ ও লেজ ছোট। দেহ বাঁকাইতে পারে না। ইহারা বিষাক্ত নহে।

এই বিভাগটা নিতান্ত স্থূল ভাবিতে হইবে। কেন না, কোন কোন সাপ মাটির উপর ডাঙ্গায় বাস করিলেও সময়ে সময়ে জলে প্রবেশ করিতে পারে। আবার গাছের সাপ ও ডাঙ্গার সাপ কখন কখন স্থান পরিবর্ত্তন করে।

গোক্ষুরের ফণা দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যে সাপের ফণা নাই, সেটা বুঝি বিষধর নহে। বলা বাহুল্য, কথাটা ঠিক নহে। সাপের ফণা ও মস্তকের গঠন ধরিয়া বঙ্গদেশের বিষধরের একটা বিভাগ দেওয়া গেল।

ক। দেহ ও শিরঃ প্রায় দণ্ডাকার, লেজ ক্রমশঃ সরু, চক্ষুতারা গোল।

১। বিষদাঁত ব্যতীত বাহির সারিতে অপর কোন দাঁত নাই। এরূপ সাপ বঙ্গদেশে নাই। আসামে আছে।

* Thanatophidia of India by Sir Joseph Fayrer, M. D.

২। বিষদাঁত ব্যতীত বাহির সারিতে দুই একটা অপর দাঁত আছে।

(১) ফণাযুক্ত......শঙ্খচূড়, গোক্ষুর, (কেউটে)

(২) ফণাহীন......শঙ্খিনী, ধোমনচিতি।

খ। শিরঃ ত্রিকোণাকার, লেজ ক্ষুদ্র, চক্ষুতারা লম্বা।

১। চক্ষু ও নাসিকার মধ্যস্থলে গর্ত্ত নাই। উলুবোড়া বা চন্দনবোড়া।

২। চক্ষু ও নাসিকার মধ্যস্থলে গর্ত্ত আছে। লাউডগা? আমেরিকার র‍্যাটেল স্নেক এই শ্রেণীর।

দেশভেদে গাছপালার জীবজন্তুর নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। তার উপর, অধিকাংশ সাপের বাঙ্গালা নাম নাই। উলুবোড়াকে কোথাও বা চন্দন বোড়া, কোথাও বা শিয়াচন্দর বা শ্রীচন্দ্র বলে। ফেরার সাহেবের মতে গোক্ষুর, শঙ্খচূড় এবং উলুবোড়া একই রূপ ভয়ানক। আমরা সচরাচর গোক্ষুর ও কেউটেকে দুই জাতীয় মনে করি। কিন্তু নিগ্রো, চীনে, ইংরাজ প্রভৃতি যেমন এক জাতীয় মনুষ্য, সেইরূপ গোক্ষুর ও কেউটেও এক জাতীয় সর্প। গোক্ষুরাদির বড় বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেই নিরাপদ মনে করা উচিত নহে। কেন না, বিষদাঁতের মূলের নিকট কতকগুলি অপরিণত ছোট ছোট দাঁত থাকে। বড় বিষদাঁত গুলি ভাঙ্গিয়া গেলে এই অপরিণত দাঁতগুলি বাড়িয়া উঠে। বিষধরের বিষদাঁতই জীবিকা সংগ্রহের সহায়। কোন ক্রমে একবার ভাঙ্গিয়া গেলে সে আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহ করিবে কি রূপে?

সর্প-বিষ। মালেরা কি প্রকারে সর্পবিষ সংগ্রহ করে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বিষধরকে রাগাইয়া তাহার মুখের নিকট কলাপাতা ধরে। সেই পাতায় সর্ষপ-তৈলের মত এক পলা বিষ নিক্ষিপ্ত হয়। উহা ঈষৎ হরিদ্রাভ দেখায়। গোক্ষুরবিষ জল অপেক্ষা কিছু ভারি, উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৫৮। শুকাইয়া রাখিলে বহুকাল পর্য্যন্ত বিষের মারাত্মক গুণ নষ্ট হয় না। শুষ্কবিষ হরিদ্রাভ দানা দানা দেখায়। ২১ বৎসরের পুরাতন বিষ প্রাণিশরীরে প্রবিষ্ট হইলেও প্রাণীটি মরিয়া যায়।

সদ্যোনির্গত সর্পবিষে ভূরি ভূরি অণুজীব দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল অণুজীব মারাত্মক নহে। সর্পমুখের লালায় ঐ সকল অণুজীব থাকে। বিষ পতিত হইবার সময় অণুজীবও তৎসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়ে।

এখন কথা এই, সর্পাবিষে এমন কি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা প্রাণ বিনষ্ট হয়? পূর্ব্বে কেহ কেহ মনে করিতেন, যেমন মৃত প্রাণীর গলিত দেহে এক প্রকার বিষ (ptomaine) থাকে, সর্পবিষেও তাহাই থাকে। কিন্তু ইহা সকলে স্বীকার করেন না।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে গোক্ষুর বিষের উপাদান এই।

১০০ ভাগ সদ্যানির্গত বিষে

৭২ ভাগ............জল

২৮ ভাগ............কঠিনাংশ

১০০ ভাগ শুষ্কবিষে

৫৩	,,	অঙ্গারক
১৮	,,	সোরাজনক
৭	,,	জলজনক
২০	,,	অম্লজনক ও গন্ধক
২	,,	ভস্ম
১০০	,,	

যাবতীয় প্রাণীশরীরে প্রোটীড (Proteid) বলিয়া এক প্রকার পদার্থ আছে। ডিমের শাদা জিনিসটা প্রধানতঃ ঐ পদার্থ। উহার রাসায়নিক উপাদান এই।

৫২-৫৫ ভাগ...অঙ্গারক

১৫-১৭ ,, ...সোরাজনক

৭ ,, ...জলজনক

২১-২৯ ,, ...অম্লজনক

৩---২ ,, ...গন্ধক

ঐ দুই তালিকা দেখিলে বিষ ও ডিম্বশ্বেত উপাদানে প্রায় এক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। তবে প্রভেদের মধ্যে বিষে অপেক্ষাকৃত অধিক সোরাজনক পদার্থ থাকে।

অধ্যাপক মিচেল সাহেব বিষকে দুই প্রকার প্রোটীডে পৃথক করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটা গ্লোবুলিন (Globuline) অন্যটা পেপ্‌টোন (Peptone)। গ্লোবুলিন সিদ্ধ করিলে জমিয়া কঠিন হয় এবং উহা জলে

দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু পেপ্‌টোন অল্লক্ষণ সিদ্ধ করিলে জমিয়া যায় না এবং উহা জলে মিশ্রিত হয়। এই পেপ্‌টোনই নাকি বিষের মারাত্মক অংশ।

আমাদের শরীরের রক্তেও প্রোটীড আছে। সুতরাং যে দ্রব্যে বিষের গুণ নষ্ট করিবে, তদ্দ্বারা দেহের রক্তও বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। বিষের প্রোটীড নষ্ট করিবে অথচ রক্তের প্রোটীড নষ্ট করিবে না, এমন দ্রব্য না থাকারই সম্ভাবনা। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিষ সিদ্ধ না করিলে উহার গুণ নষ্ট হয় না। ডাক্তার ফেরার অনেক গাছ গাছড়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, অনেক ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সর্পদংশনের ঔষধ নাই।

সাপে নেউলে কি প্রকার ভাব, প্রবাদেই তাহার প্রমাণ। অনেকে মনে করেন যে, সর্পবিষে নেউলের কিছু হয় না। ফেরার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সর্পবিষ অধিক মাত্রায় নেউলের রক্তে মিশ্রিত না হইলে, নেউলের বড় একটা কিছু হয় না। নেউলের গায়ের লম্বা লম্বা ঘন লোম উহার শরীরে বেশী মাত্রায় বিষ প্রবেশের অন্তরায়। এই জন্য বিড়ালও সহজে মারা পড়ে না। তবে সর্পবিষ নেউলের রক্তে মিশ্রিত হইলে, উহার রক্ষা নাই।

ঢেমনাসাপ নির্ব্বিষ। কিন্তু ঢেমনা সাপকে গোক্ষুর কামড়াইলে ঢেমনা সাপের কিছুই হয় না। এই জন্যই বোধ হয় মালেরা মনে করে যে, নর-গোক্ষুর নাই। নরঢেমনাই নারী-গোক্ষুরের সহিত সঙ্গত হয়। বলা বাহুল্য অনুমানটা ঠিক নহে। গোক্ষুর সাপের নর নারী উভয়ই আছে।

রক্তের সহিত সর্পবিষ মিশ্রিত না হইলে, শরীরের তত ক্ষতি হয় না। উদরে কোন স্থানে ক্ষতাদি না থাকিলে সর্পবিষ পেটে গেলেও নাকি বড় একটা কিছু হয় না। কিন্তু ফেরার সাহেব দেখিয়াছেন যে, Mucous Membrane দিয়াও বিষ শোষিত হইতে পারে। সুতরাং ক্ষত না থাকিলেও বিষ পেটে গেলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

রক্তের সহিত বিষ দ্রুতবেগে মিশ্রিত হয়। এ জন্যই এত শীঘ্র সর্প দংশনে লোক মারা পড়ে। রক্তে যে সকল কোষাণু (blood corpuscles) আছে, তৎসমুদায় পিণ্ডীকৃত হয় এবং নির্গত রক্ত আর জমিয়া যায় না। লোকে ইহাকেই বলে যে, রক্ত জল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফেরার সাহেব

বলেন যে, গোক্ষুর সাপে কামড়াইলে রক্ত জল হয় না, চন্দন বোড়া কামড়াইলেই রক্ত জল হয়।

সর্প বিষ সম্বন্ধে ফ্রেজার সাহেবের পরীক্ষা। নিজের দেহ কামড়াইলে বিষধরের কিছুই হয় না। আবার কোন গোক্ষুর অপর গোক্ষুর বা কেউটেকে কামড়াইলে ইহাদের কিছুই হয় না। বাস্তবিক যাহার নিজের বিষ আছে.অপর বিষে তাহার বড় একটা কিছুই হয় না। সম্প্রতি ডাক্তার কানিংহাম সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অনেক নির্ব্বিষ সাপও গোক্ষুর বিষে প্রাণত্যাগ করে না। ঢেমনা সাপ ইহার দৃষ্টান্ত, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু যাহার বিষের তেজঃ যত, অপর বিষে তাহার তত কম অনিষ্ট হয়। যাহা হউক বিষধরের রক্তে এমন কোন পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা বিষের মারাত্মক গুণ ব্যর্থ হয়। এমন কি, অল্পদিন হইল, ফ্রেজার সাহেব দেখিয়াছেন যে, যে শশককে সর্প বিষের টীকা দেওয়া হইয়াছে, সর্পবিষ ব্যতীত অন্যান্য বিষেও তাহার সহজে বড় একটা কিছু হয় না।

কয়েক বৎসর হইতে ফ্রেজার সাহেব এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সর্পবিষের ঔষধ আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন। বহুকষ্টে তিনি সর্পবিষ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে সর্পবিষ সংগ্রহ করিতেছিলেন। গত বৎসর তিনি পরীক্ষার উপযুক্ত পরিমাণ বিষ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পরীক্ষার প্রথম ফল এই যে, অল্প পরিমাণ সর্পবিষ কোন প্রাণীর দেহের রক্তের সহিত মিশ্রিত থাকিলে, তখন তাহা অধিক পরিমাণ সর্পবিষ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। তিনি প্রথমে শশক লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। কত অল্প পরিমাণ বিষে শশকের মৃত্যু ঘটে, তাহাই তাঁহার প্রথম পরীক্ষার বিষয় ছিল। এই পরিমাণ স্থির হইলে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ বিষ শশক দেহে প্রবেশিত করিলেন। অবশ্য ইহাতে শশকের মৃত্যু হইল না। দশদিন পরে পরে বিষের পরিমাণ অল্পে অল্পে বাড়াইয়া সেই শশক দেহে প্রবেশিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দেখিলেন যে, মারাত্মক পরিমাণ অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ অধিক বিষ একেবারে সেই শশক দেহে প্রবিষ্ট হইলেও তাহা অনায়াসে সহ্য হইল! অর্থাৎ তাহার শরীরে এখন এত বিষ প্রবেশ করিল যে, তাহাতে তাহার মত ৫০টি শশকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইত।

বস্তুতঃ অত বিষেও তাহার অনিষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে বরং তাহার শরীর

হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে একবার একটা শশকের শরীরে এত বিষ প্রবেশিত করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ বিষে সেই শশকের আকারের ও ওজনের মত ৩৭০টা শশক মরিয়া যাইত। পরে তিনি অশ্ব ও বিড়ালেও এই বিষসহতা গুণ প্রমাণিত করিলেন।

কিন্তু কতদিন পর্য্যন্ত সর্পবিষের টীকার গুণ থাকে? এ সম্বন্ধে এখনও বড় একটা কিছু জানা যায় নাই। তবে একটা শশকে দেখা গিয়াছে যে, অন্ততঃ ২০ দিন পর্য্যন্ত শশকের সর্পবিষসহতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার দ্বিতীয় পরীক্ষা এই। কোন প্রাণীর রক্ত বাহির করিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে একটা রস বা জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই রসকে বিজ্ঞানে সিরাম (serum) বলে। ইহাকে রক্তের জলীয় অংশ বলা যাইতে পারে। তিনি একটা প্রাণীর দেহে সর্পবিষ প্রবেশিত করিয়া তাহার রক্ত বাহির করিলেন। সর্পবিষ প্রবেশ বশতঃ সেই প্রাণীটা সর্পবিষসহ হইয়াছিল। ইহার রক্তের সিরাম লইয়া তাহার সহিত নূতন বিষ মিশ্রিত করিলেন। পরে এই বিষমিশ্রিত সিরাম অপর একটা প্রাণিদেহে প্রবেশ করাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইহাতে সেই প্রাণীর কোন অনিষ্ট হইল না। অতএব সর্পবিষসহ সিরামে নূতন বিষের মারাত্মক গুণ নষ্ট হয়।

এই সিরামের নাম তিনি আণ্টিবেনিন (antivenene) বা প্রতিবিষ রাখিয়াছেন। এখন তিনি একটা নূতন প্রাণীর শরীরে প্রথমে প্রতিবিষ এবং অনতিবিলম্বে নূতন বিষ প্রবেশিত করিলেন। কিন্তু ঐ প্রতিবিষে বিষের গুণ বিনষ্ট হইল। আর একটা প্রাণীদেহে প্রথমে বিষ প্রবেশিত করাইয়া যখন বিশের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন প্রতিবিষ প্রয়োগ করিলেন। তিনি দেখিলেন তৎক্ষণাৎ বিষের লক্ষণ তিরোহিত হইল এবং প্রাণীটাও পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইল। অতএব যে প্রাণিশরীর সর্পবিষসহ হইয়াছে, তাহার রক্তের সিরাম সর্পবিষের ঔষধ স্থির হইল। এই সিরাম শুষ্ক করিয়া রাখা যাইতে পারে।

এখন বাকি, ঐ প্রতিবিষের উপাদান নিরূপণ। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার আবিষ্কৃত প্রতিবিষের উপাদান জানিতে পারিলে অপরাপর ঔষধের ন্যায় সর্পবিষের ঔষধ বোতলে বোতলে বিক্রয় হইবে। কবে সে দিন আসিবে? ফ্রেজার সাহেবের আবিষ্কৃত প্রতিবিষ জলের সহিত মিশ্রিত

হয়। সর্প দংশনের পর সেই প্রতিবিষ জলের সহিত মিশাইয়া দেহে প্রবেশিত করিতে হইবে।

সম্প্রতি কানিংহাম সাহেব আলিপুরে সর্পবিষের কয়েকটি ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্লীচিং পাউডার (bleaching powder) এবং গোল্ড ক্লোরাইড্ (gold chloride) পদার্থদ্বয়ের সর্পবিষের তেজঃ খর্ব্ব করিবার গুণ প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুই পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। সর্পদষ্ট-স্থানের নিকটে উহাদের জল প্রবেশিত করিলে বিষের উগ্রতা খর্ব্ব হয়। কিন্তু তিনি দেখিয়াছেন যে, বিষ দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে এতদ্দ্বারা কোন ফল হয় না।

যাহা হউক, সর্পবিষের ঔষধ আবিষ্কারের নিমিত্ত এখন যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, আশা হয় অচিরে তাহাতে পরীক্ষকগণ সফলমনোরথ হইবেন। কি চিকিৎসক কি অপর লোক, সকলেরই সর্প-দংশনের ঔষধ জানিবার আগ্রহ আছে। কিন্তু ভ্রমে পড়িয়া টোট্‌কা, গাছগাছড়া, মন্ত্র তন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত থাকেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কেরল।

(১)

আমরা এক্ষণে দক্ষিণাপথের মালভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া মলয় পর্ব্বতে বিহার করিতেছি। বামে পশ্চিম ঘাট কুলপর্ব্বত; এক খানির পর আর এক খানি স্তূপ অগ্রসর করিয়া দিতেছে। গিরিপরম্পরা মধ্যে কাকডিম্বাভ মেঘমণ্ডল আনত হইয়া রহিয়াছে। ক্বচিৎ এক একখানি অখণ্ড প্রস্তরশৈল দৃষ্ট হইতেছে। পর্ব্বত খুদিয়া দেবালয় নির্ম্মাতা কোন নরপতিকে পাইলে ইহা একটি দিব্য দর্শনীয় স্থান করিয়া তুলিতে পারা যাইত। সত্য বটে—

"সুচন্দন বনোদ্দেশো
মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ।"

কিন্তু আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় মলয়ানিলে চন্দনের সৌরভ পাইয়া পুলকিত হইতেছে না। মলয়ার দেশের বনে যে চন্দন জন্মে তাহা সুগন্ধি নহে। কর্ণাটে কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান-সন্নিহিত ভূভাগ সদ্গন্ধশালী চন্দনের আকর। শকটশ্রেণী নিবিড় বন ভেদ করিয়া চলিয়াছে, জনসমাগমের চিহ্ন নাই। পূর্ব্বে সৌহার্দ্দ আশ্রয়-ভবনে বন্যহস্তী ও বাইসন্ আসিয়া উপস্থিত হইত। ক্রমে "বাজরা" শ্রেণীর "কম্বু" বা "রাগী" শস্যক্ষেত্র ও কচ্ছবিরহিতা স্ত্রীকুল সম্মুখীন হইল। গ্রামবাসীর পালিত হস্তী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কল্য আমরা কর্ণাটে ছিলাম। রজনী প্রভাতা হইলে দৃষ্ট হইয়াছে, আমরা দ্রবিড়ে, অধুনা কেরলে উপনীত হইয়াছি। দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নাবয়ব। ফলবান বৃক্ষবাটিকার অন্তরে মধ্যে মধ্যে উচ্চ দেহবিশিষ্ট বাঙ্গালার তৃণাচ্ছন্ন গৃহের মত তালপত্র আচ্ছাদিত বাসস্থান। ধান্যক্ষেত্রে কটিবসনা স্ত্রীজাতি দণ্ডায়মান।

তুলামাসের শেষ দিন উপলক্ষে উৎসবের জন্য নিকটবর্ত্তী জনপদের বহুলোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাহারা এই ট্রেনে উঠিলেন। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর শকটে দুইটি পুরুষ ও একটি কিশোরীসহ মহিলা উঠিয়াছেন। মলয়ারি পুরুষটীর মস্তকের মধ্যস্থলে শিখা; শিরের অপর ভাগ ও শ্মশ্রু গুম্ফ মুণ্ডিত। তাহার কর্ণে ক্ষুদ্র লিপ্ত কুণ্ডল আছে। পরিধানে কৌপীনসহ বহির্বাস। বৈদেশিক প্রভাবে কোট্ ও টুপি ধারণ করিয়াছেন। স্ত্রীর পরিধান পুরুষের মত, মস্তকে চিকুরদাম চূড়ার ভাবে সজ্জিত, শ্বেত বস্ত্রখণ্ড মস্তকোপরি হইতে গাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে; কর্ণে সুবৃহৎ হিরণ্যকর্ণিকা কর্ণপত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ত্বকের পরিধি মধ্যে অবস্থান করিতেছে। গলে সুবর্ণ মাল্য; মণিবন্ধ অলঙ্কারবিহীন।

সোরন্নুর ষ্টেষণে অবরোহণ করিয়া গো-যানে উঠিতে হইল। কুচ্চি এখান হইতে ৩৬ ক্রোশ। সুরী নদীর উপর সেতু আছে। পরপার হইতে বোধ হয় কুচ্চিরাজ্য আরম্ভ হইল। ত্রিচুরের পথ অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছে। বনদেবীগণ অনাবৃতবক্ষে সঞ্চরণ করিতেছেন, আমাদের সেদিকে চাহিতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করেন না। কোন যুবতী কাষ্ঠশিরে মন্দগতিতে আসিতেছেন, কেহ বা অন্য কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতেছেন। সৌন্দর্য্যের ছাঁচগুলি নিটোলভাবে দেহযষ্টি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। নগ্নমাধুরী বীভৎস না হইলে বিশেষ তৃপ্তিকর হয়। আমার সহচর অবাক্ হইয়া গেলেন, আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, সভ্যতার ছলনা অদ্যাপি এখানে প্রবেশ করে নাই। যে ব্যবহার দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহা কেন লজ্জাকর হইবে? পূর্ব্বে থিরুবাঙ্কোড়ে রাজ

সমক্ষে নায়ারসীমন্তিনী বক্ষ আবৃত রাখিলে অসম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে বলিয়া গণ্য হইত।

তাপাসহিষ্ণু মলয়ারিগণ তালপত্রের আতপত্র পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন। কেরল-ভূপতি পর্য্যন্ত তালপত্রের ছত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। খদিরবিহীন তাম্বুল সেবনার্থ অপক্ব শুপারি কর্ত্তন ও লিখনসৌকর্য্যের জন্য এক থানি ক্ষুদ্র ছুরিকা কটিসংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। সৎপথের উভয় পার্শ্বে নাজারা (খৃষ্টান) গণের বসতি ও পণ্যবীথিকা। তাহারা যে বৈদেশিকভাবে অনুপ্রাণিত, অঙ্গনাগণের গাত্রাবরণ জামা সে সাক্ষ্য দিতেছে। বালিকারা কর্ণপত্রের ছিদ্র চতুরঙ্গুলি পরিমিত করিবার জন্য দুইটী করিয়া সীসক চক্র আলম্বিত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের নিদ্রাকালে রাত্রি একটার সময় গাড়ি থামিল। চালক "কোকাল" "কোকাল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ব্যাপারটী কিছুতেই আমাদের বোধগম্য করাইতে না পারিয়া সে নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ হিন্দীভাষাভিজ্ঞ এক মুপ্পালা (মুসলমান) বালককে নিদ্রোত্থিত করিয়া সমভিব্যাহারে আনিল। কথাটি এই যে এ স্থানের নাম কোকাল, এখান হইতে "উড়ী" (উড়ুপ) যোগে কুচ্চি যাইতে হয়।

ঊষার আলোক প্রকাশিত হইলে নদীবক্ষে শতাধিক দ্রোণীর ছবি দৃষ্ট হইল। ইহা দ্বারা কুচ্চি হইতে দ্রব্যজাত আনীত ও প্রেরিত হইয়া থাকে। কুচ্চি ও থিরুবাঙ্কোড়ের বৃটিষ্ রেসিডেন্ট্ ত্রিচুরে বাস করেন। তদীয় দুইখানি তরণী সজ্জিত রহিয়াছে। টিপু সুলতান মালয়ার আক্রমণ করিলে জিমরিণ্ স্বকীয় তাবৎ বলক্ষয় করিয়া দেশত্যাগ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু কুচ্চিরাজ বলবানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন; এ জন্য অদ্যাপি রাজদণ্ড ধারণ করিতেছেন। সকল অবস্থায় স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ নহে।

এদেশে সরিতের প্রাচুর্য্য হেতু নদীর বিশেষ নাম নাই। তীরবর্ত্তী স্থানের নামানুসারে প্রবাহের সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আমরা তণ্ডুল ও চিপিটকাদি সংগ্রহ করিয়া কুচ্চি যাত্রা করিলাম। মিষ্টান্নের মধ্যে নারিকেল লড্ডুক পাইয়াছিলাম। তাহা নাজারার নিকট ক্রীত হইয়াছে সন্দেহ হওয়ায় নিক্ষেপ করিতে হইল। সমুদ্র-বেলার পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রণালী-পথে দ্রোণী খানি মৃদু হিল্লোলে যষ্টিভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি শ্যামল ছবিখানির

বিস্তার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের পূর্ব্বদিন আহার না হওয়ায় সেদিকে লুব্ধদৃষ্টি নিপতিত হইল না। কোথায় উপযুক্ত ভূমি মিলিবে, এই চিন্তা হইতেছে, এমন কালে অনুকূল বায়ু উপস্থিত হওয়ায় নাবিক পাল তুলিয়া দিল। আমরা অপরিচিত স্থানে যে অজ্ঞাতকুলশীলকে সহায় করিয়া চলিয়াছি, তাহার সহিত ইঙ্গিত ভিন্ন কথোপকথনের উপায় না থাকায় অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে হইয়াছে। অবশেষে এক "ধানমারি" (নিম্নভূমি)তে অবতরণ করিয়া নারিকেল আম্র পনসের উদ্যানে পাকের আয়োজন করা হইল।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বাঙ্গালার মত। প্রাবৃট্ কালে ভূমি জলমগ্ন হয়; জল অপসৃত হইলে বিবিধ ধান্য বপন হইয়া থাকে, কোনটী সার্দ্ধদ্বিমাসে, কোনটি বা চারি মাসে পক্ব হয়। যাহা ষণ্মাসে পরিপক্ব হয়, তাহার শস্যমঞ্জরীতে চৌদ্দটী, আর যাহা সার্দ্ধ দুই মাসে পাকে, তাহাতে সাতটি বীজ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক ভূমিতে বৎসরে দুইবার শস্য জন্মে।

আহারান্তে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, নারিকেল উদ্যানের শোভা, ততই গভীর হইয়া আসিতেছে। ক্ষুদ্র তটিনীর উভয় পার্শ্বে অবিরল নারিকেল বৃক্ষরাজী অবিরল ফলগুচ্ছ ধারণ করিয়া নদীগর্ভে আনত হইয়াছে। পশ্চাতে একপংক্তি, তদনন্তর অন্যশ্রেণী চলিয়াছে। নারিকেলাভ্যন্তরে গুবাক আপন অঙ্গ মিশাইয়া সুষমা বিস্তার করিতেছে। বৈচিত্রবিহীন হইলে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয় না, সেই কারণে কৃশ পূগ তরু মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র মস্তক উত্তোলন করতঃ দণ্ডায়মান। নিম্নে আর এক স্তর না দিলে নিরবচ্ছিন্ন শ্যামল হয় না, তাই কদলী শাখা বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। বাঙ্গালা অপেক্ষা কেরল শ্যামরূপে অধিক পরিমাণে সুন্দর। ইহাতে "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতটী সহসা হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল। সুর দিব্য মিলিতেছে, কাশ্মীরের পর এতাদৃশ তৃপ্তিদায়িনী শোভা আর দৃষ্ট হয় নাই। যাহা বারম্বার দর্শন করিতে বাসনা হয়, অথচ নিঃশেষিত হইতেছে না, তাহা কি প্রীতিপদ! নদীকূলে শুষ্ক নারিকেলবৃন্ত বা কেতকীজাতীয় লতার বেড়া গৃহস্থের বাটীর সীমা নির্দ্দেশ করতঃ চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কেতকী ফলের আকার পক্ব আনারস ফল স্তবকের ন্যায়। নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থাপিত বলিয়া গৃহগুলিতে প্রখর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতে পারে না। এই কুঞ্জবনে ইডেন্ উদ্যানস্থা ইভের মত কেরলীগণ বিচরণ করিতেছে।

পত্রবিতান তমসাবৃত হইলে শয়নের আয়োজন হইল। নাবিকদ্বয় বিশ্রাম করিল না। সূর্য্যোদয় হইলে দুগ্ধ আহরণার্থ "পালু" (পয়স্) শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভৃত্যকে গাভীর অন্বেষণ করিতে নিয়োজিত করিলাম। কুত্রচিৎ দুই একখানি তৈলের পণ্যশালা দৃষ্ট হইল, কোন আপণে কদলীগুচ্ছ কণককান্তি বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে নারিকেলবল্কল রজ্জুর উপযোগী করিবার জন্য কাষ্ঠতাড়ন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। নারিকেলশস্য পেষণার্থ নরচালিত পেষণযন্ত্রখানি তদুপরিস্থ ছদিসমেত ভ্রাম্যমাণ। শিউলী কটিদেশে ভাণ্ড আবদ্ধ করিয়া নারিকেল বৃক্ষারোহণ-পর হইল। তস্কর অবরোধের জন্য গৃহস্থ বৃক্ষগাত্রে কণ্টকের বেষ্টন দিয়াছে। যে বৃক্ষের ফল আপনি পতিত হইতে পারে, তন্নিম্নে করণ্ড প্রস্থাপিত হইয়াছে। এদেশের শ্রী নারিকেলের উপর নির্ভর করে, এ জন্য দেশের নাম কেরল। মলয়পর্ব্বত হইতে মলয়ার নাম ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

বেলানগর যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তৈল ও রজ্জু সম্ভার-গৃহের সংখ্যা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। দূরে কতকগুলি খর্পরাচ্ছন্ন বৃহৎ গৃহ, উহাই কুচ্চি বন্দর। পশ্চাৎ সরিৎ হইতে অম্বুধি ও দূরবর্ত্তী গুণবৃক্ষসমন্বিত বাষ্পীয় অর্ণবপোতের ক্ষুদ্রাবয়ব দৃষ্ট হইল। প্রণালীর আকার এখানে সমুদ্রবৎ।

কোন ভূতত্ত্ববিৎ সমভিব্যাহারে থাকিলে বালুকার স্তর পড়িতে আরম্ভ হইয়া এই দ্বীপ উৎপন্ন হইতে কি পরিমিত কাল অতিবাহিত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতাম। শত বর্ষে ভূমি আড়াই ফীট্ উচ্চ হয়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন, পৃথিবীতে ছয় সহস্র বর্ষ হইল মানব-বসতি হইয়াছে। অধুনা মানবের উৎপত্তি কালের পরিমাণ তিন লক্ষ বৎসর বিবেচিত হইয়া থাকে। মামথ্ মৃগয়াকারী মনুষ্য এক লক্ষ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী জীব।

কুচ্চি বন্দর বোম্বাইবাসী গুজরাটীদের দ্বারা চালিত। কচ্ছ-মাণ্ডুই প্রদেশের হিন্দু ভাটিয়া, মুসলমান খোজা, কোকনস্থ ব্রাহ্মণ ও কোচিনী য়িহুদীতে নগর পরিপূর্ণ। ভাটিয়াগণ আফ্রিকা ও খোজাগণ মরিসস্ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিয়া থাকেন। জনেক ভাটিয়া বণিক কহিলেন, তিনি নৌকাযোগে সপ্তবার আফ্রিকাখণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন। বস্ত্রের বিনিময়ে গজদন্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইত। বন্য ক্রেতৃগণ কোন প্রকার প্রতারণা করিত না। বোম্বাই হইতে যে বস্ত্র গৃহীত হইত, তাহার মূল্য ষণ্মাস পশ্চাতে

দেয় ছিল। ইদানীং আফ্রিকায় ইউরোপীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয় ব্যবসায় রহিত হইয়াছে। যবনান্ন গ্রহণ করিতে হয় না বলিয়া এই ; বল্লভাচারী বৈষ্ণবদিগের হিন্দুত্ব অব্যাহত রহে। বঙ্গদেশে ইউরোপ যাত্রাকারিগণ যদি অন্ন বিচার রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে জাতিচ্যুত হইবেন না। জাতিরক্ষা করিবার উপায় না করিয়া শাস্ত্রার্থ বলে সমুদ্রযাত্রার বৈধতা প্রতিপন্ন করিলে ফল হইবে না।

৯৪ বৎসর পূর্ব্বে বুচানন্ যখন মালয়রে আগমন করিয়াছিলেন, তখন ১০০০ নারিকেলের মূল্য ১৩৷৷০ টাকা; ১০০০ সুপারি ৸০ আনা; মরিচ এক খন্তি (খারি) ৮/৭ মূল্য ১২৫৲ টাকা; এলাচ্ এক খারি ১০০৲ টাকায় বিক্রীত হইত।

১২৯৯ সাল

৩ অগ্রহায়ণ।

	প্রেরণ ব্যয় সমেত কোচিনে ১/০ মোণের মূল।	কলিকাতায়।
নারিকেল শস্য	৭৶০	অজ্ঞাত
নারিকেল তৈল	১২/০	১২৲
নারিকেল রজ্জু (স্থূল)	৩৸৶০	৪৲
মরিচ	১৬৷৵০	১৫৲
এলাচ	৬৯৸৶০	অজ্ঞাত

কুচ্চি ও কলিকাতার মূল্যের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে না; তবে বণিজ্যায় লভ্য কি? কলিকাতায় কুচ্চি ভিন্ন অন্যত্র হইতে ঐ সকল দ্রব্য আনীত হয়, এবং কুচ্চি হইতে কলিকাতা ভিন্ন অন্যস্থানে পণ্যসম্ভার গিয়া থাকে; এ কারণ সময় বিশেষে মূল্যের অনুপাত লাভজনক না হইতে পারে। কুচ্চি হইতে যাঁহারা কলিকাতায় দ্রব্য পাঠান, তাঁহারা টাকা না আনাইয়া তণ্ডুল ও খলে আনাইতে পারেন; ইহাতে কলিকাতায় প্রেরণ-ব্যয়ের উপর যে হুণ্ডীর বাঁটা ধরা হইয়াছে তাহার হ্রাস হইবে। কুচ্চিতে ক্রয়কারী যদি অগ্রিম অর্থ দিয়া পণ্য গ্রহণের নিয়মসূত্রে আবদ্ধ থাকেন, হট্ট-মূল্য হইতে অবশ্য সুলভে গ্রহণ করিবেন।

পত্রাত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে উপায়ান্তরাভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে বিশ্রাম হওয়া হইয়া থাকে ; কিন্তু কেবল বিষয়-তৃষ্ণা থাকিলেই বণিক হইতে পারে না ; আশার সহিত সাবধানতা মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণী শক্তি শিক্ষাসাপেক্ষ নহে। সকলে গণনা-কুশল হইতে পারেন না। লোকাদরপ্রিয়তা, এবং আসঙ্গলিপ্সা প্রবল থাকা চাই। নতুবা স্বার্থবাহ অকৃতকার্য্য হইবেন। গুর্জ্জরনিবাসী বণিকগণ কেরল হইতে শ্বেত এলা-ফল বাঙ্গালায় লইয়া যান, এজন্য আমরা তাহাকে গুজরাটী এলাচ্ আখ্যা প্রদান করিয়াছি। মলয়ারে এলাচ্ রাজসম্পত্তি ; ব্রিটিষ্ রাজের অহি-ফেণের ন্যায় সার্ব্বজনিক উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া একটি বিভিন্ন পল্লীতে উপনীত হইলাম। জ্যোৎস্না-ময়ী য়িহুদী ললনাকুল গৃহদ্বার ও যবনিকাভ্যন্তরে পরিলক্ষিত হইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণের গুণে শ্বেত পরিচ্ছদ উজ্জ্বলতর দেখাইতেছে। মার্জ্জিত সুবর্ণের বর্ত্তুল-মালিকা দিব্য সাজিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দুই একটি পুমান্ দেখা দিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্কের মত য়িহুদীপল্লীতে শ্যামাভ দেশীয় য়িহুদীর দল রহিয়াছে। কলিকাতায় ইহাদিগকে কোচিনী কহে। শ্বেত ও কৃষ্ণয়িহুদীতে সঙ্কর বিবাহ হয় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মলয়ারে বাসের জন্য য়িহুদীগণ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট একটি স্থানের সনন্দ পাইয়া-ছিল। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম এতদুভয় য়িহুদীধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন ভাষা মাত্রেই পূর্ব্ব ভাষার সহিত সংস্রব রাখে, তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ছায়া লইয়া গঠিত হয় নাই, অবনীতে এমন কোন ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। হজরৎ মহম্মদ কহিয়াছেন, আমি নূতন কোন বিষয় প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি না ; ইব্রাহিম যে প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়া-ছেন, তাহাই প্রচার করিতেছি। মহম্মদের য়িহুদী এবং খৃষ্টান্‌ভার্য্যা ছিল। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের সার বিষয় এক। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব, ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ, ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি, শেষ বিচারের দিন ও ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ আস্থা করিয়া থাকেন। সমুদ্রতটে অবস্থিত বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রবাস-সাহসী "অঞ্জুবর্ণ" (পঞ্চমবর্ণ) জেরু-জালেম নিবাসী য়িহুদী, ইয়ুরোপীয় খৃষ্টান, এবং আরব্য মুসলমানবর্গ কেরলে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

ব্রহ্ম রমণী।

গত সংখ্যক 'ব্ল্যাকউড্' পত্রিকায় 'ব্রহ্মরমণী' শীর্ষক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাবর্গের কৌতূহল পরি-তৃপ্তির জন্য আমরা এই প্রবন্ধের সার সঙ্কলন প্রকাশ করিতেছি।

ব্রহ্মবাসিগণ রমণীবর্গকে যেরূপ স্বাধীনতা, তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির উপর যে পরিমাণে অধিকার দান করেন ; পৃথিবীর কোন দেশেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। আইনের চক্ষে এ দেশে পুরুষ ও রমণীর অধি-কার সমান। পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার, পুত্রের অধিকার অপেক্ষা অল্প নহে ; রমণীর বিষয়ের কেহ ট্রষ্টী নিযুক্ত হয় না, এবং বিবাহের পর তাহারা তাহা যথেচ্ছ ভোগদখল করিতে পারে। শৈশবকাল হইতেই স্ত্রীজাতি স্বাধীন ; ব্রহ্মরমণীগণের শৌর্য্য বীর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। রমণীগণের অনন্ত প্রশংসাধ্বনিতে ব্রহ্মের প্রেমসঙ্গীত তরঙ্গিত নহে; কিম্বা রমণীগণ সকল পাপের মূল, এ কথা বলিয়া কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রবেত্তা তাহাদের দিকে কোন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ক্ষেপণ করেন না। ব্রহ্মের কোন পুরুষ তাহাদিগকে ধর্ম্মের সহচারিণী বা অধর্ম্মের পথপ্রদর্শিকা বলিয়া মনে করেন না। তাহাদের সাহিত্যে স্ত্রী পুরুষ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে কোন উচ্চ আদর্শ কল্পিত হয় নাই ; পৃথিবীতে জীবন সাধারণতঃ যে ভাবে চলে, তাহারই একটা মোটামুটি ভাব লইয়া তাহারা জীবনপথে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মরমণীগণের মধ্যে কেহ বীর নারী নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রেমিকার অভাব নাই ; রমণীর যে সকল গুণ প্রার্থনীয়, ইহাদের মধ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সুগঠিত মধ্যদেশ, অনতিদীর্ঘ দেহ, তাহার উপর ঢিলা পিরান, বিদেশী আগন্তুকের চক্ষে বড়ই সুন্দর দেখায়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের চাহনীতে, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে এমন একটী মাধুর্য্য ক্ষরিত হয়, যাহাতে মুগ্ধ পুরুষ-চক্ষু একেবারে বদ্ধ হইয়া যায়। পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের বর্ণ গৌর, চক্ষু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও তাহার চঞ্চল আকর্ষণী শক্তি পুরুষের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। ব্রহ্মরমণী-গণের ব্যবহার অতি নম্র, প্রকৃতি গম্ভীর, বিলাসবাসনা অনন্যসাধারণ এবং কণ্ঠস্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট।

ব্রহ্ম পুরুষের ন্যায় রমণীগণের মধ্যে লেখাপড়ার আলোচনা সাধারণ

নহে, বাদ্যযন্ত্র চালনায় তাহাদিগকে অভ্যস্ত দেখা যায় না ; রমণীগণের মধ্যে অনেকে গ্রাম্য কবিতা সুর করিয়া শুদ্ধরূপে আবৃত্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিবার কোন বন্দোবস্ত নাই ;—নৃত্যবিদ্যা, অঙ্কণ-কৌশল প্রভৃতিতেও তাহারা অনভ্যস্ত। গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্যে তাহারা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষিত হয় ; রমণী-প্রকৃতি তাহাদের চতুষ্পার্শে কিরূপে বিকশিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিমগ্ন রহিয়াছে—তাহা তাহারা সম্পূর্ণ-রূপে ধারণা করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাগণও চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, এবং তাহারা যে সকল পুরুষ ও রমণীকে দেখিতে পায়, তাহাদের সম্বন্ধে এক একটা মতামত সংগঠন করিতে সমর্থ হয়,—তাহাদের এই সকল মতামত, তাহারা যাহা দেখে সে সম্বন্ধে তাহা-দের মনোভাব, বাস্তবিকই প্রীতিকর জ্ঞাতব্য বিষয়। সেই সকল সুন্দর চিন্তা অজ্ঞতাপ্রসূত নহে, তাহা তাহাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা-জাত।

ব্রহ্মবালিকাদিগের আমোদ ও ক্রীড়ার সংখ্যা অধিক নহে। প্রত্যেক গৃহস্থবালিকার উপর কতকগুলি গৃহকর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়া থাকে ; ধনীর গৃহে দাসদাসীর প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহাদের কন্যাগণ নিজের জন্য কিম্বা পিতামাতার নিমিত্ত সেলাইএর কাজ করে। ইহারা বাল্যকালে বিবাহিতা হয় না ; ষোল হইতে কুড়ি বৎসর বয়স ইহাদের বিবাহ-কাল, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে অনেকের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহ তাহাদের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

ব্রহ্মরমণীগণের মধ্যে 'পূর্ব্বরাগের' নিয়ম আছে ; সমস্ত ব্রহ্মেই এ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সেজন্য সময়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। রাত্রি নয় দশ ঘটিকার সময় ইহারা অনুরক্ত পুরুষের সহিত মিলিত হয় ; বিশেষতঃ রজনী যদি শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী হয় তাহা হইলে ত কথাই নাই। এখানকার চন্দ্রা-লোকপ্লাবিত রাত্রি কি রমণীয়! সমস্ত জগৎ রৌপ্যময় স্বপ্নে মগ্ন হইয়া যায়, কেবল মৃদু নৈশ সমীরণের মধুর হিল্লোল, কুসুম-সুরভি-ভারে আকুল হইয়া নিদ্রাহীন প্রণয়ীযুগলের গণ্ডস্থলে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়, বাঞ্ছিতের কামনায় প্রাণ তখন কণ্ঠাগত হইয়া উঠে। প্রত্যেক গৃহের সম্মুখেই বারান্দা, মৃত্তিকা হইতে তিন ফীট উচ্চ। বালিকাগণ এই বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করে। সঙ্গে কখন একটি সখা, কখন বা সে একাকী। প্রণয়-প্রার্থিগণ ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দার নিকট দণ্ডায়মান হয়, এবং অর্দ্ধস্ফুট-

স্বরে, অতি ধীরে তাহাদের আবেগপূর্ণ তৃষিত হৃদয়ের কাহিনী বিবৃত করে। কখন কখন কোন কার্য্যোপলক্ষে যুবকগণ আসিয়া সসম্ভ্রমে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া যায়। বালিকাগণ তাহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করে, ইচ্ছা হইলে কাহাকেও চুরট দান করে, এবং যদি দৈবাৎ কোন অনুগৃহীত প্রণয়পাত্রের শুভাগমন ঘটে, তাহা হইলে চুরট ধরাইয়া তাহার মুখে লাগা-ইয়া দেয়, ইহা যেন তাহারই কোমল স্নেহ-চুম্বন।

বারান্দার অদূরে বালিকার কোন আত্মীয় শয়ন করিয়া থাকে, কারণ হঠাৎ কোন বিপৎপাত হইলে সে বালিকার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইতে পারে ; এরূপ সময়ে বন্ধুভাবে কোন শত্রুর আগমনও অসম্ভব নহে। বালিকাগণের প্রণয়ে বাধা দিবার কেহই নাই, যাহাকে ইচ্ছা সে বিবাহ করিতে পারে। তবে বিবাহ-প্রার্থীর সচ্চরিত্র, সক্ষম হওয়া চাই ; স্ত্রী যতটুকুই সাহায্য করুক, তাহার বলে এবং নিজের ক্ষমতায় তাহাকে সংসার চালাইতে হইবে। কিন্তু যদি তাহা সেই লুব্ধ প্রণয়ীর পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সে বালিকাকে লইয়া পলায়ন করে ; এরূপ অবস্থায় পরিবারের মধ্যে ভারি একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা দশদিনের অধিক স্থায়ী হয় না।

কোন কারণে বিবাহে বিলম্ব ঘটিলেও অনেক সময় প্রণয়িণীকে লইয়া প্রণয়ী অন্তর্ধান করে, বিলম্ব করিতে তাহাদের ভরসা হয় না ; শুভকর্ম্মে কত বিঘ্ন ঘটিতে পারে কে জানে ? জীবনও ত দীর্ঘ নহে।

পূর্ণিমা নিশায় দিবারাত্রির কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না ; কেবল সূর্য্যের কণক কিরণের পরিবর্ত্তে চন্দ্রের রজতচ্ছটা, তেমনি পরিস্ফুট এবং সমুজ্জ্বল ! আরণ্য ভূমি হর্ষমগ্ন, অরণ্যের অন্তরালে কাঠুরিয়াগণের পর্ণকুটীর, ইতস্ততঃ জল-প্রপাত, সুগন্ধি শ্যামল তৃণের সুকোমল শয্যা, আর উন্নত বৃক্ষরাজীর অবারিত ছায়া। এখানে খাদ্যদ্রব্যেরও অভাব হয় না। এক ঝুড়ি চাউল, গোটাকতক শুকৃটি মাছ এবং খানিক মসলা একটা নিরালা যায়গাতে অনা-য়াসেই লুকাইয়া রাখা যাইতে পারে ; কেবল দুই একটা হাঁড়ির দরকার, দুটি হাঁড়িতেই এক সপ্তাহ ভাতরাঁধা চলিতে পারে। কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহায্যে তাহা এখানে আনীত হয় এবং এই নিভৃত আরণ্য প্রদেশে পলায়িত প্রণয়ীযুগল কিছু দিন অতি আরামে অতিবাহিত করে। পীত, লোহিত কত বর্ণের সুন্দর সুন্দর পুষ্পে এই বনভূমি অলঙ্কৃত, এই সকল পুষ্প আহরণ

করিয়া প্রণয়ী প্রণয়িনীর কেশদাম সাদরে সজ্জিত করিয়া দেয় এবং প্রতিক্ষণে উভয়ে প্রণয়োদ্দীপ্ত মধুর কল্পনায় অভিনব পৃথিবী সৃজন করিয়া তাহাতে স্বপ্নাতীত মোহময় সুখভাণ্ডার আবিষ্কার করে। নূতন আলোকে তাহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং রহস্য-সঙ্কুল স্নিগ্ধ বন-চ্ছায়া এই সকল বন বালকবালিকাগণের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের মধুময় স্মৃতি নবজাগ্রত করিয়া তুলে। হঠাৎ এক দিন হয় ত গিরি-উপত্যকায় পবিত্র অশ্বত্থ মূলে তাহাদের সঙ্গে ভগিনী অথবা পিতৃব্য-পত্নীর গোপনে সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, তাহাদের বিবাহের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়াছে। অনতিবিলম্বে বন্ধুগণ আসিয়া মহানন্দে তাহাদিগকে বিবাহ বাসরে লইয়া চলিল; তখন সেই নন্দন কানন ত্যাগ করিয়া মর্ত্তের এই সাধারণ গার্হস্থ জীবনে প্রবেশ করিতে হয় ত তাহাদের হৃদয় সন্তপ্ত হইয়া উঠে।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক মিঃ ফিলডিং সাহেব তাঁহার বালক ভৃত্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্পে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার বিংশ বৎসর বয়স্ক একটি পরিচারক ছিল। এক বৎসর হইতে সে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সাহেব তাঁহার আড্ডা হইতে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে তাম্বু ফেলিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার পরিচারক সেই গ্রামের সর্দ্দার-কন্যার প্রণয়-ভাজন হয়। এই বালিকা অতি সুন্দরী। তাহার মস্তকে তরঙ্গায়িত অলকগুচ্ছ এবং কণ্ঠস্বর অতীব মনোহর। বালিকা এই যুবকের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া ছুটির প্রার্থনা করিল, দুই একদিনের মধ্যেই তাহাদের বিবাহ হইবে, সুতরাং আর বিলম্ব করা অসম্ভব। সাহেব তাহাকে উপদেশ দিলেন যে, তাহাদের দুজনেরই বয়স যখন অল্প, তখন আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সাংসারিক অবস্থা কিছু ভাল হইলে বিবাহ করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ এ সময় তাহার চাকরি ছাড়িয়া যাওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। যুবক সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আহারাদির পর তাহার প্রণয়িণীকে এই সকল কথা বলিতে গেল। সেদিন চলিয়া গেল, যুবক আর ফিরিল না, পরদিন সকালে যুবতীর পিতা সর্দ্দার আসিয়া বলিল, তাহার কন্যাকে পাওয়া যাইতেছে না। বলা বাহুল্য দুই জনেই পরামর্শ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; অবশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে ফিলডিং সাহেব

তাম্বুর সন্নিকটবর্ত্তী একটি সুবৃহৎ অশ্বত্থমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় পলাতকা যুবতীর মাতা আসিয়া সাহেবকে জানাইল যে তাহার কন্যার সহিত সাহেবের ভৃত্যের বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গিয়াছে, যুবক অন্যত্র চাকরীও পাইয়াছে, তাহাতে যে অর্থ উপার্জ্জন হইবে, তাহাতেই স্বামী স্ত্রীর স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে; কিন্তু সাহেব যতক্ষণ সে অঞ্চলে আছেন, ততক্ষণ তাহার ভাবী জামাতা সেদিকে আসিতে ভরসা করিতেছে না। তিনি রাগ করিয়াছেন ভাবিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। সাহেব সেই স্ত্রীলোকটিকে অভয় দিয়া বলিলেন, তিনি রাগ করেন নাই, অধিক কি প্রণয়ীযুগলকে বিবাহিত দেখিলে তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইবে। স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল। তাহার কন্যা ও ভাবী জামাতা সন্নিকটবর্ত্তী অরণ্যে লুক্কায়িত ছিল বলিয়া অনুমান হয়; কারণ পরদিন প্রভাতেই উভয়ে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাঁহার ভৃত্য অনেকক্ষণ লজ্জায় সাহেবের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু শীঘ্রই এ সঙ্কোচ বিদূরিত হইল, এবং সে পূর্ব্ববৎ অসঙ্কুচিতভাবে তাহার প্রভুর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

ব্রহ্মরমণীগণ সবলদেহা, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা এবং সাহসিনী। ব্রহ্মে বিবাহ-বন্ধন বিচ্যুতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ ফিল্‌ডিং বলিয়াছেন—এদেশে বিবাহ কিম্বা বিবাহ-বন্ধনচ্যুতি বৎসরে কি পরিমাণে ঘটে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ তাহার কোন হিসাব রক্ষিত হয় না। তবে সাহেব তাঁহার অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শতকরা একটি দম্পতি বিবাহ বন্ধন ছেদন করে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। পতি-পত্নী পরস্পরকে পরিত্যাগ করিলে পুত্র পিতার নিকট যায়, মাতা কন্যাকে গ্রহণ করে, কিন্তু পুত্র-কন্যা-পরিবৃত কোন দম্পতিকে প্রায়ই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্মরমণীগণ যে শুদ্ধ ব্রহ্মবাসীরই সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত তাহা নহে; ইংরেজ, চীন, হিন্দু, মুসলমান ব্রহ্মের অনেক বৈদেশিক উপনিবেশিকই ব্রহ্মরমণীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতেছেন; ভারতবর্ষের লোক ভারতের বাহিরে বাস করিতে কদাচ রাজী হয় না; এমন কি ফিল্‌ডিং সাহেবের মতে একজন ফরাসী তাহার স্বদেশ ত্যাগ করিতে যে পরিমাণে অনিচ্ছুক একজন হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থান ছাড়িতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অনিচ্ছুক, কিন্তু তথাপি তাঁহার একজন শিখ সৈন্য- কর্ম্ম হইতে অবসর

গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মে বাস করিতে লাগিল, ব্রহ্মরমণীকে বিবাহ করিয়া সে স্বদেশ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গকে ত্যাগ করিয়া চিরজীবন প্রবাসে অতিবাহিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ব্রহ্মদেশে তত্রত্য রমণীবর্গ সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, সেগুলি ব্রহ্মরমণীর আত্মত্যাগ, সাহস, অনুরাগ প্রভৃতির উৎকৃষ্ট পরিচায়ক।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ইছামতী।

থরস্রোতা ইছামতী নিশীথ আঁধারে
নগ্নকায়া, যৌবনের লাবণ্য পাথারে
নিমগ্না সৈকতশ্রেণী; মৃদু কলনাদে
বিরহ সঙ্গীত স্ফুরে; বহে অবসাদে
নিশীথ সমীর দূর হতে গন্ধবাহি।
শূন্যে রহে অনিমেষে তারাকুল চাহি।
তটমূলে ঘুমাইছে শ্রান্ত তরিগুলি
নাবিকেরে লয়ে বুকে; মৃদু দীপাবলি
জ্বলিতেছে অতি ক্ষীণ অস্ফুট আলোকে।
অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা ভূলোক দ্যুলোকে।
ওপারে কানন আড়ে মৃদু কুহুস্বরে
স্বপনের মত লাগে, সুধারাশি ঝ'রে'
পশয়ে শ্রবণে যেন। নীল বন রেখা
সুদূর বিস্তৃত; দূরে আধ যায় দেখা
মিটি মিটি দীপালোক, যেন নিভুপ্রায়
ঘন আঁধারের চাপে। যথা আঁখি ধায়
সীমাহীন অন্ধকার জাগিছে ব্যাপিয়া
দিক দশ, ঊর্দ্ধ অধ রয়েছে গ্রাসিয়া।

চলিয়াছ এঁকে বেঁকে কোন দূরদেশে
স্রোতস্বিনি! ছুটিয়াছ কাহার উদ্দেশে?

স্মৃতি-তীর্থ কতগুলি আছে তব তীরে—
অতীত কঙ্কাল লয়ে? তব পূত নীরে
ডুবিয়াছে কত শত সৌভাগ্য তপন,
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে ভরিয়া ভুবন।
জানি নাক তব স্রোতে পূত ভস্মরাশি
চির পুণ্যস্মৃতি সম আছে কত মিশি।
অয়ি! তব প্রেমনীরে দুকুল শোভিত—
চারু কিশলয়ে, ঘন বনানী হরিৎ
শ্যামল বরণে শোভে; তমাল পিয়াল
অশ্বত্থ শাল্মলী তাল শোভিছে বিশাল,
গুবাক্ খর্জ্জুরশ্রেণী—শোভে দলে দলে
দূর শূন্যে মাথা রাখি; যেন স্বর্ণ থালে
উপহার বিলাইছ নাগরিক জনে
সাধ পূরি যেবা চায় যায় যত মনে।

বল দেখি আজি মোরে কোন কর্ম্মফলে
কল্পতরু সমা তুমি, কোন্ পুণ্যবলে
দীন দরিদ্রের ঘরে এত হর্ষরাশি
ফুটাইছ অবহেলে; আর বিশ্বগ্রাসি
অভাবের তাড়নায়—হতভাগ্য আমি
কেন সদা স্বার্থপর নীচ পথগামী।
বল দেখি অবস্থার কোন বিপর্য্যয়ে
এত দীন নীচ আমি, মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে
পারিনাক ক্ষুধিতের মুছিবারে আঁখি,—
পারিনাক জুড়াইতে হৃদি মাঝে রাখি।
হৃদয়ের তীর মোর মরুভূমি সম
কেন বল দেখি, কেন এতই অক্ষম
দীন হীনে হাসাইতে, কেন পর দুঃখে
অশ্রুজল নাহি ফেলি, থাকি মনোসুখে।
পুণ্যবতি! পূতনীর স্পর্শেতব আমি
পারিবকি হইবারে পুণ্যপথগামী?

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীহট্টাগমন।

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও মনঃসন্তোষণীর সারমর্ম্ম।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও মনঃসন্তোষণীর সারমর্ম্ম উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অদ্য সে চেষ্টা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনঃসন্তোষণী উদয়াবলীরই অনুবাদ বিশেষ, সুতরাং উভয় গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক। তবে মনঃসন্তোষণীতে অল্প যে একটু বিশেষ আছে, তাহাও যথাস্থানে বলা যাইবে। ইহাও পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, উদয়াবলীতে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বারের পূর্ব্বদেশাগমন-বার্ত্তা বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম আগমনের চারি কি পাঁচ বৎসর কাল পরে,—১৪৩১ শকে, সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর তিনি দ্বিতীয় বার (পূর্ব্বদেশে) শ্রীহট্টে গমন করেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর নাম হয়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; এই জন্যই (অর্থাৎ গৌরসন্ন্যাসীর উদয় বা আগমনোপলক্ষে যে গ্রন্থ রচিত হয়, সেই) গ্রন্থের নাম প্রদ্যুম্নমিশ্র, শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী রাখিয়াছেন। এখন, মূল বিষয়ের অবতারণা করা যা'ক।

শ্রীমৎ মধুকর মিশ্র নামক জনৈক বিপ্র, অতি প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট আগমন করেন। তিনি সামবেদী ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থানের নাম কি, তাহা বলা যায় না ; তবে এইমাত্র অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আগমন করেন। মধুকর মিশ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। শ্রীহট্ট জিলায় তিনি কিয়ৎপরিমাণ ভূমি "বরে" প্রাপ্ত হন,* মধুকরের "বরপ্রাপ্ত" হেতু ঐ স্থান "বরগঙ্গা" নামে বিখ্যাত হইল। ("বরপ্রাপ্ত হেতু নাম বরগঙ্গা থৈলা।"—মনঃ সন্তোষণী)। বর্ত্তমানে ঐ স্থানকে "বুরুঙ্গা" বলে। মধুকর সপরিবারে শ্রীহট্টে আগমন করেন, এইখানে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিটী পুত্র হয়। কথিত আছে যে, মধুকরের স্ত্রী পঞ্চম গর্ভে একটা সর্প প্রসব করেন। (এই বিবরণ কিন্তু মনঃসন্তোষণীতে নাই।) মধুকরের তৃতীয় পুত্রের নাম উপেন্দ্র

* মধুকর সম্ভবতঃ কোন ধনী জমিদার কি কোন রাজা কর্তৃক আনীত ও ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। "বরে প্রাপ্ত" ইহার অর্থ কি ? অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিতও, দেখা যায় যে, এইরূপই "লাউড়ের" রাজা কর্তৃক শ্রীহট্টে আনীত ও শ্রীহট্ট—সুনামগঞ্জের নিকট বাড়ী করিয়া বাস করেন। সুবিধা হইলে সে কথা পরে বলিব।

মিশ্র, উপেন্দ্রের পত্নীর নাম শোভা; শোভাদেবীর অপর নাম কমলাবতী। উপেন্দ্র মিশ্র নির্জ্জনতাপ্রিয় ধ্যানানুরক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নির্জ্জনবাস (তপস্যা) জন্য পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর সহিত (শ্রীহট্টের) ঢাকাদক্ষিণ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপর ভ্রাতৃত্রয় বুরুঙ্গাতেই বাস করিতে লাগিলেন। (এইখানে বলিয়া রাখি যে, তাঁহার কাহারও কাহারও বংশ অদ্যাপি বুরুঙ্গায় আছেন, তবে এখন আর তাঁহারা বিশুদ্ধ "বৈদিক" নহেন, বিবাহাদিতে অনেকটা হীনতর হইয়া পড়িয়াছেন।) ঢাকাদক্ষিণ আগমনের পরে ক্রমে তাঁহার সাতটী পুত্র হয় ; উপেন্দ্রের তৃতীয় পুত্রের নামই প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র। মনঃসন্তোষণী বলেন—

"উপেন্দ্র মিশ্রের, গৃহে নিরন্তর,
সাতটী সন্ততি শোভা।
সরোবরে যেন, বিকশে নলিন,
হেন জন মনলোভা॥
সকল হইতে, রূপ লাবণ্যেতে,
ভাল দেখি জগন্নাথে।
সুবোধ দেখিয়া, সুযশ শুনিয়া,
আনন্দিত হৈলা চিতে॥"

শ্রীমৎ উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে সাংসারিক কার্য্যব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে গমন করেন। মিশ্ররাজ তাঁহার তৃতীয় পুত্র জগন্নাথের অত্যন্ত বিদ্যানুরাগ এবং চমৎকার বুদ্ধি দর্শনে হৃষ্ট হইয়া অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া দেন। নানা কারণে, বিশেষতঃ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ঐ সময়ে নবদ্বীপ অতি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন শ্রীহট্ট দেশীয় অনেক লোক নবদ্বীপে বাস করিতেন। (এমন কি, মিশ্রের স্বগ্রাম ঢাকা-দক্ষিণের রত্নগর্ভ পণ্ডিত, স্বীয় পুত্রত্রয়ের সহিত নবদ্বীপ বাস করিতেন। ঐরূপ আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম করা যাইতে পারে। যথা, সম্ভ্রান্ত শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারী গুপ্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্ন প্রভৃতি। এই শেষোক্ত ব্যক্তি শচীদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন, ইনি মহাপ্রভুর মেসো)।

জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে গিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। দেশেই তৎকর্ত্তৃক ব্যাকরণাদি অধীত হইয়াছিল, উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট এখন

অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি সামবেদ পড়িয়া ক্রমে ন্যায় সাংখ্যাদি দর্শনে অল্পকালেই বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। অপিচ, তাঁহার সুমধুর বাক্য, ভুবনমোহন রূপ ও অসীম গুণ এবং অমায়িকতায় নবদ্বীপের স্ত্রী পুরুষ সকলই তাঁহার বশীভূত হয়। এই সময়েই পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে "পুরন্দর" উপাধি দান করেন।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপের একজন প্রধান লোক। তিনি একদিন জগন্নাথ মিশ্রের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহার কুল শীল অবগত হইয়া তৎকরে আপন দুহিতারত্ন শচীকে সমর্পণ করেন। এই শুভ সম্মিলন "প্রাজাপত্য বিধানে" সম্পাদিত হয়। এই হইতেই জগন্নাথ মিশ্র, প্রকৃত পক্ষে নবদ্বীপের অধিবাসী হইলেন। গঙ্গাতীরের বাটীতে নবদম্পতি পরমসুখে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের আটটী কন্যা জাত ও অচিরকাল মধ্যে বিনষ্ট হন। অতঃপর বিশ্বরূপের জন্ম হয়। পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনাদি প্রযুক্ত জগন্নাথের মন ঐ সময় নিতান্ত বিষাদিত হয়, ও একটী অজ্ঞাত উদ্বেগে তিনি ব্যথিত হইয়া পড়েন; আবার পিতামাতাকে দর্শনের জন্য ঐ সময়েই তাঁহার প্রবল বাসনা জন্মে। যখন জগন্নাথের হৃদয় এইরূপ আন্দোলিত হইতেছিল, ঠিক তখনই তিনি পিতার পত্র প্রাপ্ত হন, উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহাকে শ্রীহট্ট আগমনের জন্য আহ্বান করেন।

পত্র প্রাপ্তে জগন্নাথ কালবিলম্ব না করিয়া সপরিবারে বহুকাল পরে দেশে আসিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে পাইয়া বৃদ্ধ পিতামাতা কিদৃশ আনন্দ লাভ করেন, তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। জগন্নাথ এবং শচী কায়মনে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। জগন্নাথাগ্রজ পরমানন্দের স্ত্রীর নাম সুশীলাদেবী। সুশীলা বড় সদ্‌গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। এই সুশীলা ও শচীতে বড়ই "সদ্ভাব" হইয়াছিল। (এই খানে একটী কথা বলা আবশ্যক। উদয়াবলীতে পরমানন্দ মিশ্র এবং তাঁহার স্ত্রী সুশীলার প্রসঙ্গ আছে, জগন্নাথের কনিষ্ঠ অপরাপর ভ্রাতৃগণের বা তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রাদির কোন প্রসঙ্গই নাই। পরে, মনঃসন্তোষণী পাঠে জানা যায় যে, তাহারা বিবাহের পূর্ব্বেই দেহ ত্যাগ করেন)।

এইরূপে পারিবারিক সুখে কিছুদিন অতীত হইল। শচী পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইলেন; এই গর্ভের সন্তানই শ্রীমহাপ্রভু। কথিত আছে যে, গর্ভধারণের

পর শচীদেবীর অঙ্গকান্তি উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং ইহাও বর্ণিত আছে যে, শচীর গর্ভধারণের পর একদা শোভার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, বধূকে পুত্রের সহিত যেন শীঘ্রই নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্নে ইহাও জানিতে পারেন যে, এই গর্ভে একটী অচিন্ত্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। বৃদ্ধা প্রাতে পতির নিকট এই বার্ত্তা পরিজ্ঞাপন করিলে ধর্ম্মভীরু উপেন্দ্র মিশ্র পুত্র ও পুত্রবধূকে নবদ্বীপ পাঠাইতে উদ্যোগ করিলেন।

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে শচী যখন গুরুবর্গকে প্রণামাদি করিতেছেন, তখন বৃদ্ধা শোভাদেবী বধূকে কোলে করিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে বলিলেন,—

"শুন মা তোমার, গর্ভের মাঝার,
যে পুরুষ জনমিবা।
দেখিতে তাঁহারে, বাসনা অন্তরে,
এথা পাঠাইয়া দিবা॥"—মনঃসন্তোষণী।

শ্বশুড়ীর অনুরোধ রক্ষা করিতে শচী স্বীকৃতা হইলেন। তখন "স্বল্পগর্ভা" ভার্য্যার সহিত জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপ যাইতে উদ্যত হইলেন।

"প্রয়াণং কর্ত্তুমুদ্যুক্তো ভার্য্যয়া স্বল্পগর্ভয়া।"—উদয়াবলী।

যথাসময়ে জগন্নাথ নবদ্বীপে আসিলেন, যথাসময়ে নিমাই ভূমিষ্ঠ হইলেন। ক্রমে নিমাই শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, ক্রমে উপযুক্ত সময়ে তাঁহার "হাতেখড়ি," উপনয়ন প্রভৃতি হইল।

"অতঃপর জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়।
স্বদেহ ত্যজিয়া পরম্পদ প্রাপ্ত হয়॥
তান শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর।
করিলেন যত্নক্রমে লোকে সুগোচর॥
তৎপরে শ্রীশচী মাতার আজ্ঞা অনুসারে।
বঙ্গদেশে গেলা প্রভু প্রয়োজন তরে॥"—মনঃসন্তোষণী।

(এ যাত্রা নিমাইয়ের প্রথম; তখন তিনি শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। অদ্যাপি কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না; তবে পদ্মা নদী পার হইয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে)।

ঐ সময়ে তদীয় ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করেন এবং তাহাতে শচীদেবী অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন। কথিত আছে, মহাপ্রভু আপন হৃদয়ে

তাহা অনুভব করিতে পারেন। মার দুঃখ জানিতে পারিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, আর তাঁহার ঢাকাদক্ষিণ যাওয়া হইল না, ফিরিয়া নবদ্বীপে আসিলেন।

শচীর আজ্ঞায় নিমাইকে আর একটী পত্নীগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার নাম—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। বিবাহের পর নিমাই গয়ায় গমন করেন, গয়া হইতে আসিয়াই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ, ইহার পরেই সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাইকে শান্তিপুরে আনয়ন করা হইয়াছিল। তখন শচীদেবী প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে শান্তিপুরে গমন করেন, সেই সময় শচীদেবীর চিত্তে একটী চিন্তা উদিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিলেন—"পূর্ব্বে আমি শ্বাশুড়ীর কাছে, নিমাইকে তথায় পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি। এ পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। এই অপরাধেই হয়তঃ নিমাই আমার কোল-ছাড়া হইল; গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে আমি হয়তঃ পথের কাঙ্গালিনী হইলাম। যাহা হউক, এখন আমার এই একমাত্র বাসনা যে, নিমাই আমার কুশলে থাকুক, নিমাই আমার স্বধর্ম্মে, সম্মানে, সুস্থ শরীরে, দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকুক,—দেবতাগণ তাঁহাকে মঙ্গলে রাখুন।" শোকাকুলা সন্তান-বৎসলা শচী এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বকীয় বাক্য রক্ষা ও পুত্রের কল্যাণ-বর্দ্ধনাভিলাষে পুত্রকে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"আর এক কথা কহি শুন বাছাধন।
তব পিতামহী সঙ্গে প্রতিজ্ঞা বচন॥
তুমি মোর গর্ব্ভে যবে বসতি করিলা।
আমাকে প্রতিজ্ঞা তেহো তখনে করাইলা॥
শুন বধূ তোমা গর্ব্ভে পুরুষ যে হবে।
তাকে পাঠাইয়া তুমি মোরে দেখাইবে॥
ইহা অঙ্গীকার করি আইনু নবদ্বীপে।
ইহা যদি পূর্ণ তুমি কর কোন রূপে॥"—মনঃসন্তোষণী।

শচীর এই অনুরোধই মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার পূর্ব্বদেশ আগমনের কারণ। সুতরাং সন্ন্যাসের পরই তিনি শ্রীহট্টে আগমন করেন। নিমাই প্রথমতঃ প্রপিতামহের স্থান বুরুঙ্গায় আগমন করেন। এখানে তিনি এক রাত্রি অবস্থিতি করিয়া বুরুঙ্গা গ্রাম হরিসংকীর্ত্তনে মাতাইয়া তুলেন। (এই স্থানে তাঁহার কএকটী অলৌকিক ঘটনার কথা গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা

পরিত্যক্ত হইল।) পরদিন প্রাতে বুরুঙ্গা হইতে যাত্রা করিয়া বৈকালে পিতামহের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ, পশ্চিম গগন নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। প্রভু পিতামহের বহির্ব্বাটিকায়, তিনি,—

"হরি হরি শব্দ মুখে করি উচ্চারণ।
করিতে লাগিলা ইতস্ততঃ পর্য্যটন॥"—মঃ সঃ।

মহাপ্রভু বহির্ব্বাটীতে ভ্রমণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে জানাইলেন যে, হিমাচলসদৃশ উন্নতকায় এক দিব্য সন্ন্যাসী মূর্ত্তি বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছেন। এমন রূপ বুঝি মনুষ্যে সম্ভবে না। বৃদ্ধা বাহিরে আসিলেন, পরস্পরে পরিচয় হইল, মহাপ্রভু তখন বাড়ীর ভিতর আসিলেন। সে রাত্রি প্রভু পিতামহের বাটীতে বাস করিলেন, জ্যেষ্ঠতাতপত্নী পরম যত্নে তাঁহাকে আহার করাইলেন। বৃদ্ধা, পৌত্রের নিকট আপন সুখ দুঃখের বিবিধ কাহিনী কহিলেন ও পৌত্রের অমিয়মাখা উপদেশ লাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন। পরদিন মহাপ্রভু নিকটবর্ত্তী "বৃদ্ধ শিব" ও "অমৃত কুন্ড" দর্শনে গেলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইলে দুটী অদ্ভুত ঘটনার কথা বিবৃত আছে।

বৃদ্ধা তাঁহার পৌত্রকে হঠাৎ "নবজলধরবর্ণ বনমালাবিভূষিত" কৃষ্ণরূপে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে রূপ পরিবর্ত্তিত হইল, এখন আর কৃষ্ণমূর্ত্তি নাই। বৃদ্ধা দেখিলেন—সে স্থানে ভুবনমোহন গৌর শিশু দাঁড়াইয়া। সে দৃশ্যও পরিবর্ত্তিত হইল,—এখন সেই মহিমান্বিত সন্ন্যাসীশিরোমণি।

ইহার পরই নিমাই চলিয়া যান। এখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি।

যে দুইটী রূপ বৃদ্ধাকে দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ দুইটী মূর্ত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ মূর্ত্তি ও গৌর মূর্ত্তি (সন্ন্যাসী নহেন) বৃদ্ধা কর্ত্তৃক, (কথিত আছে) তখনই সংস্থাপিত হয়। অতি প্রাচীন উদয়াবলীতে এবং মনঃসন্তোষণীতে এই মূর্ত্তি যুগলের প্রসঙ্গ আছে। এ মূর্ত্তি যুগল যে অতি প্রাচীন, তার আর সন্দেহ নাই। ঢাকাদক্ষিণে মিশ্র উপাধিধারী যে ব্রাহ্মণগণ আছেন, তাঁহারাই পূজাদি করিয়া থাকেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ এখন নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, স্বীয় বংশমর্য্যাদা ও কৌলীন্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঢাকাদক্ষিণের মহাপ্রভু শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ দেবতা, বিবিধ পর্ব্বোপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী দেবদর্শনে বহুদূর হইতে আসিয়া থাকে। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ ৮ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী

দুইটি পক্ষী।

জুন মাসের “দাসী”র ৩৫২ পৃষ্ঠাতে “বঙ্গদেশের অন্যত্র প্রচলিত” কতিপয় শব্দের যে “বাঁকুড়ী” প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী ভুল আছে। “ছাতারে পাখী”র প্রতিশব্দে “ফেঙ্গা” বলা হইয়াছে। কিন্তু “ফেঙ্গা” ও “ছাতারে পাখী” একই পক্ষী নহে। বাঁকুড়া জেলায় যাহাকে “ফেঙ্গা” বলে, বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে তাহাকে “ফিঙ্গে” বলে। এই পক্ষীর বর্ণ ঘোর-কৃষ্ণ। ইহার মস্তকে একটী ঝুঁটী আছে ও ইহার পুচ্ছটি কাঁচির ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত। এই পক্ষী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বাঁকুড়া-জেলায় যাহাকে “ধ-ফেঙ্গা” বলে, তাহার কণ্ঠ অতীব মিষ্ট। এই কারণে সুকণ্ঠ-পক্ষিপ্রিয় ব্যক্তিরা ইহাকে সযত্নে পুষিয়া থাকে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের শেষ রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে ইহারা এরূপ সুস্বরলহরীতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিতে থাকে, যে তাহা শ্রবণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অন্যজাতীয় “ফেঙ্গা”রা কিছু কর্কশকণ্ঠ ও কলহপ্রিয়। কাকের সহিত তাহাদের বিশেষ বৈরিতা। কাক দেখিলেই তাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকে ও তাহাকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে।

“ছাতারে পাখী” বাঁকুড়া-জেলাতে, (অন্ততঃ জেলার পশ্চিমাংশে) ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। “ছাতারে পাখী”র গাত্রবর্ণ পিঙ্গল বা তাম্রবর্ণ। ইহারও মস্তকে ঝুঁটি আছে। এই পক্ষীকে সচরাচর বাগানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কণ্ঠস্বর অতীব কর্কশ। কাককণ্ঠও ইহাদের কণ্ঠের তুলনায় বরং সুমিষ্ট। “ছাতারে পাখী”ও ফেঙ্গার ন্যায় অতিশয় কলহপ্রিয়।

তাহার পর কাঠ ঠোক্‌রা পাখীর “বাঁকুড়ী” প্রতি শব্দ দেওয়া হইয়াছে “টেঁস্কনা”। বাঁকুড়া জেলায় যাহাকে “টেঁস্কনা” বলে, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে তাহাকেই “নীলকণ্ঠ” বলে। কলিকাতা হুগলী অঞ্চলে তাহাকেই কাঠঠোক্‌রা বলে কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু “টেঁস্কনা” পাখীকে আমি কখনও চঞ্চু দ্বারা বৃক্ষের ডাল ঠুকিতে দেখি নাই। ইহাদিগকে কখন বৃক্ষের কোটরেও বাস করিতে দেখি নাই। আমাদের গৃহের চিলেঘরের আলিসার নীচে কতকগুলি “পায়রা খোপ” আছে। এক জোড়া টেঁস্কনা পাখী কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার একটী “খোপ” দখল করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে পায়রাগুলি সেখানে কুলায় প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না। এই পক্ষীর গাত্রবর্ণ নীলাভ ; কণ্ঠদেশ গাঢ় নীল। মস্তকে

ঝুঁটি আছে। ইহারা অত্যন্ত ক্রোধ-পরায়ণ ; কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না। আসিলে কর্কশ শব্দে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে। ইহারা খড়, কুটী প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নীড় প্রস্তুত করে। “ফেঙ্গা”র ন্যায় ইহাদেরও কাকের সহিত চিরশত্রুতা আছে।—“টেঁস্ টেঁস্” শব্দ করে বলিয়া ইহাদের নাম “টেঁস্কনা।” বিহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে “টেঁস্কনা” বা “নীলকণ্ঠ” পক্ষী পবিত্র ও শুভদর্শী বলিয়া বিবেচিত হয়। বিজয়া দশমীর দিনে ইতরসম্ভ্রান্ত সমস্ত হিন্দুই সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নগরের বহির্ভাগে “নীলকণ্ঠ” দর্শনে বহির্গত হয়। অনেকের হস্তে বন্দুক থাকে। বাগানে বা বৃক্ষরাজির নিকটে সেই বন্দুক দ্বারা “ফাঁকা” আওয়াজ করা হয়। কোনও বৃক্ষে নীলকণ্ঠ পক্ষী থাকিলে বন্দুকের শব্দে ভয়ে আকাশে উড্ডীন হয় আর সেই সময়ে সকলেরই সেই শুভদর্শী পক্ষীটি দর্শন করা ঘটে। কিন্তু, সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, প্রয়োজনের সময় কোন বস্তুরই (যেরূপ অনেক ব্যক্তিরও) দর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং “নীল-কণ্ঠ” পক্ষী মহাশয়ও লোকের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া এই সময়ে আশ্চর্য্য-রূপে অদৃশ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু সেইদিনে যেরূপেই হউক, তাঁহাকে দর্শনলাভ করা চাইই। সুতরাং কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই একটী নীলকণ্ঠকে পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট কিছু পুরস্কারের আশা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দেয়।

“নীলকণ্ঠ” বা “টেঁস্কনা” সম্বন্ধে কাহারও কোনও গোলযোগ না থাকে, এই জন্য আমি এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। আমি স্বচক্ষে বিহারীদের “নীলকণ্ঠ” দর্শনের এই আগ্রহ দেখিয়াছি। আর “নীলকণ্ঠ” যে “টেঁস্কনা” তৎসম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ নাই। এখন কথা হইতেছে যে, এই “টেঁস্কনা” “কাঠ-ঠোক্‌রা” কিনা। বাঁকুড়া অঞ্চলে কাঠ-ঠোক্‌রা নামে একটী পাখী আছে। তাহা আমি দেখিয়াছি। তাহার আকার বুল্‌বুলের ন্যায় ও গাত্রবর্ণ কৃষ্ণাভ। একদিন দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী এক আম্রবৃক্ষের শুষ্ক শাখায় এই পাখীটি অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠক্ ঠক্ করিতেছিল। আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহার কার্য্য দেখিয়াছিলাম। পাখীটি চারি পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া প্রায় এক ইঞ্চি গভীর একটী কোটর প্রস্তুত করিয়াছিল। পরদিন আর সে সেখানে আসিল না। বোধ হয়, সেই শুষ্ক শাখাটি বিদারণ করা তাহার চঞ্চুর পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।

“কাঠ্-ঠোক্‌রা” একটী generic name মাত্র। এই জাতীয় নানাবিধ পক্ষী আছে। ফিঙ্গের ন্যায় আকারবিশিষ্ট কিন্তু বিচিত্রবর্ণ একটী পক্ষী একবার রাঁচিতে দেখিয়াছিলাম। তাহাও কাঠ্-ঠোক্‌রা জাতীয়। এই পাখীটি দেখিতে অতিশয় সুন্দর—নাম “সরস্বতী” পাখী। ইহা অন্যান্য পাখীর ন্যায় দাঁড় বা ডালের উপর সোজা হইয়া বসিতে পারিত না। বৃক্ষের ডালে ইহা ঝুলিয়া থাকিত। আমরা একটী কাষ্ঠ দেওয়ালে ঠেসাইয়া

রাখিয়াছিলাম। পাখীটি সেই কাষ্ঠের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার চঞ্চু দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট। জিহ্বা অতীব বৃহৎ। সর্পের জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করিয়া জিহ্বা বাহির করিত। জিহ্বা দ্বারাই ইহা খাদ্যাদি গ্রহণ করিত। ইহার প্রধান খাদ্য ছিল "কুর্‌কুট্টু" নামধেয় একজাতীয় আরণ্য পিপীলিকা। তাহাই সংগ্রহ করিয়া ইহাকে খাওয়াইতে হইত। কুর্‌কুটেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যখন যাইতে থাকে, তখন "সরস্বতী" আপনার সুদীর্ঘ লোল জিহ্বা বাহির করিয়া তাহাদের গমন পথ অবরুদ্ধ করে। যাহারা তাহার জিহ্বা স্পর্শ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার উদরস্থ হইয়া যায়।

"সরস্বতী"র কণ্ঠস্বর বিচিত্র। সেরূপ স্বর আর আমি অন্য কোনও পক্ষীর কণ্ঠে কখনও শুনি নাই। সরস্বতীর পায়ের সহিত কাষ্ঠে একটা দড়ী বাঁধিয়া রাখিলেই চলিত। পিঞ্জরের কোনও প্রয়োজন ছিল না। "সরস্বতী" কিছুদিন থাকিতে থাকিতে বেশ পোষ মানিয়াছিল। তাহাকে কোনও বৃক্ষ দেখাইয়া ছাড়িয়া দিলে, সে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষে উড়িয়া যাইত। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখে এক প্রকার "শীষ্" দিলেই সে উড়িয়া আসিয়া পুনর্ব্বার হস্তের উপর বসিত। কখন কখন সে মুখে করিয়া একটী পাতা লইয়া আসিত। এই পাখীটি ছোটনাগপুরের কোনও জঙ্গলে ধৃত হইয়াছিল। ভগবানের রাজ্যে যে কত অদ্ভুত পক্ষী আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

(২২শে জুলাই হইতে ২১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত)

দাসাশ্রমে এই মাসে নিম্নলিখিত রোগী ছিল ;—

১ দামো, ২ তিতুরাম, ৩ টোকানি, ৪ বাবুরাম, ৫ খেদনা, ৬ রসিকচাঁদ, ৭ দেবিয়া, ৮ দুর্গাতারিণী, ৯ শিবু, ১০ স্বর্ণ, ১১ নবদুর্গা, ১২ ফুলমণি।

১। দামোর—অবস্থা অতি শোচনীয় ; পা ফুলিয়া পড়িয়াছে, শরীর রোগ ও জরাজীর্ণ। এখন সে কেবল প্রার্থনা করিতেছে, "ঠাকুর শীঘ্র পার কর।" সে এখন গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার অন্নদা বাবুর চিকিৎসাধীন।

২। খেদনা—হাজারিবাগ জেলায় বাড়ী। অন্ধ, একদিন গিরিডির পথে যাইতে যাইতে পড়িয়া যাওয়ায় উরুদেশে অত্যন্ত আঘাত লাগে। হাঁসপাতালে থাকিয়া তাহার যথোচিত চিকিৎসা হয়। এখন সে যষ্টিভর করিয়া কোন রূপে দু চার পা চলিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ডাক্তার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দেন।

৩। তিতুরাম, ৪। টোকানী, ৫। শিবু—দাসাশ্রমের নিয়মাধীন হইয়া থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাহাদের ইচ্ছানুসারে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় পঁহুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারা আসিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিল যে কিছুতেই রাখা গেল না।

আয়।

মণিঅর্ডার ১৩৮৲, খেদনা রোগীর জমা ৪৲, বাবু তিনকড়ি বসু ১।/০, পূর্ব্ব মাসের হস্তেস্থিত ॥/১৫, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু ১৲, মোট ১৪৪৸৵১৫।

ব্যয়।

সংসার খরচ ৩৪৵১২॥, কর্ম্মচারীর বেতন ৫৬।৴২॥ (পূর্ব্বের বাকি শোধ সম্বলিত), বাড়ী ভাড়া ১৮৲, ধোপা ২৻১০, গোয়ালা ৪৸৵১৫, পূর্ব্ব মাসের ঋণ শোধ ২৲, পার্শেল মাসুল ১॥০, বাজে খরচ ৵০, মোট ১১৯৶০, হস্তেস্থিত ২৫॥৶১৫।

দানপ্রাপ্তি।

(২৫শে জুলাই হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত)

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদবারি সিঞ্চন করুন।

মাসিকচাঁদা।

ডাঃ কেদারনাথ দাস জুন ও জুলাইয়ের চাঁদা ॥০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ২৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ ঐ ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ঐ ঐ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ ঐ ।০, N. C. Baral Esq. জুন ও জুলাইয়ের চাঁদা ২৲, N. K. Bose Esq. জুলাইয়ের চাঁদা ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের চাঁদা ২৲, জনৈক ভদ্রমহিলা জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু ঐ ঐ ॥০, বাবু অনাথনাথ দেব ঐ ঐ ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী আষাঢ় মাসের চাঁদা ১৲।

এককালীন দান।

শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ ভ্রাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ১৲, বাবু মাণিকচন্দ্র রায় ভক্তিসঞ্চারিণী সভা হইতে ১৲, N. C. Bose Esq ১৲, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৲, বাবু প্রমথনাথ চট্টো ১৲, Hon. C. C. Mitter Esqr ৫৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ ১৲, ডাক্তার বিহারীলাল বসু ৪/, বাবু বিজয়গোপাল ঘোষ ২৲, বাবু গোপালচন্দ্র আচার্য্য ১৲, বাবু পুলিনবিহারী রায় ৫৲, বাবু মতিলাল মুখো ১৲, বাবু বিমলাচরণ সেন ৵০, শ্রীমতী কৃষ্ণকিশোরী চৌধুরাণী ১৲, শ্রীযুক্ত গোঁসাই রামরতন ভারতী ১৲, বাবু নীলরতন বন্দ্যো ।০, বাবু বেণীমাধব চাকী ।০, মুন্সী মহম্মদ উজির ১৲, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দাস ১৲, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সাহা ॥০, বাবু কৃষ্ণলাল সাহা ॥০, বাবু নবীনচন্দ্র সাহা ৻১০, বাবু গোপীনাথ সাহা ৵০, বাবু বনমালী সাহা ৵০, বাবু শ্রীরামচন্দ্র সাহা ॥০, বাবু মুকুন্দলাল ও প্রসন্নকুমার সাহা ।০, বাবু অধরচন্দ্র সাহা ।০, বাবু গৌরাঙ্গচন্দ্র সাহা ।০, বাবু রাধানাথ সাহা /০, বাবু দ্বারকানাথ কৈলাশচন্দ্র প্রামাণিক ॥০, বাবু রাজনারায়ণ ঘোষ ৵০, একজন হিতৈষী /০, একজন বন্ধু ॥০, বাবু বনমালী সান্ন্যাল ।৶১০, বাবু গোঁসাইদাস দত্ত ১৲, একজন বন্ধু ॥০, বাবু চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য /০, বাবু যদুনাথ মজুমদার ।০, একজন বন্ধু রামপুর বোয়ালিয়া ১৲, বাবু রামজয় বাগছী ॥০, একজন হিতৈষী ॥০, বাবু ভুবনমোহন মৈত্র ১৲, বাবু গুরুনাথ মুন্সী ১৲, বাবু শশধর রায় ১৲, বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ ২৸০, বাবু কুমুদবিহারী সেন পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২৲, বাবু ভোলানাথ লাহিড়ী ১৲, নীতিবিদ্যালয় ১৲, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র হাজারিকা ১৲, G. C. Mukerji ।০, বাবু গোপালচন্দ্র সিংহ ১৲, বাবু হীরালাল মৈত্র ।০, W. B. Livingstone Esqr. ১৲, বাবু হরচন্দ্র রায় ॥০, বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ৸৵০, ডাঃ অক্ষয়কুমার ভাদুড়ী ১৲, বাবু শ্যামলাল ঘোষ ১৲, বাবু তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু ললিতমোহন মৈত্র ১৲, A friend of Rampur Boalia ১৲, বাবু ভগবতীচরণ গাঙ্গুলি ১৲, একজন ভদ্রলোক ৵০, বাবু শরৎচন্দ্র রায় ১৲, বাবু রাজকুমার সরকার ১৲, বাবু হরিচরণ মৈত্র ১৲, বাবু নিত্যানন্দ বিশ্বাস ॥০, বাবু যদুনাথ মজুমদার ১৲, বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৸১০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সাহা ৵০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ॥০, রাজসাহী কলেজ বোর্ডিংয়ের ছাত্রগণ ।৵১০, কুমারী স্নেহলতা মজুমদার প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার

দরুণ ১০৲, বাবু কেদারনাথ সেন ৵০, বাবু নলিনীকান্ত সেন ৵০, বাবু সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরী ১৲, বাবু কৃষ্ণমোহন দাস ১৲, বাবু রজনীকান্ত মিত্র মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, বাবু ভোলানাথ সরকার অটল বিহারী ঘোষের এফ,এ পাশ উপলক্ষে ১৲, বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো ।০, বাবু শীতলদাস রায় ১ম পুত্রের জন্মোপলক্ষে ২৲, বিধুভূষণ দত্ত ॥৵০, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ।০, বাবু সীতানাথ গাঙ্গুলী ।০, S. K. Lahiri Esq. ।০, বাবু রাসবিহারী কর্ম্মকারের সংগৃহীত ৫।০ বাবু নৃত্যগোপাল পাঁড়ে ॥০, বাবু রসিকলাল ঘোষ এম্ এ ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র মুখো এম,এ ।০, বাবু প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী ১৲, বাবু রামনারায়ণ ব্যানার্জ্জি ২৲, Rev. B. N. Banerji ১৲, বাবু নীলমণি ঘটক ১৲, বাবু গোষ্ঠবিহারী সেন ১৲, বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য ॥০, শ্রীমতী মনোমোহিনী শেঠ ।/১০, বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥০,বাবু কুঞ্জলাল কর ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র দাস ।০, বাবু মদনমোহন দাস ১৲, বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখো ১৲, বাবু শ্রীচরণ দাস ।০, বাবু রজনীকান্ত দাস ।০, বাবু মোহিনীমোহন শেঠ ।০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস ৵০, বাবু রাধিকালাল শেঠিয়া ।০, বাবুরজনীকান্ত দাস ।০, বাবু রাধারমণ দাস ॥০, শ্রীমতী সুমতী চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু রজনীকান্ত মজুমদার ॥০, বাবু অঘোরনাথ মুখো ॥০, ডাঃ দুকড়ি ঘোষ ২৲, সিটি স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণ ।১০, বাবু কালীনারায়ণ রায় ৵১০, বাবু সীতানাথ দাস ১, P. N. Bose ১৲, বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র ॥০, J. Barooah Esqr জন্মদিনে ৮০, শ্রীমতী সুলতা রায় ৵০, শ্রীমতী ললিতা রায় ৵০, বাবু কালীচরণ সোম ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ ২৲, বাবু প্রতুলচন্দ্র ঘোষ ২৲, বাবু শশিভূষণ বসু ২৲, বাবু নারায়ণকৃষ্ণ সেন ১৲, বাবু মাণিকচন্দ্র ঘোষ ৵০, বাবু গোঁসাই মহেন্দ্র গিরি ৪৲, বাবু ব্রজলাল চট্টো ১৲, বাবু পঞ্চানন মৈত্র ।০, বাবু কেদার নাথ গুপ্তের সংগৃহীত ৩॥৵০, বাবু দুর্গাদাস মুখো ।০, বাবু প্রতাপচন্দ্র বসু ১৲, বাবু রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু ঠাকুরদাস ডাক্তার ॥০, বাবু হরিনাথ পালিত ॥০, বাবু যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ।০, বাবু লক্ষ্মীলাল সেন ॥০, বাবু রামচন্দ্র ঘোষ ॥০, বাবু গিরিশচন্দ্র দাস ৵০, বাবু নীলমণি কোঙর ১৲, বাবু যামিনীকান্ত কোঙর /১০, বাবু গোপীমোহন সাহা ॥০, বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখো ১৲, বাবু কেশবচন্দ্র বাগছী ॥০, বাবু শশিভূষণ রায় ॥০, বাবু রামসুন্দর রায় ৵০, বাবু বিষ্ণুদাস নাথ ॥০, বাবু জগমোহন বীর স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, বাবু বিনোদ বিহারী পাল ২৲, Friends' Association, City College ৪।০, ২০।৫ ভবানীচরণ দত্তের লেনস্থ ছাত্রগণ ।৴১০।

বস্ত্রাদি।

মাঃ বাবু কালীনারায়ণ সেন ঢাকাই শাড়ী ১, কোট ১ ; কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু দুই পুটুলি পুরাতন কাপড় ; শ্রীমতী শৈলবালা মিত্র কামিজ ৫, কোট ৪, জ্যাকেট ১, মোজা ১, টুপি ২, পেণ্টুলন ১, গেঞ্জিফ্রক ১, তসর কাপড় ১ ; মাঃ বাবু সুধীরচন্দ্র মল্লিক পুরাতন থান ধুতি ১।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুস্তক বিক্রয় /১০, 'দাসী' হইতে প্রাপ্ত ১৫৲।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ১৪।০, দানপ্রাপ্তি ১৪৬৵০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৫/১০, গত মাসের জের ৩১।৴০, উদ্বৃত্ত জমা ৮৫, মোট আয় ২০৭॥৵১৫।

ব্যয়।

গিরিডি সেবালয় মঃ অঃ কমিশন সহিত ১২৯॥০, ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের অবশিষ্ট ঋণ শোধ ১৯৲, কমিশন ৩০৮/১৫, দাসীর ঋণ শোধ ৫৲, বাক্স ক্রয় ১৮৵০, বিপন্ন লোক ১॥০, পার্শেল ১৴১০, চট ৴০, ডাক খরচ ৵১০, বর্ণপরিচয় ফণ্ডে ঋণ ৵০, মোট ব্যয় ১৮৯।৵১৫।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ২০৭॥৵১৫, মোট ব্যয় ১৮৯।৵১৫, হস্তেস্থিত ১৮।০।

দাসী

"খাঁ জাহান আলী।"

বাগেরহাটের আপিস, কাছারি, বন্দর ও লোকের বাসস্থান ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে ৫।৭ মিনিটের পথ অগ্রসর হইলেই একটী পাকা রাস্তা পাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া চলিলেই খাঁঞ্জে আলীর প্রধান প্রধান কীর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাট হইতেই খাঁঞ্জে আলীর কীর্ত্তির আরম্ভ। মহকুমার পশ্চিম দিকে ৩।৪ মিনিটের পথ অন্তরই পাকা ঘাট সংলগ্ন এক একটী পুরাতন পুকুর দেখা যাইবে। অনেক স্থলে ঘাটগুলি খসিয়া পড়িয়াছে, পুকুরগুলিও শুকাইয়া পতিত জমিতে পরিণত হইয়াছে। পাকা ঘাটগুলির ভগ্নাবশেষ অধিকাংশ স্থলেই রহিয়াছে, পুকুরগুলি কোথাও শুষ্ক, কোথাওবা বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। দুই একটী পুকুরের নিকট ইষ্টকালয়ের চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। পাকা পথটী কিন্তু অদ্যাপিও সুদৃঢ়াবস্থায় আছে। পথের গাঁথনি দেখিলেই মনে হয়, ইহার নির্ম্মাণে বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। কতকাল পূর্ব্বে যে এ পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখনও পথটী বিলক্ষণ শক্ত আছে। বন জঙ্গলে পথের অনেক অংশ আবৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং কোন কোন স্থান হইতে লোকেরা ইষ্টক খুঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতেই পথ দিয়া অবাধে ও একটানে গমনাগমন করা যায় না। কিন্তু সামান্য সংস্কার হইলেই পথটী সুগম হইতে পারে। শুনিলাম এই পথ নাকি চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য তাহা জানি না। যাহা হউক খাঁঞ্জে আলীর যে সকল কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে, তৎসম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। প্রায় ২ মাইল পথ গাড়ীতে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল। যেখানে গাড়ী রহিল, সে স্থান ঘোর অরণ্যময়। সঙ্গীয় লোকেরা বলিল যে, নিকটবর্ত্তী বন হইতে সেখানে সময় সময় বড় বাঘ আসিয়া থাকে, নেকড়ে বাঘ নাকি

সেই বনেই আছে। আমরা ৫।৭ জন লোক দিনের বেলায় যাইতেছিলাম, সুতরাং আমাদের পক্ষে নেকড়ে বাঘকে ভয় করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন, বনের মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পাকা পথ চলিয়াছে। আমরা এই পথ ধরিয়া প্রায় এক মাইল চলিয়া গিয়া একটী ভগ্নপ্রায় প্রকাণ্ড উচ্চ খিলান করা ফটক পাইলাম। এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গিয়া চারিটী গুম্বজযুক্ত মস্‌জিদাকৃতি একটী বৃহৎ ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম।

একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি সুপ্রশস্ত প্রস্তর-পথ মন্দির পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। আমরা যখন এই পথে যাইতেছিলাম, তখন এক-জন মুসলমান আসিয়া আমাদিগকে জুতা পায় দিয়া মস্‌জিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তাহার সঙ্গে আর একজন মুসলমান জুটিল। তাহারা উভয়েই আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত মস্‌জিদের দ্বার খুলিয়া ভিতরে লইয়া গেল। মস্‌জিদের দ্বার প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অভ্যন্তরেও প্রস্তরের অনেক কারুকার্য্য আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই দিকে দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ। সমাধিস্তম্ভে পারসীতে অনেক কথা লেখা আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মধ্যে কেহই পারস্য ভাষা জানিতেন না, সুতরাং আমরা তাহা হইতে কিছুই জানিতে পারিলাম না। যে দুইটী মুসলমানের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা বলিল যে, সমাধিদ্বয়ের মধ্যে যেটী বৃহৎ তাহার নিম্নে পীর খাঁঞ্জে আলী সমাহিত আছেন, অপরটী তাঁহার উজিরের (তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) সমাধি। মুসলমানদ্বয় খাঁঞ্জেআলীর কেরামত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। কিন্তু তাহাদের কথায় পীর খাঁঞ্জেআলী বাদসাহ, নবাব, সৈনিক পুরুষ, কি ফকির, তাহার কিছুই বোঝা গেল না। সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে একটী অতি প্রকাণ্ড দীঘী। দীঘীর চতুষ্পার্শ্বে বন জঙ্গল হইয়াছে। সম্মুখের দিকে খানিকটা স্থান পরিষ্কার আছে। ঘাটের নিকট একটা ভয়ানক কুম্ভীর দেখিয়া আমরা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। তখনই কুম্ভীরের আহারের জন্য অপর দর্শকেরা একটী মুরগী দিয়াছিল। মুরগীটী গলাধঃকরণ করিয়া কুম্ভীর যখন ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল, তখনই আমরা তথায় উপস্থিত। একটী মুসলমান ছেলে কুম্ভীরকে একখানা লাঠি দ্বারা তাড়া করিতেছিল, কিন্তু কুম্ভীরের তাহা গ্রাহ্য নাই। কুম্ভীর হয় বালকটীকে

নিতান্ত কৃপাপাত্র মনে করিয়াই তাহার আঘাত ধীর ও শান্তভাবে সহ্য করিতেছিলেন, নয় বহুকাল অন্ধ পুকুরে বাস করিতে করিতে তাঁহার হিংস্র স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়া বড়ই নিরীহ হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক তাঁহাকে ভাল মানুষ বলিয়া আমাদের কিন্তু বিশ্বাস হইল না, তাঁহার গাত্র স্পর্শ করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্মুখে যাইতেও আমাদের সাহস হইল না। আমরা পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। শুনিলাম "কালাপাহাড়" ও "ধলাপাহাড়" নামে দুই প্রকাণ্ড কুম্ভীর সর্ব্বাগ্রে এই দীঘীতে ছিল। তাহাদিগকে নাকি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা হয় ত কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। যাহাকে দেখা গেল, ইনি বোধ হয় তাহাদেরই বংশধর। শুনিলাম, দীঘীর মধ্যস্থানে একটী মন্দির আছে। শীতকালে নাকি মন্দিরের কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বৈশাখ মাসের শেষভাগে গিয়াছিলাম, তখন বৃষ্টির জলে পুকুর পূর্ণ, আমাদের ভাগ্যে সে দর্শন লাভ হইল না। সেখান হইতে গাড়ীর নিকট ফিরিয়া আসা গেল। গাড়ীতে চড়িয়া পূর্ব্বদিকে প্রায় দুই মাইল পথ গিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া প্রায় আধ মাইল পথ চলিয়া একটী সুবৃহৎ ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম। ইহাই খাঁঞ্জেআলীর সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। এই ইষ্টকালয়ে ৭৭টী গুম্বজ আছে। সমস্তই খিলানের উপর। স্তম্ভগুলি প্রস্তরের। দেয়ালেও অনেক প্রস্তরের কাজ আছে। অনেক স্থান হইতে তস্করেরা প্রস্তর খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। মেঝেরও অনেক অংশে গভীর গর্ত্ত সকল দেখা গেল। প্রবাদ আছে যে, খাঁঞ্জেআলী বহু অর্থ ঘরের মেঝেতে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে কেহ কেহ সেই অর্থ লাভ করিয়া বড় মানুষ হইয়াছে। বরিশাল জিলার অধীনস্থ কোন স্থানের নবোন্নত ধনীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ একটা অপবাদ আছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাগেরহাটের নিকটে পাঁঠা বিক্রয় করিতে আসিয়া খাঁঞ্জে-আলীর প্রোথিত অর্থ লাভ করেন এবং পাঁঠাগুলি ছাড়িয়া দিয়া টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। বাগেরহাটের অতি নিকটবর্ত্তী কোন কোন জমিদার সম্বন্ধেও এইরূপ টাকা লাভের জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এ সকল জন-শ্রুতির সত্যাসত্য নিরূপণ করা কিন্তু বড়ই কঠিন ব্যাপার। ৭৭ গুম্বজ-শোভিত বৃহদায়তন বাড়ীটী দেখিলেই মনে হয়, বাদসাহী আমলের কোন মুসলমান বড় লোকের রুচি ও কল্পনা অনুসারে স্থপতিগণ বাড়ীটী নির্ম্মাণ

করিয়াছে। স্থাপত্য-বিদ্যা-নিপুণ ব্যক্তিগণ ভিন্ন এরূপ সুন্দর ও সুরুচিকর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা সাধারণ মিস্ত্রীগণের কর্ম্ম নয়। যাঁহারা আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের তাজমহল, কুতবমিনারের কারুকার্য্য দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অপ্রসিদ্ধ অরণ্যময়, সুন্দরবন-প্রদেশীয় এই বাড়ীটী একবার দেখিলে বুঝিতে পারেন, ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে কত শ্রম, কত অর্থ এবং কত যত্নের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার মালমস্লা, প্রস্তরাদি নিশ্চয়ই পশ্চিম হইতে আনা হইয়াছিল। তখন পশ্চিম যাইবার পথও এরূপ সুগম ছিল না। সুতরাং গো-শকটে ও মুটের স্কন্ধে চাপাইয়া এ সকল মালমস্লা আনাইতে নিশ্চয়ই অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতেও কম দিন লাগে নাই। বহুলোক খাটিয়া বহু বৎসরে এরূপ একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারে। বাড়ীটীর গঠন প্রণালী অনেকটা দুর্গের ধরণে। দুর্গের উদ্দেশ্যেই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহার দুইটী দ্বার। সদর দ্বারটী খুব উচ্চ থিলান, পশ্চাৎ দ্বার অনেক নীচু। ইহার নিম্নতল সমস্তই খোলা। স্তম্ভের উপরে বাড়ীটী দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং সমস্ত নিম্নতলটাকে একটা প্রকাণ্ড হল বলিলেই চলে। আমি তাহার এক প্রান্ত হইতে অতি উচ্চৈঃস্বরে ইংরেজীতে "সভাপতি মহাশয় ও ভদ্র মহোদয়গণ!" এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিয়াছিলাম, অপর প্রান্ত হইতে আমার সঙ্গীয় বন্ধুগণ বহুদূরের শব্দ যেরূপ শোনা যায় সেইরূপই শুনিতে পাইয়াছিলেন। কলিকাতার টাউন হল অপেক্ষা এ হলটী কিছু বড় হইবে বলিয়াই মনে হয়। একটী প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠা গেল। ছাত ঘোর অরণ্যময়। সঙ্গীয় লোকেরা বলিল ছাত এখন সর্প ব্যাঘ্রের আবাসভূমি হইয়াছে। আমরা ছাতের উপর দুই চারি মিনিট দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম। ছাদের উপরে নাকি একজন স্ত্রীলোক ফকীর থাকিতেন। অনেকে তাঁহাকে সিঁড়ির উপরিস্থ চিলাকোঠায় ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ধ্যানরত দেখিয়াছে। আমরা তাঁহার দর্শন পাইলাম না। উপরের কিছুই দেখা গেল না। একে নিবিড় বন, তাহাতে আবার সর্প ও ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়াই চক্ষু স্থির হইল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম এবং পশ্চাৎদিকের অপ্রশস্ত ও অনতি-দীর্ঘ দ্বার দিয়া নিকটবর্ত্তী দীঘীটা দেখিতে গমন করিলাম। এ বাড়ী হইতে দীঘীর নিকট যাইতে আমাদের ২।৩ মিনিটের অধিক লাগিল না। এটীকে ''ঘোড়াদীঘী'' বলে। "ঘোড়াদীঘী" নাম

শুনিয়াই আমার মনে হইল, নিশ্চয়ই এই প্রকাণ্ড বাড়ীটীতে সৈনিক পুরুষেরা থাকিত এবং তাহাদের অশ্বাদি স্নান করাইবারজন্য এ দীঘীটী কাটান হইয়াছিল। গোরস্থানের সম্মুখে যে দীঘীটা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, "ঘোড়াদীঘী" তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। "ঘোড়া দীঘীর" জল দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম, এরূপ পরিষ্কার জল পাড়াগেঁয়ে দীঘী পুষ্করিণীতে আমি অল্পই দেখিয়াছি। দীঘীটার অধিকাংশ বনজঙ্গলে আবৃত হইয়া আছে। সম্মুখের দিক অনেকটা পরিষ্কার। আমরা যখন ঘোড়াদীঘীর নিকট গেলাম, তখন দুইটী চণ্ডাল স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমরা সেখান হইতে সরিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু তাহারা শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে দীঘী দেখিবার সুবিধা করিয়া দিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, দীঘীতে অনেক কুম্ভীর আছে। আমরা "আয় আয়" করিয়া ডাকিবামাত্র একটী কুম্ভীর মাথা তুলিয়া ঘাটের দিকে আসিতে লাগিল। কুম্ভীর যখন ঘাটের অনেকটা কাছে আসিয়াছে, তখনও স্ত্রীলোক দুইটীর মধ্যে একজন জলে পা দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা তাহাকে পারে উঠিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু সে একটু হাসিয়া বলিল, "এ কুমুর কাহাকেও কিছু বলে না।" তখন অপর স্ত্রীলোকটী কুম্ভীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে তুই আসিস্‌নে, বাবুরা তোর জন্য কিছুই আনেন নাই, মিছামিছি ডাক্‌ছেন।" আশ্চর্য্য বাপার! কুম্ভীর আর অগ্রসর হইল না। যতদূর আসিয়াছিল, তত দূরেই মাথা জাগাইয়া রহিল। নিরাশার কথা শুনিয়া বুঝিবা বেচারার আর পা চলিল না। আমরা কুম্ভীরকে সেই অবস্থায় রাখিয়া ৭৭ গুম্বজ বিশিষ্ট বাড়ীতে আবার ফিরিয়া আসিলাম এবং আর কিছুকাল এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম এবং বাঘেরহাট ফিরিয়া যাইবার সময় গাড়ীতে বসিয়া সকলেই নীরবে গম্ভীরভাবে "খাঁঞ্জেআলীর" বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর জীবন-বৃত্তান্তে "পীর আলীখাঁর" সমাধি মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই পীর আলিখাঁই পীর খাঁনজাহান আলী তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। এই জীব গোস্বামীর পিতৃপিতামহের কাটোয়া ও বরিশাল জেলার অন্তর্গত চন্দ্রদীপে বাসস্থান ছিল। তাঁহারা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাটোয়া হইতে বরিশাল জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী চন্দ্রদীপে যাইবার সময় বর্ত্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী ফয়তাবাদে বিশ্রাম করিয়া যাইতেন। ফয়তাবাদেও তাঁহাদের বিশ্রাম বাড়ী ছিল। এই ফয়তাবাদই "পীর খাঁনজাহান আলীর" ক্ষুদ্র

নগর। ব্লকম্যান সাহেব নানা প্রদেশীয় মুদ্রা ও সমাধির উপরিস্থ পারস্য ও আরব্য অক্ষরে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি বিশ্লেষণ করিয়া মুসলমানদিগের রাজত্ব কালীন অনেক স্থানের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি পীর খাঁঞ্জেআলীর সমাধি মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া এই বিধ্বস্ত নগরকে "কালীফয়তাবাদ" নাম দিয়াছেন। উভয় জীব গোস্বামীর জীবন চরিতে ও ব্লকম্যান সাহেবের বিবরণে যশোহরের অন্তর্গত ফয়তাবাদ বা কালীফয়তাবাদের নামোল্লেখ আছে।

জীব গোস্বামীর পিতৃপুরুষেরা ফয়তাবাদে অবস্থান করিতেন। জীব-গোস্বামীর পিতৃপুরুষদিগকে ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ জীবগোস্বামীকে ধরিয়া হিসাব করিলেও ফয়তাবাদ নগর প্রায় ৪০০শত বৎসরাবধি প্রতিষ্ঠিত, ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবগোস্বামী শ্রীশ্রী ৺ চৈতন্যপ্রভুর সমকাল-বর্ত্তী লোক। তবে তিনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন। অতএব মহাপ্রভুর তিরো-ভাব হইতে গণনা করিলেও বর্ত্তমান ১৮১৭ শক পর্য্যন্ত ৩৬২ বৎসর হয়। সে যাহা হউক পীরখাঁনজাহানআলীর ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ফয়তাবাদ নগরেরও কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। বাগেরহাট মহকুমার কাননগো মহাশয় গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র খুঁজিয়া এ সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখককে তদ্বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, খাঁনজাহান-আলীর বর্ত্তমান কীর্ত্তি সকল রক্ষা করিবার দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট "খাঁনজাহানআলীর" বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একবার বিস্তারিত বিবরণ চাহিয়াছিলেন। তদনুসারে বাগেরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কাননগো মহাশয়কে তথায় পাঠাইয়া ইহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণ-মেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

সংসার ও ধর্ম্ম।

সংসারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের নানারূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। উত্তরগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। সংসারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে সংসার একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিব অথচ ধর্ম্মলাভও করিব, ইহা হইতে পারে না। যেখানে সংসা-রের শেষ, সেইখানে ধর্ম্মের আরম্ভ।

২। সংসারে থাকিয়াও ধর্ম্মসাধন হইতে পারে। সংসার ধর্ম্মের বিরোধী নহে, বরং সহায়। কর্ম্মক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ধর্ম্মজীবনের সূচনাই হয় না।

৩। সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন অর্থশূন্য কথা। একেকে পরি-ত্যাগ করিয়া অপর থাকিতে পারে না। বায়ুশূন্য স্থানে উড্ডয়ন যেরূপ অসম্ভব, দেশকে (space) অবলম্বন না করিয়া ভ্রমণ যেমন প্রলাপবাক্য, সেইরূপ সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন আকাশ-কুসুম মাত্র। সংসার ধর্ম্মের বহির্ব্বিকাশ, ধর্ম্ম সংসারের আন্তরিক শক্তি।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার মত রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ সকল গুলিকেই একটা না একটার অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। যাঁহারা বলেন সংসার ও ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, একের সহিত অপরের চিরশত্রুতা, তাঁহাদের মতের বিস্তৃত সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের কথা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, তাহা ছাড়া আর যত প্রকার সিদ্ধান্ত আছে, তাহার সকলগুলিই ষোল আনা ভুল, এমন আস্পর্দ্ধা করিতে হইলে যে সমস্ত সদ্‌গুণ আবশ্যক, তাহার কিছুই আমাতে নাই। সত্যরাজ্যের দরজা খুলিবার একমাত্র চাবি আমার হাতে আছে, এমন আস্ফালন কোন সাহসে করিব? তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সাক্ষাতভাবেই হউক, পরোক্ষভাবেই হউক, যে মত অসত্য, তাহা স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট। "সংসার ধর্ম্মের শত্রু" এই কথা স্ববিরোধী কিনা, তাহা নির্ণয়ের সহায়তা করিবার জন্য আমি কেবলমাত্র একটী প্রশ্ন করিয়া ক্ষান্ত হইব। সকলেই স্বীকার করিবেন, সংসার ঈশ্বর হইতে প্রসূত ও তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত। অল্প কথায় বলিতে গেলে, ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ স্থাপন করা ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যাহার সহিত ঈশ্বরের নিত্যযোগ, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও যাহা তিষ্ঠিতে পারে না, ঐশী শক্তি হইতে যাহার উৎপত্তি; ঈশ্বরের সহিত মান-

বাত্মার যোগস্থাপনের পক্ষে তাহা কেমন করিয়া অন্তরায় হইতে পারে? সংসার যদি ঈশ্বরের প্রকাশ হয়, তবে তাহা মানবাত্মাকে ঈশ্বরের নিকটে না আনিয়া কেমন করিয়া তাঁহা হইতে দূরে ফেলিবে? এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। ধর্ম্মের দুইটা দিক আছে। একটা ভাবের দিক—অন্তরের দিক; আর একটা বাহিরের দিক অর্থাৎ কার্য্যের দিক। বলা বাহুল্য কার্য্যের দিক পরিত্যাগ করিলে, ধর্ম্ম একেবারে লোপ না পাইলেও নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠান নাই, উল্লেখযোগ্য এমন কোনও ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

এখন প্রশ্ন এই, ধর্ম্মানুষ্ঠান কাহাকে বলে? কোন্ কার্য্যগুলিকে ধর্ম্মানুষ্ঠান নামে অভিহিত করা যাইতে পারে? ধর্ম্মকার্য্য সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ হইতে স্বতন্ত্র না এক? * অনেকে হয়ত বলিবেন, সংসারে যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, তাহা ছাড়া ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, সেই সকল কর্ত্তব্যের সমষ্টিকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলা যায়। এ কথা সত্য হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান সাংসারিক কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে। এ মতের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এ মত সত্য হইলে আরও যে কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। ঈশ্বরের প্রতি যদি মানবের "কর্ত্তব্য" থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর মানুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তুমি যদি আমা হইতে স্বতন্ত্র, সীমাবিশিষ্ট ব্যক্তি না হও, তোমার যদি কতকগুলি ন্যায্য অধিকার (rights) না থাকে এবং তুমি ও আমি যদি এক সমাজভুক্ত না হই, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার কোনও কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। রামের সঙ্গে যদুর যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত যদি তাহার ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ না হয়, তবে ঈশ্বরের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য আছে, এ কথা বলা যায় না। অল্প কথায় বলিতে গেলে, ঈশ্বরকে সসীম ও মানবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে না করিলে, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে, এ কথার কোনও অর্থ থাকে না। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ দ্বৈতবাদীদিগের (Deists) মত কেহ বলিতে পারেন, ঈশ্বর জগৎ ও মান-

* মানুষ স্ব ইচ্ছায় যত প্রকার কার্যও করিতে পারে, তাহার সকলগুলিকে আমি "সাংসারিক কার্য্য" এই নাম প্রদান করিতেছি না। যে সকল কার্য্য নীতিবিগর্হিত নহে তাহাই প্রকৃতপক্ষে সংসারের কার্য্য।

বাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি কেবল জগৎ সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহার পর জগৎ আপনা আপনি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিতেছে। যিনি এ প্রকার মতাবলম্বী, তিনি বলিলেও বলিতে পারেন, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু যিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর জগতের প্রাণ, মানবাত্মার সহিত তাঁহার বস্তুগত কোনও পার্থক্য নাই, জগৎ তাঁহারই বাহ্য প্রকাশ, এক কথায় যিনি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহার নিকট ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য অর্থশূন্য কথা।

তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করা গেল, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে। সেই সকল কর্ত্তব্য কি? কেহ হয়ত বলিবেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যসাধন করা হইল। বেশ কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধর্ম্মের একটা আভ্যন্তরিক দিক আছে। উপাসনা ধর্ম্মের সেই ভিতরের দিক; কিন্তু ধর্ম্মের ভিতরের দিক থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম নিতান্ত অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। অধিকন্তু বাহির পরিত্যাগ করিলে ভিতরেরও অস্তিত্ব লোপ পায়। তাহা ছাড়া উপাসনাকে—আত্মার সহিত পরমাত্মার অচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করাকে "কর্ত্তব্যকার্য্য" বলা কতদূর সঙ্গত, চিন্তাশীল পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

যাহাদিগকে "ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য" এই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে, যদি এমন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে, ধর্ম্মের সহিত সংসারের পার্থক্য কি রহিল? সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কি তবে ধর্ম্ম? একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে, ধর্ম্মের সহিত সংসারের বাস্তবিকই কোন প্রভেদ নাই। কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া আপন আপন অনুষ্ঠিতব্য কার্য্য সম্পাদন ভিন্ন ধর্ম্মসাধনের অপর কোনও পথ নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, সংসার ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। পরিবারে ও সমাজে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম্ম অসম্ভব, এ কথায় বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না। ধর্ম্মানুষ্ঠানের অর্থ ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন নহে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন একই

বস্তু, এ কথা মানিতেই হইতেছে। যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যও নহে, সংসারধর্ম্ম-প্রতিপালনও নহে, এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, ইহা প্রতিপন্ন করার ভার তাঁহার উপর। ধর্ম্মের বাহিরের দিকের—অনুষ্ঠানের দিকের সহিত সংসারের কোনও পার্থক্য নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন যদি ধর্ম্ম অসম্ভব হয় ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে সংসার ও ধর্ম্ম অবিভাজ্যরূপে পরস্পরের সহিত নিত্য সংযুক্ত এ কথা প্রমাণিত হইতেছে। সংসার ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র নহে, ধর্ম্মের বহির্ব্বিকাশ।

যাঁহারা সংসারের সহিত ধর্ম্মের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেখিয়া, আমি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক এরূপ সন্দেহ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত হইতে অনুরোধ করি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের একটা ভিতরের দিক আছে। বাহির ছাড়া ভিতর থাকে না, ভিতর ছাড়া বাহির থাকে না, ইহাই আমার একমাত্র বক্তব্য। সংসার ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, এ কথা শুনিয়া যাঁহারা আমার উপর বেজায় চটিয়া গিয়াছেন, যদি তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকৃত পক্ষে সংসার হয় না, এই অবশিষ্ট কথাটুকু বলি, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইব কি? ধর্ম্ম ভিন্ন সাংসারিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু সংসার থাকে না। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ও বিষয়াসক্ত গৃহস্থের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। আবার সংসার ভিন্ন গৈরিক বসন থাকিতে পারে, অশ্রু, মূর্চ্ছা, ভাবের তরঙ্গ থাকিতে পারে, কীর্ত্তন, উল্লম্ফন, চীৎকার, বক্তৃতাময়ী উপাসনা, প্রভৃতি থাকিতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন। কান্তিপূর্ণ জীবন্ত দেহের সহিত কঙ্কালের যে প্রভেদ, সংসারযুক্ত ধর্ম্ম ও সংসারবিবর্জ্জিত ধর্ম্মের (?) মধ্যে সেই প্রভেদ।

দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ পরম ধার্ম্মিক মহাজনের নিকট নিতান্ত হেয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের দিক হইতে দেখিলে সেইগুলিই ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশমান একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের সহিত আপনার অচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করিয়া ও আপনাকে তাঁহারই কার্য্যসম্পাদনের যন্ত্রস্বরূপ জানিয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন। জগৎকে জড়পিণ্ডমাত্র মনে কর ও ঈশ্বরকে ইহা হইতে দূরে রাখিয়া দাও, অহং জ্ঞানে স্ফীত হইয়া আপনাকে ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন জীব মনে কর, নিজকৃত কার্য্য সমূহের সহিত

বিশ্বযন্ত্র ও বিশ্বপ্রাণের নিগূঢ় ও অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ বিস্মৃত হও, * তোমার সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন শুষ্ক সাংসারিকতায় পরিণত হইবে। আবার সংসারকে দূরে ফেলিবার চেষ্টা কর, সমাজ ও পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে সকল কর্ত্তব্য-পাশ দ্বারা আবদ্ধ, সেই সকলের প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন কর, তোমার ধর্ম্মসাধন পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে। তুমি আপনিও প্রতারিত হইবে, অপরকেও প্রতারিত করিবে। দুইভাবে দেখিলে একই জিনিষ দুইরূপ দেখায়। যে সকল সাংসারিক কার্য্য শুদ্ধ সংসারের চক্ষে দেখিলে সাংসারিকতার আকার ধারণ করে, সেই সকল কার্য্যই সমগ্রের (whole)—ব্রহ্মের দিক দিয়া দেখিলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হইবে। একটী সুন্দর গোলাপ দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন, আর নীরসপ্রাণ কবিত্বশূন্য কোনও ব্যক্তি গোলাপ যে কতকগুলি জড় পরমাণুর বিশেষ প্রকার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। দুই জনে একই জিনিষ দেখিতেছেন, কিন্তু দেখিবার তারতম্য আছে। কবি যাহা দেখিতেছেন, তাহা অপেক্ষা কিছু কম অপর ব্যক্তির নয়নগোচর হইতেছে, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু কবি যে চক্ষে দেখিতেছেন, অপর ব্যক্তি সেই চক্ষে দেখিতেছেন না। কিন্তু কবি যে ভাবেই দেখুন না কেন, দ্রষ্টব্য পদার্থ তাঁহার সম্মুখে থাকা চাই। গোলাপ ফুলটিকে যদি নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কবির কবিত্ব কোথায় থাকে? সেইরূপ সাংসারিক সংসারকে যে ভাবে দেখেন, ধার্ম্মিক সেই সংসারকেই আর একভাবে দেখেন। কিন্তু সংসারকে যদি দূরে অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম কোথায় থাকে?

ফল কথা এই, সংসার ধর্ম্মের শত্রুও নহে, ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্রও নহে, কিন্তু ধর্ম্মের বহির্ব্বিকাশ। সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন করা যেমন সম্ভব, দেহত্যাগ করিয়া প্রাণধারণও তেমনি সম্ভব। জনসাধারণের এমনই আশ্চর্য্য ধারণা যে গভীর মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ পাদদেশ, হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ও চন্দ্রতারকাশোভিত নীলাকাশের সীমা অতিক্রম না করিলে ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায় না। যাঁহাকে পাইবার জন্য দিগ্‌দিগন্তে হস্ত

* যন্ত্র কথাটা এরূপভাবে ব্যবহার করা উচিত নহে। ইংরাজী organism শব্দের ঠিক বাঙ্গালা মনে না পড়াতে অগত্যা "যন্ত্র" শব্দ ব্যবহার করিলাম।

প্রসারণ করিতেছি, তিনি চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছেন, অথচ দেখিতেছি না। যিনি জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যের প্রাণস্বরূপ হইয়া আছেন, তাঁহাকে মূর্চ্ছা ও উচ্ছ্বাসের ক্ষণিক সুখসম্ভোগের কাল ভিন্ন অপর সময়ে চিনিতে পারিতেছি না! পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যদি ঈশ্বরের দর্শন লাভ না কর, তবে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না; কেন বৃথা কষ্ট করিয়া মর? অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ধর্ম্ম কি তবে এতই সহজ প্রাপ্য? আমার উত্তর এই—ধর্ম্ম এত সহজ প্রাপ্য বলিয়াই এত দুর্লভ।

শ্রীহীরালাল হালদার।

শান্তিনিকেতন।

আশ্রমে বসিয়া আছি। হাত কয়েক মাত্র পুষ্পফলে অবনত বৃক্ষ সকল বিরাজ করিতেছে। তাহার পরে দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর। কোন দিকে বা গ্রামের শ্যামল প্রান্তরেখা দেখা যাইতেছে, কোন দিকে বা তাহাও দেখা যাইতেছে না। এই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আমি একাকী বসিয়া আছি। প্রভাতের মলয়-বায়ুর মৃদুহিল্লোল আমাকে চামর ব্যজন করিতেছে। সূর্য্য-কিরণ বিপুলচ্ছায় বৃক্ষের অন্তরাল হইতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া আমার শীতাপনয়ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সংসারের বিষময় কোলাহল প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছে না; বিহগকুল মধুধারা বর্ষণ করিয়া হৃদয়-নিহিত দাবাগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে। আশ্চর্য্য! এই প্রান্তরের মধ্যে আমি কি ক্ষুদ্র, কিন্তু সকলেই যেন আমারই সেবা করিতে ব্যস্ত। যখন সংসারের কোলাহলময় নগরে থাকি, তখন আমি আপনাকেই কত বড় ভাবি। সকলেই চীৎকার করিতেছে; আমি মনে করি যে আমার সুকণ্ঠ হইতে একটি চীৎকারধ্বনি বহির্গত না হইলে, চীৎকারগুলি ঠিক সুস্বর হইতেছে না। সকলেই কার্য্য করিতেছে; আমি মনে করি যে সেই সকল কার্য্যে আমার হস্ত থাকিলে তাহা আরও অধিক সুসম্পন্ন হইত। কোলাহলের সংসারে আমি আপনাকে খুব বড় লোক ভাবিয়া সকলের সঙ্গে আমিও চীৎকার করিয়া কোলাহলই বাড়াইতে থাকি, কমাইতে পারি না। কিন্তু এই আশ্রমের নির্জ্জনতার মধ্যে আসিয়া আমিও মগ্ন হইয়া গিয়াছি; আমার ক্ষুদ্রতা

বুঝিয়াছি; কোলাহল করিবার ক্ষমতাই হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই নির্জ্জন-বাসে আমি আমার ক্ষুদ্রতাও বুঝিয়াছি, আমার মহত্ত্বও বুঝিয়াছি। হে দেবদেব! এই বিশ্বমন্দিরে আসীন তোমাকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছে, "মধ্যে বামন মাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

আর তোমারি সেই অনন্ত জ্যোতির বিস্ফুলিঙ্গমাত্র এই মানবাত্মার সেবার জন্য তোমারি আদেশে বিশ্বজগৎ নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে। আমি যতটুকু জড়, ততটুকু ক্ষুদ্র; জড়শক্তি সকল অন্ধভাবে আমার সেই জড়-দেহের উপর দ্বন্দ্ব লাগাইতেছে; আমার বলিবার ক্ষমতা নাই, আমার করিবার ক্ষমতা নাই; জড়শক্তির অধীন হইয়াই এই জড়দেহকে চলিতে হইবে। আমি যতটুকু আত্মা, ততটুকু মহান্; এখানে জড়শক্তির কোন ক্ষমতাই খাটিবে না; আত্মা সেই জীবনের উৎস, শক্তির উৎস, প্রেমের উৎস পরমাত্মার নিকট হইতে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। জড়দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্; আত্মা, গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় বিশ্বজননীর গর্ভে বাস করিয়া অমৃতপানে পরিপুষ্ট হয়।

সংঘর্ষণ না হইলে কোন পদার্থেরই অনুভব হয় না, ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। এই যে আলোক অনুভব করিতেছি, যদি না ধূলি প্রভৃতি পদার্থ রাশির সহিত ইহার সংঘর্ষণ হইত, তবে ইহা অনুভব করিতে পারিতাম না। আমার বাহুতে যে বল আছে, অপর কোন পদার্থের সংঘর্ষণে বাধা না পাইলে সে বল অনুভব করিতে অক্ষম হই। তেমনি কোলাহলময় সংসারে জড়-পদার্থের সহিত অধিক সংঘর্ষণ হয় বলিয়া সেখানে জড়-দেহপিণ্ডেরই অধিক অনুভব হয়, দেহপিণ্ডেরই কথা অধিক শুনিতে পাওয়া যায়—সেখানে তাই দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত আত্ম-তত্ত্ব উপহাসের কথা। কিন্তু এই নির্জ্জন আশ্রমে জড়-পদার্থের সহিত জড়-দেহের তত সংঘর্ষণ হয় না, যত পরমাত্মার সহিত আত্মার। এখানে কাহাকেও ধাক্কা মারিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিতে হয় না; পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না। এখানে আত্মা, যতটা পারে জড়-দেহের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মার অতুল ঐশ্বর্য্যে আপনাকে দিবানিশি মগ্ন রাখিতে চাহে। এখানে তাই জড়তত্ত্ব কেহ শুনিতে চাহে না, আত্মতত্ত্বই হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া থাকে। পরমাত্মার সহিত সংঘর্ষণে আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়।

ভবকোলাহল দুরে ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন আশ্রমে ধ্যানচক্ষে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া কত না সুখশান্তি ভোগ করিতেছি। এই টুকু সুখ শান্তি দিবার জন্য প্রকৃতি আপনার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। মানবাত্মাকে সুখে স্বচ্ছন্দে পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য ভগবান এই জগতের মহান্ দাসাশ্রম খুলিয়াছেন। প্রকৃতি তথায় সেবিকা; এই মহান্ আকাশ তাহার জলন্ত চুল্লী; সূর্য্য চন্দ্র তাহার ইন্ধন; পৃথিবী ও পৃথিবীর ন্যায় জীবজন্তর আবাসভূমি অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহ। এই দাসাশ্রমে যেমন জড়দেহের পুষ্টির জন্য নানাবিধ ফুল ফল দিবানিশি প্রস্তুত রহিয়াছে, তেমনি আত্মারও পুষ্টির জন্য প্রেম, দয়া প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ দিবানিশি সজ্জিত রহিয়াছে। হে দেব! তোমার কি করুণা! আমরা পাপী তাপী দীন দরিদ্র হইলেও তুমি আমাদিগকে সুখশান্তি দিবার কত চেষ্টা করিতেছ। আমরা সকলেই অনাথ আতুর জন; অনাথ-নাথ তুমি, তুমিই দীনদয়াল। প্রেম, দান প্রভৃতি সুমিষ্ট উপকরণ পাওয়া যায় বলিয়াই এত কষ্টের সংসারও সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতন বলিয়া বুঝিতে পারি। এই মহান্ দাসাশ্রম প্রকৃতই শান্তি-নিকেতন; এখানে দেখ, সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তোমারই সেবা করিতেছে। তবে আমরা যে অনেক সময়ে এই সংসারকে শান্তিনিকেতন বলিয়া দেখি না, তাহা আমাদেরই চক্ষের দোষ। আমাদের চক্ষু হইতে কুটা সরাইতে পারি না, আর এই জগৎ সংসারকে শান্তিহীন, অশান্তিপূর্ণ মরুভূমি বলিয়া চীৎকার করিতে থাকি। যতদিন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র উদিত হইতে থাকিবে, যতদিন পুষ্পরাশি সুগন্ধ বিস্তার করিবে, যতদিন ওষধি বনস্পতি সকল ফলভরে অবনত হইতে থাকিবে, যতদিন নদী সকল সুমিষ্ট জল প্রবাহিত করিবে, এবং যতদিন প্রেম, ভক্তি, দয়া বাৎসল্য প্রভৃতি স্বর্গীয় বস্তু ইহজগতে বিরাজ করিবে, ততদিন ইহা শান্তি-নিকেতন থাকিবেই। যে জড়দেহের প্রতিবন্ধকতায় এই শান্তিনিকেতনের শান্ত ভাব অনেক সময়ে ধরিতে পারি না, না জানি, সেই জড়দেহ হইতে মুক্ত হইলে কত শান্তি লাভ করিব। হে প্রাণময়! তুমি এই জড় শরীর বিচূর্ণ করিয়া দাও। আত্মা তোমার শান্ত-স্বরূপ নিত্যকাল দেখিয়া শান্তি লাভ করুক।

মানব! তুমিও যদি এই পৃথিবীকে শান্তি-নিকেতন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই পরমাত্মাকে তোমার আদর্শ কর, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছা সম্মিলিত কর। ঈশ্বর এই জগতে সুখ শান্তি দিবার জন্য এক মহান্ দাসাশ্রম খুলিয়াছেন, তুমিও সেই আদর্শে তোমার উপযুক্ত দাসাশ্রম খোল; তোমার সাধ্যমত অনাথ আতুরজনকে আশ্রয় দাও। মহান্ আকাশ ঈশ্বরের; আমরা তাহাকে আমাদের উপযুক্ত করিয়া বলি ঘটাকাশ, পটাকাশ। মহান্ দাসাশ্রম ঈশ্বরের এই জগৎ; আমরা আবার তাহারই মধ্যে এক একটী সীমা কল্পনা করিয়া বলি, এই দাসাশ্রম এই দেশের, অমুক দাসাশ্রম অমুক গ্রামের, আর তৃতীয় দাসাশ্রম অমুক নগরের। কিন্তু সকল দাসাশ্রমেই সেই মহান্ দাসাশ্রমেরই আংশিক প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। মানব! তুমি উৎসাহ পাওনা বলিয়া, প্রশংসা পাওনা বলিয়া দাসাশ্রম খুলিতে পরাঙ্মুখ হইও না। যখন দেখিব গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, সকলেই অনাথ আতুরদিগকে, দীনদরিদ্রদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া লাগিয়াছে; যখন দেখিব মনুষ্যদিগের মধ্যে দ্বেষ হিংসা লোভ চলিয়া গিয়া সাধুবৃত্তি সকলেই কেবল রাজত্ব করিতেছে, তখনই জানিব জগতে দাসাশ্রমের প্রভাব পূর্ণ বিস্তৃত; তখনই জানিব ধরণীতে শান্তি-নিকেতন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্র।

(৩)

মৃণালিনী—মৃণালিনী বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্যবিষয়ক প্রথম উপন্যাস; এই স্থান হইতে এক নূতন ধারা প্রবাহিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রেমপ্রধান। সামান্য কোনও লেখকের হস্তে পতিত হইলে পুনরুক্তিতে প্রেম অরুচিকর হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকবার এই প্রেমকে নূতন নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন। কাজেই বৈচিত্রের জন্য প্রত্যেক মূর্ত্তিই মনোহর; প্রত্যেক মূর্ত্তিকে তিনি নূতন নূতন সৌন্দর্য্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন। এক সূর্য্যালোক কতস্থানে কত ভিন্নরূপ দেখায়, কিন্তু তাহা কখন বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয় কি? প্রভাতে যখন মেঘের উপর সোনালি ছটা ছড়াইয়া পড়ে, তখন এক শোভা, মধ্যাহ্নে এক শোভা, আবার সান্ধ্য গগনে অম্বুদমালার উপর সেই অস্তরবি রশ্মিরাশির খেলায় আর এক সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়; বৃক্ষপত্রে প্রতিফলিত সে কিরণের এক শোভা, আবার অম্বুধির বিশাল

বক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে শতখণ্ডে ভগ্ন সে কিরণের আর এক শোভা। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রেমকে সেইরূপ নানা শোভায় দেখাইয়াছেন। মৃণালিনী আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রেমপ্রধান উপন্যাস।

মৃণালিনী পাঠ করিলে প্রধানতঃ পাঁচটি চিত্র চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়ঃ—মনোরমা, মৃণালিনী, গিরিজায়া, হেমচন্দ্র ও পশুপতি। তন্মধ্যে মনোরমা চরিত্র একটি মধুর কবিতা। ব্যাখ্যায় কবিতার মাধুরী বুঝাইয়া দিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কবিতার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যায় থাকে না, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হয়। তাই মনোরমার চরিত্র কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া সহজ কার্য্য নহে; সে চেষ্টাও এখানে করিতে ইচ্ছা করি না।

নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে দূরাগত মধুর সঙ্গীতের ন্যায় মনোরমার চরিত্র হৃদয়ে এক স্নিগ্ধতা ঢালিয়া যায়। তাহার স্মৃতি অপনীত হইতে সময় লাগে। মনোরমা দুই মূর্ত্তিতে পাঠককে দেখা দিয়াছেন; এক সেই "কুসুম নির্ম্মিতা" বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী আর এক সেই "তেজোগর্ব্ববিশিষ্টা কুঞ্চিত ভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী" প্রৌঢ়া। প্রথম দর্শনে মনোরমা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সরলতা এবং জ্ঞান যে পরস্পর বিরোধী নহে, তাহা বুঝিলেই মনোরমাকে আর প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে না। তাহা ভিন্ন মনোরমার অবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ; সেই তেজস্বিনী বালিকা যখন আপনার জীবনের আশ্চর্য্য ইতিহাস জানিতে পারিল, তবুও দেখিল যে সুখ তাহার প্রাপ্য সে সুখ হইতে সে কতদূরে, তখন তাহার অবস্থা ভাবিয়া দেখ। সে আপনাকে রহস্যের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে বাধ্য হইল। যখন মনোরমা হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিল, তখন মনোরমা বালিকা; যখন মনোরমা, মৃণালিনীর মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী শ্রবণানন্তর হেমচন্দ্রের বর্ষণোন্মুখ-অম্বুদমালা-শোভিত অম্বরের মত মুখ দেখিয়া তাঁহার কাতরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমচন্দ্র বলিলেন, "কিছু না," তখন মনোরমা বলিল, "কিছু না—বলিবে না! ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে!" কিন্তু মনোরমা আপনার বুকে বিছা পুষিয়াছিল, তাহার নয়নে অশ্রু আসিল—এই মনোরমা বালিকা নহে। তাহার প্রেম সম্বন্ধীয় কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, "আমি ইহাকে একদিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম!" কিন্তু হেমচন্দ্রের সেই সকল গম্ভীর কথার মধ্যে মনোরমা বলিল, "ভাই হেমচন্দ্র, তোমার এ জীন

কিসের চামড়া?" হেমচন্দ্র দেখিলেন বালিকা। পশুপতির নিকটেও তাহার দুই মূর্ত্তি। যখন "সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল, তখন এক মূর্ত্তি; আর যখন মনোরমা পশুপতিকে উপদেশ দান করে বা ভৎর্সনা করে, তখন এক মূর্ত্তি। যখন মনোরমা হেমচন্দ্রকে বলিল—"আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে?" আবার বলিল—"তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না।" তখন বুঝিলাম সে নর-হৃদয়ের সকল তত্ত্বই অবগত ছিল। একবার "মোহিতা" মনোরমাকে মনে করিয়া দেখ, দেখিবে, তাহার হৃদয়ের গভীরতা অসীম, তাহার ভালবাসা অপরিমেয়, সে রমণীকুলের ভূষণ। মনোরমা যখন পশুপতিকে বলিল, "এ ঘর ছাড় তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত চেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণ সেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যেদিন আমাদের আয়ুঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে"—সে বলিল, "নহিলে দেবী সমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এজন্মের মত আর সাক্ষাৎ হইবে না।" তখন দেখিলাম মনোরমার হৃদয়ের দৃঢ়তা। মনোরমা প্রতিভার মানসকুসুম। যখন কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা দেখিয়া হেমচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না, মনোরমা বালিকা না তরুণী, তখন হইতেই মনোরমার কবিতার আরম্ভ। আর সেই বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষচ্ছায়াময় স্বচ্ছান্ধকারাবৃত বাপীকূলে স্বচ্ছান্ধকারময় হৃদয় লইয়া মনোরমা—তাই বলিয়াছি মনোরমা আদ্যোপান্ত একটি কবিতা। যাঁহারা রমণীহৃদয়ে নবযৌবনোন্মেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, যাঁহারা কতকাংশেও মনোরমার ন্যায় অবস্থাপন্না রমণীর ভাব অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, মনোরমা কেবল কবিকল্পনা নহে।

মৃণালিনীর চরিত্র স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল। আয়েসা এবং তিলোত্তমার বা মনোরমা এবং গিরিজায়ার একত্রীকরণ মৃণালিনী। মৃণালিনীর হৃদয় প্রেমের

লীলাভূমি। প্রেমের জন্য রমণী কতদূর করিতে পারে এই চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। জীবনের শত আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, শত বাধাবিঘ্নের উপর দিয়া প্রেম কেমন করিয়া সাগরসঙ্গমাভিলাষিণী স্রোতস্বতীর মত বহিয়া যায়, এই চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। মৃণালিনী প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র। মর্ম্মপীড়িতা, প্রণয়ী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা, যাহার জন্য তিনি গৃহত্যাগিনী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা অপমানিতা মৃণালিনী যখন বলিলেন যে তিনি নিজেই হেমচন্দ্রের দুর্ব্ব্যবহারের কারণ—বলিলেন, "সে আমারই দোষ, আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম।" তখন আমরা বুঝিতে পারি না এই মৃণালিনী দেবী কি মানবী! সেইখানেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ, সেইখানেই প্রেম তাঁহার পূর্ণমহিমায় প্রকাশিত। মৃণালিনীর হৃদয়তরণী জীবনের "সকালবেলা" প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়াছিল। তখন আশার পবন বহিতেছিল—মৃণালিনীও ভাবিয়াছিল, "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।" কিন্তু, "হেনকালে কালমেঘ উঠিল আকাশে"—মাধবাচার্য্যের আজ্ঞায় হেমচন্দ্র দূরে গমন করিলেন, তখন মনে হইল, "কূলত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।" কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই। সেখানে কলঙ্কের কণ্টকতরু যাতনার ভুজঙ্গে বেষ্টিত। তখন কেবল দুঃখ রহিল—

"যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া দিনু তরি
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে।"

নবকিশলয়দলশোভিতা ব্রততীর উপর একটি অনাঘ্রাত প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুমের মত এই গ্রন্থমধ্যে গিরিজায়ার চিত্র—কুসুমটি সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে কিন্তু তাহার উপযোগিতাও যথেষ্ট। "বঙ্কিমচন্দ্র" লেখক বলিয়াছেন, "বিরহ-দুঃখকাতরা মর্ম্মপীড়িতা রাজরাণী মৃণালিনীর পার্শ্বে মিলনলালসাবতী আনন্দময়ী ভিখারিণী গিরিজায়া বড়ই সুন্দর শোভা পাইতেছে। যেন স্থির, অচঞ্চল, অগাধ সমুদ্রের পার্শ্বে, একটি মধুরনাদিনী লীলাময়ী তরঙ্গিনী বিরাজ করিতেছে। সমুদ্রে করালকাদম্বিনীর ছায়া পড়িয়াছে; দুই একবার প্রবল বায়ুতে তাহার তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু যেন সমুদ্র 'সে আপনার বলে আপনি স্থির, আর তাহারই পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সুখমলয়হিল্লোলে রঙ্গময়ী হইয়া তরঙ্গভঙ্গে দিগ্বিভাসিত সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতেছে।' এমন

সুন্দর সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। এই বিকাশোন্মুখ নলিনীবৎ মধুর হাস্যময়ী গিরিজায়া অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর স্বরূপ। প্রতিবার দর্শনে হৃদয়ে নব নব সৌন্দর্য্যের ভাব জাগিয়া উঠে। বিরামবিহীন অতৃপ্ত নয়নে আমরা সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকি—চাহিয়া চাহিয়া সকল ভুলিয়া যাই, মন এক সৌন্দর্য্যরাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। কে গিরিজায়ার মত পরকে আপনার করিতে পারে? গিরিজায়ার কণ্ঠস্বরই কেবল মধুর নহে, ভিখারিণীর হৃদয় তদপেক্ষাও মধুর। সে তাহার প্রেমময় হৃদয়ে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মিলনাশাকে বলবতী করিয়া তুলিয়াছিল, তাই সেই মিলনের জন্য সে কি না করিয়াছিল? গিরিজায়া সুরসিকা। দিগ্‌গজ চরিত্রাঙ্কণে বঙ্কিমচন্দ্রের যে দোষ হইয়াছে, গিরিজায়ার চরিত্রে তাহা সংশোধিত হইয়াছে, কারণ এখন তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য নহে, তাহা পূর্ণ। তাই গিরিজায়ার চরিত্র বড়ই সুন্দর।

হেমচন্দ্র প্রেমিক। তাঁহার প্রেম রূপজ মোহ নহে, তাঁহার লালসা কলুষিত নহে। তাহা স্বার্থপরতার গরলশ্বাসে বিষাক্ত নহে। তাহা স্বচ্ছ স্রোতস্বতীর মত, তল পর্য্যন্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ; কিন্তু তাহার প্রবাহ ক্ষীণ নহে। ক্ষীণ নহে বলিয়াই বুঝি তিনি মৃণালিনীর মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী শ্রবণ করিলে তাহা এমন ভীষণ তরঙ্গময়, কূলপ্লাবিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। বীর-হৃদয় নানা উচ্চাশায় পূর্ণ; কিন্তু প্রেম সে হৃদয়ের সূর্য্যালোক, পৃথিবীর বক্ষে উচ্চ গিরির মত প্রেম সেখানে মহান্, মহিমান্বিত। তাই বুঝি যখন তিনি হৃদয় হইতে মৃণালিনীর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছিলেন, তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। সেইজন্য সেই সময়ের কথায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতেছিলেন। সে রজনী তখনও জ্যোৎস্না! নহিলে তাঁহার উপাধান আর্দ্র কেন? কেবল মেঘোদয়মাত্র। যাহার হৃদয় আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে রোদন করে না।" হেমচন্দ্র যে ব্যাপারের ব্যাপারি, তাহাতে ব্যাপারিরও কষ্ট যথেষ্ট, নহিলে কেন মর্ম্মযাতনাপীড়িত রাজপুত্র বলিবেন:—

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহুদেশ।
কাঁহা মেরে কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥"

যেখানে ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌গামী একাধিক জলস্রোত মিলিত হয়, পরস্পরকে উন্মত্তভাবে সকলে আবেগে ঘাত প্রতিঘাত করিতে থাকে জলরাশির সেই ফেনিল কলকলনাদমুখরিত মিলনস্থল এক অনির্ব্বচনীয় অশান্ত সৌন্দর্য্যাগার হইয়া উঠে। মানব হৃদয়েও যখন একাধিক ভাব প্রবল হইয়া উঠে, তখন সে হৃদয় এই মিলনস্থানের মত হয়। পশুপতির হৃদয় এইরূপ মিলন স্থল। সে হৃদয়ে মনোরমা-লাভ-লালসা, রাজ্য-লাভ-লালসা, বিবেক তাড়ন এইকয়টীই বড় প্রবল। কাজেই সেখানেও এক অশান্ত সৌন্দর্য্য, একতীব্র উচ্ছ্বাস। সাধারণ সৌম্যশান্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয় পাঠকের নিকট এ সৌন্দর্য্য মধুর বোধ হইবে না—এ আবর্ত্তে তাঁহার হৃদয় বিবশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যেই এক মধুরতা আছে; সকল সৌন্দর্য্য হৃদয়কে আনন্দিত করে। কবি কীট্‌স বলিয়াছেন :—

> "A thing of beauty is a joy for ever :
> Its loveliness increases ; it will never
> Pass into nothingness ;"

সকল প্রকারের সৌন্দর্য্যে যাঁহারা আনন্দানুভব করেন, তাঁহারা নিপুণ চিত্রকর বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুন্দর চিত্রে যথেষ্ট মাধুরী দেখিতে পাইবেন, এই চিত্র হইতে যথেষ্ট আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ বিপরীত দিগ্‌গামী স্রোতোবেগে মানব হৃদয় কিরূপ হইয়া যায়, পশুপতির চরিত্রে তাহা যেরূপ দেখান হইয়াছে, তাহা সুন্দর।

এই গ্রন্থ মধ্যেও অসাধারণ ক্ষমতাবান চরিত্র আছে। কিন্তু এ চরিত্র সময় সময় অলৌকিক বলিয়া বোধ হইলেও একেবারে দুর্জ্জেয় নহে। মাধবাচার্য্যের অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার আগমনে বিস্মিত হেমচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন, "কিন্তু আপনি—কামচর না অন্তর্য্যামী?"

মৃণালিনীর ভাষা এবং গীত সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিলে বক্তব্য শেষ হয় না। মৃণালিনীর ভাষা অনেকটা প্রাঞ্জল এবং মধুর; তাহার গীতগুলি অতীব মধুর। কবিতা রচনায় যে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন না, তাহা বহুপূর্ব্বের "ভারতী"র সমালোচক তাঁহার কবিতা-পুস্তক সমালোচনার সময় দেখাইয়াছেন। কিন্তু মৃণালিনীর সকল সঙ্গীতগুলিই স্থানোপযোগী এবং মধুর। মৃণালিনীর সংশোধিত সংস্করণে লেখকের নাটক রচনার প্রয়াসের চেষ্টা দেখা যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

গীতোক্ত অবতার-তত্ত্ব।

অবতার হিন্দু ব্যতীত অপর ধর্ম্মেও আছে। কিন্তু হিন্দুর অবতার যেমন সংখ্যায় অনেক এবং প্রকৃতিতে বিভিন্ন, তেমন অন্য কোন ধর্ম্মের নহে। খৃষ্টানের এক খৃষ্ট। বৌদ্ধের বুদ্ধের অবতার সংখ্যায় বহু হইলেও প্রকৃতিতে প্রায় এক, প্রায় সকলই ধর্ম্ম-অবতার। কিন্তু হিন্দুর অবতার না সংখ্যায় এক, না প্রকৃতিতে এক। তাই অপরাপর ধর্ম্মের অবতার-তত্ত্বাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের অবতারতত্ত্ব অনেকটা জটিল। এই জটিল অবতারতত্ত্ব গীতায় যেমন বিশদরূপে ব্যাখ্যাত, তেমন আর কোথাও দেখি না।

ভগবান্ কহিতেছেন :—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
> এতদ্‌যোনিনী ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
> অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
> মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
> ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব!
> (৪।৫।৬।৭ শ্লোক, সপ্তম অধ্যায়)

"ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, আমার প্রকৃতি এই আটরূপে বিভক্ত। হে মহাবাহো! ইহা কিন্তু অপরা (নিকৃষ্টা); ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবস্বরূপ (চেতনময়ী) আমার প্রকৃতি অবগত হও; যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।—সমুদায় ভূত এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। আমি প্রকৃতিসমেত জগতের উৎপত্তি ও লয় স্থান। হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই;— সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত আছে।"

ভগবানের দুই প্রকৃতি, এক অহঙ্কারাদিরূপে অষ্টধা বিভক্তা, অপর জীবভূতা। এই দুই প্রকৃতি হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি। সূত্রে যেমন মণিহার তাঁহাতে তেমনি জগৎ। ইহাতেও যেন বলা হইল না। আরও বলিতেছেন :—

> যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
> ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।
> (৩৯ শ্লোক, ১০ম অধ্যায়)

"হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ, তাহা আমি। যে হেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে, এরূপ চর বা অচর ভূত নাই (আমি ছাড়া আর কিছুই নাই)।"

তিনি সর্ব্বভূতের বীজ। বীজের বিবর্ত্তনে যেমন গাছ, তাঁহার প্রকাশে তেমনি বিশ্ব। এ বিশ্বে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বিশ্বাবতার। কিন্তু বিশ্বের সর্ব্বত্রই কি তিনি সমানভাবে প্রকাশিত?

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
(১৮ শ্লোক, ৫ম অধ্যায়)

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে ও কুকুরে জ্ঞানীগণ সমদর্শী।"

পণ্ডিতেরা গরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে সমদর্শী সত্য কিন্তু এই সমদৃষ্টি, সকলই ভগবৎপ্রকাশ বলিয়া। গরু, হাতী, কুকুর বা চণ্ডালে নাই, ভগবান শুধু ব্রাহ্মণে আছেন, ইহা ভেদবুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধির অভাবই সমদৃষ্টির কারণ, প্রকাশের সমতা সমদৃষ্টির কারণ নহে। নহিলে কেন ভগবান বলিবেন ঃ—

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিনামহম্॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধিপার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামাস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥

*   *   *   *

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবিনামুশনাঃ কবিঃ॥
দণ্ডোদময়তা মস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং॥
(২১ শ্লোক, ২৭ শ্লোক ৩।৩৭।৩৮ শ্লোক ১০ম অধ্যায়)

"আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে চেতনা। আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে মেরু। হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও; আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং স্থির জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর অর্থাৎ ওঁ কার; যজ্ঞগণের মধ্যে (অজপারূপ) জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়। আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি। অশ্বগণের মধ্যে এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমারে অমৃতার্থ ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ এবং ঐরাবত জানিও; মানবগণের মধ্যে আমারে নরাধিপ জানিও।

*   *   *   *

আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়; আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে উশনাঃ কবি (শুক্রাচার্য্য)। আমি দমনকারীদিগের নীতি, গুহ্যগণের মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান।"

সাধারণ ভাবে সমগ্র বিশ্ব ভগবানের প্রকাশ হইলেও ইহার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও বস্তুতে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। এই বিশেষ প্রকাশই তাঁহার বিশিষ্টাবতার। যেখানে রূপের বিশেষত্ব, সেখানে রূপবিশিষ্ট, আর যেখানে গুণের বিশেষত্ব সেখানে তিনি গুণবিশিষ্ট। তাই ভগবান বলিতেছেন ঃ—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ সম্ভবম্॥
(৪১ শ্লোক, ১০ অধ্যায়)

"ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, অথবা প্রভাব বলাদিগুণ-দ্বারা সমৃদ্ধ যাহা যাহা আছে, তুমি সে সমুদায়ই আমার প্রভাবের অংশ সম্ভূত জানিও।"

জগৎ রূপগুণময়। এখানে আকাশে চাঁদ হাসে, প্রভাতে পাখী গায়, শীতাবসানে বসন্ত ফুলসাজে সাজিয়া দেখা দেয়। মানুষ রণে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে নৈপুণ্য প্রকাশ করে। এই রূপগুণের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই জগৎ এত সুন্দর। রূপগুণ জগৎ ও জীবের শোভা, জীবশ্রেষ্ঠ মানবেরও শোভা।

কিন্তু ধর্ম্ম তাহার প্রতিষ্ঠা। ধার্ম্মিক লোকেরা মনুষ্যসমাজের ভূষণ-স্বরূপ এ কথা সত্য নয়; তাঁহারা সমাজের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। এ হেন ধার্ম্মিকেরা যখন নির্য্যাতিত, সমাজের ভিত্তি তখন সঙ্কটাপন্ন। সমাজের এই সঙ্কটে, ধর্ম্মের এই গ্লানিতে ধর্ম্মাবহ পাপনুদের অবতার স্বাভাবিক। তাই ভগবান কহিতেছেনঃ—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
(৭।৮ শ্লোক, ৪র্থ অধ্যায়)

"হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই।"

"সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ইহা তাঁহার যুগাবতার। গীতায় এই যুগাবতার সাধুদিগের পরিত্রাতা আর দুষ্কৃতদের বিনাশকর্ত্তা। অধার্ম্মিকদের বিনাশ করিয়া যদি ধর্ম্মসংস্থাপন হয়, তাহাতেই তিনি প্রবৃত্ত। সমাজের ক্ষত অঙ্গ বিনষ্ট হয় ক্ষতি নাই, অবশিষ্ট সমাজ-শরীর রক্ষা হইলেই হইল। এস্থলে ধর্ম্ম বা law আসিয়াছে, প্রেম বা grace আসে নাই। প্রেমকে অগ্রাহ্য করিলে ফল আলিঙ্গন, ধর্ম্ম বা law এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম অভিশাপ। গীতায় দুষ্কৃতেরা অভিশপ্ত, বিনাশের জন্য চিহ্নিত। ভগবানের প্রীতি দুষ্কৃতের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে জানে না; সাধুদের লইয়াই পরিতৃপ্ত। তাই ভগবান বলিতেছেনঃ—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকালোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥
(১৩ শ্লোক—২০ শ্লোক, ১২শ অধ্যায়)

"সর্ব্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টা, মৈত্র এবং কৃপালু, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, যোগী, মদ্‌বিষয়ে স্থির-লক্ষ্য ও আমাতেই মনবুদ্ধিসমর্পণকারী—(এরূপ) যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন (পক্ষপাতশূন্য,) চিন্তাশূন্য এবং সংকল্পবিকল্পশূন্য যিনি আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি (প্রিয়বস্তু পাইয়া) হৃষ্ট হন না, (অপ্রিয় পাইয়া) দ্বেষ করেন না, (ইষ্ট নষ্টে) শোক করেন না, (অপ্রাপ্ত অর্থ) আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগী ও মদ্ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্র এবং মান ও অপমান একরূপ, শীতোষ্ণ সুখদুঃখে বিকারশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা-কিছুতেই সন্তুষ্ট, বাসস্থানবিহীন, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। যাহারা উক্তবিধ এই অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ আমার প্রিয়।"

যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, শ্রদ্ধাশীল ও ভগবৎপরায়ণ সে তো প্রীতিপাত্র হই-বেই; কিন্তু যে অধর্ম্মাচরণ করে, পাষণ্ড ও পাপাসক্ত, সে কি ভগবানের প্রীতির সীমার বাহিরে? তবে তো সে প্রেম অপূর্ণ। ইহাতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন হইতে পারে, কিন্তু পাপীর উদ্ধার সম্ভব নয়। এই হেতু গীতার যুগাবতার প্রেমাবতার নয়। ফল কথা সুস্থকে রাখিয়া অসুস্থের কল্যাণ চেষ্টা, পথারূঢ় নিরনব্বইটিকে ছাড়িয়া পথভ্রান্ত একটির অন্বেষণই যে ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়, তখনও এ ধারণা হয় নাই। মনস্বী ৺বঙ্কিম-চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই গীতোক্ত ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির পরাকাষ্ঠা, চরম অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের এ প্রয়াস বৃথা। গীতার ধর্ম্ম অতিমহান্ হইলেও ইহা হিন্দুধর্ম্মের

উচ্চতম অভিব্যক্তি নয়। গীতার অসম্পূর্ণ অবতারবাদের পূর্ণত্ব চৈতন্যে। যুগাবতার এখানে সাধুর পরিত্রাণের জন্য নয়, পাপীর পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" নয়, "মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?" এই প্রেমাবতারের ভাষা। নিগ্রহের বিনিময়ে এখানে আলিঙ্গন। কিরূপে বলি, আলিঙ্গনের ধর্ম্ম বিনাশের ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর নহে? প্রেমাবতার অবতারের চরম। গীতার অবতার প্রেমাবতার নহে; সুতরাং গীতোক্ত অবতারতত্ত্ব অতি মনোহর ও বিশদ হইলেও অসম্পূর্ণ।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

সেকালের পাঠশালা।

গত আগষ্ট মাসের "দাসী"তে, 'সেকালের পাঠশালা' শীর্ষক প্রবন্ধটি অতীব আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। লেখকের সহিত কয়েকটি বিষয়ে আমার মতের ঐক্য না হওয়ার নিমিত্তই আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে প্রতিবাদ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। লেখকের প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার মনে যে কয়েকটি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

১। লেখক বলিয়াছেন ঃ—"আধুনিক পাঠশালাতে আপনি সেই চিরন্তন চট, চেটাই ও মাদুর আর দেখিতে পাইবেন না। সুদৃঢ়, সুগঠিত কাষ্ঠময় বেঞ্চ সমূহই আজ কাল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। আধুনিক পাঠশালার গুরুমহাশয়ও অনেক স্থলে ইংরেজি-জুতা পরা, কোট-কামিজ আঁটা, টেরি কাটা নব্যবাবু।"—লেখক মহাশয় বোধ হয় কোন 'সহুরে' পাঠশালা দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি যদি একবার পাড়াগাঁয়ে যাইয়া তথাকার পাঠশালা সমূহের অবস্থা দেখিয়া আসিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে এখনও অধিকাংশ পাঠশালায় পূর্ব্বকার ন্যায় "পোড়োরা" মাদুর পাতিয়া বসিয়া 'কয় আকার দিলে কা, কয় ইকার দিলে কি' ইত্যাদি বিবিধ প্রকার শব্দোচ্চারণ করিয়া 'তালপত্র' লিখিতেছে। তাহাদের অনতিদূরে 'ছাট্‌' (বেত) হস্তে দেবদারুকাষ্ঠ-নির্ম্মিত কেরো-

সিন তৈলের বাক্সের উপর খালিগায়ে গুরুমহাশয় ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে সমাসীন আছেন। তিনি থাকিয়া থাকিয়া 'পড়ুয়া'দিগকে বিকট শব্দে তাড়া দিতেছেন। এখনও কোন ছাত্র পাঠশালে না আসিলে অন্যান্য ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতেছে। দুই তিন জনে ধৃত বালকের হস্ত এবং দুই তিন জনে তাহার পদদ্বয় ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তাহাকে পাঠশালায় লইয়া আইসে।

"গুরুমশায়, গুরুমশায় আর বল'ব কি,
বেত্ বোনের আসামী হাজির করে'ছি।
রাম তুলসী, রাম তুলসী, রাম তুলসীর পাতা
গুরুমশায় ক'য়ে দেছেন কাণ মলার কথা।"

—এইরূপে বালকগণ ধৃত বালকের কাণ মলিতে মলিতে তাহাকে পাঠশালায় লইয়া আইসে। সেখানে গুরুমহাশয় বালকের যে দশা করেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

এখনও কদলীপত্রের ঠোঙ্গায় করিয়া বাড়ী হইতে গুরুমহাশয়কে তামাক আনিয়া দিবার রীতি আছে। যে ছাত্র বাড়ী হইতে তামাক না আনিবে, তাহাকে সপাং সপাং শব্দে বেত্ খাইতে হয়। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ এখনও ছাত্রদিগকে চুরীবিদ্যা-শিক্ষা দিতেছেন, কারণ বাবার অথবা কাকার তহবিল হইতে চুরী না করিলে তাহারা তামাক কোথায় পাইবে? কেহ কেহ বাড়ী হইতে পয়সা চুরী করিয়া তদ্দ্বারা তামাক কিনিয়া আনিয়া গুরুমহাশয়ের দারুণ প্রহারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে।

২। "আধুনিক কোন কোন গুরুমহাশয়ের ন্যায়, তিনি বেলা দশটা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পাঠশালা করিতেন না এবং রবিবারেও পাঠশালা বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন না।"—এখনকার গুরুমহাশয়েরা রবিবারে পাঠশালা করেন না বটে (সে কালের গুরুমহাশয়েরাও এরূপ করিতেন কিনা, সে কথা জানি না), তবে এখনও পাঠশালা সব স্থানেই বোধ হয় দুই বেলাই হইয়া থাকে।—আমরা যখন দেশে থাকি তখন আমরা তথাকার একটি পাঠশালার ঘড়ীর কার্য্য করি। দশটার সময় যখন আমরা এই পাঠশালার নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাই, তখন নামতা পড়া আরম্ভ হয়। এই

নামতা পড়া শেষ হইলেই তাহাদের ছুটী হয়। আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন আমরা এই পাঠশালার নিকট দিয়া নিকটবর্ত্তী ময়দানে বেড়াইতে যাই, তখন ইহাদের ছুটীর সময় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইহাদের দুই বেলাই পাঠশালা হয়। এই পাঠশালার গুরুমহাশয়কে আমরা সর্ব্বদাই খালি গায়ে এবং পায়ে থাকিতে দেখি। এই পাঠশালার নিকটে ঘরামিরা কাজ করিতেছিল। আমরা প্রায়ই দেখিতাম, গুরুমহাশয় ওরফে 'ধেনু-গুরু' মধ্যে মধ্যে যাইয়া কলিকা চাহিয়া এক এক দম দিয়া আসিতেছেন।

৩। "একালের পাঠশালায় আপনি ক্বচিৎ সেই পবিত্র 'তালপত্র' ও 'তক্তি' দেখিতে পাইবেন। ঘৃণ্য স্লেট পেনসিল এখন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। ম্যাজেণ্টা ও গুলেল রংএর দৌরাত্ম্যে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্ট্‌সদের জ্বালায় আজ কাল বেচারা বালকেরা ভূষা ও ও বাবলা আটা মাড়িয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণা চাক্‌চিক্যময়ী মসী প্রস্তুত করিবার আমোদটি পর্য্যন্ত সম্ভোগ করিবার আমোদ পায় না।" এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না। কারণ এখনও 'তালপত্র' প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। 'কদলীপত্র' লিখিবার রীতি এখনও আছে বটে, তবে অনেক কমিয়াছে। সে কালের পাঠশালায় প্রথম তালপত্র' পরে 'কদলীপত্র' তৎপরে কাগজে লিখিতে হইত। এখন প্রায়ই 'তালপত্র' ছাড়িয়াই কাগজ লিখিতে আরম্ভ করিতে হয়। সে কালে 'তালপত্র' ছাড়িয়া 'কদলীপত্র' ধরিবার সময় এবং 'কদলীপত্র' ছাড়িয়া কাগজ ধরিবার সময় গুরুমহাশয়দের যে ঘোর অত্যাচার ছিল, তাহা এখন অনেক কমিয়াছে বটে। তখন থালা, ঘটী, বাটী, কলসী ইত্যাদি না দিলে গুরুমহাশয় কিছুতেই 'কদলীপত্রে' অথবা কাগজে উন্নীত করিতে স্বীকার পাইতেন না। এখন সেটা প্রায় নাই, একথা স্বীকার করি। কিন্তু যে বেচারা পয়সা খরচ করিয়া বালকদিগকে ইংরাজি স্কুলে পড়াইতে অক্ষম, তাহার উপর অত্যাচারটা এখনও প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে।

এখনও বালকগণ রন্ধনশালায় গমনপূর্ব্বক 'ঝিনুক' দ্বারা ভাতের হাঁড়ির তলা আঁচড়াইয়া তদ্দ্বারা লিখিবার কালী প্রস্তুত করে। এখনও বালকদিগকে 'হরিতকী', 'জায়ফল' ইত্যাদি দ্বারা কালী করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এত যে বিভিন্ন প্রকারের লিখিবার কালী বাজারে মিলিতেছে, তবুও এখনও বালকেরা 'কাঠ পোড়ান' কয়লা দ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া ভিজাইয়া ঐ নেকড়া দোয়াতের মধ্যে ভরিতেছে, কারণ তাহা না হইলে যদি কালী পড়িয়া যায়।

৪। "গুরু মহাশয়ের হুকুম, স্লেটের সঙ্গে একটু সিক্ত ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া রাখ, তদ্দ্বারাই স্লেট মোছা যাইবে।" মুখের থুথুর বিষয়টা কি লেখক মহাশয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন নাকি? আমার ত বেশ স্মরণ আছে, যে পাঠশালা হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় আমার জিহ্বা একেবারেই শুষ্ক হইয়া যাইত।

লেখক মহাশয় যে 'সহুরে' পাঠশালার কথা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ তিনি অনেক সময় পাঠশালা হইতে পলাইয়া প্যারেড্ দেখিতে যাইতেন। আমার কিন্তু সে সুবিধা ছিলনা। আমি হৃদ্দ বিপিন ধোপা অথবা যদু নন্দীর সহিত জগীর মা'র বাগানের জাম অথবা কুল চুরী করিয়া খাইতে যাইতাম। পাঁওরূটীর উল্লেখও লেখক করিয়াছেন, কিন্তু তখন আমরা পাঁওরুটী কাহাকে বলে তাহা জানিতাম না। এখনকারও অনেক পাঠশালার ছাত্র বোধ হয় পাঁওরুটী চক্ষেও দেখে নাই।

লেখক 'ভূতবাঁধার' বিষয়টা হয়ত জানেননা, অথবা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের দেশীয় পাঠশালায় এরূপ 'ভূতবাঁধার' রীতি প্রচলিত ছিল কিনা, তাহা জানি না। আমরা কিন্তু প্রত্যহ স্কুলে যাইবার সময় ছোট ছোট আ-গাছার পত্র সমূহ একত্র করিয়া একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভূত বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতাম।

আমাদের গুরুমহাশয় পাঠশালায় আসিবার সময় বাজার খরচা সঙ্গে লইয়া আসিতেন। অবশ্য সকালকার পাঠশালার অধিবেশনেই এরূপ করিতেন। যাই স্কুলের নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া বাজারে মৎস্য, তরকারী, ইত্যাদি যাইতেছে দেখা যাইত, অমনি গুরুমহাশয় আমাদিগকে নামতা পড়িতে হুকুম দিতেন। নামতা পড়া শেষ হইলেই আমাদের ছুটী হইত। আমাদের মধ্য হইতে পর্য্যায়ক্রমে ২।৩ জনকে প্রত্যহ গুরুমহাশয়ের সহিত বাজারে যাইতে হইত এবং তাঁহার ক্রীত জিনিষাদি তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইত। ২।৩ জন বাদ্যকরের ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। গুরু মহাশয়ের বাড়ীতে কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেই ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে যাইয়া বিনা পয়সায় গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে

বাজাইয়া দিয়া আসিতে হইত। জন কয়েক ঘরামির ছেলেও আমাদের সঙ্গে পড়িত। বর্ষা কালে গুরুমহাশয়ের ঘরের খড় উড়িয়া গেলে ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে যাইয়া ঐ ঘর মেরামত করিয়া দিয়া আসিতে হইত। এইরূপে ধোপাকে বিনা পয়সায় কাপড় কাচিতে হইত, নাপিতকে কামাইতে হইত—ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের সুবিধা আমাদের গুরুমহাশয়ের ছিল।

আমাদের গুরুমহাশয় এক প্রকার নূতন শাস্তির বিধান করিতেন। অপরাধী বালককে একটা চাউলের বস্তার ভিতর পুরিয়া তন্মধ্যে এক প্রকার পোকা ভরিয়া দিতেন। ঐ পোকার কামড়ে বালকের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইত। অথবা ঐ প্রকারে বস্তার মধ্যে ভরিয়া, মুখ মাত্র বাহিরে রাখিয়া সমস্ত দিবসের জন্য জলের ভিতর বসিয়া থাকিতে হইত। বলা বাহুল্য এবম্বিধ দুই প্রকার অবস্থাতেই বস্তার ভিতর বালকের হাত পা বাঁধা থাকিত। পৃষ্ঠোপরি তৈল মর্দ্দন করিয়া তদুপরি বেত্রাঘাত করাই আমাদের গুরুমহাশয়ের রীতি ছিল। এখন আর এসব দেখা যায় না।

উপসংহারে আমাদের গুরুমহাশয়ের একটু বিদ্যার পরিচয় দেওয়া উচিত মনে করিতেছি। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের এক স্থানে ছিল :—

"দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?" গুরুমহাশয় তাহার অর্থ করিতেন :—"হে মহীতে! দুঃখ বিনা সুখ কি হয়?" একবার আমরা গুরুমহাশয়কে 'দুষ্কর্ম্ম' এই কথাটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি একথাটীর এইরূপ অর্থ করেন :—"দুঃ ছিল কর্ম্ম = দুষ্কর্ম্ম; অর্থাৎ কিনা যে কর্ম্ম দূরে, বহুদূরে সাধিত হয়"—ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ সাহিত্য এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ আমরা এই গুরুমহাশয় হইতে করিয়াছি।

তবে আমাদের গুরুমহাশয়ের দুইটি বিশেষ গুণ ছিল।

প্রথম :—সব-ইন্‌স্পেক্টর বাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া আমাদিগকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে গুরুমহাশয় দূরে দাঁড়াইয়া বিবিধ প্রকারের ভাব ভঙ্গী করিয়া আমাদিগকে ঐ প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতেন। যথা :—প্রশ্ন—২×৪ কত?—গুরুমহাশয় দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার এক হস্তের ৫টী অঙ্গুলি ও অপর হস্তের ৩টী অঙ্গুলি দেখাইতেন। ইহা দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারিতাম যে প্রশ্নের উত্তর ৮। আমরা গুরুমহাশয়ের এরূপ ভাবভঙ্গীর তাৎপর্য্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত ছিলাম এবং আমাদের উপর গুরুমহাশয়ের এরূপ কড়া হুকুম

ছিল যে কেহ স্কুল পরীক্ষা করিতে আসিয়া কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ গুরুমহাশয়ের পানে তাকাইতে হইবে।

দ্বিতীয় :—গুরুমহাশয় আমাদিগকে পাঠশালায় যতই প্রহার করুন না কেন, আমার পিতা, মাতা প্রভৃতি কেহ তাঁহাকে আমার বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বালক বলিয়া পরিচয় দিতেন। এইরূপে সকল বালককেই তিনি তাহাদের পিতা মাতার নিকট উত্তম বালক বলিয়া পরিচিত করিতেন। গুরুমহাশয় পারিতোষিকের লোভে অথবা অন্য কোন কারণে এরূপ করিতেন, তাহা তখন বুঝিতাম না, তবে এখন একটু একটু বুঝিতে পারি।

এখনকার পাঠশালা গৃহ মধ্যেই হয়। তখনকার পাঠশালা শীতকালে আমতলায় রৌদ্রে হইত।

শ্রীরাসবিহারী সেন।

সেবা-সংবাদ।

গত রবিবার [৯ই ভাদ্র] দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম উন্মুক্ত করিয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার ডিপুটী কমিশনর ও স্থানীয় সমস্ত ভদ্র লোক এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, সাধারণকে এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দুমাত্রেরই হিন্দুর এই পবিত্র তীর্থে কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক তীর্থযাত্রী যদি অন্ততঃ চার আনা করিয়া ঐ কার্য্যে দান করেন, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় অর্থ অনায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে। আমি সকলকেই এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করি।" মহারাজা নিজের নামে এক হাজার ও আপনার জননীর নামে ৫০০, এই দেড় হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। কুষ্ঠাশ্রমের কমিটীর হস্তে এক্ষণে প্রায় আট হাজার টাকা মজুত আছে; আরও প্রায় তিন হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর আছে। কিন্তু ইহার সুদে ২৪ জন রোগীর সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আর পঞ্চাশ হাজার টাকা এজন্য আবশ্যক। বৈদ্যনাথের ন্যায় স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা, আশা করা অসম্ভব নহে। প্রতি বর্ষে বৈদ্যনাথে যে

তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, তাঁহারা প্রত্যেকে এক আনা করিয়া দিলে তিন চারি বৎসরে এই অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা যাহাতে কৃপা-দৃষ্টি দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সুসম্পন্ন হইবে। আমাদিগের পাঠকদিগকেও আমরা তাঁহাদিগের সাধ্যানুসারে একার্য্যে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করি। যিনি যাহা পাঠাইতে চাহেন, দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কুষ্ঠাশ্রম কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর নামে পাঠাইবেন।—বঙ্গবাসী।

দাসাশ্রম।

উদ্দেশ্য।—নানাপ্রকারে বিপদ্‌গ্রস্ত মানবগণের সাধ্যানুসারে হিত-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগের ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে।

সাধারণ বিভাগ।—সেবালয়—ইহা গিরিডিতে অবস্থিত।

"দাসী" বিভাগ।—জন-হিতৈষণা প্রবর্ত্তনা ও দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ হইতে "দাসী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

ডিস্পেন্সারি বিভাগ।—দাসাশ্রমকে ঔষধ সাহায্য করিবার জন্য ও ইহার স্থায়ী এবং পাকা আয়ের সংস্থান করিবার জন্য ইহার এলো-প্যাথিক ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকানা, ৮৬, হারিসন রোড, কলিকাতা।

কার্য্যপ্রণালী।—ইহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সম্প্রতি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপার উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা ও কার্য্যে সেইরূপ চেষ্টা করা হয়।

ঊষা।

নিশার ঘন আঁধার টুটি
ঊষার আলো উঠিছে ফুটি;
তারাখচিত, চাঁদিমা আঁকা,
মেলিয়া নিশা নীলিমা পাখা,
বসিয়াছিল, যতনে ঢাকি,
কোলের কাছে আগুলি রাখি,
মমতা দিয়ে আদরে ঘিরে'
যেই আঁধার-অণ্ডটিরে;
নিশার সেই আঁধার টুটি,
ওই যে ঊষা উঠিছে ফুটি।

কত দৈন্যে, কত না দুখে,
কতই স্নেহে ধরিয়া বুকে,
অশ্রুধারে, বিজনে জাগি,
উপবাসিনী,—যাহার লাগি;
শুদ্ধ প্রেমভরিত প্রাণে,
চাহিয়া নিশা শূন্যপানে,—
কতই ভয়, ভাবনা কত,
সহিতেছিল মায়ের মত;
সেই সে ঊষা জাগিয়া উঠি,
মেলিছে তার নয়ন দুটি।

ধরণী'পরে পাষাণভার
পলায় ওই অন্ধকার;
মিলায় তারা গগনগায়
ঘুমের ঘোরে স্বপন-প্রায়;
অবশ যেন মৃত্যুভরে
মলিন চাঁদ ঢলিয়া পড়ে;
অজ্ঞান ও নিরাশা, ভয়,—
লুপ্ত সব ধরণীময়;
বর্ব্বরতা পড়িছে ছুটি
সভ্যতার পায়েতে লুটি।

আসিছে ঐ মোহিনী ঊষা
পরিয়া নব মোহন ভূষা;—
তরুণরবি-মুকুট শিরে;
জ্বলিছে মেঘ অঙ্গ ঘিরে';
চরণে আভা, ঘেরিয়া তা যে
বিহগগীত নূপুর বাজে;
অরুণ হাসি মুখেতে, তায়
মুক্তাগুলি ছড়ায়ে যায়;
ধরণী'পরে আঁচল লুঠে,
গন্ধবহ জাগিয়া উঠে।

পূরবে রাঙ্গা গগন ছেয়ে
ঘেরিয়া ঘন আসিছে ধেয়ে।
যেন রাখিতে রাজ্য তার
যুদ্ধ করে অন্ধকার;
সত্যনাশে পাশববল
পাঠায় তার সৈন্যদল;
অত্যাচার মিথ্যাবাণী
দিয়া ঢাকিতে গরিমাখানি
কুৎসা যেন জাগিয়া উঠি
সদলবল আসিছে ছুটি।

অবিচলিত সে ঊষারাণী
শুদ্ধ তুলি বদনখানি;
প্রেমভরিত নবীন প্রাণে
শুদ্ধ চাহে সবার পানে;

শুদ্ধ মৃদুমধুর হাসি',
বিলায়ে নিজ কিরণরাশি
খর শত সহস্র ধারে
বিদ্ধ করি অন্ধকারে
চরণতলে দলিয়া তায়,
অবহেলায় চলিয়া যায়।

কি যেন এক মন্ত্রবলে
মুগ্ধ সব গগনতলে,
কুৎসাবাণী ক্ষান্ত হয়,
স্তব্ধ হ'য়ে চাহিয়া রয় ;
মেঘ গুলি সে কিরণ মাখি,
যে যেখানে সে সেখানে থাকি,
জানু পাতিয়া ভক্তিভরে
সকর জোড়ে নুইয়া পড়ে ;
নিন্দাবাদ করিতে চায়,
উপাসনায় বসিয়া যায়।

আসিছে ঊষা, মেঘগুলিরে
চাঁপা-আঙুলে সরায়ে ধীরে;
যেন বনের অন্তরালে
কে বনদেবী, প্রভাতকালে,
সরায়ে ঘন দীর্ঘ ঘাসে,
ধীর চরণে বাহিরি' আসে ;
যেন পত্র বাঁধন টুটি,
মুকুল ধীরে উঠিছে ফুটি ;
মিথ্যা টুটি বিশ্ব লাগি
সত্য যেন উঠিছে জাগি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়

লে বেরিয়ে।

লে বেরিয়ের তুল্য সুদক্ষ গণক আর দৃষ্ট হয় না। কি গণিতসাধারণে, কি জ্যোতিষে, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তাঁহার কৃত "Anales de L'observatoire Imperial De paris" নামক গ্রন্থাবলি এক অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। ঐ গ্রন্থাবলির অন্তর্গতঃ সারণী সকল অবলম্বন পূর্ব্বক এক্ষণে সমস্ত গ্রহগণিত সমাধা হয় ; ঐ সারণী সকল এত সূক্ষ্ম যে গণিত ও বেধিত গ্রহে এক বিকলারও অন্তর হয় না।

গণিতাগত গ্রহের সহিত বেধলব্ধ গ্রহের একতা সাধন করা যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার, তাহা গণকেই বুঝিতে পারেন। গণিত গ্রহে "বীজ" নামক সংস্কার বিশেষ দিয়া দৃক্‌তুল্য সাধনের প্রথার সৃষ্টি বোধ হয় বরাহ মিহির করেন, কিন্তু তাঁহার কথার ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোধ হয় যে বীজব্যবহার পূর্ব্বাবধি হইয়া আসিতেছে, অথচ তিনি যে পাঁচখানি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার কোন খানিতে বীজ সংস্কারের কথা দৃষ্ট হয় না। তিনি লিখিয়াছেন,

পূর্ব্বাচার্য্য মতেভ্যো যচ্ছ্রেষ্ঠং লঘু স্ফুটং বীজং।
তত্তদিহা-বিকলমহং রহস্যমভ্যুদ্যতো বক্তুম্॥
পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ১।২॥

কিন্তু আকর্ষণাদি আধিভৌতিক ব্যাপার নিবন্ধন গ্রহগতিতে যে বিক্ষোভ জন্মে, তাহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অবিদিত থাকায় তাঁহাদের সাধিত বীজ অল্পকাল মধ্যেই কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়িত। বিক্ষোভের কারণ না জানিয়া অসংসিদ্ধ সংস্কার দ্বারা তাৎকালিক স্ফুটত্ব ক'দিন টিকে? এরূপ বীজ সংস্কার কেবল মুষ্টিযোগ মাত্র। এই দুঃখেই ব্রহ্মগুপ্ত বলিয়াছেন

শ্রীকেশবঃ স্ফুটতরং কৃতবান্ হি সৌবা
র্য্যাসন্ন মেতদপি ষষ্টিমিতে গতেঽব্দে।
দৃষ্টাশ্লথং কিমপিতত্তনয়ো গণেশঃ
স্পষ্টং যথা স্বকৃদ্ দৃগগণিতৈক্য মত্র॥
কথমপি যদিদং চেদ্ভূরিকালে শ্লথং স্যান্
মৃহরপি পরিক্ষেন্দুগ্রহাদৃক্ষ যোগাৎ।
সদমল গুরুতুল্য প্রাপ্তবুদ্ধি প্রকাশৈঃ
কথিত সদুপগত্যা শুদ্ধিকেন্দ্র প্রচাল্যো॥
বৃহত্তিথিচিন্তামণিঃ।

এবং এই দুঃখেই সম্রাট আরঙ্গজেবের সাম্বৎসর সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিবেক প্রণেতা কমলাকর চলকর্ণে বা ভোগে বা বিক্ষেপে কোথা কত সংস্কার দিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বীজের প্রতি বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

কস্যান্তরং কুত্রচ তৎপ্রদেয়ং ন জ্ঞায়তে তন্নলিকোক্তি তো পি।
লোকেঽভিমানাৎ কথয়ন্তি মূঢ়া কালান্তরং বীজমহো ন সত্তং॥

গ্রহ গতিতে কোথা হইতে কিপ্রকারে কত রকম বিক্ষোভ জন্মে, তাহা প্রকৃটরের সমুদ্র-তরঙ্গের উপমাটি দেখিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়।

বুধ গ্রহ যে মঃ লে বেরিয়েকে উদ্বেলিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের কথা পড়িলেই বুঝা যায়। "Nulle plalnele n'a demande aux astronomes plus de soins et depeines que mercure, et ne leur donne en recompense toute d' inquietudes, tout de contrarie-tes."

নেপতুন্ আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গ্রহগণ রবি-পরিতঃ পরিভ্রমণ করে। তাহাদিগের কক্ষার আকার বৃত্তাভাস। এই বৃত্তাভাসের অন্যতর অধিশ্রয়ণে রবির অধিষ্ঠান। কিন্তু গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণ জনিত ঠিক বৃত্তাভাসে গমন করিতে পারেন না; কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ চালিত হন। জ্যোতির্বিদেরা গ্রহগণের দূরত্ব এবং সামগ্রীসমষ্টি জ্ঞাত হইয়া উক্তরূপ গ্রহগতির বিষমতা যত্ন সহকারে অতি সূক্ষ্মরূপে নিগূঢ় দুর্জ্ঞেয় গণিত দ্বারা অবধারিত করিয়া বলিতে পারেন, যে কোন গ্রহ কোন সময়ে কোথায় ছিলেন বা থাকিবেন।

মঃ বোবাড পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে নিশ্চয় বুঝিলেন যে নেপতুনের অবস্থান দৃগগণিতৈক্য হয় না, অতএব ঐ গ্রহের এক শুদ্ধ সারণী প্রস্তুত করিবার মানসে যত্ন ও সাবধানতা পূর্ব্বক ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি উপর্য্যুপরি বেধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৮১ অব্দে নেপতুন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ফ্লামষ্টীড় যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত আবিষ্কৃতির পর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্বিদগণ যে সকল বেধ করিয়াছিলেন, সমস্ত কাগজ পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। তিনি ১৭৮১ অব্দের পূর্ব্বের ও পরের উভয় কালের পর্য্যবেক্ষণের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বৃত্তাভাস কক্ষার সহিত কোনটির অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু উভয় কালের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উভয় বিধ বৃত্তাভাস লাভ হয়; এক মাত্র বৃত্তাভাস প্রাপ্তির সম্ভব নাই। এরূপ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যতা স্থির সহজ নহে; অবশেষে পূর্ব্ববেধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আধুনিক বেধাশ্রয়ে ১৮২১ অব্দে এক সারণী প্রচার করিলেন; এতদ্দ্বারা গণিত গ্রহ ও গত ৪০ বৎসরের গণিত গ্রহ একতা পাইল, কিন্তু ১৭৮১র পূর্ব্বের এবং ১৮২১ এর পরের দৃষ্ট গ্রহের অবস্থান উক্ত টেবেল দৃষ্টে গণিত করিলে মিলিল না।

বোবার্ডের নির্দ্দিষ্ট কক্ষা হইতে নেপতুন বর্ষে বর্ষে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন। ১৬৯০ হইতে ১৭১৫ পর্য্যন্ত গণিত নেপতুন অপেক্ষা বেধলব্ধ নেপতুন অগ্রে ছিলেন। ১৭১৫ হইতে ১৭৭১ পর্য্যন্ত বেধলব্ধ নেপতুন অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৮১ হইতে ১৮২২ পর্য্যন্ত বাস্তব নেপতুন, গণিত নেপতুনকে পশ্চাৎ ফেলিয়া গমন করিয়াছিলেন। ১৮২২ এ বরুণেন্দ্র যোগ হইয়াছিল অর্থাৎ উভয়ে এক রাশিস্থ হইয়াছিলেন (uranus বরুণ Neptune ইন্দ্র)। এই সময়ে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক

পর্য্যবেক্ষণ করিলে যুগপৎ দুই গ্রহ দৃষ্টিক্ষেত্র মধ্যে নয়নগোচর হইতেন। ইহার পর গণিতাগত ইন্দ্র, বেধলব্ধ ইন্দ্রকে অতিক্রমণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের আসন্ন সময়ে উভয়ের অন্তর চাপাত্মক ১৮″ হইল, ১৮৩৫এ ৩২″ ১৮৩৮এ ৫৩″ ১৮৪০এ ৮৭″ ১৮৪১এ ৭২″। ১৮৪০ হইতে ইন্দ্রের গতির ক্রমবৃদ্ধি বশতঃ অন্তরের হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৪৫এ বোবার্ডের গণিত ইন্দ্র, এবং বাস্তব ইন্দ্র একতা প্রাপ্ত হইল। ১৮২২ এর পূর্ব্বে এবং পরে বাস্তব এবং গণিত বরুণের এই দ্বিবিধ গতি দেখিয়া কোন গণকের মনে উদয় হইল না যে, যে বরুণের ঊর্দ্ধ আকাশে অবস্থিত কোন গ্রহবিশেষের আকর্ষণ প্রযুক্ত এই ব্যাপার ঘটিতেছে।

এই সকল বিষমতা দেখিয়া ডাক্তার হস্‌সী ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে রাজজ্যোতিষী এয়ারির নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে যদি কোন সুদক্ষ গণিতবিদ্ বলিতে পারেন যে বরুণের ঊর্দ্ধে নভোমণ্ডলের অমুক প্রদেশে গ্রহবিশেষ থাকিবার সম্ভাবনা তাহা হইলে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এয়ারি তাঁহার প্রস্তাবে মনোযোগ করিলেন না; বরং বলিলেন যে বরুণের গতিতে এমন কোন বিষমতা দৃষ্ট হয় না, যে তাহা গ্রহ বিশেষের আকর্ষণের ফল বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বোবার্ডের সহিতও রাজজ্যোতিষীর কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। বহিঃস্থ গ্রহ বিশেষের অস্তিত্বে বোবার্ডের অবিশ্বাস ছিল না; তথাপি গণিতশাস্ত্র বিশারদ মঃ হেনসেনকে এ বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া উৎসাহভঙ্গ হইয়াছিলেন।

১৮৪৫এ ইংলণ্ডের মঃ আদম্‌স্ এবং ফ্রান্সের ম, লেবেরিয়ে উভয়ে স্বতন্ত্র ভাবে বরুণের গতির বিষমতার কারণ নিরূপণ জন্য তদীয় কক্ষার বহির্ভাগে কোন গ্রহ আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে তাহার পরিমাণাদি কত এই তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যোতির্বিনোদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু যথোচিত সাধন ও অধ্যবসায় অভাবে আফলোদয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসনস্থ থাকিতে পারিলেন না। ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরীতে শ্মশানালয়ে শবাসনে নিমীলিত নয়নে "তারা" সাধন আর তত্রৈব কালে বেধালয়ে চলাসনে উন্মীলিত নয়নে তারা সাধন উভয়েই বিবিধ প্রত্যবায় ঘটে। এক পক্ষে যেমন প্রথম পিশাচীগণের বিভীষিকায় অসমাহিত চিত্ত প্রযুক্ত মহামায়ার ধ্যান ভঙ্গ হয়, তেমনই জ্যোতিষী পক্ষে অধ্যাপক চেল্লীর ন্যায় মোহবশতঃ এক জঘন্য প্রেতবৎ

ধূমকেতু নেত্রপথে পতিত হইলে তাহার লক্ষণ জিজ্ঞাসু হওয়ায় নিদিধ্যাসিতব্য গ্রহনিধি হারা হইতে হয়।

অবশেষে ১৮৪৫ এর অক্তবর মাসে যখন আদমসের সমালোচনার ও অভিমার্গনার ফল পত্রারূঢ় হইয়া গ্রীন্‌ইচে উপনীত হইল, তখন রাজদৈবজ্ঞ এই চিরাপেক্ষিত ব্যোমচরের পত্রগত অবস্থান অবলোকন করিয়া চমকিত,—বিস্মিত হইলেন। দশবৎসর পূর্ব্বে যে তত্ত্বকে নিষ্প্রয়োজন এবং যাহার ফলকে আকাশ-কুসুম জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন, তাহাকে আজ কোন মুখে ইন্দ্রায় স্বাহা বলিবেন। এয়ারি নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার চেষ্টায় এবং আদমসের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষার অভিপ্রায়ে বলিলেন; আদমস্ কি বরুণের শ্রাবণিক বিক্ষোভের (Radial disturbanceএর) কারণ নিদ্দেশ করিতে সক্ষম? কথাও মিথ্যা নহে যে এই অনতিবিলম্বে আবিষ্কর্ত্তব্য গ্রহের কেবল ভোগ সম্বন্ধে যে বিক্ষোভ তাহাই তিনি বেধ ও গণিত দ্বারা অবধারিত করিয়াছিলেন। এখন রাজজ্যোতিষীর মানসিক বিক্ষোভ প্রযুক্ত বারুণ বিক্ষোভের এই নবীন গবেষক বক্রী হইলেন (পিছাইয়া পড়িলেন)। লোকে বলে আদম্‌সের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত ছিলনা। ভগ্নোদ্যম না হইয়া করেন কি! এয়ারি বয়সে চুন মানে শতগুণ। কত বড় লোক! ক্ষমতা কত! আদম্‌স যদি নিজের গণিতের শুদ্ধত্বের উপর জিদ করিতেন, তাহা হইলে সরকারি বেধালয়ে তাঁহার চাকরির সম্ভাবনা থাকিত না। যাহা হউক আদম্‌স ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রাবণিক বিক্ষোভ গণনা করিয়াছিলেন এবং এয়ারিকে যথোচিত উত্তর দিতে পারিতেন কিন্তু উত্তর দেন নাই।

এ দিকে পেরি নগরে ম, লে বেরিয়ে গণিত দ্বারা স্থির করিলেন যে বরুণ কেবল শনি ও বৃহস্পতি দ্বারা আকৃষ্ট নন, ঊর্দ্ধতর আকাশে আরও একটি গ্রহ আছে যদ্দ্বারা বরুণের গতিতে বিষমতা জন্মিতেছে। রাজসাম্বৎসর লে বেরিয়ের ও আদমসের গণিতে একতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অচিরে ইষ্টগ্রহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু নক্ষত্র পুঞ্জের যথোচিত মানচিত্র অভাবে আবিষ্কারের বিলম্ব পড়িল।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লে বেরিয়ে অন্বেষ্টব্য গ্রহের অবস্থান বিষয়ক তৃতীয় পত্র প্রকাশিত করিলেন। এবার উহার ভোগ ও বিক্ষেপের গণিত সবিশেষ যত্ন সহকারে সিদ্ধ হওয়াতে নভোমণ্ডলের কোনস্থানে লক্ষ্য করিলে

দূরবীক্ষণের ক্ষেত্র মধ্যে গ্রহ দৃষ্ট হইবে তাহা বেশ বুঝা গেল। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে ম, লে বেরিয়ে বরলিন নগরে জ্যোতির্ব্বিদ এঙ্ককে পত্র দ্বারা আবিষ্কর্ত্তব্য গ্রহের জ্ঞাতব্য কয়েকটি প্রধান বিষয় অবগত করাইয়া তাঁহাকে দৌরবীক্ষণিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। আদম্‌স ও লে বেরিয়ে উভয়েই নিরূপণ করিয়াছিলেন যে ইষ্ট গ্রহের বিষুবাংশ কালমানে ২১ ঘণ্টা; অর্থাৎ তৎকালে উহা সায়নকুম্ভের মাঝামাঝি ছিল। এখন সৌভাগ্য বশতঃ বরলিন বেধালয়ে তৎকালে কুম্ভের অন্তর্ভূত তারাপুঞ্জের মানচিত্র ছিল। ঐ রাত্রিতেই এঙ্কের সহকারী মঃ গল আদিষ্ট আকাশ নিরীক্ষণ করিবামাত্র দৃষ্টিক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণীর তারার ন্যায় একটি জ্যোতিষ্ককে অপরিচিতের ও অদৃষ্টপূর্ব্বের মত বোধ হইল; এবং বস্তুতঃ দেখিলেন যে নক্ষত্র চিত্রে উক্ত জ্যোতিষ্ক নাই। তবেই উক্ত জ্যোতিষ্ক যে নক্ষত্র নহে, সুদূর অন্তরীক্ষেস্থিত গ্রহ বিশেষ আস্তে আস্তে বহুকালে শতভিষায় পৌছিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা গেল। অনন্তর ২৪ শে সেপ্টেম্বর পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সকল সন্দেহ দূরে গেল এবং ঐ অষ্টম শ্রেণীর তারা অতিবরুণগ্রহ বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

এই অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কৃতি প্রকটিত হইলে সমস্ত ইউরোপে জ্যোতিষী ও জ্যোতিষানুরাগী জনগণ মধ্যে যে একটা মহা আন্দোলন হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। ফরাসীরা লে বিরিয়ের ও ইংরাজরা আদমসের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। রাজজ্যোতিষী এয়ারি রাজকীয় জ্যোতিষ সভায় আদমসের যশঃ অধিকার সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন, ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে এই কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি আদমসের। প্রকৃত পক্ষে আদম্‌স এবং লে বেরিযে উভয়েই গুণস্তুতির যোগ্য পাত্র, উভয়েই অতুল যশোলাভ করিয়াছেন। আমেরিকেরা এই মহতী আবিষ্কৃতি যে আকস্মিক বলিয়া উপেক্ষা প্রকাশ করেন, তাহা অভদ্রোচিত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

এই গ্রহের নাম নেপ্‌তুন হইল। এই প্রবন্ধ প্রক্টরের "Old and New Astronomy" দেখিয়া লিখিলাম।

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হরিদাস ও পতিতা রমণী।

"প্রভো, আমি অতি অপরাধিনী, আমার পাপের আর সীমা নাই, এ হতভাগিনীর কি উপায় আছে?" উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে একটী পরমসুন্দরী যুবতী একদা হরিদাসের চরণ ধরিয়া পড়িল। "বাছা! তুমি হরিনাম কর, তোমার ভয় নাই।" এই বলিয়া হরিদাস তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এ সুবেশা যুবতীটী কে?

ভক্তের পরীক্ষা প্রলোভনে। যদি তুমি উদাসীন হইয়া বনে চলিয়া যাও, তুমি প্রলোভনের হাত ছাড়াইলে বটে, কিন্তু আপন শক্তি বুঝিলে না;—তুমি ভীরু। যদি তুমি সংসারে থাকিয়া প্রলোভন জয় করিতে পার, যদি অগ্নি-পরীক্ষায় মলিনতা প্রাপ্ত না হও,—তবে সে তুমি খাঁটী সোনা! হরিদাসের এখন পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত; হরিদাসের প্রভু হরিদাসের দ্বারায় জগৎকে দেখাইবেন যে, তাঁহার ভক্তের কাছে রিপুগণ দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায়।

বনগ্রামের জমীদার রামচন্দ্র খাঁন দুষ্ট প্রকৃতির লোক,—পরশ্রীকাতর ও ভক্তদ্বেষী। হরিদাসের প্রভাব, তাঁহার ব্যবহার রামচন্দ্রের ভাল লাগিল না; কিন্তু হরিদাসের কোন ছিদ্র পায় না, কাযেই কিছু করিতে পারে না। একদিন সে কয়েকটী সুন্দরী বারবনিতাকে ডাকিয়া, তাহাদিগকে হরিদাসের বৈরাগ্যধর্ম্ম বিনাশ করিতে অনুরোধ করিল। তন্মধ্য হইতে একটী পরম সুন্দরী যুবতী সম্মতা হইয়া রাত্রিযোগে হরিদাসের নিকটে গমন করিল। বৈষ্ণবরীত্যনুসারে সে তুলসী দণ্ডবৎ পূর্ব্বক হরিদাসকে প্রণাম করিল, তৎপর সেই ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে বসিল; বসিয়া কুরুচিকর নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল।

এখন, হরিদাস পূর্ণযুবক। সুব্যক্ত সুবলিত শরীর,—বাহুযুগল দীর্ঘ—"আজানুলম্বিত।"* হরিদাসের অন্তর নির্ম্মল ও প্রফুল্ল, সে প্রফুল্লতা বদনে পরিব্যক্ত হইতেছে; বস্তুতঃ হরিদাস শ্রীমান ও পরম সুন্দর পুরুষ।

হরিদাসকে দেখিয়া সে বারনারী যথার্থই বিমুগ্ধ হইয়া গেল, পাপকথা

* হরিদাস গৌর কি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তচ্চরিতলেখকগণ তাহা কিছুই বলেন নাই।

উচ্চারণে তাহার কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু দারুণ অর্থলোভ! কুটিলচরিত্রা নির্লজ্জা কালবিলম্ব না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিল!

যাহার হৃদয়ক্ষেত্রে নিরন্তর অমিয়-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, সে কি বিলাস-রসিকার রসালাপে আকৃষ্ট হয়? হরিদাস মুহূর্ত্ত মাত্র বারবনিতার কথা মনে করিলেন, হতভাগিনীর দশা ভাবিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি কৃপার্থ হইয়া মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিলেন; পরে বলিলেন—"প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ আমার নিয়ম, তাহা না করিয়া কিছু করিতে আমার অধিকার নাই, তুমি একটু অপেক্ষা কর, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" বেশ্যা বসিয়া রহিল; এদিকে তিন লক্ষ নাম করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। বিফলমনোরথা বারবিলাসিনী প্রত্যূষে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিল; হরিদাসের রূপ—তাঁহার ভক্তি—তাঁহার ব্যবহার কীর্ত্তন করিল; দুষ্টাশয় রামচন্দ্র তাহাতে নিরস্ত হইল না, পুনর্ব্বার তাহাকে পাঠাইল। রমণী সে রজনীও হরিদাসের কুটীরদ্বারে হরিনাম শুনিতে শুনিতে পূর্ব্ববৎ কাটাইল। তৎপর দিন গেল,—রজনী আসিল, বেশ্যা আবার কুটীরদ্বারে! কিন্তু সে রাত্রি বেশ্যার আর পূর্ব্বভাব নাই!!

ভক্তের কণ্ঠধ্বনি একপ্রকার মদ্য বিশেষ।

মোগল সম্রাট আকবর একদিন স্বীয় প্রিয়গায়ক তান্‌সেন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সঙ্গীত বিদ্যার গুরু কে?" তান্‌সেন্ উত্তর দিলেন—"স্বামী হরিদাস।"* তৎশ্রবণে মোগল-সম্রাট একদা একটী তানপূরা সহিত তান্‌সেন্ মাত্র সমভিব্যাহারে স্বামী সন্দর্শনে যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হন। স্বামীজি সেখানে থাকিতেন। তান্‌সেন্ একটী পদ গাইলেন এবং ইচ্ছা করিয়াই একটু তালভঙ্গ করিলেন। স্বামীজির তাহা সহিল না। তখন স্বয়ং তানপূরা লইয়া, ভাবে গদগদ হইয়া ঐ পদটী ভিন্নও গাইলেন। সে সুমধুর ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়া মাধুর্য্যের লহরী তুলিতে লাগিল; সম্রাট বিস্মিত—বিমোহিত হইয়া গেলেন। শিবিরে আসিয়া সম্রাট তান্‌সেন্‌কে পুনর্ব্বার সে পদটী গাইতে আজ্ঞা দিলেন; তান্‌সেন আর একবার গাইলেন। কিন্তু যে সুমিষ্ট রস স্বামীজির ধ্বনিতে ছিল, তাহা না পাইয়া সম্রাট ক্ষোভিত হইলেন ও

* হরিদাস স্বামী ভিন্ন ব্যক্তি; আমাদের আলোচ্য হরিদাস নহেন।

তান্‌সেন্‌কে কারণ জিজ্ঞাসিলেন। "কারণ আর কিছু নহে," তান্‌সেন উত্তর করিলেন, "আমি দিল্লীর সম্রাটকে সঙ্গীত শুনাইলাম, কিন্তু স্বামীজি সম্রাটের সম্রাট—ত্রিলোকের অধীশ্বরকে গীত শুনাইতেছিলেন।"

আর পাঠক! যখন কোন প্রেমিক তাহার প্রীতিভাজনের সহিত কথা কহে, তখন তাহার স্বাভাবিক স্বর অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়া যায়, একথা কি অনুধাবন করেন নাই? প্রেমিকের প্রণয়সঙ্গীত কি শুনেন নাই? শুনিয়া থাকিলে স্মরণ করুন,—তাহা কি মিষ্ট!

তিন রাত্রি হরিদাসের মুখে হরিনাম শুনিয়া বেশ্যার মন ফিরিয়া গেল। হরিদাসের মুখোচ্চারিত মধুর ধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া বেশ্যার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আবার বলি,—ভক্তের কণ্ঠধ্বনি একপ্রকার মদ্য বিশষ।

মরুভূমে বান ডাকিল, শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জুরিত হইল, আজন্ম পাপাভ্যস্তা বারনারী অনুতপ্তা হইল! সাধুসঙ্গের কি প্রভাব! সৎসঙ্গ কীদৃশ তেজস্কর! এই জন্যই সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া মহাজনগণ বিবিধ পদ করিয়াছেন।

কোন মহাজন (ঠাকুর মহাশয়) বলেন।—

"এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়?
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এ তোমার গুণ॥"—ইত্যাদি।

এই জন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গের ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ অসার সংসারে সৎসঙ্গই সার বস্তু।

যথা—বৃহন্নারদীয়ে।—

"অসার ভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগদ্ভক্তসঙ্গোহি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাং॥"

যথা বা—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গং প্রাপ্যতে পুম্ভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

শাস্ত্র বলেন—সৎসঙ্গ সদ্‌গুণ প্রবর্দ্ধক, সৎসঙ্গই ভক্তির উৎপাদক, এবং সৎসঙ্গের ন্যায় আশু স্বভাব পরিবর্ত্তকর আর কিছু নাই।

লোক যত কেন মলিন দশা প্রাপ্ত হউক না, যত কেন পাপী হউক না, পবিত্রতার প্রতি—সত্যের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছেই আছে।

মানুষ মলিনতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, সংসারে আসিয়া নানা কারণে সে আপন অবস্থা হারায়, নানা কারণে সে সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকে; তখন সে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায়। সে সময় বিশেষভাবে পূর্ব্বাপর ঘটনা যদি তাহার মনে পড়ে, তবে মনে অনুতাপ জন্মে; অনুতাপানল প্রজ্জলিত হইলে পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন পূর্ব্বপদ লাভের জন্য স্বতএব তাহার অভিলাষ জন্মে। এই প্রকারে আত্মবিস্মৃত সাধুসঙ্গ দ্বারাই আপনার অবস্থা, আপনার মলিনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রে সাধুসঙ্গকে পাপনাশক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—তীর্থাদি হইতেও সাধুসঙ্গের ফল ও মাহাত্ম্য অধিক।

উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি সবারই বিধিদত্ত একটা লালসা, বা অনুরাগ আছে। যিনি সে বস্তুর অধিকারী, যিনি নানা গুণে বিভূষিত, সাধারণতঃ তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি উপস্থিত হয়। যাঁহাকে ভক্তি করা যায়, ভালবাসা যায়, অর্থাৎ যাঁহাকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা যায় ও যাঁহার গুণে মোহিত হওয়া যায়, তাঁহার অনুকরণ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মে। এই জন্যই সৎসঙ্গ আশু ফল প্রদান করে, এই জন্যই লোক সাধু-সঙ্গে সাধু এবং অসৎ সঙ্গে মন্দ হয়।

সাধু সঙ্গে বারবনিতার চক্ষু ফুটিল, আত্মপ্রতি দৃষ্টি পড়িল। বেশ্যা ভাবিল,—বিলাস-বাসনায় শত শত ব্যক্তি সতত আমার গৃহে আসিয়া থাকে, কিন্তু আমি অযাচিত ভাবে হরিদাসের দ্বারস্থ, হরিদাস তিন রাত্রি মধ্যে আমার প্রতি একবার ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। না জানি হরিদাস কোন্ রসে ডুবিয়াছেন, না জানি হরিদাস কোন্ রূপে মোহিত হইয়াছেন, যাহার কাছে মুগ্ধ মানবের ভোগবসনা, পাপপ্রবঞ্চণা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

রমণী-হৃদয় গলিয়া গেল; সে আত্ম-দোষ স্বীকার করিয়া হরিদাসের চরণ ধরিয়া বসিল। হরিদাস তাহাকে কি উত্তর দিলেন—পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই যে যুবতী "এ হতভাগিনীর উপায় কি?" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের চরণ ধারণ করিয়াছিল, সেই রামচন্দ্রের প্রেরিতা এই বারবিলাসিনী।

আনন্দে ভক্তের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, হরিনামে বেণাপোলের জঙ্গল প্রতিধ্বনিত হইল। হরিদাস আনন্দভরে স্নেহ সহকারে বেশ্যাকে কহিলেন,

"বাছা! আমি সবই জানিতে পারিয়াছিলাম, তবে তোমার দশা দর্শনে বড় দুঃখ হয়, তাই তোমার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, নতুবা তখনই এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম।"

"বেশ্যা কহে;———কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় সর্ব্বক্লেশ ॥
ঠাকুর কহে;———ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥
নিরন্তর নাম লহ তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।।"—চরিতামৃত।

হরিদাস তাঁহাকে "হরিনাম মহামন্ত্র" উপদেশ ও তৎসাধন প্রণালী শিখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেশ্যা গুরুর উপদেশে অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থাদি ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিল, একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া হরিদাসের পরিত্যক্ত কুটীরে আসিয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিল। তাহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ—মুখ মলিন। দুদিন পূর্ব্বে যে রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় ছিল, দুদিন পূর্ব্বে অহঙ্কারে যে ভূমিতে পা ফেলিত না, আজ সে দীনাতিদীনা। দুদিন পূর্ব্বে যে কেশ হইতে কত সুগন্ধ উদ্গীর্ণ হইত, অভিমানের উৎসর্গ স্বরূপ সে কেশ আজ মস্তক হইতে অপসারিত হইয়াছে, দীনা এখন কেশহীনা, এখন তাহার মস্তক মুণ্ডিত।

এইরূপে সে রমণী, হরিদাসের ন্যায়ই, তিনলক্ষ নাম জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীনহীনার ন্যায় কতদিন তিনি উপবাস করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কেহ দয়া করিয়া একমুষ্টি তণ্ডুল দিলে খাইতেন। কিন্তু তাঁহার এ অবস্থা অধিক দিন ছিল না; যে সরল মনে ঈদৃশ ত্যাগ স্বীকারে সক্ষম, ঈদৃশ অনুতপ্ত, সে অবশ্যই ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত জীব সহজেই লোকের মন আকৃষ্ট করিতে পারে, সন্দেহ নাই। এইরূপে সে ভাগ্যবতী রমণীর—

"ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেম পরকাশ।"—চৈঃ চঃ

এইরূপে তিনি লোকের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিলেন। তখন হরিদাসের ন্যায় তাঁহাকেও লোকে নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিতে লাগিল।

চৈতন্য চরিতামৃত বলেন।—

"বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥"

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী।

অমরত্ব ও পুনর্জ্জন্ম।

আত্মার অমরত্বের বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে পুনর্জ্জন্মের বিষয় এমন এক প্রণালীতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা, যে প্রণালী হয় সম্পূর্ণ নূতন, অথবা একবারে নূতন না হইলেও সাধারণে চলিত নহে। প্রণালী সম্বন্ধে এই নিরপেক্ষ বা আপেক্ষিক নূতনত্ব থাকাতেই এই পুরাতন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আত্মার অমরত্ব বুঝিতে হইলে 'আত্মা'র অর্থ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য ও অনৈক্য বুঝা আবশ্যক। এই আত্মতত্বের উপর যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা আপাত-যুক্তিযুক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে অকর্ম্মণ্য।

'আত্মা'র অর্থ যাহা আপনা আপনি থাকিতে পারে, যাহার অস্তিত্ব অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না, যাহার সত্তা আপেক্ষিক নহে, নিরপেক্ষ। যাহার সত্তা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে, তাহাই অনাত্মা।

মানুষের মধ্যে যদি নিরপেক্ষ সত্তাশালী কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে উহার অমরত্বও সপ্রমাণ হইল। যে বস্তুর প্রকৃতিই এই যে তাহা স্বয়ং নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে, তাহা যে অবিনাশী, এই কথা সহজেই বুঝা যায়। অথবা যদি এই কথার ভিতরেও দুর্বোধ্য কিছু থাকে, তাহা ক্রমশঃ বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে।

যাহাকে আমরা জড় বলি, যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, তাহার অস্তিত্ব আপেক্ষিক। তাহা কেবল দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, আঘ্রাত বা আস্বাদিত, এই ভাবেই প্রকাশিত হয়, এবং কেবল এই ভাবেই চিন্তা বা বিশ্বাসের বিষয়ীভূত হইতে পারে। এক কথায়, কেবল জ্ঞাত বা জ্ঞেয় রূপেই অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত, এই ভাবেই থাকিতে পারে। জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ না করিয়া যাহার সম্বন্ধে কিছুই ভাবা এবং বলা যায় না, তাহার জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে,—তাহা জ্ঞানকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে আছে—ইহা স্ববিরোধী সুতরাং অসঙ্গত কথা। সুতরাং জড় অনাত্ম বস্তু, ইহার স্বতন্ত্রতা নাই, স্বাধীনতা নাই, আত্ম-প্রতিষ্ঠা নাই, অর্থাৎ এক কথায় আত্মত্ব নাই, ইহা অনাত্মা। তারপর, যে বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় না, অথচ কার্য্য দেখিয়া আমরা যাহার অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করি, যাহা অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য হইয়াও দেশে বিস্তৃত, যাহার আন্দো

লন আছে, রূপান্তর আছে, গতি আছে, যথা আলোক উত্তাপ প্রভৃতির কারণ-রূপী ইথার, তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ্য হইয়াও যখন দেশ কালের অন্তর্গত, এবং দেশ কাল যখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞানে প্রকাশিত, সুতরাং জ্ঞানাশ্রিত, তখন এরূপ সূক্ষ্ম বস্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও জড়, সুতরাং আত্মত্ব-শূন্য,—অনাত্মা। তারপর, যাহা দৃশ্য নহে, স্পৃশ্য নহে, কোন ইন্দ্রিয়-গোচরই নহে, যাহা কেবল অতীন্দ্রিয় অনুভবের বিষয়; যাহা দেশে বিস্তৃত নহে, গতি এবং আন্দোলনযুক্তও নহে, অথচ যাহা কালে প্রকাশিত; যাহার উৎপত্তি আছে, বিলয় আছে, পরিবর্ত্তন আছে; যথা সুখ, দুঃখ, আসক্তি, বিরক্তি, উৎসাহ, ঔদাস্য ইত্যাদি, এই সমুদয় বস্তু দেশের অন্তর্গত নহে বলিয়া জড় অভিধেয় না হইলেও যখন কালের অধীন, এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তখন ইহাদেরও আত্মত্ব নাই, ইহারাও অনাত্মা।

এই সকল অনাত্ম বস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞানে প্রকাশিত, জ্ঞানের আশ্রিত। সুতরাং এই জ্ঞানবস্তুর নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা থাক্ আর নাই থাক্, ইহা যে এই সকল অনাত্ম বস্তুর অধীন নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যাহার 'আমি দেখি,' 'আমি শুনি,' 'আমি জানি,' না হইলে এই সকল দৃশ্য, শ্রবণীয়, জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশ অর্থাৎ অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, সে ইহাদের অধীন, এবং ইহাদের বিনাশে বিনাশশীল, ইহা স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী সুতরাং অসঙ্গত কথা। জ্ঞানের উপর ইহাদের একান্ত নির্ভর-শীলতা না বুঝাতেই এ বিষয়ে সন্দেহ আসে, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলে আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

এখন দেখা যাক্, যে জ্ঞানবস্তুর সম্বন্ধে উপরোক্ত অনাত্ম বস্তু সমূহ আপেক্ষিক, সেই জ্ঞানবস্তুর আত্মত্ব আছে কিনা। এই জ্ঞান বস্তুর প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অনাত্মবস্তু সমূহের সহিত ইহার আধার আধেয়ত্বের,—আশ্রয় আশ্রিতের-সম্বন্ধ বটে, কিন্তু অনাত্মবস্তু সমূহের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ আশ্রয় আশ্রিতের সম্বন্ধ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ সেরূপ নহে। তৈলপাত্র ও তৈলের মধ্যে যে সম্বন্ধ, শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, বায়ুর আঘাত ও বৃক্ষ-পতনের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে দেশ, কাল ও ভৌতিক প্রতিরোধের ভাব রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের মধ্যে এই সকল ভাব নাই। অনাত্ম আশ্রয় অন্য অনাত্ম-বস্তুকে আশ্রয় দিতে গিয়াও নিজের অনাত্মত্ব পরিত্যাগ করে না, বিষয়ত্ব

পরিত্যাগ করে না। পাত্র, শরীর ও বায়ু, তৈল, অঙ্গ ও পতনের আশ্রয় ও কারণ হইয়াও বিষয়ত্ব ও আশ্রিতত্ব পরিত্যাগ করে না। পরন্তু দেশ কাল শক্তি প্রভৃতি বিষয়ত্ব গুণের আধিক্য বশতই এই সকল বস্তু অন্য বস্তুর আধার বা কারণ। কিন্তু জ্ঞান জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে এই কথা খাটে না। আমার দৃশ্য, স্পৃশ্য, জ্ঞেয় বস্তুর সহিত আমার যে সম্বন্ধ, সে কেবল নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সম্বন্ধ। আমি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, জ্ঞাতা বলিয়াই ইহাদের আশ্রয়। আমার জ্ঞাতৃত্বেই আমার আধারত্ব, আশ্রয়ত্ব। আমার শরীর এখানে আছে, ইহাতে আমার আশ্রয়ত্ব নহে, কেননা আমার শরীরও অন্য জড় বস্তুর ন্যায় আমার বিষয়। আমি এখানে আছি, ইহাতেও আমার আশ্রয়ত্ব নহে, কারণ 'এখান' অর্থাৎ এই দেশখণ্ডও আমার জ্ঞানের বিষয়। আমি এখন আছি, ইহাতেও আমার আশ্রয়ত্ব নহে। কেননা 'এখন' অর্থাৎ এই মুহূর্ত্তও আমার জ্ঞানাশ্রিত। সুতরাং অনাত্মবস্তুর আশ্রয়ত্ব যেরূপ সমধিক বিষয়ত্ব গুণের উপর নির্ভর করে, আমার আশ্রয়ত্ব সেরূপ নহে। আমার আশ্রয়ত্ব কেবল জ্ঞাতৃত্বের উপরই নির্ভর করে, কেবল জ্ঞাতৃত্বেই আমার আশ্রয়ত্ব, আমি জ্ঞাতা বলিয়াই আশ্রয়, এবং আমার জ্ঞাতৃত্ব দেশ কালের উপর নির্ভর করে না. কেননা দেশ ও কাল নিজেই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, জ্ঞানের আশ্রিত।

এই যে জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞান, যাহা সমুদায় বিষয়ের অবভাসক, প্রকাশক, এবং প্রকাশক রূপেই আশ্রয়—এই জ্ঞান অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে কি না? বিষয় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, এবং জ্ঞানের আশ্রয়ে যে প্রকাশ, ইহাতেই ইহার অস্তিত্ব। কিন্তু জ্ঞান অন্য কিছুর বিষয় নহে, অন্য কিছুর সম্বন্ধে প্রকাশিত নহে, জ্ঞান নিজেই নিজের অবভাসক, প্রকাশক; ইহা নিজের জ্যোতিতে, নিজের কাছেই প্রকাশিত। ইহা নিজের জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া অন্য সকলকে প্রকাশ করে।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

"সেই দীপ্যমানের প্রকাশেই সমুদায় বস্তু অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।" এই স্বয়ং-জ্যোতি, স্বপ্রকাশ বস্তু স্বতন্ত্র, স্বাধীন, আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যাহার জ্যোতিতে সমুদয় প্রকাশিত, সে আর কাহার জ্যোতির অপেক্ষা রাখিবে? যাহার আশ্রয়ে সমুদায় আশ্রিত, সে আর কাহার আশ্রয়ের অপেক্ষা রাখিবে?

বিষয়, দেশ ও কাল যাহার আশ্রিত সে আর কিরূপে বিষয়, দেশ ও কালের অধীন হইবে? সুতরাং এই জ্ঞানবস্তু একান্তই স্বতন্ত্র, স্বাধীন, আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, ইহা আত্মত্বশালী নিরপেক্ষ বস্তু, ইহা আত্মা।

এই যে জ্ঞানবস্তু, যাহাকে 'আমি' বলি, আত্মা বলি, ইহা ছাড়া এবং ইহার আশ্রিত বিষয় সমূহ ছাড়া সাক্ষাৎভাবে বা অসাক্ষাৎভাবে আর কিছুই জানি না, এবং জানাও সম্ভব নহে। "ইহা ছাড়া আর কিছু," এই কথাটা যে বলিতেছি তাহা কেবল বিষয়ের তুলনায়; জ্ঞানের সম্বন্ধে এই কথাটা সম্পূর্ণ অপ্রযুজ্য। এক বিষয় অন্য বিষয় ছাড়া হইতে পারে, এক বিষয়কে অন্য বিষয় ছাড়া ভাবা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান ছাড়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না, জ্ঞান ছাড়া কোন বস্তুর চিন্তাই হইতে পারে না। কিন্তু এই সত্যটার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে—কোন না কোন জ্ঞান ছাড়া বিষয় থাকিতে পারে না, হয় আমার জ্ঞানে, না হয় তোমার জ্ঞানে, না হয় অপর কোন জ্ঞানে বিষয়কে থাকিতে হইবে। কথাটার অর্থ এরূপে বুঝাতে কেবল ইহাই প্রকাশ পায় যে জ্ঞানের স্বপ্রকাশ ভাব, জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা হয় নাই, ইহাকে বিষয়ের ন্যায় দেশগত, কালগত, খণ্ডশীল, বহুত্বশালী বলিয়া মনে করা হইতেছে, এক কথায়—ইহার বিষয়িত্ব ভুলিয়া ইহাকে বিষয়ের পদবীতে নামাইয়া আনা হইতেছে। বাস্তবিক কথা এই যে, জ্ঞানবস্তুর দেশাতীত কালাতীত প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিলে দেখা যায় ইহা অবশ্যম্ভাবিরূপেই এক, অখণ্ড, অনন্ত,—ভিন্ন ভিন্ন দেশ, কাল ও শরীর যোগে প্রকাশিত হইয়াও ইহা ব্যক্তিত্বের সীমার অন্তর্গত নহে,—সসীম ব্যক্তিত্বের আশ্রয়, আধার এবং কারণ হইয়াও ইহা ব্যক্তিত্ব-বিহীন, বা অসীম ব্যক্তিত্বশালী। এই তত্ত্ব কেবল যুক্তিগোচর নহে, ইহা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও চিন্তার গোচর। এই যে জ্ঞানবস্তু, যাহাকে আমি "আমার জ্ঞান" বলিতেছি, এই জ্ঞানবস্তুকে ছাড়িয়া,—এই জ্ঞানবস্তুর বাহিরে—আমি কিছুই জানিতে পারি না, কিছুই ভাবিতে পারি না, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি যাহা কিছু দেখি আমাতেই দেখি, অর্থাৎ আমার জ্ঞানবস্তুর আশ্রিত বলিয়াই দেখি; যাহা কিছু শুনি, স্পর্শ করি বা অন্য প্রকারে প্রত্যক্ষ করি, সমুদয়ই আমার জ্ঞানবস্তুর আশ্রিত রূপে প্রত্যক্ষ করি। তার পর, আমার প্রত্যক্ষীভূত বস্তু সমূহ হইতে যখন আমার শরীর দূরে থাকে, পরোক্ষে থাকে, তখনও আমি উহাদিগকে যেরূপে প্রত্যক্ষ

করিয়াছিলাম, অর্থাৎ আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে, কেবল সেইরূপেই আমি উহাদিগকে চিন্তা করিতে পারি ও উহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারি। আমার শরীরের অনুপস্থিতিতে যেমন বস্তু সমূহের মৌলিক গুণের বিলয় বা পরিবর্ত্তন ভাবি না, অর্থাৎ উহারা যে যে গুণ লইয়া আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সকল গুণযুক্ত হইয়াই বর্ত্তমান আছে, এরূপ ভাবি, তেমনি যে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ইহাদের প্রকাশের নিদান,—ইহাদের বিষয়ত্বের কারণ, সেই জ্ঞানের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে, ইহাও ভাবি। অর্থাৎ যাহাকে আমার জ্ঞান বলি, সেই জ্ঞানকেই তখনও—শরীরের অনুপস্থিতির অবস্থায়ও—বস্তু সমূহের আশ্রয় বলিয়া ভাবি। আমি শরীরাদি সম্বন্ধে সসীম হইলেও আমার জ্ঞানকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই এরূপ ব্যাপক, সর্ব্ব বিষয়-ব্যাপ্ত বলিয়া ভাবিতে হয়। কেবল প্রত্যক্ষগোচর ও নিকটস্থ বস্তুর সম্বন্ধে নহে, যাহা কখনও আমার ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসে নাই, এবং আসিবে না, সেই সকল বস্তু সম্বন্ধেও আমাকে অবশ্যম্ভাবিরূপে এই ভাবিতে হয়, এবং বিশ্বাস করিতে হয় যে তাহারাও সেই জ্ঞানবস্তুর আশ্রয়েই আছে যে জ্ঞানবস্তু এখানে,—অর্থাৎ এই বিশেষ দেশও বস্তু সমূহের যোগে—প্রকাশ পাইতেছে। এই জ্ঞানরূপী "আমি"কে সাক্ষীরূপে না বসাইয়া আমি কিছুই ভাবিতে পারি না, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না, ভাবনা ও বিশ্বাসের কোন অর্থই হয় না। পৃথিবীর দূরতম কেন্দ্র, সুদূর সূর্য্যমণ্ডল, অগণ্য জগৎ সমষ্টিরূপী ছায়া পথ, যত কেন দূরবর্ত্তী বস্তু হউক না; পৃথিবীর ব্যাল্যাবস্থা, সৌর ও নক্ষত্র জগতের সেই পূর্ব্বতন তরল বা বাষ্পাবস্থা, যত কেন দূরবর্ত্তী ঘটনা হউক না,—এই জ্ঞানবস্তুর সাক্ষিত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া কিছুই ভাবিতে পারি না, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না। বিষয়ের সাক্ষী, দেশের সাক্ষী, কালের সাক্ষী জ্ঞানবস্তুর ভাব একবার স্পষ্ট-রূপে হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে আর ইহাকে কোন বিশেষ দেশে, কালে, বা শরীরে আবদ্ধ রাখা যায় না; দেখা যায় ইহা সর্ব্ববিষয়ব্যাপী, সর্ব্বদেশব্যাপী, সর্ব্বকালব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, এক, অখণ্ড।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের সীমাই বা অস্বীকার করা যায় কৈ? আমি জ্ঞান-বস্তু, তুমি জ্ঞানবস্তু, তিনি জ্ঞানবস্তু, অথচ আমি তুমি নই, তুমি তিনি নও, কেহই অন্য কেহ নয়; পরস্পরে স্বতন্ত্র এবং পরস্পরে পরস্পরের বিষয়। আমি তোমাকে জানিতেছি, তুমি আমাকে জানিতেছ, তিনি তোমাকে ও

আমাকে জানিতেছেন, আবার আমি ও তুমি তাঁহাকে জানিতেছি, ইত্যাদি। সুতরাং জ্ঞানবস্তুর একত্ব, অখণ্ডত্ব রহিল কৈ? এক সর্ব্বাধার জ্ঞানবস্তু আছে, ব্যক্তিগত জ্ঞান সেই এক জ্ঞানবস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই জ্ঞানবস্তু দেশে ও কালে অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়, এই অদ্বৈত জ্ঞানবাদ দাঁড়ায় কোথা?

এই আপত্তি সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে জ্ঞানের একত্বের যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, আমাদের ব্যক্তিত্বের বিভাগে সে প্রমাণ নিষ্ফল হইতেছে না, এই বিভাগ সত্ত্বেও সে প্রমাণ অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক কথা এই যে এই ব্যক্তিগত বিভাগ মূল জ্ঞানবস্তুর বিভাগ নহে, শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মার বিভাগ নহে, এক অখণ্ড জ্ঞানরূপী আত্মার আশ্রিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরূপ আধারে যে 'চিৎপ্রতিবিম্ব' পড়িয়াছে, তাহারই বিভাগ। আত্মা স্বয়ং-জ্যোতি, স্বপ্রকাশ, নিত্য বিষয়ী-ধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহাকে অন্যের বিষয়রূপে কল্পনা করিলেই ইহার স্বাতন্ত্র্য গেল, আত্মত্ব গেল। ইহা কেবল নিজ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু নিজ জ্ঞানের বিষয় হওয়াতে ইহার বিষয়িত্ব যায় না, স্বপ্রকাশ ভাব যায় না, আত্মত্ব যায় না। যাহা হউক, এই বিষয়টা আর একটু বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যে "আমি"কে "তুমি" ও "তিনি" হইতে ভিন্ন করিয়া ভাবি, যে "তুমি" ও "তিনি"কে "আমি" হইতে ভিন্ন করিয়া ভাবি, সে "আমি" "তুমি" ও "তিনি" কি বস্তু? এই ব্যক্তিগত বস্তু নিশ্চয়ই সেই পূর্ণ জ্ঞানবস্তু নহে যাহা সমুদয় জ্ঞান, চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি। সেই বস্তুকে না ভাবিয়া, সেই বস্তুকে সাক্ষী ও আশ্রয়রূপে না বসাইয়া কোন বস্তুই ভাবা যায় না, বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু যে অর্থে আমি তোমা হইতে ভিন্ন, ও তুমি আমা হইতে ভিন্ন, সে অর্থে আমাকে ছাড়িয়া তুমি তোমাকে ভাবিতে পার, এবং তোমাকে ছাড়িয়া আমি আমাকে ভাবিতে পারি। সেই এক বস্তুর সঙ্গে এই সকল বহু বস্তুর প্রভেদ বুঝিবার পক্ষে আরো সুবিধা হয়, যখন দেখি যে এই সকল পরস্পর হইতে ভিন্ন বহু জীব ভাবিতে গিয়াও সেই পরমকে না ভাবিয়া,—সেই পরমকে ইহাদের সাক্ষী ও আশ্রয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া—ইহাদিগকে ভাবা যায় না, ইহাদের অস্তিত্ব চিন্তা ও বিশ্বাস করা যায় না। যেমন ভিন্ন ভিন্ন জড় বস্তু ভাবিতে গিয়া এক অখণ্ড জ্ঞানকে সাক্ষী ও আশ্রয়রূপে ভাবিতে হয়, যেমন সুখ দুঃখাদি মানসিক অবস্থা এক

স্থায়ী কালাতীত জ্ঞানের আশ্রিত বলিয়া ভাবিতে হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মনোময় বিজ্ঞানময় বস্তুকে ভাবিতে এবং বিশ্বাস করিতে গিয়াও অবশ্যম্ভাবিরূপেই এক সর্ব্বজীবাধার পরম জ্ঞান ভাবিতে হয়, এবং এরূপ ভাবনা কেবল সেই পরম জ্ঞানের পদবীতে দাঁড়াইয়াই সম্ভব হয়। অর্থাৎ যেমন আমরা শরীরাদি সম্বন্ধে সসীম হইয়াও দেশকালাতীত এক অখণ্ড জ্ঞানবস্তুকে জীবনের আলোক রূপে, 'আমি' রূপে পাইয়াছি বলিয়াই নিজের ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করিয়া অসংখ্য বিষয় ও ঘটনা জানিতে সক্ষম হইয়াছি, তেমনি মন ও চিন্তা সম্বন্ধে আমরা সসীম হইয়াও সেই দেশকাল ও সীমাতীত বস্তুকে জ্ঞানালোকরূপে, 'আমি' রূপে লাভ করিয়াছি বলিয়াই, এবং সেই ব্যক্তিত্বের সীমাতীত আত্মজ্ঞান পদবীতে আরোহণ করিতে পারিতেছি বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন সসীম জীবাত্মার অস্তিত্ব জানিতে ও ভাবিতে সক্ষম হইতেছি। এখন সেই জীবাত্মা গুলি কি তাহা বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। জীবাত্মার মূল ভাব, মৌলিক উপাদান বিশেষ বিশেষ বস্তুতে অভিমান বা অহঙ্কার, অর্থাৎ "ইহা আমি" বা "ইহা আমার" এরূপ সংস্কার। কোন অবস্থায় অন্নময় শরীরকে, কোন অবস্থায় প্রাণবায়ুকে, কোন অবস্থায় সুখ-দুঃখাদির অনুভব সমষ্টিরূপ মনকে, কোন অবস্থায় নানা সংস্কার সমষ্টিরূপী, চিন্তা সমষ্টিরূপী বিজ্ঞানকে, জীব "ইহা আমি," "ইহা আমার" এরূপ মনে করে। আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা ক্রমশঃ এই অভিমান রাগ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি মলিনতা-বর্জিত হইলেও ইহা সর্ব্বদাই ব্যক্তিগত জীবনের মূলে বর্ত্তমান থাকে। এই অভিমান না থাকিলে ব্যক্তিগত জীবন সম্ভব নহে। কতকগুলি চিন্তা ও ভাব, যে গুলি আমার "আমি-বোধে"র সঙ্গে অপরিহার্য্য রূপে জড়িত রহিয়াছে, যে গুলিকে জানি বলিয়াই আমি জ্ঞানী, সেই গুলিকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই আমি 'আমার' বলি; এবং আর কতকগুলি, যে গুলি আমার "আমি-বোধে"র সঙ্গে এরূপ জড়িত নহে, সে গুলিকে 'আমার' বলি না। তেমনি, আর কতকগুলি চিন্তা ও ভাব তোমার সহিত অপরিহার্য্যরূপে জড়িত বলিয়া তুমি সে গুলিকে 'তোমার' বল, অন্য গুলিকে 'তোমার' বল না। সকলের সম্বন্ধেই এরূপ। এই অভিমান এক অর্থে পরমাত্মারও আছে। কিন্তু তাঁহার অভিমান সর্ব্ববিষয়ব্যাপী, তাঁহার পক্ষে সকল বস্তুই "আমার"; আমাদের অভিমান সঙ্কীর্ণ, বিশেষ বিশেষ বস্তুতে আবদ্ধ। আমাদের সঙ্কীর্ণ সবিশেষ অভিমান যে তাঁহারই অসীম নির্ব্বি-

শেষ অভিমানের আংশিক প্রতিবিম্ব, অনুপ্রকাশ, তাহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কারণ মূলে এক জ্ঞান বই জ্ঞান নাই, এক আত্মা বই আত্মা নাই, এক "আমি" বই 'আমি' নাই, সুতরাং এক "আমার" বই দুই "আমার" নাই, এক অভিমান বই দুই অভিমান নাই। সেই এক অখণ্ড অভিমান কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশ কাল ও বস্তু সমষ্টি আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে তাহা নহে, কিন্তু ব্যাপারটা যে এরূপই, অন্যরূপ নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এখন, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বোধ হয় কতকটা বোধগম্য হইবে। ব্যক্তিগত বিভাগের মূলে সূক্ষ্ম বিষয়গত বিভাগই দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও ভাব-সমষ্টি মূল অখণ্ড বিশ্বাভিমানের আংশিক প্রতিবিম্ব বা অনুপ্রকাশে সমষ্টীভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই যে সসীম বস্তুযোগে মূল জ্ঞানবস্তুর প্রতিবিম্ব বা অনুপ্রকাশ, যাহার সম্বন্ধে আলঙ্কারিক ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, ইহাকে ব্রহ্মের অংশ বলিতে চাও বলিতে পার, কিন্তু "অংশ" কথাটাও আলঙ্কারিক। মূল ও অংশের মধ্যে যেরূপ বিয়োগ ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সম্ভব, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধে সেরূপ বিয়োগ ও স্বাতন্ত্র্য নাই। জীবের জ্ঞান ব্রহ্মেরই জ্ঞান, জীবের জানিত বিষয় সেই সর্ব্বাধার জ্ঞানেরই আশ্রিত। জীব এক মুহূর্ত্তও ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত নহে। জীব ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এবং ব্রহ্ম অন্য-নিরপেক্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও যেন নিজ প্রকৃতির অনিবার্য্য অদমনীয় বেগ বশতঃই জীবের সসীম জীবন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, এক অনন্ত চিৎসাগরে অসংখ্য চিন্ময় বীচিমালা তুলিয়া বিচিত্র লীলা করিতেছেন। জীব ও ব্রহ্ম কেহই কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না।

ব্রহ্ম ও জীবের এই একতা ও ভিন্নতা আরও কতিপয় চিন্তা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া তৎপরে আমরা দেখিব জীব ব্রহ্মের আত্মত্বে আত্মত্বশালী হইয়া ব্রহ্মের অক্ষয়ত্ব ও আবিনাশিত্বের অধিকারী হইয়াছে কিনা।

জানিত হওয়াতেই যেমন বিষয়ের বস্তুত্ব, বিষয়ের অস্তিত্ব, জানাতেই তেমনি বিষয়ির বস্তুত্ব, বিষয়ির অস্তিত্ব। বিষয়ী বা জ্ঞানবস্তু কেবল জ্ঞাতারূপেই প্রকাশিত, জ্ঞাতারূপেই জানিত, সুতরাং কেবল জ্ঞাতারূপেই থাকিতে সক্ষম। বিষয় অজানিত হইয়া আছে, ইহা যেমন স্ববিরোধী

অসঙ্গত কথা, তেমনি বিষয়ী না জানিয়া আছে, অজ্ঞ হইয়া আছে, এই কথাও স্ববিরোধী, অসঙ্গত। এই দুটী সত্যের আলোকে জীব ও ব্রহ্মের একতা ও ভিন্নতা অনেকটা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই যে জ্ঞান-বস্তু, যাহাকে আমার জ্ঞান বলিতেছি, যাহা আমার চিন্তা. ভাব এবং জগতের অন্য যাবতীয় বস্তুর সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে, এই মূল জ্ঞানবস্তুতে সমুদায় বিষয় ও চিন্তা সর্ব্বদা ধৃত রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার যে এই অভিমান, "এই বিষয় গুলি আমার," "এই চিন্তাগুলি আমার" এই যে সংস্কার, যাহাতে আমার ব্যক্তিত্ব, যাহা আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান, স্মৃতি ও বুদ্ধির মূল, এই অভিমান হইতে আমার জীবনের উপকরণ গুলি, আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপাদানরূপী চিন্তা ও ভাব গুলি, ক্রমাগতই বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। এই যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত, ইহাতে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের সমক্ষে অতি অল্প সংখ্যক চিন্তা ও ভাবই প্রকাশিত। অন্য সমুদায় উপকরণ এখন অনুপস্থিত। যে সকল উপকরণ আমার ব্যক্তিগত অভিমান-বিচ্যুত হইয়া আছে, উহাদিগকে আম আর 'আমার' বলিয়া বোধ করিতেছি না। অথচ প্রয়োজন মত সে গুলি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। উপস্থিত হইয়া আমার অভিমানাশ্রিত হইতেছে, এবং এইরূপে আসিতেছে বলিয়াই আমার স্মৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া সম্ভব হইতেছে, আমার ব্যক্তিগত জীবন-প্রবাহ চলিতেছে। এইরূপে যে-কোন সময়েই হউক, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপকরণ সমূহের অতি অল্প সংখ্যকই এক কালে আমাদের অভিমানের আলোকে বর্ত্তমান থাকে, অবশিষ্ট গুলি গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এবং প্রয়োজন মত সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দৈনন্দিন জীবন সংগঠন করে। তার পরে, সুষুপ্তি অর্থাৎ স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রার সময়ে, কেবল বিশেষ বিশেষ চিন্তা নহে, বিশেষ বিশেষ জীবনোপাদান নহে, সমুদায়ের আশ্রয়রূপী অভিমান পর্য্যন্ত অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, ব্যক্তিগত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এতদ্দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কতকটা পরিস্কাররূপে বুঝা যাইতেছে। আমরা দেখিতেছি জীবের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপেই ব্রহ্মের অধীন। তিনি যে একবার আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, আর আমরা স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি, তিনি কেবল জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় আমাদের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেছেন, এরূপ ধারণা

নিতান্তই ভ্রান্ত। আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের জ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধি, শক্তি তাঁহা হইতেই আসিতেছে। যে অহংবোধ বা অভিমান আমাদের ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান, তাহাও তিনি যতক্ষণ প্রকাশিত রাখেন ততক্ষণই প্রকাশিত থাকে। কিন্তু তিনি যখন তখনই, দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার ৬।৭ ঘণ্টার জন্য, ইহাকে নিবাইয়া ফেলিতেছেন, আবার জ্বালিয়া দিতেছেন। প্রতিদিনের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ সময় আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকি এবং তৎপর এই খণ্ড প্রলয়ান্তে যেন পুনর্জ্জাত হই। সমুদায় ধনজন আত্মীয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হওয়া, সমুদায় বিদ্যা, বুদ্ধি, স্মৃতি ও বল, সমুদায় জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, চরিত্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সম্পত্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া প্রলয়-জলধিতে নিমগ্ন হওয়া কিরূপ, তাহার প্রতিরূপ আমরা বার বার প্রাত্যহিক জীবনে দেখিতেছি। জন্মান্তর-বাদের সত্যতা প্রমাণ-সাপেক্ষ; কিন্তু আমার বোধ হয় যে আমাদের জীবনে যে প্রতিদিন মৃত্যু ও জন্মান্তরের বিচিত্র অভিনয় হইতেছে, তাহা চিন্তাপূর্ব্বক আলোচনা করিলে জন্মান্তর-বাদের উপর আর বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

কলিকাতা।

(২৫ শে আগষ্ট হইতে ২৪ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

দানপ্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাসে নিম্নলিখিত দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাদের কল্যান করুন।

মাসিক চাঁদা।

রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর জুন ও জুলাই মাসের চাঁদা ২৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ জুন ও জুলাই মাসের চাঁদা ২৲; বাবু নন্দকুমার দত্ত আগষ্টের চাঁদা ১৲, সৈয়দ আবদুল সোভান চৌধুরী জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র আগষ্টের চাঁদা ১৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টো আগষ্টের চাঁদা ১৲, N. K. Bose Esq. আগষ্টের চাঁদা ১৲, বাবু মহেন্দ্র-নাথ দাস জুলাইর চাঁদা ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর আগষ্টের চাঁদা ১৲, বাবু ত্রিপুরা-কান্ত গুপ্ত আগষ্টের চাঁদা ।০, জনৈক হিন্দু মহিলা আগষ্টের চাঁদা ১৲, বাবু মোহিনীমোহন

রায় শ্রাবণ, ভাদ্র, ও আশ্বিনের চাঁদা ৩৲, রাখালদাস মিত্র জুন, জুলাই, আগষ্টের চাঁদা ৸০

এককালীন দান।

বাবু হেমচন্দ্র মুখো ১৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ১৲, ৪৯ বেচুচাটার্জির ষ্ট্রীটস্থ ছাত্রগণ ।০, রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর ২৲, বাবু অতুলচন্দ্র সেন ১৲, বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ ৵০, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ ১৲, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র সেন ১৲, বাবু যতীন্দ্রমোহন সেন ।০, একজন ছাত্র ২৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় ২৲, বাবু শীতলদাস রায় পিতৃশ্রাদ্ধো-পলক্ষে ১৲, জনৈক বন্ধু ৪৸০, Mrs B. L. Bhaduri ১৲, কুমার ত্রিদিবেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ ১৲, বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ৺ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে ৫৲, বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু ২৲, ৪নং ছকু খানসামার লেন ॥৵০, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু ৫৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘটক ১৲, বাবু ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৲, বাবু ললিতমোহন বসু ১৲, বাবু তারাপদ রায়চৌধুরী ২৲, বাবু যতীন্দ্রনাথ মিত্র ২৲, S. C. Mukerji Esq ।০, বাবু নন্দলাল রায় ॥০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ দাস ৺ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে ২৲, বাবু রজনীকান্ত দাসের সংগৃহীত ১৪।০, বাবু হীরালাল হালদার ।৵০, বাবু মহেশচন্দ্র নন্দ ॥৵০, বাবু বেণী-মাধব চাকী ॥০, বাবু শশধর হালদারের সংগৃহীত ।০, Mrs A. C. Dutt ভগ্নীর শ্রাদ্ধো-পলক্ষে ৫৲, বাবু মহেশচন্দ্র নন্দী ॥৵০, বাবু বেণীমাধব চাকী ॥০, A Friend of Bagura ১৲, বাবু যাদবলাল রায় ১৲, বাবু অতুলকৃষ্ণ গুপ্ত ১।০, বাবু নবীনকৃষ্ণ গুপ্ত ৫৲, বাবু অপর্ণাচরণ দত্ত ২৲, শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা দাসী ৺ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে ৫৲, শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবী (চক্রধরপুর) ৮৲, বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৲, শ্রীমতী উমাশশী দেবী ১০৲, P. Mukerji Esq ১০৲, সখি সমিতি ৫৲, পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ॥০, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ১৲, কবিরাজ হরিনারায়ণ রায় ১৲, বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবরায় ১৲, বাবু অপূর্ব্বকুমার চৌধুরী ১৲, Justice G. Banerji ৫৲, বাবু হরিচরণ সরকার ১৲, বাবু কালীকৃষ্ণ সেন ॥০, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তের মাতা পৌত্র ও দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষে ১৲, বাবু ত্রিপুরাচরণ রায় পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৲, বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ ১৲, বাবু জ্ঞানদা-প্রসাদ দত্ত ৵০, কোন সমিতি মাঃ রামানন্দ বাবু ১৲, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ১৲, বাবু রাধানাথ দেব বিজন প্রসূণের ১ম জন্মদিনে ॥০, বাবু বামনদাস মজুমদার কর্ত্তৃক রাজবাড়ী হইতে সংগৃহিত ৬৲, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দে ৵০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ১০, ১১নং মুসলমান পাড়া ॥০, বাবু আশুতোষ ঘোষ ৸৶১২॥০, ১৬নং মুসলমান পাড়া লেন ॥০, কুমারী লাবণ্য-প্রভা বসুর কোন আত্মীয় কম্বল ক্রয়ার্থে ৩৲, শ্রীমতী সরযূবালা গুপ্তা ১৲, গোড্ডার জনৈক মহিলা ১০৲, ডাঃ রজনীকান্ত নন্দীর সংগৃহীত ১৸০, হিন্দু স্কুলের ৭ম শ্রেণীর একটী ছাত্র মাঃ বাবু হরনাথ বসু ১৲, বাবু ধরণীধর দত্ত ।০, বাবু জগদীশচন্দ্র বসু ১৲, বাবু বিশ্বেশ্বর দে ১৲, বাবু চুনীলাল শীল ২৲, বাবু দীনেশচন্দ্র চৌধুরী ॥০, ৪।২ ছকু খানসামার লেন ১৲, ৬৮।১ বেচু চাটার্জির ষ্ট্রীট ।০, বাবু শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু গৌরদাস বসাক ১৲, Hon. Justice P. C. Chatterji ৫৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৲, বাবু প্রকাশনাথ মল্লিক ২৲,

বাবু প্রসন্নকুমার মল্লিক ।০, বাবু দ্বারকানাথ চট্টো ।০, বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ (বড়) ২৲, বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত ১৲, চাঁচ্‌ড়া রাজবাটী ৪৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো ১৲, বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী ১৲, বাবু অম্বিকাচরণ বসু ২৲, বাবু উমেশচন্দ্র রায় ১৲, বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ (ছোট) ১৲, বাবু শ্রীনাথ চন্দ ১৲, যশোর বার লাইব্রেরী ১।০, ডাঃ জগদ্দুর্লভ বসাক ১৲, বাবু রমণীমোহন বন্দ্যো ।০, চৌগাছা ঘোষ পরিবারের Charity Box ১৲, জনৈক আর্য্য মহিলা ৫৲, বাবু উদয়রাম দাস ২৲, বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ২৲, বাবু তুলসীচরণ বন্দ্যো ।০, বাবু হরিপ্রসাদ বন্দ্যো ১৲, বাবু দীননাথ সেন ১৲, বাবু জানকীনাথ চট্টো ১৲, শ্রীমতী শান্তমণি বসু ১০৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

বস্ত্র বিক্রয় ৩।৶০, অন্যত্র হইতে হাওলাৎ ১১৸৶০, চাউল বিক্রয় ১৸৶০, কড্‌লিভার অয়েল বিক্রয় ১৲।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ১৬৲, এককালীন দান ২১৬।২॥০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৮।০, বিগত মাসের জের ১৮।০, মোট আয় ২৬৮॥৶২॥০।

ব্যয়।

আদায়কারীর ব্যয় ২৪।৶১৭॥০, গিরিডি সেবালয় ১৬৬৸০, ডাক ব্যয় ১৫, বর্ণপরিচয় বিভাগে ধার ৶০, ঋণশোধ ১৭৸৶০, এজেন্টের মঃ অঃ ব্যয় ।৶০, রোগীর গাড়ী ও আহার ১।৶০, ৩১ শে শ্রাবণের বস্ত্র ক্রয় ২৩।০, মুটে ৴৫, বাবু প্রিয়নাথ দাসের পাথেয় মাঃ মৃগাঙ্ক বাবু ৩৲, মোট ব্যয় ২৩৮।৶৭॥০।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ২৬৮॥৶২॥০, মোট ব্যয় ২৩৮।৶৭॥০, হস্তেস্থিত ৩০।১৫।

দাসী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

(১)

(অনেক দিন পূর্ব্বে কোন সাহেবকে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দ্বারা লিখিত পত্রের মর্ম্ম অনুবাদ)

১৭৩৯ শকাব্দায়, ৩রা জ্যৈষ্ঠ দিবসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমে তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সংস্থাপিত এক বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন। তৎপরে মহাত্মা ডিরোজিওর শিক্ষাধীনে হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করেন। মহর্ষির পিতা ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তানকে রামরামের স্কুলে প্রবিষ্ট করান, ইহাতে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।

হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন কালে একদা সুনির্ম্মল আকাশের বিশাল দৃশ্য ঈশ্বরের পবিত্র ও অনন্ত ভাব সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেয়।* তিনি তাহা হইতেই এই সত্যে উপনীত হইলেন যে, এই অনন্ত গগনের স্রষ্টা কখনই অন্তবৎ হইতে পারেন না। কিন্তু এই ধর্ম্মভাব তখন তাঁহার জীবনের উপর বিশেষ কার্য্য করিতে সক্ষম হয় নাই; কারণ যৌবন অবস্থায় অতুল ধনের অধিকারী হইলে যে প্রকার বৃথা আমোদ প্রমোদ ও চাপল্য মানবমনকে চঞ্চল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, মহর্ষির জীবনেও যৌবন অবস্থায় সেই ভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গিয়াছিল। আঠার বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হয়। তিনি এই সময় পর্য্যন্ত এইরূপ

* "পঞ্চ বিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুস্তক দেখ।

লক্ষ্যভ্রষ্ট অশান্তিকর জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময় যখন তাঁহার পিতামহীর মৃত শরীর সৎকারের নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটে নীত হয়, তিনিও সেই সঙ্গে ঘাটে গমন করেন। যখন সেই মৃত শরীর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন তখন এই অসার পৃথিবীর নশ্বরত্ব তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিল। তখন তিনি মানবজীবন ও পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্যের অসারত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সেই সময় তাঁহার মনের অবস্থার বিষয় তিনি স্বয়ংই কোন এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, ‘এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে এমন এক অব্যক্ত আনন্দের মধ্যে মগ্ন করে, যাহা আমি কখনও ইতিপূর্ব্বে জীবনে অনুভব করি নাই।’’ এই সময়ে তিনি প্রায়ই বোটানিকেল গার্ডেনে যাইতেন এবং সেখানে সমস্ত দিবস ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। এইরূপে ধর্ম্মতৃষ্ণায় যখন তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠিল, তখন অকস্মাৎ এক দিবস ঈশোপনিষদের একটি ছিন্ন পত্র উড়িয়া তাঁহার হস্তগত হয়। তাহাতে এই নিম্ন শ্লোকটি লিখিত ছিল। ঐটি ঐ উপনিষদের প্রথম শ্লোক।

“ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।’’

“এই জগতের সমস্ত পদার্থ তাঁহার সত্তায় পূর্ণ। নিষ্কাম হইয়া তাঁহাকে উপভোগ কর এবং অন্যের ধনের প্রতি লোভ করিও না।”

ইতিপূর্ব্বে হইতে তাঁহার ব্যাকুল আত্মা সীমাবিহীন সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। কিন্তু এখন তাঁহার প্রাণ হইতে চাঞ্চল্যের ভাব একেবারে বিদূরিত হইয়া এক মহাশান্তির ভাব উদিত হইল। প্রথম হইতেই তিনি কোথায় ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবেন, তাহার অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সেই পরমতত্ত্ব অন্বেষণ করিবার জন্য তাঁহাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে না। তাহা স্বদেশের শাস্ত্রের মধ্যেই তিনি পাইবেন। প্রথমে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে হিন্দু ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পৌত্তলিকতাপূর্ণ, কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন তাহার মধ্যেই একেশ্বরবাদ আছে। বিখ্যাত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন।

১৭৬১ শকাব্দায় ১১ই আশ্বিন দিবসে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হয়। স্বদেশের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত ব্রহ্ম-প্রতিপাদক তত্ত্ব সকলের বহুল প্রচার জন্য এই তত্ত্ববোধিনী সভা মহর্ষি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। যদিও

প্রথমে অতি অল্প সংখ্যক সভ্য লইয়া এই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু ক্রমে বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদ বাহাদুর, নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়, বিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্য মান্য ধনী বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ও সহচর ছিলেন। এই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ যাহাতে প্রধানতঃ বেদান্ত শাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিবাদক বাক্য সকল সংগৃহীত হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সকল সে বিষয়ে ইঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল; তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বেদান্ত বা উপনিষদই তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রধান ভিত্তিভূমি ছিল। সেই হেতু তাঁহারা বৈদান্তিক বলিয়া তখন উক্ত হইতেন। প্রত্যেক মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে ব্রহ্মোপাসনার জন্য সভ্যগণ একত্রিত হইতেন এবং সেই উপাসনার কার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত। এই সভার দ্বিতীয় বার্ষিক উপবেশন সময় প্রায় ৩০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে “ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিকট সম্বন্ধ আছে” এই বিষয়ে একজন বক্তা কর্ত্তৃক এক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। যদিও সেই সময় ইংরেজী ভাষার দিকে কতিপয় সভ্যের ঝোঁক হইয়াছিল, কিন্তু সভার অধিকাংশ সভ্যগণের হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং এই হিন্দুশাস্ত্র সকলকে সভ্যগণ তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এই হেতু তত্ত্ববোধিনী সভাকে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবসম্পন্ন সভা বলিতে হইবেক। কিন্তু ইহার পরে কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবের সহিত জাতীয় ভাব সংরক্ষিত হইতে পারে, এই বিষয় লইয়া অনেকের সহিত মহর্ষির মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭৬২ শকাব্দায় কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার সহিত উপনিষদ শিক্ষা দেওয়া এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিছুকাল পরে এই বিদ্যালয় কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়াতে উঠিয়া যায়। এই বাঁশবেড়িয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সাম্বৎসরিক পুরস্কার বিতরণের সময়, হিন্দুসমাজের প্রায় ৫০০ শত বিখ্যাত ধনী ও শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে

মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যালয় ১৭৬৪ শকাব্দায় উঠিয়া যায়।

১৭৬২ শকাব্দায় মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কেবল মাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রদত্ত চাঁদার দ্বারা ইহার পরিপালন কার্য্য সমাধা হইত, এবং কেবল মাত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সমাজকে প্রতিমাসে ৮০ টাকা অর্থ সাহায্য করিতেন। মহর্ষি তাঁহার "পঁচিশ বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামক গ্রন্থে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের গুপ্ত বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যখন মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করাতে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভা সম্মিলিত হইল, তখন তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক অধিবেশন উঠিয়া গিয়া ইহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মাসে অধিবেশন হইতে আরম্ভ হয়। এই সভা এখনও প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে প্রাতঃকালে হইয়া থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভাও এই সময় হইতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মত প্রচারের উপায় হইল। ১৭৬১ শকাব্দায় ইহার বাৎসরিক আয় ২৪৭৩ টাকা ৫।১০ আনা ছিল। ১৭৬৭ শকাব্দায় ইহার আয় ৩৪৭৬ টাকা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃতরূপে উপাসনা এবং বক্তৃতা দিবার প্রথা মহর্ষি কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথমে ব্রাহ্ম উপাসনার কোন পদ্ধতি ছিল না, কেবল উপনিষদ হইতে শ্লোক পাঠ এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা হইত। যখন মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের মত নিতান্ত পরিশুদ্ধ ছিল না; এমন কি কোন কোন সভ্য শ্রীরামচন্দ্রকে ঈশ্বরের অংশরূপে বিশ্বাস করিতেন। ধর্ম্মসঙ্গীত ব্যতীত অন্য দুই একটি সঙ্গীতও সমাজে গীত হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মমতের বিরোধী ও অসঙ্গত এই সকল ব্যাপার মহর্ষি সমাজে যোগদান করিবার পর হইতে একেবারে উঠিয়া যায়। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রার্থনাসমন্বিত উপাসনাপদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তন করেন।

১৭৬৪ শকাব্দায় তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক কলিকাতায় বেদ-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। বেদ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে তাহা হইতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত না হওয়াতে ১৭৬৬ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক সর্ব্বপ্রথমে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বেদ অধ্যয়নার্থ কাশীতে প্রেরিত হন এবং পর বৎসরে তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, রমানাথ ভট্টাচার্য্য ও বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য

এই তিন জনকে প্রেরণ করা হয়। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ অথর্ব্ব-বেদ ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। তারকনাথের প্রতি সামবেদ, পণ্ডিত রমানাথের প্রতি ঋগ্‌বেদ এবং পণ্ডিত বাণেশ্বরের প্রতি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবার ভার প্রদত্ত হয়।

১৭৬৫ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। বাবু অক্ষয়-কুমার দত্ত ইহার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার দ্বারা বঙ্গভাষার যে বিশেষরূপে উন্নতি সাধন হইয়াছিল, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সময় এই পত্রিকাটি বঙ্গদেশে একটি বিখ্যাত পত্রিকারূপে গণ্য হইত। সেই সময় ইহার ন্যায় অন্য কোন পত্র প্রকাশিত হইত না। এই জন্য মাসের প্রথম তারিখে যখন উহা প্রকাশিত হইত, তখন সকলে আগ্রহের সহিত উহার প্রাপ্তি প্রতীক্ষা করিতেন। সেই বৎসরে ৭ই পৌষ তারিখে মহর্ষি ও তত্ত্ববোধিনী সভার আরও ১৯ জন সভ্য তদানিন্তন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বলিয়া কোন সম্প্রদায় ছিল না। এই সময় হইতে ঐ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়; পূর্ব্বে লোকে ব্রাহ্মসমাজকে ব্রহ্মসভা ও ব্রাহ্মকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া ডাকিত। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম এই দুই শব্দের ব্যবহারই ছিল না। এখন হইতে তাহা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর দেব এবং আমার স্বর্গীয় পিতা নন্দকিশোর বসু, রামমোহন রায়ের আদিম শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা সেই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করেন। সেই প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞায় "আমি বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম" এই বাক্য ছিল। ১৭৬৮ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে আমার প্রস্তাবে এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের পোষকতায় "বৈদান্তিক ধর্ম্ম" এই শব্দের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে "ব্রাহ্ম" "ব্রাহ্মসমাজ" ও "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই সকল শব্দ প্রথমতঃ মহর্ষি কর্তৃক প্রচলিত হয়। ইহা একটি কৌতুকজনক সত্য যে "ব্রাহ্মসমাজ" নাম হইতে "ব্রাহ্ম" শব্দ উৎপন্ন হয় নাই, ঠিক বলিতে গেলে "ব্রহ্মসভা" শব্দহইতে ব্রাহ্ম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রতি দশ বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের এক একটি মহৎ ঘটনা হয়।

১৭৪১ শকাব্দে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক "আত্মীয় সভা" নামে একটি সভা সংস্থাপিত হয়। সেই সময় যদি আত্মীয় সভার সংস্থাপন না হইত। তাহা হইলে অদ্য ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিত না। সেই আত্মীয় সভাই পরে ব্রহ্মসভা নাম ধারণ করে।

১৭৫১ শকাব্দে বর্ত্তমান সমাজ-গৃহে ব্রহ্মসভার প্রথম অধিবেশন হয়। সেই সময় হইতেই সেই দিনে প্রতি বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে।

১৭৬১ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হয়।

১৭৭১ শকাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

১৭৮১ শকাব্দে কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারের জন্য ব্রহ্ম-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়।

১৭৯১ শকাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি ব্রাহ্ম, কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার অনুবর্ত্তিদিগের নিকট হইতে ঈশ্বরোচিত সম্মান গ্রহণ করাতে, উক্ত সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

১৭৬৭ শকাব্দে মহর্ষি কর্ত্তৃক হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। হিন্দুসমাজ হইতে ৩২০০০ হাজার টাকা তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত দিবার জন্য এই বিদ্যালয় প্রথম সংস্থাপিত হয়। উমেশচন্দ্র দত্ত নামক একজন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে হিন্দুসমাজে এক বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হয়। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় সেই আন্দোলনের ফলস্বরূপ। এই সময়ে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ হিন্দুবালককে প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে, সেই বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তীব্রসমালোচনাগর্ভ প্রস্তাব সকল প্রকাশিত হইত। সেই সকল প্রস্তাবে হিন্দুসমাজকে প্রাণস্পর্শী উত্তেজক ভাষায় খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা হইত। হিন্দুসমাজ ইতিপূর্ব্বে কখন এমন জীবনীশক্তির পরিচয় দেয় নাই, যেমন এই সময়ে দিয়াছিল। এই বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য ক্রোরপতি আশুতোষ দেবই দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ৺ হরিমোহন সেন ও মহর্ষি এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক, ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক এবং আমি পরিদর্শক ছিলাম।

ইহার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ বিশেষরূপে আক্রমণ

করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সমর্থনার্থ পত্রিকায় প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা প্রবন্ধ ব্যতীত পত্রিকাতে এই বিষয়ে অনেক ইংরাজী প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। সেই সকল একত্রিত হইয়া "Vedantic Doctrine Vindicated" নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বেদান্তকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া কেবল এই জন্য বিশ্বাস করা হইত যে, ইহার বাক্য সকল সত্য ও যুক্তিযুক্ত।

১৭৬৮ শকাব্দে মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়, মহর্ষি কর্ত্তৃক তাঁহার শ্রাদ্ধ অপৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণ ও গরিবদিগকে কেবল দান করা হইয়াছিল; কোন প্রকার পৌত্তলিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই বিষয়ে তাঁহার পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন। ইহাই ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত।

ইহার কিছুকাল পরে মফস্বলে ব্রাহ্মসমাজ সকল সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়; সুখসাগর, বাঁশবেড়িয়া, মণিয়ানপুর এবং মেদিনীপুরে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে মেদিনীপুরেই সর্ব্বাগ্রে বিখ্যাত শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুরে সেই সময় ডিপুটী কলেক্টরের কর্ম্ম করিতেন; তিনি এই স্থান হইতে বদলী হইলে সমাজের অবনতি হয়। ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজী ১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করি। পূর্ব্ববাঙ্গলার বিখ্যাত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক ব্রজসুন্দর মিত্র কর্ত্তৃক ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। ১৭৭০ শকে বর্দ্ধমানের মহারাজ কর্ত্তৃক সেই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। সে সমাজ এখনও (শকাব্দা ১৮১৭) বিদ্যমান আছে। প্রায় সেই সময়েই কৃষ্ণনগরে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ইহার সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হিন্দুসমাজপতি বিখ্যাত নদীয়ার রাজার প্রাসাদে হইয়াছিল; কিন্তু বিপক্ষ পৌত্তলিকগণের মন্ত্রণায় মহারাজা সমাজের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে বিরত হয়েন এবং সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজ সেই স্থল হইতে উঠিয়া যায়। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যদ্যপি নদীয়ার মহারাজা আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে ইহা এক শুভ ঘটনা হইত। তৎপরে তথাকার বিখ্যাত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা সমাজ পুনঃস্থাপিত হয়। পুনঃস্থাপিত হইলে পর

তাহার প্রথম অধিবেশনে মহর্ষি, আমি ও অক্ষয় বাবু, আমরা উপস্থিত থাকি। তখন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন মুন্সী কৃষ্ণনগরের সদর আলা (এক্ষণে সবজজ বলে) ছিলেন। ঐ অধিবেশনে উপস্থিত পৌত্তলিক দর্শকেরা তখন আমাদিগের গায়ে 'থু' 'থু' করিয়া থু থু দিয়াছিল। অধিকাংশ থু থু আমারই গায়ে আসিয়া পড়ে; ইহা আমি গৌরবের বিষয় জ্ঞান করি।

শ্রীযুক্ত লালা হাজারীলালই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মপ্রচারক। ইনি ইন্দোরবাসী এবং জাতিতে লালা অর্থাৎ কায়স্থ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যখন সর্ব্বপ্রথমে প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রবর্ত্তন হয়, তিনি সেই সময় প্রচারকের ভার লইয়া দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হন। ইঁহার উৎসাহ ও যত্ন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ছিল। হাজারীলাল লোকের গৃহে গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া ভ্রমণ করিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার পত্রে তাঁহাদের নাম সহী করাইয়া লইতেন। স্বাক্ষর করিবার পর প্রত্যেক ব্রাহ্মকে একটি করিয়া 'ওঁ' অঙ্কিত অঙ্গুরী দিতেন। তিনি নিরামিষ ভোজী ছিলেন; এমন কি দিন কতক Lord Monboddoর মতানুসারে কাঁচা বেগুন ও কাঁচা লাউ খাইতেন।

ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টিকার্য্যে প্রদর্শিত ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণা ব্যাখ্যা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। ঈশ্বরপ্রেমের বড় ধার ধারিতেন না। ১৭৭৫ শকাব্দায় কোন ব্রাহ্ম তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতাতে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। শুষ্কতার মধ্যে ঈশ্বর প্রীতির সঞ্চার দ্বারা সমাজের মহোপকার সাধিত হইতে লাগিল। অবস্থা এখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, যে ঈশ্বরপ্রীতির সর্ব্বোত্তম চিহ্ন বাঁধারোষনাইএর ন্যায় অব্যাহত প্রশান্ত যোগের পরিবর্ত্তে সাময়িক উত্তেজনা ধার্ম্মিকতার পরিচায়ক এবং ধর্ম্মোন্মত্ততাই ধর্ম্মজীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্মোন্মত্ততাকে ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা জ্ঞান করিতেন। উপরোক্ত ব্রাহ্ম মহাশয় তাঁহার প্রথম বক্তৃতা করিবার পরে যখন মফঃস্বলে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, তখন তথা হইতে তাঁহার কোন বক্তৃতাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ সকল বর্ণনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা করেন। তিনি যখন তথায় কাজ করিতেন, তখন মহর্ষি তথায় সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনকালে উক্ত সমাজে ব্যবহৃত "অসতোমা সদ্গময়" ইত্যাদি প্রার্থনা তথা হইতে আনিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী ভুক্ত করেন। (ক্রমশঃ)

অমরত্ব ও পুনর্জ্জন্ম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যাহা হউক, ব্রহ্মের উপর জীবের যে একান্ত নির্ভর. জীব যে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অধীন, এই সত্যে আমরা জীবের অমরত্বের সুদৃঢ় প্রমাণই পাইতেছি। যখন দেখি জীব ব্রহ্মের আত্মাতে আত্মত্বশালী, জীবাত্মা পরমাত্মারই অনুপ্রকাশ. ব্রহ্মেরই একাংশ, যখন দেখি জীবের জীবন ঈশ্বরেরই বিচিত্র লীলা, এবং এই লীলা ঐশ্বরিক প্রকৃতির অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী ফল, ইচ্ছাময়ের গভীর অভিপ্রায়যুক্ত ইচ্ছার ফল, তখন অমরত্ব সম্বন্ধে উজ্জ্বল বিশ্বাস আসিয়া প্রাণকে অধিকার করে। এই যে প্রাত্যহিক মৃত্যু বা প্রলয়ের কথা বলিলাম, ইহাতে কি হয়? ইহাতে আর কিছুই হয় না, ইহাতে কেবল শিশু মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়ে মাত্র, ইহাতে শিশুর শরীরের এক কণাও বিনষ্ট হয় না। নিদ্রান্তে যখন আমরা জাগ্রত হই, তখন দেখি আমাদের জ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধি, বল, প্রেম, পুণ্য সকলই ফিরিয়া আসিতেছে, কিছুই বিনষ্ট হয় নাই; তখন বুঝি সমুদায়ই পরমাত্মার নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষিত হইয়াছিল। তখন দেখা যায় যে, যদিও প্রলয়জলধির মহাপ্লাবনে সমুদায় ডুবিয়া একাকার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল,—জ্ঞানী অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, প্রেমিক অপ্রেমিক, পাপী সাধুর ভেদ বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। যখন মানব পুনর্জাগ্রত হয়, তখন সে দেখে যে নিদ্রারূপ খণ্ডপ্রলয়েও তাহার কর্ম্মফল কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই; জ্ঞানী অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, প্রেমিক অপ্রেমিক, সাধু অসাধু যে যেমন ছিল, সে তেমনই রহিয়াছে; পরস্পরের অভিমান, অভিজ্ঞতা, অর্জ্জিত আধ্যাত্মিক সম্পত্তির বিন্দুমাত্রও মিশ্রণ ঘটে নাই; যার যা তাই আছে, কেহ কিছু হারায় নাই, এবং অন্যের কিছুও পায় নাই। সেই এক অখণ্ড অনন্ত জ্ঞানের মধ্যেও যেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার জীবনোপকরণগুলি ভিন্ন ভিন্নরূপে রক্ষিত হয়, পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইতে পায় না। সুতরাং আমাদের ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মের অধীন হইলেও অক্ষয় বস্তু, অথবা শুদ্ধতর ভাষায় বলিতে গেলে, ব্রহ্মের অধীন বলিয়াই অক্ষয় বস্তু। জ্ঞান যখন কালাতীত বস্তু, এবং প্রত্যেক জ্ঞানকণিকা যখন সেই অনন্ত জ্ঞানেরই অঙ্গীভূত, তখন জীবগত প্রত্যেক জ্ঞান-

কণিকা অক্ষয় অবিনাশী বস্তু। মহাজ্ঞানীর পরিপক্ক চিন্তা ও ধ্যান হইতে ক্ষুদ্র শিশুর সরল চিন্তা ও জ্ঞানচেষ্টা পর্য্যন্ত সমুদায়ই অক্ষয় অবিনাশী। দেশ-কালাধীন বিষয়ের সহিত বিষয়ীর যে সম্বন্ধ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সে সম্বন্ধ নহে। বিষয় যে অর্থে পরাধীন, জীবাত্মা সে অর্থে পরাধীন নহে। জীবাত্মা পরমাত্মার অনুপ্রকাশ, জড়ীয় ভাষায় বলিতে গেলে, পরমাত্মার রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস, সুতরাং ইহা পরমাত্মার দেশ-নিরপেক্ষতা, কাল-নিরপেক্ষতা, সত্তান্তর-নিরপেক্ষতা, সমুদায়েরই অধিকারী, এবং এই অধিকার সূত্রেই অমর, অবিনাশী।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানবজ্ঞান পরম জ্ঞানের অঙ্গীভূত এবং সেই অর্থে অবিনাশী হইলেও শরীর পাতান্তে যে ইহার ব্যক্তিগত অনুপ্রকাশ হইবে, তাহার প্রমাণ কি? জাগ্রদবস্থায় যেরূপে আমাদের ব্যক্তিগত অভিমান ও তৎসংযুক্ত চিন্তাপ্রবাহের অভিব্যক্তি হয়, সেই অভিব্যক্তিতেই মানবের ব্যক্তিত্ব, মানবের মানবত্ব, সুতরাং মরণান্তর কালে এরূপ ব্যক্তিগত পুনঃপ্রকাশের প্রমাণ দিতে না পারিলে প্রকৃত পক্ষে মানবাত্মার অমরত্ব সপ্রমাণ হইল না। ইহা সত্য কথা, সুতরাং আমরা এই পুনঃপ্রকাশের প্রমাণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মানবজীবনরূপে অনুপ্রকাশিত হওয়া যে ঐশ্বরিক প্রকৃতির একটী অনিবার্য্য কর্ম্ম, এই কথা পূর্ব্বেই ইঙ্গিতীকৃত হইয়াছে। এখন এই কথাটী বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। পরমাত্মা অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু; তাঁহার অতিরিক্ত, তাঁহা ছাড়া, কোন বস্তু নাই। সমুদায়ই তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার অন্তর্গত। সুতরাং এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না যাহা তাঁহাতে বাসনা উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে, তাঁহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে। সুতরাং তাঁহার প্রকৃতিতে সসীম জীবের ন্যায় চঞ্চল বাসনা থাকিতে পারে না। এখন এক কামনার উদয়, তার পর কিছুকাল পর তাহার বিলয়, পুনরায় আর এক কামনার উদয়—ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ইহা অস্বতন্ত্র, পরাধীন জীবের স্বভাব, স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তির স্বভাব নহে। পরমাত্মার যাবতীয় কার্য্যই তাঁহার নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতির ফল হইবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তিনি যাহা কিছু করেন তাহা অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য, তাহা না হইয়া পারে না; তাহা অন্যরূপ হইবার যো নাই। এই

কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, এই যে মানবজীবনরূপে ভগবানের লীলা, ইহা তাঁহার সাময়িক বাসনার ফল নহে, ইহা তাঁহার সনাতন প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য ফল, ইহার অন্যথা হইতে পারে না, ইহা তিনি না করিয়া থাকিতে পারেন না, ইহা না করিলে তাঁহার নিজ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করা হইত। এই কথা যে কেবল সাধারণ ভাবে খাটে তাহা নহে। একই যুক্তিতে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই—ইহা প্রত্যেক মানবাত্মা সম্বন্ধেই খাটে। এই যে আমার জীবনে, তোমার জীবনে, তাহার জীবনে তাঁহার অনুপ্রকাশ, এই প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য ফল। এইরূপে অনুপ্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, না হইলে নয়, তাই তিনি হইয়াছেন।

তার পর আর একটী কথা বিবেচনা করুন্। এই অনুপ্রকাশের কারণ কি, অভিপ্রায় কি, তাহা যে আমরা একবারে বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা নহে। খুব সূক্ষ্মরূপে, বিশেষরূপে, না বুঝি, মোটামুটি বেশ বুঝিতেছি। মানবজীবনের আর যাহাই উদ্দেশ্য থাকুক্ না থাকুক্, ধর্ম্মে উন্নত হওয়া, জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতাতে উন্নত হওয়া, পশুভাব ছাড়িয়া মানুষ হওয়া, মানবের সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া দেবতা হওয়া, বিবেক-প্রকাশিত পূর্ণ প্রেম পবিত্রতার আদর্শ জীবনে আয়ত্ত করা, ইহা যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নানা সংগ্রামের ভিতর দিয়া, অসংখ্য সুখ দুঃখ, বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া, ঈশ্বর মানবকে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে অগ্রসর করিতেছেন। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, অন্তর্জ্জাতীয় জীবন; বিজ্ঞান, দর্শন, সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্য, সমুদায়ই এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়তা করিতেছে, সমুদায়ই এই আধ্যাত্মিক বিকাশের আয়োজন মাত্র। আর এই আধ্যাত্মিক বিকাশ মূলে ব্যক্তিগত বিকাশ। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সমাজ চাই বটে, অন্যের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বিকাশের কোন অর্থ নাই বটে, কিন্তু বিকাশ ব্যাপারটা ব্যক্তিগত আত্মা সম্বন্ধীয়, সমাজ সম্বন্ধীয় নহে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি জ্ঞানী না হইলে সামাজিক জ্ঞানের কোন অর্থ নাই; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি প্রেমিক না হইলে সামাজিক প্রেমের কোন অর্থ নাই; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চিত্ত ও ব্যবহার পবিত্র না হইলে সামাজিক পবিত্রতার কোন অর্থ নাই। সামাজিক জ্ঞানোন্নতি, প্রেমোন্নতি, পবিত্রতার উন্নতির অর্থ সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতায়

উন্নতি। সুতরাং "আধ্যাত্মিক উন্নতিই মানবজীবনের উদ্দেশ্য, বিধাতার মানব-সৃষ্টির অভিপ্রায়,"—এই কথার অর্থ এই যে প্রত্যেক মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতিই বিধাতার মানব-সৃষ্টির অভিপ্রায়।

তাহাই যদি হইল,—মানব-সৃষ্টি যদি ঐশ্বরিক প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী কার্য্যই হইল, এবং প্রত্যেক মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতিই যদি সেই কার্য্যের মূলোদ্দেশ্য হইল, তবে শরীর নাশের সঙ্গে মানবাত্মার বিনাশ—মানবজ্ঞানের ব্যক্তিগত প্রকাশের নিরোধ—কদাচ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে, যে অসংখ্য সংগ্রাম ও অশেষ যত্নের সহিত আধ্যাত্মিক সম্পত্তি সঞ্চিত হয়, সে সংগ্রাম ও যত্ন সমস্তই উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়ে। অথচ অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া নিয়ত এরূপ কার্য্য করিতেছেন, ইহা কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রকৃতি ও শক্তি-প্রসূত কার্য্য অন্য কোন শক্তি দ্বারা নিষ্ফলীকৃত হইতেছে, ইহাও একবারেই অসম্ভব। সুতরাং আমাদিগকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইতেছে যে প্রত্যেক মানবের জীবনে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক সম্পত্তি সঞ্চিত হইতেছে ও তাহার দৈনন্দিন বিস্মৃতি ও নিদ্রার মধ্যেও পরমাত্মার নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা শরীর পাত হইলেও অকর্ম্মণ্য ও অনুন্নত হইয়া পড়িয়া থাকিবে না, কিন্তু ঐশী শক্তি প্রভাবে ইহা অবস্থান্তরে পুনঃ প্রকাশিত হইবে, এবং ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইবে। যে অদম্য ধর্ম্মপিপাসার—মুক্তিপিপাসার—বশবর্ত্তী হইয়া মানব ধন, মান, অর্থ, সুখ, আত্মীয় স্বজন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে, অথচ যাহা অতৃপ্ত জীবনের শেষ দিনেও নিবৃত্ত হয় না, সেই অদম্য পিপাসার মূলে যিনি, সেই পিপাসা যাঁহার পবিত্র পূর্ণ প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য ফল, সেই পিপাসাকে নিবৃত্ত না করিয়া নির্ম্মূল করা, এবং সেই পিপাসা নিবৃত্তির সমুদায় আয়োজন নিষ্ফল করিয়া দেওয়া—এই কার্য্যের সহিত পূর্ণ পবিত্র প্রকৃতির কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। এই বলিলেই তাঁহার প্রকৃতির অনুযায়ী কথা বলা হয় যে, তাঁহা কর্ত্তৃক মানবাত্মায় সংক্রামিত এই অদম্য মুক্তিপিপাসা তিনি যে কোন উপায়েই হউক নিবৃত্ত করিবেন, তাঁহার নিজেরই অশেষ যত্ন-সঞ্চিত মানব-পুণ্যফল তিনি যে কোন প্রণালীতেই হউক চিরদিন রক্ষা করিবেন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেন।

এখন অমরজীবনের প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

১। ঈশ্বর যে নিয়মে জগৎ সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, তাহার আলোচনা করিলে দেখি, তিনি সহসা কিছুই করেন না। তিনি যাহা কিছু করেন, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে করেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পরম্পরার ফল। বিশেষতঃ যে বস্তু যত জটিল, যে বস্তু যত প্রকৃষ্ট গুণযুক্ত, সেই বস্তুর নির্ম্মাণে ততই বহুল ও দীর্ঘকালব্যাপী আয়োজন ব্যয়িত হয়, সেই বস্তু ততই ধীর ক্রম-বিকাশ-প্রণালীর ফল। বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশবাদ যদি সত্য হয়, তবে ইহা ঠিক যে বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময়, অতি জটিল মানবশরীরের অভিব্যক্তির জন্য অচিন্তনীয় দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। অগণ্য পশু-শরীর অশেষ সংগ্রাম ও সাধনার প্রভাবে ক্রমবিকশিত হইয়া, সেই সাধনার ফল সঞ্চয় করিয়া, ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর শরীর উৎপাদন করিয়া, অবশেষে এই মানব-শরীরে পরিণত হইয়াছে, এবং এখন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই নিজ আকৃতির অনুরূপ শরীরোৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে। ভৌতিক জগতে যে নিয়ম, আত্মজগতে তাহার বিপরীত নিয়ম ;—সেখানে ধীর ক্রম-বিকাশ, এখানে আকস্মিক সৃষ্টি, এরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং পরিপক্ক মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিশালী মানবাত্মা, যে মানবাত্মা জন্মগ্রহণান্তর অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই অতি বিচিত্র ও উন্নত মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করে, সেই মানবাত্মা অকস্মাৎ সৃষ্ট না হইয়া, ৯।১০ মাসের মধ্যে সূক্ষ্ম ও জটিল মনোবৃত্তি-সমন্বিত না হইয়া, সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশ প্রণালীর ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে,—প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে এই কথাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ মানুষে মানুষে যেরূপ স্বাভাবিক জন্মগত প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্মগত প্রভেদকে পূর্ব্ববিকাশের তারতম্য-জনিত বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে যেন কোন সন্তোষকর ব্যাখ্যাই হয় না। কেবল শারীরিক প্রভেদদ্বারা এই মানসিক প্রভেদ ব্যাখ্যা করা, এবং এই শারীরিক প্রভেদকে আপন আপন পিতা মাতার শারীরিক তারতম্যে আরোপ করা, ইহাতে কেবল জড়বাদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অনেক স্থলে সন্তান পিতা মাতা হইতে অতিশয় ভিন্ন হয়। আর যেখানে সাদৃশ্য থাকে সেখানে পিতা মাতার মানসিক শক্তি সন্তানে সাক্ষাৎভাবে সংক্রামিত হইয়াছে, ইহা বলিলে এই মতই

পোষণ করা হয় যে, যেমন এক শরীর হইতে আর এক শরীর জন্মে, তেমনি এক মানবাত্মা হইতে অন্য মানবাত্মা জন্মে ; অথচ এই মতের সপক্ষে কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। পিতামাতার মানসিক শক্তি কোন অজ্ঞাত প্রণালীতে সন্তানে সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে, বরং অনেক পরিমাণে সম্ভব বলিয়াই বোধ হয় ; কিন্তু পিতামাতা যখন নিজ সাধন বলে সন্তানের আত্মাকে উৎপাদন করেন না, এবং যখন দেখা যায় যে যতদিন পর্য্যন্ত না কোন আত্মা নিজে চেষ্টান্বিত হয়, যত দিন না তাহার নিজ মানসিক শক্তি জাগরিত হয়, ততদিন কেবল অন্যের যত্নে তাহার উন্নতি সাধিত হয় না,—যখন দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিগত সাধনই ব্যক্তিগত উন্নতির মূল কারণ,—তখন ভিন্ন ভিন্ন আত্মার জন্মগত প্রভেদ সেই আত্মার জন্মান্তরগত সাধনের তারতম্য-জনিত হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

২। আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিতে পাই, আমাদের মানসিক অনেক ক্রিয়াই,—সম্ভবতঃ সমুদায় ক্রিয়াই—শরীরের সহযোগিতার উপর, স্নায়বিক যন্ত্রের (nervous systemএর) সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। আত্মা আর শরীর এক নহে, ইহা নিশ্চয়, এবং স্নায়বিক যন্ত্রের নিষ্ক্রিয় অবস্থায়, গভীর সুষুপ্তির অবস্থায়ও যে মানসিক সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাও এই প্রবন্ধেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে স্নায়বিক যন্ত্র অবসন্ন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, বা অন্য প্রকারে অচেতন হইয়া পড়ে,—মানবাত্মার ব্যক্তিগত প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়,—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, মনন, ধ্যান প্রভৃতি সমস্ত মানসিক ক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনের মূলীভূত অহংবোধ বা অভিমান পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কি এই কথাই সপ্রমাণ হয় না যে মানবাত্মার ব্যক্তিগত প্রকাশের পক্ষে কোন না কোন প্রকার শরীর, স্নায়বিক যন্ত্রের ন্যায় কোন না কোন জড়ীয় আশ্রয়, একান্ত আবশ্যক? শরীর-বিহীন হইয়া যে মানবাত্মার প্রকাশ একবারে অসম্ভব (impossible), আমি এই কথা বলিতেছি না। কিন্তু সমস্ত জীবন যাহার একান্ত প্রয়োজন হইল, যাহা না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলিল না, একবার তাহার বিনাশ হওয়া মাত্র তদনুরূপ আর কিছুর প্রয়োজন হইল না,—যে শক্তি অর্থাৎ অশরীরী হইয়া থাকার শক্তি সমগ্র জীবনে একবারও প্রকাশ পাইল না, শরীর পতনমাত্রেই সহসা সেই শক্তি বিকশিত

হইল, শরীর বিনাই দর্শন শ্রবণ মননাদি সমস্ত মানসিক ক্রিয়া চলিতে লাগিল,—ইহা যেন প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ সুতরাং অনেক পরিমাণে অসম্ভব (improbable) বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি যে সমস্ত উপায়ের উপর নির্ভর করে, তন্মধ্যে অনেক গুলিই শরীরের সহিত সম্বদ্ধ। নীতি ও আধ্যাত্মিকতা সামাজিক বস্তু,—পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-ঘটিত বস্তু। পরস্পরের সহিত দেখা শুনা, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান, প্রেমিক ও প্রেম পাত্র, উপকারী ও উপকৃত—এবম্প্রকার সম্বন্ধ যে অবস্থায় নাই,—সে অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে, সে অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন অর্থ আছে বলিয়াই বোধ হয় না। অথচ অশরীরীর পক্ষে—অশরীরী ব্যক্তিগণের মধ্যে—এই সকল সামাজিক সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব, তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং এক শরীর পাতান্তে আর এক শরীর প্রাপ্ত হওয়া ব্যক্তিগত আত্মার পুনঃ প্রকাশের পক্ষে এবং ক্রমোন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। দীর্ঘকালব্যাপী সাধনও উন্নতির ফল স্বরূপ বিদেহ অবস্থা লাভ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; কিন্তু কোথাও কিছু নাই, জীবদ্দশায় এরূপ বিদেহ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তির কোন প্রকাশ নাই, অথচ মরণান্তে সহসা এরূপ অবস্থা লাভ হইল, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

৩। পূর্ব্বজন্ম সত্য হইলেও মানবাত্মা যে নানা নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। মানবাত্মারই উচ্চ নীচ অসংখ্য সোপান, অসংখ্য অবস্থা-পরম্পরা থাকিতে পারে যাহার ভিতর দিয়া ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যোনি-ভ্রমণ যে একবারে অসম্ভব, তাহা বলিতে পারি না। মানবের জ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ নিকৃষ্ট জন্তুর জ্ঞানে অনতিক্রমনীয় প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবপরম্পরাকে দাঁড় করাইলে সেই অনতিক্রমনীয় প্রভেদ লক্ষিত হইবে কি না সন্দেহ। বিজ্ঞান যেন ক্রমশঃ আমাদের সংস্কারগত ভেদজ্ঞানকে দূর করিয়া দিতেছে। কোন কোন উচ্চতর মানবেতর জন্তুর মধ্যে এমন গভীর ও মধুর সামাজিক ভাব এবং উন্নতিশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি মানবের পক্ষেই দুর্লভ পরোপকার-প্রবণতা, স্বার্থহীনতা, এমন কি অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপের ভাব পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সকল জন্তুর অমরত্বলাভ ও ক্রমোন্নতি

এবং পরিণামে মনুষ্যত্ব লাভ একবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, শরীর ও মনের পরস্পর নিকট সম্পর্ক সত্বেও ইহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ এখনও এত দুর্ব্বোধ রহিয়াছে যে জন্মান্তর ও যোনি-ভ্রমণ যদি সত্যও হয়, তথাপি বলিতে হইবে যে, কি প্রণালীতে এক দেহ-মুক্ত আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ লাভ করে, কি নিয়মে নিম্ন যোনিস্থ আত্মা উচ্চতর শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়, এই সমস্ত বিষয় এখনও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। একটী কথা আমার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কোন আত্মা একবার মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মানবের জটিল ও উন্নত মনোবৃত্তি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া যে পুনরায় কোন নিকৃষ্ট জন্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ আত্যন্তিক অধোগতি প্রাপ্তির উপযুক্ত মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থা মানবাত্মার পক্ষে ঘটা আমি অসম্ভব মনে করি, এবং বোধ হয় প্রাণীবিজ্ঞানেও এরূপ পশ্চাদ্‌গামী বিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

৪। আমাদের জীবনের অধিকাংশ তত্বই আমাদের স্মৃতির পশ্চাতে থাকে, এককালে প্রকাশিত হয় না, এবং সুষুপ্তির অবস্থায় সমস্ত বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, অথচ তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত একত্ব বিনষ্ট হয় না, এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন আর একটী কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। দেখা যায় যে আমরা সজ্ঞানভাবে যে সমস্ত পুণ্য বা পাপ কার্য্য করি তাহা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাই, অথচ সেই সকল কার্য্যের ফলস্বরূপ যে সু বা কু অভ্যাস, তাহা আত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া জীবনে সু বা কু ফল, সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করিতে থাকে। অধ্যয়ন, উপদেশ, আলোচনা ও চিন্তা প্রভৃতি হইতে লব্ধ বিশেষ বিশেষ সত্যের অধিকাংশই বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়। অথচ এই সমুদায়ের প্রভাবে বুদ্ধির যে তীক্ষ্ণতা ও ধারণাশক্তি জন্মে, তাহা আত্মার স্থায়ী সম্পত্তি হইয়া থাকে। তেমনি, যে যে সজ্ঞান পুণ্যকর্ম্ম, পুণ্যকথা, পবিত্র চিন্তা দ্বারা নিস্বার্থ প্রীতি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করা যায়, যে সকল উপাসনা ধ্যান ধারণাদি সজ্ঞান সাধনা দ্বারা যোগ ও ভক্তি লাভ করা হয়, সে সমুদায় কার্য্যের অধিকাংশই জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, অথচ তাহাতে অভ্যস্ত ও সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সম্পত্তি সমূহ নষ্ট হয় না। পুণ্য সম্বন্ধে যেরূপ, পাপ সম্বন্ধেও সেরূপ। যে সমস্ত সজ্ঞান পাপ চিন্তা, পাপ কথা, পাপ ব্যবহার দ্বারা হৃদয় শুষ্ক, কঠোর, পর-

পীড়ন-প্রবণ, স্বার্থপর ও নীচ ভোগাসক্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মানুষ ক্রমশঃ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তাহা ভুলিয়া গেলেও মনের অপবিত্র গঠন, মনো-বৃত্তির অভ্যস্ত পাপাভিমুখী গতি পরিবর্ত্তিত হয় না। এইত গেল সাধারণ কথা, যাহা সকলের জীবনেই অল্লাধিক পরিমাণে ঘটে। এই সকল স্থলে আমরা পূর্ব্ব কথার বিস্মৃতিবশতঃ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত একতা নষ্ট হইল বলিয়া মনে করি না, অথবা যে সকল কু বা সু অভ্যাস মানুষের দুঃখ বা সুখ ঘটাইতেছে, তাহার কারণরূপী সজ্ঞান পাপ বা পুণ্য কর্ম্মসমূহ কর্ত্তা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে কোন অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন,—তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন,—এরূপ মনে করি না। তারপর আবার, বিশেষ বিশেষ স্থলে, কোন উৎকট পীড়া বা বিপৎপাৎ বশতঃ পূর্ব্ব-স্মৃতি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, জীবনের পূর্ব্বাংশের সঙ্গে অপরাংশের একত্ববোধ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, অথচ সেই সকল স্থলেও প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত একতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না, এবং সেই সকল স্থলেও পূর্ব্বকৃত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল জীবনকে নিয়মিত করিতে থাকে। এই কথাগুলি মনে রাখিলে, জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে একটী আপত্তি, যাহা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা খণ্ডিত হয়। সেই আপত্তিটী এই,—পূর্ব্বজন্মের কথা যখন কিছুই স্মরণ নাই তখন কিরূপে বলিব পূর্ব্বজন্ম ছিল ? আর যে সকল কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছি, তাহার ফলভোগ ন্যায় সঙ্গতও নহে। আমার উত্তর এই যে, এরূপ বিস্মৃতি অল্লাধিক পরিমাণে এই জীবনেও ঘটে, এবং এই জীবনেও বিস্মৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ইহ জীবনের এই সকল ঘটনার যে ব্যাখ্যা, পূর্ব্ব বা পর জীবন সম্বন্ধেও সেই ব্যাখ্যা খাঁটে।

আর একটী কথা বলিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। মুক্তিলাভ করিলেই, চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্রহ্মের সহিত নিত্যযোগ লাভ হইলেই, জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, মানবের আর ব্যক্তিত্ব থাকে না, প্রকৃত পক্ষে মানব আর থাকেই না,—এই যে প্রচলিত বৈদান্তিক মত, ইহা আমার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, এবং ইহাও বলা আবশ্যক যে বেদান্ত দর্শনের প্রধান গ্রন্থ "ব্রহ্মসূত্র" এই মতের পক্ষপাতী নহে। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদান্তিক মত এবং একটী বিশেষ বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মত ; ইহা প্রাচীন বৈদান্তিক মত নহে এবং সমগ্র বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতও নহে।

মুক্তাত্মা যদি ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তই হইল, অর্থাৎ নিত্য চিরন্তন পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণই রহিলেন, সসীম জীবভাব যদি বিনষ্টই হইল, তবে ব্রহ্মের জীব-লীলা, জীবের জীবনে তাহার অনুপ্রকাশ এবং জীবের উন্নতি কল্পে অশেষ আয়োজন, সমস্তই ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে। "জীবের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, জীব কৃতকৃতার্থ হইল, আর তাহার বাঁচিয়া ফল কি ?" এই কথাও কিছুমাত্র যুক্তিযুক্ত নহে। যে অবস্থা লাভের জন্য এত আয়োজন, যে অবস্থা পরম মঙ্গল, তাহাতে নিত্য স্থিতিই প্রকৃত মঙ্গল ; সুতরাং তখন বিলয়ের সময় নয়, তখন বরং প্রকৃত জীবনারম্ভ। যাঁহার সমুদায় বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে, সমুদায় স্পৃহা পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছায় ব্রহ্মের সহিত চিরসংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মীভূত হইয়াছেন, তাঁহার আর নিজের জন্য লভনীয় কিছু না থাকিতে পারে, তাঁহার নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও ব্যস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্রহ্মীভূত সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত কামনাশূন্য আত্মারও বিলয়ের প্রয়োজন হইতে পারে না, এবং তাঁহার সকাম কর্ম্ম দগ্ধ হইলেও নিষ্কাম কর্ম্ম শেষ হয় না। এরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মপ্রকৃতি প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মের প্রকৃতি-প্রসূত জীবলীলার সহিত সমগ্র বলের সহিত যোগ দেন, জীবের মুক্তির জন্য, উন্নতির জন্য, ব্রহ্মের ন্যায় নিষ্কাম নিস্পৃহ ভাবে চিরদিন কার্য্য করিতে থাকেন। অতি ক্ষুদ্র অধম মানবকেও যখন ঈশ্বর বিনাশ করেন না, তখন যাঁহারা তাঁহার সারূপ্য ও সাযুজ্য লাভ করিয়া তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সাধনের, তাঁহার স্বর্গরাজ্য স্থাপনের সহায় হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিনাশ করিবেন ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বিনাশ করা দূরে থাকুক আমার বরং বোধ হয় যে প্রচলিত বৈদান্তিক মতের বিপরীত কথাই ঠিক। অর্থাৎ তাঁহারা সংসার হইতে, দেশ কাল ও বিষয়ের সংস্রব হইতে, দূরবর্তী না হইয়া কোন না কোন প্রকারে মানব সমাজের সহিত চিরদিনই সংশ্লিষ্ট থাকেন, এবং নিষ্কামভাবে মানবের সেবা করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, দেখ, আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, কিন্তু আমি জীবের হিতের জন্য নিয়ত কর্ম্ম করিতেছি। এই আখ্যায়িকাচ্ছলে গীতাকার প্রচলিত বৈদান্তিক মতের প্রতিবাদ করিতেছেন,—"যার সমস্ত পাওয়া হইয়াছে তাঁহার আর সংসারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবার প্রয়োজন নাই" এই স্বার্থপরতা-প্রসূত সংকীর্ণ মতের প্রতিবাদ করিতেছেন। তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও বোধ হয় যে পরমেশ্বরের ন্যায় বিদেহ অবস্থায়ই হউক, অথবা সাধারণ মানবের ন্যায় শরীরান্তর গ্রহণ করিয়াই হউক, ব্রহ্মীভূত মুক্তাত্মারা সর্ব্বদাই মানব সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন।

শ্রীসীতানাথদত্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তুকারাম।

"দাসী" পত্রিকায় তুকারামের যে জীবনী প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে তাঁহার আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬০৮ খৃঃ অঃ—১৬৫০ খৃষ্টাব্দ) নিরূপিত হইয়াছে। ভক্তচরিত লেখক মহীপতির "ভক্তলীলামৃত" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এই কাল নির্ণীত হইয়াছিল। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাই তুকারামের প্রকৃত আবির্ভাব-কাল।

"বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা" নামক পাক্ষিক পত্রিকায় (১ম বর্ষের ২২শ সংখ্যায়) মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় "শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ?" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে তুকারামের আবির্ভাবকাল ও তাঁহার ধর্ম্মজীবন লাভ-সংক্রান্ত কতিপয় প্রয়োজনীয় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি অনুমান করিয়াছেন, (১ম) তুকারাম খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন ; ২য়, "এই অতি নীচ জাতীয় মূর্খ" (সম্ভবতঃ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীগৌরাঙ্গের "কৃপা প্রাপ্ত" হইয়া "মহাভাগবত" হইয়াছিলেন। যে সকল প্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া শিশির বাবু উল্লিখিত অনুমান করিয়াছেন,তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১ম, চৈতন্যদেব অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চারিমাস মহারাষ্ট্র দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণনানুসারে গৌরাঙ্গ প্রথমতঃ কোলাপুরে ও পরে তথা হইতে পাণ্ডুপুরে (পণ্ঢরপুরে) গমনপূর্ব্বক ভীমা নদীর জলে স্নান করিয়া বিঠ্ঠল ঠাকুরের দর্শন ও তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। তুকারাম রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত ও কোলাপুরের নিকট ভীমা নদীতীরস্থ পাণ্ডুপুরবাসী ছিলেন। তুকারামের আবাসস্থান এই পাণ্ডুপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ কয়েক দিবস ছিলেন।

২য়, তুকারামের অভঙ্গে তাঁহার দীক্ষা লাভ সম্বন্ধে যে গীতটি (অভঙ্গটি) পাওয়া যায়, তাহার মোটামুটি বঙ্গানুবাদ এই,—

"প্রভু গুরু তিনি আমায় করিলেন কৃপা।
কিন্তু আমা হ'তে তাঁর নাহি হলো সেবা॥
আমি যেতেছিনু করিবারে গঙ্গাস্নান।
মোর শিরে প্রভু কর করিলেন প্রদান॥
প্রভু মোরে চেয়েছিল ঘৃত আর অন্ন।
আমি দিতে না পারিনু ছিনু অচেতন॥
কিছু নাহি জানি পরে কিবা ঘটেছিল।
কোন্ কার্য্যের তরে প্রভু কোথা চলে গেল॥
রাঘব চৈতন্য আর কেশব চৈতন্য।
তার কথা বলি দেখাইলে এক চিহ্ন॥
বাবাজী বলিয়া বলিল নিজ নাম।
রামকৃষ্ণ হরি নাম করিল প্রদান॥
মাঘ শুক্ল দশমী গুরুবার দিনে।
প্রভু মোরে কৃপা কৈল তুকারাম ভনে॥"

এখন ইহার পরিষ্কার করিতেছি। তুকা নিজের কাহিনী এইরূপ বলিতেছেন। একদিন মাঘ মাসে বৃহস্পতিবারে শুক্লদশমী তিথিতে আমি গঙ্গা, (ভীমাকে পাণ্ডুপুরে গঙ্গা বলে) স্নানে যাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে প্রভু দর্শন দিলেন আর আমাকে রামকৃষ্ণ হরি এই তিনটী নাম দিলেন। আর কি সঙ্কেত করিলেন, আর রাঘবচৈতন্য কেশবচৈতন্য বলিলেন। আর আপনাকে বাবাজি বলিলেন। এই সমুদায় বলিয়া আমার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া আমার নিকটে তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিলেন। কিন্তু তিনি মস্তকে হস্ত দিলে আমি অচেতন হইয়া পড়ি। তাহার পরে চেতন পাইয়া দেখি যে, ইচ্ছাময় প্রভু নিজ কার্য্যের নিমিত্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না।

৩য়, তুকারাম যে "রামকৃষ্ণ হরি" মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরে হরে। হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।" এই মন্ত্রেরই সংক্ষিপ্ত সার মাত্র। গৌরাঙ্গশিষ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই মন্ত্র জপ করেন।

৪র্থ;—চৈতন্য চরিতামৃতে আছে, দক্ষিণ দিকে ভ্রমণকালেপ্রভু কেবল স্পর্শ করিয়া জীবকে সমুদায় শক্তি সঞ্চার করিয়া মহাভাগবত সৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। শিশির বাবু বলিয়াছেন, এইরূপ করিতে করিতে প্রভু পাণ্ডুপুর তুকারামের স্থানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ পূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার করিয়া কর্ণে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র দিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণটি ছিলেন, তিনি তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিয়া থাকিবেন। প্রভু কথনও নিজ আহারের চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার সঙ্গিগণ তাহা করিতেন।

আর সেই কৃষ্ণদাস হয়ত বলিয়া থাকিবেন যে প্রভুর নাম কৃষ্ণ চৈতন্য। কিন্তু প্রভু যথন তুকারামকে স্পর্শ করিয়া কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তথন তিনি অচেতন। দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে প্রভু "রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং॥" এই সংকীর্ত্তন করিতেন। এখন তুকারাম কৃষ্ণদাসের কাছে শুনিলেন, প্রভুর নাম "কৃষ্ণচৈতন্য," আর প্রভুর মুখে রাম রাঘব আর কৃষ্ণকেশব শ্লোক শুনিলেন। ইহাতে বাবাজির (প্রভুর) নাম রাঘব চৈতন্য কি কেশব চৈতন্য এইরূপ কি হইবে সাব্যস্ত করিলেন। বস্তুতঃ এক সন্ন্যাসীর দুইনাম হইতে পারে না। তুকারাম অচেতনাবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে, তাঁহার প্রভুর নাম হয়, রাঘব চৈতন্য নয় কেশব চৈতন্য হইবে। তারপর, তুকারাম চেতন পাইয়া আর প্রভুকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম ও ব্রজের নিগূঢ়রস প্রবেশ করিল। এইরূপে প্রভুর নিজস্ব পাইয়া তুকারাম আনন্দে নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। তারপর শিশির বাবু একটি পাদটীকায় বলিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্র দেশীয় কোনও গ্রন্থকার তুকারামকে শ্রীগৌরাঙ্গের বহুপরভাবক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মূলক। প্রয়োজন বোধ হইলে এ সম্বন্ধে বিচার করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, একথাও প্রকাশ করিয়াছেন।

তুকারামের আবির্ভাবকাল ও দীক্ষালাভ সম্বন্ধে মাননীয় শিশির বাবু যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনার যোগ্য। শিশির বাবু নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি স্বয়ং মহারাষ্ট্র ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন। অপরের সাহায্যে তুকারামের অভঙ্গের স্থানে স্থানে অর্থ করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহা হইতেই তিনি পূর্ব্বোদ্ধৃত অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান

প্রকৃত ঘটনার সহিত কতদূর অবিরুদ্ধ, তাহার বিচার করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

১। শিশির বাবু বলিতেছেন,—তুকারাম রাধাকৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। এ কথা তিনি কাহার নিকট শুনিয়াছেন, অথবা কোন প্রমাণ বলে তিনি একথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু তুকরামের নয় সহস্র অভঙ্গবিশিষ্ট যে কবিতাগ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, বিঠোবা (কৃষ্ণ) রুক্মাই (রুক্মিণী) তাঁহার উপাস্য দেবতা রূপে স্তুত হইয়াছেন। তাঁহার অভঙ্গ সমূহের মধ্যে শতকরা ৫টি অভঙ্গেও রাধার নাম পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। মহীপতির গ্রন্থে বা তাঁহার শিষ্যগণের রচিত কোনও জীবন-চরিতে তুকারাম "রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত" বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। এস্থলে ইহ বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, বঙ্গদেশে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের যেরূপ ছড়াছড়ি, মহারাষ্ট্র দেশে তাহার চতুর্থাংশও দৃষ্ট হয় না। তুকারামের শিষ্যসমাজে এভাব আরও বিরল।

২। শিশির বাবু তুকারামকে "ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী" বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ব্রজের সেই নিগূঢ় রস কি? আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বোধ হয়, সখিভাবে ভগবানের উপাসনাই, চৈতন্য দেবের "নিজস্ব গোলোকগুপ্ত, ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ ব্রজরস।" শিশির বাবু তুকারামের কতগুলি অভঙ্গের অনুবাদ পাইয়াছেন, জানি না; কিন্তু আমরা তাঁহার গাথাবলী যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনার উপদেশই তাঁহার শত শত অভঙ্গে দেখিয়াছি। সেই সকল অভঙ্গের কতকগুলির অনুবাদ "দাসী"তে প্রকাশ্যমান তুকারাম প্রবন্ধের শেষ প্রস্তাবে প্রকাশিত হইবে।

তুকারামকে শিশির বাবু চৈতন্য দেবের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহার প্রতিকূলে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহা উদ্ধারের পূর্ব্বে কয়েকটি আনুসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। এই আলোচনা দ্বারা পরবর্ত্তী বিষয়ের পথ সুগম হইবার সম্ভাবনা। তুকারাম কোথায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন? তাঁহার নিজের কবিতায় সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ নাই। তাঁহার জীবনচরিত লেখক মহীপতি (বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের লোক) বলেন, ইন্দ্রায়ণী তীরে—তাঁহার স্বগ্রামে—দেহুতে। শিশির বাবু বলিতেছেন, ভীমাতীরে পাণ্ডুপুরে তাঁহার

দীক্ষা হয়। তুকারামের নিজের অভঙ্গে দেখা যায়, যে, তিনি বলিতেছেন,—

"আমি যেতেছিনু করিবারে গঙ্গাস্নান।
মোর শিরে প্রভু কর করিলা প্রদান॥"

মহারাষ্ট্রবাসিগণ সচরাচর গোদাবরী নদীকেই গঙ্গা বলিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন চন্দ্রভাগা, ভীমা, ইন্দ্রায়ণী প্রভৃতি পুণ্যসলিলা নদীকেও তত্তত্তীরবাসিগণ সাধারণতঃ গঙ্গানামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সুতরাং তুকারামের "গঙ্গাস্নান" শব্দের দ্বারা ভীমা, গোদাবরী, ইন্দ্রায়ণী ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতির অন্তর্গত কোন্ নদীর জলে স্নান সূচিত হইতেছে, তাহা নিশ্চয় রূপে নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। তুকারামের বাসস্থান জানিলে, এ বিষয়ের কিছু সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। অতএব দেখা যাক্, তুকারামের বাস স্থান কোথায় ছিল?

৩। শিশির বাবু বলিতেছেন, কোলাপুরের নিকট, ভীমানদী তীরে, পাণ্ডুপুর নগরে যেখানে বিঠ্‌ঠলদেব, সেইখানে তুকারামের আবাসস্থান। এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, কোলাপুরের নিকট ভীমা নদী নামে কোনও নদী নাই। বস্তুতঃ ভীমানদী কোলাপুর হইতে অন্যূন দেড়শত মাইল দূরে প্রবাহিত হইতেছে। ভীমাতীরবর্ত্তী পাণ্ডুপুরে বিঠ্‌ঠলদেবের স্থান; কিন্তু তুকারাম সে স্থানের অধিবাসী নহেন। তিনি পুণার ৮ ক্রোশ উত্তরে দেহু নামক গ্রামের অধিবাসী—একথা তাঁহার নিজের অভঙ্গেই প্রকাশ।* তিনি দেহু গ্রামে বিঠোবার (বিঠ্‌ঠলের) একটী মন্দির স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যহ বিঠোবার পূজা করিতেন; এবং বৎসরে দুই বার—এক বার আষাঢ় মাসের শয়ন একাদশী ও কার্ত্তিকী উত্থান একাদশী উপলক্ষে পণ্ঢরপুরে গমন করিতেন। কদাচিৎ কচিৎ কোনও বিশেষ পর্ব্বাহ বা উৎসব উপলক্ষেও বোধ হয়, পণ্ঢরপুরে গমন করিতেন। মাঘ মাসে কখনও কোনও পর্ব্বোপলক্ষে তিনি পণ্ঢরপুরে গিয়াছিলেন, একথা তাঁহার জীবন-চরিতে কোথাও দেখা যায় না, এবং মাঘমাসে তেমন কোনও পর্ব্বাহও থাকে না, এরূপ অবস্থায় মাঘমাসে পণ্ঢরপুরে, ভীমাতীরে, চৈতন্য দেবের সহিত দেহুগ্রামবাসী তুকারামের সাক্ষাৎ তেমন স্বাভাবিক ও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

* সুতরাং তুকারামের ব্যবহৃত গঙ্গাস্নান শব্দের দ্বারা ইন্দ্রায়ণীর জলে স্নানও বোধিত হইতে পারে।

৪। শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া তুকারাম আনন্দে নৃত্য গীত আরম্ভ করেন ও পরে তিনি মহাভাগবত হইলেন,—শিশির বাবু এইরূপ বিবেচনা করেন। কিন্তু তুকারামের নিজের অভঙ্গে প্রকাশ যে দীক্ষা লাভের বহুপূর্ব্বে বিঠোবার ভগ্ন মন্দির সংস্কার করিয়া তথায় ভজন সাধনে দিনাতিপাত করিতেন। দীক্ষার পূর্ব্বেই তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন, সংকীর্ত্তনে ও হরিনামে আসক্ত ও পরোপকার সাধনে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। (বিগত সেপ্টেম্বর মাসের দাসীর ৪৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অভঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)। দীক্ষার পূর্ব্বে তুকারাম কতদূর ভাগবতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা দাসী পত্রিকায় প্রকাশিত তুকারামজীবনীর ৪র্থ ও ৫ম প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং গৌরাঙ্গের কৃপাই যে তাঁহার ধর্ম্মজীবন লাভের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল, একথা বলা সুসঙ্গত বোধ হয় না।

৫। তুকারামকে যিনি দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনি কে? তুকারাম স্বয়ং বলিতেছেন যে, তিনি নিজের নাম "বাবাজি" বলিলেন। চৈতন্য কখনও "বাবাজি" বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিতেন কিনা, আমরা অবগত নহি। তারপর তুকারাম স্পষ্টই বলিতেছেন যে, যিনি তাঁহার কর্ণে "রাম কৃষ্ণ হরি" মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার নিকট ভোজনার্থে অন্ন ও ঘৃত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিশির বাবু বলিতেছেন যে, গৌরাঙ্গ কখনও কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, যিনি তুকারামের দীক্ষাদাতা তিনি চৈতন্য নহেন, প্রমাণিত হইতেছে। শিশির বাবু অনুমান করেন, বোধ হয়, কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণটি ঘৃত ও অন্ন প্রার্থনা করিয়া থাকিবেন। ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র। তুকারাম কিন্তু একজনেরই উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার দীক্ষাদাতা ও ঘৃতপ্রার্থী যে একব্যক্তি এ কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। তাঁহার গুরুর সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকার কোনও আভাস তাঁহার কোনও অভঙ্গেই দৃষ্ট হয় না। এরূপ অবস্থায়, ঘৃতপ্রার্থীকে কৃষ্ণদাস বা অপর কোনও ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়া কত দূর সুসঙ্গত, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

শিশিরবাবু তুকারামের অভঙ্গের যে অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যাস্থলে তিনি বলিতেছেন,—প্রভু তুকারামকে "আর কি সংকেত করিলেন, আর রাঘব চৈতন্য কেশব-চৈতন্য বলিলেন।" এই রাঘব চৈতন্য ও কেশব চৈতন্যের ব্যাখ্যা শিশির বাবু যেরূপ করিয়াছেন,

তাহা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার চতুর্থ যুক্তির সার সঙ্কলন কালে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু, "আর কি সংকেত করিলেন," এ কথার অর্থ কি?

এই কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য তুকারামের যে অভঙ্গের উপর শিশির বাবুর সমস্ত কল্পনা ও অনুমান প্রতিষ্ঠিত, সেই অভঙ্গটি সমগ্র সানুবাদ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। মূল অভঙ্গটী এই,—(অমিত্রাক্ষরছন্দ)—

সদ্‌গুরু রায়েঁ কৃপা মজ কেলী।
পরি নাহিঁ ঘড়লী সেওয়া কাঁহী ॥ ১ ॥
সাঁপড়বিলে বাটে জাতাঁ গঙ্গাস্নানা।
মস্তকঁী তো জানা ঠেবিলা কর ॥ ২ ॥
ভোজনা মাগতী তূপ পাও শের।
পড়িলা বিসর—স্বপ্না মাজি ॥৩॥
কাহঁী কলে উপজলা অন্তরায়।
ক্ষণোনিয়াঁ কায় ত্বরাঝালী ॥ ৪ ॥
রাঘব চৈতন্য, কেশব চৈতন্য।
সাঙ্গিতলী খুণ মালিকেচী ॥ ৫ ॥
বাবাজী আপলেঁ সাঙ্গিতলেঁ নাম।
মন্ত্র দিলা রামকৃষ্ণ হরি ॥ ৬ ॥
মাঘ শুদ্ধ দশমী পাহুনী গুরুবার।
কেলা অঙ্গীকার তুকা ক্ষণে ॥ ৭ ॥"

ইহার অনুবাদ এই;—

"সদ্‌গুরুরাজ আমার প্রতি কৃপা করিলেন; কিন্তু আমার দ্বারা তাঁহার কিছু মাত্র সেবা ঘটিয়া উঠিল না। ১॥ গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় পথে আবির্ভূত হইলেন এবং (আমার) মস্তকে হস্ত রাখিলেন। ২॥ ভোজনের জন্য একপোওয়া ঘৃত * প্রার্থনা করিলেন। (কিন্তু) বিস্মৃতি ঘটিল, স্বপ্নের মধ্যে (ছিলাম বলিয়া?)। ৩॥ কোনওরূপে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জানিয়াই কি তিনি (গমনে) শীঘ্রতা করিলেন? ।৪॥ মালিকার (গুরুপরম্পরার) পরিচয় স্বরূপ রাঘবচৈতন্য ও কেশব চৈতন্যের নাম বলিয়া দিলেন। ৫॥ নিজের নাম বলিলেন,—বাবাজী,

* মূলে কেবল ঘৃতের কথাই আছে। শিশির বাবু অনুবাদে "ঘৃত ও অন্ন" করিয়াছেন।

এবং "রামকৃষ্ণ হরি" মন্ত্র প্রদান করিলেন। ৬॥ তুকা বলে, মাঘ শুক্লদশমী গুরুবার দেখিয়া, আমায় অঙ্গীকার (গ্রহণ) করিলেন। ৭॥

৬। উদ্ধৃত অভঙ্গের তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কিছু জটিল ও সন্দিগ্ধ। তুকারামের শিষ্যগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের অন্বয় করিয়া এইরূপ অর্থ করেন,—

"একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, আমি গঙ্গাস্নানে যাইতেছি, এমন সময় গুরুদেব আমার নিকট আবির্ভূত হইয়া আমার মস্তকে হস্তার্পণ (পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ) করিলেন। ভোজনের জন্য একপোওয়া ঘৃত প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আমি দিতে বিস্মৃত হইলাম। (ক)" এই বিস্মৃতির কারণ মহীপতির গ্রন্থে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তুকারাম ঘৃত দিবার জন্য বাবাজীকে গৃহে আনয়ন করিলে তাঁহার স্ত্রী অবলাই অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তুকারামের সহিত কলহ আরম্ভ করিলেন; কারণ বাবাজীকে ঘৃত প্রদান করা অবলাইয়ের অভিপ্রেত ছিল না। বাবাজীকে ঘৃত প্রদান করিতে বিস্মৃত হইয়া তুকারাম অবলাইয়ের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে বাবাজী প্রস্থান করিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই তুকারাম ৪র্থ শ্লোকে সখেদে বলিতেছেন, ঘৃত প্রদানে "কোনওরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়াই কি গুরুদেব শীঘ্র প্রস্থান করিলেন?"

রাও বাহাদুর শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত এম, এ, মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে বিষ্ণু পরশুরাম পণ্ডিত ও জনার্দ্দন সখারাম গাডগীল বি, এ, মহোদয়দ্বয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত A collection of the Poems of Tukaram নামক গ্রন্থে সমালোচ্য অভঙ্গের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

The king of spiritual teachers has bestowed his blessing on me, but I have done no service to him.

I had a dream, wherein, while going to bathe in the hoiy river,* he discovered himself to me on the road and placed his hand on my head

* ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, মহারাষ্ট্রদেশে ভীমা, গোদাবরী, চন্দ্রভাগা ও ইন্দ্রায়ণী প্রভৃতি পুণ্যসলিলা নদীমাত্রকে স্থানীয় লোকেরা গঙ্গা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তুকারাম যে গঙ্গাস্নানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা শিশির বাবুর বিবেচনায় যদিও ভীমাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে কোন্ নদীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য। এই কারণে, এই ইংরাজী অনুবাদকগণ "গঙ্গা" শব্দের অনুবাদে holy river করিয়াছেন।

He asked for a quarter seer of Ghee in consenting to come to dine, but I forgot of it.

He came to know that there was some obstacle—was it on that account that he has hastened away?

He mentioned to me the names of Raghab Chaitanya and Keshav Chaitanya, to indicate the line of his spiritual teachers.

His own name he gave out to be Babajee and he gave me the sacred formula "Ram, Krishna, Hari."

Observing that it was Thursday, the tenth of Magh Suddha, he made me his own."

এই অনুবাদেও তুকারামের দীক্ষা সম্পূর্ণ স্বপ্নগত ব্যাপাররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উদ্ধৃত মূল অভঙ্গের ভাব যদিও কিয়ৎ পরিমাণে সন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তথাপি স্থলান্তরে সাধুগণের নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদান কালে তিনি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা এতৎ সংক্রান্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে।

তিনি বলিতেছেন,—

"মানিয়েলা স্বপ্নীঁ গুরুচা উপদেশ।
ধরিলা বিশ্বাস দৃঢ় নামীঁ॥

অনুবাদ।

"স্বপ্নে গুরু উপদেশ করিনু গ্রহণ।
করিলাম "নামে" দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন॥"

তুকারামের অন্যান্য অভঙ্গেও এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, তিনি স্বপ্নেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তুকারাম যখন নিজেই একথা স্পষ্ট বলিতেছেন, তখন "প্রভু তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলে, তুকারাম অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন" এরূপ অনুমান সুসঙ্গত বোধ হয় না।

৭। এখন, "তুকারামের প্রভু কি সংকেত করিয়াছিলেন," তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ মূল উদ্ধৃত করি,—

"রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য।
সাঙ্গিতলী খুণ মালিকেচী॥"

সাঙ্গিতলী অর্থে 'বলিলেন'; খুণ শব্দের অর্থ চিহ্ন, সংকেত, পরিচয়,—এখানে 'পরিচয়' অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। মালিকেচী—মালিকার। মালিকা—গুরু-পরম্পরা, গুরুকুলের বংশতালিকা। সমস্ত শ্লোকের অর্থ হইল,—"গুরুকুলের পরিচয় স্বরূপ রাঘব চৈতন্য ও কেশব চৈতন্যের নাম

বলিলেন।" পূর্ব্বোদ্ধৃত ইংরাজী অনুবাদও অবিকল এইরূপ। তুকারামের শিষ্যগণ ও মহীপতি বলেন,—"রাঘব চৈতন্যের শিষ্য কেশব চৈতন্য ও কেশব চৈতন্যের শিষ্য বাবাজী চৈতন্য, যিনি তুকারামকে দীক্ষিত করেন।" আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শিশির বাবুকে যিনি উল্লিখিত শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন যে,—"রাঘব চৈতন্য আর কেশব চৈতন্য। তার কথা বলি দেখাইল এক চিহ্ন॥" অথবা "আর কি সঙ্কেত করিলেন, আর রাঘব চৈতন্য ও কেশব চৈতন্য বলিলেন" তিনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও, হয় অভঙ্গের ভাষা বুঝিতে তিনি অসমর্থ, না হয়, তিনি উহার মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টাই করেন নাই।

৮। তুকারাম বহু অভঙ্গে "বাবাজী সদ্‌গুরু দাস তুকাভণে" এইরূপ ভনিতাদ্বারা আপনাকে বাবাজির শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তিনি যে রাঘব চৈতন্য বা কেশব চৈতন্য অথবা অপর কোনও চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন, এ কথার আভাস তাঁহার কোনও অভঙ্গেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং "তুকারাম অচেতন অবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে, তাঁহার প্রভুর নাম হয়, রাঘব চৈতন্য নয়, কেশব চৈতন্য হইবে," এই অনুমানের সহিত প্রকৃত ঘটনার সম্বন্ধ অতি বিরল।

আমরা এতদূর পর্য্যন্ত যে আটটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, মাননীয় শিশির বাবু অপরের সাহায্যে তুকারামের অভঙ্গ যেরূপ বুঝিয়াছেন, ও তাহা হইতে যে সকল অনুমান করিয়াছেন, তৎসমস্তই প্রকৃত ঘটনার বিরোধী, তুকারামকে চৈতন্যদেবের শিষ্য মনে করিবার কোনও সুসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও যাঁহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের জন্য আরও একটি প্রবল প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই প্রমাণটি তাঁহার আবির্ভাব কাল বিষয়ক।

৯। তুকারাম কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণীত হইলেই এ বিষয়ের সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। A complete collection of the Poems of Tukaram নামক গ্রন্থের সম্পাদকগণ ও মহারাষ্ট্রদেশের অপরাপর কৃতবিদ্য মহোদয়গণ তুকারামকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক অর্থাৎ চৈতন্যের একশত বৎসরের পরভবিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিশির বাবু বলিতেছেন,—"তাঁহাদিগের দেশে লেখা পড়ার চর্চ্চা বড় কখনও

অধিক ছিল না। তাঁহারা যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া তুকারামের সময় নির্ণয় করেন, সে সমুদায় আনুমানিক ও মনোকল্পিত; তাহার ভিত্তিভূমি অতিশয় দুর্ব্বল।"

মহারাষ্ট্র দেশের কৃতবিদ্য মহোদয়গণ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তুকারামকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা দাসী পত্রিকার তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যার ৭২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা পুনরায় সেই কথাগুলি এ স্থলে বিবৃত করিতেছি।—"মহাপতি প্রণীত ভক্তলীলামৃত নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, একবিংশ বৎসর বয়সের সময় তুকারাম নানা প্রকার বিপদে পতিত হইয়া সংসার ত্যাগের কল্পনা করেন; এই সময় তাঁহার জীবনের অর্দ্ধাংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। ২১ বৎসর বয়সে জীবনের অর্দ্ধাংশ হইলে, ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, স্থির করিতে হয়। ভক্তলীলামৃত মতে ১৫৭২ শকে (১৬৫০ খৃষ্টাব্দে) তুকারাম স্বর্গারোহণ করেন। সুতরাং ১৫৭২—৪২=১৫৩০ শকাব্দ (১৬০৮ খৃষ্টাব্দ). তুকারামের জন্মবর্ষ বলা যাইতে পারে।" *

মহারাষ্ট্র দেশের কৃতবিদ্যগণ তুকারামের সময়নির্ণয়-প্রসঙ্গে মহীপতির উক্তির উপরেই অধিকতর নির্ভর করিয়াছেন। কারণ, মহীপতি তুকারামের যে মৃত্যুশক প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি সন্দেহ করিবার কোনও কারণ তাঁহারা দেখিতে পান না। শিশির বাবু, কোন্ যুক্তি বলে জানি না, মহীপতির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মহীপতি কিরূপে জানিলেন যে, তুকারাম ১৫৭২ শকাব্দে (১৬৫০ খৃঃ অঃ) ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছু শক্ত। মহীপতি কিরূপে ঐ অব্দ পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতে

* কোনও কোনও মহারাষ্ট্রীয় লেথক তুকারামের জন্মাব্দ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের অব্দ সম্বন্ধে কাহারও কোনও সংশয় নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে তুকারামের জন্ম ও ১৬৫০ অব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদনুসারে মৃত্যুকালে তুকারামের বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়। তুকারামের নিজের অভঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার প্রয়াণকালে তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের অল্পকাল পরেই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণ বাবার জন্ম হয়। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে তুকারামের জন্ম ধরিলে, প্রয়াণ কালে, ৬২ বৎসর বয়সে পুত্রোৎপাদন তুকারামের পক্ষে কিছু অসঙ্গত বোধ হয় না কি?

পারি না; কিন্তু আমরা যে কারণে মহীপতির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১। একনাথ স্বামী মহারাষ্ট্র দেশের একজন প্রখ্যাত সাধু পুরুষ ও গ্রন্থকার। তিনি জ্ঞানেশ্বর প্রণীত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ গ্রন্থের পরিভাষা, ভাবার্থ রামায়ণ (৩৯, ৩২৯ শ্লোকময়) * রুক্মিণীস্বয়ম্বর (১৭১০ শ্লোক), শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ (২০ সহস্র শ্লোক) স্বাত্মসুখ, চতুঃশ্লোকী ভাগবতের টীকা, আনন্দলহরী, হস্তামলক প্রভৃতি গ্রন্থ মারাঠী ভাষায় রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থের শেষেই উহার রচনার কাল উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার ভাগবতের অনুবাদের শেষে লিখিত আছে যে, ঐ গ্রন্থ ১৪৯৫ শকের (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের) কার্ত্তিক শুক্লাপঞ্চমী দিনে সমাপ্ত হয়। একনাথ স্বামীর গ্রন্থে মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব প্রভৃতি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুপুরুষ ও গ্রন্থকারগণের উল্লেখ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়; কিন্তু তুকারামের উল্লেখ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, তুকারামের অভঙ্গে জ্ঞানেশ্বর ও নাম দেব প্রভৃতির নামের সহিত একনাথস্বামীরও নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি অভঙ্গে তুকারাম বলিতেছেন,—"যিনি ভাগবতের অনুবাদ করিয়া, উহা সর্ব্বসাধারণের শ্রুতিগোচর করিয়াছেন, সেই একনাথস্বামীর চরণে মস্তক রাখিয়া, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি।" এতাবতা তুকারাম ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের (একনাথী ভাগবত রচনার) পরভবিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন।

খৃষ্টীয় ১৫৩৩ অব্দে চৈতন্যদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোভাবের ১৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। তুকারামের স্বরচিত অভঙ্গের সহিত মহীপতির উক্তি মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত হয় যে, দীক্ষাকালে তুকারামের বয়স অন্ততঃ বিংশতি বৎসর ছিল। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে তুকারাম চৈতন্য কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন স্বীকার করিলে ১৫৭৩ অব্দে অর্থাৎ যে বৎসর একনাথের ভাগবত রচনা শেষ হয় সে বৎসর তাঁহার বয়স অন্যূন ৮৮ বৎসর ছিল বলিতে হয়। তুকারামের যে অভঙ্গে একনাথী ভাগবতের উল্লেখ আছে, তাহা ১৫৭৫ অব্দে রচিত হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও, সে সময় তুকারামের

* এই সকল গ্রন্থ "ওবী" নামক মহারাষ্ট্রীয় ছন্দে রচিত। ওবী চ্ছন্দ সংস্কৃত অনুষ্টুভ চ্ছন্দ অপেক্ষা দীর্ঘ।

বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছিল, বলিতে হইবে। ইহার কতদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহা জানা যায় না।

তুকারাম প্রয়াণকালে, স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সময় যে দুইটি অভঙ্গে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার একটি অভঙ্গে তিনি বলিতেছেন,—"প্রত্যহ তুলসীমণ্ডপ সংমার্জ্জন ও দেবতার্চ্চনা করিবে। তোমার গর্ভে "নারায়ণ" নামক যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, সেই তোমার উদ্ধার করিবে, ইত্যাদি।" তুকারামের পৌত্র গোপাল বাবার কৃত সংক্ষিপ্ত তুকারাম-চরিত গ্রন্থেও একথার উল্লেখ আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তুকারামের প্রয়োণকালে তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। সুতরাং সে সময় তুকারামের বয়স ৯০ বর্ষাধিক হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই কারণে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য কর্ত্তৃক তুকারামের দীক্ষা গ্রহণ সম্ভবপর বোধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, একনাথস্বামী, তাঁহার ভাগবত রচনায় প্রায় ২৫ বৎসর পরে লোকান্তরিত হন। এই সময়ের মধ্যে তুকারাম জন্ম গ্রহণ ও সাধু পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিলে, একনাথস্বামীর গ্রন্থে তুকারামের কোনওরূপ উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত, অনুমান করা অসঙ্গত নহে। দাসীতে প্রকাশিত তুকারাম-চরিতের দশম প্রস্তাবে সে কালের "সাধু সম্মিলন" বা Parliament of Religions সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তুকারাম একনাথ স্বামীর সময় সাধুপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিলে ও তাঁহাদের উভয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকিলে, অন্ততঃ তুকারামের অভঙ্গে সে কথার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত। কারণ তুকারাম অপর বিখ্যাত সাধুপুরুষের সহিত এইরূপ সাক্ষাতের বিষয় স্বীয় অভঙ্গে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার অভঙ্গে বা একনাথের গ্রন্থে এ বিষয়ের যখন কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, তখন তুকারামের আবির্ভাব একনাথের মৃত্যুর অর্থাৎ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের পর নির্দ্দেশ করিতে হয়।

২। মহীপতি তুকারামকে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত শিবাজীর বখর (জীবন চরিত) সমূহেও এ কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি বখরের উল্লেখ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই বখর মহীপতির গ্রন্থ রচনার প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে বা শিবাজীর মৃত্যুর ৩৮ বৎসর পরে রচিত।

এই বখরে রচয়িতার নাম নাই সত্য, কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণে ইহা শিবাজীর চিঠিনবীস (পত্রলেখক) বালাজী আউজীর পুত্র কর্ত্তৃক তদানীন্তন সরকারী কাগজ পত্র অবলম্বনে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই বখরের নাম শিব-দিগ্বিজয়। ইহাতে তুকারামের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ প্রভৃতি বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শিবাজীর মৃত্যুর মাত্র ৩৮ বৎসর পরে তাঁহারই কর্ম্মচারিপুত্র কর্ত্তৃক প্রামাণিক ও ঐতিহাসিক সরকারী কাগজ পত্র অবলম্বনে রচিত গ্রন্থে যখন তুকারাম শিবাজীর (১৬২৬—১৬৮০ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তখন সে কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? যদি বখরকারের কথায় বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে তুকারামের নিজের উক্তি দেখুন। তুকারামের স্বরচিত অভঙ্গেই শিবাজীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি শিবাজীকে যে অভঙ্গময় পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বিগত আগষ্ট মাসের দাসীতে তুকারাম শীর্ষক প্রবন্ধের প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৩। তুকারামের অভঙ্গে যে কেবল ছত্রপতি শিবাজীরই উল্লেখ আছে তাহা নহে;—তাঁহার অভঙ্গে শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তুকারামের সহিত রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা রামদাস স্বামীর বখরে (জীবন-চরিতে) ও তাঁহার স্বরচিত শ্লোকে এবং তুকারামের অভঙ্গেও বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তুকারাম স্বীয় অভঙ্গের এক স্থলে বলিতেছেন,—"কৃষ্ণাতীরে, উৎকৃষ্ট সুবর্ণগৈরিক-মুক্তাফল সদৃশ বসনধারী রামদাস স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গ অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম।" তুকারাম রামদাস স্বামীর (জন্ম ১৬০৮—মৃত্যু ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ) সমসাময়িক না হইলে, তাঁহার অভঙ্গে এরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় কেন?

৪। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে তুকারামের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে, তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণ ও দেহুস্থিত বিঠোবার মন্দিরের পূজা অর্চ্চনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মহারাজ শিবাজী তুকারামের পুত্র নারায়ণ বাবাকে কয়েকটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেই গ্রামগুলির উপস্বত্ব এখনও তুকারামের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। তুকারাম চৈতন্যদেবের সমসাময়িক হইলে তাঁহার শতাধিক বর্ষ পরে শিবাজী তাঁহারা পুত্রকে গ্রাম দান করিলেন কিরূপে?

৫। তুকারামের পৌত্র গোপালবাবার রচিত "সংক্ষিপ্ত তুকারাম চরিতে" উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"১৫৭১ শকাব্দে (১৬৫০ খৃঃ অঃ) বিরোধী নাম সম্বৎসরে ফাল্গুন কৃষ্ণদ্বিতীয়া সোমবারে এক প্রহর দিবসের সময় তুকারাম প্রয়াণ করিয়াছিলেন।" "শিষ্পীনামা" নামক তুকারামের জনৈক শিষ্যের রচিত "তুকারামের প্রয়াণ" শীর্ষক কবিতা গ্রন্থেও লিখিত আছে,—"১৫৭১ শকাব্দে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া, সোমবার বেলা ৪ দণ্ডের সময় তুকারাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন।" তুকারামের অপর এক শিষ্যের রচিত কবিতাতেও ১৫৭১ শকাব্দে তুকারামের প্রয়াণ কাল নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তুকারামের বংশধরগণের নিকট একটি হস্তলিখিত প্রাচীন অভঙ্গ পুস্তক আছে। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, রামেশ্বর ভট্টের অত্যাচারে তুকারামের এই অভঙ্গ পুস্তকখানিই ইন্দ্রায়ণী জলে নিক্ষিপ্ত ও পরে বিঠোবার কৃপায় উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই পুস্তকের শেষে গদ্যে লিখিত আছে যে, ১৫৭১ শকাব্দে ফাল্গুন কৃষ্ণদ্বিতীয়া সোমবার প্রাতঃকালে তুকারাম বাবা স্বর্গে প্রয়াণ করেন।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয়, মহীপতি তুকারামের ইহলোক পরিত্যাগের কাল ১৫৭১ শকাব্দে (১৬৫০ খৃঃ) নির্ণয় করিয়াছেন। এবং আমরাও পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে এই বিষয়ে মহীপতির উক্তিকে প্রামাণিক ও ইতিহাসের অবিরোধী বলিয়া মনে করি।

এই প্রসঙ্গে মহীপতির গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। মহীপতি মহারাষ্ট্র দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ ভক্তচরিতাখ্যায়ক। তিনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র দেশের সাধুপুরুষগণের ধর্ম্মজীবন বর্ণনা করিবার জন্য ভক্তবিজয়, ভক্তলীলামৃত ও সন্তবিজয় নামক তিনখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই তিনখানি গ্রন্থের পরিমাণ ২০ সহস্র শ্লোকের ন্যূন নহে। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ ভক্তবিজয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ও তাঁহার ভক্তলীলামৃত ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদেশে যে সকল সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই বিবরণ তিনি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সঙ্কলিত করিয়া স্বীয় গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।* তদ্ভিন্ন কবীর, তুলসীদাস, গুরুনানক ও জয়দেব প্রভৃতি

* কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে অথবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর কাহারও গ্রন্থে চৈতন্যদেবের নামোল্লেখ

উত্তর ভারতে প্রাদুর্ভূত সাধুপুরুষগণেরও জীবনী তাঁহার গ্রন্থে আখ্যাত হইয়াছে। মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, জনাবাই, একনাথ, তুকারাম ও রামদাস স্বামী প্রভৃতির জীবনী মহীপতি যেরূপ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সেই সকল মহাপুরুষের জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের স্বরচিত সমস্ত গ্রন্থ ও তাঁহাদের শিষ্যগণের রচিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সকল মহাপুরুষ সম্বন্ধে মহীপতির প্রদত্ত বিবরণে (দু এক স্থলে সামান্য ভুল ভ্রান্তি থাকিলেও) আস্থাশূন্য হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

বলিয়াছি, মহীপতির ভক্তবিজয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থে তুকারামের জীবনী সংক্ষেপে কয়েক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে যখন ঐ গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল, তখন ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে মহীপতি তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। অর্থাৎ তুকারামের তিরোধানের শতবৎসর পরে মহীপতি তাঁহার জীবনের উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বলিতে পারা যায়। সে সময়ে তুকারামের জীবনীর যে সকল উপকরণ সুপ্রাপ্য ছিল, এখন তাহার চতুর্থাংশও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। তুকারামের শিষ্যগণের রচিত যে সকল "তুকারাম চরিত" এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার ভাষার সহিত মহীপতির গ্রন্থের কোনও কোনও অংশের ভাষায় এরূপ সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় যে, তাহাতে মহীপতি সেই সকল গ্রন্থ হইতেই তাঁহার তুকারাম চরিতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। মহীপতি স্বীয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে তুকারামের যে সকল অভঙ্গ অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোনও অভঙ্গ আজ কালকার কোনও মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। কাজেই বলিতে হয় যে, সে সকল অভঙ্গ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তুকারামের জীবনীর অনেক ঘটনা, মহীপতি স্বসাময়িক তুকারাম শিষ্যগণের নিকট হইতেও অবগত হইয়া থাকিবেন, এরূপ অনুমান কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে।

দৃষ্ট হয় না। আমরা যতদূর জানি, মহারাষ্ট্রবাসিগণ চৈতন্যের নামের সহিত পরিচিত ছিলেন না। চৈতন্যদেব মহারাষ্ট্রে গিয়া তুকারামকে দীক্ষিত করিয়া থাকিলে, অথবা সে দেশে তিনি কতকগুলি "মহাভাগবত" সৃষ্টি করিয়া থাকিলে, মহারাষ্ট্রবাসীর নিকট চৈতন্যের নাম এরূপ অপরিচিত থাকিত না।

এই সকল কথার আলোচনা করিলে, প্রতিপন্ন হইবে যে, মহীপতি যদৃচ্ছাক্রমে তুকারামের জীবনী রচনা করেন নাই, পরন্তু সে জন্য যথেষ্ট সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ (অলৌকিক ঘটনার বর্ণনাবাদে) কেবলই কপোলকল্পিত মনে করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সুসঙ্গত হয় না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ঘোষ মহোদয়ের সহিত বিতণ্ডা করা আমাদিগের অভিপ্রেত না থাকিলেও, তিনি তুকারামের দীক্ষা, আবির্ভাব কাল ও মহীপতির গ্রন্থের প্রামাণিকতা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে সকলের সহিত বিবিধ আবশ্যকীয় ও বিচারযোগ্য ঐতিহাসিকতত্ত্ব জড়িত ছিল বলিয়া, আমরা এরূপ বিস্তৃতভাবে এ সকল কথা আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, সে জন্য তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। যদি কোনও স্থলে মর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রতি কোনও রূপ রূঢ় বা অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকি, সে জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, দীর্ঘকালক্লান্ত লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

কেরল।

(২)

কুচ্চি নগরের পরপারে আর্ণাকোলমস্থিত রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণ ও বিদ্যামন্দিরের সৌধশিখর ইতিপূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; এক্ষণে সাগরপ্রণালী পার হইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে চলিলাম। নিস্তব্ধ রথ্যা প্রশস্ত ও বালুকাময়ী, বৃষ্টিপাতে কর্দ্দমাক্ত হয় নাই। রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে দ্রাবিড় ও কর্ণাটী ব্রাহ্মণগণ এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। গত রাত্রে রাজমন্ত্রী গতাসু হইয়াছেন, তজ্জন্য আমাদিগকেও কষ্ট পাইতে হইল। জানপদগণ তদীয় অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষ্যে ব্যস্ত আছেন। কেরলীরা নিজ বাসভবনে শবদাহ করিয়া থাকেন। "ইল্লোম" (বাস্তু) প্রাঙ্গণের এক অংশ নাগ দেবতা ও অপর অংশ শ্মশানের জন্য রক্ষিত হয়। দ্রাবিড়গণ কহেন, শঙ্করাচার্য্য দ্রাবিড় উপনিবেশী ছিলেন। তদীয় মাতৃবিয়োগ হইলে বহনকারীর অভাবে দেহ খণ্ডীভূত করিয়া বহির্দ্দেশস্থ শ্মশানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল।

এতদ্দেশীয় বাটীর নিয়মানুসারে আমাদের বাসগৃহখানি এক নিকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। ভিত্তি খনিজ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত, পনস কাষ্ঠের ছাদ, তদুপরি নারিকেলীপর্ণ-বিনির্ম্মিত ছদিশটক অলিন্দস্থ তালস্তম্ভোপরি বিন্যস্ত হইয়াছে। গৃহের উপর পূগ ও নারিকেল বৃক্ষের ছায়া, চতুর্দ্দিকে কদলী, পেপে, গোলাপজাম প্রভৃতি বৃক্ষ। গোলমরীচের সতেজ লতা বৃক্ষ বেষ্টন করতঃ উত্থিত হইয়া মঞ্জরী বিস্তার করিয়াছে। এখানে তাম্বূলবল্লী ঐ প্রকার বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া উত্থিত হয়। এলাগুল্ম পর্ব্বতোপরি স্নিগ্ধ স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের অঙ্গনে ক্রোটন্, পিন্‌কস্, তুলসী, আনারস ও কচু পত্রিকাদল বিস্তার করিয়াছে; মঞ্চোপরি শিম্বীলতার চন্দ্রাতপ; ইহাতে সূর্য্যকিরণ গৃহাভ্যন্তরে সম্যক প্রবেশলাভ করিতে পারে না; তজ্জন্য গৃহগুলি আর্দ্র। বহির্ভাগস্থ পয়ঃপ্রণালীতে জল নিয়ত আবদ্ধ রহিয়াছে, নির্গমনের পথ নাই।

ছায়াবদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর জলে অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণুজীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানা রোগের নিদান হইতেছে। দুই জন শর্ম্মণ্য দেশীয় যুবক নদীজল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্যাস্তকালে ২০ বিন্দু জলে ১৬০টী উদ্ভিজ্জাণুজীব পাওয়া যায়। রাত্রিশেষে আলোকবিরহিত অবস্থায় জল বহুক্ষণ অবস্থিত হইলে উক্ত সংখ্যা ত্রিগুণিত হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় হইলে উক্ত জীবাণু সংখ্যায় হ্রাস হইতে থাকে। শ্লীপদ রোগকে কোচিনের পদ কহে। আমার সহচর এই ব্যাধির বীজ উদ্ভিজ্জাণুজীব সংগ্রহ করিয়া লইলেন। দেহে নিত্য নূতন ঝিল্লী উৎপন্ন হইয়া পুরাতন ঝিল্লীকে অপসারিত করিয়া দেয়। শোণিত ঝিল্লী নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। যদি শোণিত যথোপযুক্ত প্রাণবায়ু (অম্লজান) গ্রহণে অক্ষম হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা অবিশুদ্ধ ঝিল্লী গঠিত হইবে। কয়েক বৎসর পরে এমন একটি রোগ-প্রবণ-দেহ নির্ম্মিত হইয়া যায় যে, সামান্য উদ্দীপক কারণে তাহাতে বিবিধ ব্যাধি আগমন করিয়া আশ্রয় লয়। সঙ্গী মহাশয় বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে জ্বরোৎপাদক বাতাবরণে বাস করিয়া শরীরটী রোগ-প্রবণ করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য বাত রোগাক্রান্ত হইলেন।

ত্রিপুনিথুরী এখান হইতে ক্রোশ-চতুর-ব্যবহিত। রাজা তথায় বাস করেন। এক্ষণে সেখানে একপক্ষব্যাপী উৎসব চলিতেছে। আমরা হস্তচালিত ত্রিচক্ররথ-যোগে রাজপুরীতে উপনীত হইলাম। জনপদ ও প্রাসাদ

দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। আমরা শিখাতিলকবিহীন ও অঙ্গরক্ষায় আবৃত দেখিয়া প্রহরী খ্রীষ্টান বোধে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। আর্ণাকোলমে এক ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছে, তিনি কাশীতে আমাদের বাটীর পার্শ্বে বাস করিতেন; একত্র বিচরণ করিলে, তাঁহার খ্রীষ্টান সংস্পর্শ হইতেছে, এই অপবাদ ঘটে দেখিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কঞ্চুক উন্মোচন করিলাম, সহচর যজ্ঞোপবীত প্রদর্শন করাইলেন, কিন্তু দৌবারিক সন্তুষ্ট হইল না; অবশেষে কোন পৌরকে ইংরাজী ভাষায় কষ্ট জ্ঞাপন করা হইল, তিনি প্রহরীর ভ্রম দূর করিয়া দিলেন। পুরমধ্যে এক অযাচিত বন্ধু প্রাপ্ত হইলাম; তাঁহার ধারণা আর্য্যাবর্ত্তের সহিত পরিচিত কোন লোক না পাইলে আমরা পূর্ণত্রয়ীশের সম্মুখীন হইতে পারিব না। কুচ্চিরাজের প্রধান মন্ত্রী নিকৃষ্টজাতিসম্ভুত হওয়ায় দেব দর্শন পান নাই। আমাদের হিতৈষী বহু আয়াসে সে প্রকার লোক মিলাইতে না পারিয়া এক বাটীতে প্রবেশ করিলেন। জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেরল ভাষায়াং পরিচয়ো নাস্তি?" সংস্কৃত ভাষায় উত্তর ও আলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার আমাকে বৈশ্য বলিয়া বিশ্বাস হইল; কিন্তু সমভিব্যাহারে যাইতে সাহসী হইলেন না। তখন আমি দ্রুতপদে পুনর্ব্বার দেবায়তনে প্রবেশ করিলাম। একবার রক্ষীর দিকে নেত্রপাত করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে নিষেধ করিল না।

প্রাচীরবেষ্টিত প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যস্থলে মলয়ারী প্রণালীর ষট্‌ছদী-খর্পর মন্দির বিরাজমান। ইহার গঠন দ্রাবিড় প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রাকার তোরণস্থ ক্ষুদ্র গৃহখানি এতদ্দেশের গোপুরম্। মন্দিরের বহির্গাত্রে অবিচ্ছিন্ন দীপাবলির পংক্তি রচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রস্তরের তৈলাক্ত দ্বারপালচতুর দৃষ্ট হইল। আমরা সাহসে ভর করিয়া একবারে দীপাবলির মধ্য দিয়া অভ্যন্তর ভাগে জংজীৎ গোপালের সম্মুখে উপনীত হইলাম। এখানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না; অসংখ্য দীপ পূর্ণত্রয়ীশের কনককান্তি উদ্ভাসিত করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে নিমজ্জিত, শিরে হিরণ্ময় শেষ সপ্তফণা বিস্তার করিয়াছে। যাহাতে অবলীলাক্রমে মূর্ত্তি পরিদৃশ্যমান না হইতে পারে এই জন্যই বা গর্ভ-গৃহের কপাটদ্বয় ঈষৎ নিমীলিত। যাহা হউক অদ্য আমার ক্রিয়া সফলা হইয়াছে।

কুসংস্কারের সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয়কারিগণ কহেন. প্রতিমার প্রতি

সাধকের চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা উহাতে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। অবশেষে তাহার প্রভা বহির্গত হইতে থাকে ; ইহাতে পূর্ব্বে যাহা মৃত্তিকা বা কাষ্ঠমাত্র ছিল, সময়ক্রমে তাহা পরিত্রাতা, গুহ্যশক্তি ও প্রকৃত পূজার যোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এ প্রকারে কিন্তু, শাক্তদিগের পূজার সকল অনুষ্ঠান বিজ্ঞানসম্মত করা সুবিধাজনক হইবে না। কামরূপের কোচ রাজা নরনারায়ণ কামাক্ষ্যাদেবীর ইষ্টক-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ১৪০ নর-বলিদানকরতঃ তাম্রকুণ্ডে মুণ্ডস্থাপন করিয়া দেবীকে উপহার দেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে হয়গ্রীবের মন্দির পুনর্গঠন করাইয়া ভূ-সম্পত্তি প্রদানান্তে ৭০০ নরবলি দিয়াছিলেন। ছিন্নমস্তকগুলি তাম্রপাত্রে রক্ষা করিয়া দেবসন্নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে কি আত্মত্যাগের শিক্ষা আছে কহিবেন? বৈষ্ণবগণ বলিপ্রদান অনুষ্ঠানে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিষণগড়ের রাজা সোমযাগ অনুষ্ঠান করিয়া পশুবধ করায়, পরম ভাগবত বল্লভাচারিগণ জৈন ও আর্য্যসমাজীদের সহিত মিলিত হইয়া নরপতিকে উক্ত বেদোচিত কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনু-রোধ করিয়াছেন। জংজীৎ গোপালের মূর্ত্তি বদরিকাশ্রমের নারায়ণের অনুরূপ, বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের সহিত উভয়স্থানের সংস্রব থাকায় এই সাদৃশ্য ঘটিয়াছে।

অদ্য পর্ব্বাহের তৃতীয় দিবস। প্রাঙ্গণে দেববাহন পঞ্চদশ হস্তী স্বর্ণ-ললাটিকা ও গ্রৈবেয়ক পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান। তদুপরি আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে ছত্র, চামর, ও ধ্বজধারী উপবিষ্ট। আড়ানী-বাহী বালক মধ্যে মধ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া রৌদ্ররোধিনীদ্বয় ধরিতেছে। গজতার মধ্যস্থলে একটি করিশিরে গোপালের প্রতিনিধি ভোগমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। জনতার মধ্যে অসংখ্য ভেরী, তুরী ও সানাই বাদিত হইতেছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণ রাজ বাটীর সহিত সংলগ্ন ; দ্বিতল প্রকোষ্ঠে পীনউপাধানে আনত হইয়া কুচ্চিরাজ বীর কেরল-বর্ম্মা উপবিষ্ট আছেন। রঙ্গ-বৈচিত্রের অভাবে বা বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। পরিচ্ছদের মধ্যে কটি-দেশে একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র, মুণ্ডিত মুখশিরসোপরি পুরশ্চূড় উত্থিত। কিয়-দন্তরে দৌবারিক সুবর্ণযষ্টিসহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পুরীর অপর দিক হইতে, রাজ-পরিবার রঙ্গভূমি নিরীক্ষণ করিতেছেন। মলয়ারিদের বর্ণ ও গঠন বাঙ্গালীর মত। মাদ্রাসীরা ইহাদিগকে অত্যন্ত সুন্দর কহে। রাজপরি-

বারের বর্ণ অপেক্ষাকৃত গৌর ; পরিধেয় নিরতিশয় ধবল, যোষিৎগণের বস্ত্র এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের পাড় ও উত্তরীয় জরির ফুল বিশিষ্ট। এই সাম্যের দেশে কোন কোন সুন্দরীকে পুরুষের ন্যায় উত্তরীয়খানি স্কন্ধে ব্যবহার করিতে দেখিতেছি। ললাটে কৃষ্ণ তিলক, গলে মণিমুক্তা লম্বন, সুকুমার দেহে বৃহৎ কর্ণিকা, সহ্য হইবার নহে ; এজন্য দীর্ঘকর্ণ-ছিদ্র রিক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে থিরুবাঙ্কোড়ে হস্তে সুবর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ধারণ করা শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। একটি নিরাভরণা গৌরাঙ্গী সন্তান বক্ষে করতঃ সৌধোপরি হইতে "সজলঘনরুচি কেরলি কেশ পাশ" উন্মুক্ত করিয়া যাত্রা দর্শন করিতেছেন। বাঙ্গালার ন্যায় এখানে নারিকেল তৈল অভ্যঙ্গ করা রীতি। কেশ আকৃষ্ট করিয়া কবরী বন্ধনের বিধি না থাকায় ইন্দ্রলুপ্তের প্রাদুর্ভাব নাই।

রাজার সংসার ভগ্নী ও ভাগিনেয় দ্বারা গঠিত। পুত্র বা তদীয় জননীকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। রাজার ভাগিনেয় যুবরাজ নামে অভিহিত। তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। রাজা বিবাহ করেন না, রাজভগিনীর বিবাহ আছে। কুচ্চিরাজপরিবারে সবর্ণে ও থিরুবাঁঙ্কোড়ু রাজবংশে ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হয়। দিনত্রয়ের অধিক দাম্পত্য-বন্ধন রক্ষা করা অনাবশ্যক। এই বিবাহ পদ্ধতি ভিন্নদেশীয়দিগের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র, তদ্দ্বারা কোন প্রকার স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। অনারেবল্ শঙ্কর মেনন্ "মরু-মক্ক-তায়ম্" (ভাগিনেয়াধিকার) রহিত করিয়া "মক্কতায়ম্" (পুত্রাধিকার) প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটীষ মলয়ারে বিবাহকে বৈধ করিবার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় একখানি বিধানের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা সমর্থিত না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কালিকটের জীমরিণ ও নম্বুরী-গণ প্রতিবাদ করেন। বিষ্ণু পরশুরাম অবতার পরিগ্রহ করিয়া, নম্বুরী ব্রাহ্মণদিগকে কেরল দান করিয়াছিলেন ; অতএব তাঁহাদের অনভিপ্রেত বিষয় বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। নম্বুরীদের বৈধবিবাহ-প্রথা, সুতরাং পুত্রা-ধিকার পদ্ধতি আছে ; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্যে বিবাহ করিতে পায় না। এজন্য তদিতরজাতীয় রমণীদিগকে চিরজীবন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিলে অসুবিধা হয়। সর্ব্বত্র দাম্পত্য-নিয়ম লঙ্ঘন করাকে ব্যভিচার কহে, কেরলে দাম্পত্য-নিয়ম পালন করা ব্যভিচার। নারী অনুলোম জাতির সহিত মিলিত হইলে সমাজে পতিতা হন।

সাধকের চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা উহাতে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। অবশেষে তাহার প্রভা বহির্গত হইতে থাকে ; ইহাতে পূর্ব্বে যাহা মৃত্তিকা বা কাষ্ঠমাত্র ছিল, সময়ক্রমে তাহা পরিত্রাতা, গুহ্যশক্তি ও প্রকৃত পূজার যোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এ প্রকারে কিন্তু, শাক্তদিগের পূজার সকল অনুষ্ঠান বিজ্ঞানসম্মত করা সুবিধাজনক হইবে না। কামরূপের কোচ রাজা নরনারায়ণ কামাক্ষ্যাদেবীর ইষ্টক-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ১৪০ নর-বলিদানকরতঃ তাম্রকুণ্ডে মুণ্ডস্থাপন করিয়া দেবীকে উপহার দেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে হয়গ্রীবের মন্দির পুনর্গঠন করাইয়া ভূ-সম্পত্তি প্রদানান্তে ৭০০ নরবলি দিয়াছিলেন। ছিন্নমস্তকগুলি তাম্রপাত্রে রক্ষা করিয়া দেবসন্নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে কি আত্মত্যাগের শিক্ষা আছে কহিবেন ? বৈষ্ণবগণ বলিপ্রদান অনুষ্ঠানে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিষণগড়ের রাজা সোমযাগ অনুষ্ঠান করিয়া পশুবধ করায়, পরম ভাগবত বল্লভাচারিগণ জৈন ও আর্য্যসমাজীদের সহিত মিলিত হইয়া নরপতিকে উক্ত বেদোচিত কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। জংজীৎ গোপালের মূর্ত্তি বদরিকাশ্রমের নারায়ণের অনুরূপ, বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের সহিত উভয়স্থানের সংস্রব থাকায় এই সাদৃশ্য ঘটিয়াছে।

অদ্য পর্ব্বাহের তৃতীয় দিবস। প্রাঙ্গণে দেববাহন পঞ্চদশ হস্তী স্বর্ণ-ললাটিকা ও গ্রৈবেয়ক পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান। তদুপরি আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে ছত্র, চামর, ও ধ্বজধারী উপবিষ্ট। আড়ানী-বাহী বালক মধ্যে মধ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া রৌদ্ররোধিনীদ্বয় ধরিতেছে। গজতার মধ্যস্থলে একটি করিশিরে গোপালের প্রতিনিধি ভোগমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। জনতার মধ্যে অসংখ্য ভেরী, তুরী ও সানাই বাদিত হইতেছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণ রাজ বাটীর সহিত সংলগ্ন ; দ্বিতল প্রকোষ্ঠে পীনউপাধানে আনত হইয়া কুচ্চিরাজ বীর কেরল-বর্ম্মা উপবিষ্ট আছেন। রঙ্গ-বৈচিত্রের অভাবে বা বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। পরিচ্ছদের মধ্যে কটি-দেশে একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র, মুণ্ডিত মুখশিরসোপরি পুরশ্চূড় উত্থিত। কিয়-দন্তরে দৌবারিক সুবর্ণযষ্টিসহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পুরীর অপর দিক হইতে, রাজ-পরিবার রঙ্গভূমি নিরীক্ষণ করিতেছেন। মলয়ারিদের বর্ণ ও গঠন বাঙ্গালীর মত। মাদ্রাসীরা ইহাদিগকে অত্যন্ত সুন্দর কহে। রাজপরি-

বারের বর্ণ অপেক্ষাকৃত গৌর ; পরিধেয় নিরতিশয় ধবল, যোষিৎগণের বস্ত্র এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের পাড় ও উত্তরীয় জরির ফুল বিশিষ্ট। এই সাম্যের দেশে কোন কোন সুন্দরীকে পুরুষের ন্যায় উত্তরীয়খানি স্কন্ধে ব্যবহার করিতে দেখিতেছি। ললাটে কৃষ্ণ তিলক, গলে মণিমুক্তা লম্বন, সুকুমার দেহে বৃহৎ কর্ণিকা, সহ্য হইবার নহে ; এজন্য দীর্ঘকর্ণ-ছিদ্র রিক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে থিরুবাঙ্কোড়ে হস্তে সুবর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ধারণ করা শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। একটি নিরাভরণা গৌরাঙ্গী সন্তান বক্ষে করতঃ সৌধোপরি হইতে "সজলঘনরুচি কেরলি কেশ পাশ" উন্মুক্ত করিয়া যাত্রা দর্শন করিতেছেন। বাঙ্গালার ন্যায় এখানে নারিকেল তৈল অভ্যঙ্গ করা রীতি। কেশ আকৃষ্ট করিয়া কবরী বন্ধনের বিধি না থাকায় ইন্দ্রলুপ্তের প্রাদুর্ভাব নাই।

রাজার সংসার ভগ্নী ও ভাগিনেয় দ্বারা গঠিত। পুত্র বা তদীয় জননীকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। রাজার ভাগিনেয় যুবরাজ নামে অভিহিত। তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। রাজা বিবাহ করেন না, রাজভগিনীর বিবাহ আছে। কুচ্চিরাজপরিবারে সবর্ণে ও থিরুবাঁঙ্কোড় রাজবংশে ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হয়। দিনত্রয়ের অধিক দাম্পত্য-বন্ধন রক্ষা করা অনাবশ্যক। এই বিবাহ পদ্ধতি ভিন্নদেশীয়দিগের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র, তদ্দ্বারা কোন প্রকার স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। অনারেবল্ শঙ্কর মেনন্ "মরু-মক্ক-তায়ম্" (ভাগিনেয়াধিকার) রহিত করিয়া "মক্কতায়ম্" (পুত্রাধিকার) প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটীষ মলয়ারে বিবাহকে বৈধ করিবার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় একখানি বিধানের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা সমর্থিত না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কালিকটের জীমরিণ ও নম্বুরী-গণ প্রতিবাদ করেন। বিষ্ণু পরশুরাম অবতার পরিগ্রহ করিয়া, নম্বুরী ব্রাহ্মণদিগকে কেরল দান করিয়াছিলেন ; অতএব তাঁহাদের অনভিপ্রেত বিষয় বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। নম্বুরীদের বৈধবিবাহ-প্রথা, সুতরাং পুত্রা-ধিকার পদ্ধতি আছে ; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্যে বিবাহ করিতে পায় না। এজন্য তদিতরজাতীয় রমণীদিগকে চিরজীবন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিলে অসুবিধা হয়। সর্ব্বত্র দাম্পত্য-নিয়ম লঙ্ঘন করাকে ব্যভিচার কহে, কেরলে দাম্পত্য-নিয়ম পালন করা ব্যভিচার। নারী অনুলোম জাতির সহিত মিলিত হইলে সমাজে পতিতা হন।

তিরুপাট জাতীয় কুচ্চিরাজ ও থিরুবাঁঙ্কোড়াধিপ আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শেষাদ্রিয়াইয়ার অনুমোদিত থিরুবাঁঙ্কোড় পঞ্জিকাতে, তাহাদের শূদ্রত্ব উল্লিখিত হয়। কেরল আলপাথি নামে একখানি মলয়ারি পদ্যগ্রন্থ আছে। কথিত আছে শঙ্করাচার্য্য তাহার রচয়িতা। উহাতে থিরুবাঁঙ্কোড় পঞ্জিকার মতের পোষক প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

শঙ্করাচার্য্য কেরলের কোল্লম্ অব্দ আরম্ভের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ অঃ ৭৭৫) কালাদি নামক স্থানে নম্বুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আলয়াই নদীর উত্তর তটে, আলয়াই নগরের ৪ ক্রোশ ব্যবধানে কালাদি পল্লী অবস্থিত। শঙ্কর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালে শারীরক-ভাষ্য রচনা করতঃ একবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ৩২ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হন। চৈতন্য ২৮ ও ঈষা ৩৮ বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে দীর্ঘকাল কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থান করা অনাবশ্যক।

শঙ্কর বেদান্তকে সাম্প্রদায়িক-শাস্ত্রত্ব প্রদান করিয়া স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রবর্ত্তিত দণ্ডিসম্প্রদায় আর্য্যাবর্ত্তে বৈদান্তিক মত ও শাস্ত্র জীবন্ত রাখিয়াছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন একত্রিত থাকায় সত্যের সহিত কল্পনা মিশ্রিত করিতে হইয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যের পুনরুত্থান কালে ষড়্ দর্শন সংগৃহীত হইয়াছে; ঈশ্বর-নিরূপণ তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কার্য্যমাত্রের কারণ আছে। জগৎ সৃষ্টির কারণ ঈশ্বর হইলে, তাঁহার স্রষ্টা কে জিজ্ঞাস্য হইবে; তিনি স্বতঃসিদ্ধ, কহিলে, আপনি থাকিতে পারে এমন একটি অবস্থা স্বীকার করা হইল। তাহা হইলে সৃষ্টি স্বতঃসিদ্ধ এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম নির্গুণ। দণ্ডিসম্প্রদায় বৈদান্তিক হইলেও শঙ্করের ন্যায় সাকার উপাসক। ঈশ্বর সাকার নহেন। আকারের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে। সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়, এই বলিয়া তাঁহারা স্বীয় অভ্যাস পরিত্যাগের অক্ষমতা সমর্থন করেন। যতিগণ দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস-পথ অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে যিনি অধিকতর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহার লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল বিষয়ে উদাসীনতা দৃষ্ট হয়।

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতাং
কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

তিনি সুখ দুঃখে অনাসক্ত ও ইষ্টানিষ্টে সমজ্ঞান করেন। স্বয়ং চেষ্টা করিয়া বা নিজ হস্তে ভোজন করিবেন না। যে জাতীয় লোক হউক মুখে যে খাদ্য তুলিয়া দিবে তাহাই ভোজনীয়। বস্ত্র পরিধান না করাইয়া দিলে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করেন। কাহারও সহিত আলাপ না করিয়া সদাতুষ্টিম্‌ভাবে কালযাপন করিয়া থাকেন। চিত্তশুদ্ধি-সম্পন্ন সাধারণ পরমহংসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নিরাকারবাদীর অভাব নাই। ঈশ্বর নিরাকার নহেন। চেতনাদি মানসিক বৃত্তি সকল শরীর বিযুক্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বিশ্ববীজ বা জগৎ শক্তিকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শক্তি কোন বস্তু নহে, তাহা পদার্থের ক্ষমতা অর্থাৎ "কারণনিষ্ঠ কার্য্যোৎপাদন যোগ্য ধর্ম্ম" মাত্র। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম শব্দে কেহ সেরূপ বুঝেন না, এজন্য তাহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ করেন। এই ব্যক্তিত্ব লইয়া আধুনিক নাস্তিক ও আস্তিকে প্রভেদ।

শঙ্করের মাতৃবংশ পালুর নামক স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আচার্য্যের জন্মভূমি বিধৌতকারিনী আলয়াই নদীর জল স্বাস্থ্যকর বলিয়া কুচ্চিবেলা নগরে পানার্থ নৌকাযোগে আনীত হইয়া থাকে ও জানপদগণ অবগাহন করিবার জন্য উক্ত নদীতে গমন করেন।

কর্ণাটের চেরবংশীয় রাজার প্রতিনিধিত্বে চেরুমল, পেরুমল, কেরল শাসন করিতেন। পশ্চাৎ তিনি স্বাধীন হন। ৩১১ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র (বা ভাগিনেয়?) রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুচ্চি রাজ্যের বর্ত্তমান আয় ত্রয়োদশ লক্ষ টাকা। ধন্নাগার ব্রিটিষ শিপাহি দ্বারা রক্ষিত। রাজ্যে দুই সহস্র যোধ আছে; কিন্তু ইংরাজের অনুমতি না থাকায় ব্যূহ দলবদ্ধ হইতে পারে না। ভারতেশ্বরীকে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা কর দিতে হয়। শাসন কার্য্যে রাজা স্বাধীন। ভূমির পরিমাণ ফল ১৩৬১ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৫৯৮৩৫৩ থিরুবাঁঙ্কোড়পতির সহিত কুচ্চিরাজের বহুকাল হইতে প্রতিযোগিতা ছিল। থিরুবাঁঙ্কোড়ের দেওয়ান রামআইয়া কহিয়াছিলেন কুচ্চিকে অন্যান্য বৃত্তিভোগী রাজ্যের তালিকাভুক্ত করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিল। বটেভিয়া নিবাসী ডচ্‌দিগের সহিত সন্ধিকালে উভয় রাজ্যে মিত্রতা স্থাপন হয়। জিমরীণের সহিত যুদ্ধকালে কুচ্চিপতি শপথ্ করিয়াছিলেন, "আমি পেরুম্‌পাদপুস্বরূপম্ বংশীয় রোহিণী নক্ষত্রে জন্মা-এই নামধেয় বীরকেরলবর্ম্মা রাজা স্বয়ং শচীন্দ্রমের স-তনুমূর্ত্তির সম্মুখে স্বীকার

করিতেছি যে, আমি বা আমার উত্তরাধিকারী ত্রিপাপুরস্বরূপম্ বংশীয় কৃত্তিকা নক্ষত্র জন্ম নামক থিরুবাঁঙ্কোড়পতি বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত বিরোধ, বা তদীয় শত্রুর সহিত সন্ধি ও পত্র ব্যবহার করিব না।"

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

"খাঁ জাহানআলী।"

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বিগত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের দাসীতে "খাঁ জাহান আলী" শীর্ষক প্রস্তাবে খাঁ জাহানের কীর্ত্তির বিষয়ে যদৃষ্টং তল্লিখিতং ধরণের একটা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যানুরোধে স্বীকার করা উচিত যে, বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী এই সামান্য কীর্ত্তি যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয় হইতে পারে, প্রবন্ধলিখিবার সময়ে লেখকের সেরূপ ধারণা ছিল না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে পাঠকদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ ইহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; এবং "খাঁ জাহান আলী" পাঠ করিয়া এক দিকে যেমন খাঁ জাহানের কীর্ত্তি সকল দর্শনের জন্য কাহারও কাহারও মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছে, অপরদিকে তেমনি খাঁ জাহানকে জানিবার জন্যও অনেকের কৌতূহল জন্মিয়াছে। পাঠকগণের এইরূপ কৌতূহল পূর্ব্বেই চরিতার্থ করা আমাদের পক্ষে উচিত ছিল, কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ গুরুতর অপরাধ করিয়াও অনেক সময়ে নিষ্কৃতি-লাভ করা যায়, ইহাই আমাদের একমাত্র সাহস।

"খাঁ জাহান আলী" সম্বন্ধে বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয় ১৮৬৭ সালের মে মাসে, "আসিয়াটিক সোসাইটীতে" এক প্রবন্ধ পাঠ করেন; প্রবন্ধটী পাঠান্তে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত গৌরদাস বশাক মহাশয়, সেই পুস্তিকাখানি দাসীর সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিবার পক্ষে আমাদের বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মান্যবর শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত নদীয়া ও যশোহরের * রাজকীয়

* W. W Hunter's Statistical Account of Bengal Vol II.—Nudiya nd Jessore.

বিবরণ পাঠ করিয়াও এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ওয়েস্‌ল্যাণ্ড(Westland) সাহেব রচিত "যশোহর" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেও এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত গৌরদাস বাবুর পুস্তিকা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, চারি শত বৎসরের অনেক পূর্ব্বে খাঁ জাহান নামক জনৈক মুসলমান দিল্লীর রাজ-পরিষদ্ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া 'সুন্দরবনের' এই প্রান্তভাগে তহলসীলদারের কর্ম্ম করিতে দিল্লী হইতে প্রেরিত হন। শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেবের বিবরণের সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটু সামান্য অনৈক্য হয়। হাণ্টার সাহেব বলেন, খাঁ জাহান প্রাচীনতম "সুন্দরবন"-আবাদকারিগণের মধ্যে এক জন। খাঁ জাহান কোথা হইতে আসিলেন, কেন আসিলেন সে বিষয়ে হাণ্টার সাহেব নির্ব্বাক্। যাহা হউক খাঁ জাহান যে বাগেরহাটে আপনার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া 'সুন্দরবনের' অধিকাংশ চাষ আবাদ করান এবং জেলা যশোহরের মধ্যে তিনি যে ধনে, মানে ও ঐশ্বর্য্যে একজন অসামান্য লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মত-দ্বৈধ নাই। হাণ্টার সাহেব বলেন, "খাঁ জাহান সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী এই স্থানে আসিবার সময়ে ষাট হাজার মজুর সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং তাহারা এই স্থানে পৌঁছিবার কালে একটী সুদীর্ঘ পথ নির্ম্মাণ করিতে করিতে আসিয়াছিল। চট্টগ্রাম হইতে প্রস্তরাদি আনাইয়া তিনি তিন শত ষাটটী মস্‌জিদাকৃতি ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিন শত ষাটটী পুষ্করিণীও তাঁহার ব্যয়ে খাত হইয়াছিল এবং "বক্তিয়ার খাঁ", "ইক্তিয়ার খাঁ", "আলাম খাঁ", "সাদাত খাঁ", "আহাম্মদ খাঁ" প্রভৃতি তাঁহার প্রধান প্রধান অনুচরগণের নামানুসারে এই সকল পুষ্করিণী ও সরোবরের নামকরণ করা হইয়াছিল। আমাদি নামক স্থানে খাঁ জাহানের দুইটী অনুচরের সমাধি বর্ত্তমান আছে; যশোহর ষ্টেসনে ঘারিব ও বাহারামসা নামক তাঁহার দুইটী সহচরের ভজনালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যশোহর নগরের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে বড়বাজার নামক স্থানে যে সকল পুষ্করিণী আছে তাহা সমস্তই খাঁ জাহানের ব্যয়ে খনিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস। যশোহর ডিষ্ট্রীক্টে অনেকগুলি রাজপথ খাঁ জাহানের নামে অদ্যাপি পরিচিত। খাঁ জাহান যশোহর জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুসলমান সাধু বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে পূজিত হইয়া থাকেন।"

শ্রীযুক্ত গৌরদাস বাবুর মতে খাঁ জাহান বাগেরহাটের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু

কি নামে তখন এই স্থানটী পরিচিত ছিল, সে বিষয়ে তিনি কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে "ক্ষয়তাবাদ" কিংবা "কালীক্ষয়তাবাদ" নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। বাগের হাট নাম বেশী দিনের নয়; সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী লোকেরা সপ্তাহে দুই দিন বাগেরহাটে হাট করিতে আসিয়া থাকে; পূর্ব্বে যেখানে খাঁ জাহানের বাগান ছিল, সেই স্থানে (নদীর ধারে একটী উচ্চ স্থানে) অদ্যাপি গঞ্জ বা হাট বসিয়া থাকে। খাঁ জাহানের প্রমোদোদ্যানের উপর হাট মিলিত বলিয়া লোকেরা "বাগেরহাট" (Garden fair) বলিত; ১৮৬৩ সালের মে মাসে যখন গবর্ণমেণ্ট এই স্থানে একটী মহকুমা স্থাপন করেন তখন "বাগেরহাট" নামই রক্ষা করেন; তদবধি এই নামেই স্থানটী পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে খাঁ জাহান আলীর ও তাঁহার দেওয়ানের সমাধি-মন্দিরের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে বিস্তারিতরূপে কিছুই বলা হয় নাই। বাগেরহাটের তিন মাইল পশ্চিমে, খাঁ জাহানের সমাধির দক্ষিণাংশে যে প্রকাণ্ড দীঘীর কথা পূর্ব্ববারে বলা হইয়াছিল, সেই দীঘীটীর বিষয়ে কিছু বলিয়াই সমাধি সম্বন্ধে বলা যাইবে। শ্রীযুক্ত গৌরদাস বাবু দীঘী সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা এ বিষয়ে আর কিছু লিখিলাম। দীঘীটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান, ইহা এক শত বিঘার অধিক স্থান ব্যাপিয়া আছে। মুরসীদাবাদের "পালদীঘী" কিম্বা দিনাজপুরের "মহীপালদীঘীর" সমান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাস ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এ সম্বন্ধে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন, ১৮৬২ সালে, অক্টবর মাসে আসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্য-বিবরণের সহিত তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই চিঠিতে তিনি খাঁ জাহানের এই দীঘী বর্দ্ধমানের মহারাজের দেলখোস বাগানের দীঘীর সমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খাঁ জাহানের সমাধির দক্ষিণাংশে এই যে প্রকাণ্ড দীঘীর কথা বলা যাইতেছে, খাঁ জাহান আপন ব্যয়ে ইহা কাটাইয়াছিলেন এইরূপ বিশ্বাস আবহমানকাল লোকের অন্তরে স্থান পাইয়া আসিতেছে; এবং এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনও কারণও বর্ত্তমান নাই। কথিত আছে, খাঁ জাহান লবণাক্ত জল পান করিতে অসমর্থ হইয়া, গৌড়ের রাজার অনুমত্যানুসারে এই দীঘীটী খাত করেন এবং ইহারও জলে যখন লবণের আস্বাদ পাইলেন, তখন বহু অর্থব্যয়

করিয়া দীঘীর ভিতরে বহু পরিমাণ পারদ ঢালাইয়া লবণের আস্বাদ দূর করিলেন।

পূর্ব্ববারে এই দীঘীর মধ্যস্থানে একটী মন্দির থাকার কথা যে উল্লেখ করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। গল্পটী গৌরদাস বাবু তাঁহার পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গল্পটী এইঃ—দীঘীটী যখন অনেক দূর খাত হইয়াছে তখন মজুরেরা একটী মন্দির দেখিতে পাইল। মন্দিরের দ্বার ভিতর দিকে বন্ধ ছিল। মজুরগণ দ্বার খুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু দ্বার বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, কিছুতেই খুলিল না। তখন তাহারা খাঁজাহানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। খাঁজাহান অশ্বারোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার যষ্টি দ্বারা মন্দিরের দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। খাঁজাহান অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক ফকিরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ফকিরকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া দীঘী কাটিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; ফকির অনুমতি প্রদান করিলেন এবং খাঁজাহানকে ত্বরায় সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া প্রাণ রক্ষা, করিতে পরামর্শ দিলেন। খাঁজাহান দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

এই গল্পটী পাঠ করিয়া ইহাই মনে হয় যে, মজুরেরা যখন দীঘী কাটিতে ছিল, তখন তাহার গর্ভে কোন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবে। সুন্দর বনের অনেক স্থানে এইরূপ ভগ্নমন্দির ও পুরাতন ইষ্টকস্তূপ অনেক সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গৌরদাস বাবু যখন এই দীঘীটী দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন তখন ইহাতে ১০ ফিট হইতে ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা অন্ততঃ ২০ টী কুম্ভীর বাস করিত। দীঘীর কুম্ভীরগুলি এখনও যেমন নিরীহ তখনও নাকি এইরূপই নিরীহ ছিল। এইরূপ নিরীহ ও অনুগত কুম্ভীরের কথা আর কখনও শোনা যায় নাই।

দীঘীর উত্তর পারে খাঁজাহানের সমাধি। সমাধি-মন্দিরের বিষয়ে পূর্ব্ববারেই কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে।

মার্চ্চ মাসের (১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) শেষ ভাগে (২৬শে জিলহিজা, ৮৬৩ হিজারাসাল) খাঁজাহান দেহত্যাগ করেন, ২৭শে তারিখ বৃহস্পতিবার তাঁহার সমাধি হয়। সাধারণঃলোকের বিশ্বাস এই যে, খাঁজাহানের জীবদ্দশায় তাঁহার রুচি অনুসারেই সমাধি ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সমাধিস্তম্ভের

বিবরণ হইতে এই মাত্র জানা যায় যে, তাঁহার মৃত্যুর পর দিবস তাঁহাকে কবরস্থ করা হইয়াছে; কবর অগ্রে প্রস্তুত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে কোন তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। সমাধিস্তম্ভের উপর আরবী অক্ষরে কয়েকটী বয়ান খোদিত আছে। তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(ক) ঈশ্বরের কৃপার ভিখারী ও তাঁহার দরিদ্র ও নিরুপায় দাসের মৃত্যু উপলক্ষে এই বিবরণ লিখিত হইতেছে; যিনি সেই মহান ঈশ্বর-প্রেরিতের বংশধরগণের সুহৃদ, যিনি সকল জ্ঞানী ও মহাপুরুষদিগের ভক্ত, যিনি অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকগণের পরমবিদ্বেষী, যিনি ইসলাম ও মুসলমানগণের সহায়, তাঁহার নাম আলাগ খাঁজাহান;—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তাঁহার উপর অর্পিত হউক! তিনি ২৬শে জিলহিজা প্রাণত্যাগ করেন, ২৭শে বৃহস্পতিবার তাঁহার গোর হয়।

(খ) যিনি বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন, তিনিই বীরের ন্যায় ইহ সংসার হইতে চলিয়া যান।

(গ) সংসারে প্রথমাবস্থায় ক্রন্দন, দ্বিতীয়াবস্থায় দুঃখভোগ এবং চরমে মৃত্যু।

(ঘ) (পারষী অক্ষরে পারষী বয়ান) হে বন্ধুগণ! স্মরণ রাখিও, মৃত্যুই অনিবার্য্য পরিণাম। এই সংসার উদ্যানে মৃত্যুই কণ্টক স্বরূপ, কিন্তু মৃত্যুই অনিবার্য্য পরিণাম।

মৃত্যুই পরম শত্রু; মৃত্যু সকলকেই আক্রমণ করিবে তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। মৃত্যুর ন্যায় এমন ধ্রুব শত্রু আর নাই, মৃত্যুই সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

খাঁজাহান যথার্থ সাধুপুরুষ ছিলেন; তাঁহার সমাধিস্তম্ভের উপর এই সকল বাক্য খোদিত করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। তিনি জীবদ্দশায় সাধু বলিয়াই সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া গিয়াছেন, মৃত্যুর পরেও হিন্দু মুসলমান সকলের দ্বারা সমভাবে পূজিত হইতেছেন। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বহুলোক তাঁহার গোরস্থানে উপস্থিত হয় বটে, অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বহু নরনারী তাঁহার সমাধির উপর পুষ্পবৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহাদের এই অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে খাঁজাহানের সাধুতায় ও দেবভাবে যে বিশ্বাসটুকু লুক্কায়িত আছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়, তাহাই আমাদের মনোযোগের বিষয়।

চৈত্র পূর্ণিমায় খাঁজাহানের সমাধিস্থানের নিকটে একটী বৃহৎ মেলা হয়। যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি পূর্ব্ববাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে হিন্দু ও মুসলমান অনেক স্ত্রী পুরুষ এই মেলায় উপস্থিত হইয়া থাকে। বহু ফকির সন্ন্যাসীও তখন মেলায় উপস্থিত হন। এই দিনে খাঁজাহানের মৃত্যু হইয়াছিল, এই বিশ্বাসেই তাঁহার মৃত্যু দিন উপলক্ষে মেলা হয়। খাঁ জাহানের সমাধিক্ষেত্র পুণ্যভূমি তীর্থস্থানের ন্যায় সমাদৃত হইতেছে। কতলোক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া মানস করে। যাহার সন্তান হইয়া বাঁচে না তাহার সন্তান হইয়া বাঁচিলে খাঁজাহানের দরগায় (সমাধিক্ষেত্রটীকেই এখন খাঞ্জেআলীর দরগা বলা হয়) কিছু দিবে এইরূপ মনন করিয়া যায়; যাহার সন্তান হয় নাই, হইবার বয়স যাইতেছে, তাহার সন্তান হইলে সে কুম্ভীরদিগকে এক জোড়া মুরগী দিবে এইরূপ মনন করিয়া যায়। তীর্থস্থানের ন্যায় এখানে বার মাসেই লোক সমাগম হয়। এই সকল তীর্থযাত্রীর সংখ্যা এক সময় এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট এক মিথ্যা জনরব পৌছিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট শুনিলেন যে, খাঞ্জেআলীর দরগায় শিশুহত্যা হইয়া থাকে, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়ার ন্যায় বহুলোক এখানে কুম্ভীরদিগকে শিশুসন্তান ভক্ষণ করিতে দেয়।

শ্রীযুক্ত গৌরদাস বাবু তখন বাগেরহাটের সবডিভিসনের ভার প্রাপ্ত ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উপর এবিষয়ের তদন্তের ভার অর্পিত হইল। কিন্তু গৌরদাস বাবু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও এ জনরবের মূলে কোন সত্য পাইলেন না। তিনি জানিলেন যে, অশিক্ষিত নর নারীগণ এখানে উপস্থিত হইয়া কুম্ভীরদিগকে অজ ও কুক্কুট প্রদান করে। এই সকল সরল লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, খাঁঞ্জেআলীর দীঘীর কুম্ভীরগণ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলে তাহাদের সন্তান লাভ হয়, এবং যাহাদের সন্তান হইয়া অকালে মরিয়া যায় তাহারাও কুম্ভীরদিগের প্রসন্নতার জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে ছাগল ও মুরগী ইত্যাদি প্রদান করিতে আসিয়া থাকে। গৌরদাস বাবু অনুসন্ধানে যাহা জানিলেন, গবর্ণমেণ্টে তদনুরূপ রিপোর্ট দিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অনুসন্ধানে সন্তুষ্ট হইয়া এবিষয়ে নিরস্ত হইলেন।

খাঁঞ্জেআলীর দরগার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের ভদ্র পরিবারস্থ মেয়েরাও

অনেক সময়ে দরগায় উপস্থিত হইয়া মানস করেন লেখকের তাহা অবিদিত নাই। লেখকের পরিচিতা কোন কায়স্থ জমিদার বংশের একটী কুলকামিনী আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে খাঁঞ্জেআলীর দরগায় উপস্থিত হইয়া পুত্রকামনা করিয়া কিছু মানস করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র লাভ হইলে পর তাঁহার আত্মীয়েরা অঙ্গীকৃত দেয় প্রদান করিতে খাঁঞ্জেআলী গমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে, সেই কুলবধূ এখন সেই সকল অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জ্ঞান ও সত্যধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। খাঁজাহানের সমাধির পার্শ্বে আর একটী সমাধিস্তম্ভ আছে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। খাঁজাহানের দেওয়ান মহম্মদ তাহের অর্থাৎ পিরআলীর স্মরণার্থে এই স্তম্ভটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পিরআলী সম্বন্ধে এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, দিল্লী হইতে তাঁহার ডাক হইয়াছিল; সম্রাটের আদেশানুসারে তিনি দিল্লী উপস্থিত হন এবং কোন কারণ বশতঃ তাঁহার শিরোচ্ছেদন হয়। এ জনশ্রুতি কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। যাহা হউক এই পিরআলী সম্বন্ধে মোটা মোটী দুই চারিটী কথা বলিলেই পাঠকগণ ইঁহাকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিবেন।

মহম্মদ তাহের বা পীরআলী ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। মুসলমানধর্ম্মে আস্থা জন্মে বলিয়া তিনি ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মোৎসাহী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহের মাত্রাটা এতই বাড়িয়া গিয়াছিল, যে তাঁহার উৎপাতে নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বহু লোককে ইস্লাম ধর্ম্মে আনিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতিও ছিল এবং মুসলমান ধর্ম্মের বাহ্য আচার আচরণ তিনি কড়ায় গণ্ডায় পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না। নরনারায়ণ রায় নামক যশোহর জেলাবাসী এক উচ্চ বংশীয় সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতেন। কথিত আছে, রোজার দিন পীরআলী নরনারায়ণের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সম্মুখস্থ সুপক্ক আম্রফল নাসিকাগ্রে রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "নরনারায়ণ বাগানের আম্রে কেমন খোসবয় বেরুচ্ছে দেখ।" নরনারায়ণ বাস্তবিকই ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনি আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের ন্যায় অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসকেও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "খোদাবন্দ! কি করিলেন, রোজার সময়ে

আম্রের গন্ধগ্রহণ করিলেন?" পীরআলী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গন্ধ লওয়ায় দোষ কি?" নরনারায়ণ কহিলেন, "খোদাবন্দ! আমাদের শাস্ত্রে বলে, "ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হয়।" পীরআলী একটু অপ্রতিভ হইলেন; নরনারায়ণ কার্য্যানুরোধে খোদাবন্দের নিকট বিদায় লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে পীরআলী একদিন আহার করিবার সময়ে নরনারায়ণকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। জমাদার গিয়া নরনারায়ণকে পীরআলীর সেলাম জানাইবামাত্র তিনি পীরআলীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নরনারায়ণ খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আপন বস্ত্রাংশে নাসিকাগ্র আবৃত করিলেন। পীরআলী সুবিধা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরনারায়ণ! কি হইয়াছে, নাক ঢাকিতেছ যে?" নরনারায়ণ সরল ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তি, তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন, খোদাবন্দ! আপনার আহারীয় হইতে গন্ধ আসিতেছে।" পীরআলী কহিলেন, "তবে তোমাদের শাস্ত্রানুসারে তোমার অর্দ্ধ ভোজন হইয়াছে, অতএব তোমার জাতি গিয়াছে।"

নরনারায়ণ সেই দিন হইতে জাতিচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার বংশীয় লোকেরা অদ্যাপি "পীরালী ব্রাহ্মণ" বলিয়া জাতিভ্রষ্ট। যশোহরে অনেক পীরালী ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে। তাহাদের জাতি নাই। এই নরনারায়ণ রায়ের সংশ্রবে যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকেই জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছে। যশোহরই পীরালী ব্রাহ্মণ ও পীরালী শূদ্রদিগের আদি বাসস্থান। শ্রীযুক্ত গৌরদাস বশাক মহাশয় তাঁহার পুস্তিকায় এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তাঁহার মতে কলিকাতার সুবিখ্যাত ঠাকুর বাবুদিগের কোন পূর্ব্ব পুরুষ নরনারায়ণ রায়ের সংশ্রবে যাইয়াই "পীরালী" হন।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, জেলা যশোহরের অন্তর্গত বায়াসা নামক স্থানে বহু পীরালী ব্রাহ্মণের বাস। অনেক পীরালী শূদ্রও তাহার নিকটে বাস করে।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন আদি ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, তখন ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে ও বাঘাআঁচড়াবাসী কতিপয় পিরালী ব্রাহ্মণের মুখে তাঁহাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া, বাঘাআঁচড়া গমন করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে তাহাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারস্থ ব্যক্তি জাতিভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। সকলের উপাধী "মল্লিক" হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার অনেক

লোপ পাইয়াছে; বিবাহাদিতে মৌলবী আসিয়া পুরোহিতের কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন এবং মৃত্যুর পরে আপন আপন বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে, যেথানে সেখানে মৃত-শব গোর দেওয়া হইতেছে। এ ভিন্ন এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে বাধ্য হইয়া অনেক সময়ে সম্পর্কিত ভায়ের সহিত বোনের বিবাহ দিতে হইতেছিল, হিন্দু অনুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, নরনারায়ণ রায়ের সংশ্রবে আসিয়া এই সকল লোকের পূর্ব্বপুরুষদিগের জাতি গিয়াছিল এবং পরে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতাপে এই সকল দীনদরিদ্র লোক হিন্দু আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কথিত আছে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই সকল পীরালী ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা হিন্দু সমাজে থাকিয়া হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি করিতে পারিবে না; তোমাদিগকে হিন্দু আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইবে; যদি ইহার অন্যথা হয়, তবে আমার জমিদারীতে তোমাদের যে সকল ভূমি সম্পত্তি আছে তাহা সমস্তই রাজসরকারভুক্ত করা হইবে।" তদবধি বহুকাল পর্য্যন্ত বাধ্যপ্রায় হিন্দুয়ানীও ইস্‌লামী মিশ্রিত এক অভূতপূর্ব্ব সামাজিক ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল। গোস্বামী মহাশয়ের বহুপরিশ্রমে ও বহুচেষ্টায় মল্লিকগণ স্ব স্ব উপাধী গ্রহণ করিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির দাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং মল্লিক উপাধিধারি ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়লাভ করিয়া, যাবনিক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

খাঞ্জেআলীর দরগা হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে "ষাটগুম্বজ" নামে যে প্রকাণ্ড মস্‌জিদাকৃতি ইষ্টকালয়ের বিষয়ে পূর্ব্ববারে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দুই একটা কথা বলিয়াই এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ইষ্টকনির্ম্মিত এই দীর্ঘাকার অট্টালিকা দৈর্ঘ্যে ১৪৪ ফিট, প্রস্থে ৯৬ ফিট। ৭৭টী গুম্বজ ৬০টী স্তম্ভের উপরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাকে গৌরদাস বাবু জুম্মামসজিদ্ (Friday Mosque) বলিয়াছেন। হাণ্টার সাহেব বলেন যে, ইহার এক ধারে নামাজ হইত এবং অপরদিকে বিষয়কার্য্য সম্পাদিত হইত। বেদীর উপর দুইটী গর্ত্ত আছে যেথানে (হাণ্টার সাহেবের বিশ্বাস) খাঁ জাহান তাঁহার ধনরত্ন প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওয়েসল্যাণ্ড

সাহেব বলেন যে, সামান্য সংস্কার করা হইলে ইহাকে একটী অতি প্রকাণ্ড অট্টালিকা ("a grand public building") করা যাইতে পারে।

পূর্ব্ববারে যে পাকা পথটীর কথা বলা হইয়াছিল তাহা সত্য সত্যই চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ওয়েসল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, বাগেরহাট হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এক পাকা রাস্তা বান্ধা হইয়াছিল এবং এই পথ দিয়া খাঁ জাহান বয়ার্জ্জিদবিস্তান নামক জনৈক মুসলমান সাধুকে দর্শন করিতে সময় সময় চট্টগ্রামে গমন করিতেন। ওয়েসল্যাণ্ড সাহেব দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, "খাঁ জাহানের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয়ে কিছুই যেমন জানা যায় না, খাঁ জাহানের পরেও কেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তবিক খাঁ জাহান আলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কাজ সমাধা করিবেন বলিয়া হস্তে লইয়াছিলেন তাহারও নাশ হইল, তিনি যে সকল জমি চাষ আবাদ করাইয়া ফলশস্যে সুশোভিত করিয়া গিয়াছিলেন পুনর্ব্বার তাহা বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল।" বহুকাল পরে রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য সম্রাট আকবরের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া "সুন্দরবনের" এই নিবিড় প্রদেশে জমিদারী করিতে আরম্ভ করেন। বিক্রমাদিত্য বাঙ্গালার শেষ পাঠান রাজা দাউদ খাঁর অধীনে একটী উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আকবর যখন দাউদ খাঁকে পরাজিত করেন তখন হইতে বিক্রমাদিত্য "সুন্দরবনে" আসিয়া জমি জমা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি অনেক লোকের বিষয় কাড়িয়া লইয়া ধনী হইয়াছিলেন; দিল্লীর সম্রাটকে পর্য্যন্ত তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে মানসিংহ আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং বন্দী করিয়া লইয়া যান। বন্দী হইয়া দিল্লী যাইবার সময়ে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের প্রাণ বিয়োগ হয়।

শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী।

সেবা সংবাদ।

বর্ত্তমান সময়ে মধুপুর বঙ্গদেশের একটী প্রধান স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এইস্থান ইষ্টইণ্ডিয়া রেল পথের কর্ডলাইনের উপর, হাবড়া হইতে ১৮৩ মাইল দূর মাত্র। চন্দ্রধর বড়ুয়া নামক একজন আসামী যুবক প্লীহা জ্বরে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পুনঃ স্বাস্থ্য লাভার্থ এখানে আইসেন।

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কেহই আসেন নাই; তিনি একাকীই আসিয়াছিলেন। এমন কি দেশ হইতে একজন ভৃত্য পর্য্যন্ত আনেন নাই। এ পৃথিবীতে তাঁহার নিকট আত্মীয়ও বড় কেহ ছিল না। বড়ুয়া মহাশয় যখন প্রথমে এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্য অপর লোকের বড় একটা আবশ্যক ছিল না। তিনি তখনও কতকটা সবল ছিলেন। ক্রমে তাহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল, ক্রমেই তিনি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এখন সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল। এই সময়ে তাঁহার একজন ভৃত্য পর্য্যন্ত ছিল না। বড়ুয়া মহাশয় নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এইরূপ বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। এখানে সুস্থ সবল ব্যক্তি প্রায়ই আসেন না। যাঁহারা এখানে আসেন তাঁহারা প্রায় সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে রুগ্ন। এই রুগ্ন ব্যক্তিদিগের দ্বারা বড়ুয়া মহাশয়ের সেবা শুশ্রূষা অধিক দিন চলিবে না, এই জন্য তাঁহাকে গিরিডিস্থ দাসাশ্রমের সেবালয়ে পাঠাইবার পরামর্শ স্থির হইল। দাসাশ্রমের সেবালয়ে তাঁহার স্থান হইবে কিনা জানিবার জন্য লোক পাঠান হইল; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া পাঠান হইল যে এই রোগীর জন্য দাসাশ্রমের কোন ব্যয় হইবে না, রোগী তাঁহার নিজের ব্যয় নিজেই বহন করিতে সক্ষম। কিন্তু দাসাশ্রম ইহাকে স্থান দিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া ইহাকে কলিকাতায় কোন হাঁসপাতালে পাঠানই স্থির হইল এবং কলিকাতার কোন হাঁসপাতালে একটী কামরা ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া জনৈক বন্ধুকে পত্র লিখা হইল। যে দিন কলিকাতায় পত্র লিখা হইল, সেই রাত্রি হইতে বড়ুয়া মহাশয়ের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। এখন তাঁহাকে স্থানান্তর করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না। রোগীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। ঈশ্বর অসহায়ের সহায়, তিনিই বিপন্নের বন্ধু। তাঁহারই প্রেরণায় পূর্ব্বোক্ত সহৃদয় ব্যক্তিগণ নিজ নিজ রুগ্ন ও অসুস্থ অবস্থা ভুলিয়া প্রাণপণে বড়ুয়া মহাশয়ের সেবা ও চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। নববিধান সমাজের অন্যতম প্রচারক ভাই বলদেবনারায়ণ এবং ময়মনসিংহ জেলাস্থ বাবু উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় দিনরাত্র রোগীর নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পাটনানিবাসী বাবু যদুনাথ

পালিত প্রমুখ আরও ৪।৫ জন ভদ্রলোক রোগীর সেবা ও চিকিৎসা বিষয়ে উক্ত দুই মহাত্মাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। বড়ুয়া মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। কিন্তু এ সময়ে তাঁহার নিকট অতি অল্পমাত্র অর্থ ছিল। টাকার জন্য বার বার আসামে টেলিগ্রাফ যাইতে লাগিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ে টাকা আসিয়া উপস্থিত হইল না। টাকা আসিল না বটে, কিন্তু তাহার জন্য বড়ুয়া মহাশয়ের চিকিৎসার কোন ত্রুটী হয় নাই। উক্ত মহাত্মাগণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় বড়ুয়া মহাশয় বিনা ব্যয়ে সুচিকিৎসিত হইয়াছিলেন। প্রথমে দুইজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং তৎপরে একজন ইংরাজ ডাক্তার বড়ুয়া মহাশয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে বড়ুয়া মহাশয় এক উইল দ্বারা তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকাংশ (প্রায় ২০০০ দুই সহস্র টাকা) সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন।

বিগত ১২ই অক্টোবর হইতে ২২এ অক্টোবর পর্য্যন্ত বড়ুয়া মহাশয় শয্যাগত ছিলেন।

২। কলিকাতার বিখ্যাত সেনবংশীয় ৺ কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের বিধবা পত্নী এখানে আছেন। তিনি একদিন কতকগুলি অন্ধখঞ্জ প্রভৃতি আতুরদিগকে (প্রায় একশত লোককে) উদর পুরিয়া আহার করাইয়াছিলেন।

৩। স্থানীয় খৃষ্টীয়ান মিসনারী বাবু আশুতোষ দাস বড় পরোপকারী ব্যক্তি। খৃষ্টের কর্ম্মের ভাব ইহাঁর চরিত্রে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। লোকের উপকার করাই ইহাঁর জীবনের প্রধান কাজ। যে সকল লোক বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আইসেন, আশু বাবু প্রায় তাঁহাদের সকলেরই বিশেষ উপকার করিয়া থাকেন। কাহাকে ঔষধ আনাইয়া দিতেছেন, কাহাকেও ভাল বাড়ী খুঁজিয়া দিতেছেন, কাহারও জন্য বরফ দুগ্ধ বা অপর কোন দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দিতেছেন, আবার কখনও বা কোন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। যাহার যে বস্তুর অভাব, আশু বাবু জানিতে পারিলেই প্রাণপণে তাঁহার সেই অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্যামলাল ঘোষ।

—:o:—

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

গিরিডি।

২২এ আগষ্ট হইতে ২১এ অক্টোবর পর্য্যন্ত।

১ দামো, ২ বাবুরাম, ৩ রসিক চাঁদ, ৪ খেদনা, ৫ লক্ষ্মণ, ৬ গগনচন্দ্র সরকার, ৭ ছৈয়লুল্লা ৮ দেবিয়া, ৯ দুর্গাতারিণী, ১০ স্বর্ণ, ১১ নবদুর্গা, ১২ ফুলমণি ও ১৩ গোপাল মণ্ডল।

দামো—শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। অসুখ ছাড়ে না। পা ফুলিয়াই রহিয়াছে। স্ফূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বে কত গান করিত, এখন আর সে শক্তি নাই। দিবানিশি মৃতের মত পড়িয়া আছে।

বাবুরাম—"ভিক্ষা করিলে বেশ পয়সা পাওয়া যায়" এই লোভে কলিকাতায় যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

খেদনা—এই হতভাগ্য এখানে আসা অবধি খুব ভুগিয়া শেষে বাতশ্লেষ্মা রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। খেদনা অতি নিরীহ, অল্পে সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞচিত্ত ছিল। ভগবান ইহার আত্মার কল্যাণ করুন। মরিবার সময় খেদনার বয়স ২৩। ২৪ বৎসর হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ—ইহার জন্মস্থান দুমকা জেলা। জলপাইগুড়িতে কুলির কার্য্য করিত। সেখানে ম্যালেরিয়া হইয়া উদরী হয়। দুই বৎসর হাঁসপাতালে কাটায়। আরাম না হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষেরা তাড়াইয়া দেন এবং সেখানকার কয়েকটী ভদ্র লোকের সাহায্যে শ্রীযুক্ত জালাল উদ্দিন মিঞা তাহাকে গগনচন্দ্র সরকার নামক আর একটী রোগীর সহিত একজন লোক সঙ্গে দিয়া দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। এখানে ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় তাহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল; হতভাগ্য কুলীর দুঃখময় জীবন এখানেই অবসান প্রাপ্ত হইল।

গগনচন্দ্র সরকার—ইনি নিজে একজন নেটিভ ডাক্তার, বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। শেষে দারুণ চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় বৎসরাবধি ভুগিতেছেন। একটী চক্ষু একেবারেই নষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয়টীও যাওয়ার মধ্যেই। এখানে আসিয়া জ্বর, বাতশ্লেষ্মা ও কোমর ব্যথা প্রভৃতিতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছেন। ডাক্তার অন্নদা বাবুর কৃপায় এখন অনেক সুস্থ আছেন। ইহাঁর ইহসংসারে কেহই নাই। সেই জন্য ইহাকে সাধারণ হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এক্ষণে ইনি কলিকাতা হাঁসপাতালে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। শীঘ্রই ইহাকে পাঠান হইবে।

ছৈয়লুল্লা—পক্ষাঘাত রোগে ইহার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে অবশ। আরাম হইবে না বলিয়া হাঁসপাতাল হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয়। ইহার বৃদ্ধা জননী ও একটী অন্ধ ভাই আছে। তাই পাবনার বাবু কৈলাশচন্দ্র বাগচী তাহাকে কলিকাতা দাসাশ্রম আফিসে পাঠাইয়া দেন। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেছেন।

গোপাল মণ্ডল—বাড়ী বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর, জাতিতে সদগোপ। বাপের নাম মথুর মণ্ডল। গোপাল বলে, তাহার বাপ মহারাজার সরকারে গোমস্তা ছিল। তাহার বাবা টাকা নষ্ট করিয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহার গরু বাছুর ঘর বাড়ী জমি জমা সব বিক্রয় করিয়া লইয়া তাহাকে ২২ দিন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে রাখা হয়। তাহাতে বৃদ্ধ একেবারে শেষদশাপন্ন হইয়া অবশেষে দাসাশ্রমে প্রেরিত হইয়াছে। এখানে আসিয়া আমরক্ত পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে।

আয় ব্যয়।

(২২শে আগষ্ট—২১শে সেপ্টেম্বর)

জমা।

পূর্ব্বমাসের জের ২৫॥৶১৫, মনিঅর্ডার ১৬০৲, পুরাতন কাপড় বিক্রয় ॥/০, ছবি বিক্রয় ১।৶০ ঔষধ বিক্রয় ১॥০, দান ৯।০, মোট জমা ১৯৮।৶১৫।

খরচ।

সংসার খরচ ৫০৶/১৭॥, কর্ম্মচারীর বেতন, (পূর্ব্ববাকি সহিত) ৮৩৶১৭॥, দাহ খরচ ১॥০, ঔষধ ফণ্ডের জন্য জমা ২৫৲, রোগীর গচ্ছিত শোধ ।৶৫, বাসনাদি মেরামত ১৲, গোয়ালা ॥৶, ধোপা ৶৫, বাড়ী ভাড়া ১৮৲, রোগী পাঠাইবার খরচ ১২/০, মোট খরচ ১৯৪৻৫।

মোট জমা ১৯৮।৶১৫। মোট খরচ ১৯৪৻৫। হস্তেস্থিত ৪।৶১০।

২২শে সেপ্টেম্বর—২১শে অক্টোবর।

জমা।

পূর্ব্বমাসের জের ৪।৶১০, মনিঅর্ডার ৭০৲, ঔষধ ফণ্ড ২৫৲, দান ২॥০, ঔষধ বিক্রয়।০ মোট ১০২৶১০।

খরচ।

বাড়ী ভাড়া ১৮৲, সংসার খরচ ৪২॥/১৭॥০, কর্ম্মচারী ৩০।/৭॥, গোয়ালা ১।/৫, ধোপা ৶৶০, পার্শেল ।০, দাহ খরচ ১॥০, দুজন রোগী পাঠাইবার খরচ ৬।৶০, মোট ১০১॥/১০।

মোট জমা ১০২৶১০, মোট খরচ ১০১॥/১০, হস্তেস্থিত ॥/০।

কলিকাতা।

(২৫এ সেপ্টেম্বর হইতে ২৪এ অক্টোবর পর্য্যন্ত)

দানপ্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাদের কল্যাণ করুন।

মাসিক চাঁদা।

বাবু নন্দললে দত্ত, মে ও জুন ২৲, বাবু শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই ১৶০, A Son C/o G. N. Sen জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু নবীন চাঁদ বড়াল আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ২৲, বাবু অনাথনাথ দেব ঐ ঐ ২৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত সেপ্টেম্বর ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ঐ ১৲, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ২৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ ঐ ঐ ২৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস আগষ্ট ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী শ্রাবণ ও ভাদ্র ২৲, বাবু যদুনাথ সেন অক্টোবর ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু আগষ্ট সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১॥০, বাবু দীনেশচন্দ্র চৌধুরী অক্টোবর ॥০, বাবু প্যারীমোহন ভড় জুন, জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ॥০, A Lady C/o S. N. Das Esq. সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র সেপ্টেম্বর ১৲, N. K. Bose Esq. ঐ ১৲, নবাব সৈয়দ আবদুল সোভান চৌধুরী আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ২৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টো সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু নন্দকুমার দত্ত জুলাই ও সেপ্টেম্বর ২৲।

দান।

বাবু পরাণচন্দ্র বসু ১৲, বাবু প্রমথনাথ দত্ত ৫৲, A friend of Chakraberia Road ।০, বাবু চুনীলাল দে ১৲, বাবু চন্দ্রকুমার চট্টো ১৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ বন্দো ১৲, বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র বসু ১৲, বাবু কেদারনাথ মিত্র ১০৲, A friend of College St. ।০, বাবু বিশ্বম্ভর দিন্দা ২৲, বাবু প্রিয়নাথ শাশমাল ।০, বাবু দুর্গা-

প্রসাদ মাইতি ॥০, ডাঃ নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১০৲, বাবু বেণী-মাধব দাস পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, A friend ১৲, শ্রী—চুঁচুড়া ৵০, বাবু অতুলকান্ত নাগ ২৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যো ৩/০, দাওয়া তরহিম মাঃ সঞ্জীবনী কার্য্যাধ্যক্ষ ॥০, জনৈক মহিলা কম্বলের জন্ত মাঃ পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ২০৲, বাবু অমূল্যরত্ন গুহ।০, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক ও ভ্রাতা বিমল চন্দ্রের পরিত্যক্ত ১॥০, লাহোরস্থ Sun পত্রিকার Editor. ৫৲, K. C. Bauerji Esq, ॥০, বাবু দীননাথ চাটার্জি ১৲, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲, H, D. Mukerji Esq. ।০, N. C. Ghosh Esq. ।০, Hon. Mohini Mohan Roy ১০৲, রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ২৲, রাণী কৃষ্ণকামিনী চৌধুরাণী ৫৲, বাবু কালীকৃষ্ণ বসু।০, বাবু বিপিনবিহারী দে ॥০, Dr D. N, Chatterji ১৲, বাবু মুকুন্দলাল রায় ১৲, Messrs K. Dastch & Co ১৲, বাবু নলিনবিহারী সরকার ১৲, বাবু চুনীলাল নিয়োগী ॥০, ডাঃ দুকড়ি ঘোষের পত্নী পিতৃ শ্রাদ্ধে ১৲, মাঃ মনোরঞ্জন গুহ ১৲, শ্রীমতী থাকমনি ঘোষ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ১৲, বাবু কামিনীকুমার রায় ১৲, বাবু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, বাবু দক্ষিণামোহন রায় ২৲, বাবু রমানাথ দাস ১৲, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বটব্যাল ॥০, বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ দাস ১২৲, বাবু কালীচরণ বন্দ্যো ৫৲, বাবু শশিভূষণ যসাক ৵০, কবিরাজ গোপীমোহন রায় ২৲, বাবু গোপালচন্দ্র কুণ্ডু ।০, বাবু রামলাল দাস ১৲, বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, Balaji Rao Esq. ১৲, S. C. Mukerji Esq. ।০ ।

আয়।

মাসিক চাঁদা ২৮৬৵০, এককালীন দান ১২৬॥/০, বিগত মাসের জের ৩০।১৫ মোট আয় ১৮৪॥৶১৫ ।

ব্যয়।

কমিশন ২৩।৶৫, মুটে ও ট্রাম ভাড়া ।/৫, ডাক খরচ ।৫, গিরিডি সেবালয় ১০৫৲, তালা সারাণো ৶০, রোগীর গাড়ী ও পাথেয় ২॥০, ব্যাগ সারাণো ।০, রোগীর পাথেয় ৬॥০, কম্বল ক্রয় ১৩।০, কর্জ্জ টাকার সুদ ১৲, বাবু মনোরঞ্জন গুহের ফেরত ।০, বিবিধ ।১০, মোট ব্যয় ১৫৩।৫ ।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৮৪॥৶১৫, মোট ব্যয় ১৫৩।৫, হস্তেস্থিত ৩১।৶১০ ।

বস্ত্রাদি।

P. N, Dutt Esq. সাদা সার্ট ৬, গরম সার্ট ৩, গরম কোট ১ । বাবু অবিনাশচন্দ্র রায়—Cod liver Oil ১, বাবু মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীঃ—চাদর ১ । বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—সৎরঞ্চ ১, বিলাতী কম্বল ১, গায়ের কাপড় ১, ধুতি ১, বিছানার চাদর ১, বালিস ১ । বাবু তারিণীচরণ মজুমদার—মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নূতন থান ধুতি ২ । বাবু বিপিনবিহারী রায়চৌধুরী—সার্ট ৬, গেঞ্জি ২, ছোট জামা ১, উড়ানী ১, ধুতি ২ । মাঃ বাবু শশিভূষণ বসু M. A.—কম্বল ৪ খান। বাবু প্রসন্নকুমার বসু—নূতন ১ থান কাপড়, বেথুন বোর্ডিং সাড়ী ৩, জ্যাকেট ৮, কামিজ ৫, মোজা ৩, ইজের বডি ১, জাঙ্গিয়া ১ । শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী—তসরের কাপড় ১ । রাজবাড়ীর জনৈক মহিলা—পুরাতন কাপড় ১ পুঁটুলি।

Calcutta,

PRINTED BY L. M. DASS, AT THE BRAHMA MISSION PRESS,

211, CORNWALLIS STREET.

দাসী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

(২)

১৭৬৯ শকাব্দায় তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক এক গ্রন্থসভা সংস্থাপিত হয় এবং সেই সভাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ ছাপাইবার উপযুক্ত, তাহাই বিবেচিত হইত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (তখন তিনি ডাক্তর অথবা রাজা হয়েন নাই) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, যদিও ইহাঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন না, তথাচ এই সভার সভ্য ছিলেন। বিবেচনা করিতে গেলে তত্ত্ববোধিনী সভাই তখনকার এই দেশের জ্ঞান, ধন ও মানসিক ক্ষমতা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, মহর্ষির ভায়রাভাই শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শোভাবাজারের রাজবাটীর আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং আমি এই গ্রন্থ-সভার সভ্য ছিলাম।

আমি ১৭৬৬ শকে চিরস্মরণীয় লালা হাজারী লাল কর্ত্তৃক ১৯ বৎসর বয়ক্রম কালে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হই। আমি তাঁহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমি মহর্ষিকে ইংরাজিতে যে পত্র লিখি তাহা হইতে অনুবাদিত হইয়া নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ও পুনঃ প্রচার যখন আপনার জীবনের ব্রত তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত মূল, সরল বঙ্গানুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা সহ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করুন। ইহার প্রথম ভাগে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল থাকিবে। এই সকল শ্লোক কেবল বেদান্তদর্শন হইতে না লইয়া সমস্ত শ্রুতি হইতে সংগ্রহ করা

উচিত, কারণ বেদান্তদর্শনকে অন্যান্য হিন্দুদার্শনিকেরা এবং সাকারবাদী অনেক পণ্ডিত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রুতিকে একান্ত প্রমাণিক বলিয়া ভারতবাসী সমগ্র হিন্দু স্বীকার করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকলের সমর্থন জন্য হিন্দু দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং ইতিহাস হইতে ঈশ্বর বিষয়ক বচন সকল উদ্ধৃত হইবে। ইহার তৃতীয় অর্থাৎ শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুগণের নীতি-বিষয়ক শ্লোক সকল সরল তাৎপর্য্যের সহিত প্রকাশিত হইবে। এই সকল শ্লোক সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া আহৃত হইবে এবং এই শ্লোক সমূহ সৌন্দর্য্যে এবং সারবত্তায় মহাত্মা যিশুখৃষ্টের স্বর্গীয় বচন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও না হউক ত সমকক্ষ হইবে।” আমার এই প্রস্তাবের চারি পাঁচ বৎসর পরে মহর্ষি হিন্দুশাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম ভাগে ঈশ্বরের লক্ষণ এবং তাহার সঙ্গে যোগ এবং তাহার উপাসনা বিষয় সকল উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এবং ইহার দ্বিতীয় ভাগে মনু যাজ্ঞবল্ক্য, মহাভারত, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র হইতে নীতি বিষয়ে উপদেশ বাক্য সকল গৃহীত হইয়াছে। মনু হইতে সারসংগ্রহ আমি করিয়া দিই। এই দুই ভাগ গ্রন্থেই সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ভাগের তাৎপর্য্য মহর্ষি, অক্ষয় বাবু ও আমার দ্বারা লিখিত হয়। দ্বিতীয় ভাগের তাৎপর্য্য সকল অনেক দিবস পরে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দ্বারা লিখিত হয়। যে বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ প্রকাশিত হয় সেই বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে বৈদান্তিক ধর্ম্মের কোন উল্লেখ না থাকিয়া খাঁটি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে সকল বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটি সকলাপেক্ষা সুন্দর এবং মহান্—“তস্মিনপ্রীতি—তস্তপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসন-মেব,” ঈশ্বরকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই উচ্চ ও মহান্ বাক্যটি মহর্ষির নিজের রচিত। বাইবেলে এইরূপ একটী বাক্য আছে—“সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমার ঈশ্বরকে ভাল বাস এবং তোমার প্রতিবাসীদিগকে নিজের ন্যায় দেখ।” মহর্ষির বাক্যটী বাইবেলোক্ত উক্ত রচনাপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ বাইবেলে নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য অবধারিত করা হইয়াছে। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হয় নাই। মহর্ষির উক্তিতে ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করা উচিত বলা হইয়াছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও লক্ষ্ণৌএর বিখ্যাত রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে এই বাক্যটী অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বেদোক্তি মনে করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জানাই যে উহা বেদোক্তি নহে, মহর্ষির রচনা। অক্ষয় বাবু মহর্ষিকে বেদান্তের অভ্রান্ততার মত পরিত্যাগে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের কিছুকাল পরে ১৭৭২ শকাব্দায় ১১ই মাঘোৎসবের বক্তৃতায় অক্ষয় বাবু প্রকাশ্যভাবে বলেন যে, প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সত্বা ও মহিমা উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মগণের একমাত্র লক্ষ্য এবং জগৎ গ্রন্থই ব্রাহ্মগণের একমাত্র শাস্ত্র এবং একথাও বলেন যে রামমোহন রায়েরও এইরূপ মত ও বিশ্বাস ছিল। বলা বাহুল্য তিনি সেই বক্তৃতায় রামমোহন রায়কে ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মধ্যে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। উহা উক্ত মহাত্মার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। তিনি ঐ প্রশংসার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

এই সময় হইতে যুবকগণকে ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়। এই সময় হইতে “তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদো” ইত্যাদি মুণ্ডক উপনিষদের প্রসিদ্ধ বাক্যটী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মর্ম্মসূচক বাক্য হইয়া পত্রিকার শিরোদেশ শোভিত করে। ঐ শ্লোকের মর্ম্ম এই “বেদ বেদাঙ্গই” নিকৃষ্ট জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যাহাদ্বারা অব্যয় অক্ষয় ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানগোচর হয়েন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞান বেদ বেদাঙ্গ পাঠে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা মনুষ্যের মনে স্বয়ং সম্ভূত হয়।

১৭৭১ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে “ধর্ম্মতত্ত্ব বিবেক” নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতেই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজে সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের মতের অবতারণা করা হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত উহার লেখক।

১৭৭৮ শকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্জ্জন ধ্যানের জন্য হিমালয় পর্ব্বতে কিছুকাল বাস করিতে গমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই নির্জ্জন ধ্যানের জন্য এক বলবতী স্পৃহা তাঁহার প্রাণে উদিত হইয়াছিল। ১৭৮০ শকে সীপাহি-বিদ্রোহের পরে তিনি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হিমালয়ে তাঁহার নির্জ্জন বাসে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার

এই নির্জ্জন বাসের গভীর চিন্তার ফল 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ব্যাখ্যান'; ঐ ব্যাখ্যান আজ সমগ্র ব্রাহ্মগণের হৃদয়ের এক অতি প্রিয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিমালয়ে মহর্ষির নির্জ্জন বাসের সময় ১৭৭৮ শকের ২৯এ পৌষ তারিখে তাঁহার অনুপস্থিতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন হয়। বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর সেই সভায় সভাপতির কার্য্য করেন। সেই সভাতে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে পরলোকগত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ও রাধাপ্রসাদ রায়ের স্থলে রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি নিযুক্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রেসকে অর্থাগমের এক উপায় স্বরূপ করিতে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করা হয়।

১৭৮১ শকে ১১ই পৌষে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক এক বিশেষ সভা আহূত হয়। তাহাতে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ, উভয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য পৃথকভাবে আর কাজ করিবার অবশ্যক নাই। সেই সময় হইতে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্মিলিত হইল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এতকাল যাবৎ ইহার সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন তিনি এই সময় স্বপদ পরিত্যাগ করেন। উক্ত সভাতেই নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার প্রাপ্ত হন।

সভাপতি

বাবু রমাপ্রসাদ রায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ কালীকৃষ্ণ দত্ত। (নিবাধই দত্ত পুকুরের)

„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

সম্পাদক

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ কেশবচন্দ্র সেন।

সহকারী সম্পাদক

পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক

বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

পরিদর্শক বা প্রচারক

বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। নবীন বাবুর পরে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সপ্তদশ বয়ঃক্রম কালে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি এই অল্প বয়সেই এই কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করেন এবং অনেক প্রকারে সমাজের উন্নতি সাধন করেন। তিনি অনেকগুলি ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, সেই সকল সঙ্গীতের ভাষার সৌন্দর্য্য এবং অতি উচ্চ স্বর্গীয় ভাব সমস্ত ব্রাহ্মগণের হৃদয় সম্যকৃপ্রকারে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সত্যেন্দ্র বাবু স্ত্রী স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী এবং জাতি বিভেদের উচ্ছেদ সাধনে বিশেষ চেষ্টিত।

অক্ষয় বাবু নানা প্রকার শারীরিক পীড়া ও দুর্ব্বলতা জন্য চার বৎসর পূর্ব্বেই কার্য্য পরিত্যাগ করেন। কেশব বাবু ইঁহার পর সমাজের সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ও তৎপরে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। ইনি বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র। দেবেন্দ্র বাবু হিমালয় পর্ব্বতে নির্জ্জন বাসের পরে কলিকাতায় যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ইঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহার বয়স তখন ২২ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই কেশব বাবু সুন্দর রূপেই ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। উক্ত ভাষায় বক্তৃতা করণে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা থাকাতে তিনি ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবকদিগের শিক্ষাস্থল ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।

১৭৮১ শকাব্দায় ২৫এ বৈশাখে ঐ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। প্রতি রবিবারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতেন এবং কেশব বাবু ইংরাজীতে বলিতেন। দেবেন্দ্র বাবু ইহাতে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সকল পুস্তকাকারে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(উপদেশ)

১। ... ... ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ।

২। ... ...ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয় কর্ত্তা।
৩। ... ...ঈশ্বরের আনন্দ স্বরূপ।
৪। ... ...ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ।
৫। ... ...ঈশ্বরপ্রীতি এবং সংসারের উন্নতি।
৬। ... ...সাংসারিক সুখ এবং ব্রহ্মানন্দ।
৭। ... ...পরকাল।
৮। ... ...স্বর্গ এবং নরক।
৯। ১০। ...মুক্তি।

এই বিদ্যালয়ে যে সকল বালক পড়িত তাহাদের রীতিমত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা পারদর্শিতা দেখাইতে পারিত তাঁহাদের উচিত মত পুরস্কার প্রদান করা হইত।

১৭৮১ শকে ১১ই শ্রাবণ দিবসে মহর্ষি তাঁহার "ব্যাখ্যানপুস্তকের" অমর ও চিরস্মরণীয় উপদেশ সকল প্রদান করিতে আরম্ভ করেন।

১৭৮৩ শকাব্দায় ১২ শ্রাবণ তারিখে মহর্ষির দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ম-বিধিমতে সম্পন্ন হয়। ইহাই ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত। পারিবারিক ক্রিয়া কর্ম্মে পৌত্তলিক আচার বর্জ্জন করিয়া তাহা ব্রহ্মোপাসনা-পূর্ব্বক সম্পন্ন করিবার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ১৭৭২খৃঃ ব্রাহ্ম-বিবাহের সাহায্য জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া সিবিল বিবাহ পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়া লন। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্ম সকল ইহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন বলিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে ইহাকে "ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন" এই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে না। যে বিবাহ ঐ আইনানুসারে সম্পন্ন হয় তাহা ধর্ম্ম বর্জ্জিত কারণ এই বিবাহ যখন রেজেষ্টরী করা হয় তখন যে অঙ্গীকার সকল করিতে হয়, তাহাতে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই আর সেই নিরীশ্বর অঙ্গীকার না করিলে বিবাহ বৈধ-বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না। যদিও ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ এই বিবাহে উপাসনাদি ব্রাহ্মক্রিয়া সকল সংযোজিত করিয়াছিলেন তবুও ইহাকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না, কারণ ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলেও ঐ বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হয়। যে বিবাহ কেবল জগৎপিতা ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া সম্পন্ন হয় তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্ম বিবাহ; কোন মানবের সাক্ষ্যতায় অথবা স্বাক্ষরে তাহা হইতে পারে না।

আদি সমাজের ব্রাহ্মগণ কাশী ও নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ নিকট হইতে এক বৃহৎ ব্যবস্থাপত্র আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া মত দিয়াছেন।

ব্রাহ্ম মতে মহর্ষির দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ সময় হইতে পৌত্তলিক ক্রিয়া কর্ম্ম সকল ব্রাহ্মগণ দ্বারা উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজ এই সময় হইতে এক নূতন ও উন্নত আকার ধারণ করিল। বলাবাহুল্য এই সকল সংস্কার অতি সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন হয় নাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ক্রিয়াকর্ম্মের প্রচারে হিন্দু জাতির সেই সেই অংশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন যাহা বিবেক ও সত্যের অনুমোদিত; উহার পৌত্তলিক অংশ সকল তাহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সকল ক্রিয়া কাণ্ড সংস্কৃত আকারে ব্রাহ্মসমাজে (আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত তখন অন্য ব্রাহ্মসমাজ ছিল না) গৃহীত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের নামোল্লেখ করা হইল।

১। জাতকর্ম্ম।	৪। উপনয়ন।
২। নামকরণ।	৫। দীক্ষা।
৩। বিবাহ।	৬। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ।

ব্রাহ্মবিবাহে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সপ্তপদীগমনের রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রীতিটি এরূপ মনাকর্ষক এবং সুন্দর যে সিবিল-বিবাহ-পদ্ধতির প্রণেতা অনারবল ফিট্‌স্ জেম্‌শ ষ্টিফেন সাহেব ইহা ইংরাজ সমাজে প্রচলন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তিনি আদি সমাজের সিমলাপর্ব্বতে প্রেরিত প্রতিনিধি ৺ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও ৺ নবগোপাল মিত্র মহাশয়দ্বয়কে বলিয়াছিলেন।

এই স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে মহর্ষির মত এই যে, দেশী প্রথা যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া পৌত্তলিক আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি ব্রাহ্মদের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত; সামাজিক সংস্কার করা আর না করা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। এই প্রকার তিনি সমাজ সংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের পার্থক্য ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমার মতে এই প্রথার পার্থক্য রক্ষা করাই উচিত। যে ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য-ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহাকে কখনই ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না; কিন্তু যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন অথচ হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা করিয়া যিনি

ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহাকেও ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ব্রাহ্ম শব্দে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা পরব্রহ্মের উপাসক বুঝায় অতএব যে ব্রাহ্ম হিন্দু ভাব সম্পন্ন নহেন তাহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না, তিনি Theist।

১৭৮৩ শকাব্দার ২৭ চৈত্রে আদি সমাজে ব্রাহ্মদিগের এক সাধারণ সভা হয় তাহাতে মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের সমাজপতি পদে নিযুক্ত হয়েন।

১৭৮৭ শকে ১১ মাঘোৎসবে কয়েক জন ব্রাহ্মিকা আদি সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে প্রথম এই দৃষ্টান্ত দেখান। স্ত্রীপুরুষে একত্র দেবোপাসনা সম্পূর্ণ হিন্দুরীতি সম্মত। প্রত্যেক হিন্দু-দেবমন্দিরে এরূপ হইয়া থাকে। সমাজ গৃহের তৃতীয় তলে যেখানে উপাসনা হইয়া থাকে সেখানে স্ত্রীলোকদিগের উঠিবার জন্য পূর্ব্বদিকে এক স্বতন্ত্র সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। যদ্যপি কোন ব্রাহ্মিকা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সমাজের ঐ দিকে পর্দ্দা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যখন কোন ব্রাহ্মিকা উপস্থিত থাকেন না তখন সমস্ত গৃহ ব্রাহ্মদিগের ব্যবহার জন্য খোলা থাকে।

সর্ব্বপ্রথমে আদি সমাজের "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ" নাম ছিল। কিন্তু ১৭৮৯ শক হইতে "কলিকাতা" শব্দের পরিবর্ত্তে "আদি" শব্দ ব্যবহৃত হইতে-লাগিল। "আদি" শব্দের অর্থে অনেকেই মনে করেন যে এই সমাজ সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছিল সেই জন্য উহার ঐ নামকরণ হইয়াছে কিন্তু বলাবাহুল্য যে কেবল ভারতেই ইহা আদি নহে সমগ্র পৃথিবীতে একেশ্বরবাদীদিগের উপাসনা মন্দিরের মধ্যেই আদি। সেই জন্য ভবিষ্যত সময় যে কোন দেশে যে কোন জাতির মধ্যে একেশ্বরবাদীর উপাসনামন্দির স্থাপিত হইবে তাহার সহিত ইহা পিতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিবে।

১৭৯৪ শকের ৩১ ভাদ্র দিবসে জাতীয় সভায় (National Societyর) এক অধিবেশন হয়। দেবেন্দ্র বাবু তাহাতে আগ্রহপূর্ব্বক সভাপতির কার্য্য করেন। সেই সভায় আমি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয় এক বক্তৃতা করি। তাহাতে আমি অতি স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছিলাম যে পৃথিবীর বর্ত্তমান ধর্ম্ম সকলের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ও মহান্। এই সভায় বহুসংখ্যক হিন্দু ও ব্রাহ্মশ্রোতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলের সম্মুখে শাস্ত্রীয় বচনের দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে আমি সক্ষম হইয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের

পূর্ণাকার এবং যদিও এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন জাতিবিশেষ বা মত বিশেষে আবদ্ধ নহে তথাপি উহা হিন্দুধর্ম্মের সার। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমবিকাশ দ্বারা সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। যাহা সত্য তাহা সকল স্থানে ও সকল সময় সত্য সেই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বের ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম আপনা আপনি ক্রম বিকাশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে। যদিও হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তবুও ইহা হিন্দুধর্ম্ম কারণ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যে ব্যক্তি ছিলেন এখনও সেই ব্যক্তি আছেন, সময়ে তাঁহার শরীরের বৃদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপক্কতা হইয়াছে মাত্র। যে সভায় হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই উপমাটি প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন এই উপমাটি অতি সুন্দর ও সর্ব্বসামঞ্জস্য সাধক। এই বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে ইহা অনেক সহায়তা করিয়াছে। ইহার পর হইতে হিন্দুসমাজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বৈদেশিক ধর্ম্ম নহে। উহা আর্য্যঋষিগণের ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রণালী বিষয়ে মহর্ষির মত নিম্নে বিবৃত হইয়াছে।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু আকারে প্রচারিত হওয়া উচিত। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে, হিন্দুভাবের মধ্য দিয়া হিন্দু শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া প্রচার করিলে এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে নচেৎ নহে।

২। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ না করিলে নয় আর সমাজ সংস্কার স্বেচ্ছাধীন, হিন্দুধর্ম্মের সকলই থাকিতে পারে কেবল পরিমিত দেবতার পরিবর্ত্তে অপরিমিত দেবতা আসিবে না।

৩। ঈশ্বরোপাসনাতে যে কোন ব্রাহ্মের সহিত যোগ দেওয়া যাইতে পারে।

যদি আমরা এই মতানুসারে কার্য্য করিতে না পারি তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও ইহার দেশীয় ভাব এককালে কখনই রক্ষিত হইবে না। মহর্ষি চিরকালই এই মতানুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

সমাজ সংস্কার স্বেচ্ছাধীন হইলেও ঐ বিষয়ে যাঁহারা অত্যন্ত অগ্রসর, তাঁহাদিগের সহিত উপাসনা করিতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের কোনই আপত্তি নাই।

সাহেবকে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার কোন কোন স্থল একেবারে উঠাইয়া দিয়া, কোন কোন স্থল পরিবর্ত্তন করিয়া আবার কোন কোন স্থল পরিবর্ত্তিত করিয়া এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে মহর্ষির অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি,তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অসাধারণ পরিশ্রম, যত্ন ও উৎসাহ, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠা, তাঁহার তপস্বী ভাব, তাঁহার হিন্দুভাবের ক্ষীণ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বলিতে কি এই প্রবন্ধ তাঁহার জীবনবৃত্তের কঙ্কালমাত্র। ইহাতে তাঁহার জীবনের অধুনাতন ঘটনা সকলের কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনবৃত্ত লেখকের কিঞ্চিৎ উপকরণে আসিতে পারে, এই আশায় ইহা প্রকাশিত হইল।

চিন্তা করিতে কি সুখ যে, মহর্ষি আমাদিগের মধ্যে এখনও বর্ত্তমান আছেন, এখন আমরা তাঁহার নিকট আরো ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি, এখনও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অমূল্য পরামর্শ লাভ করিতে পারি। সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের পুনর্জ্জন্মদাতা মহর্ষিকে তাঁহাদিগের প্রধান আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ দিবসে মহর্ষি তাহার উনআশি বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। ঐ দিবসে তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনার পর তাঁহার পরিবারের সকল লোকেরা এবং বাহিরের উপস্থিত ব্রাহ্মেরা তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। সে দৃশ্য কি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র।

(৪)

বিষবৃক্ষ—বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের মত সুন্দর উপন্যাস সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলেন যে বিষবৃক্ষেই বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার পূর্ণ বা সর্ব্বোচ্চ বিকাশ—আমরা সে মতাবলম্বী নহি। কিন্তু বিষবৃক্ষ প্রকৃত জীবনের চিত্র বলিয়াই তাহা এত সুন্দর, সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল আদৃত।

গ্রন্থমধ্যে এক দিকে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-পরায়ণা, পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখী; অন্যদিকে শিশিরস্নাতা অপ্রস্ফুট যূথিকাকলিকার মত "ন প্রবুদ্ধা ন সুপ্তা" কুন্দনন্দিনী; এক দিকে হাস্যময়ী,সরলপ্রাণা কমলমণি; অপরদিকে পাপমগ্না হীরা; একদিকে সদসদ্‌বুদ্ধিসজ্ঘর্ষ-নিপীড়িত নগেন্দ্র; অন্যদিকে পাপস্রোতে ভাসমান দেবেন্দ্র। এরূপ বৈপরীত্যময় চরিত্রসমাগম সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই বিষবৃক্ষ এমন সুন্দর উপন্যাস।

এখন বিষবৃক্ষের চরিত্রগুলির সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর সম্বন্ধে বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "একদিকে লজ্জাশীলা, ভীরুস্বভাব-সম্পন্না, আত্মঘাতিনী, সুন্দরী, চপলা বালিকা,—অন্য দিকে নিস্বার্থপরায়ণা, বুদ্ধিমতী, সংযতা, সাধ্বী, পতিব্রতা স্ত্রী। মমতাহীন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে, সূর্য্যমুখী শিক্ষিতা, ধীরা, গম্ভীরা,—অসহ্য পৈশাচিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আপনাকে সামলাইতে সক্ষম। কুন্দ সংসারের বড় ধার ধারে না, সংসার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা অতি অল্প;— সে সংসারে চপলা, মুখচোরা বালিকা; যাকে ভাল বাসে, তাকে চায়, ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে কাঁদে, আবার সময় সময় অভিমান ক'রে, জলে ডুবে মরিতে যায়।"

আবার কুন্দর কাছে পৃথিবী একটী অজানা দেশ; সে অতি সঙ্কোচে, অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া চলে—তার পদে পদে ভয়; সূর্য্যমুখী আপন কর্ত্তব্যপথে অস্খলিত চরণে বিচরণ করে,—সে যেথান দিয়া চলিয়া যায়, সেখানে ফুল ফুটিয়া উঠে; ভূমি শস্য শ্যামলা হয়।"

উভয়ের চরিত্রে এই প্রভেদ। সূর্য্যমুখী কর্ত্তব্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন; তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সম্মুখে সকল বাধা বিঘ্ন প্রবল ঝটিকার সম্মুখে মেঘরাশির মত দূর হইয়া যায়, স্নিগ্ধ আলোক দিগ্বিভাসিত করিয়া হাসিতে থাকে। সঙ্কোচে, লজ্জায় কুন্দ তাহা পারে না। প্রস্ফুটিতা সূর্য্যমুখীর মত সূর্য্যমুখী জানেন, কেমন করিয়া রবির কিরণে হাসিতে হয়, কেমন করিয়া সে কিরণ প্রতিবিম্বিত করিতে হয়, কেমন করিয়া পূর্ব্বগগনপ্রান্তে মেঘের রেখায় রেখায় সেই আলোক দেখিয়া চক্ষু মেলিতে হয়; আবার কেমন করিয়া সান্ধ্যগগনে সেই প্রেমময়ের প্রেম-নির্ব্বাণের সময়, চক্ষু মুদিতে হয়। অপ্রস্ফুট কুন্দ,তাহা পারে না; রবির দিগন্তব্যাপী কর-স্রোতের মধ্যে, সে আত্মহারা হইয়া পড়ে; সে ত তত আলোক কখন দেখে নাই! সে আপনার অপ্রস্ফুট হৃদয়ে তত আলোক, তত প্রেম, তত আনন্দ রাখিতে পারে না।

কুন্দকে অপ্রস্ফুট বলিলাম, কারণ তাহার প্রস্ফুট ভাব আমরা কোথাও পাই নাই। যুবতী হইয়াও কুন্দের কখন যৌবনচাঞ্চল্য হয় নাই। যুবতী কুন্দকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসী বৈষ্ণবী যখন বলিল, "হ্যাঁগা—তুমি কিছু ফরমাস করিলে না ?" তখন কুন্দ "লজ্জাবনতমুখী" হইল; আপনি তাহার কথার উত্তর দিতে পারিল না। আবার "সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল। তাই বলিতেছি, কুন্দ-কুসুম ফুটে নাই। মরণাহতা যুবতীর কথায় গ্রন্থকারও বলিয়াছেন, "অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।" "কাব্যসুন্দরী'' প্রণেতা বলিয়াছেন যে, কুন্দনন্দিনীর চিত্র "তত বিভাসিত নহে, অতি কোমল বর্ণে মৃদু রঞ্জিত, কিন্তু উহার চিত্রে এমন মাধুর্য্য, এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা তাহার পার্শ্বস্থ কোন উজ্জল চিত্রে নাই।" বাস্তবিক "সূর্য্যমুখী অন্য দেশে দুর্লভ, কিন্তু কুন্দনন্দিনী বঙ্গদেশেও দুর্লভ।" কারণ কুন্দ কেবল কোমলতার ও নিশ্চেষ্ট সরলতার আদর্শ; আর "সূর্য্যমুখী বঙ্গনারীর অলঙ্কার, বঙ্গভূমির অলঙ্কার, নারী-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।"

সূর্য্যমুখীর মত পতিপ্রেমপরায়ণা, স্বার্থত্যাগিনী কয় জন আছে? কয় জন পতির প্রেমের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া আপনার আমিত্ব লোপ করিতে পারে? সূর্য্যমুখী যখন বলিলেন, "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; * * * পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে তবে সে স্বামীর স্নেহ।" তখনই মনে হয় সূর্য্যমুখী দেবী। যখন স্বামীর কথায় তিনি বলিলেন, "তাঁহার ছায়া দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি," তখনই মনে হয়, পতিপ্রেমে তাঁহার আমিত্ব বিসর্জ্জিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে সূর্য্যমুখী যখন মনে মনে বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব-ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে! তুমি বড় না আমি বড়?" সূর্য্যমুখীর প্রেমে স্বার্থের লেশমাত্র নাই। সূর্য্যমুখী যখন কমলমণিকে বলিলেন, "আমি কে?" তখন মনে হয় সূর্য্যমুখী রমণীচরিত্রের আদর্শ। কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রের বিবাহান্তে কমলমণি সূর্য্যমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি সুখী হইয়াছ?"—সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে

দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।" বাস্তবিক তিনি পতিপ্রেমপরায়ণার উচ্চতম আদর্শ। তিনি রমণীজাতির গৌরব। সূর্য্যমুখী সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।" নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসেন কিন্তু সূর্য্যমুখী তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহা-কেও জানেন না। নগেন্দ্রের সুখের জন্য সূর্য্যমুখী আপনার সুখ বলি দিলেন—কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। এমন দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। তিনি সত্যসত্যই স্বামীকে বলিতে পারিতেন:—

"আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাইগো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই, কিছু নাইগো!"

সূর্য্যমুখীর মত সহ্যগুণ, প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগ কুন্দনন্দিনীর নাই;—থাকিলে সে আত্মঘাতিনী হইতে পারিত না। যে অবহেলা সূর্য্যমুখী সহ্য করিলেন, কুন্দ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। কেবল কয়বার মাত্র কুন্দের পরোপকার বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছিল। কমল যখন তাহাকে বলিলেন,—"বুঝেছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?''—তাহাকে বুঝাইলেন যে, তাহার জন্য সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে, তখন সে হৃদয়ের পুণ্যতীর্থ নগেন্দ্রের দর্শনসুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিতা করিতে সম্মত হইল—কলিকাতায় যাইতে চাহিল। সেই একবার "কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল।"—একবার সে সরোবরে ডুবিতে গিয়াছিল—আরও একবার বড় যন্ত্রণায় সে মরিবে স্থির করিয়াছিল; মরণাহতা হইয়া সে নগেন্দ্রকে বলিল—"মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না।'' নগেন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রথম দুইবার তাহার সঙ্কল্প সামান্য কথায় স্বামীর উপর পত্নীর অভিমানের মত দূর হইয়া গিয়াছিল; শেষ-বারেও সে তাঁহাকে বলিল—"তবে তোমাকে দেখিলে, আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।" আর সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগের পর দেখিলেন যে, স্বামীর অদর্শন

জনিত যাতনা অপেক্ষা গৃহের যাতনা শতগুণে সহনীয়, তাই আবার রমণীর গুরু পতির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সূর্য্যমুখী সত্য সত্যই বড় দুর্ল্লভ।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন "কমলমণি রমণীরত্ন।" সত্যই বহুগুণের উৎকর্ষ দিয়া কমলের চরিত্র নির্ম্মিত। "কমল, পরিপূর্ণ প্রফুল্লতার মূর্ত্তিমতী কল্পনা।" সংসারের সুখে, দুঃখে, আনন্দে, বিষাদে কমল কখন বিচলিতা নহেন; আবার তাঁহার পতিপ্রেম প্রবল; তিনি সূর্য্যমুখীকে লিখিতেছেন,—"স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।" তবে কমল কেবলই হাস্যময়ী নহেন। কমল স্নেহময়ী, দয়াময়ী, সহানুভূতিময়ী; তাঁহার আপনার উপর দিয়া সংসারের কষ্টের ঝন্ঝাবাত কখন বহিয়া যায় নাই—তবুও কমল সহানুভূতিময়ী, নহিলে সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়ে যাতনার সময় তাঁহাকে আশ্রয় বলিয়া জানিবেন কেন? কমলমণি সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা নহেন; তিনি যখন সূর্য্যমুখীকে উপদেশ দিতেছেন, কুন্দকে বুঝাইতেছেন ও ভ্রাতার আগমন প্রত্যাশায় নানা উদ্যোগ করিতেছেন, তখন কে বলিবে তিনি সংসারের ধার ধারেন না—সংসারের চিন্তাস্রোত তাঁহার হৃদয়ের কেবল উপর দিয়াই বহিয়া যায়? কমলমণির আর একটি গুণ আছে, আর একটি ভাব আছে যাহা এই গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত অন্য কোন প্রধান চরিত্রে নাই, তাহা কমলের জননীত্ব; কমল স্নেহময়ী জননী। তবে কমলের কোন্ গুণের অভাব? মানবহৃদয়ের সকল বৃত্তির সমউৎকর্ষকে যদি মানবচরিত্রের উচ্চতম আদর্শ বলিতে হয়, তবে এই গ্রন্থ মধ্যস্থ অন্যান্য চরিত্রের উজ্জ্বলতা কমলের উজ্জ্বলতার নিকট ম্লান হইয়া পড়ে। কমলের ভাস্বর মধুর জ্যোতিঃর নিকট তাঁহাদের জ্যোতিঃ তেমন মধুর বোধ হয় না। সংসার সরসীউরসে যখন কমলের মত কমল ফুটিয়া উঠে, তখন আর কোন্ কুসুম তাহার মত সুন্দর দেখায়? সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে কমলমণি পত্নীর উচ্চ আদর্শ। কমলের চরিত্র মধুর হইতেও মধুর, সুন্দর হইতেও সুন্দর।

ঘাতপ্রতিঘাতে নগেন্দ্রের চরিত্রের সৃষ্টি। ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃতি কেমন করিয়া মানবহৃদয় অধিকার করে, আবার কেমন করিয়া তাহা দূর হয়, এই চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। নগেন্দ্রের প্রেমসূর্য্য সূর্য্যমুখীর দিকে চাহিয়াছিল—সহসা মেঘের ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ সূর্য্যমুখীকে চক্ষের অন্তরাল করিল—তিনি ভাবিলেন এই ক্ষণস্থায়ী আবরণছায়ায় বুঝি সত্যসত্যই জীবনের ছায়াস্নিগ্ধ পথ আছে; সেখানে বুঝি দুঃখজ্বালার তীব্রতাপ হৃদয় স্পর্শ করিবে না।

সূর্য্যমুখী শুকাইয়া উঠিলেন; সে মোহ আবরণও বাত্যাবাহিত শরতের লঘুমেঘের মত সরিয়া গেল। তখন জগতের কঠোর যাতনার মধ্যে তাঁহার আত্মভ্রম ঘুচিল; তখন মনে হইল:—

"সেই মায়া উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার!

সূর্য্যমুখীকে পাইলেন কিন্তু কুন্দ শুকাইয়া গেল। নগেন্দ্রের অভাব ছিল না। "কান্তরূপ; অতুল ঐশ্বর্য্য; নীরোগশরীর; সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা; সুশীল চরিত্র; স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী" সকলই তাঁহার ছিল। তাই তিনি চিত্তবৃত্তি দমন শিক্ষা করেন নাই আর চিত্তবৃত্তি দমন করিতে শিক্ষা করেন নাই বলিয়াই কুন্দকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়াছিল। এক জ্বালা ঘুচাইতে তিনি আর এক জ্বালার আশ্রয় লইলেন—মদ্যপান আরম্ভ করিলেন। তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; তখন তিনি চিত্তবৃত্তি দমন করিতে চাহিলেন, কিন্তু অগ্নি জ্বলিয়াছে—নিবিল না। সূর্য্যমুখীকে তিনি বলিলেন "আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখন তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।" বাস্তবিক এই বাক্য প্রবাহ যাতনার্ত্ত নগেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে অগ্নিপ্রবাহের মত বাহির হইয়াছে। হরদেবকে তিনি লিখিলেন "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।" ইহা সত্য কথা; তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। তিনি কুন্দনন্দিনীকে পাইলেন কিন্তু সূর্য্যমুখীকে হারাইলেন। বিচ্ছেদেই প্রেমের পরিপাক; সত্যসত্যই "বিরহে বাড়ায় তৃষ্ণা।" বিরহের করাল শ্মশানে দাঁড়াইয়া নগেন্দ্র বুঝিলেন, কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখী নহে। তখন তিনি আত্মভ্রম বুঝিলেন; বুঝিলেন কেন সূর্য্যমুখীর প্রেমে হৃদয় জুড়ায় নাই—বুঝিলেন সে প্রেমতৃষ্ণা জুড়াইবার নহে বলিয়াই জুড়ায় নাই। বুঝিলেন কেন কবি বলিয়াছেন:—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥"

কিন্তু তখন

"বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।"

তখন সূর্য্যমুখীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। মনে আশা ছিল কোথাও না কোথাও হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত সেই মুখ আবার দেখিতে পাইবেন;—প্রদোষে কমলের মত একখানি ম্লানমুখ আবার হৃদয় উজ্জ্বল করিবে। আবার

"তনু প্রকাশেন বিচেয় তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেবশর্ব্বরী"

সূর্য্যমুখীর বিষাদক্লিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্যই গ্রন্থকার প্রথমে তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন না। প্রেমের আরও পরিপাক, পরীক্ষা, পূর্ণতা হইল; তৃষ্ণা আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ হইল। নগেন্দ্র যে জ্ঞান লাভ করিলেন, যে শিক্ষা পাইলেন, তাহা আর ভুলিবার নহে। তখন একদিন দুঃখকাতর হতাশের সুখস্বপ্নের মত সূর্য্যমুখী আসিলেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; গ্রন্থকার বলিয়াছেন "অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখ ভোগই প্রধান শিক্ষা।"

দেবেন্দ্রের উপর যেমন রাগ হয়, ঘৃণা হয়, তেমনই দয়াও হয়। সে ত এমন ছিল না। মধুর পবনে কুসুমকলিকা কেবল ফুটিতেছিল, ঘটনাচক্রে ফুটিবার পূর্ব্বে সে পঙ্কিল স্থানে পতিত হইল; তখন তাহার কতকগুলি দল ফুটিল—ফুটিল, কিন্তু হৃদয়ে দুর্গন্ধ, পাপ লইয়া। দেবেন্দ্র পূর্ব্বে এমন ছিল না—তাহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল; হৈমবতী যদি সূর্য্যমুখী বা কমলমণি হইত, তবে হয় ত তাহা নিষ্কলঙ্কই থাকিত। গ্রন্থকার কমলাকান্তের দপ্তরে বলিয়াছেন, "সংসারশিক্ষা-শূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে।" স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া দেবেন্দ্র আপনার সর্ব্বনাশ সংসাধন করিল—পাপস্রোতে গা ভাসাইল। শেষ আবর্ত্তে পড়িয়া আর জ্ঞান রহিল না; সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখে সে হৃদয়ের শান্তি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কোন পাপেই আর তাহার বিতৃষ্ণা রহিল না। দেবেন্দ্র যখন বলিল, "আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ কর্ণে শুনি, তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।" তখন তাহার জন্য সত্যই দুঃখ হয়। সেই পাপাসক্তের নয়নে ঘটনাক্রমে কুন্দনন্দিনীর অপরূপ রূপরাশি পতিত হইল। পাপতৃষ্ণার উপর পাপতৃষ্ণা প্রবল হইল। তখন তাহার "কাঁটা ফুটে" মরার ভয় দূর হইয়া গিয়াছিল,

লোকলজ্জার নিষ্ঠুর দংশনের ভয়ে সে আর ভীত নহে। সে তখন "কলঙ্কের ফুল" খুঁজিতে লাগিল; হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজিয়া দত্তবাড়ী গেল—আরও নানারূপ পাপ উপায় অবলম্বন করিল। সে যে কুন্দকে পাইবার জন্য এত চেষ্টা করিল, সে হয়ত কেবল

" To sport an hour with Beauty's chain
Then throw it idly by."

পাপেই পাপের বৃদ্ধি—মধ্যে হীরা আসিয়া পড়িল। ক্রোধপরবশ দেবেন্দ্র, পাপময় দেবেন্দ্র তাহার সর্ব্বনাশ করিল—পাপের ভার পূর্ণ হইল—তাহার রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিল।

এই গ্রন্থে হীরা আর একটি প্রধান চরিত্র। হীরা দত্তবাড়ীর দাসী, সে অশিক্ষিতা বালবিধবা বলিয়াই পরিচিতা। তাহার ভরা যৌবন, দুর্লভরূপ, সে চঞ্চল স্বভাবসম্পন্না, বিলাসাসক্তিময়ী। এইরূপ যুবতীর অবনতির পথ শীঘ্রই পরিষ্কৃত হয়; হীরার অধঃপতন নিতান্ত শীঘ্র না হইলেও তাহার গভীরতা অত্যন্ত অধিক। সে দেবেন্দ্রকে দেখিল, দেবেন্দ্রের অতুল রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য—আপনার পাপ-উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ভাবিয়া সে হীরাকে আদর করিল;—হীরা মরিল। হীরা নিতান্ত সাধারণ রমণীর মত নহে; যখন সে দেখিল যে দেবেন্দ্র অন্যে আসক্ত, তখন দত্তগৃহের উদ্যানে তাহাকে শিক্ষা দিল—আপনার সর্ব্বনাশের পথ আপনি পরিষ্কৃত করিল। তখন সে ডুবিয়াছে। এদিকে দেবেন্দ্র ক্রোধান্ধ হইল—পয়োমুখ বিষকুম্ভের মত সে হীরার সর্ব্বনাশ সংসাধন করিল। "ঘুমের দেশে ভাঙ্গিল ঘুম"—হীরা আপনার অবস্থা বুঝিল। তখন তাহার পৈশাচিক ভাব ভীষণ প্রবল হইয়া উঠিল—তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি উত্তেজিত হইল; প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিই তাহার জীবনের গ্রন্থি সবল রাখিল। দেবেন্দ্রের প্রতি প্রতিহিংসা লইতে না পারিয়া সে কুন্দের প্রতি প্রতিহিংসা লইল—সহজেই তাহার প্রতিহিংসা লইতে পারিল, সরলা যুবতী আত্মঘাতিনী হইল। আবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। হীরা উন্মাদিনী হইল—অতীত পাপের স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া সে উন্মাদিনী হইল। দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পরেও গভীর রজনীতে উদ্যান মধ্যে, রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে উন্মাদিনী হীরা গাহিতেছে,—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

এই গ্রন্থমধ্যে নিতান্ত অল্প সময়ের জন্য আমরা দুই জনের সাক্ষাৎ পাই।

হরদেব ঘোষাল ও সুরেন্দ্র উভয়েই অত্যল্প কালের জন্য পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন; কিন্তু তাহাতেই তাঁহাদিগের মহত্ত্ব বুঝিতে পারি। তাঁহাদিগের জ্যোতিঃ ভাস্বর স্নিগ্ধ; চিত্রের পশ্চাৎভাগে তাঁহারা স্থাপিত—তথাপি তাঁহাদিগের জ্যোতিঃ হৃদয় আলোকিত করে।

বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি গুরুতর সামাজিক প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন বা প্রচলিত মতের বিরোধী মত পাঠকের মনে অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছেন। এমন অনেক কুসুম আছে ঊষার আলোক যাহাদিগকে কেবল প্রস্ফুটোন্মুখ করিয়া যায়; দীপ্ত সূর্য্যকরে তাহারা প্রস্ফুটিত হয়; তখন সমস্ত দলগুলি বিকশিত হয়। বঙ্গসাহিত্যের বিমল প্রভাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয়—"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন" বঙ্কিমচন্দ্র কথিত মতকে কেবল প্রস্ফুটোন্মুখ রাখিয়াছিলেন—তাহার বিকাশ পরে হইয়াছিল। বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর বিধবাবিবাহ হইয়াছে। শ্রীশচন্দ্রকে নগেন্দ্র যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বিধবাবিবাহের সপক্ষে মতগুলিও প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু বিবাহের আদ্যন্ত শোকোচ্ছ্বাসোদ্দীপক—সেই হইতেই বিপদের উপর বিপদের ঘন মেঘ আষাঢ়ের আকাশে জলভরা জলধরজালের মত আসিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র এমন ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন যে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে পুস্তক সমাপ্ত করিবার পর সে কথা আর মনে থাকে না। থাকে না বলিয়াই যে গুণ বা দোষের জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের "সংসার" সর্ব্বসাধারণে তেমন আদৃত নহে, সেই গুণ বা দোষসত্ত্বেও বিষবৃক্ষ সর্ব্বসাধারণে আদৃত। বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে যে মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন—সংসারে তাহার বিকাশ।

বিষবৃক্ষ অতি সুন্দর উপন্যাস; কিন্তু তাহা দোষবর্জ্জিত নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের কথা বলিতেছি না; এই গ্রন্থে একটি প্রধান দোষ দৃষ্ট হয়—সেটি সেই স্বপ্নদর্শন। কুন্দ স্বপ্নে তাহার জীবনের বিপ্লবকারী মূর্ত্তিযুগল দেখিতে পাইল—রেখায় রেখায় তাহাদিগের মূর্ত্তি মিলিল—আবার স্বপ্নে সে যাহা শুনিল তাহাই হইল। স্বপ্নের এইরূপ অজ্ঞেয় রহস্যময় অসীম ক্ষমতা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। দোষ সত্ত্বেও বিষবৃক্ষের মত সুন্দর উপন্যাস দুর্লভ। গ্রন্থকারের সহিত আমরাও ভরসা করি "ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"

প্রচারে প্রকাশিত "দুইটি হিন্দুপত্নী" নামক প্রবন্ধে, শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসু ভ্রমরের সহিত সূর্য্যমুখীর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সূর্য্যমুখীর আচরণফলে "যে যেখানে ছিল সকলেই শেষে সুখী হইল," নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী সন্তানাদি লাভ করিয়া পরম সুখে পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গেল।—দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী থাকিলে সেও নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর সঙ্গে তেমন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইত। কিন্তু ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হরিদ্রাগ্রামের রায়বংশ লোপ হইল, কৃষ্ণকান্ত রায়ের নাম ডুবিল, একটা সংসার, একটা সম্পত্তি, একটা ঐশ্বর্য্য ছারখার হইয়া গেল।" তাহার পর লেখক বলিতেছেন "বুঝিবা পরিণামের এই ভীষণ, এই শোচনীয় প্রভেদ ভাবিয়া সূর্য্যমুখী যে ধাতুর পত্নী, সংস্কৃত সাহিত্যে সেই ধাতুর পত্নীত্বের এত গৌরব করা হইয়াছে।" দুঃখের বিষয় আমরা শ্রদ্ধেয় লেখকের এই মতের অনুমোদন করিতে সমথ নই। আমাদিগের বিশ্বাস যে দেশ কাল ও পাত্রভেদে আচরণের প্রভেদ হইয়া থাকে;—ভ্রমরের অবস্থায় ভ্রমর যাহা করিয়াছিল তাহাতে তাহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহে। গোবিন্দলালের পাপের প্রায়শ্চত্তের আবশ্যক ছিল। আর যদি সব লোপ হইল এবং গোবিন্দলাল ও ভ্রমর সন্তানাদি লাভ না করিয়া মরিল (!!!) তাহাতেই বা দোষ কি? যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, তবে তাহা গোবিন্দলালের। মহাভারতকার বলিয়াছেন যে, এ সংসারে পিতা পুত্রের কর্ম্মে বদ্ধ নহেন, পুত্রও পিতার কর্ম্মে আবদ্ধ নহেন,—সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকেন। গোবিন্দলাল স্বেচ্ছায় যে বিষপান করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি অবশ্যই ভোগ করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন "বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল, এই দুইখান পুস্তককে যদি উপন্যাস বল, তবে দুই খানিই হিন্দু উপন্যাস, যদি কাব্য বল তবে দুই খানিই হিন্দু কাব্য।" কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার স্থান এ নহে; তবে বিষবৃক্ষ সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিবার আছে। "যদি হিন্দু উপন্যাস অর্থ এই হয় যে এই পুস্তকের অন্তর্গত সমস্ত প্রধান চরিত্রই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তবে পুস্তক পাঠ করিয়াও যে তাহা বুঝে নাই, বৃথা তাহার পুস্তক পাঠ; আর যদি ইহা হিন্দুর জন্য রচিত এই অর্থ হয়, তবে বলিতে চাহি যে সাহিত্যক্ষেত্রে এমন

সুন্দর উপন্যাসখানিকে এমন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না। যাহা ভাল তাহা সর্ব্বদাই ভাল, যাহা মন্দ তাহা সর্ব্বত্রই মন্দ। ইহা কোন ঘটনাবিশেষের কথা নহে, ইহা মতের কথা। একখানি ভাল উপন্যাস হইতে একটী ভাল কবিতা হইতে, একখানি সুন্দর চিত্র হইতে আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে, তবে পণ্য দ্রব্যের মত তাহাতে হিন্দুত্বের ছাপ দেওয়া কেন? । ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে একটা প্রস্ফুট সৌন্দর্য্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে, লোক চক্ষুর অন্তরালে হিন্দুত্বের নিভৃত অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যরূপে এই পুস্তকখানি রাখিতে ইচ্ছা হয় না। তাহাতে কি বিশেষ উপকার বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

তুকারাম।

একাদশ প্রস্তাব।

এইরূপে দিন দিন তুকারামের প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তিমান ও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ভাবিয়া, অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গ্রামে গ্রামে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত ও গৃহে গৃহে তাঁহার অভঙ্গ সমূহ গীত হইতে লাগিল। অতি দূরদেশ হইতেও আর্ত্ত, পীড়িত ও ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিলেন। সমাজের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া থাকা একদিকে যেমন ক্লেশকর, অতিরিক্ত পরিচিত হওয়াও অপর দিকে তেমনই অসুবিধাজনক। সাধুগণের পক্ষে এরূপ সমাদর ভাজন হওয়া আরও বিশেষরূপ ধর্ম্ম-বিদ্রোহোৎপাদক। তাহাতে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, এবং আহার, বিহার এমন কি নিয়মিত পূজা, পাঠ প্রভৃতিতেও স্বাতন্ত্র্য থাকে না। জনসমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে তুকারামকে এই অসুবিধা বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কেহ তাঁহাকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার পাঠাইতেন, কেহ তাঁহাকে সুমিষ্ট খাদ্য ভোজন করাইতে চাহিতেন, কেহ বা তাঁহাকে দেবাবতার বা দেবানুগৃহীত পুরুষ ভাবিয়া, অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেন। নিস্পৃহ ও বিনয়ী তুকারামের এ

সকল ভাল লাগিত না। সাধ্যানুসারে তিনি সকল প্রকার সাংসারিক সম্পদ ও গৌরব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে কেহ ব্যথিত হন, এই ভাবিয়া, সম্পূর্ণরূপ নিজের ইচ্ছানুসারেও চলিতে পারিতেন না। ইহার উপর আরও বিপদ ছিল। মৃতবৎসা আসিয়া তাঁহার নিকট সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেন, বিষয়ী নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য অনুরোধ জানাইতেন; দিন নাই, রাত্রি নাই, দলে দলে লোক আসিয়া নানা প্রকার উপরোধ শুনাইতেন। এই সকল কারণে যেরূপ সংযম ও বিরাগের সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে তুকারামের ইচ্ছা হইত, সকল সময় তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। তিনি দুঃখিতচিত্তে ভগবানের নিকট বলিতেন, "প্রভো, আর কেন, এইবার আমাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া চল।" অনবরত ব্রত উপবাস ও জগারণ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার শরীরও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল; অথচ মানসিক পরিশ্রমের বিরাম ছিল না। ভক্তবৃন্দকে সমাগত দেখিলেই তিনি সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইতেন; এবং নূতন নূতন অভঙ্গ রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন; তখন আর শরীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। তাঁহার পৃথিবীর প্রবাসকাল যে সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, জীবনী শক্তি হ্রাসের সঙ্গে তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। ক্রমশঃ ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভাবস্থার ন্যায় তাঁহার জীবনে পুনর্ব্বার বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য লক্ষিত হইল। মন পার্থিব কোন বস্তুতেই স্থির থাকিত না। এক স্থানে বসিয়া আছেন, হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি।" হরি কথা ভিন্ন অন্য কথা আর মুখে আনিতেন না। দিবা রাত্রি হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন এবং প্রতি গ্রাসে ও প্রতি নিশ্বাসে হরিনাম স্মরণ করিতেন। সঙ্কীর্ত্তন কালে প্রায়ই বলিতেন, "হে পণ্ঢরীশ, তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা আর অধিক কষ্টকর কি আছে? আমার আয়ু পরিমিত করিতে চাও, কর, কিন্তু প্রভো, এই করিও, যেন আমার শক্তির হ্রাস না হয়, যেন প্রভো, আমি শক্তির অভাবে তোমার গুণগান করিতে অসমর্থ না হই।" কি মধুর প্রেম! কি অহেতুকী ভক্তি! এরূপ ভক্তি না থাকিলে কি কখনও ভগবানের কৃপার অধিকারী হইতে পারা যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লোহগ্রামের লোকেরা তুকারামের সঙ্কী-

র্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তুকারামের সঙ্গ লাভ দ্বারা লোহগ্রামবাসিগণ ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ-জনিত সদাচরণ গুণে তাঁহাদিগের পার্থিব সম্পদও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। লোহগ্রামবাসিগণ তুকারামকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তুকারামও তাঁহাদিগের প্রতি তেমনই স্নেহবান ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি অভঙ্গে তিনি লোহগ্রাম সম্বন্ধে আপনার সস্নেহ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি লোহগ্রামে যাইয়া এক মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময় মহারাষ্ট্রীয়গণের সঙ্গে মুসলমানদিগের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল এবং লুণ্ঠন, হত্যা ও গ্রাম উৎসাদন প্রভৃতি নিষ্ঠুর কার্য্য তখন মহারাষ্ট্রদেশে একরূপ দৈনিক ঘটনাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তুকারামের অবস্থান কালে লোহগ্রাম "পরচক্র" দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে, তাহার অধিবাসিগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। গ্রামবাসিদিগকে নিরুৎসাহিত ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া তুকারাম তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিলেন। সকলকে একত্র করিয়া তিনি সুমিষ্ট বাক্যে বলিলেন; "যে ধন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা গিয়াছে, তাহা ভগবানেরই বিধানে গিয়াছে; সুতরাং তাহা তাঁহারই সেবায় উৎসৃষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, সকলে শোক সম্বরণ কর। অন্তরাত্মাস্থিত নারায়ণই সকল প্রকার সুখ দুঃখের ভোক্তা; শরীরে তপ্ত অঙ্গার পতিত হইলে, তিনিই দুঃখ ভোগ করেন; সুতরাং দুঃখ কখনও জীবের নিজের নয়। ভগবান যখন, বিনা মূল্যে, কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য, তখন অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া চিন্তা কি?"

তুকারাম এইরূপে গ্রামবাসিদিগকে অবস্থানুরূপ সান্ত্বনা দান করিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁহার স্বভাবত কোমল হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত ও উদাসভাবাপন্ন হইল। তুকারামের নিজের যদিও কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু সাধারণের ক্ষতিতে তিনি নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্তের ন্যায় বোধ করিলেন। শত্রুহস্তে উৎসাদিত গ্রামের দৃশ্য অতি শোচনীয়। ভস্মাবশেষ গৃহ, পদদলিত শস্যক্ষেত্র, ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হতাহত জীবদেহ এবং লুণ্ঠিত-বিত্ত ও বিপন্নদিগের অশ্রুসিক্ত মুখ দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। এই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দর্শন করিয়া তুকারাম সংসারের অনিত্যত্ব আরও সুস্পষ্টরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি ভগবানকে কেবলই বলিতেন, "প্রভো

এই মর্ত্ত্য লোকে বাস আমার যথেষ্টই হইয়াছে, এইবার আমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া চল।" তুকারামের উপদেশ গুণে লোহগ্রামবাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই সাংসারিক সুখে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই আকস্মিক বিপৎপাতে সে শিক্ষা সম্যক্‌রূপ ফলদায়িনী হইল। পার্থিব সম্পদের অসারত্ব বুঝিয়া, লোহগ্রামের অনেকে, ধর্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য, তুকারামের সঙ্গে দেহুতে আগমন করিলেন।

তুকারামের দেহুতে প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরে দোলযাত্রার উৎসব উপস্থিত হইল। সাধারণতঃ দোলযাত্রা উপলক্ষে অনেক বীভৎস আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তুকারাম সে সকল রহিত করিয়া গ্রামস্থ সকলকে কেবলই হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে "হোলির" কুৎসিত আমোদ রহিত হওয়াতে, দেহুগ্রাম সে বার নির্ম্মল ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইল। পূর্ণিমা গত হইলে, প্রতিপদের দিন তুকারাম সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। সে রাত্রিতে তিনি যে ২৪টী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা "কায়াব্রহ্মকরণ" অর্থাৎ "ব্রহ্মে দেহ-সমর্পণ" নামে পরিচিত। সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রাভাতিক আরতি সমাপনান্তে তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দানপূর্ব্বক হরিনাম ঘোষণা করিতে করিতে, মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন এবং অবলাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে এস"। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তুকারাম কোন তীর্থে যাইতে হইলে সকলকে বলিতেন যে, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি," সুতরাং অবলাই সহজেই মনে করিলেন যে, তুকারাম এবারও কোন তীর্থে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তাঁহার অভ্যাসানুরূপ "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম" বলিতেছেন। সেই জন্য তিনি সে কথায় কোন উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি সসত্ত্বা, গৃহে শিশুসন্তানগুলিকে ফেলিয়া এবং সংসারের ভার ছাড়িয়া কেমন করিয়া তোমার সঙ্গে যাইব।" তুকারাম এই কথা শুনিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম, আর গৃহে ফিরিব না।" ইহার পর আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন;—

আত্মজন, পরজন, যে হও সে হও।
পাণ্ডুরঙ্গ শ্রীচরণে শরণ গে লও॥
জানায়ো প্রণাম মোর গুরুজনগণে।
শেষ নিবেদন মোর রাখিও স্মরণে॥

পড়ে যদি মধুভাণ্ডে মক্ষিকা কখন।
সে কি আর উঠিবারে চাহে কদাচন ॥
সময় বারেক যদি গত কভু হয়।
সেও আর কোন দিন ফিরিবার নয় ॥
সিন্ধু সনে ভাগীরথী হয় যদি লীন।
ফিরিতে পশ্চাতে সে কি চাহে কোন দিন ॥
এই নিবেদন তবে চরণে সবার।
যাইতেছে তুকারাম ফিরিবে না আর ॥

অনন্তর নিজের পত্নীর কথা উল্লেখ করিয়া, অনুগত ও শিষ্যদিগকে বলিলেন ;—

"যা ছিল প্রাণের কথা বলেছি সকল।
একটী এখনও বাকী রয়েছে কেবল ॥
চলিলাম আমি আজ অমর-সদনে।
রহিলেন পত্নী মোর মরত ভবনে ॥
জান সবে গৃহকার্য্যে নহে সে চতুরা।
নাহি মুখে মিষ্টবাণী, বড়ই মুখরা ॥
কি বলিব সাধুগণ, তোমা সবে আর।
মোর অনুরোধে সবে লয়ো তার ভার ॥
বহু উপকারে আমি আছি তার ঋণী।
বসনে বাঁধিয়া তারে করেছি গৃহিণী ॥ *
পাণ্ডুরঙ্গ, ঋণ তার করো বিমোচন।
খুলে দাও উভয়ের দাম্পত্যবন্ধন ॥
তুকা বলে দয়াময় হরির কৃপায়।
ঋণ শোধি তুকারাম মুক্তি পথে ধায় ॥

ইহার পর সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন ;—

চলিনু আপন দেশে শুন বন্ধুগণ।
"রাম রাম" সবে মোর করহ গ্রহণ ॥ †

* বিবাহের সময় দম্পতী পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বদ্ধ হন। তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, বোধ হয় তুকারামের ইহাই বলা উদ্দেশ্য। আমাদিগের দেশেও বর কন্যাকে "গাঁটছড়া" বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

† "আমার রাম রাম গ্রহণ করিও" অর্থাৎ আমার বিদায় কালীন নমস্কার অবগত হইও। "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার প্রথা মহারাষ্ট্রদেশে প্রচলিত আছে।

এই হল শেষ দেখা সকলের সনে।
ভবের সম্বন্ধ পাশ ছিন্ন এত দিনে ॥
সবার চরণে আমি করি এই নতি।
দীন আমি, কৃপা সবে রেখ মোর প্রতি ॥
যাই আমি, বন্ধুগণ, যাই নিজ ধাম।
বল সবে "রাম কৃষ্ণ বিষ্টলের" নাম ॥

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বিঠোবাকে প্রণামানন্তর, তিনি নাম ঘোষণা করিতে করিতে, সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। তুকারাম বলিয়াছিলেন যে, "আর আমি প্রত্যাগমন করিব না ; সেই জন্য যদিও কেহ কেহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে এরূপ বৈকুণ্ঠগমনের কথা বলিতেন বলিয়া, তিনি যে এবার সত্য সত্যই মহা-প্রস্থান করিবেন, তাহা কাহারও প্রত্যয় হয় নাই। তাঁহারা ভাবিলেন, হয়ত তিনি কোন বহুদূরস্থ দুর্গম তীর্থে গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সেই জন্যই এরূপ কথা বলিতেছেন। তাদৃশ সঙ্কট বহুল সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার প্রিয়শিষ্য রামেশ্বর ভট্টকেও এ বিষয়ে অনুরোধ জানাইতে বলিলেন। তুকারামের অনু-গামিগণ যখন এইরূপ পরামর্শ করিতেছিলেন,তুকারাম তখন সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে একবারে ইন্দ্রায়নী তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি তাঁহার অন্তিমপ্রার্থনা সূচক কয়েকটী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। তুকারামের ভক্তিমান চরিতাখ্যায়ক মহীপতি বলেন যে, সেই সকল অভঙ্গ গীত হইবার পর, সহসা দিব্য জ্যোতিতে তাঁহার পার্শ্বচরদিগের চক্ষু ঝলসিত হইল এবং তাহার পর তাঁহারা নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তুকারাম কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিগণ তুকারামের এইরূপ অন্ত-র্দ্ধান ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান নাই ; কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবগণ দেখিলেন যে, স্বর্গ হইতে দেবগণবেষ্টিত বিমান অবতীর্ণ হইল এবং শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে ও গন্ধর্ব্বগণের নাম ঘোষণায় আকাশ পরিপূর্ণ হইল। তুকারাম দেবগণে বেষ্টিত হইয়া, দেবরথে আরোহণপূর্ব্বক, সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন। ভারতের অন্যান্য অনেক সাধু পুরুষের ন্যায় তুকারামেরও তিরোভাব এইরূপ অলৌকিকতায় জড়িত হইয়াছে এবং তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কোথায় ও কি ভাবে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয়

করিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার কোন চরিতাখ্যায়ক অনুমান করেন যে, হয় ত যে সময় তুকারামের শিষ্যগণ তাঁহার শেষ সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, তুকারাম সেই সময় ইন্দ্রায়নীতে অবতরণপূর্ব্বক "জলসমাধি" গ্রহণ করিয়াছিলেন। জলসমাধি গ্রহণের প্রথা মহারাষ্ট্রদেশে যেরূপ প্রচলিত ছিল, তাহাতে তুকারামের ন্যায় বীতরাগ পুরুষের পক্ষে তাহা অবলম্বন করা অসম্ভব নহে। তুকারাম যেখানে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে এখনও নির্দ্দেশ করে, ইন্দ্রায়নীর সে স্থান অতি গভীর এবং শিশুকাদি জল জন্তুতে পরিপূর্ণ। গভীর জলের জন্যই হউক, বা এই সকল জলজন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই হউক, তুকারামের দেহ আর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তুকারাম সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তুকারামের চরিতাখ্যায়ক উপরি উক্তরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তুকারামের তিরোভাব সম্বন্ধে এইরূপ আরও দুই একটা অতিলৌকিক মত প্রচারিত আছে। সে সকলের আলোচনায় কোন লাভ নাই। দেহুতে তুকারামের বংশধরদিগের গৃহে তাঁহার অভঙ্গ সমূহের যে পাণ্ডুলিপি এখনও রক্ষিত ও অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে এবং যাহা ইন্দ্রায়ণী হইতে উদ্ধৃত পাণ্ডুলিপি বলিয়া সেখানকার লোকে এখনও বিশ্বাস করেন, তাহার শেষে এইরূপ লিখিত আছে "১৫৭১ শকাব্দের ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া তিথির প্রাতে তুকারাম তীর্থ প্রয়াণ (বৈকুণ্ঠ গমন) করিয়াছিলেন।" ইহাতে কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহাই তাঁহার পরলোক গমন সম্বন্ধে অমিশ্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; ইহার অতিরিক্ত কিছু নির্দ্দেশ করিতে হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তুকারামের তিরোভাবের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার শিষ্যবর্গ এবং অবলাইও হাহাকার করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তুকারাম হয়ত জল হইতে পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারেন, বা তীর্থযাত্রা হইতে বিরত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন, এই আশায় সকলেই ইন্দ্রায়ণীর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে অপর সকলেই গৃহে প্রতিগমন করিলেন; কেবল রামেশ্বরভট্ট প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটী ভক্তিমান শিষ্য তাঁহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত না হওয়া

পর্য্যন্ত সে স্থান ত্যাগ করিব না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহীপতি বলেন, চতুর্থ দিনে তুকারাম তাঁহাদিগের জন্য স্বর্গ হইতে আপনার ব্যবহৃত একটী বাদ্য ও পরিচ্ছদ নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার সংবাদ স্বরূপ কয়েকটী অভঙ্গও প্রেরণ করিলেন। তখন তাঁহারা তুকারাম নিশ্চয়ই পরলোক গমন করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, স্নানশুদ্ধি সমাপনান্তে বিঠোবাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।*

তুকারামের তিরোভাবকালে অবলাই সসত্ত্বা ছিলেন। তুকারাম পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার গর্ভে এবার যে সন্তান জন্মিবে তাহার নাম নারায়ণ রাখিও, সে বিশেষ ভক্তিমান হইবে।" তুকারামের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। নারায়ণ সত্য সতাই পরম ভক্তিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি অভঙ্গ এখনও মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে। তুকারামের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে শিবাজী একবার দেহুতে আগমন করিয়াছিলেন। তুকারামের পুত্রদিগকে বিশেষতঃ নারায়ণকে ভক্তিমান ও পিতৃপথাবলম্বী দেখিয়া, তিনি তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য কয়েকখান গ্রাম জায়গীর দান করিয়াছিলেন। তুকারামের বংশধরগণ অদ্যাপি তাহা ভোগ করিতেছেন।

তুকারামের জীবনের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। সাধারণতঃ সাধুদিগের জীবন যেরূপ ঘটনাশূন্য হইয়া থাকে, তুকারামের জীবন সেরূপ নহে। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। সুখ দুঃখের যে অভিজ্ঞতা হইতে মনুষ্যের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তুকারামের জীবনে তাহা যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। সম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি পিতা মাতার পরম আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। সামাজিক রীতি অনুসারে অল্পবয়সে বিবাহ করাতে তরুণ যৌবনেই তাঁহাকে সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হইয়াছিল। বিষয় বুদ্ধির তাঁহার অভাব ছিল না। যে কয়বৎসর তিনি পৈত্রিক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্টই উন্নতি হইয়াছিল। সুতরাং পিতামাতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম, নবজাত পুত্রের মায়া এবং অর্থের মোহ প্রভৃতি, সকল প্রকার সাংসারিক প্রলোভন একত্র সম্মিলিত হইয়া,

* এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার দিনই তুকারামের তিরোভাবের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই দিনে এখনও প্রতি বৎসর তুকারামের স্মরণার্থ দেহুতে একটী মেলা হইয়া থাকে।

তাঁহাকে শত বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিল। পৃথিবীর কোটী কোটী জীবের ন্যায় তিনিও বিষয়ের সেবায় নিমগ্ন থাকিবেন, এ অবস্থায় ইহাই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে পথের কাঙ্গাল করিয়াছিলেন এবং ভিকারিণী শচীমাতার সর্ব্বস্বধন শ্রীচৈতন্যকে তাঁহার অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার সাভিলাষ দৃষ্টি তুকারামেরও উপর নিপতিত হইয়াছিল। পৃথিবীর শোক, তাপ, হিংসা ও অশান্তি প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য, তিনি তুকারামকে আপনার সৈনিকরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। পিতামাতার আকর্ষণ, পত্নীর বাহুপাশ দূরে থাকুক, লৌহের শৃঙ্খলে পদদ্বয় আবদ্ধ থাকিলেও, ভগবানের চিহ্নিত সৈনিক তুকারামের সাধ্য ছিল না যে, তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন। বিশ্বরাজের রণভেরীর অহ্বানে তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। তাঁহার বন্ধনও একে একে ছিন্ন হইতে লাগিল। পিতা, মাতা, এবং তাঁহার ভ্রাতৃজায়া উপর্য্যুপরি পরলোক গমন করিলেন। ভ্রাতা সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্নেহাস্পদ পুত্র শৈশব অতিক্রান্ত না হইতে হইতেই পিতামাতাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। বণিকের পক্ষে যাহা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর তুকারামের সেই জাতীয় ব্যবসায়েও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তুকারাম প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিলেন না। অর্থ, পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব, স্বজাতীয়গণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা সকলই ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল এবং সর্ব্বশেষে তাহার রোগজীর্ণা পত্নী অর্থাভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবানের এমনই বিচিত্র কৌশল যে, যাহা একের পক্ষে বিষ, অপরের পক্ষে তাহাই অমৃত স্বরূপ হইয়া থাকে। তুকারাম যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, অনেকের পক্ষে নাস্তিকতাই তাহার পরিণাম। কিন্তু শিশু যেমন মাতার নিকট প্রহৃত হইলেও মাতাকেই দৃঢ়রূপে ধারণ করে, তুকারামও তেমনই সেই বিশ্বজননীর নিকট নিগৃহীত হইয়া তাঁহাকেই অবলম্বন করিলেন।

স্বর্ণকার স্বর্ণের শ্যামিকা দূর করিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ করে, ভগবানও আপনার প্রিয়তম সন্তানগণের নির্ম্মলত্ব প্রতিপাদনের জন্য, তাঁহাদিগকে সংসারের প্রচণ্ড অনলে নিক্ষেপ করেন এবং সেই অগ্নি পরীক্ষা দ্বারাই তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধত্ব সাধিত হয়। তুকারামের সমস্ত জীবনই এক সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষা বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

সংসারের অসারত্ব বুঝিয়া তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে মুক্তিমার্গ গমনে উদ্যত পদ দেখিয়া আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবাসিগণ চতুর্দ্দিক হইতে নিবারণের জন্য ধাবিত হইলেন। কেহ তাঁহাকে উন্মাদ এবং কেহবা নির্ব্বোধ, ভাবিয়া তিরস্কার করিলেন। তুকারাম যখন তাহাতে বিচলিত হইলেন না, তখন বিদ্রূপ, কটূক্তি ও তাহার পর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। কণ্টকের যষ্টিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, এবং তাঁহার সর্ব্বস্বধন বিঠোবার চরণে উৎসৃষ্ট অভঙ্গগুলি ইন্দ্রায়ণীতে নিক্ষিপ্ত হইল। গৃহে শান্তি থাকিলে মনুষ্য এ সকল বাহিরের অত্যাচার কোন রূপে সহ্য করিতে পারে; কিন্তু তুকারামের পক্ষে সে শান্তির কণামাত্রও ছিল না। এক রজ্জুতে বদ্ধ বিপরীতমার্গগমনেচ্ছু পশুদ্বয়ের ন্যায় তিনি ও তাঁহার পত্নী বহুদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের কণ্ঠ বেদনারই কারণ স্বরূপ ছিলেন। * তুকারাম যখন কোন রূপে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন সাধুজনের পক্ষে যে পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, তাহা উপস্থিত হইল। পুষ্প বিকসিত হইলে মধুমক্ষিকাগণ দলে দলে আসিয়া তাহার মধুলুণ্ঠন করিতে থাকে, শেষ বিনিময়ে আপনাদিগের পদরেণু রাখিয়া তাহাকে কলুষিত করিয়া যায়। সাধুপুরুষদিগেরও সদ্‌গুণের কথা শুনিলে মক্ষিকাবৃত্ত লোক দলে দলে ধাবিত হয়, এবং অতিরিক্ত প্রশংসা দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আত্মাভিমান উৎপাদন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে বিমলিন করিয়া যায়। তুকারামের নাম সাধারণের নিকট পরিচিত হইবার পর হইতেই তাঁহার নিকট লোক-সমাগম আরব্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছত্রপতি শিবাজী হইতে পুত্রহীনা দরিদ্রা বিধবা পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিতেন; শিষ্য, সেবক ও অনুরক্ত জনের সংখ্যা ছিল না। অর্থের এবং প্রশংসার প্রলোভন অজস্রধারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু

---

* তুকারামের সাংসারিক অশান্তির বিষয় আমরা যথাস্থলে উল্লেখ করিয়াছি। অবলাইয়ের বাক্যবাণে প্রথম প্রথম তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অবলাই পতিকে কেবল তিরস্কার করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না; মহীপতি বলেন যে একবার তুকারাম কতকগুলি ইক্ষু দরিদ্র বালকদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, অবলাই তাঁহার পৃষ্ঠে একগাছি ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন। তুকারাম তাহাতে কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন, অবলাইয়ের আমার প্রতি এতই ভালবাসা যে আমাদিগের দুই জনের জন্য অবলাই ইক্ষুটীকে দুই খণ্ড করিয়া লইলেন। তুকারাম এ বিষয়ে সক্রেটিসকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন।

তুকারাম তাহাতে বিমুগ্ধ হইলেন না। প্রশংসার মাদকতা উপলব্ধি করিয়া তিনি তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন, এবং লক্ষপতির সম্পদ উপেক্ষা পূর্ব্বক ভিক্ষুকের জীর্ণকন্থা নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। উৎপীড়নে অক্ষুণ্ণ, প্রশংসায় অবিচলিত এবং ঐশ্বর্য্যে অনাকৃষ্ট থাকিয়া, তিনি ভগবানের নামামৃত স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে আদর্শ সকলের পক্ষে উপযোগী বা স্পৃহনীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার বিনয়, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার স্বার্থত্যাগ এবং তাঁহার ভগবদ্ভক্তি মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে অনুকরণীয়। আত্মসংযম, ভূতানুকম্পা এবং অহেতুকী ভক্তি প্রভৃতি প্রকৃত সাধুর যে সকল লক্ষণ তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াও তিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং ঘোর অত্যাচারীকেও প্রেমালিঙ্গন দানে বশীভূত করিয়া হরিনামামৃত বিতরণে কৃতার্থ করিতেন। বহিরঙ্গ ধর্ম্ম দেশ এবং জাতি অনুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে জাতিগত বা দেশগত কোন পার্থক্য নাই। সকল দেশীয় এবং সকল সম্প্রদায়স্থ সাধুগণকেই তাহাতে সমতুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে তুকারাম যে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, যে কোন দেশীয় সাধুপুরুষেরই পক্ষে তাহা গৌরবজনক। ভেদ-বুদ্ধি-বিমূঢ় মনুষ্য সমাজ সাম্প্রদায়িকতা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত সাধুপুরুষের সমাদর করিতে শিক্ষা করিলে, তুকারাম সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বজাতীয় "সাধু" রূপেই পরিগণিত হইবেন।

তুকারামের অবলম্বিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। যদিও তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত করিয়া যান নাই, কিন্তু এক বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বদেশে এক নূতন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের দুরভিগম্যতা দূর করিয়া তিনি তাহাকে সাধারণের সুপ্রাপ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আচণ্ডাল সকলেই যে ভক্তিগুণে মুক্তিলাভ করিতে পারেন এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে হইলে যে বাহ্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না, তাহা তিনি লোকের প্রতীত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে তাঁহার স্বদেশীয়গণ ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, প্রকৃত সাধুতা কেবলই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র সম্পত্তি নহে। আকরাস্থিত রত্নের ন্যায় নীচ কুলেও প্রকৃত সাধু পুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে। তুকারাম আজীবন

হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপে এবং শাস্ত্রোপদেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান যে অতি অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার অনেকগুলি অভঙ্গে তিনি তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার অভঙ্গ সমূহে নিম্নলিখিত ভাবগুলি পরিস্ফুট হইবে।

১ম। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সকল অবস্থাতেই শ্রীভগবানকে ভক্তি করিবে।

২য়। ত্রাতা, পাতা ও শরণ্যরূপে তাঁহাতেই নির্ভর করিয়া থাকিবে।

৩য়। তিনি কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য; বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না।

৪র্থ। জীবের প্রতি অনুকম্পা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, আত্মানুভূতি এই সকলই প্রকৃত ধর্ম্মের অঙ্গ। ভস্মলেপন বা জটাধারণ ধর্ম্মের অতি নিকৃষ্ট অংশমাত্র।

৫ম। দ্বিজ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ভগবানের কৃপার অধিকারী। জাতি বা বংশের সঙ্গে ভগবৎকৃপার সম্বন্ধ নাই।

৬ষ্ঠ। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং অতি মধুর। তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে নহেন। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি।

ইহাই তুকারামের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, এবং ইহা দ্বারাই তিনি মহারাষ্ট্র দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ যদিও ধর্ম্মের বিভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের সহিত জীবের নৈকট্য সংস্থাপনই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যে ধর্ম্মে সে উদ্দেশ্য যতই সম্পাদিত হয়, সে ধর্ম্ম ততই উচ্চ। এই উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য ভগবানকে কেহ রাজা, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ সখা, কেহবা প্রিয়তম নায়করূপে কল্পনা করিয়াছেন। ভগবান কাহারও কিছু নহেন, অথচ তিনি সকলেরই সকল। যিনি যে ভাবে তাঁহাকে আরাধনা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। নায়কভাবে ভগবানকে আরাধনা বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ। দুর্ভাগ্যক্রমে এই আদর্শ হইতে পাত্র বিশেষে অতি বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে। তুকারাম যদিও বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতের অনুরূপ ছিল না। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় তিনি জীব ও ভগবানের মধ্যে

পরকীয় নায়ক নায়িকাভাব কল্পনা করেন নাই। ভগবানকে প্রাণারাম পতিরূপে তিনি অনেক স্থলে আহ্বান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁহাকে পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ, শরণ্য ও আশ্রয়দাতারূপে ভজনা করিতেও বিস্মৃত হন নাই। জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় ভগবানের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, তাহাতে ভগবানে পরকীয় নায়কত্ব ভাব আরোপ করা কেবল ধর্ম্মের বিকৃতিকরণ মাত্র। ওতপ্রোত ভাবে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হইবার বাসনা হইতেই এই নায়কভাবের উৎপত্তি। কিন্তু জীবের বর্ত্তমান অপূর্ণ ও কলুষিত অবস্থায় সাধ্য কি যে, সেই পূর্ণস্বরূপ নিষ্পাপ পুরুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইতে পারে। সুতরাং প্রাণারাম পতি ও সখারূপে ভজনার সঙ্গে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব মূলক রাজ ভাব ও পিতৃভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে তুকারামের আদর্শই অতি মহান্ ও স্বাভাবিক বলিয়া আমাদিগের প্রত্যয় হয়।

যে লালসাময় মাদকতাপূর্ণ ভাবের জন্য, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরও গ্রন্থ অনিষ্টোৎপাদক হইয়াছে, তুকারামের কবিতায় তাহা লক্ষিত হয় না। তাঁহার কবিতা ভাগীরথীর সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ, নির্ম্মল ও তৃপ্তিকর; তাহা পান করিলে তৃষ্ণা দূরীভূত হয়, অথচ তাহাতে অবসাদ উৎপন্ন হয় না। যখন মহারাষ্ট্র দেশ কর্ম্মকাণ্ডের প্রাবল্যে শুষ্কমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তুকারাম সেই সময়ে সেখানে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতগণ যখন তর্কবলে "সপ্ত ব্রহ্ম-স্থাপন" ও "সপ্ত-ব্রহ্ম নিরসন" করিতেন, বিদ্যাভিমান শূন্য তুকারাম এই সময় সেখানে আবির্ভূত হইয়া বিনীত ভাবে ভক্তিকথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান, তর্ক শক্তি, বা বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না। অথচ তাঁহার কথা শুনিলে বিষয়ীর বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইত, জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানগর্ব্ব দূরীভূত হইত এবং শুষ্ক হৃদয় তার্কিক ভক্তির অমৃতাশ্রুতে অভিষিক্ত হইত। একমাত্র ভক্তি বলেই তিনি লোকের হৃদয় বিগলিত করিতেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তুকারামের তাহা ছিল না, সেই জন্য পৃথিবীর অল্প লোকেই তাঁহার নাম অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তি নির্ভরশীলতা, জীবানুকম্পা, বৈরাগ্য, বিনয় প্রভৃতি গুণ, পৃথিবীর যে কোন সাধু মহাত্মারই পক্ষে স্পৃহনীয়। যে সকল ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বতী আপনাদিগের সত্তা বৃহৎ তরঙ্গিনীতে বিলুপ্ত

করে, তাহাদিগের নাম পৃথিবীর মানচিত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যকারিণী শক্তি তজ্জন্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কৃষকের শস্যক্ষেত্রের শ্যামলতা সম্পাদন করিয়া এবং তৃষ্ণার্ত্তকে অমৃত বারিতে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাহা চিরদিনই ধীর গমনে প্রবাহিত হইতে থাকে। তুকারামের অস্তিত্ব ভারতের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মপ্রচারকদিগের অস্তিত্বে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি তজ্জন্য বিলুপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর কত তাপ-ক্লান্ত পথিক কত শুষ্ককণ্ঠ নরনারী এখনও তাঁহার ভক্তিরস পূর্ণ কবিতায় তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। হিন্দুজাতি পুরুষকারে ও বলবীর্য্যে জগতের কোন কোন জাতি অপেক্ষা এক্ষণে নিকৃষ্ট হইলেও সহৃদয়তা, জীবানুকম্পা এবং ভক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণে জগতের কোন জাতি হইতে নিকৃষ্ট নহেন। লুণ্ঠিতবিত্ত ও অধঃপতিত হইলেও এই সকল গুণই এক্ষণে হিন্দুজাতির একমাত্র গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে এবং ইহাতেই হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব। যাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তগুণে হিন্দুজাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃতিগত এই সকল গুণ এখনও রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তুকারাম তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতর। হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব রক্ষা করা যদি গৌরবজনক ও প্রার্থনীয় হয়, তবে তুকারাম অবশ্যই হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইবেন এবং ভক্তি কথায় লোকের অনুরাগ বিলুপ্ত না হইলে, তাঁহার নাম ভারত ভূমি হইতে কখনও অন্তর্হিত হইবে না।

সম্পূর্ণ। *

* তুকারাম দীর্ঘকাল অবধি দাসীতে প্রকাশিত হইতেছে। তুকারামের কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিবার আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবেও পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় আমরা আপাততঃ সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলাম। কেহ কেহ তুকারাম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। তুকারামের জন্মভূমি দেহু, তাঁহার প্রিয় নদী ইন্দ্রায়ণী এবং তাঁহার আরাধ্যদেবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পণ্ঢরপুর দর্শন না করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। দাসীর পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা তুকারাম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ও নাম ধাম ইত্যাদি জানাইলে আমি আনন্দিত হইব। আপাততঃ কাহারও মূল্য প্রেরণের প্রয়োজন নাই। সে সম্বন্ধে পত্রাদি পরে লিখিত হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বৈদ্যনাথ দেওঘর।

রামপ্রসাদ বৈদ্য কি কায়স্থ ?

সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনী, জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভ্রমপূর্ণ মত প্রচারিত আছে, তাহার দূরীকরণার্থে আমি একটী প্রবন্ধ লিখি। বিগত শ্রাবণমাসের নব্যভারতে উহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের গ্রন্থ ও সঙ্গীতসমূহ পাঠ করিলে নিম্নলিখিত কথাগুলি ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতীতি হয়।

(১) রামপ্রসাদ বৈদ্যজাতীয় ও সেন উপাধিধারী।

(২) কুমারহট্টে তাঁহার বাসস্থান।

(৩) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্করভূমি ও কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন।

(৪) কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তোষার্থ রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত রাজাকে উপহার দেন।

(৫) বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

(৬) আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের সহিত সঙ্গীতসমর করিতেন।

(৭) রামদুলাল ভিন্ন রামমোহন নামে রামপ্রসাদের আরও এক পুত্র ছিল।

(৮) কাব্য ও গান রচনার সময় রামপ্রসাদের মাতা জীবিতা ছিলেন ইত্যাদি।

উপরি উক্ত ভ্রমগুলির সংশোধন ভিন্ন কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রতি বিদ্বেষপ্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। তবে সত্য কথাও অনেক সময় অপ্রীতিকর হয়। বিশেষতঃ ভ্রমের ভিত্তিতে স্বজাতিগৌরবের মঞ্চস্থাপন করিয়া যাঁহারা চিরকাল সুখে আসীন আছেন, সত্যের ভাষাটা তাঁহাদের কর্ণে স্বভাবতই নীরস বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যাঁহারা সেই সত্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে ইহাঁদের নিকট বালক, চপল, বাতুল, অভদ্র প্রভৃতি সম্ভাষণ পাইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি ? এই জন্যই 'দাসী'তে (১৮৯৫ সেপ্টেম্বর অক্টোবর) আমাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদস্থলে জনৈক লেখক যে পুষ্পাবর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হই নাই।

প্রতিবাদ-লেখক আরম্ভেই বলিয়াছেন—প্রবন্ধলেখক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামগতি ন্যায়রত্নকে গালি দিয়াছেন, বৈদ্যদিগকে কেবল চিকিৎসা-

ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, বৈদ্যেরা জমিদার ছিলেন না বলিয়াছেন, বৈদ্যজাতির উপর ইহার বিদ্বেষ, ইনি কায়স্থ ভাল বাসেন, ব্রাহ্মণকায়স্থ না লিখিয়া কায়স্থব্রাহ্মণ লিখেন, অতএব ইহাঁর প্রবন্ধ অপাঠ্য, এ বালক, চপল,—ইহাঁর মাথা গরম হইয়াছে, আমি বৈদ্য ইহাঁর চিকিৎসা করিব।

এই সকল কথা হাসিয়া উড়াইবার উপযুক্ত, উত্তর দিবার উপযুক্ত নহে। তিনি যে ভাষায় অভ্যস্ত তাহা সকলের আয়ত্ত নহে। অতএব মৃদুহাস্য করিয়া আমরা তাঁহার তর্কের বিষয়সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব।

প্রতিবাদ-লেখকের আপত্তি রামপ্রসাদের জাতি লইয়া। তিনি স্বকীয় প্রবন্ধের নাম করিয়াছেন 'রামপ্রসাদ সেন'। তাঁহার বিশ্বাস রামপ্রসাদ বৈদ্য, আমরা জোর করিয়া তাঁহাকে কায়স্থ বলিতেছি। কিন্তু স্বকীয় প্রবন্ধে তিনি এই বিশ্বাসের কোন হেতু দেখাইতে পারেন নাই। প্রবন্ধের নাম করিয়াছেন রামপ্রসাদ সেন কিন্তু রামপ্রসাদের যে সেন উপাধি ছিল এমন কোন প্রমাণ তিনি প্রবন্ধে প্রদর্শন করেন নাই। রামপ্রসাদের সম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তা অনুসন্ধানের পরিচয় প্রবন্ধে পাওয়া যায় নাই। তিনি গুপ্ত কবিদিগের কথিত প্রবাদগুলি, স্বীয় সাধুভাষায় চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছেন মাত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই প্রতিবাদ লেখা তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে।

আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি।

(১) রামপ্রসাদের উপাধি দাস।

(২) তাঁহার ভগিনীপতির উপাধিও দাস।

(৩) রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ জমিদার।

(৪) রামপ্রসাদ চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন বা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন নাই। জমিদারির আমলা ছিলেন।

(৫) তাঁহার বঙ্গভাষায় গান ও গ্রন্থ লেখা।

(৬) তিনি কি গ্রন্থে কি গানে কোথায়ও সেন বলিয়া পরিচয় দেন নাই।

(৮) আজু গোসাঁইর কথা কল্পিত।

প্রতিবাদকারী আমাদের ১ম ও ২য় কারণ সম্বন্ধে বলেন—

(১) দাস শব্দ বিনয়ব্যঞ্জক।

(২) দাস হইলেই কায়স্থ হইবে এমন কোন কথা নাই। বৈদ্য দাসও আছে।

(৩) ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস সহোদরাভগিনীপতি না হইতে পারেন।

দাস শব্দে যে বিনয় প্রকাশ পায় তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু দাস শব্দ জাতি-প্রকাশকও বটে। রামপ্রসাদ দাস শব্দ কুত্রাপি বিনয় প্রকাশার্থে কোথাও জাতিপ্রকাশার্থে উপাধি স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহারা সরলভাবে প্রসাদের কাব্য ও গান পাঠ করিয়াছেন তাহাদের ইহাই ধারণা হয়। প্রতিবাদকারী দীনতা-ব্যঞ্জক দাস শব্দ দুই একটী উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু উপাধিব্যঞ্জক দাস শব্দের উল্লেখ করেন নাই। আমরা প্রবন্ধে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাও দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। আমরা এস্থলে পুনরায় উপাধিবোধক দাস শব্দ উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন নিতান্ত তর্কের ইচ্ছা না থাকিলে তাহার দীন অর্থ ঘটান যায় না।

(১) কবি রামপ্রসাদ দাসে গো ভাবে জননী।

(২) ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস,
সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবিতনয় শঙ্কা,
মদনমথন-অঙ্গনা।

(৩) শ্রীরামপ্রসাদ দাসে,
এ কথা শুনিয়া হাসে.
অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাজ।

(৪) রামপ্রসাদ দাসে,
প্রেমানন্দে ভাসে।

(৫) ভণে রামপ্রসাদ দাস,
মার এই এক ধ্যান।

(৬) কহিছে প্রসাদ দাস,
রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।

(৭) ভণে দাস রামপ্রসাদ,
হায় একি পরমাদ।

(৮) রামপ্রসাদ দাস কয়,
রিপু ছয় কর জয়।

(৯) রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে,
ব্রহ্মরসে মিশাইবা।

(১০) কবি রামপ্রসাদ দাসে,
আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।

(১১) কলয়তি রামপ্রসাদ দাস,
ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ,
হৃদয় কমলে সতত বাস,
শ্যামা দীর্ঘকেশী।

কি কালীকীর্ত্তন, কি কৃষ্ণকীর্ত্তন, কি গান সর্ব্বত্রই এইরূপ উপাধি প্রকাশক দাস শব্দ আছে। সেন উপাধি কোথায়ও নাই। আবার এই সকল দাস শব্দ যে পরবর্ত্তী লোকে যোজনা করিয়া লইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, কেননা দাস শব্দের পরিবর্ত্তনে ছন্দো ভঙ্গ হয়। সুতরাং এই অপরিবর্ত্ত-নীয় বহু ব্যবহৃত দাস শব্দ যে রামপ্রসাদের জাতিবাচক তাহার সন্দেহ নাই।

প্রতিবাদকারী এক স্থলে বলিয়াছেন—রামপ্রসাদ যেমন বৈষ্ণবের মতন বিনয় প্রকাশার্থে দাস শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনি বৈষ্ণবের মত শ্রী শব্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিবাদ-লেখক শ্রী শব্দ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া রামপ্রসাদের গ্রন্থ ও বৈষ্ণব সাহিত্য উভয়ত্র আপনার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ শ্রী শব্দের প্রয়োগ করিতেন শ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য। দেবতা, গুরু, গুরুস্থান, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রাধিদেবতা, ভগবৎগুণকীর্ত্তন-বিষয়ক গ্রন্থ প্রভৃতির নাম তাঁহারা শ্রীপূর্ব্বক উচ্চারণ করিতেন। আত্মনাম বা পুত্রাদির নামের পূর্ব্বে (১) কখনও শ্রী ব্যবহার করেন নাই। প্রসাদ বৈষ্ণবের মত শ্রী শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তিনি ছন্দের জন্য শ্রী ব্যব-হার করিয়াছেন। যেখানে শ্রী প্রয়োগ না করিলে ছন্দঃপতন হয়, তথায় নিজের বা পুত্রের নামের পূর্ব্বে শ্রী লিখিয়াছেন। শ্রী প্রয়োগ সম্বন্ধে রামপ্রসাদ ও বৈষ্ণব কবিতে এই প্রভেদ। বৈষ্ণবের মত শ্রী প্রয়োগ না করিলেও যে রাম-প্রসাদ বৈষ্ণবের মত দীনতা প্রকাশ করিয়াছেন একথা মিথ্যা নহে। প্রসাদের শাক্ত ধর্ম্ম বৈষ্ণব মতে অনুপ্রাণিত। তিনি শ্যামের গোচারণ গোষ্ঠলীলার

(১) দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাং
সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ॥

অনুকরণে শ্যামার গোচারণ গোষ্ঠলীলা গাইয়াছেন। বৈষ্ণবের নিকট শাক্ত প্রসাদ ভক্তি বিনয়ে বড় বেশী ঋণী। ভাষাতেও কম নহে। কিন্তু তাই বলিয়া দাস শব্দও যে বৈষ্ণবের নিকট ধার করা তাহা বলা যায় না। বৈষ্ণবের দাস শব্দ প্রায়শঃ নামের অন্তর্ভূত ছিল—যেমন কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস, হরিদাস, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস। এখনও বৈরাগীদিগের নাম প্রায়ই এইরূপ। স্বতন্ত্র দাস বলিয়া বিনয় প্রকাশ বৈষ্ণব কাব্যে নাই বলিলেই হয় সুতরাং প্রসাদের দাস শব্দকে বৈষ্ণবের অনুকরণ বলিয়া জাতিবোধক নহে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রতিবাদক লেখক রামপ্রসাদের গানে কয়েকটী দ্বিজ শব্দ দর্শন করিয়া, প্রসাদ কায়স্থ হইতে পারেন না বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। তবে এ দ্বিজ দর্শনে প্রসাদকে ব্রাহ্মণ বলিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। প্রসাদকে বৈদ্য রাখিতেই হইবে তা যে প্রকারেই কেন হউক না। এজন্য কৈফিয়ত দিতেছেন—"বৈশ্য জাতি (একি মুদ্রাকর প্রমাদ, না প্রতিবাদলেখক বৈদ্য বৈশ্য এক মনে করেন?) চিরকালই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন সুতরাং দ্বিজ লেখাতে রামপ্রসাদের কোন অসঙ্গতি হয় নাই।" কোন অসঙ্গতি হউক কি না হউক রামপ্রসাদ ইচ্ছা করিয়া কেন একটা কৈফিয়তের নীচে আসিতে গেলেন বুঝা যায় না। গুপ্ত লিখিলে বা বেজ লিখিলেই আর এত কৈফিয়ত দিতে হইত না। বৈদ্যগণের চিরন্তন যজ্ঞসূত্রের কথা লোকে না জানুক, গুপ্ত উপনামের কথা অনেক দিন অবধি জানা আছে। বৈদ্যের দ্বিজ পরিচয় এই নূতন শুনা গেল। এদেশে দ্বিজ পরিচয় ব্রাহ্মণেই এত দিন দিয়াছেন। তবে এখন কি হইবে বলিতে পারা যায় না।

আমরা মূল প্রবন্ধে দ্বিজ শব্দ প্রয়োগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। প্রতিবাদ লেখক হৃদ্গত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাহা পাঠ করিলে তাহার জন্য অদ্য আমাদিগকে আর কিছু লিখিতে হইত না।

কি কালীকীর্ত্তন (বিদ্যাসুন্দর সমেত) কি কৃষ্ণকীর্ত্তন কোথায়ও দ্বিজ ভণিতা নাই। এ সকল লোকমুখে বড় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। অন্যের রচনাও ইহার সহিত মিশ্রিত হইবার সুবিধা পায় নাই। সুতরাং ইহাতে যাহা আছে তাহার উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল গ্রন্থে 'দাস' ব্যতীত জাতিবোধক অন্য কোন শব্দ নাই। দ্বিজ ভণিতা কেবল গানে দেখা যায়। গান লোকমুখে বড়ই পরিবর্ত্তিত হয়। রামপ্রসাদের গানের সুর সহজ, ভাব সরল, শব্দগুলি সকলেরই পরিচিত। সুতরাং অল্পদিনেই প্রসাদের গান বড় বেশী প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গায়কের রুচি, শক্তি ও অভিজ্ঞতানুসারে যে পরিবর্ত্তনও বেশী হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়। বিশেষতঃ ওমা, ঐ যে, দেখ, মা, তারা, প্রভৃতির পরিবর্ত্তে দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ বড়ই সহজ। উহাতে সঙ্গীতের কোনও হানি হয় না। অধিকাংশস্থলে ঐ সকল শব্দের পরিবর্ত্তে যে দ্বিজ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রসাদপদাবলির ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণেও এ কথার যাথার্থ্য দৃষ্ট হয়। একজনের প্রকাশিত গ্রন্থের যে গানে দ্বিজ শব্দ আছে, অন্যের প্রকাশিত গ্রন্থের সেই গানে হয়ত তারা, বা ওমা এইরূপ একটা শব্দ রহিয়াছে। তবে কথা এই যে, অন্য শব্দ প্রয়োগ না করিয়া গায়কেরা দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ করিল কেন? সঙ্গীতরচয়িতা আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচিত না করিলে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এমন হইতে পারে যে, গীতরচক আপনাকে দুই এক স্থলে দ্বিজ বলিয়াছেন, গায়কেরা সেই দ্বিজ শব্দ বহুল স্থলে প্রয়োগ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আদিতে একবারে ছিল না এমন হইতে পারে না। দ্বিজ শব্দে বঙ্গদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। সুতরাং সহসা গীতরচয়িতা রামপ্রসাদকে ব্রাহ্মণবলিয়া মনে হইতে পারে। তাহা হইলে কাব্যরচয়িতা রামপ্রসাদ আর গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ দুই পৃথক্ ব্যক্তি হইয়া পড়েন। কিন্তু কাব্য ও গানের ভাষার সাদৃশ্য, উভয়ে কবিরঞ্জন উপাধির প্রয়োগ, বিশেষতঃ গানেরও বহুস্থানে দাস উপাধি দর্শন করিলে আর সে সন্দেহ থাকে না। তখন এক রামপ্রসাদ দাসই যে কাব্য ও গান রচনা করিয়াছেন তাহা স্বতই মনে উদিত হয়। দ্বিজ শব্দ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, দুই একটী গানে স্বয়ং রামপ্রসাদ দাস আপনাকে দ্বিজ বলিয়া থাকিবেন। যখন সাধনাতে তিনি একবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন, তখন দ্বিজ বলা অসম্ভব বা অশাস্ত্রীয় নহে (প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ)। এখনও অনেক নীচ জাতীয় লোকদিগকে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হইয়া উপবীত ধারণ করিতে দেখা যায়। গান ভিন্ন অন্যত্র দ্বিজ শব্দ নাই। গানের মধ্যেও উহার সংখ্যা বেশী নহে। আমরা ২৩১টী গানের মধ্যে ৫।৬টীতে দ্বিজ শব্দ পাইয়াছি। সুতরাং দ্বিজ শব্দ কায়স্থত্বের প্রতিকূল বলিয়া এস্থলে মনে করি না। এবং এই দুই এক স্থলে দ্বিজ শব্দের ব্যবহারে দাস উপাধির হানি হইতেছে না।

অতঃপর প্রতিবাদ-লেখক বলিতেছেন "রামপ্রসাদ দাস হইলেই যে কায়স্থ হইবেন এ কথার কোন প্রমাণ নাই। বৈদ্যের মধ্যেও দাস আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার সহোদরাভগ্নীপতি নাও হইতে পারেন।" আমরা বলি দাস হইলেই তিনি কায়স্থ হইবেন। কেননা বৈদ্যদাসগণ সকলেই এক গোত্র, বৈদ্য দাসের ভগিনীপতি দাস হইতে পারে না। রামপ্রসাদের ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। লক্ষ্মীনারায়ণ যে রামপ্রসাদের সহোদরা ভগিনীর পতি তাহা কবি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী,
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি।
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস,
গরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস।
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম,
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম।
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা,
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা।
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা,
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা।
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া,
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া।
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি,
শ্রীরাম দুলালে মাগো দেহ পদধূলি।

কালীকীর্ত্তনের অষ্টম মঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের সমাপ্তি সময় কবি উল্লিখিত কবিতাগুলি দ্বারা আত্মীয়গণের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন। যাহার সহিত যে সম্পর্ক, তাহাও ইহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিধিরামকে যেমন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, ভবানী যদি সহোদরা ভগিনী না হইতেন, তাহা হইলে কেবল জ্যেষ্ঠা না বলিয়া বিশেষ পরিচয় অবশ্যই বলিতেন। কেবল জ্যেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠা বলিলে বঙ্গভাষায় সহোদর সহোদরাকেই বুঝায়। ভবানীকে জ্যেষ্ঠা এবং অম্বিকাকে সর্ব্বাগ্রজা বলাতে উভয়েই যে তাঁহার সহোদরা তাহা নিঃসংশয়ে বুঝাইতেছে। কাজেই প্রতিবাদ-লেখকের "সহোদরা ভগ্না নাও হইতে পারেন" এই কথার কোন মূল্য নাই। তিনি কেবল

প্রতিবাদের জন্য লেখনীচালনা করিয়াছেন, সত্যানুসন্ধানের জন্য নহে। সুতরাং গ্রন্থপাঠ বা চিন্তা তাঁহার আবশ্যক হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা রামপ্রসাদের সম্বন্ধে চিন্তা অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভবানীকে রামপ্রসাদের সহোদরা বলিয়াই বুঝিয়াছেন। এই ভবানীর স্বামীই লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। বৈদ্য দাসের ভগিনীপতি দাস হইতে পারে না, এই জন্য আমরা রামপ্রসাদ দাসকে বৈদ্য মনে না করিয়া কায়স্থ মনে করি।

রামপ্রসাদ দাসের কায়স্থত্বের অনুকূলে আরও দুএকটী কথা আছে। তাঁহার গানে জানা যায়, তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ ধনী ও জমিদার ছিলেন। সে কালে বঙ্গদেশে কায়স্থগণই প্রায় জমিদার ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের অনুগ্রহে একালে যাহাই হউক, সে কালে বৈদ্যগণ জমিদার ছিলেন না। তখন নাকি চিকিৎসকের গৃহে লক্ষ্মী থাকিতেন না—এইরূপ শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়। তাহাতে বোধ হয় সে কালে চিকিৎসকেরা অধিক সঞ্চয় করিয়া ধনী বলিয়াও পরিচিত হইতে পারিতেন না। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ে রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়াই মনে হয়।

আর একটী কথা—রামপ্রসাদের ব্যবসায়। রামপ্রসাদ বৈদ্য হইলে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া স্বজাতিসুলভ কবিরাজী করিতেই প্রবৃত্ত হইতেন, কায়স্থসুলভ আমলাগিরিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। তৎকালে স্বজাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া কেহ অন্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত না।

প্রতিবাদলেখক বলিয়াছেন,—তাঁহার বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন, সুতরাং তাঁহাকে বৈদ্যদাস কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দাসের সম্বন্ধে যত কল্পিত কথা আছে, তন্মধ্যে জীবিত বংশধর বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। দাস রামপ্রসাদের অধস্তন পুরুষগণ সেন উপাধিধারী—ইহা অপেক্ষা আর বিচিত্র কি? প্রতিবাদ লেখক স্বয়ং এবং তিনি যাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা রামপ্রসাদের বংশধর বলিয়া যাঁহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সেন রামপ্রসাদের বংশধর। কিন্তু দাস রামপ্রসাদ, সেন রামপ্রসাদ নহেন। তবে কালে, দাস রামপ্রসাদের বংশধর বাহির হওয়াও বিচিত্র নহে। পণ্ডিতবর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন বর্দ্ধমান যাইয়া বিদ্যাপোতা, মালিনীপোতা, সুড়ঙ্গ, সকলই পাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের ভিটা ও বংশধর আবিষ্কৃত হওয়াও অসম্ভব নহে।

রামপ্রসাদের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে প্রতিবাদ-লেখকের আর একটী প্রমাণ আজু গোসাঁই। আজু গোসাঁই সম্বন্ধে আমরা নব্যভারতে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট মনে করি। প্রতিবাদ-লেখক তাহার একটী কথাও খণ্ডন করিতে পারেন নাই, আজু গোসাঁই সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসজনক প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই, ব্যঙ্গ করিয়া কথাটা উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, ঠাকুরমার উপকথা শুনিয়া কালীদাসের জীবনী লেখাই তাঁহার কার্য্য, ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে আসা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র।

প্রতিবাদ-লেখকের শেষ কথা রামপ্রসাদ স্বয়ংই আপনাকে ভিষক্ বলিাছেন। প্রমাণস্বরূপ একটী গানের চরণ তুলিয়াছেন। প্রায় ২৫০ গাঁন একখানি বিস্তৃত কাব্য ইহার মধ্যে কেবল একটী গানের একটী চরণে বৈদ্যবাচক একটী শব্দ দেখিয়া শতসংখ্যক দাস শব্দ ও বিবিধ বিরোধী প্রমাণসত্বে বৈদ্য বলিয়া নিশ্চয় করা কখনই সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ দাস শব্দ যেমন অপরিবর্ত্তনীয় ভিষক্ শব্দটী তেমন নহে। উহার পরিবর্ত্তে সাধক, শ্রীরাম বা অন্য কোন শব্দ যে ছিল না তাহা বলিবার উপায় নাই। আবার গানটী যে ভাবের তাহাতে ভিষক্ শব্দটী জাতিবাচক না হইলেও হইতে পারে। পঞ্চভূত রূপ ভূতের ওঝা অর্থেও প্রযুক্ত হইলেও হইতে পারে।

উপসংহারে প্রতিবাদ-লেখককে বলি রামপ্রসাদ বৈদ্য বা কায়স্থ যাহা হউন না কেন তাহাতে ঐ জাতি দ্বয়ের যে বিশেষ কিছু আসে যায় এমন বোধ হয় না। আমরা প্রমাণ প্রয়োগ যাহা পাইয়াছি তাহাতে কায়স্থ বলিয়া বুঝিয়াছি বলিয়াই কায়স্থ বলিয়াছি। বৈদ্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিলে আমরা আহ্লাদে তাহাই প্রকাশ করিতাম। অতঃপর যদি কেহ বৈদ্য বলিয়া প্রমাণ দেখাইতে পারেন, আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহা স্বীকার করিব। কিন্তু বিনা প্রমাণে উপকথার উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলিলে কেহই স্বীকার করিবে না। 'গুপ্ত কবি ও পণ্ডিত ন্যায়রত্ন কল্পনা ও প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াছেন, বলিয়া আমরা নাকি উক্ত মহাশয় দ্বয়ের অসম্মান করিয়াছি। সত্য কথায় ত্রুটি দেখাইলে যদি অসম্মান হয়, তাহা হইলে আমরা নিরুপায়। যাহা হউক আমরা প্রতিবাদ-লেখককে জিজ্ঞাসা করি—

বাবু শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ১৲, বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ী ১৲, S. C. Mukerji Esq. ১৲, Mrs. K.N.Ray ১৲, কোন সমিতি মাঃ বাবু প্রিয়নাথ দাস ॥০, বাবু কালীদাস মজুমদার ॥০, বাবু মনোমোহন মজুমদার ও বাবু রেবতীমোহন ঘোষ ⁄১০, S. C. Mukerji, Esq. ।০, বাবু ক্ষেত্রমোহন দে ১৲, বাবু সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী ১৲, বাবু মদনমোহন বসু ১৲, বাবু জয়গোপাল সিংহ ৵০, বাবু শ্যামাচরণ মিত্র ১৲, বাবু সুরেশচন্দ্র মিত্র ২৲, Dr. K. D. Mukerji. ১৲, D. N. Ray Esq. ৵০, A. Debtor. ৶১০, কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২৲, বাবু হরিদাস শ্রীমানী ⁄০, ৺ ক্ষেত্রমোহন বন্দোর স্ত্রী, স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২৲, বাবু কেদারনাথ কুলভি ১৲, বাবু জ্ঞানদাপ্রসাদ দত্ত ৵০, J. Ghoshal, Esq. ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি ॥০ বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ॥০, ডাঃ কেশবচন্দ্র দাস ২৲, A friend of Dsaasram. ১৲, ৬৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৵১০ বাবু রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ১৲, বাবু কালিকা প্রসাদ মুখো ১৲, বাবু তারাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত ১৲, বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ৪৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ১৲, বাবু ধরণীধর রায় ২৲।

অন্যাপ্রকারে আয়।

হাওলাত ৭৲, বিগত মাসের জের ৩১।৶১০ মোট ৩৮।৶১০।

মোট আয়।

মাসিকচাঁদা ২৩৲ এককালীন দান ৪৮।⁄১০ অন্যান্য প্রকারে আয় ৩৮।৶১০। মোট আয় ১০৯৸⁄০

ব্যয়।

রোগীর গাড়ী ।৵০, গিরিডি সেবালয় ৯০৸৵০, কর্জ্জ টাকার সুদ ১৲, কমিশন ১৩।৵৫, মৃগাঙ্ক বাবুর ট্রামভাড়া ও ডাক ব্যয় ।⁄১৫, ডাক ব্যয় ১৵০, মোট ব্যয় ১০৭৵০।

মোট আয় ব্যয়।

আয় ১০৯৸⁄০, ব্যয় ১০৭৵০, হস্তেস্থিত ২॥৶০।

বস্ত্রাদি।

বাবু আনন্দচন্দ্র রায় বিছানার চাদর ২ জোড়া। ডাক্তার চুনীলাল বসু মোজা ২ জোড়া, প্যান্টুলেন ৪ জোড়া, সার্ট ৪। বাবু রামদুর্লভ মজুমদারের শ্রীতসরের কোট ১, আলপাকার কোট ১, চাপকান ২, প্যান্টুলেন ১০। বাবু আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারির স্বর্গীয় কন্যা শান্তশীলা ঘোষের প্রদত্ত গরম জ্যাকেট, ২ গরম কাপড় ১, সাদা জ্যাকেট ৩ ধুতি ১, মসারি ১, দস্তানা ১ জোড়া, ফ্লানেল টুকরা ১, বার্লি টিন ২, সাগু টিন ১, পিস্‌কারী ১, এরারুট টিন ১, শিশি বোতল ১৮টা। বাবু অত্রিকুমার রায় স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন ঘোষের আত্মার কল্যানার্থ-Brand's Essence of chicken ৩ কৌটা, Olive Oil ২ বোতল, Lint Gota parcha ও Cotton প্রভৃতি। বাবু ব্রজের চাঁদ গোস্বামী-নূতন কোরা ধুতি—১, ধোলাই ধুতি ১। বাবু প্রসন্নকুমার মল্লিক পুরাতন সাদাধুতি ১।

ভ্রমসংশোধন।

অক্টোবর মাসের দাসীতে বাবু সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সংগৃহীত যে ২৲ দুই টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার হিসাবঃ—

দাসাশ্রম সাহায্য ভাণ্ডার ১২০/২ মশ্‌জিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট ৮৵০, দাসাশ্রম সাহায্য-ভাণ্ডার ৬৩।১ মেছুয়াবাজার ৵১৫ ও ১টী শার্ট। দাসাশ্রম সাহায্য-ভাণ্ডার ৬৩ হ্যারিসন রোড ।৵১৫, দাসাশ্রম সাহায্য-ভাণ্ডার ১০০/২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ।/১০ মোট ২

দাসাশ্রম।

উদ্দেশ্য।—নানাপ্রকারে বিপদ্‌গ্রস্ত মানবগণের সাধ্যানুসারে হিত-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগকে ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে।

সাধারণ বিভাগ।—সেবালয়—ইহা গিরিডিতে অবস্থিত।

"দাসী" বিভাগ।—জন-হিতৈষণা প্রবর্ত্তনা ও দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ হইতে "দাসী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

ডিস্পেন্সারি বিভাগ।—দাসাশ্রমকে ঔষধ সাহায্য করিবার জন্য ও ইহার স্থায়ী এবং পাকা আয়ের সংস্থান করিবার জন্য ইহার এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকানা—৮৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কার্য্যপ্রণালী।—ইহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সম্প্রতি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপার উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা ও কার্য্যে সেইরূপ চেষ্টা করা হয়।

PAGES MISSING